শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের

অনুকম্পিত

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের

শ্রীচরণাশ্রিত

শ্রীসনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

কর্তৃক উত্তর প্রদান

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫, ২৪৫-৫৭৮

সূচীপত্র

ভূমিকা

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, পশুপাখিরা প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই মনে মনে প্রশ্ন করে 'কোথায় গেলে খাবার পাব?' বুদ্ধিমান মানুষেরা প্রশ্ন করেন, 'কে আমি? কেন এই জগতে? এই জগৎ কি? আমার কর্তব্য কি?' একে বলে অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেছিলেন, তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমার গ্রন্থাবলীর মধ্যেই রয়েছে।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত দি ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত দুটি সর্বজনপ্রিয় পারমার্থিক পত্রিকা 'ভগবৎ-দর্শন' ও 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচারে' গ্রাহক তথা পাঠকবৃন্দের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে থাকে। সেই প্রশ্নোত্তরগুলি অনেকের হৃদয়ে আনন্দ ও আগ্রহের সঞ্চার করে। বেশ কিছু প্রশ্ন-উত্তর সংকলিত করে 'প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হল।

সুধী পাঠকবৃন্দের পক্ষ থেকেই প্রেরিত প্রশ্নের উত্তরগুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ যে অবশ্যই থাকছে, তা বলা বাহুল্য। অনুসন্ধিৎসু সহৃদয় পাঠকবৃন্দ এই প্রশ্নোত্তর পাঠ করে বিশেষ উপকৃত হতে পারবেন। ভক্তি জীবনের প্রেরণা ও উৎসাহ ব্যঞ্জক 'প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন' গ্রন্থখানি আপনার বহু সংশয়ের সমাধান করবে বৈকি!

প্রশ্নগুলির উত্তরদানের প্রেরণায় শ্রীমায়াপুর বিবিটি প্রোডাকশান ম্যানেজার শ্রীবৃহৎকীর্তন দাস ব্রহ্মচারী, গ্রন্থ প্রকাশনায় বিবিটি ম্যানেজার শ্রীশ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী, প্রুফ সংশোধনে শ্রীতেজোগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী, পৃষ্ঠাসজ্জায় শ্রীরাধিকেশ দাস ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য সহযোগী ভক্তবৃন্দ সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রায়ই মনে হয়—

বহু জীবনের পুঞ্জীভূত
প্রশ্ন তোমার যতেক আছে।
সব প্রশ্নের হয় সমাধান
যদি যাও মন কৃষ্ণকাছে ॥
"সমস্ত কিছু আমিই জানি"—
ভগবানের মুখের বাণী।
নানা জনের নানা কথায়
ঘামিয়ে মাথা কি লাভ আছে ॥

—শ্রীসনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

১
সৃষ্টি ও স্রষ্টা

প্রশ্ন ১। ভগবান যদি সুন্দর হন তবে তাঁর সৃষ্ট এই জগৎটা এত খারাপ কেন? এখানে এত কষ্ট, মৃত্যু, কান্না—এর তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ এই জগৎটা জেলখানা স্বরূপ। এটি *দুঃখালয়ম্*—দুঃখের আলয়। ভগবদ্‌বিমুখ হওয়ার জন্য আমরা এই দুঃখময় জগতে অধঃপতিত হয়েছি বলে বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজদ্রোহী প্রজারা জেলখানায় স্থান পায়। জেলখানা শাস্তি, উদ্বেগ ও কষ্ট পাওয়ার জন্যই তৈরি হয়েছে। সরকার জেলখানা তৈরি করেছে বলে সরকার ভাল নয়—এরূপ ভাবাটাই বোকামি। জেলখানা তৈরি করাটা কোনও রাজার দোষরূপে গণ্য করা উচিত নয়। তবে কৃত কর্মের দণ্ডভোগের মেয়াদ শেষ হলে জেলখানা থেকে রেহাই পাওয়ার সুযোগ থাকে। পুনরায় অপরাধমূলক কর্ম করলে পুনরায় জেলখানাতেই গতি হবে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি বারে বারে জড়জাগতিক দুঃখ কষ্ট লাভ করতে চাইবেন না, তাই তাঁরা ভগবদ্‌ভক্তি অনুশীলন করে এই জেলখানা স্বরূপ দুঃখময় জগৎ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পরমানন্দময় ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার জন্য সযত্ন প্রয়াস করেন।

প্রশ্ন ২। শাস্ত্রে জানতে পারলাম, ভাল ও মন্দ উভয়েই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি। তা হলে ভগবান কি কারণে মন্দ বিভাগ সৃষ্টি করলেন?

উত্তর ঃ বৈপরীত্য না থাকলে বৈচিত্র্য উপলব্ধ হয় না। ভালর মহিমা লোকে তখনই বুঝতে পারে যখন মন্দ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা হয়। অন্ধকার যদি না থাকত, তবে আলোর মর্যাদা কেউ দিত না। জীবের মন্দ প্রবণতা আছে বলে মন্দ বিভাগে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছু নাগরিক কয়েদি হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের আটক রাখার উদ্দেশ্যে কয়েদখানা তৈরি করা হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, সমস্ত নাগরিককে কয়েদখানায় বাস করতে কিংবা মন্দ হয়ে থাকতে বলা হচ্ছে। না, তা নয়।

প্রশ্ন ৩। শাস্ত্রে পেয়েছি, "যা গত হয়েছে তা ভাল হয়েছে, যা চলছে তা ভাল চলছে, যা ভবিষ্যতে হবে তা-ও ভাল হবে।" তবে আমরা যা করছি তা যা-ই হোক, শাস্ত্র অনুযায়ী ভালই হচ্ছে। তা কি সত্য নয়?

উত্তর ঃ কোন্ শাস্ত্রে আছে জানি না। তবে বলা যায়, যে পুণ্য করছে সে স্বর্গসুখ ভোগ করবে—অতএব ভাল করছে। যে পুণ্য করেছিল সে এখন স্বর্গসুখ লাভ করছে, অতএব ভাল করেছিল। যে পাপ করেছিল, সে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে সুতরাং শাস্তির পর তার পাপফল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অতএব ভাল হচ্ছে। যে ক্রমশ পাপ কর্ম করেই চলেছে, সে অবশ্যই নরকগামী হবে এবং দণ্ডভোগ করবে। এটিও নীতিগত বিচারে ভালই। শাস্ত্রে আছে, এই মানবজন্মে যে পশুর মতো আচরণ করবে, পরজন্মে সে একটি পশুজন্ম পাবে। এই জন্মে যে হরিভজন করে জীবন অতিবাহিত করবে, পরবর্তী

জীবনে সে হরিধামে উন্নীত হবে। অতএব আপনি যেটাই ভাল বোঝেন, সেটাই করে চলবেন এবং তার উপযুক্ত ফল লাভ করবেন। এই নিয়মটি নিশ্চয়ই ভাল।

প্রশ্ন ৪। ভগবান কেন এই জগৎ সৃষ্টি করলেন?

উত্তর ঃ জীব তার স্বতন্ত্র ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ও ভোগের বিষয় আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। তার সেই সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে যখন জীব বুঝতে পারে যে, প্রকৃত আনন্দ এখানে নেই, তখন সে আনন্দময় ভগবদ্ ধামে উন্নীত হওয়ার জন্য সাধুসঙ্গাদিমূলক আচরণ করার সুযোগও পেতে পারে। এই জন্যই ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন ৫। জগতে ভক্তের সংখ্যা বেশী, না অভক্তের সংখ্যা বেশী?

উত্তর ঃ সমগ্র জগৎ অর্থাৎ চিন্ময় জগৎ ও জড় জগৎ—এভাবে সমগ্র জগতের চারভাগের একভাগ মাত্র জড়জগৎ। বাকী তিনভাগই বৈকুণ্ঠ জগৎ। বৈকুণ্ঠ জগতের সকলেই ভক্ত। অল্প অংশ এই জড়জগতের মধ্যে আবার উর্ধ্বলোকগুলিতে ভক্ত বেশী। যদিও সকাম ভক্তই বেশী। পৃথিবী নামক ছোট গ্রহে কলিপ্রভাবিত মানুষের সংখ্যা বেশী। প্রচ্ছন্ন ভক্তের সংখ্যা বেশী। তবে এই কলিযুগ ধন্য। কারণ মহাবদান্য অবতার ভক্তরূপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার হওয়ার কথা প্রতিশ্রুত হয়েছে। শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে আগামী দশহাজার বছর অবধি মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তন সমগ্র পৃথিবীর প্রতি নগর গ্রামে সবার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়বে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। অর্থাৎ কলির প্রথম সন্ধ্যায় ভক্তই বেশী। যদিও বা ইদানীং মনে হচ্ছে জগতে অভক্ত বেশী। কিন্তু ঘোর কলি আসতে না আসতেই একটি বিশাল মঙ্গলময়—ভক্তিময় পরিবর্তন সূচিত হবে। পাঁচ হাজার বছর পর ক্রমশ ভক্তসংখ্যা এই পৃথিবীতে কমতে থাকবে। এই জগতে অসংখ্য প্রাণীর প্রজাতি রয়েছে, তাদের মধ্যে মনুষ্য জন্ম লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। তার মধ্যে ভক্ত সঙ্গ বহুগুণাধিক দুর্লভ।

প্রশ্ন ৬। পরমেশ্বর ভগবানের সৃষ্টিকর্তা কে?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর অর্থাৎ পরম ঈশ্বর। তাই পরম ঈশ্বরের আবার সৃষ্টিকর্তা রয়েছে—এরূপ কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল। যিনি পরম, তাঁর উপরে কেউই থাকেন না। যদি থাকেন, তবে 'পরমেশ্বর' কথাটি ব্যবহার করা হত না। শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে 'অসমোর্ধ্ব' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'অসমোর্ধ্ব' কথাটির অর্থ হল 'যাঁর সমান কেউ নেই এবং যাঁর উর্ধ্বে কেউ নেই।' তিনিই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আপনার আমার সৃষ্টিকর্তা রয়েছে বলেই তো আমরা ভগবান নই। যে কারণে আমরা ভগবান নই সেই কারণটি ভগবানের ক্ষেত্রে আরোপ করা কেন?

সৃষ্টির আদি জীব প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

অর্থাৎ, "সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান। তিনি অনাদিরও আদি এবং সমস্ত কারণের পরম কারণ।" (শ্রীব্রহ্মসংহিতা ১) এই থেকে প্রতিপন্ন হয় যে

পরমেশ্বরের কোন কারণ নেই। পরমেশ্বরের কোন আদি নেই। তিনিই সমস্ত কারণের পরম কারণ।

প্রশ্ন ৭। ভগবান যে আছেন, তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারবেন?

উত্তর ঃ আপনি আপনার অপূর্ণ চক্ষু দিয়ে বস্তুকে দেখেন। সেই চক্ষু দিয়ে আপনি অতি কাছের, কিংবা অন্তরালের কিংবা দূরের জিনিস প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। আবার সেই চক্ষুরও কোনও মূল্য থাকবে না, যদি আলোর সাহায্য না নেন। আলোর সাহায্য আছে বলেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আবার যে চক্ষু দিয়ে আপনি দর্শন করছেন, সেই চক্ষুকেও আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আয়না বা প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে এমন কোন বস্তুর সাহায্য না নিচ্ছেন। আবার কোন জিনিস দেখেও আপনি 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা' অর্জন করতে পারবেন না, যদি তা দেখার মতো মনোযোগ আপনার না থাকে। অর্থাৎ মনের সাহায্য নিতে হচ্ছে। আবার মৃত্যুর সময় জড় দেহের সঙ্গে সঙ্গে আপনার চক্ষুটিও হারাবেন। এইভাবে দেখা যায় যে, আপনার দর্শন ক্ষমতা কতো তুচ্ছ আর নগণ্য। এরূপ ক্ষুদ্র অপূর্ণ জড় চক্ষুতে পূর্ণ ও অসীম ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার আশা করছেন কিভাবে? ভগবানকে দেখতে হলে কাম-ক্রোধ-কালিমাশূন্য হৃদয়ে ভক্তি-চক্ষুর উন্মেষ প্রয়োজন। শ্যামসুন্দরকে 'ভক্তিবিলোচনেন' ভক্তিচক্ষুতে দর্শন করতে হয়। আপনি আগে ভক্তিচক্ষু লাভ করুন। ভক্ত হোন্। তারপর ভক্তিচক্ষুর সাহায্যে ভগবৎ দর্শন হবে। ভগবান 'অধোক্ষজ'—অর্থাৎ তিনি এই জড় চক্ষুর অতীত। কামময় চক্ষু দিয়ে প্রেমময়ের দর্শন অসম্ভব।

প্রশ্ন ৮। "শূন্য থেকে কোন কিছুই সৃষ্টি হয় না।" তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি করে সৃষ্টি হলেন, জগৎ কিভাবে সৃষ্টি হল?

উত্তর ঃ শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি হয় না—একথা সত্য। কিন্তু পূর্ণ থেকে সব কিছু সৃষ্টি হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ পুরুষ। তিনি সর্বকারণের পরম কারণ। তিনি সৃষ্টির অতীত। যখন কোনও সৃষ্টি ছিল না, তখন আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি। তিনি ঘোষণা করেছেন—*অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—"আমি সমস্ত কিছুর উৎস।" (গীতা ১০/৮)

প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা নির্দেশ করেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান। তিনি অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের পরম কারণ।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)

এই থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনও কারণ থাকতে পারে না। অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বেও তিনি বিদ্যমান।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পূর্ণ, তিনি কখনই শূন্য নন। শ্রীঈশোপনিষদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

"পরমেশ্বর ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ। তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ বলে এই দৃশ্যমান জগতের মতো তাঁর থেকে উদ্ভূত সব কিছুই সর্বতোভাবে পূর্ণ। যা কিছু পরম পূর্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তা সবই পূর্ণ। কিন্তু যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই তাঁর থেকে অসংখ্য অখণ্ড ও পূর্ণ সত্তা বিনির্গত হলেও তিনি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।"

প্রশ্ন ৯। ভগবান যে সত্যি আছেন তা মানুষ বুঝবে কি করে?

উত্তর ঃ মানুষের বোঝা, না বোঝার উপর ভগবানের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। সৃষ্টি যখন আছে তখন স্রষ্টার নিশ্চয়ই অস্তিত্ব আছে। আমরা যে কাপড় চোপড় ব্যবহার করছি, আসবাব পত্র ব্যবহার করছি সেগুলি নিশ্চয় কেউ না কেউ বানিয়েছে। অতএব আমরা কখনও বলতে পারি না যে, এগুলির নির্মাতা কেউ নেই। যখন কেউ কোন ব্যক্তি বা স্থানের ছবি বা নকসা দেখায়, সেই ব্যক্তি বা স্থানের বর্ণনা দেয়, সেই ব্যক্তির বা স্থানের নানাবিধ কাহিনী আমরা শুনতে পাই, তখন সেই ব্যক্তি বা স্থান আমরা না দেখলেও তার অস্তিত্ব আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। আমরা নিউইয়র্ক বা আফ্রিকা কোনদিন না দেখলেও তা আছে বলে সহজেই স্বীকার করে নিই। আমরা প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিকে না দেখলেও না যোগাযোগ রাখলেও তাঁরা যে আছেন তা স্বীকার করে নিই। এই যদি সত্য হয় তবে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর যে কেউ একজন আছেন সেই কথাটি কেন সত্য হবে না—যখন মুনিঋষিগণ ভক্তগণ ভগবানের ধাম নাম রূপ গুণ লীলাবিলাসের যাবতীয় কাহিনী ও চিত্র নকসা প্রদান করে গেছেন? অবশ্য ভগবান বলেছেন—*ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—ভক্তরা আমাকে জানতে পারবে। কিন্তু *মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি*—গণ্ডমূর্খেরা আমাকে কিছুতেই জানতে পারবে না।

প্রশ্ন ১০। এই পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ছিলেন?

উত্তর ঃ এই একটি পৃথিবী নয়, অনন্ত কোটি পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান সেই কথা ব্রহ্মাকে বলছেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥

"হে ব্রহ্মা। সমগ্র সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর আমিই একমাত্র বর্তমান ছিলাম, এবং তখন আমি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এমনকি এই সৃষ্টির কারণীভূত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়ের পরেও পরমেশ্বর একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকব।" (শ্রীমদ্ভাগবত ২/৯/৩৩)

শ্রীকৃষ্ণের নিজ ধাম শ্রীগোলোক বৃন্দাবন। *গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি* (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৩)। গোলোকেই তিনি নিত্যকাল বাস করেন। *গোলোক এব নিবসতি* (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৭)। আর তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছেন। *একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিম্* (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৫)।

প্রশ্ন ১১। এই বিশ্ব সংসার তো ভগবানের সৃষ্টি। তিনি তো সকলের মঙ্গলের চিন্তা করেন, তবে তাঁর সংসারে কেউ চোর কেউ সাধু, কেউ ধনী, কেউ গরিব—এর কারণ কি?

উত্তর ঃ ভগবান আমাদের দিয়েছেন স্বতন্ত্র ইচ্ছা শক্তি। সেই ইচ্ছাশক্তি অনুসারে আমরা কর্ম করছি। আর সেই কর্মের ফলে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছি। স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির সদ্ব্যবহার করে আমরা সুন্দর হতে পারি, আবার অসদ্ ইচ্ছায় বদ্চরিত্র হতে পারি। বিশ্ব সংসারে স্থিত জীব তার নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করছে এবং তার ভাল বা মন্দ ফল ভোগ করছে।

বাধ্য করে যেমন ভালবাসা হয় না, মনের ইচ্ছা থেকেই লোকে ভালবাসে, তেমনই ভগবান সবাইকেই সঠিক পথে পরিচালিত করতে থাকলে স্বতন্ত্র ইচ্ছার মূল্যও থাকে না। তখন কর্মের মূল্য মর্যাদা বা মাহাত্ম্য বলে কিছু থাকত না। যেমন আলো ও অন্ধকার আছে বলেই আলোর মহিমা ও অন্ধকারের দুঃখ উপলব্ধ হচ্ছে। বৈচিত্র্যময় কর্ম ও কর্মফল যদি না থাকত তবে তো লোকে কর্ম করা থেকে বিরত হয়ে বসে থাকত, অথবা একটা নিছক যন্ত্রের মতো ভগবানের নির্দেশে চলত। কিন্তু নিছক যন্ত্রের মতো কর্ম করাটা আত্মবিরুদ্ধ। তাই, হয় ভাল কিছু করে ভাল ফল পেতে হবে, নতুবা মন্দ কিছু করে মন্দ ফল পেতে হবে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই প্রকৃত সুখের সন্ধান করতে হবে।

প্রশ্ন ১২। আমরা জানি সমুদ্র পৃথিবীর মধ্যেই আছে। অথচ শাস্ত্রে বলা হয়েছে ভগবান বিষ্ণু বরাহ রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীকে সমুদ্র থেকে উত্তোলন করলেন। এর রহস্যটা কি?

উত্তর ঃ আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডে বাস করছি তা হচ্ছে চৌদ্দ ভুবন বিশিষ্ট। তার মধ্যে মাঝখানের একটি গ্রহ হচ্ছে এই পৃথিবী। ব্রহ্মাণ্ডের তলদেশে রয়েছে গর্ভোদক সমুদ্র। সেই সমুদ্রে শায়িত গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে প্রজাসৃষ্টিকারী শ্রীব্রহ্মার জন্ম। সেই গর্ভোদক সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে শ্রীবরাহদেব উত্তোলন করেছিলেন। পৃথিবীর যথার্থ অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে অসুর হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে গর্ভোদক সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখে ছিল। পৃথিবীতে যে অতি নগণ্য সমুদ্র আছে, সেই সমুদ্রের কথা বলা হচ্ছে না।

প্রশ্ন ১৩। ভগবান সর্বশক্তিমান। ইচ্ছা মাত্রেই সব কিছু করতে পারেন। কলিযুগে প্রতিনিয়ত অন্যায় হিংসা প্রতারণা হানাহানি চলছে। তিনি তো ইচ্ছা করলে এসব পাপকর্ম থেকে মানুষকে বিরত করে জগতের মঙ্গল বিধানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে পারেন। কিন্তু নিচ্ছেন না কেন? তাহলে কি এই জগতে দুর্বিষহ পরিস্থিতিটা তাঁরই ইচ্ছার প্রকাশ?

উত্তর ঃ আমরা এই জগতে এসে পড়েছি ভগবানের সেবা বিমুখ মনোভাব নেওয়ার ফলে। এটিই শাস্ত্রে বলা হয়েছে। ভগবান আমাদের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা দিয়েছেন, যাতে

আমরা ভাল হয়ে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারি, কিংবা এই জগতে থেকে অন্যায় অবিচারও করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে এই জগতের অধিকাংশ মানুষই জড় জগৎটাকে ভালবাসতে চায়। ভগবানকে ততটা ভালবাসতে চায় না। অতএব দুর্বিষহ পরিস্থিতিটাই তো আমরা পেতে চেয়েছি, না হলে আমরা সবাই ভক্ত হওয়ার জন্য তৈরি হতাম। লোকেরা ধর্মশীল হতে চায় না। ধর্ম হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন। আইন লঙ্ঘন করে আমরা স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপব্যবহার করতেই পছন্দ করি। অতএব পরিণামে শাস্তি দুর্ভোগ পাওয়াটাই আমাদের উচিত। নতুবা শিক্ষা হবে না। অতএব উচিত শিক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের এখানে দুর্বিষহ পরিস্থিতি বজায় থাকুক—এটি ভগবানের ইচ্ছা। যদি আমরা ভগবানকেই পেতে চাই তবে তিনি আমাদের সেরূপ বুদ্ধি দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু এই দুঃখময় জগৎটার পরিবর্তন সাধন ভগবান প্রত্যক্ষভাবে করে দিন তার ফলে আমরা সব জগৎবাসী সুন্দরভাবে আঁটঘাট মেরে থাকব—এরকম কল্পনা করা ঠিক নয়। কেননা তাহলে তো সুন্দর বা মঙ্গলের মর্যাদা কেউ দেবে না। পাণ্ডব আর কৌরব যদি এক হয়ে যায় কিংবা আঠারো দিনের মহাভারতের যুদ্ধ একদিনেই শেষ হয়ে যায় তাহলে তো আর মহাভারতের মূল্য মর্যাদা থাকত না। চৌদ্দ বছরের বনবাস দুঃখ একদিনেই কিংবা সীতাহরণকারী রাবণকে যদি মুহূর্তের মধ্যেই নিহত করা যেত তাহলে তো বাল্মিকীর রামায়ণ রচনার কোন প্রয়োজন পড়ে না। সেইভাবে এই জগতেরও কোন প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কোনদিন হবে না।

জীবাত্মা কোন জড়বস্তু নয়। নিছক যন্ত্রের মতোও নয়। সে নিজের মনের মতো করে চলবার স্বাধীনতা চাইবে। যে পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিল সে পাশ হল এবং যে সারা বছর ফাঁকি দিয়ে ফেল করল সেও পাশ হয়ে যাক—এই রকম নিয়ম জগতে কেউ চায় না। যদি কেউ মন্তব্য করে, পরীক্ষাটাই তুলে দিয়ে সবাইকেই পাশ করিয়ে দেওয়া হোক, তাহলে পরীক্ষা বলে কথাটির মূল্য কেউ দেবে না। পড়াশুনার কোন মর্যাদাও থাকবে না। এইভাবে শেষ পর্যন্ত এই জগৎসহ ভগবানেরও মূল্য মর্যাদা কেউ দেবে না। একথা বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

প্রশ্ন ১৪। সর্বলোকমহেশ্বর আনন্দময় পরমেশ্বর ভগবানের সৃষ্ট জগতে আনন্দ নেই কেন?

উত্তর ঃ জগৎ যেরূপ হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে সকলেই আনন্দে রয়েছে। আনন্দ যদি না থাকত তবে জীব এতকাল কিভাবে থাকতে পারে। জীব যদি জানত যে এই জগৎ দুঃখে ভরা তখন তারা অবশ্যই বৈকুণ্ঠ জগতে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাত। কিন্তু তারা এই জগতে সুখে আনন্দে আছে বলেই বৈকুণ্ঠ জগতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে হরিভজন করেই না। আমরা জানি বিষ্ঠা কত নোংরা বিষয়। তাতে আমাদের বিরক্তি ভাব হলেও বিষ্ঠাভোজী পোকাগুলি কিছুতেই বিষ্ঠা ছেড়ে চলে যেতে চাইবে না। কারণ বিষ্ঠা খেয়ে সে আনন্দ পাচ্ছে। লাইটের সামনে হাজার হাজার পোকা লাফালাফি করছে।

তাদের ধরে এনে দূরে নিক্ষেপ করলে আবার লাইটের কাছে ধেয়ে আসে। লাইটের কাঁচে বারে বারে ঠোক্কর খেয়ে মরে যাবে তবুও লাইট ছেড়ে যেতে চায় না। কারণ লাইটেই সে আনন্দ পাচ্ছে। আমাদের জড় দেহ কতই ব্যাধিগ্রস্ত হচ্ছে, বহু অসুবিধা হচ্ছে, তবুও দেহ ছাড়তে বা মরতে কেউ চাইছি না। কারণ এই দেহে থেকেই আমরা আনন্দ পেতে চাই। কত জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। তবুও সেই সব অসুবিধাগুলি আমরা চিন্তা করি না। আমরা যেরূপ আনন্দ চাই তা-ই ভগবান দিচ্ছেন। উড়বার আনন্দ পেতে চাইলে হয়তো উড়োজাহাজে চড়ার সৌভাগ্য না হলেও পরবর্তী জন্মে মশা হওয়ার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী হয়ে আনন্দ পেতে চাইলে হয়তো এই জন্মে সুযোগ না হলে ছারপোকা শরীর ধারণ করে প্রধানমন্ত্রীর গদির ভেতরে জীবন যাপন করবার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। বড় বড় মাছ খাওয়ার আনন্দ পেতে চাইলে বাজ, গোসাপ, তিমি হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই। অতএব এই জগৎ এক প্রকার আনন্দ ভোগের জগৎ বটে।

ভগবদ্‌সেবা-উন্মুখ মানসিকতা থাকলে বৈকুণ্ঠ জগতের আনন্দ পাওয়া যাবে। ভগবদ্‌সেবা-বিমুখ মানসিকতা থাকলে জড় জগতের আনন্দ পাওয়া যাবে। ভগবদ্‌ বিমুখতাই ভগবানের নির্ধারিত এই দুঃখময় জগতে আমাদের পতিত হওয়ার কারণ বলে শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে। এখানে মায়াসুখ-আনন্দে সবাই রয়েছে। গাধা যতই গর্দভীর লাথি খেয়ে মুখ ফোলাক না কেন তবুও সে গর্দভী-সঙ্গের আনন্দ পেতে চায়। চিন্ময় আনন্দ এবং জড় আনন্দ দুটোই এই মনুষ্য জন্মে লাভ করা যায়। যেটাই আমরা চাই। প্রকৃতপক্ষে এই জগৎ দুঃখময়। দুঃখ দিয়ে তৈরি। দুঃখময় হল কেন, সুখময় করে জগৎটা নির্মিত হল না কেন, এই রকম প্রশ্ন করাই অমূলক। ভগবান বলেছেন জগৎটাই দুঃখময় করেই গঠন করা হয়েছে। সুদুর্লভ মনুষ্য-শরীর লাভ করে জীব এই দুঃখময় ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে পরমার্থ সাধন করবে, হরিভজন করবে। এইভাবে জীবন যাপন করতে করতে একদিন দেহত্যাগ করে আনন্দময় জগতে উন্নীত হতে পারবে। তাই এই জগৎ আসলে পরমার্থ সাধন ক্ষেত্র। এই জীবনটি চিরমুক্তির পরপারে যাওয়ার পরম সুযোগ। দুঃখ থেকেই শিক্ষা হয়।

প্রশ্ন ১৫। আমরা বহু আলোচনা করেও একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। প্রশ্নটি হল, বীজ না হলে গাছ হয় না, কিংবা গাছ না হলে বীজ হয় না। এখন গাছ আগে, না বীজ আগে?

উত্তর ঃ কোনও জিনিস সৃষ্টি হল, তারপর বৃদ্ধি পেল, তারপর পরিপূর্ণ হল—এরকমটি চিন্ময় জগৎ বৈকুণ্ঠ জগতে নয়। চিন্ময় জগতে সবকিছু পরিপূর্ণ। বৈকুণ্ঠে একটি গাছকে বীজের মধ্য দিয়ে আসতে হবে তার পর বড় হবে এমনটি নয়। চিন্ময় জগতে কল্পবৃক্ষ সম্পূর্ণ বৃক্ষই বিরাজ করে। সেখানে গাছই আগে। আর এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও ধ্বংস রয়েছে। বীজ থেকে গাছ অংকুরিত হয়, বড় হতে থাকে, তারপর একদিন সেই গাছও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই জড় জগতে বীজ আগে।

প্রশ্ন ১৬। ভগবানের সৃষ্টির জীবাত্মা কোনও সংখ্যা আছে না কি? যদি থাকে তবে কত কোটি অবশ্যই জানাবেন।

উত্তর ঃ এক-একটি জীবাত্মা ভগবানের অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চেতন সত্তা বা চিৎকণা। কত কোটি চিৎকণা আছে—এরকম প্রশ্নটাই অবান্তর। ভগবান চিন্ময়। তিনি অসীম ও অনন্ত। তাঁর চিন্ময় অঙ্গ থেকে প্রকাশিত চিৎকণাও অনন্ত অগণিত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটি। জড় ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটি, চিৎ বৈকুণ্ঠও অনন্ত কোটি। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি কোটি জীবাত্মা এবং অনন্ত বৈকুণ্ঠে অনন্ত কোটি কোটি জীবাত্মা বিরাজ করছে। সূর্য থেকে উৎপন্ন সূর্যরশ্মিকণা যেমন গণনার বিষয় নয়, তেমনই ভগবান থেকে সৃষ্ট জীবাত্মার সংখ্যাও অগণনীয়।

প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে জীবাত্মাদের জন্যে দেহ গঠন করেছেন। যে জড় দেহ গ্রহণ বা আশ্রয় করে এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে জীবাত্মা জীবন যাপন করবে, সেই দেহ হচ্ছে চুরাশি লক্ষ রকমের।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষণম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষা॥

অর্থাৎ, ৯ লক্ষ রকমের জলজপ্রাণী, ২০ লক্ষ রকমের বৃক্ষলতাদি, কৃমি-কীট-সরীসৃপ ইত্যাদি ১১ লক্ষ রকমের, পক্ষী ১০ লক্ষ রকমের, পশু ৩০ লক্ষ রকমের এবং মানুষ ৪ লক্ষ রকমের। এইভাবে মোট ৮৪ লক্ষ রকমের জীবযোনি রয়েছে।

প্রশ্ন ১৭। কৃষ্ণকে পুরুষ বলা হয় কেন?

উত্তর ঃ কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি একজন ব্যক্তি। তিনি নিরাকার নন। পুরুষ বলতে বোঝায় যিনি সমস্ত আয়োজনের ভোক্তা। কৃষ্ণই সমগ্র বিশ্বের সমস্ত আয়োজনের মূল ভোক্তা। তিনি তাঁর আনন্দ বর্ধনের জন্যই অনন্ত কোটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র জীবজগৎ তাঁর সেবক। তিনিই একমাত্র সেব্য। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস। সেই কথা ভুলে জীব যখন নিজে পুরুষ বা ভোক্তা হওয়ার বাসনা করে তখনই দুঃখময় জড়ব্রহ্মাণ্ডে পতিত হয়। কিন্তু আসলে জীব হচ্ছে সবসময় প্রকৃতি। আর পুরুষ হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণ।

প্রশ্ন ১৮। গোলোক ধাম কোথায়?

উত্তর ঃ বৈকুণ্ঠ-জগতের সমস্ত গ্রহলোকের উপরে।

প্রশ্ন ১৯। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দেখলাম ১+১=১, ১-১=১। এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান চিরকালই পূর্ণ। কখনই শূন্য বা অপূর্ণ নন। কোনও পূর্ণ অংশ থেকে কিছু অংশ বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশটি পরিমাণে হ্রাস পায়, আবার—কিছু অংশ যুক্ত করলে পূর্বের তুলনায় অংশটি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এটি হচ্ছে জড় জগতের হিসাব। অর্থাৎ জড় জগতের হিসাবটি হল, ১+১=২, ১-১=০

কিন্তু চিন্ময় জগতে এরকম নয়। ভগবান স্বয়ং সম্পূর্ণ। তিনি এমন ব্যক্তি নন যে, তাঁর বুদ্ধি ছিল না, তাই শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে বুদ্ধি হয়েছে, আবার নানা সমস্যায় পড়ে তাঁর বুদ্ধি কমে গেছে। তাঁর শক্তি বৃদ্ধি বা হ্রাস হচ্ছে। না, এরকম ভগবানের ক্ষেত্রে হয় না বলেই তাঁকে পূর্ণপুরুষ বলা হয়। তাঁর কখনও চ্যুতি হয় না, হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, তাই তাঁকে অচ্যুত বলা হয়। চিন্ময় জগতে কোনও ঘাটতি বা অভাবের প্রাদুর্ভাব নেই। সেখানে যা বিদ্যমান তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু যোগ করা যদি কখনও সম্ভব হয় তো তার বৃদ্ধি সমৃদ্ধি-ঘটল—এমন নয়। বা সেখান থেকে কিছু বাদ দিলে ঘাটতি হল এমন নয়। চিন্ময় সর্বদা পরমপূর্ণই থাকে। এটি চিন্ময় জগতের হিসাব। অর্থাৎ চিন্ময় জগতের হিসাবটি হল, ১+১=১, ১-১=১। কখনই হ্রাস-বৃদ্ধি বা শূন্য হয় না। ঈশোপনিষদে প্রথমেই তাই পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

অর্থাৎ, "পরমেশ্বর ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ। তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ বলে এই দৃশ্যমান জগতের মতো তাঁর থেকে উদ্ভূত সবকিছুই সর্বতোভাবে পূর্ণ। যা কিছু পরমপূর্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তা সবই পূর্ণ। কিন্তু যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই তাঁর থেকে অসংখ্য অখণ্ড ও পূর্ণ সত্তা বিনির্গত হলেও তিনি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।"

প্রশ্ন ২০। শুনেছি অসংখ্য বৈকুণ্ঠ গ্রহলোক রয়েছে। সেই গ্রহলোকগুলির নাম কি?

উত্তর ঃ পুরুষোত্তমলোক, অচ্যুতলোক, ত্রিবিক্রমলোক, হৃষিকেশলোক, কেশবলোক, অনিরুদ্ধলোক, মাধবলোক, প্রদ্যুম্নলোক, সঙ্কর্ষণলোক, শ্রীধরলোক, বাসুদেবলোক, অযোধ্যালোক, দ্বারকালোক ইত্যাদি অসংখ্য চিন্ময় গ্রহলোক রয়েছে।

প্রশ্ন ২১। এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সৃষ্টি করে থাকেন তবে পৃথিবীর মানুষের ভাষা বিভিন্ন, চেহারা বিভিন্ন, আচার-আচরণ বিভিন্ন, বর্ণ বিভিন্ন, ধর্ম বিভিন্ন। —এরকম কেন?

উত্তর ঃ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সব পৃথিবীতেই পরমেশ্বর ভগবান স্বেচ্ছায় বৈচিত্র্য রেখেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি একই রকম একঘেয়েমি করতে চাননি। বিচিত্র সুখ বিচিত্র দুঃখ বিচিত্র জাতের লোক নিয়েই বৈচিত্র্যময় জগৎ।

প্রশ্ন ২২। কৃষ্ণ তো ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারেন এবং জগৎকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারেন। কিন্তু তা করেন না কেন?

উত্তর ঃ কেউ অসৎপথে থাকুক সেটি তো কৃষ্ণ ইচ্ছা করেন না, তবে স্বতন্ত্র জীব নিজেরা কৃষ্ণের মতো উপভোক্তা হতে চায় বলেই এরকম জগতে আসতে হয়েছে।

সুন্দর জগৎ বলতে ভগবানের পরমধাম, সেখানে ফিরে যেতেই তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ করছেন। কিন্তু আমরা যদি সুন্দর জীবনে সুন্দর জগতে যেতে না চাই এই জড় জগতেই থাকতে চাই—সেই ইচ্ছার উপরও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলপ্রয়োগ করতে ইচ্ছা করেন না। এটিই রহস্য। যখন জানব এই জগৎ ভালো নয়, এই জীবনের পরিস্থিতি মোটেই ভালো নয় তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনতে চাইব, তখন সুন্দর বৈকুণ্ঠ গোলোক ধামে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা করব। এই জড় জগৎ জেলখানার তুল্য। তাই এই দুঃখময় জগৎটাকে এই জেলখানাটিকে শ্রীকৃষ্ণ কেন সুন্দর করলেন না, সেটা কোন প্রশ্ন নয়। এর বাইরে বৈকুণ্ঠ জগৎ তো নিত্য শাশ্বত সুন্দর রয়েছেই।

প্রশ্ন ২৩। ভগবানের জন্ম নেই। এ কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। তা হলে পাঁচ হাজার বছর আগে দেবকী বসুদেবের পুত্র রূপে ভগবান কৃষ্ণের জন্ম হল কি করে?

উত্তর ঃ ভগবানের জন্ম নেই বলতে তিনি জন্মলীলা প্রকাশ করতেও পারেন না—এরকম কোনও কথা নয়। তিনি ইচ্ছা করলে জন্মলীলা প্রকাশ করতে পারেন, তবে সেই জন্মটি আমাদের মতো জীবেদের জন্মের মতো নয়। ভগবানের জন্মলীলা দিব্য বা অপ্রাকৃত। কৃষ্ণ বলেছেন, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্* (গীতা), আমার জন্ম ও ক্রিয়াকলাপ অপ্রাকৃত অর্থাৎ এই জড়জগতের কারও মতো নয়।

প্রশ্ন ২৪। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে কেন সবই মঙ্গলময় হল না?

উত্তর ঃ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য বিদ্যমান; কেবল আলো থাকলে অন্ধকারের মর্যাদা থাকত না। কথায় বলে—'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা লোকে বোঝে না।' দাঁত পড়ে গেলে তখন দাঁতের গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। আপনি আলোতে থাকুন কিংবা অন্ধকারে থাকুন, তাতে সৃষ্টিকর্তার কিছু যায় আসে না। আপনি দুঃখে থাকুন কিংবা সুখে থাকুন, তাতে সৃষ্টিকর্তার কোন লাভ-ক্ষতি নেই। আপনি ভক্ত হোন কিংবা অভক্ত হোন, তাতে সৃষ্টিকর্তার কোনও ঝামেলা নেই। অর্থাৎ আপনি এই দুঃখময় জগতে থাকার বাসনা করে যন্ত্রণা ভোগ করতেও পারেন, আবার আনন্দময় বৈকুণ্ঠে যাওয়ার বাসনা করে নিত্য আনন্দলাভ করতেও পারেন। তাতে সব রকমের লাভ আপনার নিজের, সৃষ্টিকর্তার লাভ বা ক্ষতি বলে কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে এই বৈচিত্র্যই মঙ্গলময়। আপনার যেমন ভাব যেমন কর্ম তেমন লাভ তেমন ফল পাবেন। এই বৈচিত্র্য না থাকলে 'মঙ্গল'-এর গুরুত্ব বা মর্যাদা কিভাবে থাকত?

ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠ—সেখানে কোনও কুণ্ঠা নেই, অমঙ্গল নেই। কিন্তু এই জড় জগৎ কুণ্ঠাযুক্ত, দুঃখময়। তাই এখানে অমঙ্গল থাকবে। রাজা মঙ্গলময় হতে পারেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট জেলখানাগুলি কয়েদীদের কাছে মঙ্গলময় বলে বোধ হয় না। কারণ কয়েদীরা সেখানে দুঃখ ও শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু তাই দেশে জেলখানা আছে বলে রাজা মঙ্গলময় নয়—এরূপ কথা বলা যায় না।

প্রশ্ন ২৫। মানবজাতির প্রথম মাতাপিতা কে?

উত্তর ঃ পিতা—মহর্ষি মনু, মাতা—শতরূপাদেবী।

প্রশ্ন ২৬। ব্রহ্মাণ্ড কয়টি?

উত্তর ঃ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড। 'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন।' শাস্ত্রে বর্ণনা রয়েছে, জানালা দিয়ে বাতাসের মাধ্যমে অসংখ্য ধূলিকণা ভেতরে প্রবেশ করে, আবার ঝাড়ু দিলে সেই ধূলিকণাগুলি বেরিয়ে যায়। সেই ধূলিকণাগুলি গণনার অতীত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ মহাবিষ্ণুর শ্বাস ত্যাগের সময় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড নির্গত হয়, পুনরায় শ্বাসগ্রহণকালে সেগুলি তাঁর দেহ-অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ডগুলিও গণনার অতীত।

প্রশ্ন ২৭। সকলে বলে ভগবান আছেন। ভগবান থাকলে দেশে এত দুঃখ কষ্ট কেন?

উত্তর ঃ আপনার দেশে দুঃখকষ্ট থাকা না থাকার উপর ভগবানের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। সৃষ্টি আছে মানেই স্রষ্টা আছেন। ভগবান-বিমুখ হওয়ার ফলেই দুঃখকষ্ট ভোগ করার উদ্দেশ্যে এই দুঃখকষ্টের জগতে জীব এসেছে।

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

ভগবানের নির্দেশ হচ্ছে, এই জগৎটা দুঃখকষ্ট দিয়েই তৈরি। তাই কৃষ্ণভজন মাধ্যমে পরমানন্দময় ধামে উন্নীত না হওয়া অবধি দুঃখকষ্টই পেতে হবে।

দুঃখ এই জগতে দেওয়া হয়েছে যাতে আমরা বুঝতে পারি এই জগৎটা সুখের স্থান নয়। যাতে এখান থেকে শীঘ্র আনন্দময় বৈকুণ্ঠ জগতে যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত হতে পারি।

প্রশ্ন ২৮। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ঈশ্বর আছে কি? প্রমাণ করুন।

উত্তর ঃ বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান থাকলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অতিসহজেই বোঝা যায়। সেই বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই বলে বৈজ্ঞানিক। কিন্তু জড়বুদ্ধির বাইরে যারা এগোতে পারেনি তারা এই জড় জগতে বৈজ্ঞানিক বলে পরিগণিত হলেও তারা প্রকৃত বিজ্ঞানী নয়। 'ঈশ্বর আছেন' কথাটি অতি সহজেই প্রমাণিত করেছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরাও। বৈজ্ঞানিক নিউটন বলেছেন, আমরা কোনও কিছু তৈরি করতে গেলে অনেক বুদ্ধি খাটাতে হয়। তারপর কোনও জিনিস তৈরি হয়। ঘড়ির কাঁটা বা অন্যকিছুকে দেখলে মনে হয় সেটি আপনা আপনি ঘুরছে, কিন্তু তার পেছনে একজনের বুদ্ধি কাজ করেছে। তেমনই মহাবিশ্বের অসংখ্যকোটি বিশাল বিশাল গ্রহনক্ষত্র আপন আপন কক্ষপথে নিয়মিত ঘুরছে। সেই ভারী ভারী গ্রহগুলি আবার মহাকাশে ভেসে আছে। নিশ্চয়ই অনেক উন্নত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন কর্তার অভিপ্রায় অনুসারে সেগুলি কার্যকরী হচ্ছে। এভাবে নিউটন এক পরম নিয়ন্তা বর্তমান বলে প্রমাণ করলেন।

২

আয়ুষ্কালের হিসাব

প্রশ্ন ১। অল্প বয়সে সাধু হওয়া কি ভাল?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৬/১) উল্লেখ আছে—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

পরম ভগবদ্ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, "প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি মানবজন্ম লাভ করে এই জাগতিক অনিত্য সুখের প্রয়াস বাদ দিয়ে কুমার বয়সেই ভাগবত-ধর্মের অনুষ্ঠান করবে। কারণ, সংসারে মানবজন্ম—অতি দুর্লভ, তা আবার ক্ষণিক। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হলেও ভগবদ্ভক্তি সাধনায় এই জীবন পরম অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।"

এর পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষ তার দুর্লভ জীবনটা কিভাবে নষ্ট করছে। মুগ্ধ বা অজ্ঞান অবস্থায় শৈশবের দশটি বছর কেটে যায়, কৌমার অবস্থায় দশটি বছর খেলাধূলায় কেটে যায়। জড় বিদ্যায় কৈশোর অতিবাহিত হয়। তারপর দুঃখজনক কাম ও মোহে সংসার-সুখ ভোগে আসক্ত থেকে কর্তব্য-সন্ধানশূন্য অবস্থায় আরও দশ বছর পেরিয়ে যায়। সন্তান ও স্ত্রীর প্রতি আসক্ত চিত্ত ব্যক্তি দৃঢ় স্নেহপাশে বদ্ধ থাকে, সেই অজিতেন্দ্রিয় ভোগী ব্যক্তিরা নিজেদের কোনও সদ্‌গতির চিন্তা করতে পারে না।

তারপর তারা নিছক ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশ্যে প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন করেও টাকাপয়সা উপার্জনের জন্য যত্ন করে। যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থায় এইভাবে আয়ুক্ষয় হয়। এই সব সংসার-ভোগাসক্ত ব্যক্তিরা সমস্ত দেশে সমস্ত কালে আধিআত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—সমস্ত দুঃখের মধ্যে ক্লিষ্ট হতে থাকে। নানা দুঃখে জর্জরিত হয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তখন নানা রকমের পাপকাজে তারা অগ্রসর হয়। তখন তারা জেনে শুনেও পাপকর্মে লিপ্ত হয়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তারা গতানুগতিক পদ্ধতিতে জীবন ক্ষয় করতে থাকে।

শ্রীপ্রহ্লাদ বলছেন, "এটা আমার ওটা আমার' এরূপ ভাব পোষণ করে পণ্ডিত ব্যক্তিও অতি আসক্ত হয়ে কুটুম্ব-পরিবার পালন করতে করতে আত্মবিষয়ক শুভ পরামর্শ নিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু অতি মূর্খের মতো অজ্ঞানতাই লাভ করে এবং কোনও দেশে কোনও কালে জ্ঞানহীন ভগবৎ-বিমুখ ব্যক্তি নিজেকে ভবচক্র থেকে মুক্ত করতে পারে না। অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তর ধরে নানা দুঃখপূর্ণ জড়জীবন গ্রহণ করতে থাকে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে, "কামলম্পট ব্যক্তিরা স্ত্রীদের খেলার হরিণের মতো হয়ে পড়ে। মূর্খতা বশত পুত্রপৌত্র ইত্যাদির প্রতি আসক্তিও তারা ছাড়তে পারে না।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৬/১৭)

সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানেও বোঝা যায়, মানুষ তার জীবনের মোট আয়ুর অর্ধাংশ ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। দিন হিসাবে কারও বয়স যদি সত্তর বছর হয়, তবে পঁয়ত্রিশ বছর প্রায়

ঘুমিয়েই সে কাটিয়েছে বলা যায় এবং বাদবাকী তথাকথিত জাগ্রত অবস্থায় সে নানা প্রজল্প, নানা রাজনীতি, কূটনীতি, অনর্থক শয়তানী চিন্তায় কাটিয়ে দেয়।

মৃত্যুর দরজায় উপনীত হওয়াকে বার্ধক্য বলে। সেই হিসেবে, একটি শিশুও বৃদ্ধ। কেননা যে কোন মুহূর্তেই আমাদের মৃত্যু হতে পারে। আমরা সবাই মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। ভবিষ্যতের বিশ্বাস নেই। আমারও অকালমৃত্যু হতে পারে। বার্ধক্য সবার ভাগ্যে জোটে না।

অনেকে মনে করেন, 'এখন যা ইচ্ছা তাই করা যাক, পরে যখন চুল পাকবে, সব কিছু সমস্যা-জটিল হয়ে পড়বে, মেজাজ খিটখিটে হবে, দাঁত পড়ে যাবে, চোখে ছানি পড়বে, কান কালা হবে, হাত পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবে, যখন বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ করব এবং কফ পিত্ত বায়ুতে এই দেহপিণ্ডটা ভর্তি হবে, সকলের অবজ্ঞা ও বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়াব, তখন খুব করে নেচে গেয়ে ভগবানের নামকীর্তন-সাধন ভজন করব।' সেই সব কামপাগলা ব্যক্তি আত্মঘাতী আত্মপ্রবঞ্চক ছাড়া আর কিছু নয়।

তাই হরিভজন একমাত্র মানবজীবনের জন্যই এবং তাই ছোটবেলা থেকেই বৈদিক পন্থায় জীবন গঠন করতে হয়, তারপর ব্রহ্মচারী কিংবা গৃহস্থ কিংবা সন্ন্যাসী যা-ই হন না কেন, সর্বদা কৃষ্ণভক্তির অনুকূলে থাকাই মূল কথা।

প্রশ্ন ২। কি করে বুঝব সাধন ভজন করলে মৃত্যুর পর ভগবদ্ধামে যাওয়া যায়?

উত্তর ঃ একজন ছাত্র নিয়মমতো যদি পড়াশুনা করে চলে, তবে যখন পরীক্ষার দিন উপস্থিত হয়, তখন সহজে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে। এই ব্যাপারটি যেমন নিশ্চিত, তেমনি সারা জীবন নিয়ম নিষ্ঠার সহিত যিনি ভগবদ্‌ভজনা করেন, সেই ভক্ত অবশ্যই জড়জগতরূপ পরীক্ষা ক্ষেত্রে সহজে উত্তীর্ণ হয়ে নিত্য ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত হতে পারবেন। এতে সন্দেহের কী আছে?

পরম নিয়ন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্'* অর্থাৎ 'যখন এই অনিত্য দুঃখময় মর্ত্যলোকে মনুষ্যদেহ ধারণ করেছ, তখন আমাকেই ভজনা কর।' (গীতা ৯/৩৩) এবং যখন কেউ কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত থাকে—কৃষ্ণসেবায় সর্বদা যুক্ত থাকে, তার গতি কি হয়? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—*'মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ'* ॥ অর্থাৎ 'সম্পূর্ণরূপে আমাকে আশ্রয় করে তুমি অবশ্যই আমাকে লাভ করবে।' (গীতা ৯/৩৪)

প্রশ্ন ৩। জগতে সবচেয়ে আশ্চর্যকর বিষয় কি?

উত্তর ঃ ধর্মপুত্র শ্রীভদ্রশ্রবার উক্তি দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতং
ঘ্নন্তং জনোঽয়ং হি মিষন্ ন পশ্যতি।
ধ্যায়ন্নসদ্‌যর্হি বিকর্ম সেবিতুং
নির্হৃত্য পুত্রং পিতরং জিজীবিষতি ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৫/১৮/৩)

"আহা, কী আশ্চর্য! এই সব মানুষ আসন্ন প্রাণ-অপহারক ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে দেখেও দেখছে না! মৃত পিতা বা মৃত পুত্রকে দাহ করে এসে তারা মৃতের ধন-সম্পত্তি দ্বারা অতি তুচ্ছ বিষয়-সুখ ভোগ করবার আশায় জীবন ধারণ করে থাকতে ইচ্ছা করছে!"

মানুষ ভাবছে সবাই মরে গেলেও আমি মরব না। এই বিষম মূর্খামির জন্যই মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয় না। ভগবানের পাদপদ্মে তার মতি হয় না, সে কেবল দুঃখময় জগতে সুখভোগের অন্ধ আশায় জীবন কাটিয়েই যায়। এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যকর। যুধিষ্ঠির মহারাজও বকরূপী ধর্মের অনুরূপ একটি প্রশ্নে এই রকমই উত্তর দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৪। কলিযুগের বর্তমান বয়স কত, আর কত বছর থাকবে?

উত্তর ঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্বকালের মধ্যে কলিযুগ শুরু হয়েছে। বর্তমানে পাঁচ হাজার বছর গত হয়েছে। সুতরাং কলিযুগের আরও ৪ লক্ষ ২৭ হাজার বছর বাকি রয়েছে।

প্রশ্ন ৫। জড়জগতের মানুষ সাধারণতঃ কিসে আগ্রহী? তারা কি ভক্তিতে বেশী আগ্রহী বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর ঃ অধিকাংশ মানুষই ধনসম্পদ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আগ্রহী। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যথাসম্ভব ধন উপার্জন করা এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য তা ব্যয় করা। অধিকাংশ মানুষ ভক্তিতে অর্থাৎ ভগবৎ সেবায় আগ্রহী নয়, বিষয় ভোগ বাসনায় আগ্রহী। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥

"তারা রাত্রে বেশি ঘুমিয়ে কিংবা মৈথুনাদি কর্মে তাদের সময় অপচয় করে, আর দিনের বেলায় অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় তারা ব্যস্ত থাকে। তারা উপার্জিত অর্থ পরিবার-পোষণের জন্য নিয়োগ করে।" (শ্রীমদ্ভাগবত ২/১/৩) এভাবে দিন-রাত ক্রমশ শেষ হয়ে যায়। জীবনের আয়ু শেষ হয়ে যায়। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, এই প্রকার ব্যক্তিরা কখনও জীবনের মাহাত্ম্য বুঝতেও চেষ্টা করে না। ভগবান কে, জীবাত্মা কি, ভগবানের সঙ্গে কি সম্পর্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে তারা কখনও ভেবে দেখে না।

প্রশ্ন ৬। আমরা কৃষ্ণকথা আলোচনা করতে ভালবাসি। কিন্তু আমাদের অঞ্চলের মানুষেরা খেলোয়াড়, চিত্রতারকা, অভিনেতা ইত্যাদি লোকের সম্বন্ধে বেশী আগ্রহী। আমরা যখন তাদের কৃষ্ণকথা বলতে ইচ্ছা করি, তখন তারা 'সময় নেই' বলেই সরে পড়তে চায়। কি কর্তব্য?

উত্তর ঃ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছিলেন, কেউ যদি কৃষ্ণকথা না শুনতে চায় তবুও কৃষ্ণকথা কীর্তন কর, চার দেওয়াল শুনবে। তাতেও কাজ হবে। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণচিন্তা বিফল হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রবক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন, যারা কৃষ্ণকথা শুনবে না? যারা কুকুর, শূকর, উট ও গর্দভের মতো। তারা কি কথা শুনবে? তারা শুনবে, যে সব মানুষেরা কুকুর, শূকর, উট ও গর্দভের মতো তাদেরই কথা।

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুত পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ম পথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥

"শ্ব, বিট্, বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দভের মতো মানুষেরা তাদের স্তুতি বা প্রশংসা করতে থাকে, যারা সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলাকথা কখনও শ্রবণ করে না।" (শ্রীমদ্ভাগবত ২/৩/১৯)

ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ মেনে চলবেন। মহাপ্রভু বলেছেন—'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ'। তারপর ঐকান্তিক ভক্তকে লক্ষ্য করে সমাজের মানুষেরা অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণে এগিয়ে আসবেন এবং মহাপ্রভুর কৃপাশীর্বাদ লাভ করবেন।

ক্ষেত্র বিশেষে কতগুলো প্রয়োগপদ্ধতি রয়েছে। যেমন, বিদেশে শ্রীল প্রভুপাদের এক শিষ্য বাজার থেকে ভিক্ষে করে কিংবা বাজার শেষে কিছু কিছু শাক-সবজী কুড়িয়ে এনে সুন্দর করে ধুয়ে রান্না করতেন। তারপর কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করতেন। সেই কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করতেন। যারাই প্রসাদ পেতে আসত, তারাই ভক্ত হয়ে যেত। এরপর তারা কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণে নিযুক্ত হয়ে যেত।

প্রশ্ন ৭। অনেকে বলেন যে, এখন কৃষ্ণভজন করার সময় হয়নি। তবে কখন আমাদের কৃষ্ণভজন করার সময়?

উত্তর ঃ কৃষ্ণভজন করতে সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবে না। প্রহ্লাদ ধ্রুব প্রমুখ ভক্তগণ শিশুকাল থেকে কৃষ্ণভজন করেছেন। যারা অতীব গণ্ডমূর্খ, তারাই চিন্তা করে—যখন রক্তের তেজ শুকিয়ে যাবে, মাথার চুলগুলো পেকে ঝরতে থাকবে, চোখে ছানি পড়তে থাকবে, মলমূত্র কফপিত্ত বায়ুতে শরীরের নাড়িভুঁড়ি বোঝাই হয়ে যাবে এবং রোগব্যাধিতে ভুগতে ভুগতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ করতে হবে তখনই খুব করে নেচে গেয়ে হরিভজনের প্রয়াস নেওয়া যাবে!

প্রায়শই দেখা যায় বাস্তবিক সেই সব মূর্খরা পরিবারের সবার কাছে বিড়ম্বনা ও ঘৃণার পাত্র হয় এবং সবাই তার মৃত্যুকামনা করে যাতে সে শীঘ্রই এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে নরকলোকে গিয়ে হাজির হয়।

মূর্খেরা সত্যিই হরিভজনের সময় পায় না। এই সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বলেছিলেন, "শিশুরা খেলায় মগ্ন, যুবকেরা যুবতীদের সাথে তথাকথিত প্রেমালাপে মগ্ন এবং বৃদ্ধরা ব্যর্থ জীবনসংগ্রামে নিজেদের অবস্থাটা একটু গুছিয়ে নেওয়ার চিন্তায় মগ্ন। কিন্তু হায়! জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানতে, পরম তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে কেউই প্রস্তুত নয়।" (*আঃ লাঃ পঃ, ৪৭ পৃঃ*)

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ রয়েছে—

পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্ধং চাজিতাত্মনঃ।
নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেহন্ধং প্রাপিতস্তমঃ ॥

"মানুষের আয়ু বড় জোর একশ বছর। কিন্তু যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, তার সেই একশ বছরের অর্ধেক সময় অনর্থক অতিবাহিত হয়, কারণ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রাত্রিবেলায় সে বারো ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকে। অতএব এই প্রকার ব্যক্তির আয়ুষ্কাল পঞ্চাশ বছর।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৬/৬) *আধ জনম হাম নিদে গোঙায়লুঁ* (*বিদ্যাপতি*)। তারপর বাকি আয়ুষ্কালের মধ্যে হিসাব করলে দেখা যায়—

মুগ্ধস্য বাল্যে কৈশোরে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ ।
জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ ॥

"বাল্যকালে মোহগ্রস্ত অবস্থায় দশ বছর অতিবাহিত হয়। তেমনই, কৈশোরে খেলাধূলায় মগ্ন থেকে আরও দশ বছর অতিবাহিত হয়। এইভাবে কুড়ি বছর বিফলে যায়। তেমনই, বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্ত হয়ে জড়জাগতিক কাজকর্মে অক্ষম হওয়ার ফলে আরও কুড়ি বছর বৃথা অতিবাহিত হয়।" (ভাঃ ৭/৬/৭)

জীবনের বাদবাকি বছরগুলিও কিভাবে বৃথা যায় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা ।
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতি হি ॥

"অসংযত মন ও দুর্বার ইন্দ্রিয় নিয়ে সে তার অতৃপ্ত কামনা এবং প্রবল মোহের ফলে, পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে উম্মত্ত ব্যক্তির বাকি জীবনও বিফলে যায়, কারণ সেই কয়টি বছরে সে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে পারে না।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৬/৮)

এইভাবে সুদুর্লভ মনুষ্য জন্মে নারকী ব্যক্তি তার পূর্ণ আয়ুর সম্পূর্ণ অংশই বৃথা অপচয় ও অপব্যবহার করে এবং মৃত্যুর পর তাকে জন্মান্তর চক্রে নিম্নতর পশুপাখি কীটপতঙ্গের শরীর গ্রহণ করতে হবে।

অত্যধিক দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা গাধার মতো পরিশ্রম করতে, শূকরের মতো ভোগবিলাস করতে, কুকুরের মতো চেঁচামেচি করতে, বেড়ালের মতো চুপচাপ বসে থাকতে (মৌনব্রত) নানাভাবে সময় দিতে পটু; কিন্তু পরম নিয়ন্তার শরণাপন্ন হতে চায় না, কারণ পরমেশ্বরের প্রতি মন দিতে তাদের নাকি সময় নেই। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিপূর্ণ দুঃখময় সংসার চক্রে ঘুরতে তাদের সময় আছে, কিন্তু জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে যিনি চিরতরে আমাদের উদ্ধার করে তাঁর পরমানন্দময় ধামে নিয়ে যাবেন (তদ্ধাম পরমং মম) সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে সময় নেই। এই হল মূঢ়দের দুরবস্থা।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে* (গীতা ৭/১৫) "দুষ্কৃতকারী মূঢ়রা আমার শরণাপন্ন হয় না। *অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ* (গীতা ৯/১১) "মূঢ়ব্যক্তিরা আমাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে।" ভজন্তে *মাং বুধাঃ* (গীতা ১০/৮) বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই আমার ভজনা করে। *যজন্তি হি সুমেধসঃ* (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৫/৩২)। সুমেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ভজনরত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৬/১) নির্দেশিত হয়েছে—*কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ* "প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ বাল্যকাল থেকেই হরিভজন করবেন।" বৃদ্ধ বয়সে হরিভজন হয় না। *বার্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হত কেমনে ভজিব বল*—(ভক্তিবিনোদ)

তা ছাড়া সবচেয়ে নিষ্ঠুর সত্য কথাটি হল, যে কোনও মুহূর্তেই আমাদের মৃত্যু ঘটবে। অতএব সাধনভজনের সুযোগ কেউ আমাদের দেবে না। নিজেদেরই সর্বপ্রযত্নে কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত থাকতে হবে। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নেই। ভক্ত বরং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন এইভাবে—

কৃষ্ণ! তদীয়-পদপঙ্কজপঞ্জরান্ত-
মদ্যৈব বিশতু মে মানসরাজহংসঃ ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ ভজনং কুতস্তে ॥

"হে কৃষ্ণ! আজই আমার মন-রাজহংস তোমার পদপঙ্কজপঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে থাকুক্। প্রাণ-প্রয়াণকালে আমার কণ্ঠ কফ, বাত ও পিত্ত দ্বারা অবরুদ্ধ হবে। সুতরাং তখন আর ভজন কিভাবে সম্ভব হবে?" (মুকুন্দমালা ৩৩ শ্লোক)

প্রশ্ন ৮। 'হরিভজনের সময় নেই।' কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ ভক্তিশূন্য কাজকর্মে কিংবা অসার চিন্তাভাবনায় অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষদের সত্যিই ভগবদ্ ভজনের সময় নেই। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, অপকর্ম ইত্যাদিতে তারা আকৃষ্ট। হরিভক্তি তারা পছন্দ করে না। জন্ম-মৃত্যুর ঘূর্ণিপাকে বদ্ধ পাগলের মতো সংসার ভোগ করবার জন্য তাদের কালরূপী শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই অনেক সময় দেবেন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন ৯। গীতায় বলা হয়েছে, মৃত্যুর সময় যদি কেউ কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করতে পারে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। তা হলে সারা জীবন পাপকর্ম করেও যদি মরণকালে কৃষ্ণস্মরণ কেউ করে তারও উদ্ধার হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সেও পরমগতি প্রাপ্ত হবে। কারণ যিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হলেন, তার সমস্ত পাপ থেকে পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উদ্ধার করবেন বলে শ্রীঅর্জুনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অহং *ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥* (গীতা ১৮/৬৬) "আমি তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। এই বিষয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।"

কিন্তু বিপদটি হচ্ছে সেইখানে যে, পাপীদের কাছে মৃত্যু যখন উপস্থিত হয়, সাধারণত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করবার মানসিকতা তাদের একটুও থাকে না। বিষয় ভোগ চিন্তায় অভ্যস্ত ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মতি স্থির হয় না। তার হৃদয়ে ভোগবাসনা জমা থাকার জন্য জন্ম-জন্মান্তর ধরে পশুপাখি কীটপতঙ্গাদি হয়ে এই জড় জগতে তাকে বদ্ধ থাকতে হয়।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, "মৃত্যুর সময়ে আমাদের শেষ চিন্তাটি কি হবে তা নির্ভর করছে আমাদের জীবদ্দশায় আমরা কিভাবে কর্ম করছি তার উপর।" (আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা, ২০৭ পৃঃ) অর্থাৎ বুঝে নেওয়া উচিত এই যে, জীবদ্দশায় যদি আমরা ভগবদ্-কর্মে নিয়োজিত না হই, কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন না করি,

তা হলে অবশ্যম্ভাবী আসন্ন মৃত্যু কখনই আমাদের পরমধামে উন্নীত হতে কৃষ্ণস্মরণের সুযোগ দেবে না। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি জীবনের প্রথম থেকেই কৃষ্ণভজন করেন। *কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ।* শৈশব থেকেই হরিভজন করা উচিত। সব সময়ই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা উচিত এবং কখনই শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন ১০। কলিযুগের মানুষকে কেন এত কম আয়ু দেওয়া হল?

উত্তর : বেশি আয়ু নিয়ে থাকলে জগতে আরও বেশি পরিমাণে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাবে। কলির মানুষ ধর্মজ্ঞানহীন হয়ে যা ইচ্ছে তা-ই করতে শুরু করবে। রাক্ষস-পিশাচের মতো তারা মাছ-ব্যাঙ কাক-মোরগ গরু-শূকর কুকুর-ছাগল বানর-মানুষ ইত্যাদির রক্ত-মাংস হাড়-পিত্ত খাবে আর হিংস্র পশুর মতো আচরণ করবে। তারা রোজ রোজ ক্রমবর্ধমান মাদকাসক্ত হয়ে—চা-বিড়ি সিগারেট-গাঁজা তামাক-খৈনি দোক্তা-জর্দা মদ-আফিং হিরোইন-চরস এল. এস. ডি ইত্যাদি জঘন্য জিনিস সেবনপূর্বক যে কোনও অশালীন অসামাজিক আচরণ করতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। তারা হাটে-বাজারে ঘরে-রাস্তায় কলির আড্ডা বসিয়ে—তাস-জুয়া পাশা-দাবা লটারী ইত্যাদি খেলে সময় ও ধনসম্পদ নষ্ট করবে। সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তারা স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গ করবে। নাইট ক্লাব, বেশ্যাখানা, অশ্লীল ছায়াছবি ইত্যাদির সংগঠন করে তারা মজা-স্ফূর্তি করবে এবং তারা মনে করবে সেটাই জীবনের একমাত্র আনন্দ। কলির মানুষ অতি নগণ্য তুচ্ছ সম্পত্তি বা ধন কিংবা খাদ্যশস্য বা আসবাব পত্র ভোগ করার আশায় দিবারাত্র আত্মীয় পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে কলহ মারামারি হানাহানি করবে।

অতএব, সত্যযুগের ধর্মপরায়ণ মানুষের তুলনায় কলিযুগের পাপপরায়ণ মানুষের আয়ু শতগুণ হ্রাস হয়েছে—তা ভালই হয়েছে। অবশ্য কলির শেষ পর্যায়ে আয়ু আরও পাঁচ থেকে দশ গুণ অবধি হ্রাস পাবে।

প্রশ্ন ১১। জীবনে কোনদিনও কৃষ্ণনাম করা হল না, হরিকথায় যার মন নেই, কেবল মৃত্যুর সময় একখানি গীতা মড়ার বুকের উপর রেখে 'বল হরি হরিবোল' করলে কি লাভ হয়?

উত্তর : কথায় বলে, প্রাণ থাকতে মুখে জল দিতে হয়। প্রাণ উড়ে গেলে জল দিয়ে লাভ কি? প্রাণ চলে গেলে, শ্মশানে নিয়ে মড়ার মুখে আর জল নয়, আগুন দিতে হয়। ভাল করে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। সেই রকম, জীবন থাকতে হরিভজন করতে হয়। সেই সৌভাগ্য যদি না থাকে, তবে ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে যে গীতা শাস্ত্রে, সেই গীতার স্পর্শন ও দর্শন করে মৃত্যু বরণ করলেও কিছুটা মঙ্গল হয়। আর সেই সৌভাগ্যও যদি না থাকে, তবে মৃত্যু অবস্থায় দেহের উপর কেউ যদি গীতা রাখে, তবে 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' এই জ্ঞানে একটু মঙ্গল হতেই পারে।

প্রশ্ন ১২। গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকি, কৃষ্ণ স্মরণ কখন করব?

উত্তর : লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে, কিভাবে লোকে কর্মব্যস্ত জীবনে কৃষ্ণকে স্মরণ করে তার বর্ণনা দিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, 'গোপীরা এতই ভাগ্যবতী যে, তাঁরা সকাল বেলায় গাই দোওয়া, শস্য থেকে তুষ ঝাড়া, দধি মন্থন করা ইত্যাদি প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁকে চিন্তা করতেন। রান্না করা, বাসন মাজা, ঘর দুয়ার ধোওয়া, ঝাড়ু দেওয়া ইত্যাদি কাজকর্মের সময়েও গোপ-মায়েরা সব সময় কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট ছিলেন।' (কৃঃ ২/৯)

বিভিন্ন কাজে মগ্ন যে কোন মানুষেরই কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে গোপীদের আদর্শ ও পন্থাই অনুসরণীয়। ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, *সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ* —সর্বদা আমাকে স্মরণ করতে করতেই যুদ্ধ চালিয়ে যাও।

প্রতিক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট ব্যক্তি কখনও জড় কলুষতার দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যিনি প্রতিনিয়ত শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন, সমস্ত যোগীদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন ১৩। কেউ হয় তো মরবার কথা নয়, অথচ মরল—এই রকম দুর্ঘটনা ঘটে কি?

উত্তর : ব্যাসপিতা শ্রীপরাশর মুনি সীতাদেবীর পিতা রাজর্ষি জনকের কাছে উল্লেখ করেছিলেন, "কারও আয়ু যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়, কেউ বা হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" (মহাভারত শান্তিপর্ব ২৯ অধ্যায়) অর্থাৎ, কারও মৃত্যু ঘটনার মূল কারণসূত্রটি হল তার আয়ুর সমাপ্তি। আমাদের কাছে দৃশ্যমান কোনও একটি ঘটনাকে কারও মারা যাওয়ার আপাত কারণ রূপে প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু আসল কারণটি হল তার আয়ুর সমাপ্তি। কথা প্রসঙ্গে বলা যায়, আমাদের কর্মের মাধ্যমেও নির্ধারিত হয় আমাদের আয়ু। যেমন, শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৪/৪৬) বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি সাধুজনের প্রতি উৎপীড়ণ করে, অজান্তেই তার আয়ুষ্কালের মেয়াদ কমে যায়।" অর্থাৎ অকালমৃত্যু ঘটে। সাধুগুরুর আনুগত্যে সাধন ভজন বলে আয়ু বৃদ্ধিও হয়।

প্রশ্ন ১৪। কৃষ্ণ যখন আমাকে কৃপা করবেন তখন আমি কৃষ্ণনাম করতে পারব। কৃষ্ণ না কৃপা করলে কি করে কৃষ্ণনাম করব?

উত্তর : যুক্তিটি বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও অনেকটা এই রকম যে, আমি বিছানায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে থাকব। কৃষ্ণ যদি কৃপা করে ওষুধ পত্রাদি না খাইয়ে দিয়ে যান, তবে আমি কিছুই খাব না, পড়ে থাকব আর ছটপট করতে থাকব। ওষুধপাতি ছোঁব না। এইভাবে সব দোষ সব দায়িত্ব কৃষ্ণের উপর দিয়ে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। কথায় বলে অতি পণ্ডিতের গলায় দড়ি। অর্থাৎ গলায় আমি নিজে গিয়ে দড়ি দিয়ে ঝুলব আর কৃষ্ণ যদি রক্ষা করেন তবে আমি বাঁচতে পারব। অন্যথায় আমার বাঁচার দরকার নাই। এই সব যুক্তির জাল যারা বিস্তার করছেন তারা নিদারুণভাবে মূর্খামি করছেনই।

আরও অনেকে যুক্তি দিচ্ছেন যে, সারা জীবন আমি কত কষ্ট পাচ্ছি, আমাকে কতই না কর্ম করতে হয়। অতএব আমি হরিনাম করতে সময় পাব কোথায়। এক সময় বিদেশে একজন ভদ্রমহিলা তাঁর পতিকে বলছেন, 'তুমি দয়া করে হরিনাম জপ করো। প্লীজ, ইউ চ্যান্ট্।' পতি বলছেন, 'আমি পারি না। আই ক্যান্ট্।' পত্নী বলছেন, 'জপ করো, জপ করো। চ্যান্ট্ চ্যান্ট্।' পতি বলছেন, পারি না, পারি না। ক্যান্ট্ ক্যান্ট্।' অথচ যতক্ষণ তিনি পারি না পারি না বা ক্যান্ট্ ক্যান্ট্ করছেন ততক্ষণই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বললেই কৃষ্ণনাম জপ বা চ্যান্ট্ করা হয়েই যায়।

আমি সারাদিন কত কথা বলছি। কত সময় চলে যাচ্ছে। কেবলমাত্র 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' এই মহামন্ত্র জপ করলে জীবনের কোন প্রকার ক্ষতি হয় না। বরং লাভই হয়।

শাস্ত্রের নির্দেশ হল এই হরিনাম জপ কীর্তন একান্ত ভাবে করলে জীব জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ভবচক্র অতিক্রম করে আনন্দময় জগতে উন্নীত হতে পারবে। কৃষ্ণ কৃপা করলে নাম করব এই রকম বুদ্ধি ছেড়ে কৃষ্ণনাম করে কৃষ্ণকৃপা পেতে পারব এই রকম ভাবনা থাকা উচিত। মহামন্ত্রটি একটি প্রার্থনা। আগে প্রার্থনা করে তবে কৃপা পাওয়া যায়। কারও কৃপা লাভ করতে হলে তাঁর কাছে আগে প্রার্থনা করতে হয়। আগে কেউ কৃপা করলে তারপরে প্রার্থনা করব এমনটি তো পাগলের মতো কথা।

প্রশ্ন ১৫। ভক্ত এবং অভক্তের মধ্যে পার্থক্য কিরূপ?

উত্তর ঃ যারা হরিভজন করে তারা ভক্ত, আর যারা হরিভজন করে না তারা অভক্ত। কারা ভক্ত হয় না সেই সম্বন্ধে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন (গীতা ৭/১৫) যারা দুষ্কৃতকারী, বৈদিক শাস্ত্রের মত-বিরুদ্ধ পথে চলে, তাদের মধ্যে চার ধরনের লোক রয়েছে। যথা, ১) মূঢ়—এই ধরনের মানুষেরা সারাজীবন গাধার মতো খেটে চলে জাগতিক কিছু সুখ-লাভের জন্য এরা বহু কর্ম করে। তাদের 'হরি ভজনে একেবারে সময় নেই।' ২) নরাধম—নরদেহ পেয়েও যে অধম। অর্থাৎ ভগবদ্ ধর্ম সম্বন্ধে তারা কিছুই শেখে না। দিবারাত্র রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক সব কিছু ব্যাপারে তারা ওস্তাদ হলেও ভগবান সম্পর্কে তারা 'নাক গলাতে' চায় না। ৩) মায়াপহৃতজ্ঞান—মনোহারী পাণ্ডিত্য, মায়ার সুখ-দুঃখের চিত্র ওরা উপন্যাস গান, কবিত্ব, কাব্য মাধ্যমে খুব ভালো করে ফুটিয়ে তুলতে পারে। তারা বড় বড় পণ্ডিতরূপে সমাজে গণ্যমান্য হতে পারে। কিন্তু কখনও ভগবৎ উন্মুখ হয় না। মায়ার সুখ-দুঃখ নিয়েই ওরা ব্যস্ত ও চিন্তামগ্ন। ৪) অসুর ভাবাপন্ন—পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান যে একজন পুরুষ, তা এরা স্বীকার করতে চায় না। ওরা কেউ বলে ভগবান নির্বিশেষ নিরাকার। কেউ বলে অন্য কোন দেব-দেবী ভগবান, জীব ভগবান, নিজে ভগবান এই রকম দাবী ব্যক্ত করে। আর যারা ভগবানের ভক্ত তাদের বিরোধিতা করাই ওদের কাজ।

কারা ভক্ত হয় সেই সম্বন্ধে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন (গীতা ৭/১৬) যারা সুকৃতিবান, পুণ্যকর্মা তারা চার ধরনের। যেমন ১) আর্ত—যারা বেদনাতুর। দুঃখ-কষ্ট

পাচ্ছে, বিপদাপন্ন। ২) অর্থার্থী—যাদের বিষয় সম্পদ খাদ্য ধন বাসনা আছে। ৩) জিজ্ঞাসু—যারা জানতে চায় আমি কেন জগতে জন্মেছি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা। ৪) জ্ঞানী—যারা জানে ভগবান আছেন এবং তাঁর কাছে নিত্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করা যায়। এই চার ধরনের ব্যক্তিরা পুণ্যবান বা সুকৃতিবান হলে সাধুসঙ্গ ক্রমে ভগবানের ভক্ত হন। অন্যথায় হাজার হাজার আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু জ্ঞানীও কেউ ভক্ত হতে পারে না।

স্বরূপে প্রত্যেকেই ভক্ত। জড় জগতে মায়াবদ্ধ জীব তার নিত্য ভগবদ্ দাসত্ব পরিচয়টি ভুলে যাওয়ার দরুন সে এই সংসারে নিজেকে ভগবানের কাছ থেকে স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করে। তাই ভগবদ্ সম্বন্ধ জ্ঞান হীন অবস্থায় তার মায়িক জগতের সম্বন্ধ ক্রিয়াকর্ম তাকে অভক্ত রূপে পরিচিতি দেয়। যদিও বা 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস' এটি তার স্বরূপ পরিচয়।

প্রশ্ন ১৬। আমার ৩৫বছর বয়স্কা স্ত্রী শ্রীভগবানকে ভোগনিবেদন করে প্রসাদ পাওয়ার পূর্বে হঠাৎ বুকব্যাথা অনুভব করে। তারপর আধাঘণ্টার মধ্যে অচৈতন্য হয়ে মৃত্যুবরণ করে। ভক্তিমতী বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ স্ত্রীর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ কি? সে কি অল্প আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল? না কি আগের থেকে কিংবা সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারা গেল? তার কি গতি হবে? এ সব কথা জানিয়ে আমাকে প্রবোধ দিন।

উত্তর ঃ সদাচারী ব্যক্তির স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু হয়, পাপাচারীদের অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়। যারা কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ, তাদের মৃত্যু অস্বাভাবিক হয় না। কৃষ্ণ ইচ্ছায় তাদের সব কিছুই মঙ্গলময় হয়। কৃষ্ণস্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করলে অবশ্য কৃষ্ণধামে গতি হয়। চিত্তের চেতনাবাসনার উপর নির্ভর করছে কার কি গতি হবে।

রামায়ণ গ্রন্থে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কেউ ব্যাধিতে মরে কেউ বৃদ্ধাবস্থায় মরে, কিন্তু আসল কথা হল আয়ুষ্কালের মেয়াদ শেষ হয়েছে বলেই মৃত্যু ঘটে। আয়ুষ্কাল যতটুকু, লোকে ততটুকুই বাঁচতে পারে মাত্র, কেউ তাকে মারতে পারে না। মৃত্যু ঘটনার অন্যান্য সমস্ত কারণগুলি মোটে মুখ্য নয়, তা নিমিত্ত মাত্র। ডাক্তার, ওষুধ, টাকা, লোকজন, চিকিৎসা—এগুলিকে লোকে কারণ হিসাবে ধরে বটে, কিন্তু এগুলি কাউকে বাঁচায় না, আয়ুবৃদ্ধি করে না। এগুলি যদি কারণ হত, তবে তো ধনী ব্যক্তিরা, চিকিৎসকেরা মরত না। আসলে, যতটুকু দুঃখ সুখ ভুগবার কথা—ভুগতেই হবে।

ভক্তগণ এই সমস্ত দুঃখজনক ঘটনাতে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করেন। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে? কৃষ্ণ যদি ইচ্ছা করেন তাঁর কোন ভক্তকে তাঁর কাছে নিয়ে নেবেন, কোনও ভক্তকে অনেক দুঃখ দিয়ে শিক্ষা দেবেন, সেখানে আমাদের তাঁর ইচ্ছার তাৎপর্য বুঝতে হবে।

ছোটবেলায় শ্রীনারদ মুনি তাঁর মায়ের আশ্রয়ে দিনযাপন করতেন, মার কথা সর্বদা চিন্তা করতেন। তাঁর মা বৈষ্ণবসেবা পরায়ণা ছিলেন। হঠাৎ তিনি সর্পদংশনে মারা

গেলেন। শ্রীনারদ তখন চিন্তা করলেন, আমি যাতে মায়ের কথা বেশি চিন্তা না করে ভগবৎ চিন্তায় ভালভাবে থাকতে পারি, সেই জন্য আমাকে কৃপা করে ভগবান আমার মাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

অঙ্গিরা ঋষির বরে রাজা চিত্রকেতু একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন। অকালেই পুত্রটি মারা গেলে, রাজপরিবার এবং সমগ্র সাম্রাজ্যই শোকাচ্ছন্ন হল। সেইকালে নারদমুনি সেখানে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহে আত্মাকে ফিরিয়ে এনে বললেন, "ওহে বৎস, পিতামাতাকে ছেড়ে হঠাৎ অকালে কোথায় চলেছ? পুত্রটি বলে, "হে ঋষিবর, কেউই আমার পিতা নয়, মাতা নয়। আমার কর্মফলে কত পিতামাতা স্ত্রীপুত্র পেয়েছি। আবার তাদেরকে ছেড়ে চলেছি। আজ আমি এখানে উনাদের পুত্র ছিলাম, কাল আবার অন্য কারও হব। এই মায়া সম্পর্ক কয়েকদিনের জন্য মাত্র। আসল সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে। তিনিই সবার পিতামাতা।"

শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্র অল্পবয়সে দেহত্যাগ করে। মহাপ্রভু তাকে তুলে ধরে আত্মাকে ফিরিয়ে এনে বলেন "তুমি কেন হঠাৎ চলে যাচ্ছ।" সেই পুত্র বলে, "হে মহাপ্রভু, বহু জন্ম আমি জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরেছি। এই জন্ম আমার সার্থক যে, ভক্ত গৃহে জন্মেছিলাম। এই জন্মে তোমার শ্রীমুখ থেকে হরিকীর্তন শুনে পরমানন্দে চলে যাচ্ছি, কারণ আমার থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।"

আমাদের প্রত্যেকেই তো আজ, নয় কাল, যেতেই হবে। কিন্তু ভগবানের সাধন ভজনে বেশি করে যুক্ত থাকতে হবে। কর্মফল যার যাই হোক না কেন, সর্বপ্রযত্নে ভগবদ্ পাদপদ্মে মনোনিবিষ্ট করে আমাদের আয়ুষ্কালের সদ্ব্যবহার করে জীবনের শেষদিনে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়াটাই মনুষ্য জন্মের সার্থকতা।

যাঁরা কৃষ্ণনাম জপ করেন, সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করেন, বৈষ্ণব সেবাপরায়ণ, যাঁদের গুরুকৃষ্ণ-চরণে মতি, তাঁরা কখনও অসদ্‌গতি প্রাপ্ত হন না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের রক্ষা করেন।

প্রশ্ন ১৭। "বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন" এই তিন বিষয়ে বিস্তারিত তাৎপর্য জানতে চাই।

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৫) বলা হয়েছে, "যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য কি এই সম্বন্ধে জানতে না পারছে, ততক্ষণ তার সমস্ত কার্যকলাপ মূল্যহীন বলে বুঝতে হবে। নিজেকে জানবার মাধ্যমেই জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।"

বেদান্ত শাস্ত্রে প্রথমেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মানুষের জানবার চেষ্টা করা উচিত যে, "সে কে? এই জগৎ কি? সবকিছুর সৃষ্টিকর্তাই বা কে? এবং তাঁর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?" বলা হয়েছে যথার্থ মানুষের হৃদয়ে এই প্রশ্ন জাগবে, কুকুর-বেড়ালেরা এসব প্রশ্ন করতে পারে না। এই সম্পর্কে জানবার কৌতূহল অবশ্যই মানুষের থাকা উচিত।

নিজের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে এবং ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে—এই চারটি বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাকেই বলা হয় সম্বন্ধ জ্ঞান। জিজ্ঞাসু

চিত্তে বেদশাস্ত্রাদি থেকে আমরা জানতে পারব যে, জীব হচ্ছে ভগবানের অণুসদৃশ চিৎকণা, ভগবান হচ্ছেন জগতের কারণ, এবং এই দৃশ্যমান জগৎটি ভগবানের চিৎজগতের ছায়া সদৃশ, আর জীবের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক হচ্ছেন সেব্য-সেবক সম্পর্ক, ভগবান হচ্ছেন একজন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন, "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" দাসের কাজ হচ্ছে প্রভুর সেবা করা। প্রভুর সন্তোষ বিধান করা। জীবজগতের সমস্ত সম্পদ, সমস্ত কার্যকলাপ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য নিয়োজিত হওয়া কর্তব্য। যেহেতু সমস্ত কিছুই তাঁর সৃষ্টি । সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অহং সর্বস্য প্রভবো।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রিয় প্রভু এবং জীব হচ্ছে তাঁর প্রিয় সেবক। এই হচ্ছে সম্বন্ধ।

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যখন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার পরবর্তী কর্তব্য হচ্ছে, সেই সম্বন্ধ অনুসারে কার্য করা। পারমার্থিক সদ্‌গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করার ফলে বদ্ধজীবের কলুষিত হৃদয় নির্মল হয় এবং তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করতে পারেন। সম্বন্ধ স্থাপনে যত্ন করা বা তৎপর হওয়া বা কৃষ্ণভক্তি সেবায় যুক্ত থাকাকেই বলা হয় অভিধেয়।

অভিধেয় বা ভক্তি সম্পাদন করার ফলে যখন জীবের পরম উদ্দেশ্য কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়, তখন তাঁর প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধি লাভ হয়। পরম সিদ্ধি কৃষ্ণপ্রেমকেই বলা হয় প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সিদ্ধ হলে জীবের আর এই জগতের মধ্যে অন্য কোনও প্রয়োজন অনুভব হয় না। কেন না আর কিছুই পাওয়ার বাকি থাকে না। তস্মিন্ন জাগুস্তর্বাহ্যে তৎলভতে কৃতী (ঋক্‌বেদ)।

এক বাক্যে বলা যায়, কৃষ্ণভক্ত হওয়াই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করাই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমই লাভ করাই প্রয়োজন।

এই বিষয়ে যদি মানুষের রতি বা আসক্তি না জন্মায় তবে সমগ্র জীবনের কর্ম ও পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বৃথা বলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম দিকেই মহর্ষি ব্যাসদেব উল্লেখ করেছেন।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অর্থাৎ, যত বড় জ্ঞানী ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি হন না কেন, তিনি খুব ভালো ভাবে দুনিয়ার কর্তব্য সম্পাদন করতেও পারেন, কিন্তু তিনি যদি পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু না হয়ে নিজেকে এড়িয়ে রাখেন, তবে তিনি যা করেছেন তা সবই সময়ের অপচয় মাত্র। (শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/৮) জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিপূর্ণ দুঃখময় জড় সংসার চক্র থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দময় শাশ্বত জীবনে উন্নীত হতে হলে বেদশাস্ত্রের এ সব সহজ সরল নির্দেশগুলি অনুধাবন করা কর্তব্য।

প্রশ্ন ১৮। মৃত্যুকালে কৃষ্ণনাম স্মরণ করতে করতে কৃষ্ণলোকে উন্নীত হওয়া যায়। জীবৎ কালে কৃষ্ণনাম করেও মৃত্যুকালে কৃষ্ণস্মরণ হল না—এমনও তো হতে পারে?

উত্তর ঃ অপরাধ না থাকলে অন্তিম কালে কৃষ্ণনামের স্ফূর্তি হয়। অপরাধ থাকলে কৃষ্ণনাম স্মরণ হয় না।

প্রশ্ন ১৯। কলিযুগে মানুষের আয়ু একশ বছর। অথচ অধিকাংশ মানুষই পরমায়ু পূর্ণ হতে না হতেই মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ প্রাচীনকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র শ্রীবিদুরকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'বিদুর! বেদশাস্ত্রে মানুষ শতায়ু বলে কীর্তিত হয়েছে, অথচ শতবর্ষ আয়ু লোকে পাচ্ছে না, এর কারণ কি?' তখন বিদুর বলেছিলেন, 'মহারাজ! অতিমান (হামবড়া ভাব), অতিবাদ (নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ), অতি অপরাধ (গুরুতর পাপকর্ম), ক্রোধ (কোপ), আত্মম্ভরিতা (স্বার্থপরতা), ও মিত্রদ্রোহ (বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা)—এই ছয়টি তীক্ষ্ণ বাণ স্বরূপ হয়ে মানুষের আয়ু ক্ষয় করে ও প্রাণহরণ করে।' (মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব, ৩৬ অধ্যায়)

প্রশ্ন ২০। দীর্ঘ আয়ু নিয়ে বাঁচতে হলে কি করতে হবে?

উত্তর ঃ এই জগতে একই শরীরে দীর্ঘ আয়ু নিয়ে বাঁচতে হলে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে বট বৃক্ষ হয়ে জন্ম নিতে হবে। তাতে কমপক্ষে এক হাজার বছর পর্যন্ত আয়ু নিয়ে থাকার আশা করা যাবে। কলিযুগের মানুষকে তো মাত্র একশ বছর পর্যন্ত আয়ুষ্কালের মেয়াদ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে নানাবিধ অনাচার-দোষে আয়ু কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যতই দীর্ঘ আয়ু নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডে বাস করুন না কেন, মহাকালের কাছে তা অত্যন্ত তুচ্ছ ও ক্ষণিক। এমনকি ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মার আয়ুও। প্রকৃত চিরায়ু নিত্য জীবন হচ্ছে বৈকুণ্ঠজগতে। সেখানে যেতে হলে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করতে হবে।

প্রশ্ন ২১। দেহতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর ঃ মানবজাতির পিতা মহর্ষি মনু আমাদের দেহ সম্পর্কে সুন্দর তত্ত্ব দান করেছেন। তিনি বলেছেন, এই দেহ হচ্ছে অস্থিস্থূনং—কতকগুলো অস্থি হাড়ের স্তম্ভে বিধৃত, স্নায়ুযুতং—জড় জাগতিক সুখদুঃখ অনুভবের উদ্দেশ্যে স্নায়ুরূপ দড়ি দিয়ে বাঁধা, মাংস শোণিতলেপনম্—মাংস ও রক্ত দিয়ে প্রলেপ দেওয়া, চর্মাবনদ্ধং—চামড়া দিয়ে ঢাকা, দুর্গন্ধিপূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ—মূত্র ও বিষ্ঠা দিয়ে পূর্ণ দুর্গন্ধময়, জরাশোক সমাবিষ্টং—জরা-শোকে আক্রান্ত, রোগায়তনম্—নানারকমের রোগের নিলয়, আতুরম্—ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর-ধর্ম বিশিষ্ট, রজস্বলম্—কামক্রোধাদি রজোগুণযুক্ত, অনিত্যম্—বেশিদিনের জন্য টেকসই নয়—ক্ষণিক, ভূতাবাসম্—পঞ্চভূতের আবাস স্বরূপ, ইমং ত্যজেৎ—এই ধরনের জড় দেহের প্রতি মায়া ত্যাগ করা উচিত। ভোগবাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। যাতে পুনরায় এই রকম জড় দেহরূপ কারাগারে প্রবেশ করতে না হয়, সেরকম প্রযত্ন করা কর্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, বহু বহু জন্ম—গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি জন্মের পর জীবাত্মা মনুষ্যদেহ লাভ করে। *নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং*—এই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যদেহ অত্যন্ত দুর্লভ হলেও আমরা বর্তমানে তা লাভ করেছি। এই দেহ ধারণ করে জীব শ্রীকৃষ্ণভক্তির অনুকূলে জীবন যাপন করার সুদুর্লভ সুযোগ লাভ করতে পারে। ময়ানুকূলেন। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির দুঃখময় ভবসংসার সমুদ্র উত্তরণ করবার পক্ষে মনুষ্য দেহ একটি উপযুক্ত নৌকা স্বরূপ। *প্লবং সুকল্পং।* এ জীবনে কৃষ্ণভক্ত সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে থেকে, ভক্তিবিঘ্ন-সমূহ আমিষাহার-নেশাভাং-জুয়া-অবৈধসঙ্গাদি পরিবর্জন করে শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য। তা হলে জড় দেহ ত্যাগ করে নিত্য জীবনে অধিষ্ঠিত হয়ে সচ্চিদানন্দময় দেহে সচ্চিদানন্দময় ধামে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ হবে।

প্রশ্ন ২২। কলির পর কি আছে? মানুষ-জীবন কতবার হয়?

উত্তর ঃ কলির পর সত্য আছে। লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন ইতর জীবনের পর দুর্লভ মানুষজীবন লাভ হয়। এই জীবনে কৃষ্ণভজন না করলে, কলির স্বাভাবিক পাপাচারের ফলে আর মনুষ্য জীবন অসংখ্যযুগের মধ্যে নাও হতে পারে।

প্রশ্ন ২৩। কৃষ্ণভক্তেরা যমরাজের অধীন নন, এ কথার মানে কি?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে যমদূতদের প্রতি যমরাজের উপদেশ বর্ণিত রয়েছে। শ্রীযমরাজ বলছেন, "হে দূতগণ! যে মানুষের জিহ্বা পরমেশ্বর ভগবানের নাম কীর্তন করে না, যার বাক্‌শক্তি ভগবানের মহিমা কীর্তন করে না, যার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করে স্পন্দিত হয় না, যার মস্তক পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করে না, সেই দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে অবশ্যই যেন আমার কাছে নিয়ে আসা হয়। .....যে সুধীজন সর্বান্তঃকরণে অন্তর্যামী ভগবানের পবিত্র নামকীর্তনরূপ ভক্তিপন্থা অবলম্বন করেছেন তাঁরা আমার দণ্ডার্হ নন।" তে মে ন দণ্ডম্ অর্হন্তি। ভক্তগণ কৃষ্ণনাম স্মরণ করতে করতে জীবনের অন্তিমে বিষ্ণুদূত দ্বারা গৃহীত হন, যমদূতদের দ্বারা নিগৃহীত হন না।

প্রশ্ন ২৪। রাধাকৃষ্ণসেবা, একাদশীব্রত, হরিনাম কীর্তন, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ, নিরামিষ আহার, পারমার্থিক গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ, কণ্ঠে তুলসী কাঠের মালা ধারণ করতে আমাদের বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সকলের সহযোগিতাও পাচ্ছি না। ভক্তসঙ্গেরও যথেষ্ট অভাব। এমন পরিস্থিতিতে কিভাবে আমরা ভগবৎ সেবায় আত্মনিয়োগ করব? কিভাবে প্রেরণা পাব?

উত্তর ঃ ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করবার মন থাকলে রাধাকৃষ্ণও সদ্বুদ্ধি যোগান দিয়ে থাকেন। দদামি বুদ্ধিযোগং তম্। যে কেউই অতি সহজে ভোরে উঠে স্নানশুচি হয়ে রাধাকৃষ্ণের চিত্রপটের প্রতি ফুল ও ধূপ নিবেদন করতেই পারে। অতি ভোরে বাধা দেওয়ার মতো কে আর থাকবে? কত মেয়েই গুন্‌গুন্ করে গান করে থাকে। হরিনাম গান করলেই হয়ে গেল। ষোলমালা জপ করতে ২ ঘণ্টা সময় লাগে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাধাহীন সময় ২ ঘণ্টা নিজের মতো

করে বেছে নেওয়া যায়। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি ক্যান্সার রোগ যুক্ত জ্যান্ত মাছ দেখে থুথু ফেলতাম। আর আমিষ খাবার খাওয়া তো দূরের কথা, কেউ খেতে বসলেই বমি হয়ে যেত। তাই কেউ যদি অরুচি বশত খেতে না চায় তবে অন্য কারও জোর করার কোন প্রশ্নই নেই। পারমার্থিক গুরুদেবের শরণাগত হলেই দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ আসে, লোক লজ্জাবশত কণ্ঠে তুলসী কাঠের মালা পরতে অসুবিধা বোধ হলে তামা-রূপার চেন যুক্ত তুলসী হার পরা যায়। নতুবা, এমনভাবে গলায় তুলসী মালা ঝোলানো থাকবে যা পরিহিত কাপড়েই আবৃত থাকবে, লোকে দেখতে পাবে না। সুতরাং বাধা দেওয়ার লোকই পাবেন না। হয়তো বা ক্ষেত্রবিশেষে বিচিত্র মনোভাবের অবোধ লোক উপহাস করতে পারে। কিন্তু জানবেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তন শুরু করে বহু বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন ও বহু উপহাস সয়েছিলেন। অবোধ লোকের কথার কি মূল্য আছে? শাস্ত্র পড়ে জানতে হবে এই মনুষ্য-জীবন একটি দুর্লভ জীবন। এই জীবনে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে জীবনের অন্তিমে ভগবানের আনন্দময় নিত্যধামে উপনীত হওয়া যায়। যারা বাধা দেবে তারা নরকগ্রহে যাবার রাস্তা সুগম করবে। কিন্তু বুদ্ধিমান জন ভক্তিপথ যাত্রায় সেই বাধাকে সমর্থন করবে কেন? 'আমি ভাল হব'—তা আন্তরিকভাবে সমাজ কখনও চায় না। কিন্তু আমি বদমাশ হলে নিন্দা কুৎসা ছড়াতে কিংবা আমাকে প্রহার করতে কত লোক দৌড়ে আসবে। অতএব পারমার্থিক পন্থায় সহযোগী বেশী পাওয়া যায় না। তাই ঘরে থেকে গীতা ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করতে হয়, সুযোগ বুঝে মন্দিরে তীর্থে এসে কৃষ্ণভক্তদের সহযোগিতা প্রার্থনা করতে হয়।

প্রশ্ন ২৫। কত বছরে এক মন্বন্তর হয়?

উত্তর ঃ ত্রিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ কুড়ি হাজার বছরে এক মন্বন্তর হয়।

প্রশ্ন ২৬। পবিত্র স্রোতস্বিনী গঙ্গা এই পৃথিবীতে কত বছর ধরে প্রবাহিতা হচ্ছেন?

উত্তর ঃ আটত্রিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশ বছর।

প্রশ্ন ২৭। গঙ্গা কবে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন?

উত্তর ঃ মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে, সত্যযুগের শুরুতে ব্রহ্মলোক থেকে গঙ্গা ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

প্রশ্ন ২৮। আমরা জানি শিশুরা নিষ্পাপ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, শিশুরা নিষ্পাপ হয়েও প্রচণ্ড দুঃখকষ্ট পাচ্ছে। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ না, শিশুরাও নিষ্পাপ নয়। মাতৃজঠরে থাকাকালীনও মানুষ পূর্বজন্মকৃত কর্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে। মানুষ বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য প্রভৃতি যে অবস্থায় যেরকম শুভ বা অশুভ কর্ম করেছিল, তাকে সেই অবস্থায় তার অনুরূপ ফল ভোগ করতে হচ্ছে। এ কথা ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠির মহারাজকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। রামায়ণ

ইত্যাদি বহু শাস্ত্রেও এরকম কথা বলা হয়েছে। অতএব শিশুরা নিষ্পাপ, যুবক বা বৃদ্ধরা পাপযুক্ত—এ ধরনের কথা অনর্থক। শিশুকে বর্তমান জীবনে পাপকর্ম করতে না দেখা গেলেও পূর্বজীবনে এমন কোনও পাপকর্ম করেছে যার ফলে এই জন্মে শৈশবে কষ্ট পেতে হচ্ছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন একমাত্র তাঁর শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে মানুষ সর্বপাপ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে।

প্রশ্ন ২৯। ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন কেন?

উত্তর ঃ ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজের আনন্দ বিধানের জন্য, তাঁর নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। কিন্তু ভগবানের প্রীতিবিধানের কথা ভুলে গিয়ে আমরা নিজ নিজ ভোগসুখ স্পৃহা করার ফলে এই জগতে ভগবানের মায়াতে বদ্ধ হয়েছি।

এক এবেশ্বরঃ শশ্বন্তিশেষু নিখিলেষু চ।
সর্বে তৎকর্মসিদ্ধ্যর্থং মোহিতাস্তস্য মায়য়া ॥

একমাত্র নিত্য পরমেশ্বর ভগবান তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য সকলেই তাঁর মায়াতে মোহিত। (না. প. ২/১/২২)

প্রশ্ন ৩০। অনেক সময় দেখা যায় দুর্ঘটনা বা বিপদ থেকে ভক্তকে ভগবান রক্ষা করেন না, কেন?

উত্তর ঃ দুর্ঘটনাকেও শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের বিশেষ কৃপারূপে গ্রহণ করে থাকেন। যেমন, শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ এক ব্রাহ্মণদ্বারা অভিশপ্ত ছিলেন যে, সাতদিনের মধ্যে তক্ষক দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে। তখন তিনি জাগতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে অবসর নিয়ে সাতদিন গভীর মনোযোগে মুক্তপুরুষ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখ থেকে ভাগবত শ্রবণ করতে করতে অনায়াসে ভগবদ্ধামে গমন করলেন। তক্ষক দংশন করল ঠিকই, কিন্তু দংশন যাতনা তাঁকে প্রভাবিত করেনি। কারণ তিনি ভগবৎচেতনায় আবিষ্ট ছিলেন। কেবলমাত্র সেই ঘটনাকে মাধ্যম করে তিনি জড়জগৎ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে চিন্ময় জগতে প্রবেশ করলেন। যা অভক্তদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভগবান এমন করতেন যাতে তক্ষক কিছুতেই পরীক্ষিৎ মহারাজকে দংশন করতে না পেরে একেবারে পালিয়ে যেত, তা হলে আপনি হয়তো মনে করতেন যে, ভগবান ভক্তকে রক্ষা করলেন। তক্ষক দংশন করল মানেই—ভগবান ভক্তকে রক্ষা করলেন না। তাই না? কিন্তু এভাবে বাহ্য দৃষ্টিতে ভগবানের ভক্তরক্ষা কার্য বিচার করা হয় না।

অনেকের ধারণা এই যে, ভক্ত হলে তিনি আর কোনও প্রকার দুর্ঘটনা বা বিপত্তির সম্মুখীন হবেন না। কিন্তু তা ঠিক নয়। জড় জগৎ বলতে দুর্ঘটনা বা বিপত্তিপূর্ণ জগৎ। এখানে বিপত্তি থাকবেই। কিন্তু কৃষ্ণচেতনাময় ভক্ত সেই সব বিপত্তির মুখে আরও বেশী করে কৃষ্ণশরণাগত থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ—দুঃখে থাকো, সুখে থাকো, সদা 'হরি' বলে ডাকো। যদি এই জগতে প্রাণ থাকে তবে কৃষ্ণভজনা করতে হবে, প্রাণহানি হলে কৃষ্ণলোকে ফিরে যাবেন। এটিই ভক্তজীবনের মুনাফা।

প্রশ্ন ৩১। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের পূর্বলীলার কথা সান্দীপনি মুনির কাছ থেকে শ্রোতা হিসাবে শ্রবণ করেছিলেন। এমন কোনও মানুষ আছেন কি যিনি এরকম মহাত্মাদের কাছ থেকে নিজের পূর্বকাহিনী শ্রবণ করেন?

উত্তর ঃ অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণ করেছিলেন। সেইসময় পাণ্ডবদের কথা প্রসঙ্গে শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেন অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র থেকে মাতৃজঠরস্থ পরীক্ষিৎকে ভগবান কিভাবে রক্ষা করেছিলেন। সেই বর্ণনাও শুনতে লাগলেন।

প্রশ্ন ৩২। পশুরা কি কখনও মানুষ হতে পারে?

উত্তর ঃ মানুষ জীবন হরিভজন করবার জন্য। পশুরা মানুষ হয় হরিভজন করবার জন্য। শুধু পশুই কেন, দেবতারাও হরিভজন করবার জন্য মানুষ-জন্ম আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। স্বয়ং ব্রহ্মাও পৃথিবীতে হরিভজনের জন্য মানুষ-জন্ম গ্রহণ করলেন। কিন্তু যে মানুষ-জীবনে হরিভজন হল না, কেবল আহার বিহার নিদ্রাদি কর্মেই জীবন অতিবাহিত হল—তা হলে সে জীবন পশুর জীবন। হরিভজনহীন জীবন বৃথা বলে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৩। আমাদের এই পৃথিবীর সঙ্গে অন্যান্য লোকের সময়ের হিসাবের তারতম্য কতটা?

উত্তর ঃ মানুষের এক মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্রি হয়। মানুষের এক বছরে দেবতাদের এক দিবারাত্রি বা চব্বিশঘণ্টা হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগকে এক চতুর্যুগ বলে। পৃথিবীর অর্থাৎ আমাদের এই লোকের এক চতুর্যুগ হলে স্বর্গলোকের দেবতাদের হয় মাত্র বারো হাজার বছর। দেবতাদের এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার মাত্র বারো ঘণ্টা হয় অর্থাৎ সত্যলোকের এক দিবারাত্র হচ্ছে স্বর্গলোকের দুই হাজার চতুর্যুগ।

প্রশ্ন ৩৪। মৃত্যুকালে কৃষ্ণস্মরণ করতে পারলে ভগবৎ ধামে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের স্মরণ করলে কি গতি হয়?

উত্তর ঃ শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন এবং শ্রীগুরুদেবের গতি যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ, তাই গুরুদেবকে স্মরণ করলে শ্রীকৃষ্ণের কাছেই পৌঁছানো হবে।

প্রশ্ন ৩৫। কতদিন পর্যন্ত জন্ম আর মৃত্যু নিয়ে এই জড় জগতে থাকতে হয়?

উত্তর ঃ জীব যতদিন পর্যন্ত জড়-জগতের প্রতি কম-বেশি আসক্ত থাকে, যতদিন পর্যন্ত পূর্ণরূপে কৃষ্ণের প্রতি, কৃষ্ণসেবার প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করে, যতদিন পর্যন্ত এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে চিন্ময় বৈকুণ্ঠে উপনীত না হয়, ততদিন পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

প্রশ্ন ৩৬। আমরা শুনে এসেছি যে, কোনও মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির কাছে অন্য কেউ ভগবদ্গীতা পাঠ করলে কিংবা কৃষ্ণনাম করলে তাতে সেই ব্যক্তির মৃত্যু তাড়াতাড়ি হয় এবং সদ্গতি হয়। এটা ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ যদি ভগবদ্গীতার কথাগুলি শুনতে পারে, কিংবা কৃষ্ণনাম শুনে কৃষ্ণচিন্তা করতে পারে তা হলে সেই মৃত্যুপথযাত্রী স্বচ্ছন্দে সদ্গতি লাভ করতে পারবে। কিন্তু গীতাপাঠ কিংবা কৃষ্ণনাম কীর্তন হলে যদি সেই ব্যক্তির মন অন্যচিন্তা এবং অন্যকিছুর চাহিদা অনুভব করে, তবে সহজে সদ্গতি হয় না। আবার দেখা যায়, শয্যাশায়ী ব্যক্তি বুঝতেই পারে না যে, কৃষ্ণনাম কিংবা গীতাপাঠ কিনা, অন্য কিছু হচ্ছে। অবশ্য এত কিছু বিচার থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণনাম বা গীতাপাঠের অবশ্যই মাহাত্ম্য রয়েছে। যার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণনাম বা গীতাপাঠ হচ্ছে তার অবশ্যই অজ্ঞাতভাবে সুকৃতি লাভ হচ্ছে যাতে সে পরবর্তীতে সদ্গতি লাভের সুযোগ পেতে পারবে।

আমরা প্রত্যেকেই মৃত্যুপথযাত্রী। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মৃত্যুরও জন্ম হয়েছে। সেই মৃত্যুর সঙ্গেই আমরা যাত্রী। যে কোনও সময়ে সেই মৃত্যুর চরম প্রকাশ হবেই। তাই এখন থেকেই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করলে গীতাপাঠ আলোচনা করলে কৃষ্ণনাম কীর্তন করার অভ্যাস থাকলে অন্তিম দিনে কৃষ্ণচিন্তাটি হৃদয়ে থাকবে এবং পরমগতি লাভ করার সুযোগটিও সহজসাধ্য হবে।

প্রশ্ন ৩৭। আমরা দেখি যে, মানুষ বোঝে তাদের সংসারটি দুঃখময়। তাদের জীবন ক্লেশময়, এবং এও বোঝে যে, কৃষ্ণভজন করারই দরকার রয়েছে। তারা ব্যক্তিগতভাবে বোঝে, কৃষ্ণভজন বিনা দুস্তর দুঃখময় জীবন থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না, তবুও তারা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে না। কেন?

উত্তর ঃ আমরা বিভিন্ন ধরনের ভবরোগী। রোগে কষ্ট পাচ্ছি কিন্তু ওষুধ খেতে চাইছি না, ডাক্তারী পরামর্শ নিচ্ছি না। এগুলি মানসিক রোগ।

যে বলছে, কৃষ্ণভজন করা দরকার, সে-ই যদি বলে, এখন সময় নেই পরে করব, তা হলে বুঝতে হবে বহু জন্মের অনেক অনর্থ জমা হয়ে আছে মনের মধ্যে। আর অচিরেই ভজন শুরু করে দিলেই ধীরে ধীরে অনর্থ দূর হবে এটি সুনিশ্চিত বলেই শাস্ত্র নির্দিষ্ট। এই দুঃখময় সংসারের দিকে আমি খুবই কাজের লোক, পরিশ্রমী, উদ্যমী, কিন্তু ভজন রাজ্যের দিকে অকাজী, অলস, উদ্যমহীন। তা হলে পরিণামটি অবশ্যই হতাশায় পর্যবসিত হয়। যথেষ্ট সাধুসঙ্গ, হরিনাম কীর্তন, জপ, হরিকথা শ্রবণ, কৃষ্ণসেবায় অংশ গ্রহণ করবার জন্য অবশ্যই সুযোগ নিতে হবে। মানুষ-জন্মেই সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু আয়ুষ্কাল অতি অল্প। বর্তমানে যদি ভজন সাধন এড়িয়ে থাকি নানা অজুহাতে, ভবিষ্যতেও অজুহাতগুলো নতুন অজুহাত এনে জড়ো করবে আর ভজন সাধন করতে সুযোগ দেবে না। বরং ভজন করতে থাকলে ভজনফলে অজুহাত একে একে পালিয়ে যায়।

প্রশ্ন ৩৮। কি কাজ করলে আমার অশান্ত মনে শান্তি আসবে?

উত্তর ঃ সখা উদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, হে উদ্ধব, জগতে মানুষ যদি প্রকৃতই সুখী হতে চায়, শান্তি পেতে চায় তবে তাদের কর্তব্য হল তারা অবশ্যই আমার নাম-গুণ-রূপ-লীলা মহিমার কথা আলোচনা করবে। অর্জুনকেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—

মচ্চিত্তা মদ্‌গত প্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যম্ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥

"আমাতে চিত্ত রেখে, আমাতে জীবন সমর্পণ করে, ভক্তরা আমার কথা নিত্য আলোচনা করে পরস্পরকে বুঝিয়ে হৃদয়ে তুষ্টি লাভ করে এবং পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়।" (গীতা ১০/৯)

প্রশ্ন ৩৯। আমি কতবার মানবজন্ম গ্রহণ করেছি তা কি করে বুঝবো?

উত্তর ঃ একটি জীবনের পর মৃত্যু, তারপর জন্ম হয়। এই মৃত্যু ঘটনাটির মধ্যে আমাদের বিশাল বিস্মৃতি হয়। যার ফলে আমরা বুঝতে পারি না কোথায় কখন কোন্ জন্মে কি ছিলাম। এমনকি মাতৃজঠরে কিভাবে ছিলাম তাও আমরা স্মরণ করতে পারি না। এই জীবনে ছোটবেলাকার কথা, এমনকি গত কালের কথা আজ ভুলে যাই। সকালের অনেক কথা বিকালেই ভুলে থাকি। অতএব পূর্ব পূর্ব জন্মে কতবার কি ছিলেন সেই চিন্তা করে কোনও লাভ নেই। কেবলমাত্র ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিদের কথা মতো স্বীকার করতে হবে যে বহু বহু জন্মের পর এই মানব-শরীর লাভ হয়েছে। এবং এই মানব-জীবনের সার্থকতা হল ভগবান শ্রীহরির ভজন সাধন করা।

প্রশ্ন ৪০। আমরা বিভিন্ন জনের কাছেই ঋণী হয়ে থাকি। তবে ঋণশোধ না করে যদি আমাদের মৃত্যু হয় তা হলে কি অপরাধ হয়?

উত্তর ঃ মৃত্যু হওয়াটা অপরাধ নয়। ঋণ শোধ করবার জন্য আবার জন্মাতে হয়। কিন্তু সর্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক সেবার মাধ্যমে জানা অজানা সবারই ঋণ শোধ হয়ে যায়। কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করে চলতে হয়। অন্যথায় সবার সব ঋণ পরিশোধ করাও সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ৪১। কৃষ্ণভজনা করলে যদি এই জীবন চক্রের সমাধান হয়ে যায়, তবে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ কেন এই পথ গ্রহণ করছে না?

উত্তর ঃ বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই জীবন চক্রের সমাধান চায় না, তারা কেবলমাত্র এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের চক্রে ঘুরপাক খেয়ে সুখে থাকতে বাসনা করে। অধিকাংশ মানুষই কৃষ্ণভজন বিরুদ্ধ আচরণই গ্রহণ করে থাকে। কলির চারটি পাপ কর্মে তারা ব্রতী হতে পছন্দ করে—নেশাভাঙ, জুয়া, আমিষ আহার, অবৈধ যৌনতা। যার ফলে কলিগ্রস্ত জীবের অন্তঃকরণ কলুষিতই থাকে।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করতে হলে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার আছে। প্রথমত, হৃদয়ে কলুষতা দূরীভূত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সুখ দুঃখ নানাবিধ পরিস্থিতির মধ্যেও দ্বন্দ্বমুক্ত ও মোহমুক্ত থাকতে হবে। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্য কর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্ব মোহ নির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে, এবং যারা জাগতিক দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করে।" (গীতা ৭/২৮)

প্রশ্ন ৪২। আমাদের জীবনে দিন ও রাত্রি কেন?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

রাত্রি স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈঃ কর্মণামহঃ ॥

"দিন ও রাত্রি—এই দুটির মধ্যে জীবদের শান্তভাবে নিদ্রার জন্য রাত্রি এবং সুচারুরূপে কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য দিনের সৃষ্টি হয়েছে।"

প্রশ্ন ৪৩। একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের করণীয় কি?

উত্তর ঃ শ্রীব্যাসপুত্র শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে নির্দেশ দিলেন—

এবমেতন্নিগদিতং পৃষ্টবান্ যদ্ ভবান্ মম ।
নৃণাং যন্ ম্রিয়মাণানাং মনুষ্যেষু মনীষিণাম্ ॥

"হে মহারাজ, আপনি আমাকে ম্রিয়মাণ মানুষদের কর্তব্য সম্বন্ধে যা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তার উত্তরে যোগ মতে কয়েকটি বিষয় বলেছি। কখনও দৈবযোগে জীবদের মধ্যে কেউ কেউ মানুষ জন্ম লাভ করেছে এবং মানুষদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, আবার তাদের মধ্যে যারা আপনার মতো মৃত্যুপথযাত্রী, তাদের হরিকথামৃত শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ করা একান্ত বিহিত।" (শ্রীমদ্ভাগবত ২/৩/১)

মৃত্যুপথযাত্রী বলতে কেবল্ জরাব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধকেই মাত্র বোঝায় না। প্রত্যেকেই আমরা মৃত্যুপথযাত্রী। একটি শিশুও মৃত্যুপথযাত্রী। কারণ যে কোনও পরিস্থিতিতে, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও বয়সে আমাদের এই দুর্লভ মনুষ্যজীবন নষ্ট হয়ে যাবে। এই জড় জগতে নিষ্ঠুর সত্য কথাটি হল এই যে, যে কোনও মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু হবে।

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই প্রতিনিয়ত পরমেশ্বর ভগবানের সর্বমঙ্গলকর শ্রীনাম কীর্তন, ভক্ত ও ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাকথা শ্রবণ, ভগবানের অভয়পাদপদ্মের স্মরণ করা, ভগবানের সেবা আরাধনা করা আবশ্যক। কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*। —সদা সর্বদা হরিনাম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে।

পরম ভাগবত পরীক্ষিৎ মহারাজ জানতে পেরেছিলেন, মাত্র সাত দিন পরে তাঁকে দেহত্যাগ করতে হবে। তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর রাজা। পুত্র জন্মেজয়কে সাম্রাজ্যভার

অর্পণ করে রাজ-ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে তিনি মহর্ষি শ্রীশুকদেবের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন মৃত্যুর জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুতি নিতে। তিনি তাঁর কাছে অবিরাম সাতদিন ধরে অমল পুরাণ *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেছিলেন এবং যথা সময়ে তক্ষক দংশনে দেহত্যাগ করে পরম তুষ্ট চিত্তে ভগবদ্ধামে মহাপ্রয়াণ করে নিত্যানন্দময় জীবনে প্রবেশ করেন।

কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ জীবদের মৃত্যুর কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। আমরা পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো নিশ্চিত হতে পারি না কখন আমাদের এই দেহ ছাড়তে হবে। তাই আমরা মূর্খের মতো ভগবদ্ ভজনা বাদ দিয়ে ছাগলা বুদ্ধিতে এই জগৎ সর্বান্তঃকরণে ভোগ করবার চেষ্টা করি। মৃত্যুরূপী ঘাতকের দড়িতে বাঁধা ছাগল মুহূর্তের মধ্যে বলি হতে চলেছে, অথচ ছাগলটি বহু ছাগলের মৃত্যুর বীভৎস রূপ দেখেও তার সামনে কচি কচি সবুজ ঘাস খাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকে এবং কসাইখানার মধ্যেই ছাগীর সঙ্গ করার চেষ্টা করে।

সেই রকম, আসন্ন মৃত্যুর জন্য মানুষ যদি প্রস্তুত না হয়, ছাগলা বুদ্ধিতে কেবল এটা খাব, ওটা দেখব, কার হাতে মৃত্যুগ্রস্ত মুখে জল খাব, পুত্রপৌত্রকে দেখব ইত্যাদি চিন্তা করতে থাকে, তবে তার সদ্‌গতি হয় না। পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো সাধুসঙ্গ, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ—এই সকল ভগবদ্‌ভক্তির কোনও কার্যে তখন রুচি থাকা উচিত, যাতে পরবর্তী জন্মে সদ্‌গতি হয়।

প্রশ্ন ৪৪। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল কত?

উত্তর ঃ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগ এক হাজার বার আবর্তিত হলে মোট সময়টাকে এক কল্প বলে। তখন ব্রহ্মার এক দিন অর্থাৎ বারো ঘন্টা। তেমনই ব্রহ্মার এক রাত্রির পরিধিও এরই সমান। এই রকম দিন ও রাত্রি সমন্বিত বর্ষ অনুসারে ব্রহ্মা একশত বছর বেঁচে থেকে তারপর দেহত্যাগ করেন। অতএব মনুষ্য মাপে অর্থাৎ এই পৃথিবীর হিসাবে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল হল—

(সত্যযুগ+ত্রেতাযুগ+দ্বাপরযুগ+কলিযুগ)×১০০০×২×৩০×১২×১০০ বছর।

=(১৭,২৮,০০০+১২,৯৬,০০০+৮,৬৪,০০০+৪,৩২,০০০)×১০০০×২×৩০×১২×১০০ বছর।

এইভাবে মোট সংখ্যাটি = ৩১১,০০০,০৪০,০০০,০০০ বছর।

এই গণনা অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু অসীম বলে মনে হতে পারে, কিন্তু অনন্ত কালপ্রবাহের কাছে তা বুদ্‌বুদের মতো অত্যন্ত ক্ষণিক।

প্রশ্ন ৪৫। মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ এই ক্ষণিক অথচ সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মে এই জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু তথা নানা দুঃখ ও উদ্বেগপূর্ণ জগতে এসে এই জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য হল সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ধামে ভগবানের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া, যাতে নিত্য স্বরূপে গিয়ে আর কখনও এই উৎপাত ও উদ্বেগপূর্ণ ভবচক্রে ফিরে আসতে না হয়, সেই

জন্য ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়ে থাকতে হবে। কৃষ্ণভাবনানুশীলন কার্যে যুক্ত থাকতে হবে। সাধুসঙ্গের সুযোগ নিতে হবে।

প্রশ্ন ৪৬। জীবনের অর্থ কি?

উত্তর ঃ যে জীবনে জানা হল না যে, আমি পরমেশ্বরের নিত্য দাস, আমি পরম নিয়ন্তাকে বাদ দিয়ে এই নশ্বর জগতের কারও দাসত্ব করতে আসিনি, সেই জীবনে এই দুঃখময় জগতে সুখের অনুসন্ধান করা মূর্খামি মাত্র। এই প্রপঞ্চময় বিশ্ব মায়ামোহ বিভ্রান্তি মাত্র। আপন সত্তার প্রকৃত পরিচয় আনন্দ স্বরূপ চিন্ময় অমর আত্মা যে আমি, সেই সন্ধান আমাদের পূর্বপুরুষ মহান কল্যাণকামী মুনিঋষিরা দিয়ে গেছেন। তাঁদের অনুসৃত ও নির্দেশিত পরমার্থ সাধনের পথ রয়েছে। তা যে জানে, তার জীবন সার্থক। যে অনুসন্ধান না করে কেবল এই নশ্বর জীবনটারই সব কিছু ভোগ করবার জন্যই উদ্‌গ্রীব, তার জীবন অনর্থক ও কৃমিকীট তুল্য।

প্রশ্ন ৪৭। মানুষ আত্মহত্যা করে কেন? এই প্রবণতা কেন মানুষের মনে আসে?

উত্তর ঃ এই জড় জগৎ-সংসার দুঃখ ও উদ্বেগময়। পদে পদে নানাবিধ বিপত্তি ও উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে হয়। যে মনুষ্য-জীবন নিয়ে এই দুঃখপূর্ণ জগতে রয়েছি সেই জীবনও অত্যন্ত ক্ষণিক। জন্ম এবং মৃত্যুর অধীন। অন্যান্য প্রাণীরা জড়া প্রকৃতির অধীন হয়ে গতানুগতিকভাবেই জীবনযাপন করে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান জীব। সে ভগবৎপ্রদত্ত শাস্ত্রীয় পন্থা গ্রহণ করে এই দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ সংসারচক্র থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, সচ্চিদানন্দস্বরূপে তার নিত্য ধামে ফিরে যেতে পারে। বুদ্ধিমান মানুষেরা তাই এই অনিত্য সংসারের প্রতি মোহগ্রস্ত হন না কিংবা এখানকার সুখ-দুঃখে উৎফুল্ল কিংবা হতাশাচ্ছন্ন হন না।

কিন্তু যারা মূর্খ, তারা এই দুঃখময় সংসারকে সুখ-শান্তি লাভের স্থান বলে মনে করে অত্যন্ত মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। মোহগ্রস্ত ব্যক্তি আশা করে, 'আমি আনন্দ পেতে পারি। আমার পরিবার আত্মীয় স্বজন দেশ জাতি রাষ্ট্র সবাই আমাকে সুখ ও শান্তি লাভের ব্যবস্থা করে দেবে। আমি জীবনটাকে উপভোগ করতে পারব।'

কিন্তু ক্রমে যখন সে আঘাত পেতে থাকে, তখন সে হতাশাচ্ছন্ন হয়। দৈহিক কিংবা মানসিক যন্ত্রণা তখন তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তখন মায়ামোহগ্রস্ত মূঢ় জীব মৃত্যুকেই একমাত্র সমাধান বলে মনে করে। তখন সে আত্মহত্যা করতে এগিয়ে যায়। কিন্তু সেই তথাকথিত সমাধান তাকে কখনই এই দুঃখময় সংসার থেকে মুক্তি দেয় না। বরং তার ফলে নরকের দুর্ভোগ ভুগতে হয়।

বুদ্ধিমান মানুষ কখনও এইভাবে আত্মহত্যা করেন না। তিনি সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভয় চরণকমলের আশ্রয় নেন। ভগবদ্‌ভক্ত জীবনের দুঃখ-দুর্দশাগুলিকে ভগবানের আশীর্বাদ বলেই মনে করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

"ভগবানের ভক্ত এই জীবনের দুঃখ-দুর্দশাগুলিকে ভগবানের আশীর্বাদ বলেই মনে করেন। তিনি মনে করেন, তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে তাঁকে দণ্ডভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু কৃপাপূর্বক ভগবান তাঁর দণ্ডকে লঘু করে দিয়েছেন এবং তাই তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে অধিকতর ভক্তি সহকারে প্রার্থনা ও প্রণতি নিবেদন করেন।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১৪/৮)

কিন্তু ভগবদভক্তির অনুকূলে যে-মানুষ যায় না, সে আত্মঘাতী। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ রয়েছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

"সমস্ত প্রকার সুফলের মূলস্বরূপ সুদুর্লভ এই মনুষ্যজন্ম প্রকৃতির নিয়মে সুলভে লাভ করা যায়। এই মনুষ্যদেহ এক সুপরিকল্পিত নৌকার মতো। শ্রীকৃষ্ণের কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা পরিচালিত এরূপ নৌকা লাভ করেও যে ব্যক্তি এই সংসার-সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টা না করে, সে আত্মঘাতী।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/২০/১৭)

অতএব, যারা সুদুর্লভ মানব-জন্মের সদ্ব্যবহার করতে জানে না, জীবনের মূল উৎস শ্রীভগবানের অভয় পাদপদ্মে আশ্রয় নিতে যাদের মতি হয় না, কেবল মায়ামোহগ্রস্ত হয়ে যারা সংসার-চিন্তায় মশগুল থাকে, তারা প্রত্যেকেই আত্মঘাতী।

প্রশ্ন ৪৮। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ মৃত্যু একটা বিরাট পরীক্ষা। যেমন, স্কুল-কলেজের ছাত্ররা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। দিনরাত তারা মনোযোগ সহকারে পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন করতে থাকে। সারাবছর ভালমতো পড়াশুনা করলে তারা সহজেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। একেই বলে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি। সেইরকম, মৃত্যুও একটি পরীক্ষা। সারাজীবন হরিভজন অনুশীলন করলে সহজেই দেহত্যাগের পর নিত্য পরম আনন্দময় ভগবদ্‌ধামে উন্নীত হওয়া যায়। যখন কোনও ছাত্র পড়াশুনা ঠিকভাবে করে, তখন পরীক্ষাকক্ষে সে পাঠ্য বিষয় স্মরণ করে খাতায় সহজে লিখতে পারে। তেমনই ঠিকমতো কৃষ্ণভজন করলে মৃত্যুকালে শ্রীহরি স্মরণ হবে। এইভাবে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়া যাবে। এই কথাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিয়েছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবম্ যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

(গীতা ৮/৫)

"জীবনের অন্তিমকালে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহ ত্যাগ করলে সেই জীব আমার কাছে ফিরে আসবে। এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।" কিন্তু মূর্খেরা কৃষ্ণভজন করবে না, বাদবাকী আর সমস্ত কিছু করলেও করতে পারে।

যে ছাত্র মনের মধ্যে সর্বদা ছায়াছবি, উপন্যাস, বন্ধুবান্ধবের বাড়ি, সঙ্গীসাথীর কথা চিন্তা করে সে পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারে না। তার পক্ষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় না। তাকে আগে সেই সব আজেবাজে চিন্তা মন থেকে দূর করে পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। তেমনই যে ব্যক্তি এই জড় সংসার সুখ ভোগ চরিতার্থ করার চিন্তায় রত, সে কখনও মৃত্যুর পর শাশ্বতী গতি লাভ করতে পারে না। তাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪৯। কৃষ্ণকথা শ্রবণই ভব-সমুদ্র পারের উপায়। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতেই কৃষ্ণকথা শ্রবণ মাহাত্ম্য বলা হয়েছে।

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্ ।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ২/২/৩৭)

"যাঁরা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত শ্রবণপুটে পান করেন তাঁদের জড়বিষয় ভোগে দূষিত অন্তঃকরণ পবিত্র হয়ে যায় এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মসমীপে তাঁরা গমন করেন।"

আরও বলা হয়েছে—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ ।
কালেন নাতিদীর্ঘেণ ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥

"যাঁরা নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধা সহকারে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, তাঁদের হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই প্রকাশিত হন।"

শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করতে করতেই ভগবদ্ধামে উন্নীত হয়েছিলেন। কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে শ্রদ্ধা নেই বলেই তো ভব সংসারে জীব বদ্ধ হয়ে রয়েছে।

প্রশ্ন ৫০। 'এই জড় জগতের প্রত্যেক জীবেরই মৃত্যু অবধারিত। ভগবান এই জগতের জীবের প্রতি পরম দয়ালু। কিন্তু মৃত্যু যখন অনিবার্য হয় সেই ভগবান পর্যন্ত জীবের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার জন্য যমকে নির্দেশ করেন নিষ্ঠুর ভাবে।" মৃত্যু কাকে বলে? ভগবানকে দয়ালু এবং নিষ্ঠুর বলা হয় কেন?

উত্তর ঃ উপরোক্ত উদ্ধৃতি কোথা থেকে পেয়েছেন, তা আপনার উল্লেখ করা উচিত ছিল। এই মর্ত্য জগতে যে জড় দেহ আমরা গ্রহণ করেছি, সেই দেহটি ত্যাগ করাকে 'মৃত্যু' বলা হয়।

ভগবান অবশ্যই দয়ালু এই জন্যে যে, তিনি আমাদের এই অনিত্য জন্ম-মৃত্যুময় জগৎ থেকে তাঁর নিত্য ধামে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিয়েছেন এই মনুষ্য দেহ দান করার মাধ্যমে। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে মানুষ চিন্ময়ধামে নিত্য জীবনে উন্নীত হতে পারে। মনুষ্য জীবন পেয়েও আমরা যদি ভক্তিযোগে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত না হই তা হলে অবধারিতভাবে দেহত্যাগের পর পুনরায় অন্য কোনও জড়দেহ ধারণ করতে হবে। এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর জগতে পড়ে থাকতে হবে। ভগবান অত্যন্ত দয়ালু, তাই পাপাচ্ছন্ন কলিকালেও যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন করার সহজ পন্থা দিয়েছেন। ভক্তিযুক্ত মানসিকতায় যেভাবে মৃত্যু হোক না কেন তার সদ্‌গতি লাভ হয়ে থাকে।

কিন্তু মানুষ যখন নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ, ভোগ বাসনার জন্যই নানাবিধ চেষ্টা করে থাকে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে কোনও কিছু দিতে না স্বীকার করলে কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপে এসে তার সবকিছুই ছিনিয়ে নেবেন। মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্ (গীতা ১০/৩৪) অভক্তের কাছে কৃষ্ণ তখন পরিচয় দেন 'আমিই হচ্ছি সর্বগ্রাসী মৃত্যু'।

সর্বগ্রাসী মৃত্যুরূপে ভগবান নিষ্ঠুর-প্রকৃতির না হলে পাপমতি মানুষের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পেত এবং প্রচণ্ড অহমিকা ও দম্ভের ফলে জগৎ অনর্থক ভারাক্রান্ত হত।

অতএব ভগবানের কৃপালুতা ও নিষ্ঠুরতা আমাদের জড়বুদ্ধির অতীত।

প্রশ্ন ৫১। কোন্ ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্র থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে মুনিঋষিগণের উক্তি এই যে,—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্ ।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥

অর্থাৎ, "জন্ম-মৃত্যুর ভয়ংকর আবর্তে আবদ্ধ মানুষ বিবশ হয়েও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে করতে অচিরেই সংসার-চক্র থেকে মুক্ত হয়। সেই কৃষ্ণনামে স্বয়ং মহাকালও ভীত হন।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১/১/১৪)

শ্রীকুন্তীদেবীর উক্তি—

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥

"হে শ্রীকৃষ্ণ! যাঁরা তোমার অপ্রাকৃত চরিত্র-কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, স্মরণ করেন এবং যাঁরা তোমার নাম অবিরাম উচ্চারণ করেন, অথবা অন্যে তোমার গুণমহিমা আলোচনা করলে আনন্দিত হন, তাঁরা অবশ্যই তোমার শ্রীপাদপদ্ম অচিরেই দর্শন করতে পারেন, যা একমাত্র জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকে নিবৃত্ত করতে পারে।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৮/৩৬)

প্রশ্ন ৫২। 'সংসার' শব্দটির অর্থ কি?

উত্তর ঃ 'সংসার' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সম্যক সৃতিযুক্ত'। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে যুক্ত। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় সংসার বলতে বুঝায় কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত।

প্রশ্ন ৫৩। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৯/২৯) বলা হয়েছে—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥

অর্থাৎ, একটি জীব মনুষ্য-দেহ লাভ করে বহু জন্ম-মৃত্যুর পর। যদিও এই মনুষ্যজীবনও অনিত্য, তবুও এই জীবন জীবকে পূর্ণসিদ্ধি লাভের সুযোগ প্রদান করে। পূর্ণ সিদ্ধি হল—যা পেলে আর কোনও পাওয়ার বাকি থাকে না, তা হল কৃষ্ণপ্রেম। অতএব ধীর ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে অবিলম্বে এই পূর্ণসিদ্ধি লাভের জন্য প্রযত্ন করা। সমস্ত মানবেতর জীবের উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে থেকে আহার-নিদ্রা-দেহরক্ষা-মৈথুন সুখ লাভের জন্য চেষ্টা চালানো। কিন্তু মানব-জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আর পতিত না হয়ে নিত্যানন্দময় জীবনে উন্নীত হওয়া। মূর্খ মানুষ সর্বদা এই দুঃখময় জগতে ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের জন্য কতকিছুই চেষ্টাভাবনা করে থাকে। কিন্তু জঘন্যতম প্রজাতিদের মধ্যে সেই ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বিষয় অতি সুলভ। পক্ষান্তরে মানব-জীবনেই কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার সুদুর্লভ সুযোগ রয়েছে। অতএব কৃষ্ণভজন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ৫৪। আমাদের জন্ম কখন? পিতার মাধ্যমে যখন মাতৃগর্ভে এলাম তখন, না কি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়াটাই জন্ম?

উত্তর ঃ আমরা আত্মা। আত্মা হচ্ছে ভগবানের অতি সূক্ষ্ম চিৎকণা। সেই চিৎকণা আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশপ্রকাশ মহাবিষ্ণুর দিব্য শরীরে ছিলাম। মহাবিষ্ণু তাঁর সৃষ্ট জড়া প্রকৃতিতে ঈক্ষণ বা দৃষ্টিনিক্ষেপ মাধ্যমে সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিৎকণাগুলিকে জড় জগতে পাঠালেন।

মহাবিষ্ণুর অংশপ্রকাশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মার জন্ম হল। সেই ব্রহ্মা ভগবদ্‌নির্দেশে চুরাশিলক্ষ প্রকার জীবদেহ সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মা মন থেকে বিভিন্ন সন্তান সৃষ্টি করলেন। জীবদেহগুলির উপাদান হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এ সবই ভগবানের সৃষ্টি। ব্রহ্মা সেইগুলি দিয়ে ভগবানের নির্দেশে দেহ গঠন করেছেন। ভগবানের চিৎকণা আত্মা সেই দেহগুলিতে প্রবিষ্ট হল। এভাবে জীব সৃষ্টি হল। ক্রমশঃ ব্রহ্মা নারী ও পুরুষদেহ সৃষ্টি করলেন এবং মৈথুন মাধ্যমে প্রজাতি বৃদ্ধির পন্থা হল।

পিতৃ শরীরে শুক্রাণুরূপে সূক্ষ্ম জীবনকণা আশ্রয় করে থাকে। সেই শুক্রাণু মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয়ে শরীর ধারণ করে। তারপর এক সময় সেই জীব ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর সে বৃদ্ধি পায়, কিছু কর্ম করতে থাকে এবং তার কর্মফল সঞ্চিত হয়। এভাবে একদিন দেহ ক্ষয় হয়ে যায়। তারপর সেই দেহ ছেড়ে জীবাত্মা অন্য দেহ ধারণ করে। সঞ্চিত ভাল-মন্দ কর্মফল ভোগ করবার উদ্দেশ্যে কর্মানুরূপ অন্য কোনও মাতা-পিতাকে আশ্রয় করে নতুন একপ্রকার দেহ ধারণ করে। এইভাবে বারংবার লক্ষকোটি রকমের দেহ ধারণ করা হয়ে থাকে। নতুন নতুন দেহ ধারণ করাকে বলে জন্ম। সেই সেই ক্ষয়শীল দেহ ত্যাগ করাকে বলে মৃত্যু।

সুতরাং মূলতঃ ভগবান থেকে আমরা যখন জড় জগতে পতিত হয়ে জড় দেহ ধারণ করলাম তখন থেকেই আমাদের জন্ম শুরু হল।

প্রশ্ন ৫৫। এ জীবনের কর্মফল এ জীবনেই ভোগ না হলে পরজীবনে ভোগ করতে হবে কেন?

উত্তর ঃ জীবনের মেয়াদ অতি অল্প। ভোগবাসনা প্রচুর। সে জন্য কত রকমের প্রচেষ্টা। অতএব সব কর্মফল অল্প মেয়াদের মধ্যেই ভোগ করে ফেলব—এরকম চিন্তা করা ঠিক নয়। এক বেলাতেই সব ভোগ করে ফেলব—আপনি তা মনে করলেও ভোগ করতে পারেন না।

প্রশ্ন ৫৬। সারাজীবন পাপাচার করে বৃদ্ধবয়সে ভগবদ্‌সেবা করে, হরিনাম করলে তার গতি কি হবে?

উত্তর ঃ হরিনাম গ্রহণ ও ঐকান্তিক হরিসেবা করার ফলে তার পাপগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। কর্মানি নির্দহতি চ ভক্তিভাজান্। সে পরমগতি প্রাপ্ত হবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি বর্তমানে হেলায় খেলায় কাটিয়ে বৃদ্ধ বয়সটিতে সাধন ভজন করবে বলে মনে করছে, সাক্ষাৎ মৃত্যু সেই ব্যক্তির সাধনভজনের সুযোগ না দিতেও পারে। তাছাড়া বৃদ্ধবয়সে ঠিকমতো সাধনভজন হয় না। কেননা শারীরিক ও মানসিক নানা সমস্যাই বেশী করে দেখা দেয়।

প্রশ্ন ৫৭। আমার বাবা দিনরাত ভগবৎকথা আলোচনা করতেন। তবুও কেন অকালে গাছের উপর থেকে পড়ে মারা গেলেন?

উত্তর ঃ আমরা কে কি রকমের কর্মফল সঞ্চয় করেছি তা আমরা জানি না। কে কিভাবে কোথায় কখন মৃত্যুবরণ করব তাও জানি না। আমরা কখনও নিজেরা নির্বাচন করেও আসিনি যে, অমুক স্থানে অমুকের ঘরে অমুক শরীরে একটা নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল নিয়ে জন্মগ্রহণ করব। অথচ এ সব কিছুই ঘটে চলেছে। কিভাবে? *দৈবনেত্রেণ।* বিধির বিধান অনুসারে। আমরা কেবল জানি এইটুকু যে, আমাদের জন্ম হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে। কিভাবে কখন কোথায় এবং কেন—সেইগুলি আমাদের দৃষ্টির বাইরে বলেই 'অদৃষ্ট' বা 'বিধির বিধান' বলা হয়ে থাকে। যাঁরা সর্বদ্রষ্টা তাঁরা সবকিছু দর্শন করতে পারেন কোথায় কিভাবে কেন কি সব ঘটে চলেছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ হল—

অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

"জীবনের অন্তকালে কেউ যদি আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, সে নিঃসন্দেহে আমার কাছে ফিরে আসে।" (গীতা ৮/৫)

আর আপনি এই কথাও উল্লেখ করেছেন যে, 'বাবা বিদায় কালে নিজেই হরিকীর্তন করেছেন।' এই যদি হয়, তবে তিনি ধন্য।

সকাল বিকাল অকাল নিয়ে কথা নয়, যে কোনও কালই যে কোনও মুহূর্তই আমাদের ইহ জীবনের অন্তিমকাল হতেই পারে। সেই জন্য শ্রীনারদমুনি বললেন, 'মনুষ্য-জীবনের সেই আয়ুষ্কাল ধন্য যে-আয়ুষ্কালে সে কৃষ্ণভক্তিতে কৃষ্ণসেবাতে নিযুক্ত আছে।' কিছু সাধন ভজন না করলে কেউই অন্তিমকালে ভগবানের নামও কীর্তন করতে পারে না।

যারা সব কিছু সুখ সুবিধা পেয়েও মরণকালে সাংসারিক চিন্তা, রাজনৈতিক কিংবা অন্য আজেবাজে চিন্তা করে দেহত্যাগ করে, তারা ভগবদ্ধামে উন্নীত হবে এই ধরনের কথা আদৌ কোথাও বলা হচ্ছে না। তাদের দুর্গতিই লাভ হয়। সুতরাং কৃষ্ণভক্তি চেতনায় যেখানে যে অবস্থায় আমরা মরি না কেন তাতে কোনও ক্ষতি নেই।

৩

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর

প্রশ্ন ১। 'জীবই ঈশ্বর। এছাড়া ঈশ্বর নেই।' এই কথার তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ এটি বাজে কথা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অগণিত অসংখ্য জীব রয়েছে—আর সবাই-ই ঈশ্বর—এই রকম উৎপাতমূলক ধারণা অশাস্ত্রীয় এবং বিশৃঙ্খলা ছাড়া কিছুই নয়।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং অন্য সকলেই হচ্ছে তাঁর সেবক মাত্র। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ৫/১৪২)

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালন কর্তাগণ সর্বতীর্থের তীর্থস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের রজকণা মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, লক্ষ্মী—সকলেই তাঁর অংশ ও অংশকলারূপে তাঁর পদরজ মস্তকে ধারণ করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৬৮/৩৭) মহাবিশ্বের সমস্ত জীব তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র *মমৈবাংশো জীবলোকে*..... (গীতা ১৫/৭) প্রতিটি জীবই হচ্ছে কৃষ্ণের ভৃত্য। জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২০/১০৮)। তাই জীবকে কৃষ্ণ বলে মনে করা অপরাধ। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সাবধান করে দিয়ে বলেছেন—

প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮/১১১)

"কখনই অধম জীবকে 'কৃষ্ণ' বলে মনে করা উচিত নয়। জীব যতই মহৎ হোক না কেন, তাকে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়।"

জীব ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮/১১৩)

"জীব এবং ভগবান কখনই সমান নয় ঠিক যেমন স্ফুলিঙ্গকে কখনই জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের সঙ্গে সমান বলে মনে করা যায় না।"

হ্লাদিন্যা সংবিদা শ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকরঃ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮/১১৪)

"পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা সচ্চিদানন্দময় এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তির দ্বারা আশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব সর্বদাই স্বীয় আরোপিত অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই সে সর্বপ্রকার ক্লেশের আকর।"

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন—মায়াবাদী সন্ন্যাসীর পরস্পরকে নারায়ণ জ্ঞানে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলে সম্ভাষণ করলেও মন্দিরে গিয়ে শ্রীনারায়ণকে প্রণতি নিবেদন করে না। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ। যারা নিজেদের ভগবান বলে মনে করে তারা অসুর মাত্র। ভাগবতাদি শাস্ত্রে বর্ণনা রয়েছে, অসুরেরাই নিজেদের নারায়ণ, কৃষ্ণ বা ভগবান বলে জাহির করেছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, নরকের মত-পথ ধরবার জন্যই গণ্ডমূর্খেরা জীব আর ঈশ্বর এক বলেই চিন্তা করে, এ ছাড়া আর কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব তারা অস্বীকার করে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* উল্লেখ করেছেন—

যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেইত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮/১১৫)

"যে মূঢ় ব্যক্তি বলে যে, জীব এবং ঈশ্বর সমান, সে একটি পাষণ্ডী, তাই মৃত্যুর দেবতা শ্রীযমরাজ তাকে শাস্তি প্রদান করেন।"

প্রশ্ন ২। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা শিবকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। না কি বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর?

উত্তর ঃ শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর। শিব হচ্ছেন বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*—সমস্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে শিব হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে—সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা হচ্ছে বিষ্ণুর আরাধনা। *আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোঃ।* *শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে*—'বিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর সঙ্গে শিব বা ব্রহ্মাকে সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়।'

প্রশ্ন ৩। কৃষ্ণভক্তকে যোগমায়া দুর্গার পূজা করতে নিষেধ করা হয়েছে, অথচ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও যোগমায়া ভ্রাতা ও ভগিনীরূপে আবির্ভূত হলেন। ভ্রাতার পূজা করা হবে, কিন্তু ভগিনীর পূজা হবে না কেন?

উত্তর ঃ যোগমায়ার পূজা করতে কাউকে কোথাও নিষেধ করা হয়নি। ভক্তরাই যোগমায়ার পূজা করে। অভক্তরা কখনই যোগমায়ার পূজা করে না। অভক্তরা সব সময় মহামায়ার পূজায় আগ্রহী।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা এই উভয় শক্তিরই দুর্গা, মহামায়া প্রভৃতি নাম নানা শাস্ত্রে দেখা যায়। অন্তরঙ্গা শক্তির উপাসনায় কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তির উপাসনায় জড়জাগতিক বৈভব প্রাপ্তি হয়ে থাকে। যিনি যা কামনা করবেন তাঁর সেই শক্তির উপাসনা করা হয়। 'ধন দাও, যশ দাও, পুত্র দাও, সরকারী চাকুরী দাও, সুন্দরী স্ত্রী দাও, ডিগ্রী পাস, জমিজমা ভোগ, রাজত্ব, মন্ত্রীত্ব'—এই রকম কিছু বাসনা নিয়ে দুর্গাপূজা করলে তিনি বহিরঙ্গা মহামায়া রূপে মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় উন্মুখী হলে যে শক্তি সহায়তা করেন সেই শক্তিই যোগমায়া, আর কৃষ্ণবহির্মুখ হলে যে শক্তি জড়জাগতিক ভোগ্যবস্তু দিয়ে কৃষ্ণ থেকে ভুলিয়ে রাখতে সহায়তা করেন সেই শক্তিই মহামায়া।

কাত্যায়নী দুর্গারই অন্য নাম। শ্রীবৃন্দাবনের গোপবালিকাগণ যে কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা করেছিলেন সেই ক্ষেত্রে তাঁদের আরাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করা। অত্যন্ত সম্মানীয়া মহা প্রজ্ঞাবতী শ্রীবৃন্দাদেবীর নির্দেশে গোপবালিকারা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করবার আশায় কাত্যায়নী পূজা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। তিনি সচ্চিদানন্দময় পুরুষ। গোপকুমারীগণ কোনও বদ্ধ জীবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য কাত্যায়নী ব্রত করেননি। সেই কাত্যায়নী যোগমায়া।

কিন্তু অভক্তরা অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্মুখ ব্যক্তিরা জড়জাগতিক সম্পদ উপভোগের উদ্দেশ্যে দুর্গাপূজা করে, সেই দুর্গা হচ্ছেন মহামায়া। মহামায়ার দেওয়া সম্পদ পরিণামে দুঃখই দান করে। জড়জাগতিক ভোগবাসনার জন্য এই জড় জগৎ থেকে জীব কখনই স্বস্তি লাভ করতে পারে না। মৃত্যুময় ভবচক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তাকে জন্মমৃত্যুর চক্রে জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই দুঃখময় জড় জগতে বদ্ধ হয়েই থাকতে হয়।

কেউ যদি কৃষ্ণভক্তি আকাঙ্ক্ষী হন তবে কৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগত হয়ে এই মহামায়ার দুঃখ ও উদ্বেগপূর্ণ জড় জগৎ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারবেন। এই কথা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেনঃ

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তাকে কেউই সহজে অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করে তারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে।" (গীতা ৭/১৪)

কিন্তু জগতের অসুর প্রকৃতির মানুষেরা দুর্গা বা কালীকে পরম আরাধ্যা রূপে গ্রহণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ রূপে কল্পনা করে। আবার অনেকে মনে করে কালীপূজা, দুর্গাপূজা আর কৃষ্ণপূজা একই কথা। এই ধরনের লোকেরা *মায়াপহৃত-জ্ঞানাঃ*। মহামায়া তাদের জ্ঞান বুদ্ধি অপহরণ করেছেন। কারণ তারা কৃষ্ণের চরণে অপরাধী। কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণপূজা করে, তবে তাঁর প্রতি সমস্ত দেব-দেবী প্রসন্ন হন বলে শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। (ভাগবত ৪/৩১/১৪ দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণভক্তি আছে যার সর্বদেব বন্ধু তার ॥

জড় জগতে মহামায়া দুর্গাদেবী হচ্ছেন চিৎজগতের যোগমায়ার ছায়া স্বরূপিনী। শ্রীব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছেন—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।

ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"ভগবানের স্বরূপ শক্তি বা চিৎ শক্তির ছায়া স্বরূপা, জড় জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধনকারিণী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (ব্রহ্মসংহিতা ৪৪)

প্রশ্ন ৪। পরমেশ্বর ভগবান কে? তিনি কেমন দেখতে? তিনি কোথায় থাকেন? সেই ধাম দেখতে কেমন? সেখানে কোনও মানুষ যেতে পারবে কি? জীবনে মানুষের পক্ষে কি ঈশ্বর দর্শন সম্ভব?

উত্তর ঃ *শ্রীব্রহ্মসংহিতা* শাস্ত্রে শ্রীব্রহ্মার ভগবদ্ স্তুতিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

অর্থাৎ, "ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দময় পুরুষ। তিনি সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একমাত্র সেব্য প্রভু। তিনি সব কিছুর মূল রূপ অনাদিরও আদি, তিনি সমস্ত কারণের পরম কারণ।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/১) তাঁকে দেখতে পরম সুন্দর। বর্ণনা রয়েছে—

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ, "তিনি বেণুবাদন করতে থাকেন। তাঁর দুই নয়ন পদ্মপাপড়ির ন্যায় বিকশিত। তাঁর মস্তকে ময়ূরের পুচ্ছ শোভিত। জলভরা নীল মেঘের মতো তাঁর অঙ্গকান্তি। তিনি কোটি কোটি কন্দর্পের অত্যন্ত কমনীয় রূপ অপেক্ষাও বিশেষ রূপে শোভাযুক্ত। সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩০)

আরও বর্ণনা রয়েছে—

আলোলচন্দ্রক লসদ্বনমাল্য বংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্ ।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ, "দোলায়িত ময়ূরপুচ্ছ শোভিত বনমালা তাঁর গলদেশে, তাঁর দুই হাতে বংশী ও রত্নাঙ্গদ, তিনি সর্বদা প্রণয় কেলিকলা বিলাসে সুনিপুণ, অত্যন্ত ললিত ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে তিনি দণ্ডায়মান হন। তিনি মনোহর শ্যামসুন্দর রূপে নিয়ত প্রকাশমান। সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩১)

তিনি থাকেন শ্রীগোলোক বৃন্দাবনে। বলা হয়েছে—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ "এই চৌদ্দভুবন বিশিষ্ট দেবীধাম, তার উপরে শিবধাম, তার উপরে বৈকুণ্ঠধাম এবং সবার উপরে গোলোক নামক কৃষ্ণধাম। সেই সমস্ত ধামে বিভিন্ন প্রভাব সমূহ যিনি বিধান করেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৩)

এই জড় জগতের উর্ধ্বে শিবধাম, সেই ধাম 'মহাকাল-ধাম' নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ ভেদ করে মহা-আলোকময় সদাশিব-লোক। তারও উর্ধ্বে হরিধাম অর্থাৎ চিৎ জগৎ বা বৈকুণ্ঠলোক। তারও উর্ধ্বে গোলোক বৃন্দাবন ধাম। দেবীধামে মায়ার বৈভবের প্রভাব, শিবধামে কাল ও দ্রব্যময় ব্যূহ প্রভাব, হরিধামে চিৎ-ঐশ্বর্য প্রভাব এবং গোলোকধামে সর্ব ঐশ্বর্য-নিবাসকারী মহা মাধুর্য প্রভাব রয়েছে। সেই সমস্ত প্রভাব সহ সেই সেই ধামে শ্রীগোবিন্দ সাক্ষাৎ গৌণ বিক্রম দ্বারা বিধান করেছেন।

সেই গোলোক ধামের বর্ণনা রয়েছে—

চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশত সম্ভ্রম সেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"সেই ধামে চিন্ময় রত্নসমূহের দ্বারা বিরোচিত প্রাসাদ রয়েছে। কোনও জড় বস্তু দিয়ে সেই জগৎ গঠিত নয়। সেখানে কল্পবৃক্ষ রয়েছে। এই জগতে যদি কখনও কোনও কল্পবৃক্ষ থাকে, তবে তার কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণলোকে কল্পবৃক্ষ প্রেমভক্তির নানা বৈচিত্র্যরূপ অনন্ত ফল দিয়ে থাকে। সেই লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিত দিব্য রত্নময় আলয়সমূহ সেখানে বিদ্যমান। সেই আলয়সমূহে সুরভী গাভীসকল পালিত হচ্ছে। সাধারণত কামধেনু দোহন করা মাত্রই দুধ দেয়, আর গোলোকের কামধেনুসমূহ ভক্তদের কেবল ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করে তা-ই নয়, সেই কামধেনু সকল চিন্ময় পরমানন্দধারায় প্রেমের স্রোত বইয়ে অনর্গল দুগ্ধামৃতের মহাসমুদ্র সৃষ্টি করে। শতসহস্র গোপসুন্দরী-লক্ষ্মীগণ পরম যত্ন সহকারে সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছেন।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/২৯)

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥

"সেখানে পরম লক্ষ্মীস্বরূপা কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীরাই কান্তাবর্গ, পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, সেখানে বৃক্ষমাত্রই কল্পতরু, ভূমিমাত্র চিন্তামণি, জলমাত্রই অমৃত,

কথামাত্রই গান, গমন মাত্রই নৃত্য, বংশীই প্রিয়সখীর ন্যায় প্রিয়কার্য সাধনকারী, চিদানন্দময় জ্যোতি সেখানে বিদ্যমান, অর্থাৎ চন্দ্র বা সূর্যেরও সেখানে প্রয়োজন নেই। পরম চিৎ পদার্থমাত্রই আস্বাদ্য বা উপভোগ্য।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৫৬)

সেই ধামে মানুষ যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিনিধি সদ্গুরুর কৃপায় শুদ্ধ ভক্তিপূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় স্বীয় চিদবৃত্তিকে অবলম্বন করে সেই গোলোকধামে উপনীত হওয়া যায়। অর্থাৎ, সর্ব প্রযত্নে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে জীবন পরিচালিত করতে হবে।

প্রেমনেত্রেই ভগবানকে দেখা যায়। শ্রীব্রহ্মা বলছেন—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ, জড়জাগতিক কামনাবাসনাময় নেত্রে নয়, "ভগবৎ প্রেমের অঞ্জনে রঞ্জিত ভক্তিনেত্রে নিষ্ঠাবান সাধুগণ সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে সেই অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট পরমসুন্দর শ্যামসুন্দরকে দর্শন করেন। সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৮)

প্রশ্ন ৫। শ্রীকৃষ্ণই যে পরমেশ্বর ভগবান, তা কিভাবে বুঝব?

উত্তর ঃ সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই পরমেশ্বর ভগবান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কোনও শাস্ত্রে, কোনও দেব-দেবী পর্যন্ত নিজেদেরকে ভগবান বলে জাহির করেননি। বরং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব স্বীকার করে তাঁর আরাধনা করেছেন।

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের পরম কারণ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই স্বীকার করেছেন, "আমি সমস্ত জড় এবং চেতন বিশ্বের সব কিছুর উৎস। সব কিছুই আমার থেকেই প্রবর্তিত।"

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে (গীতা ১০/৮)

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন, "হে ধনঞ্জয়, আমার উর্ধ্বে কিঞ্চিৎ বস্তুও নেই। আমিই পরমতত্ত্ব।"

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় (গীতা ৭/৭)

এইভাবে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে প্রমাণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬। ভগবানের মধ্যে বিদ্যমান গুণগুলির সামান্যতম পরিমাণও যদি কারও মধ্যে থাকে তবে তাঁকে 'ভগবান' বলা যায় কি না?

উত্তর ঃ সর্বশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই পরমেশ্বর ভগবান বলা হয়েছে। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*। তিনি একটি বিশাল পর্বত তুলে কড়ে আঙুলে সাতদিন ধরে রেখেছিলেন। যদি

কেউ একদলা কাদামাটিতে আঙুল ঢুকিয়ে উপরে তুলে ধরে রাখে তবে তাকে নিশ্চয়ই ভগবান বলা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ড মোহিত করেছিলেন। তাই কেউ যদি যাত্রার আসরে বাঁশি বাজিয়ে আসর মাতিয়ে দেয় তাহলে সে ভগবান বলে নিশ্চয়ই গণ্য হয় না। গোপগৃহে ননী চুরি করে ভগবান ননীচোরা রূপে অর্চিত হতে পারেন। তাই বলে কোন বেড়াল যদি ননী চুরি করে তবে সেও ভগবানের মতো অর্চিত হবে—এমন কখনও নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপী সঙ্গে রাসনৃত্য করেছিলেন। তাই তিনি গোপীনাথ রূপে পূজিত হন। কিন্তু উড়িষ্যার বিষকিশন নামে এক মহা ধুরন্ধর ব্যক্তি নানাবিধ তান্ত্রিক বিদ্যা প্রদর্শন করে নিজেকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় দান করে। যেদিন সে রাসলীলার সূচনা করল অমনি তার পরদিন থেকেই তাকে যাবজ্জীবন কারাবন্দী হয়ে থাকতে হল। ভগবান যুদ্ধক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে তাঁর ভক্ত অর্জুনের রথের সারথী রূপে আসেন তখন তাঁর লৌকিক হিসাবে বয়স ছিল একশ পঁচিশ বছর। তখন যদুবংশের বিস্তার হয় অর্থাৎ কৃষ্ণের অনেক পুত্র-পৌত্রাদি থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণকে একজন নবীন কিশোর যুবকের মতোই দেখাতো। ব্রহ্মসংহিতায় তাই তাঁর বর্ণনা রয়েছে—*নবযৌবনঞ্চ*। তিনি সর্বদাই নব যৌবন সম্পন্ন। কিন্তু কোন মানুষ যদি যৌবন প্রাপ্ত হয় তাহলেই তাকে ভগবান বলা হবে এমন নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। অনেক বাহু অনেক মাথা ইত্যাদি। মায়াবী রাক্ষস রাবণও বহু মাথা দেখিয়েছিল, বাণাসুরের এক হাজার বাহু ছিল। কিন্তু রাবণ বা বাণাসুরকে ভগবান বলতে হবে এমন নয়। ভগবান ইচ্ছা করলে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন। মহিষাসুর নামে এক ভয়ংকর অসুরও ইচ্ছা করলে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারে। তাই বলে মহিষাসুর বা কোনও জোকারকে ভগবান বলা হবে এমন নয়।

কলিযুগে কোন কোন সিদ্ধ যোগীবাবাকে ভগবান জ্ঞানে মূর্খ লোকেরা শ্রদ্ধা পূজা করে চলেছে। কেন না সেই বাবাদের মধ্যে অনেক অলৌকিক গুণ তারা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই গুণগুলি মোটেই ভগবদ্ গুণ নয়, সেগুলি জড় গুণ মাত্র। ভগবানের ভক্তরা কখনই সেই সমস্ত সিদ্ধির প্রতি মোহগ্রস্ত হন না।

ভগবদ্‌ভক্ত প্রহ্লাদকে তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু যখন বলেন—'আমি ভগবান, তুই দ্যাখ্ সমগ্র জগৎটা আমার কর্তৃত্বে রয়েছে।' কিন্তু কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদ বলতে থাকেন—'শ্রীহরিই ভগবান। তিনি হর্তা কর্তা বিধাতা। তাঁর অধীনে তুমি তুচ্ছ নগণ্য জীব মাত্র।'

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা আছে, এই হিরণ্যকশিপুর কাছে স্বর্গের সকল দেব-দেবী নতি স্বীকার করে জয়ধ্বনি দিয়ে হিরণ্যকশিপুকে স্বর্গরাজরূপে পূজা বন্দনা করেছিলেন। হিরণ্যকশিপুর ভয়ে বসুন্ধরা প্রচুর ফল ফুল শস্য দানায় পরিপূর্ণা হয়েছিলেন। কিন্তু সেই হিরণ্যকশিপু নিজেকে ভগবানের মতো মনে করায় অচিরেই ভগবানের হাতে নিহত হল।

তাই আপাত অলৌকিক ক্ষমতা কেউ দেখাতে পারলেই তাকে ভগবান বলে মনে করা কখনই ঠিক নয়।

প্রশ্ন ৭। দেব-দেবী ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ সমস্ত দেব-দেবীর উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান বলছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো* (গীতা) "আমিই চরাচর বিশ্বের সব কিছুর উৎস।" ভগবান উল্লেখ করেছেন—

প্রজাপতিং চ রুদ্রং চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ ।
তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়া বিমোহিতৌ ॥

অর্থাৎ, "প্রজাপতিরা, রুদ্র এবং অন্য সকলকেই আমি সৃষ্টি করেছি, যদিও তারা তা জানে না। কারণ, তারা আমার মায়াশক্তির দ্বারা বিমোহিত।" (মোক্ষধর্ম)

ভগবানকে বলা হয় 'অসমোর্ধ্ব' অর্থাৎ, কেউই তাঁর সমান নয়, কেউই তাঁর উর্ধ্বেও নয়। ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। সমস্ত দেব-দেবী তাঁর অধীন ভৃত্য মাত্র। দেব-দেবীরা বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সমস্ত ক্ষমতার উৎস স্বয়ং ভগবান। ভগবানই তাঁদের সেই ক্ষমতা দিয়েছেন। দেব-দেবীরা প্রত্যেকেই ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল।

প্রজাপতি ব্রহ্মা, মহাদেব শিব সর্বদাই ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করেন। জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্র থেকে চিরমুক্তি একমাত্র ভগবানই দিতে পারেন, কোনও দেব-দেবী তা দিতে পারেন না। জড় অনিত্য বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে লোকে দেব-দেবীর আরাধনা করে।

শ্রীঅর্জুনকে ভগবান বলছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । (গীতা ১৮/৬৫)

"সব রকম ধর্ম বাদ দিয়ে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও।"

ভগবান আরও বলেছেন—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।

"যাদের মন জড় কামনা বাসনার দ্বারা বিকৃত হয়ে গিয়েছে, তারাই অন্য দেব-দেবীর শরণাগত হয়।" (গীতা ৭/২০)

শ্রীপদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে, যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেব-দেবীর সমান বলে মনে করে—এমন কি ভগবানকে যদি ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, কালী ইত্যাদি মহা মহা দেব-দেবীদের সমান বলে মনে করে, তা হলে তখনই সে একজন ভগবদ্‌বিদ্বেষী মহা নাস্তিকে পরিণত হয়।

পুরাকালে রাজর্ষি খট্টাঙ্গ ছিলেন তেত্রিশ কোটি দেবতার উপাসক। তিনি সমস্ত দেবতার প্রিয় পাত্র ছিলেন। দেবতাদের বরে খট্টাঙ্গ মহারাজকে কেউই যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারত না। একদিন দেবতাগণ তাঁকে কোনও বর প্রার্থনা করতে বললে খট্টাঙ্গ মহারাজ তাঁর আয়ুষ্কাল কত তা আগে জানতে চাইলেন। দেবতাগণ বললেন তাঁর আয়ু আর এক মুহূর্তকাল মাত্র বাকী। তখন তিনি আর কালক্ষেপ না করেই দেবতাদের দেওয়া বিমানযোগে আপন রাজধানীতে ফিরে গিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, দেবতারা তাঁর জড়

কামনা পূরণ করবেন বটে, কিন্তু তাতে কোনও নিত্য মঙ্গল লাভ নেই। আসল কাম্য হচ্ছেন ভগবান শ্রীহরি।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৮/১৬/২০) দেখা যায়, দৈত্যদের দ্বারা বিপন্ন সমস্ত দেবতাদের মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্যে দেবমাতা অদিতিকে তাঁর পতি মহর্ষি কশ্যপ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভজনা করতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৫) বলা হয়েছে, দেবতার উপাসকগণ স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারেন। অনিত্য স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারেন। কিন্তু যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা চিন্ময় জগৎ অর্থাৎ, বৈকুণ্ঠে বা গোলোকধামে নিত্য গতি লাভ করতে পারেন।

প্রত্যেক জীব ভগবানের নিত্য দাস। 'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।' যতক্ষণ পর্যন্ত জীব তার এই নিত্য স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারছে, যতক্ষণ পর্যন্ত জীব সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে না জানছে, ততক্ষণ তাকে নানা যোনি ভ্রমণ করে দুঃখময় ভব সংসারে পতিত হতে হবে। ভগবান বলেছেন—

অহং হি সর্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

"আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যারা আমার চিন্ময় স্বরূপ জানে না, তারা পুনঃপুনঃ সংসার সমুদ্রে অধঃপতিত হয়।" (গীতা ৯/২৪)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, মহান দেব-দেবীদের অবজ্ঞা করা কারও উচিত নয়। এটাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। যথা—'অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে।' পরমারাধ্য পরমেশ্বর ভগবানের দাসদাসী হিসাবে তাঁদের শ্রদ্ধা করা উচিত। ব্রহ্মা শিবাদি পরম বৈষ্ণবদের চরণে অপরাধ করলে হরিভক্তি নষ্ট হয়। কারণ তাঁরা সর্বদা শ্রীহরির আরাধনায় ব্যাপৃত। সর্বব্যাপী সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবানকে প্রতিনিয়ত কায়মনোবাক্যে আরাধনা করাই ভক্তের লক্ষণ।

প্রশ্ন ৮। বৈষ্ণবগণ দেব-দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করেন না কেন?

উত্তর ঃ মহান বৈষ্ণব শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'জৈবধর্ম' গ্রন্থে এই সম্পর্কে পরিষ্কার কথা উল্লেখ রয়েছে—"বৈষ্ণবগণ অপর দেব-দেবীর প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন না। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরমেশ্বর। অন্যান্য দেব-দেবী তাঁহার অধিকৃত ভক্ত। ভক্তপ্রসাদে শ্রদ্ধা ব্যতীত বৈষ্ণবের অশ্রদ্ধা নাই। ভক্তপ্রসাদ গ্রহণে শুদ্ধ ভক্তি লাভ হয়। ভক্তদিগের পদরজঃ, ভক্তদিগের চরণামৃত ও ভক্তদিগের অধরামৃত—এই তিনটি পরম উপাদেয় বস্তু। মূল কথা এই যে, মায়াবাদী যে দেবতারই পূজা করুন ও অন্নাদি যে দেবতাকেই অর্পণ করুন, মায়াবাদনিষ্ঠাদোষে সেই দেবতা, সেই পূজা ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন না। ইহার ভূরি ভূরি শাস্ত্র প্রমাণ আছে। অন্য দেবপূজকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাঁহাদের প্রদত্ত দেবপ্রসাদ লইলে ভক্তির হানি হয় ও ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি কৃষ্ণার্পিত প্রসাদান্ন অন্য দেব-দেবীকে দেন, সেই দেব-দেবী বড় আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাঁহার প্রসাদও

বৈষ্ণব জীবমাত্রেই পাইয়া আনন্দলাভ করেন। শাস্ত্র আজ্ঞাই বলবান। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যোগাভ্যাসী ব্যক্তি কোন দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না—ইহাতে বলা যাইতে পারে না যে, যোগাভ্যাসী ব্যক্তি অন্য দেবতার প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন। যোগ কার্য্যে প্রসাদ পরিত্যাগ একান্ত ধ্যানের উপকার হয়। তদ্রূপ ভক্তিসাধনে উপাস্যদেব ব্যতীত অন্য দেবের প্রসাদাদি লইলে অনন্যভক্তি সাধিত হয় না। ইহাতে অন্য দেব-দেবীর প্রসাদে যে কেহ অশ্রদ্ধা করে, এরূপ নয়, শাস্ত্র-আজ্ঞা মতে আপন আপন প্রয়োজন সিদ্ধিতে যত্ন করে, এইমাত্র জানিবেন।" (দশম অধ্যায়, নিত্যধর্ম ও ইতিহাস)।

প্রশ্ন ৯। কিভাবে ভগবানকে দেখা যায়?

উত্তর ঃ সূর্যকে দেখতে হলে যেমন সূর্যের আলোতেই সূর্য দর্শন করতে হয়, তেমনই ভগবানের কৃপাতেই ভগবানকে দেখা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ১০। কালী ও কৃষ্ণ কি এক?

উত্তর ঃ না। কালী ও কৃষ্ণ এক নয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর অনন্ত শক্তি রয়েছে। তার মধ্যে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া দুর্গার একটি উগ্র প্রকাশ হচ্ছেন দেবী কালী। জড় বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধনকারিণী দুর্গা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হন। (*ব্রহ্মসংহিতা*) শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র প্রভু, আর সকলে তাঁর ভৃত্য মাত্র।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫/১৪২)

ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, কালী—সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য। কালী ও কৃষ্ণ কখনই এক নয়। শাস্ত্রে ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

কৃষ্ণ—সূর্যসম, মায়া হয়—অন্ধকার।
যাহা কৃষ্ণ, তাহা নাহি মায়ার অধিকার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৩১)

আলো ও অন্ধকার—দুটি বিপরীত বিষয়। আলোর আবির্ভাবে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, তেমনই কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে জাগ্রত হলে মায়ার বৈভবের প্রতি আগ্রহ দূর হয়। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া মানুষের বুদ্ধি বিশুদ্ধ নয়। *"বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"* (চৈঃ চঃ মধ্য ২২/২৯) যখনই জীব কৃষ্ণভক্তি বিমুখ হয়, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব ভুলে যায়, তখনই বহিরঙ্গা মায়াদেবী সেই জীবকে নানা প্রকারে প্রলুব্ধ ও বিমোহিত করে তাকে ত্রিতাপ-দুঃখ দিয়ে এই জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্রে বেঁধে রাখেন। যার ফলে বদ্ধ জীবের পক্ষে ভোগবাসনারূপ মায়িক শৃঙ্খলের বন্ধন থেকে ত্রাণ পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'কৃষ্ণ-নিত্যদাস'—জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তারে গলায় বান্ধিল॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/২৪)

কিন্তু, সে যদি মায়াদেবীর এরূপ ক্লেশপূর্ণ সংসারে আবর্তিত হতে না চায়, তবে তাকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকার করতে হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।

যারা আমার চরণে প্রপত্তি স্বীকার করে, তারা এই মায়ার কবল থেকে রেহাই পেতে পারবে। (গীতা ৭/১৪)

কিন্তু মায়া যাদের জ্ঞান বুদ্ধি হরণ করেছেন তারা কৃষ্ণভক্ত হতে চায় না। শ্রীঅর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, চার ধরনের মানুষ আছে যারা কৃষ্ণভজন করে না।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

অর্থাৎ মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার (শ্রীকৃষ্ণের) শরণাগত হয় না।" (গীতা ৭/১৫)

মহামায়ার সংসারে নানাবিধ ভোগবাসনা চরিতার্থ করবার আশায় এই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কৃষ্ণবহির্মুখ আচরণ করে এবং সাড়ম্বরে মহামায়া দুর্গা বা কালী পূজার উদ্দেশ্যে নানা আয়োজনে উদ্যোগী হয়।

সাধারণত চোর-ডাকাতেরা মহামায়ার ভয়ংকরী রূপ চণ্ডী, কালী ইত্যাদি দেবীর পূজা করত। তারা মদ্যপায়ী, অন্যান্য নেশাদ্রব্যে আগ্রহী এবং মাংসপ্রিয়। বিভিন্ন কামনা-বাসনা দোষে তাঁরা মুক্তিদাতা মুকুন্দ শ্রীহরির প্রতি বিমুখ হয়ে দুর্গা, চণ্ডী কিংবা কালীর ভক্ত হয়। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।* (গীতা ৭/২০) যাদের মন জড় কামনা-বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে নানা দেব-দেবীর শরণাগত হয়। কিন্তু জাগতিক কামনা-বাসনা কৃষ্ণভক্তের কাছে ভক্তিপথের প্রতিবন্ধক।

দেব-দেবীর উপাসকেরা দেব-দেবীদের বিভিন্ন দেবলোকে উন্নীত হয় এবং যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত তারা কৃষ্ণলোকে উন্নীত হয়। *দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি* (গীতা ৭/২৩) তাই কালীভক্ত ও কৃষ্ণভক্তের গতি কখনই এক নয়। বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা এবং কৃষ্ণভক্তি কখনই এক পর্যায়ের নয়। কারণ দেবোপাসনা হল জড়জাগতিক বা প্রাকৃত, আর কৃষ্ণভক্তি হল সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত, চিন্ময়। দেবীধাম অনিত্য পরিবর্তনশীল। কিন্তু কৃষ্ণধাম নিত্য চিরশাশ্বত।

যাদের বুদ্ধি অল্প তারা দেব-দেবীর আরাধনা করে। তাদের আরাধনা লব্ধ ফলও অস্থায়ী। *অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্* (গীতা ৭/২৩)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ পুরুষ। দেব-দেবীরা তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকণা, যেমন অন্যান্য সমস্ত জীবই ভগবানের ক্ষুদ্র অংশ। দেব-দেবীদের সমস্ত ক্ষমতা ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া। ভগবদ্‌কৃপা বিনা দেব-দেবীদের কোনও ক্ষমতা থাকে না। প্রজাপতি ব্রহ্মা, মহাদেব শিব, সব সময়েই ভগবানের নাম জপকীর্তন করছেন। শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করছেন।

দেবর্ষি শ্রীনারদ সর্বদা কৃষ্ণনাম কীর্তন করছেন। দেবী দুর্গা স্বয়ং কৃষ্ণভজনের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় বদ্ধ জীবের দুর্গতি ঘোচে না। (নারদ পঞ্চরাত্রম্ ৪/৩/২০৫দ্রঃ)

মায়াবাদীরা জগতে অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, জীবই শিব, কালী ও কৃষ্ণ এক, ভগবান এবং সব দেব-দেবী এক, অর্থাৎ সবই ভগবান। প্রকৃতপক্ষে এই কথাগুলি অপরাধমূলক এবং নাস্তিক ভোগীদেরই কথা।

অনেকে আবার যুক্তি খাড়া করে যে, শ্রীকৃষ্ণও কালীরূপে লীলা করেছিলেন। কথাটি ঠিক যে, শ্রীকৃষ্ণও কালীরূপে লীলাবিলাস করেছিলেন কৃষ্ণবহির্মুখ ব্যক্তিদের বিমোহিত করবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্নরূপ ধারণ করতে পারেন কিন্তু তিনি কালী নন। শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন অবতারে মৎস্য, কূর্ম কিংবা শূকর ইত্যাদি রূপ ধারণ করতে পারেন, তাই বলে বিশেষ মৎস্য কূর্মাদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে মনে করাটা নির্বুদ্ধিতা।

প্রশ্ন ১১। ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন দুর্গা, শিব, কালী ইত্যাদি দেব-দেবীদের ত্রিনয়ন দেখা যায়, তাঁরা ত্রিনয়ন দিয়ে দর্শন করেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য-স্বরূপ। কিন্তু সর্বক্ষমতাসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের ত্রিনয়ন কেন থাকে না?

উত্তর ঃ নয়ন সংখ্যা দিয়ে কারও ক্ষমতা বিচার করা ঠিক নয়। দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের ছিল এক সহস্র নয়ন। তাঁর সর্বাঙ্গ ছিল নয়নে ভরা। কিন্তু তিনিও মাঝে মাঝে অসুরদের উৎপাত দেখে ভয়ে স্বর্গসিংহাসন ছেড়ে দিয়ে লুকিয়ে যেতেন। লঙ্কেশ্বর রাবণের ছিল দশ মাথা অর্থাৎ বিশ নয়ন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তাকে প্রাণ হারাতে হয়।

সমস্ত দেব-দেবীই পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া শক্তিতেই ক্ষমতাশালী। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বান্তর্যামী সর্বক্ষমতার উৎসস্বরূপ। শ্রীব্রহ্মা তাঁর স্তুতি করতে গিয়ে বলছেন, '*সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি*' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে কোনও ইন্দ্রিয় দিয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সর্ব কার্য করতে পারেন। তিনি সর্ব ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। তাঁর মধ্যে কোনও অভাব নেই। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আবার, বিশ্বরূপ দর্শনকালে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন যে, অসংখ্য সূর্যচন্দ্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের অগণিত নয়ন।

প্রশ্ন ১২। ভগবান কি সত্যিই আছেন? আমরা কেন ভগবানকে দেখতে পাই না?

উত্তর ঃ এই অদ্ভুত প্রশ্নটি ঠিক এই রকম যে, 'রাষ্ট্রপতি কি সত্যিই আছেন? আমরা কেন রাষ্ট্রপতিকে দেখতে পাই না?—উত্তর হল, রাষ্ট্রপতির ঠিকানা জেনে তাঁর কাছে উপনীত হতে হবে, নতুবা কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি যদি আমাদের দৃষ্টিপথের গোচরে আসেন, তবে দেখতে পাওয়া যাবে।

কিন্তু দেখতে পেলেই যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে—নতুবা তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না—এরূপ মনে করাটা নিদারুণ মূর্খতা। এই জগতে এবং এই জগতের বাইরে এমন অনন্ত বস্তু রয়েছে, যেগুলি কোন দিনই আমরা দেখিনি বা দেখবই না। অগণিত গ্রহ-

নক্ষত্র, বিদেশের নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সাহারা মরুভূমি, প্রশান্ত মহাসাগর—বহু কিছু আমরা দেখিনি। অথচ নিঃসন্দেহে সেগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করি। কেবল বই পড়ে, শোনা কথায়, মানচিত্র বা ছবি দেখে বিনা চাক্ষুষ প্রমাণে আমরা সেগুলির অস্তিত্ব বিশ্বাস করি। অথচ, পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের কথা বেদশাস্ত্র পড়ে, ভক্ত মুখে শুনে, ভগবানের চিত্র দর্শন করেও অতীব গণ্ডমূর্খের মতো ভগবানের অস্তিত্ব আমরা বিশ্বাস করতে চাই না।

পরমেশ্বর ভগবান বলছেন *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—(গীতা) ভক্তির দ্বারা আমাকে জানতে পারবে। *ভক্তিবিলোচনেন*—(ব্রহ্মসংহিতা) ভক্তিচক্ষুতে ভগবান দর্শন হয়। এই জড় বুদ্ধি—জড় চক্ষুতে ভগবানকে দেখা যায় না। জড় বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে প্রচলিত ভাষায় ইডিয়ট্ বা জড়ধী বলা হয়। ভগবানের অস্তিত্ব আমাদের দেখা বা না দেখার উপর নির্ভর করে না।

প্রশ্ন ১৩। ভগবান কি সমস্ত কিছুরই পরম কারণ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ভগবান যে সমস্ত কিছুর পরম কারণ এই কথাটি যে ব্যক্তি বুঝতে পারবেন তিনি অবশ্য ভগবদ্ পাদপদ্মে শরণাগত হবেন। এই কথাই গীতায় বলা হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

অর্থাৎ, বহু বহু জন্মের পর যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত কিছুর পরম কারণ জেনে তাঁর শরণাগত হন। কিন্তু জগতে সেরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

এই জগতে উল্টোটাই মানুষ গ্রহণ করছে, তারা মনে করছে ভগবান যেহেতু সবকিছুরই পরম কারণ, অতএব আমরা সবরকমের অনাচার করে যাব, আর পরম-কারণস্বরূপ ভগবানই তার জন্য দায়ী হবেন। এই ধরনের ভাবাপন্ন জ্ঞানহীন মূর্খেরা কখনই ভগবানের শরণাগত হয় না। কেবল জ্ঞানের অনর্থক বড়াইটাই তাদের সম্বল হয়।

প্রশ্ন ১৪। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, "কামনা-বাসনা ত্যাগ করে যিনি আমার ভজনা করেন তাঁর পুনর্জন্ম হয় না।" ভগবান বলছেন, "কর্ম করে যাও, ফলের আশা করবে না।" কিন্তু আমি ভগবদ্ধামে যাওয়ার আশা নিয়েই তো কৃষ্ণভজনা শুরু করলাম। এটা কি কামনা-বাসনা নয়?

উত্তর ঃ কামনা-বাসনাহীন জড় পিণ্ডের মতো হতে ভগবান আমাদের বলছেন না। আমাদের কি বাসনা করা উচিত এবং কি বাসনা করা উচিত নয়, সেই সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পরিষ্কারভাবেই উল্লেখ করেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

(শিক্ষাষ্টক, শ্লোক ৪)

"হে জগদীশ্বর ভগবান! আমি জড়-জাগতিক সুখভোগ চরিতার্থ করবার জন্য ধন, জন, কিংবা সুন্দরী রমণী কামনা করি না; আমি কেবলমাত্র এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে তোমার শ্রীচরণপদ্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক।"

কিন্তু জড় বদ্ধ মানুষ সাধারণত লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা যশ ধন জন সুন্দরী স্ত্রীলাভের কামনা-বাসনা নিয়েই কর্ম করে। যার ফলে এই দুঃখময় ভবচক্রে তাকে বারে বারে জন্ম মৃত্যু গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভক্তি নিত্যকালের জন্যই কামনা করা সমুচিত। যার ফলে মানুষ ভবচক্র উত্তীর্ণ হয়ে নিত্যধামে গতি লাভ করতে পারবে। তাকে আর এই দুঃখময় জগতে জন্ম নিতে হয় না। অতএব অহৈতুকী ভক্তি সর্বদা কামনা করা উচিত।

প্রশ্ন ১৫। দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন কতিপয় মানুষের জন্য শাস্ত্রে অনুমোদিত। তাহলে যে সমস্ত বড় বড় ব্যক্তি দুর্গা বা কালীর পূজা করছেন তারা কি স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন? তাছাড়া পুরাকালে মহিষাসুরকে বধ করবার জন্য মা দুর্গা ধরাতে অবতীর্ণ হন এবং যার আহ্বায়ক ছিলেন স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, মহাদেব। তাহলে তাঁরাও কি স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন?

উত্তর ঃ দুর্গা বা কালীকে শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা ও মহাদেব এসে পূজা অর্চনা করছেন এমনটি কোথাও দেখা যায় না। দুর্গাকে যদি কেউ আহ্বান করে তবে তাতেই আহ্বায়ক স্বল্পবুদ্ধি হয়ে পড়বেন এরকম কথার কোন যুক্তি হয় না। প্রভু যদি কোন ভৃত্যকে ডাকে তাতে প্রভুর প্রভুত্ব চলে যায় না। শ্রীব্রহ্মা বলছেন, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে দুর্গাদেবী কাজ করে চলেন।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ, "চিৎশক্তির ছায়াস্বরূপা প্রপঞ্চের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধিনী ভুবনপূজিতা দুর্গা যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৪)

স্বল্পবুদ্ধি তাদেরই বলা হয় যারা কৃষ্ণ, ব্রহ্মা বা মহাদেবের নির্দেশকে অবজ্ঞা করে। যেমন, মহাদেব শিব দেবী পার্বতীকে বলছেন যে, কলিকালে একমাত্র কৃষ্ণভজন পরায়ণ ব্যক্তিরাই ধন্য।

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্বধর্ম বিবর্জিতাঃ।
বাসুদেবপরা মর্ত্যাস্তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥

"ঘোর কলিযুগ সমাগত হলে সর্বধর্ম বিবর্জিত হলেও বাসুদেব পরায়ণ মর্ত্যগণ অর্থাৎ এই জগতের কৃষ্ণভক্তগণই নিঃসংশয়ে কৃতার্থ হয়ে থাকেন।" (পদ্মপুরাণ)

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভজন করে না সে সমস্ত পাপাচরণই করছে।

স কর্তা সর্বধর্মানাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্তা সর্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥

"হে কেশব (কৃষ্ণ)! যিনি তোমার ভক্ত, তিনি সর্বধর্মেরই অনুষ্ঠাতা। হে অচ্যুত! কিন্তু যিনি তোমার ভক্ত নন, তিনি সর্ব পাপের অনুষ্ঠানকারী।" (স্কন্দ পুরাণ)

সদাশিব নারদমুনিকে বলছেন, ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ আরাধ্য নেই।

ভুবনে সর্বলোকানাং নারাধ্যো বৈ হরিং বিনা।
ভবার্ণবচ্ছিন্ন কোহপি সর্বকামদকামদঃ॥

"এই ভুবনে সকল লোকের ভগবান শ্রীহরি ছাড়া নিশ্চিতভাবে আর কেউ আরাধ্য নেই। যে কোনও সর্বকামদাতা দেবতার অভিষ্টদাতাই হচ্ছেন শ্রীহরি। ভবসমুদ্রের ছেদনকর্তা অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর সংসার-বন্ধনরূপ পুনঃপুনঃ আবর্তনের ছেদনকারী শ্রীহরি বিনা অন্য কেউ নেই।" (পদ্মপুরাণ)

গীতায় বলা হয়েছে, যাদের বুদ্ধি কামনা বাসনা দ্বারা বিগড়ে গেছে, তারাই ভগবানকে বাদ দিয়ে অন্য দেব-দেবীর শরণাগত হয়।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্য দেবতাঃ।
তং তং *নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥*

"যাদের মন জড় জাগতিক কামনা-বাসনার দ্বারা বিকৃত হয়ে গেছে তারা অন্য দেব-দেবীর শরণাগত হয়। তাদের নিজ স্বভাব অনুসারে তারা নিয়ম পালন করে দেব-দেবীর উপাসনা করে।" (গীতা ৭/২০)

মহাভারতে লিখিত আছে যে, বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যারা অন্য দেব-দেবীর পূজা করছে তারা সোনা-হীরা ফেলে দিয়ে ছাই-পাঁশ নিচ্ছে।

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥

"যে ব্যক্তি মোহবশত শ্রীবিষ্ণুকে বাদ দিয়ে অন্য দেব-দেবীর উপাসনা করে, সে স্বর্ণরাশি ফেলে ছাই-পাঁশ নিতে ইচ্ছা করে।" (হরিবংশ পর্ব)

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যারা অন্যের উপাসনা করছে, তারা ভবসংসার উত্তরণের অযোগ্য।

যথা ধৃত্বা শুনঃ পুচ্ছং তর্তুমিচ্ছেৎ সরিৎপতিম্।
তথা ত্যক্ত্বা হরিং সেবামন্যোপাসনয়া ভবম্॥

"মূর্খ মানুষ কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হতে ইচ্ছা করে, সেই রকম সেব্য ভগবান শ্রীহরিকে ত্যাগ করে অন্যের উপাসনা বলে জন্ম-মৃত্যুর ভব সংসার উত্তীর্ণ হতে চিন্তা করে।" (পদ্মপুরাণ) শ্রীমদ্ভাগবতেও (৬/৯/২) অনুরূপ কথা বলা হয়েছে।

অতএব কৃষ্ণ, ব্রহ্মা বা মহাদেব স্বল্পবুদ্ধি নন। স্বল্পবুদ্ধি হচ্ছে তারা, যারা কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে কালী, দুর্গা পূজা করছে। অবশ্য কৃষ্ণকে না পূজা করে কেউই কালী, দুর্গা পূজা করতে সাহস করে না। কৃষ্ণ বা নারায়ণশিলা বা শালগ্রামকে সর্বাগ্রে পূজা করা হয়। তারপর দুর্গাপূজা করাই দুর্গাপূজক ব্রাহ্মণদের বিধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কথাও অনেকেই জানেন।

কিন্তু শালগ্রাম পূজা করার যোগ্য তারাই, যারা রক্ত-মাংস হাড়-পিত্ত ভক্ষণ করে না। শালগ্রাম কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর প্রকাশ। তার উপাসক বলতে বোঝায় বৈষ্ণব। তাই রক্তমাংস-ডিমভোজী ব্যক্তির বিষ্ণুপূজা ধর্মনীতি-বিরুদ্ধ কর্ম। সেই কথা ভাগবতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৬। বেদে কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে, বেদে তো ভগবানকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ 'বেদ' কথাটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হন শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে। অথর্ব বেদে সেই কথা বলা হয়েছে—*যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ।* অর্থাৎ, "ব্রহ্মা, যিনি পূর্বকালে জগতে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞান তিনি সৃষ্টির আদিতে যাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত হন তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।"

মহর্ষি ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পুরুষোত্তম যোগ অধ্যায়ে (১৫/১৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বিবৃত করেছেন—

বেদৈশ্চ সর্বৈঃ অহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥

"আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য বিষয়, আমি সমস্ত বেদান্ত কর্তা ও বেদবেত্তা।"

ঋক্ বেদে বলা হয়েছে—

ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণো হা উ কর্মাদিমূলং কৃষ্ণঃ স হ সর্বৈকার্যঃ কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ কৃষ্ণোঽনাদিস্তস্মিন্ অজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী॥

অর্থাৎ, "শ্রীকৃষ্ণই সৎ, চিৎ ও আনন্দঘন শ্রীবিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণই আদি পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কর্মের মূল, সর্বকার্যের উৎস। শ্রীকৃষ্ণ সকলের একমাত্র প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইত্যাদি ঈশ্বর প্রমুখ দেবগণের প্রভু এবং পূজ্য। শ্রীকৃষ্ণ আদিরও আদি (অনাদি)। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে যত মঙ্গল, কৃষ্ণসেবক কৃতী ব্যক্তি সেই সমস্ত মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণেই লাভ করে থাকেন।"

এই রকম ভুরি ভুরি শাস্ত্রবাক্যের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর রূপে বেদে উল্লেখ থাকলেও বর্তমান কলিযুগের দুর্বুদ্ধি ও হীনবুদ্ধি মানুষেরা পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান না বলে নাকি 'জীবই ভগবান', 'মানুষই ভগবান', 'বৈজ্ঞানিকই ভগবান', 'কালী দুর্গা ভগবান', 'নিরাকার ব্রহ্মই ভগবান', 'অমুক বাবা ভগবান', 'তমুক যোগী

ভগবান', 'আমি ভগবান'—এইভাবে অসংখ্য মনগড়া গাদা গাদা ভগবানকে আবিষ্কার করে চলেছে। এমন কি কলিযুগের মানুষের মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, বেদে শ্রীকৃষ্ণের কথা নাও থাকতে পারে। এখনও কলির বাবা ঠাকুর অনেক গজিয়েছেন। তাদের কথাও নাকি বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে বলে অনেকে দাবিও করছেন যে, সেই বাবাগুলি নাকি ভগবান এবং তারা নাকি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ নম্বরের অবতার। অর্থাৎ কৃষ্ণকে ভগবান রূপে স্বীকার করলেও কতকগুলো যোগীবাবার অন্যতম তাদের দেখা বাবাকে ভগবান বলে মানুষের বদ্ধ ধারণা আছে, যতই সেই বাবা অভক্ত হন না কেন। প্রকৃতপক্ষে সর্ববেদে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলা হয়েছে। অন্য কাউকে নয়। ব্রহ্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গজ্যোতি মাত্র।

প্রশ্ন ১৭। পিতা যদি সব সময় পুত্রের সঙ্গে থাকে, তবে কেন সেই পুত্র কুপথে যায় এবং কর্মফলের ভাগী হয়? পিতা কি তবে তাকে সুপথে চালাতে পারে না?

উত্তর ঃ পিতা সর্বদা সঙ্গে থাকলেও পিতাকে অগ্রাহ্য করার মতো মানসিকতা পুত্রের জন্মাবে না, এমন নয়। যেমনটি কৃষ্ণবিমুখ মানসিকতা হওয়ার ফলে এই দুঃখময় সংসারে আমরা পতিত হয়েছি। আবার যখন মায়ার দণ্ড পেয়ে শিক্ষা হবে তখন পিতার অবাধ্য মানসিকতা ছেড়ে পিতার অনুগত হব। তার ফলে পুনরায় সুপথে চালিত হব। অতএব ভাল মন্দ সব কর্মফলের ভাগী নিজেকেই হতে হয়। পিতা সর্বনিয়ন্ত্রক হলেও পুত্রদেরকে একেবারেই যন্ত্রের মতো করে নিজের আয়ত্তে রাখেন না, একটু স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা অর্থাৎ নিজ নিজ ইচ্ছামতো ঘুরবার সুযোগও দিয়েছেন। আপনি কি চান যে আপনার পিতা অনবরত আপনার হাত দুটো শেকলে বদ্ধ হওয়ার মতো ধরেই থাকুন? না, এমনটি কেউ চাইতে পারে না। সুতরাং পিতার পরিচালনায় কোনও বিশৃঙ্খলা বা ঢিলেমি নেই তা মহান মহান ঋষিবৃন্দও ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রশ্ন ১৮। তেত্রিশ কোটি দেবতাদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অন্যান্য দেবদেবীদের প্রতি নববিধা ভক্তি দ্বারা আরাধনা করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ স্বর্গলোকে দেবদেবীরা থাকেন। সেই স্থান এই জড় জগতের মধ্যেই, পৃথিবী থেকে মাত্র কয়েক হাজার যোজন মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে বৈকুণ্ঠ জগতের সর্বোচ্চ লোক 'গোলোক' নামে চিন্ময় গ্রহলোকে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান। কোনও দেবদেবী ভগবান নন। দেবদেবীরা ভগবানের ভৃত্য মাত্র। কৃষ্ণের অনুমোদন ব্যতীত তাঁদেরও কোনও ক্ষমতা নেই।

স্কন্দ পুরাণে ব্রহ্মা-নারদসংবাদে বলা হয়েছে—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবামুপাসতে ।
ত্যক্তামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষম্‌ ॥

"যে মূর্খ শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অন্য দেবতার উপাসনা করে সে অমৃত বাদ দিয়ে বিষপান করছে।"

মহাদেব পার্বতীকে বলছেন—

দেবতাঃ পিতরঃ সর্বে শিবে পূজ্যাঃ প্রযত্নতঃ ।
ন্যূনাঃ স্যুর্নিষ্ফলং কেচিৎ গৃহিভির্যাদি কর্মসু ॥

"হে কল্যাণময়ী দুর্গে, গৃহী ব্যক্তিরা সমস্ত দেবতা ও পিতৃপুরুষকে অতি যত্নে পূজা করবে। কিন্তু যদি দেবতা বা পিতৃগণের মধ্যে কেউ পূজিত হলেন, কেউ অপূজিত থাকলেন—তা হলে সেই গৃহীর সমস্ত পূজাকর্মই নিষ্ফল।"

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হলে গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার মতো সমস্ত শাখাপ্রশাখারূপ দেবদেবীদেরকে আলাদা করে জল দেওয়ার বা পূজা করার প্রয়োজন পড়ে না। বৃক্ষমূলে জল দিলে যেমন আপনাআপনি শাখাপ্রশাখাদিতে জল দেওয়া হয়ে যায় তেমনই কৃষ্ণপূজাতেই সবারই পূজা হয়ে যায়। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে বলছেন *মাম্‌ একং শরণং* (গীতা ১৮/৬৬) একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যারা কৃষ্ণকে ছেড়ে বহু দেবদেবীর পূজা করছে, সেখানে ভগবান বলছেন তারা বিধিহীন হয়ে পূজা করছে *যজন্তি অবিধিপূর্বকম্‌* (গীতা ৯/২৩)

প্রশ্ন ১৯। শিব দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবীর পূজা না করে কেবল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলে দেবদেবীরা অসন্তুষ্ট হন কিনা?

উত্তর ঃ শিব ঠাকুর বলছেন, "শ্রীকৃষ্ণ যাঁর প্রতি প্রসন্ন হবেন, ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনিই ধর্ম-উপদেষ্টা ও ধার্মিক বলে পরিগণিত হবেন।" (মহাভারত অনুশাসনপর্ব ১৪৭ অধ্যায়)

প্রশ্ন ২০। পরাশক্তি, হ্লাদিনী শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি ও অন্তরঙ্গা শক্তি কি?

উত্তর ঃ পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গে যে শক্তি রয়েছেন, সেই শক্তিকেই অন্তরঙ্গা বা পরাশক্তি বলা হয়। এই শক্তির মাধ্যমে ভগবান নিজ বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপ বৈভব প্রকাশ করেন।

আর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে জড় মহাবিশ্ব প্রকাশ করেন।

অন্তরঙ্গা বা পরাশক্তিকে ভগবানের স্বরূপ শক্তি বলা হয়। এই শক্তি তিন ভাগে ব্যাখ্যা করা হয়। যথা সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। এই তিন শক্তিকে নিয়ে ভগবান সচ্চিদানন্দময়। সৎ-চিৎ-আনন্দ। সৎ বা নিত্যবর্তমান, অর্থাৎ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কাল মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধীন নন। তিনি চির শাশ্বত নিত্য। ভগবানের এই শক্তিকেই বলে সন্ধিনী। *চিৎ* বা জ্ঞানময়, তিনি অদ্বয় স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত। ভগবানের এই শক্তিকেই বলে সম্বিৎ। *আনন্দ* বা আনন্দময় তিনি। ভগবানের নিত্য আনন্দময়ী শক্তিকে বলে হ্লাদিনী।

শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি। এই আনন্দদায়িনী শক্তি ভক্তগণের মধ্যে কৃষ্ণসেবানন্দ প্রদান করে থাকেন।

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছেন দুর্গাদেবী। তিনি পরাশক্তির ছায়ারূপা। তিনি কৃষ্ণভক্তি বিমুখ ব্যক্তিদের জড়জগতে শাসন করবার জন্য নিযুক্তা।

প্রশ্ন ২১। ভগবান কি মানুষের মধ্যে আছেন?

উত্তর ঃ ভগবানের তিনটি প্রকাশ, *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি কথ্যতে।* প্রথমত, ভগবানের অঙ্গজ্যোতি ব্রহ্ম সর্বত্রই অণুপরমাণুতে বিরাজমান। দ্বিতীয়ত, পরমাত্মারূপে ভগবান সবার হৃদয়ে আছেন। এরকম নয় যে, কেবল মানুষের মধ্যেই আছেন—আর কোনও জীবের মধ্যে নেই। তৃতীয়ত, স্বয়ংরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের সর্বোচ্চ লোক গোলোক ধামে আছেন।

ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে করতে ভগবানের কৃপা অনুসারে ভগবদ্ উপলব্ধি হয়। মানুষের মধ্যে ভগবান রয়েছেন বলতে এমন নয় যে, মানুষকে কেটে ফেললেই ভগবান বেরিয়ে আসবেন, কিংবা এমন নয় যে মানুষই ভগবান। না, তা কখনও নয়। ভগবান সবার হৃদয়ে পরমাত্মারূপে থাকলেও ভগবানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার মতো কলুষিত চেতনাসম্পন্ন জীবও এই জড় জগতে কম নেই।

ভগবান সর্বত্র এবং সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে থাকলেও, ভগবানের কোনও প্রিয় অপ্রিয় না থাকলেও, ভগবান বলছেন তাঁকে জানতে হলে ভক্তি অনুশীলন করতে হবে। *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—'ভক্তি দ্বারা আমাকে জানতে পারবে'। ভক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।* আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই ভক্তি। কিন্তু যখন আমাদের জীবন ভক্তি-অনুশীলনহীন হয়ে থাকে তখন 'ভগবান আছেন' কিংবা 'ভগবান নেই'—দুই অভিজ্ঞ মতই মূল্যহীন।

প্রশ্ন ২২। নারায়ণ থেকে কৃষ্ণের প্রকাশ, না কি কৃষ্ণ থেকে নারায়ণের প্রকাশ?

উত্তর ঃ কৃষ্ণই আদিপুরুষ। কৃষ্ণের প্রকাশ হচ্ছেন চতুর্ভুজ নারায়ণ।

> কৃষ্ণের প্রকাশ 'নারায়ণ'—শাস্ত্রে কহে।
> নারায়ণ হইতে কৃষ্ণ—হেন বাক্য নহে॥
>
> (শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্য ২/৫৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে, বৃন্দাবনে লোকপিতামহ ব্রহ্মা এসে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করছেন—

> *নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনা-*
> *মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।*
> *নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ*
> *তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥*

হে সর্বেশ্বর, আপনি সর্বজীবের আশ্রয় স্বরূপ নারায়ণ। আমি আপনার থেকে উদ্ভূত হয়েছি। হে অধীশ, আপনার নারায়ণত্বের আরও কারণ রয়েছে, আপনি অখিল-লোকসাক্ষী এবং ত্রিকালজ্ঞ। 'নর' অর্থাৎ জলে 'অয়ন' অর্থাৎ শয়ন যাঁর, তিনিই নারায়ণ।

সেই নারায়ণ হচ্ছেন আপনারই অংশ প্রকাশ। আপনার বিলাস-মূর্তি মাত্র। এ সমস্ত আপনার অচিন্ত্য শক্তির পরিচয় এবং পরম সত্য। এ মায়া নয়। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১৪/১৪)

> জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
> সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ॥
>
> (চৈতন্যচরিতামৃত আদি ৩/৬৯)

প্রশ্ন ২৩। পুরাণ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, ভগবান মানুষ-রাক্ষস-দানবাদির থেকে দেবতাদের প্রতি বেশি করুণাময়। দানব-অসুরাদির থেকে ইন্দ্রাদিদেবগণ তুলনামূলকভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশী দোষী হওয়া সত্ত্বেও ভগবান অসুরদের বধ করেন অথচ দেবতাদের কৃপা করেন। কেন?

উত্তর ঃ কে কম দোষী, কে বেশী দোষী, কাকে ভগবান কিভাবে করুণা করছেন, কোন্ ব্যক্তি দেবশরীর পেয়েছে, কোন্ ব্যক্তি অসুর শরীর পেয়েছে, তারা তাদের কর্মফল কিভাবে কখন ভোগ করছে—সেগুলির তাৎপর্য যদি বিচার করতে থাকেন তা হলে বুঝতে পারবেন ভগবান সবার প্রতিই সমদর্শী।

প্রশ্ন ২৪। দেবদেবীর আরাধনা করলে স্বর্গবাস হয়। সেখানে কি শিশুরূপে জন্ম নিতে হয়? না কি যে বয়সে এখানে মৃত্যু হয় সেই বয়সে সেখানে আবির্ভূত হয়?

উত্তর ঃ দেবদেবীদের আরাধ্য প্রভু ভগবান শ্রীহরির শুদ্ধভক্ত ইচ্ছা করলে স্বর্গ দর্শন করতে করতে হরিধামে উপনীত হতে পারেন। কিন্তু পৃথিবীতে দেবদেবীর আরাধনা করে পুণ্যকর্মা ব্যক্তিকে স্বর্গবাসীদের গৃহে শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্ন ২৫। আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টি গুণ। রামচন্দ্র কত গুণের অধিকারী ছিলেন? রামচন্দ্র ও কৃষ্ণের মধ্যে কি এ ব্যাপারে কিছু পার্থক্য আছে?

উত্তর ঃ রামচন্দ্রের ষাটটি গুণ। কৃষ্ণের অধিক চারটি গুণ হল রূপমাধুরী, বেণুমাধুরী, লীলামাধুরী, প্রেমমাধুরী। শ্রীরামচন্দ্রের রূপ অত্যন্ত অপূর্ব। শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরীর উৎকর্ষতা তাঁর অপেক্ষাও বহুগুণে অধিক।

প্রশ্ন ২৬। যদি কোনও মানুষ এ জগতে নিজেকে ঈশ্বর বলে জাহির করেন, তবে তার কি রকম গতি হবে?

উত্তর ঃ যে মানুষ নিজেকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলে জাহির করেন, তাঁর উদ্দেশ্যে মহাভারতের শান্তিপর্বে মোক্ষধর্মে ১৮০ অধ্যায় ৪৮-৫০ শ্লোকে বলা হয়েছে—*আন্বীক্ষিকীমর্থীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ॥* অর্থাৎ, সেই ধরনের মানুষ দেহত্যাগের পর ঈশ্বরত্ব লাভের পরিবর্তে শৃগাল যোনি লাভ করবেন।

প্রশ্ন ২৭। আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণই ভগবান। কিন্তু মন্দিরে আপনারা রাধারাণী এবং সখীবৃন্দেরও উপাসনা করেন কেন?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। রাধারাণী হচ্ছেন মূর্তিমতী ভক্তি। সখীবৃন্দ হচ্ছেন রাধারাণীর বিস্তার বা কায়ব্যূহ স্বরূপা। মূর্তিমতী ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যদি কেউ আমাকে জানতে চায় তবে তাকে অবশ্য ভক্তির আশ্রয়ে থাকতে হবে। *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি।* হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে প্রথমেই 'হরে' কথাটি বলতে 'হে রাধারাণী' বা 'হে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী' বা হরা শক্তিকে বোঝায়। অভিমানী ব্যক্তিরা আগে কৃষ্ণকে ভগবান মনে করে আর নিজেকেই ভক্ত মনে করে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিখিয়েছেন যাঁরা কৃষ্ণের সেবা করছেন সর্বক্ষণ সর্বভাবে তাঁদের দাসানুদাসানুদাস হতে। তাই সেই নিত্য সেবাভাব পরিস্ফুট করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের চতুষ্পার্শে তাঁর সেবাপরায়ণা শক্তি সমূহ বিরাজ করছেন। তাছাড়া কৃষ্ণ কখনও একাকী থাকতে চান না, সর্বদা তাঁর সঙ্গে কেউ না কেউ থাকবেনই। অতএব সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাই পূর্ণ ও যথার্থ বলে স্বীকার্য।

প্রশ্ন ২৮। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং আমাদের জন্মের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর জন্ম ও আমাদের জন্মের পার্থক্য বলছেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥

"হে পরন্তপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহু বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পারো না।" (গীতা ৪/৫)

আমরা বহু বিভিন্ন শরীর নিয়ে বিভিন্ন স্থানে জন্ম গ্রহণ করে তারপর কালক্রমে মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছি। কিন্তু অতীতের সেই সমস্ত ঘটনা বিস্মৃতির অতল সাগরে তলিয়ে গেছে। আবার মৃত্যুর পর কোথায় জন্ম নেবো তা-ও অবগত নই। কিন্তু কৃষ্ণ সেই সমস্তই অবগত। এই হল পার্থক্য।

প্রশ্ন ২৯। যাঁর থেকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সংস্থিতি এবং প্রলয় সবকিছুই সংগঠিত হচ্ছে, সেই তত্ত্ববস্তু পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ শ্রীনন্দ মহারাজের গোশালার মধ্যে হল কেন?

উত্তর ঃ হর্তা কর্তা বিধাতা পরমেশ্বর ভগবানকে পৃথিবীতে এসে কংসের বদ্ধ কারাগারের মধ্যে জন্ম নিতে হল, ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম নিয়েও গরুচরানো কাজে যুক্ত থাকতে হল, নিজের বাড়িতে বহু ননীমাখন থাকা সত্ত্বেও লোকেদের বাড়ীতে ননীমাখন চুরি করতে হল। তেমনই এত আলয় থাকা সত্ত্বেও গোশালার মধ্যে নামকরণ অনুষ্ঠান করতে হল। এগুলি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা। ভগবান ভক্তদের অধীন হয়ে লীলাবিলাস করেন, আবার অভক্তদের বিভ্রান্ত করার জন্যও নিজে একজন হীনমন্য ব্যক্তির মতো ক্রিয়া করেন। আবার তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ জড়জাগতিক বিচার বিবেচনারও ঊর্ধ্বে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

জন্ম-কর্ম চ মে দিব্যম্ এবম্ যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

'হে অর্জুন আমার জন্ম ও কর্ম অপ্রাকৃত। এই জগতের কারও মতো নয়। এভাবে তত্ত্বগতভাবে আমার ক্রিয়াকলাপ যে জানতে পারবে তাকে আর এই মনুষ্যদেহ ত্যাগের পর পুনরায় এই জড়জগতে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। সে আমার কাছে উপনীত হবে।' তবে অবশ্যই জানতে হবে যে নন্দমহারাজের গোশালাগুলি বর্তমান সমাজের ছন্নছাড়া সাধারণ গোশালার মতো ছিল না।

প্রশ্ন ৩০। আমরা জানি জগতের পিতা-মাতা হলেন শিব ও দুর্গা। তবে তাঁদের পূজা না করে কেন আমরা কৃষ্ণ পূজা করব?

উত্তর ঃ শিব-দুর্গাই কৃষ্ণপূজা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। শিবঠাকুর দুর্গাদেবীকে বলছেন—

কিংপুনর্যোঽর্চয়েন্ নিত্যং সর্বদেবনমস্কৃতং।
ধন্যঃ স কৃতকৃত্যশ্চ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

"বেশী আর কি কথা বলার আছে, সমস্ত দেবদেবী যাঁকে সদা প্রণতি নিবেদন করে থাকেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে পৃথিবীতে যে ব্যক্তি নিত্য পূজা করে, সে ধন্য ও কৃতকৃত্য হয়ে ভগবৎলোক প্রাপ্ত হয়।" (স্কন্দ পুরাণ)

যাঁরা শুধু মাত্রই পিতামাতা-ভক্ত তাদের ক্ষেত্রেও শিবঠাকুর বলেছেন—"অনন্ত বিশ্বের পিতা হচ্ছেন কৃষ্ণ, মাতা হচ্ছেন রাধারাণী"। *শ্রীকৃষ্ণঃ জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।* শ্রীকৃষ্ণই জগতের পিতা এবং শ্রীরাধিকা জগতের মাতা। (পদ্মপুরাণ)

প্রশ্ন ৩১। হিন্দুদের ভগবান, ক্রিশ্চানদের গড এবং মুসলমানদের আল্লার মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে, কি নেই?

উত্তর ঃ হিন্দুরা যদি ভগবান বলতে কৃষ্ণকে বোঝেন কিংবা মুসলমানেরা যদি আল্লা বলতে কৃষ্ণকে বোঝেন তা হলে ভগবান বা আল্লার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু হিন্দুরা যদি দেব-দেবীদেরকে ভগবান বলে মনে করেন কিংবা কোনও জীবকে ভগবান বলে মনে করেন, আবার মুসলমানেরা আল্লাকে যদি নিরাকার বলে মনে করেন, ক্রিশ্চানেরা যীশুকেই গড বলে মনে করেন, তা হলে বুঝতে হবে তাদের গতি আদৌ এক নয় এবং তাদের সবারই ধারণার সঙ্গে ভগবৎ-তত্ত্ব বিজ্ঞানের বিশাল পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে।

প্রশ্ন ৩২। শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ টি নাম রয়েছে। একথা কি সত্য?

উত্তর ঃ ১০৮টি শুধু কেন, শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য অনন্ত নাম রয়েছে। মাতা বসুন্ধরাকে শ্রীঅনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের ১০৮টি নাম বলেছিলেন। বাসুদেব, সনাতন, ত্রিভঙ্গ, যাদবেন্দ্র, পরমপুরুষ ইত্যাদি। রাজা উগ্রসেনকে মহর্ষি ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের ১০০০টি নাম বলেছিলেন। হরি, দেবকীনন্দন, রমেশ, পরেশ, সুরেশ, ধরেশ, বনেশ, রাধিকেশ, গোপিকেশ, ব্রজেশ ইত্যাদি। পার্বতীদেবীকে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের ১০০০টি নাম বলেছিলেন। ইষ্ট, বরদ, দুঃখহর্তা, দুর্গতিহা, শোকহারক, ভক্তবৎসল ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৩৩। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবীতে জন্ম নিয়েও পৃথিবীতে দেহ না রেখে অন্তর্হিত হয়েছেন। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ এতে বোঝা যায় যে, বদ্ধজীবদের জন্মমৃত্যুর মতো ভগবানের জন্মমৃত্যু হয় না। ভগবানের জন্মমৃত্যু ও সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অপ্রাকৃত। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবানের উক্তি—

জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন! যে-ব্যক্তি আমার জন্ম ও কর্ম যে দিব্য, এই বিষয়টি তত্ত্বগতভাবে জানতে পারে, তাকে দেহত্যাগ করার পর পুনরায় এই জড় জগতে জন্মাতে হয় না। সে আমারই নিত্যধাম লাভ করে।" (গীতা ৪/৯)

প্রশ্ন ৩৪। শ্রীকৃষ্ণের ষোল কলা গুণ ছিল। সেই ষোল কলা কি কি?

উত্তর ঃ ষোল কলা গুণ সর্বদাই আছে। অনিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, লঘিমা, ঈশিতা, কামাবসায়িতা ও বশিতা—এই আট সিদ্ধি; ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয় ভগ এবং লীলা ও কৃপা। এই গুণগুলি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য বর্তমান।

প্রশ্ন ৩৫। পরমবৈষ্ণব কবি জয়দেব তাঁর 'শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থে ভগবানের দশ অবতারের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ অবতারের কথা নেই কেন?

উত্তর ঃ শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে কবি জয়দেব অবশ্যই গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান অবতারী অর্থাৎ তিনি সমস্ত অবতারের মূল উৎস। সমস্ত অবতার তাঁর থেকেই উৎপন্ন হয়েছেন। তাই অবতারগণের সঙ্গে কৃষ্ণকে একজন অবতার রূপে মনে করা উচিত নয় বলেই কবি জয়দেব অবতার-স্তোত্রে কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করেননি।

আর তিনি যে দশ অবতারের নাম উল্লেখ করেছেন সেই সকল অবতারগণের অবতারী হচ্ছেন আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেই কথাই কবি জয়দেব গোস্বামী দশ অবতার গীতের ঠিক পরের শ্লোকটিতেই পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছম্ মূর্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥

অর্থাৎ "তুমি মৎস্য অবতারে বেদের উদ্ধারসাধন করেছ, কূর্ম অবতারে পৃথিবীকে পিঠে বহন করেছ, বরাহ অবতারে ধরণীকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করেছ, নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করেছ, বামন অবতারে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনাচ্ছলে দৈত্যরাজ বলিকে বঞ্চিত করেছ, পরশুরাম অবতারে ক্ষত্রিয়কুল সংহার করেছ, রাম অবতারে রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাভূত করেছ, বলরাম অবতারে হল ধারণ করেছ, বুদ্ধ অবতারে জগতের বার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছ, অবশেষে কল্কি অবতারে ম্লেচ্ছকুলকে বিমোহিত করবে। হে দশাবতারধারী। হে শ্রীকৃষ্ণ। তোমাকে প্রণতি নিবেদন করি।"

প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেছেন এইভাবে—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতামকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ, "যে পরম পুরুষ স্বাংশ-কলা নিয়মে রামাদিমূর্তিতে স্থিত হয়ে ভুবনে নানা অবতার প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণও প্রকট হয়েছিলেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

প্রশ্ন ৩৬। ভগবান কোথায় বাস করেন?

উত্তর ঃ এই অনন্তকোটি জড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করেছেন—

গোলোক নাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ, "এই দেবীধাম, তার উপরে মহেশধাম, তার উপরে হরিধাম বা বৈকুণ্ঠ এবং সবার উপরে শ্রীগোলোক নামক নিজধাম অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের পরম ধাম। এবং এই সকল প্রকার, সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাব যিনি বিধান করেছেন সেই পরমেশ্বর ভগবান আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

এখন, এত প্রকার ধামে কোথায় কে থাকেন যদি নির্দেশ করা যায় তাহলে ভগবানের গোলোক ধামের অবস্থানটা নির্ণয় করা যেতে পারে। দেবীধাম বলতে অনন্তকোটি জড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝায়। তা শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া দুর্গাদেবী পরিচালনা করেন। পাতাললোক থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমগ্র দেবীধামটাই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্রে আবর্তিত হচ্ছে, অর্থাৎ তা নিত্য নয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা অগণিত, ঠিক যেন এক গাড়ি সরিষা বীজের মতো, যার মধ্যে এই ধরাধাম হল একটি ছোট্ট সরিষাদানার মতো। এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে রয়েছে চিন্ময় আকাশ। তার মধ্যে রয়েছে মহেশধাম বা শিবলোক। তার ঊর্ধ্বে হরিধাম—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার শ্রীবিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধাম। সবার ঊর্ধ্বে শুদ্ধ ভক্তগণের পরম আদরণীয় পরমারাধ্য দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম শ্রীগোলোক বৃন্দাবন।

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে নিজেই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে সেই গোলোক ধামের বর্ণনা প্রদান করে গেছেন। যা তিনি বহু পূর্বে সূর্যদেবকে দান করেছিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, সেই অব্যক্ত অক্ষয় চিন্তামণি ধামই সমস্ত জীবের পরম গতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠাভক্তির মাধ্যমে কোনদিন যদি কেউ সেখানে যেতে পারেন তবে আর কখনই তিনি

এই দুঃখময় জগতে ফিরে আসেন না। কারণ তিনি নিত্যধামে নিত্যানন্দময় জীবনে আসীন হন। সেই দিব্য সচ্চিদানন্দময় ধামই ভগবানের পরম ধাম। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* অক্ষর ব্রহ্মযোগের ২১ শ্লোকে এই কথারই উল্লেখ আছে।

আবার সেই ভগবান যুগপৎ ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুতে রয়েছেন—*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং।* তিনিই অংশাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে নির্বিকার সাক্ষীর মতো পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন। কিন্তু জীবাত্মার ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে সে তা ভুলে যায়। এই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।'

"আমি সবার হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকে সমস্ত জীবের স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হয় আবার বিলোপও হয়।" (*গীতা ১৫/১৫*) অর্থাৎ আমরা যদি ভগবদ্ অনুগত হয়ে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করি, তবে আমাদের স্মৃতি ও জ্ঞান জাগ্রত হবে; নতুবা যদি আমরা বৈদিক শাস্ত্র বিরুদ্ধ জীবন প্রণালীতে চলি তবে আমাদের স্মৃতিশক্তি জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হবে।

বর্তমান যুগে অর্থাৎ আধুনিক নব্য প্রণালীতে কিছু কিছু মানুষ জীবকেই ভগবান বলে মনে করে। বহু দরিদ্র পতিত মানুষকে অন্নবস্ত্র দান করে সমাজে তারা বড় বড় সমাজসেবী বলে পরিচিতি লাভ করছে। কিন্তু দেহত্যাগের পর প্রতিটি জীবের কর্মফল অনুসারে স্বর্গে কি নরকে গিয়ে, সুখভোগ কি দুর্ভোগ করবে—তা চিন্তা করা যথার্থ পরোপকারীর কর্তব্য।

দুর্লভ মানব জীবনে প্রত্যেকের ভগবদ্মুখী জীবন ধারাটাই সর্বপ্রযত্নে গ্রহণ করা আবশ্যক এবং যা শুধু এই জন্মেই নয়, জন্মজন্মান্তর ধরে আমাদের প্রকৃত **সুখ-শান্তি** প্রদান করবে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত দেবদেবী যত জীবকুল সবাই পরমেশ্বর পরমনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য। তা কেউ মানুক আর নাই মানুক। 'একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।' তাতে নিজেদেরকে ভগবান বলে মনে করাটা কত বড় বিভ্রান্তি। কত বড় মূর্খতা তা বোঝা উচিত।

শ্রীপদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম্ হৃদয়েষু বা।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥

ভগবান ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদকে বলছেন—'আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও নয়, হে নারদ, যেখানে আমার ভক্তরা আমার কার্যকলাপ ও মহিমার কথা গুণকীর্তন করে সেইখানে আমি অবস্থান করি।" শ্রীদুর্বাসা মুনিকে ভগবান বলেছেন, 'আমি ভক্তজনপ্রিয়, ভক্তই আমাকে চিন্তা করে, আমিও ভক্তের জন্য চিন্তা করি।' (শ্রীমদ্ভাগবত ৯/৪/৬০) অর্থাৎ ভগবান সর্বত্র যুগপৎ বিরাজ করলেও বিশেষরূপে ভক্তজনপ্রিয়। তাই ভক্ত হওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। যাঁরা সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন তাঁরা তাঁর অপ্রাকৃত চিত্র, তাঁর মন্দির, তাঁর শ্রীবিগ্রহ, তাঁর শ্রীনাম, তাঁর কথা,

তাঁর প্রসাদ, তাঁর ভক্ত-সবার প্রতি অবশ্যই আকৃষ্ট হবেন। তখন তাদের নিষ্কপট ভগবদ্ভক্তিময় চক্ষুতে ভগবান কোথায় আছেন আর কোথায় নেই-তা উপলব্ধ হবে।

প্রশ্ন ৩৭। ভগবানের প্রকৃত সংজ্ঞা কি?

উত্তর ঃ *ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।*
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬/৫/৪৭)

'সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টির সমাহারকে 'ভগ' বলে। এই ছয়টি অচিন্ত্য গুণ যাঁর মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে পূর্ণরূপে রয়েছে, তিনিই ভগবান।' একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই এই ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাই তিনি এবং বিষ্ণুতত্ত্বরূপে তাঁর বিস্তার সমূহই ভগবৎ পদবাচ্য।

প্রশ্ন ৩৮। কৃষ্ণ যদি পরমপিতা আদিপুরুষ হন, তবে তাঁর মা-বাবা থাকা কিভাবে সম্ভব?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্* (গীতা ৪/৯) 'আমার জন্ম এবং কার্যকলাপ সবই দিব্য অপ্রাকৃত।' ভগবান কারও বা কোন কিছুর অধীন নন। তাঁর ইচ্ছায় সব কিছুই হতে পারে। তাই কারও পুত্ররূপে কিংবা সখারূপে তিনি লীলাবিলাস করতে পারেন। মায়াবদ্ধ জীব আমরা জন্ম-মৃত্যু গ্রহণ করতে বাধ্য হই। কিন্তু মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণ কোনও কিছুতে বাধ্য নন। নরলীলা প্রকাশ করবার জন্য তিনি পিতামাতার কোলে শিশুরূপে আবির্ভূত হতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* (গীতা ৪/১১)—'যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, প্রপত্তি করে, আমি তাকে সেই ভাবেই পুরস্কৃত করি।' পরমেশ্বর ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করবার জন্য শ্রীনন্দ-যশোদা ও শ্রীবসুদেব-দেবকী জন্মজন্মান্তরে কঠোর সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তের সন্তোষ বিধান করতে ভগবানও তাঁদের পুত্ররূপে লীলাবিলাস করতে অভিলাষ করেন। আর এই জন্ম ও কর্মলীলা আমাদের জড়বুদ্ধির বিচার্য বিষয় নয়। ভগবান সর্ব অবস্থাতেই ভগবান। মানুষরূপে কিংবা অন্য যে কোনও রূপে আবির্ভূত হলেও তাঁর ভগবত্তা লাঘবের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন ৩৯। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও যান না। তবে '*মদ্ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি*'—কিভাবে বলছেন?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ এক জায়গায় থেকেও একই সময়ে অন্যত্র প্রকাশিত হতে পারেন। যেমন সূর্য একস্থানে থাকলেও আমরা সকালে পূর্বদিকে, দুপুরে মাথার উপর, বিকালে পশ্চিম দিকে দেখি। কিন্তু সূর্য একটি নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া পূর্ব বা পশ্চিমে কোনও দিকেই যাচ্ছে না। একই স্থানে রয়েছে। রাত্রে আমরাই সূর্যের বিপরীত দিকে থাকি বলে সূর্যকে দেখি না, যদিও সূর্য একই জায়গায় বরাবর রয়েছে। আবার পৃথিবীর কাছ থেকে বহু কোটি মাইল দূরে অবস্থান করলেও সূর্যকে আমরা আমাদের অনেক কাছেই প্রত্যক্ষ করি।

এই জড় জগতেই দেখা যায় বহু দূর-দূরান্তে অবস্থিত কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে না গিয়েও তার সঙ্গে কথা বলা যায়, তার কণ্ঠ নির্দেশ শোনা যায়, এমন কি তাকে দেখাও যায়। বেতার, দূরভাষ, দূরদর্শন ইত্যাদি এমনই কত যন্ত্র হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত। তেমনই, ভক্তিযোগের মাধ্যমে কোনও ভক্ত ভগবানের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, ভগবানের নির্দেশ শ্রবণ করতে পারেন, ভগবানকে দর্শন করতে পারেন, সেই ভক্ত যে কোনও স্থানে যে কোনও গ্রহে অবস্থান করুন না কেন।

শ্রীব্রহ্মসংহিতা শাস্ত্রে বলা হয়েছে—যদিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্য গোলোক বৃন্দাবনে নিত্যকাল বিরাজ করেন, তবুও তিনি সর্বব্যাপক, এমন কি পরমাণুর মধ্যেও তিনি বিরাজমান।

শ্রীব্রহ্মা বলেছেন—

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপত একতত্ত্ব হয়েও তাঁর অচিন্ত্যশক্তি বলে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মধ্যেই বর্তমান এবং তিনি যুগপৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণুতেও পূর্ণরূপে অবস্থিত। এইরকম আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (ব্রহ্মসংহিতা ৩৫ শ্লোক)

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোক বৃন্দাবনে নিবাস করেও চিদ্‌জগৎ ও জড় জগতের সর্বত্রই বিরাজমান। আবার সর্বত্র বিরাজমান হলেও সবাই তাঁকে দর্শন করতে পারে না। একমাত্র তাঁর কৃপা বলে প্রেমরূপ অঞ্জনে ভাবভক্তির চক্ষুতে সাক্ষাৎ দর্শন হয়।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"কৃষ্ণপাদপদ্মে একনিষ্ঠ সাধুগণ যে অচিন্ত্য গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের প্রেমাঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিনয়নে অর্থাৎ প্রেমভক্তি যোগে সর্বদাই তাঁর সরল শুদ্ধ হৃদয়ে অবলোকন করে থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (ব্রহ্মসংহিতা ৩৮ শ্লোক)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই যে, সূর্য এক স্থানে অবস্থান করলেও সেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য গ্রহলোক থেকে সূর্যকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তেমনই জগতে ভক্ত-অভক্ত নির্বিশেষে প্রত্যেকের কাছেও শ্রীকৃষ্ণ দৃশ্যমান হন। ভৌম বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে ভক্ত ও অভক্ত, সকলেই এই চক্ষুতে তাঁকে দেখেছিলেন, কিন্তু কেবল মাত্র ভক্তরাই সেই ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের হৃদয়ের একান্ত পরমধন বলে আদর করেছিলেন,

অভক্তরা নয়। সম্প্রতি ভক্তগণ সেরূপ চাক্ষুষ দর্শন লাভ না করেও ভক্তিভাবিত হৃদয়ে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন।

প্রশ্ন ৪০। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে আমাদের কি লাভ হবে?

উত্তর ঃ অন্যান্য দেবদেবীর আরাধনা করার ফলে যে বস্তু লাভ হয় তা অনিত্য বা অস্থায়ী। কিন্তু কৃষ্ণভজনের ফল নিত্য।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ঘোষণা করেছেন—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের দেবদেবী-আরাধনা লব্ধ ফল অস্থায়ী। দেবদেবীদের উপাসকেরা তাদের আরাধ্য দেবতাদের লোক প্রাপ্ত হয় কিন্তু আমার ভক্তরা আমার পরম নিত্য ধাম প্রাপ্ত হয়। (গীতা বিজ্ঞানযোগ ৭/২৩) আর সেভাবে যোগী বা সিদ্ধ বাবাদের পূজকেরা তাদের যেখানে গতি সেখানে গিয়ে পৌঁছবে।

প্রশ্ন ৪১। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম আছে, দেহত্যাগ আছে। তা হলে তিনি অজ নিত্য হন কি করে?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বর্ণনা রয়েছে—*জন্ম-কর্ম চ মে দিব্যম্*—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও সমস্ত ক্রিয়াকলাপ দিব্য। অর্থাৎ আমাদের মতো জড়জাগতিক নয়। যদিওবা মনে হল তিনি জন্ম নিচ্ছেন, মৃত্যুবরণ করছেন, কিন্তু সেটি আমাদের জড় দৃষ্টিতেই মাত্র গোচরীভূত হচ্ছে। যেমন, সূর্য ডোবেও না ওঠেও না। সূর্য তো সর্বদা তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে রয়েছে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে কখনও উদয় হওয়া, কখনও অস্ত যাওয়া, কখনও বা সূর্য নেই অন্ধকার—এভাবে প্রত্যক্ষ হচ্ছে।

প্রশ্ন ৪২। আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভগবান। তা হলে ভগবান শঙ্কর, ভগবান নারদ, ভগবান মনু প্রভৃতি কথাগুলি পাওয়া যায় কেন?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর ভগবান। সর্ব অবতারের মূল অবতারী ভগবান। অনন্ত কোটি সমস্ত অবতার তাঁর থেকেই প্রকাশিত। সেই জন্যে বলা হয়—*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ* অর্থাৎ তিনি কেবল ভগবান বা ঈশ্বর নন, তিনি পরম ঈশ্বর। *অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণকারণম্*। যখন কিছুই ছিল না তখনও অনাদির আদি কৃষ্ণ ছিলেন। তিনি সমস্ত কিছুর কেবল কারণমাত্রই নন, সমস্ত কারণেরও পরম কারণ। *সর্বকারণকারণম্*। শিব, ব্রহ্মা, নারদ, মনু—এঁরা সকলেই তাঁর অবতার মাত্র। কেউ গুণাবতার, কেউ শক্ত্যাবেশ অবতার ইত্যাদি। এ জন্যেই তাঁদের প্রতি বিশেষ সম্মাননার খাতিরে কখনও কখনও ভগবান বলা হয়ে থাকে। যদিও আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণই সকলের প্রভু, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের অর্থাৎ প্রভুভক্তদেরও প্রভু বলে সম্মাননা করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ৪৩। আমি কি করে ভগবান হব?

উত্তর ঃ আপনি কোনও দিনও ভগবান হতে পারেন না, কেউই ভগবান হতে পারে না। আপনি জীব। চিরকালই জীব। ভগবান চিরকালই ভগবান। আপনি বড় জোর ভগবদ্‌ভক্তি অনুশীলন করে ভগবানের ভক্ত হতে পারেন।

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' আপনি অভক্তি আচরণ মাধ্যমে ভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার দাসত্ব করছেন। ভক্তি অনুশীলন করলে কৃষ্ণের সেবা করবেন। আসল স্বরূপটাই হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্য সেবায় অধিষ্ঠিত থাকা। 'একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।' কৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান। সবাই তাঁর ভৃত্য। অন্য কেউ কৃষ্ণ হতে পারে না। জীব ভগবান হওয়ার বাসনা যেই উদ্রেক করল, অমনি সে দুঃখময় জড় মায়াজগতে পতিত হল।

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥

আবার, এই সংসার বদ্ধ হয়েও ভগবান হওয়ার বাসনা করলে ভাগ্যে আরও অধিকতর দুঃখ জুটবে—তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন ৪৪। অনেকে বলেন, পরম ঈশ্বর অব্যক্ত অনাদি, অসীম ও অনন্ত। কিন্তু মাত্র পাঁচহাজার বছর পূর্বে সসীম মানবরূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে পরমেশ্বর ভগবান হতে পারেন?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্‌।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্‌।
গোপিকোলুখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥

অর্থাৎ, "ভগবানের আদি-অন্ত নেই, বাহ্য-অন্তর নেই, পূর্ব-পশ্চাৎ নেই। তিনি সর্বব্যাপ্ত। যেহেতু তিনি কালের নিয়ন্ত্রণাধীন নন, তাই তাঁর কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোন পার্থক্য নেই। তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে নিত্য-বর্তমান। দ্বৈতভাবের অতীত পরমতত্ত্ব হওয়ার ফলে, যদিও তিনি সব কিছুরই কার্য ও কারণ, তবুও তিনি কার্য-কারণের দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত। সেই অব্যক্ত পুরুষ, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়-অনুভূতির অতীত, তিনি এখন একটি নরশিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আর মা যশোদা তাঁকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে দড়ি দিয়ে উদূখলে বেঁধে রেখেছেন।" (ভাগবত ১০/৯/১৩-১৪)

এভাবে অনাদি অব্যক্ত অসীম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মানুষের মতো লীলাবিলাস করছেন। কিন্তু নির্বিশেষবাদী বা মায়াবাদীরা তাঁকে বুঝতে পারে না। তারা আদৌ জানে না যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি মাত্র।

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এই যে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥

"আমি যখন পৃথিবীতে মানুষরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে, তারা আমার পরমভাব সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা আমাকে সমগ্র চরাচরের পরম ঈশ্বর বলে জানতে পারে না।" (গীতা ৯/১১)

প্রশ্ন ৪৫। কেউ কেউ বলেন জীবই ভগবান। সেটি কি ধরনের কথা?

উত্তর ঃ সেটি অজ্ঞ লোকের কথা। ভগবান অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। জীব হচ্ছে সৃষ্টির এক অধীন ক্ষুদ্রকণার মতো। ভগবান সর্বজ্ঞ। জীব অতি অল্পজ্ঞ বা অজ্ঞ। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সবকিছুই ভগবান জানেন। কারণ তিনি কালের কর্তা। কাল ভগবানের অধীন। জীব কালের অধীন। অতএব কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে পারেন যে জীবই ভগবান। কলি-গ্রস্ত ব্যক্তিরই জীবে ভগবদ্‌বুদ্ধি এবং ভগবানে জীববুদ্ধি হয়।

প্রশ্ন ৪৬। 'কৃষ্ণ' শব্দটির ব্যাখ্যা কি?

উত্তর ঃ শ্রীল শ্রীধর স্বামী 'কৃষ্ণ' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।

'কৃষ্‌' ধাতু আকর্ষণ বাচক এবং 'ণ' পরমানন্দ বাচক।

অর্থাৎ, যিনি জীবদেরকে মায়ার কবল থেকে আকর্ষণ করে নিজ নিত্য দাস্যে নিয়োগ পূর্বক পরমানন্দ প্রদান করেন, তিনিই কৃষ্ণ।

৪

কৃষ্ণসেবাই জীবনের স্বরূপ

প্রশ্ন ১। কৃষ্ণভক্তদের নাকি দেব-দেবীর পূজা করার প্রয়োজন নেই। তবুও মায়াপুরে কৃষ্ণভক্তদের দেখলাম বিশ্বকর্মা পূজার দিন তাঁরাও বিশ্বকর্মা পূজা করছেন। কেন?

উত্তর ঃ ভগবদ্‌ভক্তের দ্বারা পূজা এবং অভক্তের দ্বারা পূজার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। ভক্তদের সচরাচর কোন দেব-দেবীর পূজা করতে দেখা যায় না, তবে তাঁরা দেব-দেবীদের কাউকে অবজ্ঞাও করেন না। বৈষ্ণব জ্ঞানে দেব-দেবীদের তাঁরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য সমস্ত দেব-দেবীও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য বা সেবক। শ্রীবিশ্বকর্মা ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কলকব্জা সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষণ করেন। যদি কোন দেব-দেবীর পূজার সূত্রপাত ঘটে থাকে তবে সেই দেব-দেবীদের শ্রীকৃষ্ণের সেবকরূপে কৃষ্ণপ্রসাদে আপ্যায়িত হওয়া উচিত। তাই মায়াপুরে ভক্তরা কেউ কেউ রাধামাধবের মহাপ্রসাদ এবং প্রসাদী ফুল ও মালা দিয়ে বিশ্বকর্মাকে আপ্যায়ন করেছিলেন। আমাদের জানতে হবে পরম আরাধ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর গৃহীত নৈবেদ্য বা মহাপ্রসাদ কোনও দেব-দেবীকে দিলে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হন। কিন্তু তাঁদের কাছে জড়জাগতিক বিষয় কামনা করা কখনই উচিত নয়।

প্রশ্ন ২। হিন্দুরা যে বহু দেব-দেবীর পূজা করেন সেটি যথার্থ? না কি একমাত্র কৃষ্ণপূজা করলেই আর নতুন করে কোনও দেব-দেবীর পূজার প্রয়োজন নেই?

উত্তর ঃ হিন্দুরা মহাভারতকে তাদের ধর্মশাস্ত্র বলে মানে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে উত্তর গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি রয়েছে—

দেবাদীনঞ্চ পূজ্যোঽহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয় ।
মৎপূজনেন সর্বার্চা স্যাদ্ধ্রুবং নাত্র সংশয় ॥

"আমি সমস্ত দেবদেবীর এবং সকল বর্ণের সকল আশ্রমের ব্যক্তিগণের পূজ্য। আমার পূজাতে নিশ্চিতভাবে সকলেরই পূজা হয়, এতে কোনও সন্দেহ নেই।"

ঋক্ বেদের কৃষ্ণোপনিষদে বলা হয়েছে—*ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কর্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স হ সর্বৈকার্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশং কৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণোঽনাদি তস্মিন্নজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী।* অর্থাৎ "কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দঘন, কৃষ্ণ আদি পুরুষ, কৃষ্ণ কর্মাদির মূল, কৃষ্ণ সকলের একমাত্র প্রভু, কৃষ্ণই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি ঈশ্বর প্রমুখ দেবগণের প্রভু ও পূজ্য, কৃষ্ণ অনাদি, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাইরে যত মঙ্গল—সেই সমস্তই কৃষ্ণসেবক কৃতী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণেই লাভ করে থাকেন।"

শ্রীভগবানের আরাধনা ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছুই নশ্বর এবং তুচ্ছ বলে হেয়। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবতাগণ শ্রীহরির স্তুতি করে বলেছেন—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণ-কামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্তি সিন্ধুম্ ॥

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি অবিস্ময়ে অর্থাৎ সুনিশ্চিত রূপে স্বীয় লাভে পরিপূর্ণকাম বা সমগ্রবৈভব সমন্বিত ও প্রশান্ত শ্রীগোবিন্দকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে উপাসনা করে, সেই মূর্খ নিশ্চয়ই কুকুরের লেজ ধরে মহাসমুদ্র পার হবার চেষ্টা করছে।" (ভাঃ ৬/৯/২)

এই কথা শ্রীপদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

যথা ধৃত্বা শুনঃ পুচ্ছং তর্তুমিচ্ছেৎ সরিৎপতিম্ ।
তথা ত্যক্ত্বা হরিং সেব্যমন্যোপসনয়া ভবম্ ॥

অর্থাৎ, "অতিশয় অজ্ঞ ব্যক্তিরা কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছা করে, সেই রকম সেব্য শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করে অন্য দেব-দেবী ইত্যাদির উপাসনা করে মূর্খরা জন্ম-মৃত্যুর ভব-সংসার উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছা করছে।"

প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরি ছাড়া কেউই সংসারবদ্ধ জীবকে দুঃখময় জড় জগৎ থেকে উত্তীর্ণ করতে পারে না। এই কথা দেবর্ষি নারদকে সদাশিব বলছেন—

ভুবনে সর্বলোকানাং নারাধ্যো বৈ হরিং বিনা ।
ভবার্ণবচ্ছিন্নকোঽপি সর্বকামদকামদঃ ॥

অর্থাৎ, "এই ভুবনে সকল লোকের হরি বিনা আর কেউ আরাধ্য নিশ্চয়ই নেই; ভগবান শ্রীহরি ছাড়া আর কেউই কামদগণের কামদ এবং ভবার্ণবচ্ছেত্তা নয়।" ভগবান শ্রীহরি হচ্ছেন সর্বকামদকামদ অর্থাৎ যে কোনও সর্বকামদাতা দেবতারও অভীষ্ট দাতা এবং ভবার্ণবচ্ছেত্তা অর্থাৎ সমস্ত জীবের সংসার বন্ধন স্বরূপ বারবার জন্মমৃত্যুর ভবচক্রের একমাত্র ছেদনকারী।

মহাভারতে হরিবংশে বলা হয়েছে—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে ।
ত্যক্তামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষম্ ॥

অর্থাৎ, "যে মূঢ়াত্মা বাসুদেব শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করে মোহবশত অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে অমৃত ছেড়ে সংসার যাতনা রূপ বিষ ভক্ষণ করে।" শ্রীস্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে—

শ্রীহরির পূজা হলে তেত্রিশকোটি দেব-দেবীরও পূজা হয়ে যায়, আলাদা করে কারও পূজার প্রয়োজন নেই।

অর্চিতে দেবদেবেশ অজশঙ্খগদাধরে ।
অর্চিতাঃ পিতরোদেবা যতঃ সর্বময়ো হরিঃ ॥

অর্থাৎ, "পদ্ম-শঙ্খ-গদাধর, সমস্ত দেব-দেবীর ঈশ্বর শ্রীভগবান অর্চিত হলে দেবগণ ও পিতৃগণ সকলেই অর্চিত হন, যেহেতু শ্রীহরি সর্বময়।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও তাই বলা হয়েছে, গাছের গোড়ায় জল দিলে শাখাপ্রশাখা ফল ফুল পাতায় জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সেগুলি গোড়ার জলেই পুষ্ট হবে। উদরে খাদ্য দিলে হাত পা চোখ নাক আপনাতেই পুষ্ট হবে, আলাদা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তেমনই শ্রীহরির আরাধনা হলে সমস্ত দেব-দেবী প্রসন্ন হন। গোড়া বাদ দিয়ে আগায় জল দিলে গাছ নষ্ট হয়, পেট বাদ দিয়ে হাত পায়ে নাকে কানে খাদ্যবস্তু দিলে শরীর টিকে না, তেমনি ভগবান শ্রীহরিকে বাদ দিয়ে দেব-দেবীর আরাধনায় প্রকৃত মঙ্গল হয় না।

প্রশ্ন ৩। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"যে করে আমার আশ, আমি করি তার সর্বনাশ।" এই কথার মানে কি?

উত্তর ঃ যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ভজন সাধন শুরু করবেন, তিনি এই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিপূর্ণ পার্থিব জীবনের সংসার সুখ, কুটুম্বদের সঙ্গে পড়ে হাসি-ঠাট্টা-তামাসার রোল, মদ্য-মৎস্য-মাংস-ডিম্ব ভক্ষণের তৃপ্তি, সিনেমা-জুয়া-পার্টি ইত্যাদি আড্ডার প্রমোদ, আধুনিক নভেল-নাটক-গালগল্পের প্রতি রুচি, স্ত্রী-পুরুষের রচিত নির্জন সঙ্গসুখের বিলাস, খেলাধূলোর উল্লাস, নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার আনন্দ—সমস্তই হারিয়ে বসবেন।

তাই এই সমস্ত তথাকথিত সর্বজনপ্রিয় তামাসা করার বাসনা নিয়ে যিনি জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই জড় সংসারে নানাবিধ জীবজন্তু হয়ে থাকতে চান, তাঁর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের প্রতি আশা করাটা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ৪। জীবিত কোনও মানুষকে কি কখনও মৃত বলা যায়? কেউ হয়তো ঘুমিয়ে আছে, শরীর খারাপ, তাকে বলা হল, সে মরেই গেছে। এগুলি বলা উচিত কিনা।

উত্তর ঃ শরীর খারাপ হলে ঘুম আসতেই পারে, চিকিৎসা বা বিশ্রাম নিয়ে আবার কাজে-কর্মে নিযুক্ত হতে পারে, এটা সাধারণ কথা। এতে 'মরেই গেছে' বললে স্বভাবতই মানসিক আঘাত দেওয়া হয়ে থাকে। তাতে নতুন করে বিরোধের অবকাশ থাকে, মনোমালিন্য হয়। সেটি ভালো নয়।

একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে। কি করে জীবিত মানুষদেরও মৃত বলা হয়।

নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অর্থাৎ, "এই জগৎ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম তাকে ধর্মীয় জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য অভিমুখী করে না, যার ধর্ম অনুষ্ঠান জড় বিষয় ভোগের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদন

করে না, যার বৈরাগ্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় পর্যবসিত হয় না, সেই ব্যক্তি জীবিত হলেও মৃত।" (ভাগবত)

ভাগবত-দৃষ্টিতে জগতের অধিকাংশ মানুষই আমরা জীবিতাবস্থায় মৃত, যদিওবা কেউ কেউ দাবী করতে পারি যে, আমরা খুবই কর্মঠ, দিনরাত খেটে চলেছি।

সমস্ত কর্মের আয়োজন কৃষ্ণভক্তির উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।* শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যদি কর্ম না করা হয় তবে সেই সমস্ত কর্ম এই মৃত্যুময় মর্ত্য জগতে আমাদের বন্ধনের কারণ।

শ্রীল প্রভুপাদ তাই বলেছেন, স্বাভাবিক কর্ম করার প্রবণতা থেকে মানুষ যদি ক্রমশ কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে জীবিত হলেও মৃত।

প্রশ্ন ৫। সকল দেবদেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাম-অবতারে রাবণ-বধের জন্য কেন দুর্গাদেবীর আরাধনা করলেন?

উত্তর ঃ মূল গ্রন্থ বাল্মীকি রামায়ণে, কোথাও ভগবান রামচন্দ্র দুর্গাপূজা করেছেন—এমন কোন বর্ণনা নেই। ব্রহ্মসংহিতার বর্ণনা অনুসারে দুর্গা হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধীনস্থ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধনকারিণী এক শক্তি। ভোগাসক্ত মানুষ জড় কামনা নিয়ে দুর্গা পূজা করে থাকে। তারা দুর্গাদেবীর কাছে প্রার্থনা করে বলে—"*ধনং দেহি, জনং দেহি, রূপবতী ভার্যাং দেহি.....*"। কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শেখালেন, "*ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং.....*"—'হে ভগবান, ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করতে আমি এই জড়জাগতিক ধনবল, জনবল এবং রূপবতী ভার্যা—এসব কিছুই চাই না, কেবল জন্ম-জন্মান্তর ধরে আপনার শ্রীচরণে আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক।'"

অবশ্য ভগবান অনেক সময় আপন ভগবত্তা লুকিয়ে রেখে লীলার খাতিরে তাঁর ভক্তের পূজা করে জীবশিক্ষা দেন। যেমন, গার্হস্থ্য লীলায় দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণ অতিথি নারদ মুনিকে দেখে নিজ হাতে শ্রীনারদের চরণ ধুয়ে মুছে দিয়ে তাঁকে প্রণতি জানিয়েছিলেন। কারণ গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে সাধুসেবা, সন্ন্যাসীর যথাযথ মর্যাদা দেওয়া। এই শিক্ষাই ভগবান স্বয়ং শেখালেন। যদিও নারদ মুনি কৃষ্ণের ভক্ত মাত্র। কিন্তু এতে ভগবানের ভগবত্তা কখনই ক্ষুণ্ণ হয় না।

তাই প্রশ্নানুসারে, রামচন্দ্র যদি দুর্গা পূজা করেও থাকেন, তাতে তাঁর ভগবত্তা কখনই ক্ষুণ্ণ হবে না। এছাড়া, ভগবান যখন তাঁর ভক্তের পূজা করেন, তার মাধ্যমে তিনি জীবকে জড় কামনা থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থাই শিক্ষা দেন। ব্রজগোপীরা দেবী কাত্যায়ণীর পূজা করেছিলেন ভোগাসক্তি চরিতার্থ করার জন্য নয়। শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করার জন্যই তাঁরা কাত্যায়ণী ব্রত করেছিলেন।

কিন্তু, কলিযুগের পতিত ব্যক্তিরা ভোগবাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই দুর্গা পূজা করে থাকে। তাই, তারা যতই দুর্গা পূজা করুক না কেন, মহামায়া দুর্গা তাদের সমস্ত শুভ জ্ঞান-বুদ্ধিকে শুধু হরণ করতে থাকেন। তারা কখনও পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তত্ব

হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এদেরকে *'মায়য়া অপহৃত জ্ঞানাঃ'* অর্থাৎ 'মহামায়া কর্তৃক তাদের জ্ঞানবুদ্ধি অপহৃত হয়েছে'—এই রকম বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন ৬। বহুদিন ধরে কৃষ্ণনাম জপ করছি। চারটি বিধিনিষেধ পালন করছি। কিন্তু এখনও মায়াকে অতিক্রম করতে পারলাম না। এই অবস্থায় আমি কি সাধন ভজন বন্ধ করে দেব?

উত্তর ঃ বহুদিন পর্যন্ত কৃষ্ণনাম জপ করতে হবে—এমন কথা শাস্ত্রে বলা হয়নি। বলা হয়েছে *'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'"* এবং ভক্তের একটি গুণ হল *'কৃষ্ণৈক শরণং'"*। অর্থাৎ, সে নিত্যকাল ধরে সর্বতোভাবেই কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের সেবা গ্রহণ করবে। কারণ "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।" কৃষ্ণের দাসত্বই তার নিত্য স্বরূপ। এমন নয় যে, কিছুদিন ধরে কৃষ্ণের দাসত্ব করব এবং যখনই মায়া আক্রমণ করবে তক্ষুণিই মায়ার দাসত্ব বরণ করব।

ভগবানের ধাম হল বৈকুণ্ঠ। কুণ্ঠাবিহীন অর্থাৎ আনন্দময়। আর মায়ার জগৎ দুঃখময়। ত্রিতাপ ক্লেশ যুক্ত। ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন এই দুঃখময় জগৎ অতিক্রম করে আনন্দময় জগতে—আমাদের প্রকৃত আলয়ে যাওয়ার জন্য। আমাদের ভোগবাসনা হেতু এই দুঃখময় মায়ার জগতে আমরা পতিত হয়েছি।

"কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

তাই আমাদের প্রকৃত ধামে উত্তীর্ণ হতে হলে—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

কেবলই হরিনাম জপকীর্তন অনবরত করে চলতে হবে, এছাড়া কলিযুগে অন্য কোন পন্থা নেই। শুদ্ধ চিত্তে হরিনাম। শুদ্ধচিত্ত না হলে হরিনামে রুচি হয় না। তাই শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিধিনিষেধ পালন করতেই হবে। এইভাবে কৃষ্ণানুশীলনে ব্রতী হয়ে আমাদের প্রকৃত আলয়ে ফিরে যেতে হবে।

কোনও পথিক তার আলয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়াসী হয়ে, মাঝপথে এসে সে যদি চিন্তা করতে থাকে যে, 'বহুক্ষণ ধরেঁ তো আমি হাঁটছি। রাস্তায় কোথাও কারও সঙ্গে সময় নষ্ট করিনি। তবুও আমি এই বালুমাড়ি এখনও পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারলাম না। এমত অবস্থায় এখন হাঁটা-চলা বন্ধ করে দিয়ে তপ্ত বালিতে শুয়ে থাকা যাক্‌।' সে যদি এরূপ চিন্তা করে, তবে বুঝতে হবে সে হতাশাচ্ছন্ন এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কারণ সে তার আসল কাজ বন্ধ রেখে সময় নষ্ট করতে চায়। আয়ু অপচয় করতে চায়। তার মতো বোকামি না করে আরও বেশি করে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করা দরকার।

প্রশ্ন ৭। ঈশ্বর সাধনা কি বাড়িতে বসে সম্ভব নয়। সাধনা বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।' শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবায় যুক্ত থাকাই সাধনা। সাধক "গৃহেতে বা বনেতে থাকে সদা হরি বলে ডাকে।" অর্থাৎ, সর্বদা সে ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই জীবনযাপন করে। সে বাড়িতে বসেই হোক কিংবা গাড়িতে বসেই হোক।

প্রশ্ন ৮। এই জগতে মুক্ত ব্যক্তি কারা?

উত্তর ঃ কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই মুক্ত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

অর্থাৎ, "যিনি তাঁর দেহ, মন, বুদ্ধি এবং বাণীর দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি এই জড় জগতে থাকলেও মুক্ত বলে বিবেচিত হন।" (ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১/২/১৮৭)

প্রশ্ন ৯। 'মানুষ-পূজা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম পূজা'—এতে আপনাদের মতামত কি?

উত্তর ঃ মানুষকে পূজা করাই শ্রেষ্ঠ—এটি একটি অবৈদিক মনগড়া ধারণা। 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাবা' প্রশ্নের মতোই বহু পাণ্ডিত্যের পরে হয়তো কেউ এরূপ কথা বলে। মহর্ষি ব্যাসদেব উল্লেখ করেছেন, "যে পরমেশ্বর ভগবান থেকে সমস্ত জীবের উৎপত্তি, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁকে মানুষ তার কর্মের দ্বারা অর্চন করে সিদ্ধি লাভ করেন।" (গীতা) সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন— "আমি সর্বেশ্বর। জীবসকল আমার অংশ ও নিত্য। এই প্রপঞ্চে তারা ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে কর্ম করে প্রকৃতির সুখদুঃখ ভোগ করছে।" (গীতা)

যে সমস্ত জীব সুখ-দুঃখের অধীন নন, তাঁরা মুক্ত। যারা সুখ-দুঃখের মধ্যেই জীবন কাটায়, তারা বদ্ধ। তাদের সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥
'নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে, নরকাদি-দুঃখ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/১১-১২)

মুক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চনা করে কৃষ্ণসেবাসুখ লাভ করেন। আর, বদ্ধ জীবেরা শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণ-বহির্মুখ কর্ম করে জগতে নরকাদি দুঃখ ভোগ করতে থাকে।

আমাদের সর্বদা মনে রাখা দরকার—

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১০৮)

কিন্তু তথাকথিত সভ্য জীব হয়ে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব অবজ্ঞা করে অন্য মানুষের, অন্য জীবজন্তুর দাসত্ব করছে। অন্যের পূজা করতে চাইছে। আবার, তারা পাপ এবং পুণ্যাদি কর্ম করে নিজেদের এক-একজন মহাত্মা বলেও মনে করছে।

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব—অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১১৭-১১৮)

দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পূর্বকালে রাজারা যেমন নদীতে চুবিয়ে ধরতেন, আবার তার দম আটকে গেলে একটু উপরে তুলে ধরতেন, পুনরায় তাকে চুবিয়ে রাখা হত। এইভাবে মহামায়াও কৃষ্ণ-বহির্মুখ ব্যক্তিদের কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে, বারে বারে নিক্ষেপ করতে থাকেন।

এইভাবে স্বর্গ-নরক ভোগ করা কোনও বুদ্ধিমান মানুষের লক্ষ্য নয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন। যারা তা করে না, তাদের সঙ্গ বর্জন করতে হয়।

তারে যে না ভজে, বর্জ্য হয় সেই জন ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫/৩)

ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত উন্নত জীবদের কর্তব্য পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা। মহাভারতে বলা হয়েছে—

স ব্রহ্মকাঃ স রুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ।
অর্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্ ॥

অর্থাৎ, "অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, মহর্ষিগণের সঙ্গে দেবতাগণ সকলে ভগবান শ্রীহরির অর্চনা করে থাকেন।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও উল্লেখ করছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

"আমাতে তুমি চিত্ত স্থির কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই জন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, এইভাবে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে।" (গীতা ১৮/৬৫)

শ্রীকৃষ্ণ এই কথাও বলেছেন—"আমার ভক্ত সর্বকার্যে লিপ্ত থাকলেও আমার কৃপায় আমার অব্যয় ও শাশ্বত নিত্য আনন্দময় ধাম লাভ করে।" (গীতা ১৮/৫৬)

কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করে যদি জড় জগতের মানুষকে কিংবা অন্য দেব-দেবীকে পূজা করা হয়, তবে দুঃখময় বদ্ধ সংসারটাই লাভ হবে মাত্র। যেখানে শুধু মানব-জীবনই নয়, পশুপাখী কীটপতঙ্গ জন্মও লাভ করা যাবে। পুণ্য ও পাপ কর্ম অনুসারে কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে ভ্রমণ করতে হবে।

যারা জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করার কথা বলে এবং 'জীবই ঈশ্বর' বলে, তারা পাষণ্ডী। জীবকে ভগবদ্‌জ্ঞানে পূজা করে, অথচ পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ মেনে চলে না, সেই মূঢ়দের নারকী বলা হয়।

যেই মূঢ় কহে—'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তার যম ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮/১১৫)

এরূপ পাষণ্ডমতি বাদ দিয়ে কৃষ্ণভক্তের সঙ্গই বাঞ্ছনীয়। তা হলে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মে দুঃখময় সংসার চিরতরে অতিক্রম করা যাবে।

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০/১২০)

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ মহাজনের উল্লেখ রয়েছে—যাঁরা প্রত্যেকেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা), নারদ, শম্ভু (শিব), সনৎকুমার, দেবহূতিপুত্র কপিল, মনু (মনুষ্যজাতির পিতা), জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি (শুকদেব), প্রহ্লাদ, যমরাজ—এঁরা দ্বাদশ মহাজন। (ভাঃ ৬/৩/২০) এবং শাস্ত্রে নির্দেশ রয়েছে—

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ (মহাভারত বনপর্ব ৩১৩/১১৭)

মহাজনদের নির্দেশিত পথটাই শ্রেষ্ঠ পথ। মনগড়া পন্থায় গেলে ভ্রষ্ট হতে হবে।

প্রশ্ন ১০। "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" এই কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ এই কথাটি যদি কেউ যথার্থ বলে মনে করেন, তবে তাঁকে অবশ্য অবশ্যই সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাপরায়ণ হতে হবে। যে কোনও ব্যক্তিই সহজে বুঝতে পারেন যে, জীব বলতে কেবলমাত্র মানুষকেই বোঝায় না, গরু ছাগল হাঁস মুরগী মাছ ব্যাঙ সবাইকেই বোঝায়। সুতরাং মানুষ কারও প্রতি হিংসা করবে না। কিন্তু মাছ-মাংস-ডিম ভক্ষণ করতে থাকব এবং আপন শরীরের কথাকথিত স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে জীবহত্যা জীবহিংসা করতে থাকব, অথচ মুখে বলব 'জীবে প্রেম'—তা হলে সেটি অত্যন্ত বদমায়েসী করা হয়।

মাছ মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি অবৈধ কর্ম কখনই সর্বজীবের ঈশ্বর পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতিমূলক আচরণ নয়। মানুষ নিজের রসনা-তৃপ্তি এবং উদরপূর্তির জন্য জীবহত্যাদি পিশাচসুলভ আচরণ করে থাকে। এটা কাম, কখনই প্রেম নয়। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ করা হয়েছে—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলে 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪/১৬৫)

কাম হচ্ছে জড়জাগতিক লালসা এবং প্রেম হচ্ছে ভগবৎ আসক্তি। কাম অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্মল ভাস্কর? (চৈঃ চঃ আদি ৪/১৭১)

এই জগতে কোনও জীবের সঙ্গে অন্য জীবের প্রেম হয় না—কাম হয়। ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তের প্রেম হয়। কিন্তু ধড়িবাজ ব্যক্তিরা কামকে প্রেম বলে প্রচার করছে।

যেমন, উদ্ভ্রান্ত ভ্রষ্ট সমাজে সিনেমা ও পত্র-পত্রিকায় যুবক-যুবতীদের কামার্ত রূপকে 'প্রেম' নামে প্রচার করা হয়েছে, তেমনই ধর্মের নামে মানুষ বৈদিক শাস্ত্র-বিরোধী জীবহিংসা করেও 'জীবে প্রেম' বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

বদ্ধ জীবের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি পূর্ণ ভবচক্র থেকে চিরকালের জন্য নিস্তার পাওয়ার পদ্ধতি করে দেওয়াই জীব সেবা। দু-একদিনের জন্য কিছু আহার নিদ্রা আত্মরক্ষা ও মৈথুনের ব্যবস্থা করে দেওয়াটা জীব সেবা নয়। রোগীকে ওষুধ দেওয়া, ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়াটা এমন কোনও বড় সেবা নয়। তা কেবল তাৎক্ষনিক উপকার বলা যায় মাত্র। তারপর জীবের একই সমস্যা চলতেই থাকে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে জীব চুরাশি লক্ষ প্রকার দেহ ধারণ করে দুঃখময় জগতে বদ্ধ হয়ে আছে। জড়জাগতিক সমস্ত দুঃখগুলিই অনর্থ। আর এই থেকে জীবকে মুক্ত করাই প্রকৃত জীবসেবা। মহর্ষি ব্যাসদেব তাই নির্দেশ দিয়েছেন—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে। (ভাগবত ১/৬/৭)

অর্থাৎ, 'বদ্ধ জীবের দুঃখদুর্দশারূপ অনর্থগুলি অচিরেই উপশম করার পন্থা হল সাক্ষাৎ ভক্তিযোগে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। 'শাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তির কথা বলা হয়েছে। কোথাও জীবভক্তি বা 'জীবে প্রেম' বলা হচ্ছে না। কিন্তু পাষণ্ডীরা ভগবানকে পাষাণ বলে ধরে নিয়েছে এবং জীবকেই ভগবান বলে মনে করছে।

যেই মূঢ় কহে,—'জীব' 'ঈশ্বর' হয় 'সম'।
সেই ত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তার যম ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১১৫)

সুতরাং পাষণ্ডীদের যমলোকের দ্বারস্থ হতে নির্দেশ করা হয়েছে।

যারা পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করে না, তারা অন্যকারোর সেবা করারও অনুপযুক্ত। তারা জীবসেবার নামে জীবের সঙ্গে পরিহাস করছে। এই বিষয়টি বুঝতে পারা এমন কিছু কঠিন নয়। জগৎ দুঃখময় উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। প্রতি পদে পদে এখানে বিপদ। এই রকম জগতে জীব বদ্ধ। সেই বদ্ধ জীবকে দু'মুঠো অন্ন দেওয়া, পরতে কাপড় দেওয়া, তার রোগব্যাধিতে কিছু ওষুধ দিলেই জীবের দুঃখময় পরিস্থিতির সমাধান হয় না। কসাইখানায় বাঁধা ছাগলকে দু'মুঠো কচি ঘাস প্রদান করাটা তার সমস্যার সমাধান নয়। সেটি এক রকমের পরিহাস মাত্র।

জীবের সমস্ত সমস্যার সমাধান তখনই হয়, যখন জীব নিজের মনগড়া মত ও পথ না গ্রহণ করে পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাপন্ন হয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে কোনও দুশ্চিন্তা করো না।" (গীতা ১৮/৬৬) অর্থাৎ,

একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হতে হবে, তা হলেই এই দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে। সেই জন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে, পরম বন্ধু হচ্ছেন তিনি, যিনি আমাদের শ্রীকৃষ্ণভক্তি—শ্রীকৃষ্ণসেবা অনুশীলন করতে শিক্ষা দেন।

সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা ॥ (চৈঃ মঃ)

অতএব যারা পরমনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বাদ দিয়ে বদ্ধ জীবের সেবা করার প্রয়াস করছে, অবধারিতভাবে তারা এই জড় জগতেই আবদ্ধ থাকবে। এবং কখন পশুপাখি, কখনও কীটপতঙ্গ, কখনও মানুষ কিংবা দেব শরীর ধারণ করে স্বর্গ ও নরকাদি সুখদুঃখ ভোগ করতে থাকবে।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১১৭)

জড় বস্তু দিয়ে বদ্ধ জীবের সেবা করলেই ভগবানের সেবা করা হয়—এই ধারণা যাদের রয়েছে তাদের পন্থা ভ্রান্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে বরং বিপরীত কথাই বলা হয়েছে—

যথা তরোর্মূল নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধভুজোপশাখাঃ ॥
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হনমচ্যুতেজ্যা ॥

"বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করা হলে যেমন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা উপশাখা ইত্যাদি সঞ্জীবিত হয়, উদরে খাদ্য দিলে যেমন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, তেমনই ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের পূজা বা সন্তোষ বিধান করা হলে ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ নিখিল জীবের আলাদা করে পূজা করার দরকার হয় না।" (ভাঃ ৪/৩১/১৪)

ভগবানই জীবের অভাব পূরণ করতে পারেন। মানুষ নিজেই অভাবগ্রস্ত। সে সব সময় কিছু না কিছু অভাব বোধ করে। সে আবার অন্য কার অভাব পূরণ করবে আর অল্প আয়ু নিয়ে কত দিনই বা অন্য জীবের অভাব পূরণ করবে? কিন্তু ভগবান বলছেন, *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্* (গীতা ৯/২২) "আমি অভাব অভিযোগ পূরণ করি।"

কিন্তু কলিবদ্ধ মানুষের ভগবান সম্পর্কে কোনও স্থান নেই। তারা ভগবানকেই গ্রাহ্য করে না। তারা সারাদিন জীব সেবা করছে। ঠাকুর সেবা বাদ দিয়ে কুকুর সেবা করছে। শহরে কোন কোন মানুষকে দেখা যায় তারা ভোরে উঠেই কতকগুলি কুকুরকে বেড়াতে নিয়ে যায়। কুকুরগুলোকে সাবান মাখানো, খাওয়ানো, আদর করা, কাছে নিয়ে ঘুমানো—সারাদিনে তাদের কত রকমের সেবা করে চলেছে। কিন্তু তাদের জানা উচিত, জগতে অগণিত জীব রয়েছে যাদের মানুষেরা কেউ পালন করছে না, সেবা করছে না, তাদের দেখাশোনা কে করছে? তারা কি আহার-নিদ্রা-আত্মরক্ষা-মৈথুনের সমাধান করতে পারছে না?

যাই হোক, শাস্ত্রে সদা সর্বদা ভগবানের সেবায়, ভগবানের সেবক অর্থাৎ তাঁর ভক্তের সেবায় নিয়োজিত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে অভক্ত হয়ে জীবসেবা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

প্রশ্ন ১১। ভক্তরা একজন আরেকজনকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করেন। কেন?

উত্তর ঃ অন্যদের ভগবানের প্রিয়জন মনে করে নিজেকে তাঁদের দাস বলে মনে করাই দৈন্য ও নম্রতার লক্ষণ। তাই 'প্রভু' সম্বোধনটি ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ১২। কলিবদ্ধ মানুষ যদি কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ না করে, তা হলে তাদের অসুবিধা কি?

উত্তর ঃ কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণকারী জন এই জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্র অতিক্রম করে নিত্য শাশ্বত আনন্দময় ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার অত্যন্ত মহান সুদুর্লভ সুযোগ লাভ করবে। জড় জগতের মধ্যে নানারকমের পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গদের দেহ ধারণ করে বহুবিধ দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে জন্ম-জন্মান্তর ধরে বদ্ধ জীবকে আর থাকতে হবে না। আর, যে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করবে না, তার মতো দুর্ভাগা এই মহা বিশ্বে আর কেউ নেই।

শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীপাদ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে লিখেছেন—

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা ।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥
এ-বন্যায় যে না ভাসে, সেই অন্ত্য জীব ছার ।
কোটিকল্পে কভু তার নাহিক নিস্তার ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩/২৫২-২৫৩)

তাঁরা এই পৃথিবীতে সুবুদ্ধিমান বলে শাস্ত্রে বিবেচিত হয়েছেন, যাঁরা হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছেন।

যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ (ভাঃ ১১/৫/৩২)

"সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই সংকীর্তন যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের যজন করে থাকেন।" বাদবাকী ব্যক্তিরা এই তথাকথিত সভ্য সমাজে যতই ভাল ব্যক্তি হন না কেন, সকলেই দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন। তাই বলা হয়েছে—

সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার ।
সর্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৩/৭৭-৭৮)

প্রশ্ন ১৩। যে কোনও লোক কি বৈষ্ণব হতে পারে?

উত্তর ঃ বস্তুতপক্ষে প্রত্যেকের স্বরূপই বৈষ্ণবতা। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে (ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু) প্রত্যেকের হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান। আর প্রত্যেক জীবের পরিচয় হল সে শ্রীবিষ্ণুর নিত্য দাস অর্থাৎ বৈষ্ণব। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।

ভগবানের সেবা করাই তার একমাত্র ধর্ম। সেটা না জানাই অজ্ঞতার কারণ। তাই যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বৈষ্ণব হতে পারেন।

প্রশ্ন ১৪। কৃষ্ণ সূর্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাহাঁ কৃষ্ণ তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার। —এ কথার তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যের সঙ্গে, মায়াকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সূর্যালোক থাকলে জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়। সূর্য না থাকলে অন্ধকার সেই স্থান অধিকার করে নেয়। আমরা যদি কৃষ্ণচিন্তা কৃষ্ণসেবা করি, তবে আমাদের মন-প্রাণ শুদ্ধ হয়। আমরা যদি কৃষ্ণচিন্তা কৃষ্ণসেবা না করি, তবে আমাদের মন-প্রাণ অবশ্যই কলুষিত হয়। অজ্ঞতার মায়া-অন্ধকার থেকে আমরা যদি মুক্ত হতে চাই, তবে কৃষ্ণভাবনামৃতরূপ জ্ঞান-সূর্যালোকে আসতে হবে।

প্রশ্ন ১৫। আপনাদের আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী এই জগতে তিনটি সত্য— "এক—কৃষ্ণ সত্য, দুই—কৃষ্ণভক্তি সত্য, তিন—কৃষ্ণভক্ত সত্য।" কিন্তু (ক) কৃষ্ণ নিজেই বলেছেন তাঁর গীতার বাণীতে যে, যিনি যাঁকেই ভক্তি বা পূজা করুন না কেন তা যদি সঠিক আচরণ ও ভক্তিসহ হয় তবে তিনি সেই একই ঈশ্বরের কাছে যান। তাই নয় কি? (খ) পূর্বপুরুষগণও কি এতই বোকা ছিলেন যে, অন্যান্য দিকেও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের আরাধনার ফলে জগতের কাছে পূজনীয় হয়ে আছেন?

উত্তর ঃ (ক) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনও কোথাও বলেননি যে, যাঁকে-তাঁকেই ভক্তি বা পূজা করলেই ভগবানের কাছে যাওয়া যাবে। যাঁকে-তাঁকে ভক্তি বা পূজা ভালমতো করে গেলেই সেই একই ভগবানের কাছে যাওয়া যাবে—এই প্রতারণা মূলক ভয়ঙ্কর কথাটি মায়াবাদী লোকেরা সারা পৃথিবীতে প্রচার করে শ্রদ্ধেয় হয়ে বসে আছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, যারা ভক্তি করে অন্য দেবতাদের পূজা করছে, তারা আমার পূজা করছে অবৈধভাবে। *যজন্তি অবিধিপূর্বকম্।* (৯/২৩)

পরের শ্লোকেই (৯/২৪) বলা হয়েছে, সমস্ত আয়োজনের বা যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু হচ্ছেন এক শ্রীকৃষ্ণ। এইভাবে তাঁকে যে না জানে সে তত্ত্বজ্ঞান থেকেই বিচ্যুত। তার পরের শ্লোকেই (৯/২৫) বলা হয়েছে, দেব-দেবীর যারা উপাসনা করে তারা দেব-দেবীর লোকেই যেতে পারবে, যারা ভূত-প্রেতের পূজা করছে তারা ভূত-প্রেতলোক লাভ করবে, যারা পিতৃপুরুষদের উপাসনা করে তারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করবে, কিন্তু যারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে তারা শ্রীকৃষ্ণধাম লাভ করবে।

অতএব, যার-তার পূজা করেই কখনও এক ভগবানের কাছে পৌঁছানো যাবে না।

(খ) আমাদের পূর্বপুরুষগণ অবশ্যই বোকা ছিলেন না। তাঁদের জীবনী, তাঁদের কথা, বৈদিক শাস্ত্রে বিশেষত শ্রীমদ্ভাগবতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত রয়েছে। প্রত্যেকেই

ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো এই অজ্ঞান অন্ধকারময় জগতে জ্ঞান আলোক প্রদানকারী। তাঁরা কেউ ছিলেন রাজর্ষি, কেউ মহর্ষি, কেউ দেবর্ষি, কেউ ব্রহ্মচারী, কেউ গৃহস্থ, কেউ বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী, কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য বা শূদ্র, কেউ নারী বা পুরুষ—কিন্তু প্রত্যেকেই ছিলেন পরমভক্ত। প্রত্যেকেই ছিলেন শ্রীহরির উপাসক। কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর উপাসক। তাঁরা কৃষ্ণভজনেরই নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

কিন্তু সেই সমস্ত মহান ভক্তদের বিরোধিতা করছিল যে সমস্ত অসুরেরা, তাঁরাই বিভিন্ন দেব-দেবীর কঠোর উপাসনায় ব্রতী হয়েছিল। সেই বিষয়ে কারও অজানা থাকারও কথা নয়। আর কলিযুগের অধিকাংশ মানুষই সেই আসুরিক পন্থা অবলম্বন করছে সন্দেহ নেই।

অতএব, আপনার প্রশ্ন অনুসারে উত্তর এই যে, পূর্বপুরুষগণ নিশ্চয় বোকা নন। বরং যারা পূর্বপুরুষগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করছে তারাই বোকা। যারা কৃষ্ণভজন করে তারা অবশ্যই সুবুদ্ধিমান। *যজন্তি হি সুমেধসঃ।* শাস্ত্রে বলে "যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। যে জন মায়া ভজে সে হয় ফতুর॥" শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার ভজনা যারা করে তারাই বোকা।

প্রশ্নটি হচ্ছে যারা দেব-দেবীদের পূজা করেছেন তাঁরা বোকা ছিলেন কি না? হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে মহাভারত। মহাভারতের সার হচ্ছে ভগবদ্গীতা। হিন্দুরা বেশির ভাগ দেব-দেবীর আরাধনার পক্ষপাতী এবং অনেকে মনে করেন যে হিন্দুরা বহু দেব-দেবীর উপাসক। আর না কি দেব-দেবীরাই সব ভগবান। কিন্তু এই ধারণাটিই মহা মূর্খতা। কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জড়জাগতিক কামনা-বাসনার দ্বারা যাদের বুদ্ধি বিকৃত করা হয়ে গেছে তারাই বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে। যেমন—*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানা প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতা।* (৭/২০) অর্থাৎ, কামনা-বাসনার দ্বারা জ্ঞান ভ্রষ্ট হয়ে গেলেই লোকে বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাগত হয়। *তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।* (৭/২০) মানুষ তার নিজ স্বভাব অনুসারেই অনুরূপ দেব-দেবীর উপাসনা করে।

আপনার প্রশ্ন হচ্ছে, উপাসনা যদি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে হয় তাহলে সেই উপাসনার ফলে ভগবানের কাছে যাওয়া যাবে। কিন্তু জানতে হবে শ্রদ্ধা সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিন রকমের মানুষের শ্রদ্ধার কথা বলেছেন। *ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা। সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃনু॥* (গীতা ১৭/২) অর্থাৎ, "দেহীদের স্বভাব জনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। সাধারণত সাত্ত্বিক গুণের মানুষেরা দেব-দেবীদের পূজা করে। রাজসিক গুণের মানুষেরা যক্ষ-রাক্ষসদের পূজা করে। তামসিক গুণের মানুষেরা ভূত-প্রেতদের পূজা করে। (গীতা ১৭/৪) কিন্তু যারা এই তিন গুণের উর্ধ্বে অর্থাৎ, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের, তারাই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে। (ভাঃ ৪/৩/২৩)

তাই আসল নিঁখুত শ্রদ্ধা হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি-শ্রদ্ধা। সেই কথাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়॥

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন বহু বহু জন্মের পরে যদি কেউ যথার্থ জ্ঞানবান ব্যক্তি হন, তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণই যে সমস্ত কিছুর পরম মূল এই কথাটি বুঝে শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হন।

শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যারা অন্য দেব-দেবীর ভজনা করছে তারা যে সত্যিই অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি—সেই কথাটি পরিষ্কার ভাবেই গীতায় (৭/২৩) বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

অর্থাৎ, "যাদের বুদ্ধি অল্প তারা যে আরাধনা করে সেই আরাধনা লব্ধ ফলও অনিত্য ও অস্থায়ী। দেব-দেবীদের যারা উপাসনা করে তাদের আরাধ্য সেই সেই দেবলোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যারা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্ত হয় তারা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) পরম ধাম প্রাপ্ত হয়।"

অতএব যে সব ব্যক্তি দেব-দেবীদের অত্যন্ত সনিষ্ঠ ভক্ত তারা অবশ্যই সেই সেই দেব-দেবীর লোকেই গমন করবে, কিন্তু পরম ধাম ভগবানের ধামে যেতে হলে ভগবানের ভক্তই হতে হবে।

(গ) তার পরের প্রশ্ন হচ্ছে, যাঁরা কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপাসনা করেন, জগতে তাঁরা কিভাবে এত পূজনীয় ও শ্রদ্ধেয় হচ্ছেন। তার উত্তর হচ্ছে, *তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।* (৭/২০) মানুষ তার নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে অনুরূপ পছন্দসই ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তার কয়েকটি স্থূল উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হয়। যেমন যারা মাছ-মাংস ডিম খাওয়ার প্রতি আগ্রহী তারা উগ্র মূর্তি চণ্ডী বা কালীর পূজা করে বিশেষ পদ্ধতিতে সেই সব রক্ত মাংস খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। যারা দৈহিক ক্ষমতা অর্জনে প্রচণ্ড আগ্রহী তারা কালভৈরবের পূজা করে।

আবার, যারা অবৈধ যৌনসঙ্গে আগ্রহী তারা সিনেমা-তারকাদের চিত্র বা ফটো স্মরণীয় আলেখ্য স্বরূপ ঘরে দেওয়ালে সাজিয়ে রাখে। যারা জুয়াতাস পাশায় আগ্রহী তারা রাক্ষস বা ভূতপ্রেতের পূজা করতেই পারে। অনেকে রয়েছেন যাঁরা এক ভারতীয় নাস্তিক গোমাংসভোজী হিন্দুনেতার আলেখ্যে প্রতিদিন সকালে ফুল দিয়ে থাকেন। অনেকে আছেন যাঁরা কোনও খেলোয়াড়ের প্রতি খুবই শ্রদ্ধা সম্পন্ন, যদি সেই খেলোয়াড় কোন ক্রমে হেরে যায় তবে তাঁরা মনো ক্ষুন্ন ও বিরক্ত হয়ে টিভি রেডিও ভেঙ্গে ফেলে। এমনকি প্রাণ পর্যন্তও দিয়ে দেয়। আবার দেখাও যায় কোনও কোনও রাজনৈতিক নেতার প্রতি লোকে এতই শ্রদ্ধাসম্পন্ন যে, ঘুম থেকে উঠেই সেই নেতার কথা পড়বে, অথবা তার চিত্র দেখবে। যদি কোনও কারণে সেই নেতা হত হয়, তাহলে তারা দিশাহারা হয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের সামনে কোন লোককে নেতার দল বিরোধী জ্ঞান করেই

হঠাৎ মেরে ফেলে। হয়ত নিহত সেই লোকটি বেচারা রাজনৈতিক ব্যাপারে কিছুই জানে না। অনেকে আবার যোগ সিদ্ধি প্রদর্শন করা নেশাখোর মাতাল ইত্যাদি 'বাবা'দেরকে ভগবদ্ জ্ঞানে সন্ধ্যা-সকালে ভক্তিভরে উপাসনা করছে। তাদের তথাকথিত মধুর মধুর বাণী হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশের বিরুদ্ধ আচরণ করছে। এই ধরনের মোহগ্রস্ত শ্রদ্ধার বা পূজার কি মূল্য আছে? অধিকন্তু এই ধরনের শ্রদ্ধা বা পূজার ফলে মানব-সভ্যতা জঘন্য রূপ ধারণ করেছে।

প্রশ্ন ১৬। মানুষ মাত্রেই আস্তিক হোক কিংবা নাস্তিক হোক সকলেই ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে। ঈশ্বর কি সব মানুষকে সমানভাবে আদর করেন? যদি আদর করেন, তবে কেউ হাসে কেউ কাঁদে কেন?

উত্তর ঃ সকলেই ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে—এটি ঠিক নয়। সকলের ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব বেদে তাই-ই ব্যক্ত হয়েছে। সেই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রকাশ বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার সর্বযুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। রাবণ, বাণাসুর, কংস, জরাসন্ধ ইত্যাদি বহু মহাপরাক্রমশালী অসুরেরা আপন বৈভব ও ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা ও আরাধনা করে দেব-দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিল। তাদের কাজটাই ছিল পরমেশ্বরের বিরোধিতা করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদেরকে উৎপীড়ন করা। তাই, প্রশ্নানুসারে উৎপীড়নকারীকে এবং উৎপীড়িত নিরীহ ব্যক্তিকে ভগবান সমান ভাবেই আদর করুন—এরকমটি কে চায়?

প্রশ্নানুসারে না কি মানুষ মাত্রই ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন (গীতা ১৭/৪) সাত্ত্বিক মানুষেরা ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র চন্দ্র ইত্যাদি দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা করে তাঁদের আরাধনা করে। রাজসিক মানুষেরা যক্ষ রাক্ষস ইত্যাদি প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এবং তামসিক মানুষেরা ভূত প্রেতের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে (ভাঃ ৪/৩/২৩) সত্ত্বং বিশুদ্ধং বাসুদেব-শব্দিতম্ অর্থাৎ 'বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত মানুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আরাধনা করেন।' ঘোর রাজসিক মানুষেরা হিটলার ইত্যাদি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে প্রতিদিন পূজা করে চলে, কেউ বা রোজ কোন সমাজসেবী বিপ্লবী কবি ইত্যাদির আলেখ্যকে শ্রদ্ধা জানায় আর ফুলমালা পরায়। তামসিক লোকেরা শ্মশানে কিংবা মৃত লোকের উদ্দেশ্যে, কোন গাছকে যেখানে ভূত আছে কিংবা উগ্র বা তমোগুণের দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নৈবেদ্য অর্পণ করে। আর যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী, তারা তো ঈশ্বর নিরাকার এই জ্ঞানে যাকেই উপাসনা করুক আর বড় বড় শ্রদ্ধা দেখাক না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা উপাস্য বা শ্রদ্ধেয় বস্তুকে পরিত্যাগ করে।

জীবের শ্রদ্ধা যতক্ষণ পর্যন্ত না শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা জড়া প্রকৃতির যে কোন গুণের দ্বারা কলুষিত হতে পারে। জড় জগতের কলুষিত গুণ হৃদয়ে প্রবেশ করে। এইভাবে প্রকৃতির বিশেষ কোন গুণের সংস্পর্শে হৃদয় প্রভাবিত হওয়ার ফলে জীবের সেই গুণে শ্রদ্ধার প্রকাশ হয়।

আপন ভোগ উন্মুখ স্বার্থ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারে। কিন্তু সেই শ্রদ্ধাটি হচ্ছে কপটতা বা ছলনা মাত্র। যেমন মহাভারতে দেখা যায়, দুর্বুদ্ধি রাজনীতিবিদ দুর্যোধন নাস্তিক হয়েও আপন দল ও ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তার প্রাসাদে তথাকথিত প্রীতি ভোজের আয়োজন করে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে আপ্যায়ন করেছিল। যাতে কৃষ্ণকে যদি কোন মতে আপন করায়ত্তে আনা যায় তাহলে পাণ্ডবদের অনায়াসে বধ করা যাবে। এইভাবে অনেক কিছু হাবভাবকে শ্রদ্ধা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা শ্রদ্ধা পদবাচ্যই নয়। ভগবানই আমার জীবন সর্বস্ব এই মনোভাব নিয়েই ভগবানে অহৈতুকী প্রীতিই শ্রদ্ধা।

'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥

কৃষ্ণভক্তিহীন মানসিকতা সম্পন্ন সমস্ত মানুষের তথাকথিত শ্রদ্ধা প্রকৃত শ্রদ্ধা নয়।

পরিশেষে প্রশ্নটিতে বোঝা যায় যে, না কি ভগবান কাউকে আদর করছেন বলে সে হাসে, কাউকে অনাদর করছেন বলে সে কাঁদে। কিন্তু এইভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপের বিচার করা ঠিক নয়। পাণ্ডবেরা ছিলেন ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে থাকলেও তাঁরাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন ও কেঁদেছিলেন। নাস্তিকেরা বরং বেশি হাসে। কারণ তারা মনে করে জগৎটা হচ্ছে সুখভোগের বিরাট সুযোগের স্থান। সুখভোগের নেশায় অনেকে হাসতে হাসতে গর্হিত জঘন্য কর্ম করতেও কুণ্ঠা বা দুঃখ বোধ করে না। কেউ যদি লোকহত্যা করে হাসে, কিংবা নেশা করে মাতলামি করে হাসে, অন্য ভাইদের প্রতারণা করে হাসে, তখন আমরা মনে করতে পারি না যে, সেই ব্যক্তিকে ভগবান আদর করছেন বলেই সে হাসছে।

প্রশ্ন ১৭। সব কিছু ভগবানের। ভগবানকে বাদ দিয়ে জগতে কিছু নেই। অতএব আমি যা কিছুই আরাধনা করি তাতেই তো ভগবানের আরাধনা করছি। তাই নয় কি?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, আমি এই দেহজুড়ে রয়েছি। দেহের সবটাই আমি বা আমার। কিন্তু যখন খাবার খেতে হয়, সেটাতো দেহটির মুখের মধ্যে দিয়ে নিতে হয়, মলদ্বার কিংবা অন্য কোন ছিদ্র দিয়ে চলে না। দেহের নয়টি দ্বার রয়েছে—দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি নাসারন্ধ্র, একটি মুখগহ্বর, একটি মূত্রনালী, একটি মলদ্বার। এতগুলি রন্ধ্র থাকলেও কেবল মুখরন্ধ্র দিয়েই খাদ্যদ্রব্য চালানো হয়। অন্য কোন রন্ধ্রে খাদ্যদ্রব্য চালনা করা উচিত নয়। তেমনই ভগবান বলেছেন, *মাম্ একং শরণং ব্রজ।* ভগবানের একমাত্র আরাধনা করতে হবে। যার তার আরাধনার কথা বলা হয়নি। যা কিছুরই আরাধনা করা গেলেই সেটি ভগবানেরই আরাধনা হয়ে গেল বলে মনে করাটা মূর্খামি।

প্রশ্ন ১৮। কর্ম বড়, না ধর্ম বড়?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নটা যথার্থ নয়। কর্মহীন ধর্ম কিংবা ধর্মহীন কর্ম—এই দুটির কোনটারই মূল্য নেই। তিন রকমের কর্ম আছে—পুণ্যকর্ম, পাপকর্ম ও ভক্তিকর্ম।

যে কর্ম করলে পরিণামে জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়, কিংবা মৃত্যুর পর স্বর্গগতি লাভ হয়, সেই শাস্ত্র-বিহিত কর্ম হচ্ছে পুণ্যকর্ম।

যে কর্ম করলে পরিণামে কষ্টই ভোগ করতে হয়, কিংবা মৃত্যুর পর নরকগতি লাভ হয়, সেই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম হচ্ছে পাপকর্ম।

যে কর্ম করলে পাপ ও পুণ্য এই দুয়ের উর্ধ্বে বৈকুণ্ঠগতি লাভ হয়, সেই শাস্ত্র-নির্ধারিত ভগবৎ সেবামূলক কর্ম হচ্ছে ভক্তিকর্ম।

পুণ্যকর্ম ফলে স্বর্গ-সুখ ভোগ হয়, সুখ ভোগ করতে করতে পুণ্য শেষ হয়ে গেলে আবার এই মর্ত্যলোকে জন্মাতে হয়। *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।*

পাপকর্ম ফলে নরক-যাতনা ভোগ হয়, যাতনা ভোগ করতে করতে পাপরাশি শেষ হয়ে গেলে আবার এই মর্ত্যলোকে জন্মাতে হয়।

ভক্তিকর্ম ফলে বৈকুণ্ঠ-জীবন প্রাপ্তি হয়। ভয়ংকর বৈষ্ণব-অপরাধ না করলে ভক্তি নষ্ট হয় না। বরঞ্চ বৈকুণ্ঠ-গতি হওয়ার ফলে তাকে আর এই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিপূর্ণ মায়ার জগতে ফিরে আসতে হয় না।

যদি কেউ জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর দুঃখময় চক্রে ঘুরপাক খেতে না চান তবে তিনি ভগবদ্ ভক্তি-সেবামূলক কর্ম করবেন।

ধর্ম হচ্ছে, আমাদের জন্য ভগবানের দেওয়া নিয়মকানুন। *ধর্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতম্।* ধর্ম হচ্ছে ভগবানের দেওয়া নিয়মকানুন। সেই নিয়ম-কানুনটি কি—যে যেখানে যেরূপ অবস্থায় থাকি না কেন? জীবনের সম্পূর্ণ অর্থাৎ শতভাগই হরিভজনে যুক্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ আপনার যাবতীয় কর্ম—চাষবাস করা, চাকুরী করা, ব্যবসা করা, ঝাড়ু দেওয়া, রান্না করা, ঘর সংসার করা, সন্ন্যাস নেওয়া, কথা বলা, সিনেমা দেখা, বাজার করা, বই পড়া, গান শোনা, খাওয়া দাওয়া, ঘর সাজানো, জল আনা—সবই ভগবৎ সেবাকর্মের অনুকূলে, ভগবানকে কেন্দ্র করেই গড়ে তুলতে হবে। ভগবদ্ প্রীতির উদ্দেশ্যে এইভাবে জীবন যাপন করাটাই মনুষ্য-জন্মের একমাত্র কর্ম এবং একমাত্র ধর্ম। আর সেটিই একমাত্র শাশ্বত পরম গতি লাভের কারণ।

প্রশ্ন ১৯। ব্রহ্মা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাঁর উপাসনা না করে আমরা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি কেন?

উত্তর ঃ আমাদের দৈহিক সমস্ত উপাদান এবং জীবনীশক্তি শ্রীকৃষ্ণ থেকে এসেছে। ব্রহ্মা কেবলমাত্র দৈহিক গঠন বা আকৃতি দান করেছেন মাত্র। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ভগবানের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা ভগবানের দেওয়া উপাদানগুলি নিয়ে নানাবিধ জীব প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন।

শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে গীত করেন—

ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

" আমি ব্রহ্মা যাঁর শক্তি পেয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা হয়েছি, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি।।" (শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার উক্তি থেকে সুন্দর শিক্ষা পাওয়া যায়—"হে শ্রীকৃষ্ণ, যতদিন পর্যন্ত আপনার প্রতি জগতের মানুষ অনুরাগী না হয়, ততদিন পর্যন্ত তারা জড়জাগতিক মোহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই থাকবে।" (ভাঃ ১০/১৪/৩৬)

শ্রীব্রহ্মা তাঁর দিব্য ভাবনা থেকে সঞ্জাত পুত্র শ্রীনারদকে নির্দেশ দিচ্ছেন—

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যু সমাকুলে।
পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্থিতম্ ॥

" জন্ম-মৃত্যু এবং বিভিন্ন রকমের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সমন্বিত ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদ-সঙ্কুল জড় সংসার থেকে মুক্ত হতে হলে একমাত্র উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকা। এ সত্য সর্বতত্ত্ববিদ্ স্বীকৃত।" (স্কন্দ পুরাণ)

অতএব স্বয়ং ব্রহ্মার নির্দেশ অনুসারে এই মানব-জাতির একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে হবে। শ্রীব্রহ্মাকে কৃষ্ণভক্ত জেনে আমাদের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

প্রশ্ন ২০। কৃষ্ণসেবা করে লোকে শ্রীকৃষ্ণের ধামে চলে যায়। আর তাকে এই জগতে জন্মাতে হয় না। কিন্তু আমি এই জন্মের মতো পরজন্মেও এই পৃথিবীতে কৃষ্ণসেবা করতে চাই। আমার সেই আশা কিভাবে পূর্ণ হবে?

উত্তর ঃ জড় বদ্ধ শরীরে ঠিক কৃষ্ণসেবা হয় না। জরা-ব্যাধিমুক্ত ও কৃষ্ণসেবার অনুকূল শরীর এখানে লাভ হয় না। জড় জগতের বিভীষিকার মধ্যে কৃষ্ণসেবা কখনও সম্পূর্ণও হয় না। আসল সেবা চিন্ময় জগতে। চিন্ময় শরীরে চিন্ময় সেবা। জড় জগতে তো কেবল মাত্র কৃষ্ণের সেবা অনুশীলন। তা ছাড়া, প্রতি পদে পদে তো এখানে বিপদ। কলিবদ্ধ মানুষের মন যে কোনও সময় কৃষ্ণসেবার নামে মায়াসেবার প্রতি উন্মুখ হতে পারে। এই বিভীষিকাপূর্ণ মায়ার জগতে, যেখানে প্রতি পদে পদে বিপদ (পদং পদং যদ্ বিপদাং) সেখানে পুনর্জন্ম নিয়ে কৃষ্ণসেবা করব, এই রকম আশা পোষণ করা খুব একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়।

ভক্তরা ভয় পান, কারণ কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা আসতেই পারে। ভগবানের কাছে বৈষ্ণবগণ প্রার্থনা করেন 'নিজ কর্ম দোষে যে জন্ম পাই না কেন, হে কৃষ্ণ, তোমার পাদপদ্ম যাতে কখনও না ভুলে যাই।'

আমাদের বুঝতে হবে জড় জগৎটি জেলখানা তুল্য। এখানে বারে বারে জেলে থাকা ভাল নয়। কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই আশা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন না যে, 'হে ভগবান, আমি পুনর্জন্ম নিয়ে আবার জেলখানায় আসতে পারি এবং জেলখানার ডাল ভাত ও প্রহার খেয়ে তোমার নাম স্মরণ করতে পারি।'

তবে এই জড় সংসারের প্রতি আসক্তি বজায় রাখতে চাইলে পুনর্জন্ম নিয়ে কৃষ্ণসেবার প্রার্থনা করতে পারেন।

প্রশ্ন ২১। শ্রীশঙ্করাচার্য বেদজ্ঞ মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মহাদেবের অবতার। তিনি কেন কৃষ্ণভজন করার শিক্ষা দেননি?

উত্তর ঃ শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে পার্বতী দেবীকে মহাদেব বলছেন—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা ॥

"হে দেবী, আমি কলিযুগে ব্রাহ্মণ মূর্তি ধারণ করে অসৎ শাস্ত্র মাধ্যমে মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত স্থাপন করি।"

ভগবদ্ বিমুখ ঘোর নাস্তিক আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষের চেতনা থেকে ভগবান নিজেকেই আড়াল করে রাখতে চাইলেন। তাই ভগবান তাঁর প্রিয়জন মহাদেবের মাধ্যমে মায়াবাদ প্রচার করতে নির্দেশ দিলেন। ভগবান শ্রীহরি মহাদেবকে বললেন—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাং চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥

"তোমার কল্পিত মতবাদের দ্বারা মানুষদের আমার প্রতি বিমুখ করে তোল। আমাকে এমনভাবে গোপন কর যাতে বহির্মুখ মানুষেরা তাদের সংসার-প্রবৃত্তি কর্মে বিরক্তি না জন্মে। বরং তারা উত্তরোত্তর জড়-জাগতিক উন্নতিতে আগ্রহী হয়।" (পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ৬২/৩১)

তাই মায়াবাদের মধ্যে ভগবানকে একটা নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু উপলব্ধ হয় না। অবশ্য এভাবে অসৎ শাস্ত্র মায়াবাদ প্রকাশ করার ফলে মহাদেবের অবতার শ্রীশঙ্করাচার্যকে দোষ দেওয়া যাবে না। কারণ তিনি কেবলমাত্র ভগবানের আদেশ পালন করেছেন। সেই জন্যেই তিনি কল্পনা করে নাস্তিক শাস্ত্র রচনা করেছেন। সেই কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্য ৬/১৮০) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন—

আচার্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ॥

কিন্তু সেই মহাদেবের অবতার শ্রীশঙ্করাচার্য বিশেষ কারণে ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে মায়াবাদ প্রচার করলেও, তাঁর প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করতেও তিনি ভুলেননি। তিনি অবশ্যই মানুষকে অহৈতুকী কৃপাবশত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। শঙ্করাচার্য নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন—

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
সম্প্রাপ্তে সন্নিহিতে কালে ন হি
ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে ॥

"ওহে মূর্খের দল, তোমরা গোবিন্দের ভজনা কর, গোবিন্দের ভজনা কর, গোবিন্দের ভজনা কর। তোমাদের ব্যাকরণ জ্ঞান আর বাক্য বিন্যাস মৃত্যুর সময়ে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।"

প্রশ্ন ২২। ভগবানের সান্নিধ্য লাভের উপায় কি?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদ্ সান্নিধ্য লাভের উপায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনায় তার মনকে নিযুক্ত করে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই ভক্তি নিবেদন করে, তাঁর পূজা অর্চনা করে, তাঁকে একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে, সেই জীব ভক্তি বলে তাঁকে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণলোকে উন্নীত হতে পারবে।

প্রশ্ন ২৩। জীবনের মানে কি?

উত্তর ঃ যিনি জীবনীশক্তির উৎস সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবার উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করাটাই জীবনের আসল মানে।

প্রশ্ন ২৪। ভগবানের সেবা করে, বিনিময়ে কতটা আনন্দ পান?

উত্তর ঃ অফুরন্ত।

প্রশ্ন ২৫। কিভাবে দুঃখ নিবারণ সম্ভব হয়?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ সেবা-প্রীতিবিনা এই দুঃখময় সংসারে দুঃখ নিবারণ সম্ভব নয়। মানুষ যখন শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে চিন্তা, কর্ম, আচরণ করে তখন পরিণামে সেই চিন্তা সেই কর্ম সেই আচরণ তারজন্য এই জড় জগতে শোক দুঃখই নিয়ে আসে। কিন্তু সেই চিন্তা, সেই কর্ম কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হলে পরিণামে তার অন্তহীন অনাবিল আনন্দ লাভ হয়।

প্রশ্ন ২৬। ভোগে শান্তি, না ত্যাগে শান্তি?

উত্তর ঃ ভোগে কিংবা ত্যাগে কোনটাতেই শান্তি নেই। শান্তি পাওয়ার সূত্রটি ভগবান এইভাবে বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

সব কিছু আয়োজনের ভোক্তা হচ্ছেন কৃষ্ণ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হচ্ছেন কৃষ্ণ, সমস্ত জীবের বন্ধু হচ্ছেন কৃষ্ণ। এই তিনটি কথা যে বুঝতে পারবে সে-ই শান্তি লাভ করতে পারবে।

সমস্ত কিছুর মালিক কৃষ্ণ। বলা হচ্ছে না যে, বদ্ধ জীব কোন কিছুর মালিক। অতএব কোন জীব শ্রীকৃষ্ণের সম্পদ ভোগ করতে চাইলে সে শাস্ত্রমতে দণ্ডনীয় হবে। ভোগকারী কৃষ্ণ। আমরা জীব ভোগ করবার কে? আমাদের সর্বাঙ্গ, আমাদের মস্তিষ্ক,

আমাদের জীবনী শক্তি শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন। আমরা নিজেরা বানাইনি। সমস্ত মাটি জল বায়ু আকাশ বাতাস যেগুলি আমরা ভোগ করছি সেগুলি আমাদের তৈরি করা জিনিষ নয়। অতএব আমার বলে কিছু থাকলে তবেই না সেই বস্তু ভোগ করা কিংবা ত্যাগ করার প্রশ্ন আসে। প্রকৃতপক্ষে আমার বলে কিছুই নেই। আমাদের পরিচয় হচ্ছে "নিত্য কৃষ্ণদাস" কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়ে কৃষ্ণের কৃপার ওপর নির্ভর করেই আমাদের থাকতে হয়।

আপনার মনে হয় জানা নেই, শ্রীল রূপ গোস্বামী নির্দেশ দিয়েছেন যে, *বিষয়ান্ যথার্হম্ উপযুঞ্জতঃ নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধেঃ* বিষয়গুলিকে শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করতে হবে যথার্থভাবে। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু আবার বলছেন—যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধিত বিষয়কে জড়বুদ্ধিতে ত্যাগ করে তবে সেই ত্যাগীবৈরাগী ফল্গু বা ভণ্ড বলেই পরিচিত হন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের গ্রহণ করতে হবে কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সমস্ত বিষয় এবং ত্যাগ করতে হবে কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল বিষয়—*দ্যূতং পানং স্ত্রীয়ঃ সুনা*—জুয়া-নেশাভাঙ-অবৈধ যোষিৎসঙ্গ ও জীবহিংসা। সুতরাং অন্যভাবে বলা যায়, শান্তি ভোগে কিংবা ত্যাগে নয়, শান্তি কৃষ্ণভক্তিতে—কৃষ্ণসেবায়। কোনও কিছু ত্যাগ করতে কিংবা আপনসুখের জন্য ভোগ করতে বলা হচ্ছে না, প্রীতিপূর্ণভাবে কৃষ্ণসেবায় যুক্ত করে বিষয়ের যথার্থ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ২৭। অষ্ট যোগসিদ্ধি কি কি?

উত্তর ঃ অষ্ট সিদ্ধি হল ঃ ১) অনিমা—এই সিদ্ধির প্রভাবে স্বেচ্ছায় যোগী অত্যন্ত ক্ষুদ্ররূপ ধারণ করতে পারে। ২) লঘিমা—এই সিদ্ধির প্রভাবে যোগী ইচ্ছা করলে অত্যন্ত হালকা হয়ে যেতে পারে, ফলে জলের উপর হেঁটে চলা কিংবা আকাশে ভেসে বেড়াতে পারে। ৩) মহিমা—এই সিদ্ধির প্রভাবে যোগী ইচ্ছা করলে বিশাল রূপ ধারণ করতে পারে। ৪) প্রাপ্তি—এই সিদ্ধির প্রভাবে যোগী ইচ্ছা করলে বহু দূরের কোনও বস্তুকে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে পারে। হাত বাড়িয়ে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত কোন বৃক্ষ থেকে ফল পেড়ে আনতে পারে। ৫) ঈশিতা—এই যোগসিদ্ধির প্রভাবে কেবল ইচ্ছার দ্বারাই একটি সম্পূর্ণ গ্রহ সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস করা যায়। ৬) বশিতা—এই সিদ্ধির প্রভাবে যে কোনও মানুষকে বশীভূত করা যায়। ৭) প্রাকাম্য—এই যোগসিদ্ধির প্রভাবে যে কোনও জড় বাসনা পূর্ণ করা যায়। ৮) কামাবশায়িতা—এই সর্বোচ্চ যোগসিদ্ধির প্রভাবে জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

শ্রীগৌরহরির পার্ষদ শ্রীল রসিকানন্দদেব যোগসিদ্ধির ভাবনায় প্ররোচিত না হয়ে যুগধর্ম হরিনাম জপকীর্তনে ব্রতী হতে নির্দেশ দেন। ব্রজের কুসুমাসব সখার অবতার মায়াপুরবাসী শ্রীধর পণ্ডিতকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অষ্টসিদ্ধি দান করতে চাইলে শ্রীধর পণ্ডিত যোগসিদ্ধিগুলিকে অনিত্য ও অনর্থ জ্ঞান করে প্রত্যাখ্যান করেন এবং মহাপ্রভুর নিত্য সেবায় যুক্ত হওয়ার বাসনা পোষণ করেন। তাতে গৌরহরি আরও বেশি প্রসন্ন হয়েছিলেন। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের পরম বৈষ্ণব তিরুমঙ্গাই-এর চারজন যোগসিদ্ধ শিষ্য গুরুদেবের নির্দেশে কেবলমাত্র বিষ্ণুসেবার উদ্দেশ্যেই যোগসিদ্ধির ব্যবহার করেছিলেন।

প্রশ্ন ২৮। গৃহস্থ ভক্তদের নামের শেষে 'দাস অধিকারী' কথাটি যুক্ত হয় কেন?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।' সেইজন্য ভক্তদের নামটি ভগবানের কোন বিশেষ নাম দিয়ে তার সঙ্গে 'দাস' কথাটি যুক্ত করা হয়। গৃহস্থগণ যাঁরা গৃহে থেকে ভগবদ্ বিগ্রহের সেবা অর্চনায় অধিকার লাভ করেছেন, পারমার্থিক গুরুদেবের মাধ্যমে অধিকার প্রাপ্ত—এই সূত্রে তাঁরা 'অধিকারী' নামে আখ্যাত হন।

প্রশ্ন ২৯। কৃষ্ণভক্তি যদি জীবনের একমাত্র কর্তব্য হয়ে থাকে, তা হলে কৃষ্ণ ছাড়া অন্যান্য কর্ম কি বাদ দিতে হবে?

উত্তর ঃ কর্ম ত্যাগ করতে কৃষ্ণ কোথাও বলেননি। প্রত্যেকেই তার সদ্‌গুণ ও প্রবণতা অনুসারে ক্ষমতা অনুসারে কর্ম করবেই। কিন্তু সেই সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য হবে কৃষ্ণপ্রীতি। নিজের ইন্দ্রিয় তোষণ বিষয়ভোগবাসনা চরিতার্থ করতে মানুষ যে যে কর্ম করে থাকে সেই একই কর্ম সম্পাদিত হবে ভোগবাসনা বাদ দিয়ে কৃষ্ণপ্রীতি বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে। তা হলে সেটিই কৃষ্ণভক্তি। সেই ভক্তিকর্মফলে জীব চিন্ময় আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে। এই কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। অন্যথায় সমস্ত কর্মই দুঃখময় বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে যোগসাধন করতে হবে। সেখানে কৃষ্ণ বলছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

"ভগবদ্ প্রীতিসম্পাদন করার জন্যই কর্ম করা উচিত। তা না হলে সমস্ত বৈষয়িক কর্ম এই জড় জগতে বন্ধনের কারণ হবে। তাই হে কুন্তীপুত্র অর্জুন, যদি তুমি সর্বদা ভগবৎ সেবা-প্রীতির জন্যই তোমার কর্তব্যকর্মগুলি করে চলো তা হলে সেইভাবে তুমি সর্বদা ভববন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।" (গীতা ৩/৯)

অর্জুন যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ বলেছিলেন আমার নির্দেশেই তোমার যুদ্ধ কর্তব্য। যুদ্ধকর্ম পরিত্যাগ করে ভিক্ষুক হয়ে শান্তি খোঁজা ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে উচিত নয়, তা কাপুরুষতার লক্ষণ। তাই অর্জুন যুদ্ধ করেছিলেন যেহেতু সেটি কৃষ্ণের নির্দেশ।

প্রশ্ন ৩০। শিব হচ্ছেন পরম বৈষ্ণব। ভগবানের চেয়ে ভক্তের পূজাই বড়। তা হলে আমরা কেবল শিব পূজা করলে ক্ষতি কি? কৃষ্ণপূজা করতে যাব কেন?

উত্তর ঃ হরিবংশ শাস্ত্রে শিবের নির্দেশ এই যে, "তোমরা সত্ত্বগুণে স্থিত হয়ে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করো। সর্বদা কৃষ্ণমন্ত্র জপ করো এবং সর্বদা কৃষ্ণে মন রাখো।" (হঃ ভঃ বিঃ ১/১/৭৪)

প্রশ্ন ৩১। যোগমায়া কাত্যায়নীর পূজা করার ফলে গোপীরা কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করল। নইলে কৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়া যেত না। এই প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর দিয়ে সন্দেহ নিরসন করুন।

উত্তর ঃ কাত্যায়নী পূজা না করলে যে গোপীদের পক্ষে কৃষ্ণকে মোটে পাওয়া যাবে না—এরকম নয়। বরং কালী, দুর্গা, কাত্যায়নী দেবীর তথাকথিত ভক্তদের শিক্ষা করা উচিত যে, যোগমায়া কাত্যায়নীর পূজা করার একমাত্র তাৎপর্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া। কৃষ্ণসম্বন্ধহীন পূজা এই জগতে বিড়ম্বনা মাত্র। এটাই গোপীদের আচরণ থেকে শিক্ষা পাওয়া উচিত।

রাজসিক লোকেরা জাঁকজমকভাবে মহামায়া দুর্গার পূজা করতে খুবই আগ্রহী। তারা তাদের ভোগ-উন্মুখ মানসিকতার জন্য মহামায়ার কাছে জাগতিক ভোগসুখের বিষয় প্রার্থনা করে থাকে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ তারা ভুলেই যায়। তাই সেই নিত্য সম্বন্ধ কৃষ্ণভক্তিসুখ লাভের জন্য জড়জাগতিক চেতনাবদ্ধ জীবদের শিক্ষার্থে কাত্যায়নী বা দুর্গার পূজা করে তাঁর কাছে গোপীরা চিরকালের উপযুক্ত পতি সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন মাত্র।

প্রশ্ন ৩২। মাঝে মাঝে দেখা যায় ভগবানের মন্দির, বিগ্রহ ও ভক্ত খরা-বন্যা-ঝড় ও আসুরিক লোকদের দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরূপ অবস্থাকে কিরূপভাবে মেনে নেওয়া উচিত?

উত্তর ঃ ভক্তিজগতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সব কিছুই ভগবানের। ভক্ত ভগবদ্ সেবায় যুক্ত থাকে। নিজের ভোগের বিষয় তার কিছু নেই। তাই তার হারিয়ে যাওয়ার দুঃখও নেই। জীবনহানি হলেও সে চিন্ময় ধামে ফিরে যাবে। জড়জগতে থাকলে নতুন উদ্যমে ভগবৎ সেবার জন্য যত্ন নেবে। জড়জাগতিক সৃষ্টি-ধ্বংস তাণ্ডবে ভক্তহৃদয় প্রকৃতপক্ষে বিচলিত হয় না। ভক্তিহীন পরিবেশে ভক্ত কষ্ট ও অস্বস্তি অনুভব করে।

প্রশ্ন ৩৩। শান্ত ও দাস্য ভক্ত কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে ভক্ত সাধারণতঃ ভগবানের রূপ দর্শন করে, ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তন করে, ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করে, ভগবানের ধাম ও লীলা দর্শন করে, ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করে, ভগবানের কথা চিন্তা করে আনন্দ পেয়ে থাকেন, সেই শান্তভক্ত। যেমন—চতুষ্কুমার, শুকদেব গোস্বামী ইত্যাদি। ব্রজের পশুপাখী, নদী, বৃক্ষলতাও শান্তভক্ত।

যে ভক্ত সাধারণতঃ ভগবানের নির্দেশানুসারে নিয়মিত ভগবৎ সেবা সম্পাদন, পদসেবা, তৈলমর্দন, গৃহমার্জন, আসবাবপত্র তৈরি, বাজারাদি ইত্যাদি করবার চেষ্টা করেন সেই দাস্য ভক্ত। যেমন—রক্তক, পত্রক, রামভক্ত হনুমান ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৩৪। 'জগতে তিনটি জিনিস নিত্য সত্য ঃ কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত।' এ কথা কোথায় রয়েছে?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শচীমাতাকে এই কথা বলেছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (মধ্য ১/১৯৪) উল্লেখ রয়েছে।

প্রভু বলে—"আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণকমল গুণধাম॥
সত্য কৃষ্ণনাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে-যে-জন॥"

প্রশ্ন ৩৫। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (২/৪৫ তাৎপর্যে) ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'বেদ সাধারণত সকাম কর্ম করার শিক্ষা দান করে, ফলে সাধারণ মানুষ জড়সুখ উপভোগের মাধ্যমে জড়ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পর জড়াপ্রকৃতিকে অতিক্রম করে অধোক্ষজে উত্তীর্ণ হতে পারে।' (১) এই অধোক্ষজ কথার অর্থ কি? (২) বেদ নিষ্কাম কর্ম করার শিক্ষাদান করে কি না?

উত্তর ঃ (১) 'অধোক্ষজ' বলতে জড়-ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত যিনি সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বোঝায়। যতদিন পর্যন্ত মানুষ এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে সুখভোগের চিন্তায় মগ্ন থাকবে ততদিন পর্যন্ত সেই অধোক্ষজে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসতে পারে না। তাই জড়া প্রকৃতির সুখ-দুঃখ অতিক্রম করতে হয়। জড়জাগতিক সুখ-দুঃখে বিচলিতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে শুদ্ধ ভক্তিস্তরে আসা সহজ হয় না।

(২) বেদে কি কর্ম সম্পাদন করে জড় জগতে বেশি সুখ ভোগ করা যাবে সেই কর্মের কথা বেশি বলা হয়েছে। তারপর জগতে সুখের স্থায়িত্ব নেই তাও বলা হয়েছে। মানুষ সেই সুখের আশাতে বহু বিড়ম্বনা দেখে মুক্তি কামনা করে। মুক্তি কিভাবে পেতে হয় তাও বলা হয়েছে। এভাবে 'ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলে অশান্ত।' কিন্তু 'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত।' বেদে তামসিক মানুষদের জন্য বলিদান ইত্যাদি হিংসাযুক্ত সকাম কর্ম-বিধি, রাজসিক মানুষদের জন্য হিংসারহিত সকাম কর্মবিধি, সাত্ত্বিক মানুষদের জন্য মুক্তি-ইচ্ছামূলক সকাম কর্ম-বিধি এবং শুদ্ধসাত্ত্বিক স্তরে মানুষদের জন্য ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশে নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হয়েছে।

অর্থাৎ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি স্তরটি হচ্ছে স্বত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের উর্ধ্বের স্তর। অধোক্ষজে উত্তীর্ণ হতে হলে জড়াপ্রকৃতির এই তিনগুণের সুখ-দুঃখমূলক দ্বন্দ্ব মোহ অতিক্রম করতে হবে।

প্রশ্ন ৩৬। ব্রজবাসী কাদের বলে?

উত্তর ঃ যাঁরা ব্রজ ধামে বাস করেন তাঁদের ব্রজবাসী বলা হয়। এটি সাধারণ কথা। আর বিশেষ কথাটি হল, যাঁরা কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত আছেন

তাঁরা পৃথিবীর যে কোনও স্থানে বাস করুন না কেন তাঁরা ব্রজবাসী। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষাদর্শে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে যাঁরা এই জগতে বাস করছেন তাঁরা যথার্থ ব্রজবাসী।

প্রশ্ন ৩৭। এই জড় জগতে মুক্ত কারা?

উত্তর ঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে ॥

"যিনি তাঁর দেহ, মন ও বাক্য দিয়ে ভগবান শ্রীহরির দিব্য সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন, তিনি এই জড় জগতে থাকা কালেও সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত থাকেন। তাঁকেই জীবন্মুক্ত বলা হয়।" (ভঃ রঃ সিঃ ১/২/১৮৭)

প্রশ্ন ৩৮। বিজ্ঞানযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য দেবদেবীর পূজা করছে, তারা সেভাবে আমারই পূজা করছে। —এ কথা কি সত্য?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জ্ঞানবান ব্যক্তি বহু বহু জন্মের পর এই কথাটি বুঝতে পারে যে—এই চরাচর মহাবিশ্বের সবকিছুর কারণ হচ্ছে আমি কৃষ্ণ স্বয়ং, তখন সেই জ্ঞানবন্ত ব্যক্তি আমার ভক্ত হয়। এভাবে আমার একান্ত উপাসনা করে আমাকেই লাভ করে। কিন্তু সেই রকমের মহাত্মা এই জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন, যারা নানা রকমের জড় জাগতিক কামনাবাসনার দ্বারা হতজ্ঞান হয়েছে, সেই সমস্ত হতবুদ্ধি বা অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা তাদের গতানুগতিক রুচিকর ভূত, প্রেত বা অন্য কোন দেব-দেবীর আরাধনা করে থাকে। এভাবে তাদের উপাস্যজনের কাছ থেকে অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী বস্তু লাভ করে থাকে। (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা)

প্রশ্ন ৩৯। এই জগতে ভগবানের নিত্য সেবা কোন্‌টি?

উত্তর ঃ এই জগতে নিজে কৃষ্ণভক্তি আচরণ করা এবং অপরকে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে প্রেরণা দেওয়া—এটাই ভগবানের প্রিয় সেবা।

প্রশ্ন ৪০। কলিযুগে 'কৃষ্ণনামই' একমাত্র গতি, তবে 'কৃষ্ণসেবা' করব কেন?

উত্তর ঃ কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি সেবা মনোভাব না থাকলে কৃষ্ণনামও কেউ করতে পারে না। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

'শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনই আমাদের জড় চক্ষু কর্ণের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয় না। কেউ যখন অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হয়, তখনই তার জিহ্বায় কৃষ্ণনাম স্বয়ং স্ফূর্তিলাভ করে।

প্রশ্ন ৪১। শুনেছি সবাইকে আকর্ষণ করেন বলে ভগবানের নাম হচ্ছে কৃষ্ণ। তাহলে তো জগতের সবাইর কৃষ্ণভক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা। তাই নয় কি?

উত্তর ঃ চুম্বকের আকর্ষণ রয়েছে। লোহা তার সংস্পর্শে এলেই সহজে আকৃষ্ট হবে। চুম্বকের মতো শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-আকর্ষণে লোহারূপ জীবেরা আকৃষ্ট হবে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু লোহাতে মরিচার আস্তরণ থাকলে ওটা আকৃষ্ট হয় না। জল-আলো-হাওয়ার সংস্পর্শে থেকে থেকে লোহাটি বিকৃত হয়ে মরিচায় পরিণত হয়। জড় বিষয় ভোগপ্রবণতার মধ্যে থাকতে থাকতে জীবহৃদয় কলুষিত হয়ে পড়ে। তখন সেই জীব সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিবোধ হারিয়ে ফেলে। শ্রীকৃষ্ণভক্তি হচ্ছে জীবের স্বাভাবিক অবস্থা এবং কৃষ্ণভক্তিহীনতা হচ্ছে জীবের বিকৃত অবস্থা।

প্রশ্ন ৪২। কৃষ্ণভক্তরা অন্য দেবদেবীর প্রতি অনাদর করেন কিনা? অন্য দেবদেবীর প্রসাদ তাঁরা গ্রহণ করেন না কেন?

উত্তর ঃ কৃষ্ণভক্তরা অন্য দেবদেবীকেও পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দাসদাসী জ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু দেবদেবীর উপাসকেরা যেহেতু অমেধ্যভোজী হন কিংবা কৃষ্ণপ্রসাদ সেই দেবদেবীকে নিবেদন করেন না, সেই জন্য কৃষ্ণভক্তদের সেই প্রসাদে আদর নেই।

প্রশ্ন ৪৩। যারা কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণসেবা করেন না, কিন্তু দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, পথিকদের জন্য জল সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি রকমের জনহিতকর কর্মে আত্মনিয়োগ করে তারা কি ভগবানকে লাভ করতে পারে না?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবত মতে একনিষ্ঠ ভাবে ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। সম্যক ভাবে ভগবৎ সেবায় আত্মনিয়োগ করে ভগবানের সনাতন ধামে ভগবানের নিত্য সেবানন্দে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। সেটি শুদ্ধসত্ত্ব স্তর। এতে নিত্য বৈকুণ্ঠ জগতের বাসিন্দা হওয়া যায়। কিন্তু তমো ও রজোগুণের উর্ধ্বে যে সত্ত্ব স্তরে কর্ম—জনসাধারণের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়া—তা পুণ্যকর্ম। এসব কর্মের ফলে বৈকুণ্ঠ জগতের বাসিন্দা হওয়া যায় না, ভগবানকে লাভ হয় না। এতে কেবলমাত্র জড় জাগতিক ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের সুবিধা পাওয়া যায়, এই ধরনের পুণ্যকর্মা ব্যক্তিদের জন্য স্বর্গলোকের বাসিন্দা হওয়ার সুযোগ রয়েছে। মর্তের তুলনায় স্বর্গে অনেক গুণ অধিক জড় সুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারা যাবে। তারপর সুখ ভোগের ফলে সঞ্চিত পুণ্য শেষ হয়ে আসবে। *ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।* (গীতা) পুণ্য ক্ষীণ হলে আবার এই পৃথিবীতে এসে জন্মাতে হবে।

প্রশ্ন ৪৪। পশুপাখিরাও কী ভগবানের সেবা করে ভগবদ্ ধামে উন্নীত হতে পারে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, কৃষ্ণনাম কীর্তন করে কিংবা কৃষ্ণনাম শ্রবণ করে, ভগবৎ প্রসাদ বা চরণামৃত সেবন করে গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখিও বৈকুণ্ঠগতি লাভ করতে পারে এ কথা নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলেছিলেন। শচীমাতাকে নিমাই দেখিয়েছিলেন কুকুরবাচ্চাগুলো হরিনাম কীর্তন করে ভগবদ্ ধামে চলে গেল। উড়িষ্যার ঝাড়িখণ্ড অরণ্যে সমস্ত হিংস্র স্বভাব পশুরা হিংসা ভুলে গিয়ে কৃষ্ণনামে নৃত্য করতে লাগল

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে। শিবানন্দের কুকুর, রসিকানন্দের হাতি, পর্ণিগোপালের বাঘ ইত্যাদি অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। রামায়ণের শকুন, বানর, পদ্মপুরাণের বৃক্ষ, কপোত, ইদুঁর প্রভৃতির মুক্তির কাহিনী অনেকেই জানেন।

কীটপক্ষীমৃগানাঞ্চ হরৌ সন্ন্যস্তচেতসাম্ ।
ঊর্ধ্বামেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্ ॥

অর্থাৎ, "কীট, পক্ষী এবং পশুরাও পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় শরণাগত হলে জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ করতে পারে, অতএব বুদ্ধিমান জ্ঞানী মানুষদের আর কি কথা?" (গরুড় পুরাণ)

প্রশ্ন ৪৫। আমার ভাই সর্বদাই কৃষ্ণসেবায় মত্ত থাকত। কৃষ্ণছাড়া সে কিছুই জানত না। কিন্তু আজ তার এমন রোগগ্রস্ত অবস্থা হয়েছে যে সে আর কৃষ্ণসেবা করতে পারছে না। ভাগবতে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কৃষ্ণের শরণ নেয়, তাকে কৃষ্ণ ছাড়ে না।' তা হলে আমার ভাইকে এখন কি করা উচিত?

উত্তর ঃ 'শরণাগত ব্যক্তিকে কৃষ্ণ ছাড়েন না'। অতএব আপনার ভাই শরণাগতই থাকবে। আপনিও ভাইয়ের চিকিৎসা ব্যাপারে সহযোগিতা করে অপ্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণের সেবা করুন। আপনি ভাগবত পড়ে নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন পরমভক্ত হলেও নানাবিধ রোগ ব্যাধি আঘাত ব্যাঘাত তার উপরও আসে এবং ভক্ত কৃষ্ণচিন্তা মাধ্যমে সমস্ত জাগতিক দুশ্চিন্তামুক্ত থাকেন।

প্রশ্ন ৪৬। 'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন ।
মন মলিন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥"—চৈঃ চঃ

তবে বিষয়ী লোকের টাকা নিয়ে ইসকন শ্রীধাম মায়াপুরে বিশাল মঠ মন্দির তৈরি করছে, এতে কি কোন দোষ হয় না?

উত্তর ঃ বিশেষ রকমের ঝুঁকি নিয়ে কৃষ্ণভক্তরা বিষয়ী-অবিষয়ী নির্বিশেষে প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে কৃষ্ণনাম মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছেন। উদ্দেশ্য হল মানুষকে বিষয়-ভোগবাদের অশুভ পরিণতি থেকে উদ্ধার করে কৃষ্ণভক্তির পথে নিয়ে আসা। বিষয়ী বলতে তাদেরই বোঝায়, যাদের বিষয়-ভোগ তৃষ্ণা প্রবল। শ্রীল প্রভুপাদ বিষয়ী তাদেরকে বলেছেন, যারা মাংস খাওয়া, নেশা করা, অবৈধ যৌনসঙ্গ এবং জুয়া কখনও বর্জন করতে চায় না। তাদের চরিত্র কলুষিত হওয়ার ফলে তারা সব সময় ভগবানের ও ভক্তের বিরোধী, কপটাচারী ও কৃপণ প্রকৃতির। অতএব তাদের কাছে ভক্তরা কিছুই গ্রহণ করে না। এমন কি বৈষ্ণব-ভেকধারী বিধিনিষেধ-বিচারবিহীন সহজিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ও বিষয়ীর অন্তর্ভুক্ত। যারা গৃহস্থ অর্থাৎ পরিবারের ব্যয়ভার বহনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন, তাঁদের মোট আয়ের অর্ধাংশ ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত করতে বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব যাঁরা প্রীতি সহকারে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করছেন ভগবানের মন্দির নির্মাণের জন্য, তাঁরা সাধারণ ব্যক্তি নন। বাইরের

দৃষ্টিতে বিষয়ী অবিষয়ী পার্থক্য নির্দেশ করাও উচিত নয়। কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৯/৪১)

ভগবানের অপ্রাকৃত নাম প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে তার প্রকৃত সত্তার কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়। যার ফলে যথার্থই তার উপকার সাধিত হয়। অতএব এই পৃথিবী গ্রহে নাম প্রচারের জন্য ইসকনের যে শুভ প্রয়াস, তার কোনও ক্ষয় নেই। বদ্ধ জীবকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করাই প্রচারের লক্ষ্য। ভগবদ্ মহিমা প্রচারের একটি বিশেষ অঙ্গ হল ভগবানের সর্বাকর্ষণীয় মন্দির নির্মাণ। ভগবৎ সেবায় অর্থ, শ্রম ইত্যাদি সহযোগিতাই প্রত্যেকের কাম্য। জড় জাগতিক বিষয়ের মোহবন্ধন মুক্ত হলে মানুষ প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, কৃষ্ণসেবাই সহজাত অধিকার। অতএব যাঁরা সহযোগিতা করছেন, তাতে কারও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
ন হি কল্যাণকৃৎকশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥

"হে পার্থ, শুভানুষ্ঠানকারী পরমার্থবিদের ইহলোক এবং পরলোকে কোন দুর্গতি হয় না। হে বৎস, তার কারণ, কল্যাণকারীর কখনো অধোগতি হয় না।" (গীতা ৬/৪০)

কিন্তু যাঁরা শ্রীমন্দির নির্মাণ তথা অন্যান্য প্রচারকার্যে আন্তরিক আগ্রহভরে মুক্ত হস্তে অর্থ-শ্রম-সহানুভূতি সহযোগিতা করছেন, তাঁদের বিষয়ী ভেবে অবহেলা করা বা তাঁদের দেওয়া উপযুক্ত দ্রব্যকে বিষয় জ্ঞানে অবহেলা করার কোনও যুক্তি নেই। বরং শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

অর্থাৎ, "যখন কোনও কিছুর প্রতি মানুষের আসক্তি থাকে না, কিন্তু সেই সময়ে সে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় সব কিছু গ্রহণ করে, তখন সে যথার্থই সকল আসক্তির উর্ধ্বে অবস্থান করে থাকে। আর অন্যদিকে, যে ব্যক্তি সব কিছু বর্জন করছে অথচ সেগুলির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তার নেই, তা হলে বুঝতে হবে, তার বৈরাগ্য সম্পূর্ণ হয়নি।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২৫৫-২৫৬)

তাই আমাদের গুরু-আচার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গোস্বামী লিখেছেন—

"হরি-সেবায় যাহা হয় অনুকূল ।
বিষয় বলিয়া তার ত্যাগে হয় ভুল ॥"

(বৈঃ শ্লোঃ ৩০ পৃঃ ৩৯৪)

কৃষ্ণসেবার অনুকূল বস্তুকে যদি কেউ বিষয় জ্ঞানে পরিত্যাগ করে, তবে তা বড়ই ভুল করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, কপটাচারী উৎপাত সৃষ্টিকারী বিধিবিচারহীন অবৈষ্ণব বিষয়ীদের অন্ন ভক্তরা কখনই গ্রহণ করতে যান না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তরা বিষয়ীর সঙ্গ প্রভাবে হয় তো কৃষ্ণভক্তির পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। অতএব সাবধান বাণীর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু ভগবৎ সেবার জন্য অনুকূল বা উপযুক্ত বস্তু গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়নি। বিশেষ করে, একজন মহাভাগবতের কাছে কোন কিছুই জড় বিষয় নয়। তথাকথিত বিষয়ীদের প্রদত্ত বিষয়কে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় লাগাতে জানেন। তখন সেই বিষয় আর বিষয় থাকে না, তা চিন্ময় হয়ে যায়।

প্রশ্ন ৪৭। বৈষ্ণবগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, কিন্তু অন্য দেব-দেবীকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করেছেন, *অহমাদির্হি দেবানাং* (১০/২) 'আমিই দেবদেবীদের উৎস'। ভগবানের ভক্তেরা ভগবানকেই স্মরণ করেন, তাঁরই মহিমা কীর্তন করেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

একমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্তনং স্মরণং প্রভোঃ ।
কুর্বতাং পরম প্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে ॥ (২০ বিলাস)

অর্থাৎ, "ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত পরম প্রীতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণেরই কীর্তন ও স্মরণ করেন, অন্য কোনও কাজে তাঁদের প্রায়ই রুচি হয় না।" তবে কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্তেরা অন্যান্য দেব-দেবীদের পূজা না করলেও সমস্ত দেব-দেবীকে শ্রদ্ধা করেন, অবজ্ঞা করেন না। শ্রীপদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে—

হরিরেব সদারাধ্য সর্বদেবেশ্বরেশ্বর ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন ॥

অর্থাৎ, "সমস্ত দেবতার ঈশ্বর, সমস্ত ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সদাসর্বদা আরাধ্য। তবে ব্রহ্মা শিব প্রমুখ দেবতাদেরও কখনো অবজ্ঞা করা উচিত নয়।" ব্রহ্মা শিব দুর্গা লক্ষ্মী—অন্যান্য সমস্ত দেব-দেবী ভগবানের অধীন ভক্ত। ভগবানের দাস-দাসী মাত্র। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ আছে, "একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।" (আদি ৫/১৪২) শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা বলছেন, "*গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তমহং ভজামি।*"—'হে আদিপুরুষ গোবিন্দ, তোমাকে আমি ভজনা করি।'

অনেকে মনে করে, দেব-দেবীদের পূজা করা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা একই। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অপরাধ মূলক ধারণা। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন যে, তারা *যজন্তি অবিধিপূর্বকম্* (গীতা ৯/২৩) অর্থাৎ বিধিবিহীনভাবে পূজা করে। তাদের বুদ্ধিহীন বলা হয়েছে। কারণ গাছের গোড়ায় মূল বাদ দিয়ে শাখায় উপশাখায় পাতায় জল সেচন করা বুদ্ধিহীন লোকের কাজ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন গাছের মূল স্বরূপ, আসল কেন্দ্র। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।

অর্থাৎ, "গাছের গোড়ায় সুষ্ঠুরূপে জল সেচন করলে গুঁড়ি, ডালপালা, ফুল, ফল সবই সঞ্জীবিত হয়।" সেই রকম একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হলে আলাদাভাবে অন্য দেব-দেবী বা পিতৃপুরুষের পূজা করার প্রয়োজন হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥
(ভাঃ ১১/৫/৪১)

"হে রাজন্! যিনি অপর কর্ম পরিহার করে সর্বতোভাবে একমাত্র শরণ্য মুকুন্দের শরণাগত, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত, আত্মীয়-কুটুম্ব, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট ঋণী ও কিংকর হন না।"

গীতায় (১৮/৬৫) *মামেকং শরণং*—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হতে বলা হয়েছে। আবার *অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং* (গীতা ৯/২২) অনন্যচিত্তে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৮) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমিই জড় ও চেতন বিশ্বের সমস্ত কিছুর উৎস। সমস্ত কিছুই আমার থেকেই প্রবর্তিত। যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই এই তত্ত্ব জেনে শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।"

যদি কেউ অন্য দেব-দেবীর পূজা করতে চান, তবে তাঁদের সম্পর্কে শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্ । (হ. বি. ৯/৮৭)

অর্থাৎ, "ভগবানের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ নিয়ে দেব-দেবীকে নিবেদন করা কর্তব্য।" এতে দেব-দেবীগণ বেশি প্রীত হন। যারা ভগবানকে বাদ দিয়ে অন্য দেব-দেবীর উপাসনা করে, তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্য দেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

অর্থাৎ, "যাদের মন জড় কামনা বাসনার দ্বারা অপহৃত বা বিকৃত, তারা অন্য দেব-দেবীর শরণাগত হয় এবং তারা তাদের নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।" (গীতা ৭/২০)

সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণভক্তি। এই জড়জাগতিক বিষয় বস্তুর কামনা করা অনর্থক। কারণ সেই সবই অনিত্য। এই যুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের প্রার্থনা শিখিয়েছেন—*মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*—'হে কৃষ্ণ। জন্মে জন্মে তোমাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক। অন্য কিছু চাই না।'

কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব *কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ* (গীতা ৪/১২)—নানা রকম কর্ম করে জড় ভোগ সুখসিদ্ধির কামনায় দেব-দেবীর উপাসনা করে।

প্রশ্ন ৪৮। পিতা-মাতার সেবা বড়, না স্ত্রী-পুত্রের সেবা বড়?

উত্তর ঃ পিতা-মাতার সঙ্গে সম্পর্ক যেমন অনিত্য, সেইরূপ স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গেও সম্পর্ক অনিত্য। এই জড় সংসারের সমস্ত সম্পর্কই অস্থায়ী। একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক নিত্য ও চিরন্তন। শাস্ত্রে বলে, নিত্য সম্পর্ক ভুলে গিয়ে যখনই জীব স্বতন্ত্র ভোগবাসনা করল অমনি এই দুঃখপূর্ণ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় মায়িক জগতে সে পতিত হল। "কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব ভোগবাঞ্ছা করে, নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে" (প্রেম বিবর্ত)

এই জগতে অনিত্য সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে যে-আদর যত্ন স্নেহ ভালবাসা প্রীতি—সেই সবই কখনও চিরন্তন নয়। কারও প্রতি আমাদের সহানুভূতি, প্রীতি বা দয়াভাব তার প্রতি আমাদের সেবা করার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্রের আমরা সেবা করি, কারণ তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি বা প্রীতিভাব রয়েছে।

তবে চিন্ময় জগতের যে নিত্য প্রেমের সম্পর্ক, জড় জগতে তা বিকৃত প্রতিফলন বলেই শাস্ত্রে বলা হয়েছে। বিকৃত সম্পর্কটি প্রেমের সম্পর্ক নয়। তা হল কামের সম্পর্ক, কামনা-বাসনার সম্পর্ক। স্বার্থের সম্পর্ক। অর্থাৎ যতদিন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে, ততদিন আদর-যত্ন সম্বন্ধ থাকে। স্বার্থের হানি হলে, কামনা চরিতার্থ করতে বাধা-বিঘ্ন-ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে প্রীতির সম্পর্কও নষ্ট হতে বসে।

একজন গৃহস্থ ব্যক্তি হিসাবে যেরূপ তার সহধর্মিণী স্ত্রী ও পুত্রের প্রতি কর্তব্য থাকে, তেমনই পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য থাকে। স্ত্রী-পুত্রকে অবহেলা করে পিতা-মাতার সেবা কিংবা পিতা-মাতাকে অবহেলা করে স্ত্রী-পুত্রের সেবা করা—দুই-ই বেঠিক।

সব চেয়ে বড় সেবা হচ্ছে সমগ্র পরিবারকে কৃষ্ণভাবনাময় করে গড়ে তোলা। মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন সবাইকেই কৃষ্ণভক্ত করে গড়ে তোলাই হচ্ছে একজন আদর্শ ধার্মিক গৃহস্থের কর্তব্য। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন, কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কৃষ্ণনাম কীর্তন, কৃষ্ণ পূজা অর্চনা, কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন ইত্যাদি আচরণ করার প্রয়াস যাদের নেই, তারা নারকীয় পথের পথিক মাত্র। সেই রকম ক্ষেত্রে পিতা-পুত্র পতি-পত্নী সব সম্পর্কই শাস্ত্রবিধিমতে অনর্থক। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া কোনও সেবা সম্পর্কই আমাদের কাউকেই জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্র থেকে রক্ষা করতে পারে না। তাই জগতে যার সঙ্গে যে সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া যাক না কেন, সেই সম্পর্ক যেন কৃষ্ণভক্তির অনুকূলে সংগঠিত হয়। তা হলে তার সেবাকার্য মঙ্গলজনক হবে।

প্রশ্ন ৪৯। কার সেবা বড়? পিতা-মাতার, না স্ত্রী-পুত্রের, না গুরু-গৌরাঙ্গের?

উত্তর ঃ কারও সেবা করাটাই জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি স্বরূপ। বহু জন্ম জন্মান্তরের পিতা-মাতা রয়েছে। কে কার সেবা করছে? আমরা যখন পশু বা পাখি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম তখনও সেই সেই জন্মের মা-বাবা তাদের সাধ্য মতো আমাদের পালন

করেছিল। পাখি কত কষ্ট করে বাসা বাঁধে, সন্তানের যত্ন নেয়। মাছ তার বাচ্চাদের নজরে রাখে। গরু তার বাচ্চার গা চেটে দেয় এবং দুধ খাওয়ায়। কিন্তু সেই সব পিতা-মাতার কে সেবা করে? কোন সেবা করাই হয় না।

আর তারপর স্ত্রী-পুত্রের সেবা। লোকে স্ত্রী গ্রহণ করে আপন একঘেয়েমি জীবনে আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যে। স্ত্রী আমাকে সুখ দেবে এই মনোভাবের ফলে লোকে স্ত্রীর সেবা করে। তারা যেভাবে মাতা-পিতা থেকে এসেছে তেমনই তাদের থেকে ছেলে-মেয়েরা আসবে। যদিও সেই ছেলে-মেয়েরা অন্য জীবাত্মা—তাদের পুত্র-কন্যা রূপে এসেছে মাত্র। যে মানসিকতা নিয়ে তাদের পিতা-মাতারা সেবা করেছিল তেমনই তারাও নিজেদের পুত্রকন্যাদের সেবা যত্ন করতে চেষ্টা করে। যে কোন পিতা-মাতার পক্ষে পুত্র-কন্যার সেবা করা স্বাভাবিক। আর পুত্র-কন্যারা তাদের স্নেহশীল পিতা-মাতার সেবা করাটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু স্ত্রী-পুত্রকে সেবা করা একমাত্র কর্তব্য আর পিতা-মাতাকে অবজ্ঞা করলেও চলবে, কিম্বা পিতা-মাতাকে সেবা করব আর স্ত্রী-পুত্রকে বাদ দিয়ে দেব এই রকম মনোভাব মূর্খ পশুদের হয়তো হতে পারে।

এ-তো এই জন্মের পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্রের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু বিগত জন্মগুলিতে সহস্র কোটি পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্রের কথা বাদ পড়েই গেল। তাদের তো সেবা করা যাবে না। এমন কি লোকে মাতা-পিতা স্ত্রী-পুত্রের সেবা কি করবে—বরং নানা অক্ষমতা হেতু তাদের সবার কাছে সেবা গ্রহণ করছে মাত্র, সেবা দান করা হচ্ছে না। সেই ব্যাপারটাও চিন্তা করার বিষয় রয়েছে।

কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, এই এক জীবনেও ব্রহ্মাণ্ডের সবার সেবা করা যায়, যদি ব্রহ্মাণ্ডনাথের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। আর সেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি স্বয়ং ভক্তরূপে কলিযুগে পৃথিবীতে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর সেই গৌরহরির প্রতিনিধিরূপে পারমার্থিক পথদ্রষ্টা গুরুদেব আমাদের জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধির দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় বদ্ধ সংসারচক্র থেকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁকে তুষ্ট করার ফলে ভগবান তুষ্ট হন বলে শাস্ত্রে স্বীকৃত। *যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো।* আর ভগবান তুষ্ট হলে সমগ্র জন্মের পিতামাতাদিও সন্তুষ্ট বলে শাস্ত্রে স্বীকৃত।

এইবার আপনি বিচার করুন, কার সেবা বড়। কিন্তু গুরু-গৌরাঙ্গ কখনও চান না যে, আপনি মাতা-পিতা কিম্বা স্ত্রী-পুত্রকে নদীর স্রোতে ফেলে দিয়ে এসে ভগবানের সেবা করুন। অর্থাৎ সবারই সেবা করতে হবে। সেই সেবার উদ্দেশ্য তখনই সার্থক হয়, যখন সকলে কৃষ্ণভক্ত হবে, গৌরাঙ্গ ভজনা করবে এবং পারমার্থিক গুরুদেবের চরণে আশ্রিত হয়ে জীবন-যাপন করবে।

চিন্তা করা উচিত আমি যদি ভক্ত না হই, তবে আমি নিজেই তো বদ্ধ সংসারে পতিত অধম জীব মাত্র। আমার উদ্ধার-কর্তা কেউ নেই। সেই আমি পতিত হয়ে

অন্যের সেবা করে তার জীবন কি করে সার্থক করব? নিজের জীবন যেখানে নিরর্থক সেখানে কি করে অপরের জীবন সার্থক করা যায়? শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছেন, 'জীবন সার্থক করি কর পরোপকার।' নিজের জীবন আগে শুদ্ধ ভক্তিময় করতে হবে, তারপর অপরের জীবন শুদ্ধ সুন্দর করতে পারা যাবে, নইলে কারও সেবা করার কোন মূল্য নেই। যে মানুষ কৃষ্ণসেবা করে না, কৃষ্ণপ্রসাদ খায় না, কৃষ্ণনাম করে না, মাছ-মাংস খায়, সিনেমা দেখে বেড়ায়, নেশা করে, সারাদিন লোকের সঙ্গে হুটোপুটি করে, মা-বাবা স্ত্রী-পুত্রকে মাছ-মাংস খাওয়ায়, নোংরা সিনেমা দেখায়, নেশায় মজায়, আত্মীয়-স্বজনকে বিব্রত করে মারে, সেই সব মানুষের সেবা নেওয়াও মহাপাপ। কারণ সে নিজে যাবে নরক নামক গ্রহলোকে, আর সবাইকেও সেখানে যেতে হবে। অথচ এই ধরনের মানুষও দাম্ভিক হয়ে জোর গলায় বলে, আমিই কত জনের সেবা করছি। কিন্তু আসলে সেই সেবা বিপদজ্জনক ব্যাপার মাত্র।

প্রশ্ন ৫০। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধান্তর্গত 'দিব্য ভাব ও দিব্য সেবা' প্রকরণের ষষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য বিশ্লেষণে আপনারা লিখিয়াছেন 'শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমস্ত জীবের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক'। অথচ তাহার পূর্বে বলিতেছেন 'সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের অংশ'। মৎসদৃশ হীনবুদ্ধিসম্পন্ন জনমানসে ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। কারণ, ভৃত্য কদাপি প্রভুর অংশ নহে।

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'আমিই সকলের প্রভু'। (গীতা ৯/১৮) প্রভু বলিতে বোঝায় তাঁহার ভৃত্য রহিয়াছে। ভৃত্য বলিতে বোঝায় প্রভু রহিয়াছেন। অন্যথায় প্রভু-ভৃত্য কথাটি অমূলক। এর একটি অংশ বাদ দিলে আর প্রভু ও ভৃত্য কোন অংশই তাৎপর্যহীন হইতে বাধ্য।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন।* (গীতা ১৫/৭) 'জীব হচ্ছে আমার বিভিন্ন অংশ।' ভগবান পূর্ণ পুরুষ জীব তাঁর অংশকণা। যেমন আমাদের সমগ্র শরীরের অংশ-অঙ্গ হইতেছে হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ চক্ষু ইত্যাদি। সেই অংশগুলির কার্য হইতেছে সমগ্র শরীরটির সেবা করা। যদি পদদ্বয় শরীরকে বহন না করে, চক্ষু দর্শন ক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরকে চালনার সাহায্য না করে, তবে সেই সেই অঙ্গগুলি তাৎপর্যহীন। অনুরূপভাবে ভৃত্যের কাজ প্রভুর সেবা করা। সে যদি সেবা না করে তাহলে তার ভৃত্য নামটির কোন মূল্য থাকে না।

অতএব অংশ এবং পূর্ণ, প্রভু এবং ভৃত্য—ইহা ভগবানের ক্ষেত্রে অসমীচীন ও অসাঙ্গস্য কথা কিছুই হইতেছে না। প্রকৃতপক্ষে কোন একটি জাগতিক উদাহরণ সহযোগে ভগবৎ সম্বন্ধ উপলব্ধি করা সহজে সবার পক্ষে সম্ভব যে হইয়া উঠিবে তাহা নহে। ক্রমশ চিন্তাশীল ব্যক্তির উপলব্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন ৫১। এই জগতে ঋণ পরিশোধ না করলে সংসার চক্র থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। একথার মানে কি?

উত্তর ঃ আমাদের জন্মগ্রহণের পর থেকেই আমরা এই জগতে ছয় প্রকার মহাজনের নিকট ঋণী হয়ে থাকি।

শ্রীবিষ্ণুসংহিতায় বলা হয়েছে—

দেবতাপিতৃবন্ধুনামৃষিভূতনৃণাংতথা।
ঋণী স্যাত্তদধীনশ্চ বর্ণাদির্জন্মমাত্রতঃ॥

"চারি বর্ণাদির জীব জন্ম মাত্রই দেবতা পিতৃ বন্ধু ঋষি প্রাণী ও মানুষের নিকট ঋণী ও তাদের অধীন হয়ে থাকে।"

দেবতাদের দেওয়া আলোক বাতাস জল ইত্যাদি আমরা ভোগ করছি, পিতা-মাতা গুরুজনের স্নেহযত্ন ও পরিশ্রমের ফল আমরা গ্রহণ করছি, বন্ধু-বান্ধবের নানা সহযোগিতা নিচ্ছি, ঋষিদের শিক্ষা, শাস্ত্রাদি মাধ্যমে সুষ্ঠু-জীবন গঠন করছি, খাদ্যের জন্য গাছপালা, দুধ ও চাষবাসাদি কর্মে গবাদি পশু, এমনকি মধুর জন্য মৌমাছি থেকে শুরু করে বহু প্রাণীর উপর নানা প্রয়োজনে আমরা ঋণীই। তারপর সমাজের নানা প্রকারের ব্যক্তি যেমন শাসনকর্তৃপক্ষ, সৈন্য, শহীদ, নানা ধরনের কর্মী তাদের কাছেও আমরা এই জগতে নানা ঋণে বদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁদের কাছে আমরা সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করছি তাঁদের সকলের কাছেই আমরা ঋণী হয়ে যাচ্ছি।

এই সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করলে আমাদের এই জড় সংসার চক্র থেকে মুক্তির কোনও উপায় নেই। ঋণ শোধ করতেই হবে। যদি কেউ ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে তা হলে সে অবশ্যই দণ্ডনীয় হবে।

এই জন্মে শোধ না করতে পারলে পরজন্মে সেই কাজ করতে হবে। অকৃতজ্ঞ হলে নরকের দণ্ড তো থাকেই। কেউ দাবী করতে পারে না যে, 'আমি অজ্ঞানেই এই সব নিয়েছি, আমার ঋণ শোধ করতে কোনও প্রয়োজন নেই।' কিন্তু কর্মচক্রে বিধির বিধান আমাদের কোনও দাবী বা অজুহাত মানতে রাজী নয়।

এখন সমস্যা হল, আমরা কার কাছে কত ঋণী সেই হিসাবও রাখা হয়নি, এমন কি এক-একজনের ঋণ কিভাবেই বা শোধ করতে হবে তাও জানা নেই। কেবল দিন যত যাচ্ছে অমনি ঋণও বেড়ে চলেছে বৈকী, ঋণ পরিশোধের কোথাও ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না। তাই প্রশ্ন হলো, কার কাছে কত ঋণ কিভাবে শোধ করা সম্ভব হবে? এমন কি, এ সমস্ত ঋণ আদৌ শোধ করা সম্ভব কি না?

এই রকম বিষম সমস্যার সমাধানের উপায় মুনিঋষিগণ আমাদের শিক্ষাও দিয়েছেন। কার কাছে কিভাবে ঋণী আমরা না জানলেও বুঝতে হবে যে, সর্বব্যাপ্ত এবং সর্বজীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা সকলের পরম সাক্ষী হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অতএব তাঁর কাছে জীব আত্মসমর্পণ করলে সমস্ত ঋণশোধের সমাধানটা সহজেই হয়ে যায়। আর এটি হচ্ছে একমাত্র সহজ পন্থা।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের জীবনীশক্তির মূল উৎস। তিনিই সমস্ত কিছুর পরম কারণ। তাঁর সন্তোষহেতু যত্ন করলে ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই সন্তোষ বিধান করা সম্ভব হয়। কারণ

সব কিছুই তাঁর কাছ থেকেই আসা। কি করে সম্ভব যে, একজনের সেবা করলেই সবার সেবা হয়ে যায়। উদাহরণটি শ্রীমদ্ভাগবতে দেওয়া হয়েছে এভাবেই যে, আমাদের শরীরে অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। আমার যাবতীয় কর্মে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সাহায্য সহযোগিতা করছে। খাদ্যবস্তু পেলে, তা একমাত্র উদরকেই দিতে হয়, তার ফলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও সতেজ পুষ্ট ও তৃপ্ত হয়। সেই ক্ষেত্রে আলাদাভাবে একে একে প্রত্যেক অঙ্গকে খাদ্য দিয়ে তৃপ্ত করতে যাওয়াটা নিতান্তই বোকামি হয়।

আমরা ঋণী মানেই আমরা অধীন। একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকলে আমরা ঠিক থাকতে পারব। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা হলে সমস্ত দেবতা-পিতৃ-ঋষি-দৈত্য প্রভৃতি এবং চারিবর্ণের সকল লোকেরই পূজা হয়ে যায়। সেই কথা মহাভারতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

দেবাদীনপ্ত পূজ্যোঽহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয় ।
মৎপূজনেন সর্বার্চা স্যাদ্ ধ্রুবং নাত্র সংশয়ঃ ॥

"আমি সমস্ত দেব-দেবী এবং সমস্ত বর্ণের লোকগণের পূজ্য। আমার পূজাতে নিশ্চয়ই সকলের পূজা হয়, এতে কোনও সন্দেহ নেই।" (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, উত্তর-গীতা)

ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণোঽহনাদিস্তস্মিন্ন জাণ্ডান্ত-
র্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী ।

"ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে এবং বাইরে যত মঙ্গল, কৃষ্ণসেবককৃতী ব্যক্তি সেই সমস্ত মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ থেকেই লাভ করে থাকেন।" (ঋক্‌বেদ, কৃষ্ণোপনিষদ)

শ্রীবিষ্ণুযামল সংহিতায় বলা হয়েছে—

যৎপূজনেন বিবুধাঃ পিতরোঽর্চিতাশ্চ
তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূতসলোকপালাঃ ।
সর্বে গ্রহান্তরণিসোমকুজাদিমুখ্যা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"যাঁর পূজাতে সমস্ত দেবতা, পিতৃ, ঋষি, ভূত, লোকপাল, গ্রহ সকলেই পূজিত ও সন্তুষ্ট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
নায়ং কিঙ্করো ন ঋণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"হে রাজন্, যে ব্যক্তি অন্য কর্ম বাদ দিয়ে একমাত্র শরণ্য মুকুন্দ শ্রীহরির সর্বতোভাবে শরণাগত হন, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত, আপ্ত, মানুষ ও পিতৃগণের কারও নিকট ঋণী ও কিঙ্কর থাকেন না।" (ভাগবত ১১/৫/৪১)

প্রশ্ন ৫২। মন ও বুদ্ধিকে সংযত ও স্থির রাখার প্রকৃষ্ট উপায় কি? কিভাবে চিত্তবৃত্তি পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত স্থির হবে?

উত্তর ঃ জগতের সমস্ত বস্তুই ভগবানের। *অহং সর্বস্য প্রভবঃ মত্ত সর্বং প্রবর্ততে।* সমস্ত কিছুই ভগবানের এবং ভগবানের দ্বারাই সব কিছু প্রবর্তিত। আমরা হচ্ছি ভগবানের 'নিত্য সেবক'—আমাদের এটি স্বরূপের প্রকৃত পরিচয়। অতএব জগতের কোনও বস্তুতে নিজের ভোগবুদ্ধি না করে সেইসব বস্তু ভগবদ্ সেবার উপযুক্ত—এইভাবে দর্শন করাটাই প্রকৃষ্ট দর্শন। *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং।* জগতের সমস্ত আয়োজনের ভোক্তা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। অতএব আমরা যার সঙ্গে যে সম্বন্ধে আসি না কেন, যে বস্তু-সামগ্রী পাই না কেন—যতদূর সম্ভব প্রত্যেককে ও বস্তুসামগ্রীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করবার মানসিকতা থাকলেই আমাদের চিত্ত সমস্ত রকমের কলুষ মুক্ত থাকবে, বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন থাকবে।

প্রশ্ন ৫৩। খুব পাপী মানুষরাও কি ভক্ত হতে পারে?

উত্তর ঃ "পাপী-তাপী যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই-মাধাই।"

আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে নবদ্বীপে বিশ্ববিখ্যাত দুরাচারী পাপী জগাই-মাধাই বাস করত। শোনা যায় সবরকমের পাপকর্ম তারা করেছিল, কিন্তু পরম করুণাময় পতিতপাবন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা তারা পেয়েছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, "তোমরা আজ থেকে হরিনাম জপকীর্তন কর, আর সমস্ত পাপাচার পরিত্যাগ কর।" তারা তাইই মেনে নিয়েছিল। পরম সুন্দর ভক্তে পরিণত হয়েছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা-স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম ॥

"হে পার্থ, যারা আমাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে, তারা স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, অধমকুলে জাত হলেও অবিলম্বে পরম গতি লাভ করে।" (গীতা ৯/৩৩)

এমনকি অত্যন্ত পাপী দুরাচারীদের কথাও ভগবান বলেছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্ অনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অতি দুরাচারী ব্যক্তিও অনাচার বর্জন করে যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করে, তাকেও সাধু বলে মনে করা উচিত। কারণ সে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যথার্থ মার্গে অবস্থিত।" (গীতা ৯/৩০)

এখানে 'সম্যগ্ ব্যবসিত' বা 'পূর্ণরূপে দৃঢ় সংকল্পে অবস্থিত' কথাটিতে বোঝা যায় অতি দুরাচারীও সংকল্প বা ইচ্ছা করলেই ভক্তিময় জীবন যাপন করে এই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম ধন্য করতে পারে।

প্রশ্ন ৫৪। বৃন্দাবনে দেবীপূজার প্রচলন ছিল কি? দেবীপূজা না থাকলে আয়ান ঘোষ দেবীভক্ত হবেন কি করে? আয়ানকে দেখে কৃষ্ণ কেন চতুর্ভুজা শ্যামায় পরিণত হলেন, তা হলে শ্যামাভজন শ্রেষ্ঠ, না কৃষ্ণভজন শ্রেষ্ঠ?

উত্তর ঃ বৃন্দাবনে বহু পূর্ব থেকেই দেবীপূজার প্রচলন ছিল। আয়ান ঘোষ দেবীভক্ত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্য লীলাবিলাস ক্ষেত্রে দেবীভক্তি পরায়ণ আয়ান ঘোষের সম্মুখে চতুর্ভুজা শ্যামা রূপ ধারণ করেছিলেন। শ্যামাতে পরিণত হয়ে যান নি। শ্যামারূপে প্রকাশিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সকল উপস্থিত ভক্তগণের সংশয় দূর করে আনন্দ প্রদান করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্যামারূপ ধারণ করলেন বলে যে, শ্যামাভজনই শ্রেষ্ঠ হবে, কৃষ্ণ ভজন শ্রেষ্ঠ হবে না—এরকম মনে করার কোনও অর্থ হয় না। লীলা বিলাসের ক্ষেত্রে যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ একসময় সাপ রূপ-ধারণ করেছিলেন, অতএব সাপের ভজনই শ্রেষ্ঠ, কিংবা কোকিল সুরে কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে ছিলেন অতএব কোকিলভজনই শ্রেষ্ঠ—এরকমটি চিন্তা করার কোনও মানে হয় না।

প্রশ্ন ৫৫। জীবকে রক্ষা করতে পারলেই কৃষ্ণের উপাসনা করা হয়। এ কথা সত্য না মিথ্যা?

উত্তর ঃ সমস্ত জীব রক্ষা পায় যদি একান্তেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে। কৃষ্ণ উপাসনা না করেই জীব চিরকালের জন্য দুঃখপূর্ণ মায়িক সংসারে অধঃপতিত হয়েছে বলে নির্ধারিত হয়।

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, সমগ্র মানব-সমাজকে যদি রক্ষা করতে চাও তবে অবশ্যই কৃষ্ণ-উপদেশ শিখিয়ে দাও। কৃষ্ণভক্তিতে নিয়ে এসো।

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

'সবাইকে কৃষ্ণভক্তি উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তার পরম্পরাক্রমে গুরু হয়ে এই বিশ্বকে তারণ বা রক্ষা কর।'

পরমেশ্বর ভগবানের এমন কোনও নির্দেশও নেই যে, জীবকে কয়েক বস্তা চাল, কয়েকশ টাকা এবং কয়েক বাক্স ওষুধ দান করলেই পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা সম্পাদিত হয়ে যাবে। এরকম কোনও নির্দেশ নেই। শ্রীকৃষ্ণ সর্বজীবের রক্ষাকর্তা। কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান। আপনি নিশ্চয় ভগবান নন, আপনি নিজেকেই রক্ষা করতে চাইলে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করেন। 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?' এই বাক্যটিও কিছু লোক জানে। কিন্তু আপনি যদি বলেন, 'কৃষ্ণ জীবকে

রক্ষা করতে পারবেন না। আমিই রক্ষাকর্তা।' অর্থাৎ কাউকে রক্ষা করার মতো কৃষ্ণের ঐশ্বর্য নেই, কৃষ্ণের শক্তি নেই, কৃষ্ণের বুদ্ধি নেই, কেবল আপনার ঐশ্বর্য, শক্তি ও বুদ্ধি-বলে আপনি জগতের জীবকুলকে রক্ষা করবেন। এই গূঢ় অহমিকাই আপনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা-জীবনে পর্যবসিত করবে।

প্রশ্ন ৫৬। অনুকূল ঠাকুর বলেছেন, মনে বিশ্বাস থাকলে শূকরের মাংস খেলেও কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে। একথা সত্য না মিথ্যা বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর ঃ অনুকূল ঠাকুর একথা বলেছেন কিনা তা জানি না। তবে শূকরের মাংস খাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও কেবলমাত্র দুধ খেয়েও কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না। যদি কেউ বলে, আমার কৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমি কেবল ফল ও দুধ খেয়েই ভগবানকে পেয়ে যাব—সেরকম অন্ধবিশ্বাসেও কখনও কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না। পয়োব্রতধারী এক ব্রহ্মচারীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এরকম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তাছাড়া 'বিশ্বাস' সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন—

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥

অর্থাৎ, কৃষ্ণের অভয় পাদপদ্মে শ্রদ্ধা থাকবে। বিশ্বাসটি কোনও ভাবালুতা নয়। অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং সুনিশ্চিত বিশ্বাস। কি সেই বিশ্বাস?—তা হল কৃষ্ণভক্তি করলে দুনিয়ায় কোনও করার বাকি কিছু থাকে না। সব কিছু কর্তব্যই সম্পাদিত হয়ে যায়।

শূকরের মাংস খাওয়াটা নিশ্চয়ই কৃষ্ণভক্তির অনুকূল নয়, বরং ভক্তিপ্রতিকূল বা বিঘ্নস্বরূপ। কৃষ্ণের প্রতি যার বিশ্বাস থাকবে, সে কৃষ্ণ যা বলেছেন তার বিরুদ্ধতা করবে কেন? কৃষ্ণ তামসিক আহার বা মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। তা হলে সেই মাংসের প্রতি মনোযোগী হওয়াটা কি ধরনের কৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস হল? কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজনই ভক্তির অঙ্গ। মাংস খেয়ে দুঃখময় প্রপঞ্চ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।

প্রসাদ সেবা করিতে হয়।
সকল প্রপঞ্চ জয় ॥

প্রশ্ন ৫৭। এই মায়া-সংসারে থেকেও আমরা কিভাবে মুক্ত হতে পারব?

উত্তর ঃ কৃষ্ণসেবার মাধ্যমে মুক্ত হওয়া যাবে। কৃষ্ণসেবার প্রতি যথার্থ অনুরাগ লাভ করা যায় কৃষ্ণসেবার মাধ্যমেই। শুধু ধ্যান করেই নয়। কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করে চলাই পন্থা। আমাদের যা কিছু রয়েছে, যা কিছু আমাদের ব্যবহার্য, সেইসবই ব্যবহার করা উচিত। কৃষ্ণসেবায় কোন কিছু অব্যবহৃত রাখা উচিত নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়, বাক্য, অর্থ, শক্তি, সম্পদ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হলে আমরা আর এই মায়ার জগতের মধ্যে আবদ্ধ থাকব না। জড়জাগতিক স্তর থেকে আমরা চিন্ময় স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারব। কায়মনোবাক্যে প্রতিক্ষণেই কৃষ্ণসেবায় যুক্ত থাকা যায়। কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কৃষ্ণমহিমা কীর্তন থেকে শুরু করে বিচিত্ররকমের নিত্যসেবায় যুক্ত হওয়া যায়। এভাবে চললে জড় জগতের মধ্যে জীব থাকলেও সে মুক্তজীব।

প্রশ্ন ৫৮। কৃষ্ণভাবনামৃতে থেকেও কি মানুষ জড়কর্মে লিপ্ত হয় না?

উত্তর ঃ কথা বলা একটি কর্ম, আহার করা একটি কর্ম। যখন কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধীয় কথা বলা হয় তখন সেটি জড়কর্ম নয়, কৃষ্ণপ্রসাদ আহার করা হয় সেটি জড়কর্ম নয়। সেটি কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম। যখন কৃষ্ণভাবনামৃত বাদ দিয়ে অন্য ভাবনা নিয়ে লোকদেখানো ভক্তিকর্ম করা হয়, সেটিই জড়কর্ম। সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃতের মধ্যে থেকে জড়কর্ম হয় না।

প্রশ্ন ৫৯। মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম কি?

উত্তর ঃ কৃষ্ণসেবা। নিজে কৃষ্ণভক্তি আচরণ করে অন্যদের কৃষ্ণভক্তি শিখিয়ে সবাইকে দুঃখময় জীবন চক্র থেকে চিরতরে উদ্ধারের বৈদিক পন্থা দান করাই এ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম।

প্রশ্ন ৬০। কৃষ্ণভক্তের কোনও দুঃখ-কষ্ট নেই। এই কথাটি ঠিক কিনা বুঝিয়ে দেবেন।

উত্তর ঃ কৃষ্ণভক্ত দুই রকমের। শুদ্ধভক্ত এবং মিশ্র ভক্ত। মিশ্র ভক্তের জড়-জাগতিক অভিলাষ থাকে। জড় জগৎ স্বরূপে দুঃখময়। অতএব এখানে দুঃখকষ্টহীন অবস্থা লাভ করা যায় না। শুদ্ধভক্ত ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণের শরণাগত থাকেন। অন্য অভিলাষ থাকে না। জড় জাগতিক কি দুঃখ কি সুখ এ বিষয়ে উদাসীন। তিনি কৃষ্ণচেতনায় অবস্থান করেন। কৃষ্ণ আনন্দময়। তাঁর ভক্তও আনন্দিত থাকেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, শুদ্ধভক্তির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ক্লেশঘ্নী। অর্থাৎ, শুদ্ধভক্তি ভক্তের যাবতীয় ক্লেশ নাশ করেন। জীবের এ জগতে ক্লেশের কারণ তিনটি—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা।

পাপ দুই প্রকার—অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ। যে পাপ কর্ম সংস্কার রূপে জীবের সূক্ষ্ম দেহে রয়েছে এবং যার ফল উদয়ের সময় এখন উপস্থিত হয়নি, সেই পাপকে বলা হয় অপ্রারব্ধ। আর, যে পাপকর্ম এখন ফল দিতে শুরু করেছে বা জীব এখন যে পাপফল ভোগ করছে, সেই পাপকে বলা হয় প্রারব্ধ।

যে পাপ সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে চিত্তে রয়েছে তাকে পাপবীজ বলে। সেটি পাপকর্ম নয়, তা হল পাপবাসনা। বাসনা রূপে রয়েছে। সেই বাসনা যে কোনও সময় কর্মরূপে প্রকাশিত হতে পারে এবং পরিণামে তার ফলও পেতে হবে।

অবিদ্যা হচ্ছে, বিদ্যা বা জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান। অনিত্য বস্তুতে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি জ্ঞান, দুঃখে সুখবুদ্ধি এবং অনাত্মাকে আত্মবোধ—এগুলি অবিদ্যা।

শুদ্ধভক্তি এই সমস্ত রকমের ক্লেশের কারণকে নষ্ট করে দিতে পারেন বলেই ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনকারী ভক্তের কোনও দুঃখকষ্ট নেই বলে উল্লেখ করা হয়।

প্রশ্ন ৬১। ভগবান যদি সব কিছুই জানেন, তবে আমাদের আর চিন্তা কি? আমরা ভক্ত হব, কি অভক্ত থাকব, সেটি তো আমাদের হাতের ব্যাপার নয়, সেটি ভগবানের ব্যাপার। তাই নয় কি?

উত্তর ঃ ভগবান সব কিছুই জানেন বলেই, আমাদের চিন্তাটি নিষ্ক্রিয় থাকবে এমন নয়, আমাদের চিন্তা করতে হবে সেই পরমচিন্তামণির চরণাশ্রয়ে থাকার জন্য। ভগবান চিন্তাহীনভাবে থাকতে বলেননি। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥

"অন্য চিন্তা না করে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যারা সর্বদা ভক্তি সহকারে আমার সেবা করে, তাদের সমস্ত অভাব আমি পূরণ করি এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তুর আমি সংরক্ষণ করি।" (গীতা ৯/২২)

সুতরাং কর্তব্যটি হচ্ছে কৃষ্ণচিন্তায় কৃষ্ণসেবায় অবশ্যই যুক্ত থাকা। আর যদি কৃষ্ণ বাদ দিয়ে অন্যচিন্তায় থাকি সেক্ষেত্রে কি পাব না পাব তাতে কৃষ্ণ দায়ী থাকছেন না।

অতএব চিন্তাটি কৃষ্ণের জন্যে রাখলে সৎ চিন্তায় থাকা হয়। কৃষ্ণের জন্য না রাখলে দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে। একেবারে নিশ্চিন্ত বা চিন্তাশূন্য অবস্থায় কেউ থাকতে পারে না।

৫

কলিযুগের ধর্ম হরিনাম

প্রশ্ন ১। শুনেছি পৃথিবীতে সব ধর্মই ইস্কন ধর্মে পরিণত হবে। এই সম্পর্কে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে কি?

উত্তর ঃ কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তনে সবাই উদ্বুদ্ধ হবেন এমন দিনের কথাও বহু মনীষী মানসচক্ষে দর্শন করেছিলেন। তা ছাড়া আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন যে,

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

তাই সেই বিশ্বমঙ্গল অমল হরিনাম বিশ্বব্যাপী আজ ছড়িয়ে পড়েছে ইসকন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিশেষ প্রচেষ্টায়। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থরূপ দান করতে তাঁকে বিশ্বব্যাপী গৌরবাণী প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

প্রায় দু'শ বছর আগে মহাভাগবত সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে সারা বিশ্বের মানুষ এসে মায়াপুরের ধূলিকণা মাথায় নিয়ে 'জয় শচীনন্দন গৌরহরি, জয় শচীনন্দন গৌরহরি' বলে দুহাত তুলে নৃত্য কীর্তন করবে। (ভক্তিবিনোদবাণী বৈভব) এ সমস্তই আজ ইস্কনের মাধ্যমে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "জগতের সর্বজাতির মধ্যে যাঁহারা ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা একদিন বহু বহু দূরদেশ হইতে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান দেখিতে আসিবার আশা করিবেন।" (সঃ তোঃ ১২/১)

বাংলা ১২৯৩ সালে ২/৯ সজ্জনতোষণীতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণী উদ্ধৃত হয়েছিল, "........খোল করতাল ও কীর্তনের সুর যেরূপ প্রবলতা সহকারে অন্যান্য ধর্মে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে অতি শীঘ্র চৈতন্য ধর্ম জগদ্ব্যাপী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।" (*বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার সঃ তোঃ* ২/৯) তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখে উল্লেখ করেছিলেন, "জগতে যত প্রকার ধর্ম আছে সে সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এক নাম সংকীর্তন ধর্ম হইয়া পড়িবে—ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া প্রতীত হয়।" (নিত্যধর্ম সূর্যোদয়, সঃ তোঃ ৪/৩)

প্রশ্ন ২। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

হরিনাম কি? গতিই বা কি? গতির শেষ কোথায়? কখন জীব সেই গতির কথা চিন্তা করে?

উত্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামই হল হরিনাম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্র কীর্তন করাই এই দুঃখময় জগতে এবং অনিত্য পৃথিবীতে জীবকুলের উদ্ধারের পথ। শাস্ত্রমতে, এ ছাড়া আর কোনই গতি নেই। হরিনাম সংকীর্তনই কলিকালে একমাত্র গতি।

শুদ্ধভাবে এই মহামন্ত্র জপ কীর্তন চর্চা করলে কলিযুগের মানুষ ভক্তিপূর্ণ জীবন যাপনের পথ খুঁজে পায় এবং তখন সে পরমেশ্বর ভগবানের চির আনন্দময় ধামে প্রবেশ লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। তা হলে মৃত্যুর পরে তাকে আর এই জড়জাগতিক জীবনের দুঃখকষ্টের মধ্যে ফিরে আসতে হয় না। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির আবর্ত থেকে জীব মুক্তি পায়। সেখানেই তার দুঃখকষ্টের শেষ হয়। যখন জীব বুঝতে পারে—এই জগৎ দুঃখময়, যতটুকু সুখ তা বিড়ম্বনা মাত্র, তখন তার আত্মজিজ্ঞাসা শুরু হয়—আমি কে? কোথা থেকে এলাম? কোথায় এসেছি? কেন জন্মালাম? কেন মরব?—এইভাবে চিন্তা করতে করতে সে পরম গতির কথা চিন্তা করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের শরণাপন্ন হয়। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সে তখন ভক্তিলতার বীজ লাভ করে এবং সতর্কভাবে সাধন ভজনের ফলে ভগবদ্ধামে পৌঁছায়।

প্রশ্ন ৩। কলিকালে নাম-বিনা যদি কোনও গতি না থাকে, তবে ইসকনের গগনচুম্বী মন্দিরসমূহে প্রতিদিন যাগযজ্ঞ, পূজা-অর্চনা, আরতি, জপ-তপে কি কোনই ফল নেই?

উত্তর ঃ কায়মনোবাক্যে আমাদের শুচিশুদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। সেই জন্যই মঙ্গল আরতি, কৃষ্ণভজনা, কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন ও কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা দরকার। তাই বিশ্বব্যাপী হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে এইগুলির সমস্ত রকম আকর্ষণীয় আয়োজন রাখতেই হয়।

সমগ্র পৃথিবীতে মানুষকে হরিনাম সংকীর্তনে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য ইসকন 'গগনচুম্বী' মন্দির গঠন করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকৃষ্ট করছে। কুটিরের দিকে এত মানুষ আকৃষ্ট হত না এবং এত মানুষকে কুটিরে স্থান দেওয়াও যেত না। দ্রুতগতিতে লক্ষকোটি বিভ্রান্ত মানুষকে কলিযুগের একমাত্র গতিপথে অনুপ্রাণিত করে তুলতে হলে গগনচুম্বী মন্দিরগুলি চুম্বকের মতো কাজ করছে। এই সব মন্দির ভক্তদের মনগড়া বিলাসিতা নয়—শাস্ত্রাদিতেই এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে—'অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ'। (নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য ৫/৭৫)

রোগীর ওষুধ ছাড়া গতি নেই, তাই তাকে নিয়মিত ওষুধ খেতেই হবে। তবে রোগ উপশমের জন্য একমাত্র ওষুধ সেবন অপরিহার্য হলেও, সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক পরিচর্যার গুরুত্বও কম নয়—যেমন, উপযুক্ত পথ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড়, বিছানা পত্র, জল, খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম—এই সমস্তও দরকার।

ঠিক সেই রকম নামকীর্তন যেমন প্রয়োজন, তেমনি ভোরে ওঠে স্নান করে মঙ্গল আরতি করা, গুরুবন্দনা, তুলসীতে জলদান, বৈষ্ণব প্রণাম, বিগ্রহ সেবা, কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন, কৃষ্ণকথা শ্রবণ, গীতা-ভাগবত অনুশীলন—এই সমস্ত শুচিশুদ্ধ ভক্তিসেবা অনুশীলনেরও আবশ্যকতা রয়েছে। শ্রীগুরুদেব নতুন ভক্তকে হরিনাম দীক্ষা প্রদানকালে অগ্নিদেবের

সামনে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিয়ে শিষ্যকে পবিত্র থাকার শপথ গ্রহণ করান। সুতরাং মন্দিরে যাগযজ্ঞের প্রয়োজন রয়েছে। বদ্ধজীব মাত্রই রোগী। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ভবরোগগ্রস্ত মানুষের চিকিৎসার জন্য ভগবদ্ভক্তির চেতনা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি শুচিশুদ্ধ আচরণের চর্চাও তাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

(ভাঃ ১১/৫/৩২)

"যাঁর মুখে সর্বদাই 'কৃষ্ণ' এই দুটি বর্ণ, যাঁর কান্তি অ-কৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ-উপাঙ্গ, অস্ত্র, ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সংকীর্তনপ্রায় যজ্ঞ দ্বারা যজন করে থাকেন।"

এখানে 'সংকীর্তনপ্রায়' কথাটির অর্থ হল—মূলত হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞ করা এবং আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানও থাকবে। অনবরত এক টানা হরিনাম কীর্তন করা আমাদের মতো বদ্ধজীবের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই মহাজন নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে হয়। সমবেতভাবে সংকীর্তন মুখ্যত থাকলেও, আমাদের আচার্যবর্গ একাকী কৃষ্ণনাম জপ করা এবং অন্যান্য কৃষ্ণসম্বন্ধীয় চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন ৪। আপনারা শুধু হরেকৃষ্ণ কীর্তন করতে জানেন। বেদ বেদান্ত সম্পর্কে আপনাদের কি যোগ আছে—তা বিচার্য নয় কি?

উত্তর ঃ আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করেছিলেন—

সন্ন্যাসী হওয়া কর নর্তন-গায়ন ।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্তন ॥
বেদান্ত-পঠন, ধ্যান—সন্ন্যাসীর ধর্ম ।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭/৬৭-৬৯)

অর্থাৎ, সন্ন্যাসী হয়ে বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন চর্চা বাদ দিয়ে কেবল 'হরেকৃষ্ণ' কীর্তন করে ভাবুকের মতো হীন কর্ম কর কেন?

উত্তরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বলেছিলেন, "আমাকে আমার গুরুদেব বলেছেন—

মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার ।
'কৃষ্ণমন্ত্র জপ' সদা—এই মন্ত্র সার ॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭/৭২-৭৩)

কলিযুগে ভগবানের নাম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনই একমাত্র ধর্ম।

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম ।
সর্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্র মর্ম ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭/৭৪)

সমস্ত শাস্ত্রের মূল কথা হল কেবল ভক্তিভরে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করা। অতএব আপন বুদ্ধির গরিমা ও পাণ্ডিত্য ফলাও না করে, বহু জ্ঞানগর্ভ বেদ বেদান্ত চর্চায় সময় না কাটিয়ে কলিযুগের অল্প আয়ু, চঞ্চল চিত্ত ও অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বদ্ধ জীবের পক্ষে মহাপ্রভুর নির্দেশই একমাত্র কাম্য।

তবে বৈষ্ণবেরা যে বেদান্ত জানেন না তা নয়। বরং শঙ্করাচার্যের শুষ্ক বেদান্ত ভাষ্য অপেক্ষা বৈষ্ণবগণ স্বচ্ছ ও সরস বেদান্ততত্ত্ব জানেন। শ্রীব্যাসদেব রচিত শ্রীমদ্ভাগবত হল একটি অমূল্য বেদগ্রন্থ। এবং তা সমস্ত বেদের সার বা অন্ত। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বড় বড় বৈদান্তিককে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মতো তৎকালীন বিখ্যাত বৈদান্তিকেরা মহাপ্রভুর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর সহজ সরল সাবলীল ভাষ্য সম্বলিত গীতা-ভাগবত প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিত থেকে শুরু করে গ্রাম্য কিশোর ছেলে মেয়েদের চিত্তেও বেদান্তের আলোক দান করেছেন এবং ফলস্বরূপ আজ হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে জগদ্বাসী স্বাগত জানাচ্ছে। অন্য কোনও জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে এরকমটি সম্ভব হয়নি।

প্রশ্ন ৫। আমরা ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরযুক্ত 'হরেকৃষ্ণ' কীর্তন না করে ভগবানের অন্য কোন নাম করলে ক্ষতি কি?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র ।
ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি খণ্ড ১৪/১৪৫-১৪৬)

কলিসন্তরণ উপনিষদেও অনুরূপ উক্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। অতএব কলিযুগের এই হরিনাম সংকীর্তন বাদ দিয়ে নিজের মনগড়া কীর্তন করতে যাওয়ার দরকার কি? সহজিয়া মনগড়া ভাবধারা মানুষকে অভক্তির পথে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন ৬। ১ লক্ষ মালা জপ করতে প্রায় ৮ ঘণ্টা সময় লাগে। ৩ লক্ষ মালা জপতে ২৪ ঘণ্টার মতো সময় প্রয়োজন। তা হলে হরিদাস ঠাকুর ৩ লক্ষ মালা কিভাবে জপতেন এবং কখন কি করতেন?

উত্তর ঃ ভক্তচূড়ামণি নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা সময় নিতেন স্নান, আহার ও বিশ্রামের জন্য। ২৪ ঘন্টার বাকী সময় হরিনামেই বিভোর থাকতেন। দিব্যপ্রেমভাবে হরিনামের প্রতি অনর্গল আকর্ষণে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তি-নিদ্রা, ব্যথা-বেদনা সহজে তাঁকে আক্রমণ করতে পারত না।

প্রশ্ন ৭। নিম্নতর জীবদের মুক্তি কিভাবে সম্ভব?

উত্তর ঃ নিম্নতর জীবদের চেতনা উন্নত না থাকার জন্য সর্বদা তারা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আবদ্ধই থাকে। ভগবান বলেছেন, *"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ"* (গীতা ৩/২৭)—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বদ্ধ হয়ে তারা কাজ করে চলে। তাই মনুষ্যেতর শরীরধারী প্রাণীদের কোনও মুক্তির প্রশ্ন ওঠে না। মুক্তির চিন্তা একমাত্র মানুষই করে। কুকুর-বিড়াল করে না।

তবে, শুদ্ধ ভক্তের মুখে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ করে তারাও এই ভবদশা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে—

পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে॥

(চৈতন্যভাগবত, আদি ১৬/২৮০)

প্রশ্ন ৮। কৃষ্ণনামে মুক্তি হয়, নাকি জীবসেবার মাধ্যমে মুক্তি হতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিহত জীবকে যুগধর্ম নাম কীর্তন করতে শিক্ষা দিয়েছেন। হরিনাম করেই বহু পাপী মানুষ মুক্তি লাভ করে।

"পাপী তাপী যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই-মাধাই॥"

কিন্তু কোন পাপ না করে নিছক জীব সেবার মাধ্যমে মানুষ কিছুদিনের জন্য স্বর্গসুখ ভোগ করতে স্বর্গ লোকে যেতে পারে। কিন্তু জীবসেবারূপ পুণ্য শেষ হয়ে গেলে আবার এই মর্ত্যলোকে এসে পড়তে হবে। অর্থাৎ, মুক্তি হয় না। সেই কথা ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।*

প্রশ্ন ৯। 'যত মত তত পথ'—উক্তিটি কি যথার্থ?

উত্তর ঃ বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশিত কলিযুগের যুগ-ধর্ম দিব্য হরিনাম সংকীর্তন করাই কলিবদ্ধ কলুষিত জীবের একমাত্র পথ, যা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ময় ভবচক্র থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে। কিন্তু 'যত মত তত পথ' কথাটিও যথার্থ। কারণ, হরিনাম মহামন্ত্র বাদ দিয়ে অন্য যত রকমের মত অনুসারে চলা যায়, তারও তত রকমের পথ রয়েছে। সেই সমস্ত মতে চললে, মৃত্যুময় জড় জগতের মধ্যেই জন্ম-জন্মান্তর ধরে ঘুরপাক খেতে হবে, কোনও দিন ভগবানের সচ্চিদানন্দময় ধামে ফিরে যাবার উপায় থাকবে না। এটাই বৈদিক শাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত। কোনও পথ চলে গেছে নরকে, কোনও পথ বৈকুণ্ঠে। যাঁরা নরকের মত ও পথ গ্রহণ করেন, তাঁরা নরকেই গমন করেন। সুতরাং 'যত মত তত পথ' ঠিকই রয়েছে।

প্রশ্ন ১০। আপনারা যে বলেন 'কীর্তনীয় সদা হরি'—সব সময় হরিনাম কীর্তন করতে হবে। তবে কি অন্য কাজ কর্ম করার প্রয়োজন নেই? এক জায়গায় বসে কি শুধু হরিনাম করলে চলবে?

উত্তর ঃ যদি খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন না থাকে, কারও সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন না থাকে, তবে এক জায়গায় বসে সব সময় একমাত্র কীর্তন করাই কর্তব্য। আর যদি সেগুলির প্রয়োজন থাকে তবে নাম স্মরণ-জপ-কীর্তন সব সময় সেই সব কাজ কর্মের পাশাপাশি করে চলতে হবে।

প্রশ্ন ১১। মহাপ্রভু শ্রীগৌরহরি বলেছেন সদা কীর্তনীয় হরি। তা হলে অশৌচ অবস্থায়ও কি হরিনাম করা চলে?

উত্তর ঃ মহাপ্রভু হরিনাম কীর্তন করতে বলেছেন 'সদা' অর্থাৎ সব সময়ের জন্যই কীর্তন করতে হয়। আবার বলেছেন 'স্মরণে ন কালঃ' অর্থাৎ হরিনাম করা বা শ্রীহরিকে স্মরণ করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক সময় নিতে হবে এরূপ নয়।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম গ্রন্থে বলা হয়েছে—

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥

অর্থাৎ, "শ্রীহরিনাম গ্রহণের কোনও দেশকালের নিয়ম নেই। কি উচ্ছিষ্ট অবস্থায়, কি অশৌচ অবস্থায় হরিনাম কীর্তন করতে কোনও নিষেধ নেই।"

শ্রীস্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে—

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্বত্র কীর্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥

অর্থাৎ, "শ্রীহরির নাম সর্বদা সর্বত্র কীর্তন করা যায়। সেই নাম স্বয়ং পবিত্রকারী। নামকীর্তনে কোনও অশৌচ বিচার নেই।"

প্রশ্ন ১২। হরিনাম সংকীর্তন ধর্মই যদি কলিযুগের যুগধর্ম, তবে কলির মানুষ সকলে কেন সংকীর্তনে ব্রতী হয় না?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, একমাত্র সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনে ব্রতী হবেন। *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।* (ভাঃ ১০/৮/১৩) *সুমেধসঃ* কথাটির অর্থ হল, সুমেধাসম্পন্ন বা সুবুদ্ধিমান। সকলে কেন শ্রীকৃষ্ণভজন, কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ, কৃষ্ণনাম কীর্তন করছে না এই প্রসঙ্গে মহর্ষি শ্রীল ব্যাসদেবের পিতা শ্রীল পরাশর মুনি উল্লেখ করেছেন—

ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে স্মরণং কীর্তনং তথা॥

অর্থাৎ, "এই পৃথিবীতে যারা অপুণ্যবান (দুষ্কৃতিশালী, পাপাচারী), মূঢ় (মূর্খ, জড় বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন), কুটিলাত্মা (কুটিল-হৃদয়, খল-প্রকৃতির, স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ), সেই

সব ব্যক্তিদের পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তির উদ্রেক হয় না, এবং তাদের তাঁর দিব্য নাম স্মরণ বা কীর্তনের অধিকার ঘটে না।" (শ্রীস্কন্দপুরাণ, হঃ ভঃ বিঃ ১১/২৯)

প্রশ্ন ১৩। আমি 'রাম নারায়ণ রাম' এই নাম গ্রহণ করে দীক্ষিত হয়েছি, কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কিভাবে করব, বা আমার পক্ষে করা যাবে কি না?

উত্তর ঃ বৈদিক শাস্ত্রে কলিযুগের মানুষের জন্য 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"—এই মহামন্ত্র সুনির্দিষ্ট। এই মহামন্ত্র প্রত্যেকেরই অবশ্য কীর্তনীয়। এতে কারও কখনও দোষ হয় না, অধিকন্তু কল্যাণ হয়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ হয়।

প্রশ্ন ১৪। ভগবদ্ বিদ্বেষী জগাই-মাধাইয়ের কাছে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হরিনাম প্রচার করেছিলেন। অথচ নাম-অপরাধ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নাস্তিকদের কাছে হরিনাম মাহাত্ম্য প্রচার করা অপরাধ। তাহলে কি সাধারণের জন্য নিয়ম আলাদা? মহাজনদের অনুসরণ করা কি ঠিক হবে না?

উত্তর ঃ জগাই-মাধাই নাস্তিক ভগবদ্‌বিদ্বেষী হলেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাদের কৃপা করেছিলেন। সমস্ত রকমের পাপকর্ম থেকে তাদের বিরত করিয়ে শুদ্ধ নাম সংকীর্তনে ব্রতী করিয়েছিলেন। সেই ক্ষমতা যদি কারো থাকে তবে তিনি অবশ্যই যার-তার কাছে নাম প্রচার করতে পারেন। যেমন একটি দুর্দান্ত পাগলা হাতিকে হরিনাম দিয়ে শ্রীল রসিকানন্দ ঠাকুর তাকে খুব শান্ত প্রকৃতির ভক্তে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন জনকে নাম দিলে যে-ক্ষেত্রে অপরাধী হতে হয় সেখানে নাম মাহাত্ম্য প্রচার না করাই উচিত। যেমন বানরকে কাপড় দিলে সে ছিঁড়ে ফেলবে। তখন তার তো কোনও লাভ হল না, অধিকন্তু আমিই তাকে দিয়ে কাপড়টা নষ্ট করলাম। তেমনি দুষ্টজনকে শিষ্য বানিয়ে গুরুরও অধঃপতন ঘটে। যার নামের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, সে তখন নাম পেয়েই মনে করবে যে, নামের জোরেই সব রকমের পাপাচার করব। তখন তাকে সেই হরিনামের নির্দেশ দিলে বিপদও ঘটতে পারে। শ্রদ্ধাবান জনকেই নামমাহাত্ম্য তথা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে আহ্বান করা উচিত। যদিও বা হরিনাম প্রত্যেকের জন্য। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রবর্তিত নামহট্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই লিখেছেন—

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ মহাজন নামহট্ট করেছেন সমস্ত বদ্ধ জীবের কল্যাণের জন্যই। কিন্তু সেই নামগ্রহণের জন্য আহ্বান করতে হবে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে—

শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন।
প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥

হে শ্রদ্ধাবান জন! নিত্যানন্দপ্রভুর আদেশ এই, দয়া করে কৃষ্ণনাম কর, কৃষ্ণভক্তি কর, আর—

অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥

কোনও প্রকার অপরাধ না করে কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর। সেই কৃষ্ণনামই জীবনের নিত্য পিতা মাতা ধন প্রাণ স্বরূপ।

কিন্তু নামের প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই, তাকে উপদেশ দিয়ে উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কি? শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি যার কাছে নাম প্রচার করেন তার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তিনি শাস্ত্রবিধির অধীন হতেও পারেন, না-ও পারেন। তিনি একবার শিবানন্দ সেনকে পদাঘাত করলেন, অমনি সেই দুপুরের প্রখর রোদে শিবানন্দ প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে উল্লসিত হয়ে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লাগলেন। এই ধরনের ব্যাপার কেউ কখনো অনুসরণ করতে পারে না। তাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যা করতে পারেন আমরা কেন তা পারব না—এরূপ প্রশ্ন মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রশ্ন ১৫। আপনারা বলেন যে, প্রত্যেক যুগের ভগবানের নাম সমন্বিত একটি নির্দিষ্ট মন্ত্র কীর্তন হয়। কোন্ যুগে কোন্ মন্ত্র?

উত্তর ঃ চার যুগের নির্দিষ্ট তারকব্রহ্ম নাম মন্ত্র রয়েছে। যেমন

সত্যযুগের মন্ত্র—

নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।
নারায়ণ পরা মুক্তিঃ নারায়ণ পরা গতি ॥

ত্রেতা যুগের মন্ত্র—

রাম নারায়ণ অনন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

দ্বাপর যুগের মন্ত্র—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

কলিযুগের মন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রশ্ন ১৬। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কোন্ বেদের মন্ত্র?

উত্তর ঃ অথর্ব বেদের মন্ত্র। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে—

স এব মূলমন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণ ইতি রাম ইতি।....নামান্যষ্টাবষ্ট চ শোভনানি, তানি নিত্যং যে জপন্তি ধীরাস্তে বৈ মায়ামতিতরন্তি নান্যঃ ॥ (চৈঃ উঃ)

"মূলমন্ত্র হরি-কৃষ্ণ-রাম নাম সমন্বিত আট আট ষোল নাম যাঁরা নিত্য জপ করেন, সেই ধীর ব্যক্তিগণ মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে না।"

কলিসন্তরণ উপনিষদে বলা হয়েছে—

হরে [illegible] হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

"ষোল নাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রটি কলিকলুষ নাশকারী। এই মহামন্ত্র অপেক্ষা আর অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ উপায় সমস্ত বেদের মধ্যেও দেখা যায় না।"

প্রশ্ন ১৭। ছেলে যদি বাবার কাছে সব সময় 'বাবা বাবা' বলতেই থাকে তাতে তো বাবাকে বিরক্ত করা হয়, তাই নয় কি? তেমনই পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের নাম যদি অহরহ করা হয়, তাতে কি ভগবানের কৃপা বেশী পাওয়া যাবে? না কি ভগবানকে বিরক্ত করা হবে?

উত্তর ঃ বাবা যদি ছেলেকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, "সর্বদা বাবা বাবা করবি" তা হলে ছেলে সেরূপ করলে বাবার বিরক্তি হবে না কারণ বাবার নির্দেশ আছে। বাবা যদি বলেন, "চুপচাপ থাকো।" তখন বুঝতে হবে 'বাবা বাবা' করলে বাবা বিরক্ত হবেন, কারণ তিনি চুপচাপ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ঠিক সেই রকম পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন সততং কীর্তয়ন্তো মাং—"সর্বদা আমার নাম আমার কথা কীর্তন করো।" তখন আমাদের কাজ হচ্ছে অহরহ তাঁর নাম তাঁর কথা কীর্তন করা।

এমন কি ক্ষণিকের জন্যও তাঁর নাম কীর্তন করতে আমরা না ভুলে যাই সেই জন্য তিনি জোর দিয়ে বলেছেন সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতা—"দৃঢ়নিষ্ঠভাবে যত্নশীল হয়ে নিরন্তর আমার মহিমা কীর্তন কর।" (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৯/১৪)

কিন্তু পরম পিতার এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটি অর্জুনের মাধ্যমে সর্বযুগের সর্বশ্রেণীর মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হলেও কলিযুগের স্বভাবতই অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আমরা সেই নির্দেশ অবজ্ঞা করতে পারি, ভুলে যেতে পারি এবং ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু পরমপিতা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের নামমহিমা প্রচার করে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ* (শিক্ষাষ্টকম্)—"সর্বদা হরিনাম কীর্তন কর।"

সুতরাং, পিতার নির্দেশমতো চললে পিতা খুশি হবেন, অখুশি বা বিরক্ত হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পরমপিতা শ্রীকৃষ্ণ কখনও নির্দেশ দেননি যে 'তোমরা আমার

নাম কীর্তন করো না, বোবার মতো চুপ হয়ে কিংবা তোমার মতো থাকো।' না, কখনও কোনও শাস্ত্রে এরূপ নির্দেশ নেই। বরং শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ রয়েছে, *তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ* (গীঃ ৮/৭) "আমাকে সর্বদা স্মরণ কর এবং তোমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর।" যখন আমরা কাউকে স্মরণ করি তখন স্বভাবতই তাঁর নাম মুখে আসবে। আমাদের জানতে হবে যে কখনও কৃষ্ণনামে কোনও দোষ নেই। কিন্তু যেক্ষেত্রে জোরে কৃষ্ণনাম করলে অন্য ব্যক্তির সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, কিংবা যেক্ষেত্রে কেউ বলেন, 'ভাই কৃষ্ণনাম ধীরভাবে করো, নইলে আমি অসুবিধা অনুভব করছি' তখন কথা বেশি না বাড়িয়ে সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্যত্র কৃষ্ণনাম করতে হবে, অন্যথায় কোনও অসুবিধা সৃষ্টি না করে ধীরভাবে কৃষ্ণনাম করতে হবে। কিন্তু নির্দেশটি হচ্ছে 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'।

শ্রীধর পণ্ডিত সারারাত আপন কুটিরে বসে চিৎকার করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতেন। তাতে পাড়া-প্রতিবেশীরা বলত "এই বুড়ো খেতে পায় না, তাই ক্ষিদার চোটে চেঁচাচ্ছে। আর প্রতিদিন আমাদের ঘুম নষ্ট করছে।" কিন্তু সেই শ্রীধর পণ্ডিতকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষরূপে কৃপা করেছিলেন। সেই কথা কত সুন্দরভাবে চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা আছে।

অতএব আপনার প্রশ্নের উত্তরে বোঝা যাচ্ছে যে, অহরহ শ্রীকৃষ্ণনাম করা হলে তাতে ভগবানের কৃপা বেশী পাওয়া যাবে। অনেকে বিরক্ত হলেও ভগবান বিরক্ত হননি।

কিন্তু তৎকালীন বহু ব্রাহ্মণ নদীয়ার শাসনকর্তা চাঁদকাজীর কাছে সর্বদা হরিনাম কীর্তনের শব্দ বিরক্তিকর জ্ঞানে ভক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল। মুসলমান কাজীও তাঁদের অভিযোগ মতো ভক্তদের উপর নির্দেশ জারি করেছিল, 'হরি কীর্তন বন্ধ করে দাও। অন্যথায় উপযুক্ত দণ্ড পেতেই হবে।' ভক্তদের খোল ভেঙে দেওয়া হল। ভয় দেখানো হল।

শেষে পরিণাম কি হল? চাঁদকাজী রাত্রে ঘুমাতে পারল না। ভক্তবৎসল ভগবান নৃসিংহদেব স্বপ্নযোগে কাজীকে সবংশে নিপাত করবার ভয় দেখালেন। যে ব্যক্তি ভক্তদের ধমক দিয়ে খোল ভাঙতে এসেছিল, হঠাৎ কোথা থেকে দেবাগ্নি এসে তার মুখের দাড়িগোঁফ পুড়িয়ে দিল।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহাসংকীর্তন দল সহ চাঁদকাজীর বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। চাঁদ কাজী তখন বললেন, ঠিক আছে হরিনাম সংকীর্তনে বাধা নেই। সারা নবদ্বীপে অহরহ হরিনামে চলতে লাগল। অতএব আপনার প্রশ্নের উত্তরে বোঝা গেল যে, অহরহ হরিনাম করলে ভগবান খুশি হন, কখনও বিরক্ত হন না।

প্রশ্ন ১৮। আমরা শিষ্টাচার বশত পিতার নাম ধরে ডাকি না, তা হলে পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের নাম ধরে ডাকব কেন?

উত্তর ঃ পরম পিতা ভক্তরূপে তাঁর নাম কীর্তন করতে শিক্ষা দিয়েছেন। সেই নির্দেশ পালন করাটাই শিষ্টাচার।

প্রশ্ন ১৯। মেয়েদের মাসিক ঋতুকালে জপমালাতে মহামন্ত্র জপ করা চলে কিনা?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলেছেন *নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ* অর্থাৎ, হরিনাম স্মরণের কোনও কালাদি নিয়ম বিধি বিচার নেই। দীক্ষা কালে রোজই জপমালায় সংখ্যা রেখে জপ করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে থাকে। অতএব মাসিক অশুদ্ধ কালেও জপমালাতে হরিনাম জপে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন ২০। কলিযুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তর ঃ এই যুগে মানুষ নিজ নিজ জড় সুখ ভোগাকাঙ্খা চরিতার্থ করবার জন্য একে অপরের সঙ্গে অনর্থক কলহ, দ্বন্দ্ব ও হিংসা করবে। কলিযুগের অধর্মের ব্যাপক প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হল যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন।

প্রশ্ন ২১। এই কলিযুগের অবসান কবে?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কলিযুগের আয়ু বা মেয়াদ চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর। তার মধ্যে সবে মাত্র পাঁচ হাজার পাঁচশত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ২২। মহানাম, মহাপ্রভু, মহাপ্রসাদ এই শব্দগুলির ব্যাখ্যা চাই।

উত্তর ঃ মহানাম বা মহামন্ত্র বলতে বোঝায় বৈদিক শাস্ত্রের সর্বোচ্চ মন্ত্র বা নাম। যেমন বলা হয়েছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

'হরেকৃষ্ণ' এই ষোল শব্দ সমন্বিত নাম মন্ত্রটি কলির কলুষ নাশ করে, এই নাম অপেক্ষা সমস্ত বেদের মধ্যেও আর শ্রেষ্ঠ কিছু নেই।' তাই এই নামমন্ত্রকে মহামন্ত্র বা মহানাম বলা হয়।

মহাপ্রভু বলতে বোঝায় যিনি অত্যন্ত অধঃপতিতদেরকেও কৃপা করে নিজদাস্য দান পূর্বক দুঃখময় জড় সংসারচক্র থেকে উদ্ধার করেন। তিনিই সমস্ত প্রভু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রভু, তিনিই হলেন পতিতপাবন গৌরহরি মহাপ্রভু।

দেবদেবীর উচ্ছিষ্ট ভুক্তাবশেষকে প্রসাদ বলা হয়। সমস্ত দেবদেবীর আরাধ্য যিনি, সেই ভগবান শ্রীহরির ভুক্তাবশেষকে মহাপ্রসাদ বলা হয়। শ্রীহরির অধরামৃত মহাপ্রসাদের প্রতি দেবদেবীগণও আকৃষ্ট হন। মহাপ্রসাদ সেবন করলে হৃদয়ে পারমার্থিক শুদ্ধতা আসে।

প্রশ্ন ২৩। অশুদ্ধ অবস্থায় হরিনাম জপ করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ এই কলিযুগে কলিবদ্ধ মানুষ কায়মনোবাক্যে কোন না কোনও ক্ষেত্রে অশুদ্ধই থাকে। কিন্তু কলিতে যুগধর্ম হরিনাম জপ কীর্তনে যুক্ত হতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীস্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে—

ন দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্ নাম কামিতকামদম্ ॥

"শ্রীহরির নাম কীর্তনে দেশ কাল অবস্থা বিষয়ে কোনও শুদ্ধতার অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। হরিনাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সর্ব অভীষ্ট প্রদ।"

হরিনামবিহীন অবস্থাটাই সবচেয়ে অশুদ্ধ অবস্থা বলে জানতে হবে।

প্রশ্ন ২৪। কৃষ্ণনাম করলে কি লাভ হবে?

উত্তর ঃ কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭/৭৩)

জন্মজন্মান্তরের সংসারচক্রের যাতনা থেকে মুক্তি হবে এবং ভগবদ্ধামে গতি হবে।

প্রশ্ন ২৫। হরিনাম জপের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী জপথলির ভেতরে এবং তর্জনী বাইরে রাখা হয় কেন?

উত্তর ঃ বৃদ্ধ অঙ্গুলিতেই জপের গুটি ধরে জপ করতে হয়। তর্জনীতে গুটি স্পর্শ করতে শাস্ত্রে বারণ করা হয়েছে। তর্জনী দিয়ে বাইরের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাবধান করা হয়।

প্রশ্ন ২৬। এক ধরনের সম্প্রদায় প্রচার করছেন যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু উচ্চস্বরে মহামন্ত্র জপ করেননি, বরং উচ্চস্বরে জপ বা কীর্তনে অপরাধ হয়। এর উত্তর শাস্ত্রযুক্তিতে কি আছে?

উত্তর ঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভু উচ্চস্বরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতেন—সেই কথা বড় গোস্বামীদের রচিত শাস্ত্রে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত 'শ্রীশ্রীস্তবমালা' গ্রন্থে 'শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম-অষ্টকে' উল্লেখ করেছেন—

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।

"উচ্চস্বরে হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করতে মহাপ্রভুর রসনা নৃত্য করতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের গণনার জন্য গ্রন্থি সমন্বিত কটিসূত্র তাঁর বামহাতে শোভা পেতে থাকে।"

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী 'শ্রীশচীসূন্বষ্টকম্' (শ্লোক ৩) উল্লেখ করেছেন—
গায়ন্নুচ্চৈর্নিজমধুরনামাবলীমসৌ শচীসূনুঃ।

"শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি নিজ মধুর নামাবলী উচ্চস্বরে কীর্তন করতে থাকেন।" অতএব মহাপ্রভু উচ্চস্বরে মহামন্ত্র জপকীর্তন করেননি—এই রকম মনগড়া কথা এখানে বরবাদ করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদিখণ্ড ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে, বাংলাদেশের যশোর জেলার হরিনদী গ্রামে এক যুবা ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে উচ্চস্বরে মহামন্ত্র জপ করতে দেখে প্রশ্ন করে, "ওহে, তুমি মনে মনে জপ না করে উচ্চস্বরে নাম করছ কেন?" শ্রীল হরিদাস ঠাকুর উত্তর দিলেন, "উচ্চস্বরে নাম গ্রহণ করলে মনে মনে জপ ও স্মরণের থেকে শতগুণ ফল লাভ হয়।" নারদীয় পুরাণে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাতি-উচ্চৈঃ জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ ॥

"মনে মনে হরিনাম জপ থেকে উচ্চ স্বরে জপকারী ব্যক্তি শতগুণে শ্রেষ্ঠ। মনে মনে জপকারী কেবল নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চস্বরে জপ করলে অন্য শ্রোতারাও পবিত্র হন।"

কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে যুবা ব্রাহ্মণটি হরিদাস ঠাকুরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। হরিদাস ঠাকুর কিছু না বললেও তিনদিনের মধ্যে ব্রাহ্মণটি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। গ্রামবাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাকে হরিদাসের চরণে অপরাধী জ্ঞানে ধিক্কার দিতে লাগলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীপাদ তাঁর 'বৈষ্ণব কে?' গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দান করেছেন—

"উচ্চৈঃ স্বরে কর হরিনাম রব।"

অতএব যাঁরা উচ্চস্বরে নাম কীর্তন করা অপরাধ বলে জাহির করছেন, তাঁরা নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরের বিরুদ্ধগামী।

প্রশ্ন ২৭। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রে যে 'রাম' বলা হয়েছে, সেই রাম—রামচন্দ্র না বলরামকে বোঝাচ্ছে?

উত্তর ঃ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে রাম বলতে শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝাচ্ছে। রামচন্দ্র বা বলরামকে বোঝাচ্ছে না। যেমন নাম সংকীর্তনে বলা হয়—"গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।" এখানে রাম বলতে শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ২৮। হরেকৃষ্ণ নাম কীর্তন শাস্ত্রের বিধান। তবে হরি ওঁ, বাবা লোকনাথ নাম কেবলম্, ইত্যাদি মতভেদ সৃষ্টি হল কেন?

উত্তর ঃ হরি, ওঁ, লোকনাথ—এ সমস্ত নামই শ্রীকৃষ্ণের নাম। তবে এই নামে সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যদি অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয় সেই নামের গতি ভিন্ন ধরনের। চারযুগের জন্য শাস্ত্রনির্ধারিত চার রকমের তারকব্রহ্ম নাম রয়েছে। কলিযুগের যুগধর্ম তারকব্রহ্ম হরিনাম মহামন্ত্র কীর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট হয়েছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই নাম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয় নাম। *নাতঃ পরতরোপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে।* (কলিসন্তরণ উপনিষদ)

প্রশ্ন ২৯। শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করলে তিনি যে প্রীত হন, একথা কি তিনি বলেছেন?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, *সততং কীর্তয়ন্তো মাম্*—আমার নাম সর্বদা কীর্তন কর। আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

তস্মান্ নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জুন ॥

"হে কুন্তীপুত্র অর্জুন। তুমি একাগ্রচিত্তে নাম ভজনা করতে থাকো, কারণ, নামকীর্তনকারী ব্যক্তি আমার প্রিয়। তুমি সর্বদা নাম কীর্তন কর।" তাঁর নাম কীর্তনে যদি তিনি প্রীত না হতেন তা হলে সর্বদা নামকীর্তন করতে বলতেন না।

প্রশ্ন ৩০। সাধ্য-সাধন তত্ত্ব কি?

উত্তর ঃ সাধ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম। জীবনের পরম প্রয়োজন। যা পেলে আর কোন কিছু পাওয়ার অবশেষ থাকে না। আর সাধন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণসেবকের শুদ্ধভক্তি। শুদ্ধভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে লীলাপুরুষোত্তম প্রেমময় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪/১৪৩)

প্রশ্ন ৩১। কেউ কেউ বলেন 'ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাক'। ব্যাকুল বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ এই জড় জগৎ দুঃখময়। এখানে প্রতি পদে পদে উদ্বেগ আর ক্লেশ। মনুষ্য জীবনও ক্ষণস্থায়ী। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই জগতে সুখে থাকবার পরিকল্পনা বেশি না করে পরজগতে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে প্রার্থনা করবেন, 'হে কৃষ্ণ, বহু জন্ম আমার বৃথা নষ্ট হল। আর নয়, এবার কৃপা করে তোমার নিত্য সেবায় আমাকে নিয়ে জড় সংসারে বৃথা ঘুরপাক খাওয়া ঘুচিয়ে আমার জন্ম ধন্য কর।' তাই *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।*

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রশ্ন ৩২। দ্বাপরে কৃষ্ণ অসুরনিধন লীলা করলেন, কলিতে গৌরসুন্দর সবাইকে চরণে স্থান দিয়ে ত্যাগের মন্ত্র দিলেন। তা হলে গৌরকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণকে কেন ডাকব?

উত্তর ঃ আমাদের হৃদয়ে আসুরিক প্রবৃত্তি নষ্ট হবে, যদি শ্রীগৌরহরির নির্দেশানুসারে—যুগধর্ম 'হরেকৃষ্ণ' নাম কীর্তন করি। গৌর স্বয়ং কৃষ্ণই।

প্রশ্ন ৩৩। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে 'হরে' কথাটির অর্থ 'হে রাধারাণী', তবে 'হরে রাম' কথাটির অর্থ কি?

উত্তর ঃ 'হরে রাম' কথাটির অর্থ 'হে রাধারাণী, হে ভক্তদের আনন্দদানকারী ভগবান'। 'রাম' হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। 'গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন'— সবই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নাম।

প্রশ্ন ৩৪। ভগবানের নাম কীর্তন মাহাত্ম্য ঋগ্বেদের কত শ্লোকে রয়েছে?

উত্তর ঃ ঋক্ বেদে (১মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত, ৩য়া ঋক্) বলা হয়েছে ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।

হে বিষ্ণো, চিন্ময় নাম স্বপ্রকাশ রূপ। সেই নাম উচ্চারণ মাহাত্ম্য না জেনেও কেবল নামাক্ষর অভ্যাস করি, তবুও নাম প্রভাবে দিব্যজ্ঞান পেতে পারবো। আপনিই স্বয়ং নামরূপে প্রকাশিত।

প্রশ্ন ৩৫। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, কলিযুগের মানুষ অল্পবুদ্ধি হবে, তা হলে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ কে হবে?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

অর্থাৎ, "কলিযুগে তাঁরাই সুবুদ্ধিমান মানুষ হবেন, যাঁরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা পার্ষদ পরিবৃত ভগবান শ্রীগৌরহরির আরাধনা করবেন।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৫/৩২)

প্রশ্ন ৩৬। হরিনাম করে লাভ কি?

উত্তর ঃ হরিনাম করে নামের কৃপা লাভ হবে। কলির কলুষিত প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সর্বপাপ বিনাশ হবে। শুদ্ধনামে ভগবদ্ধামে গতি হবে। আনন্দময় জীবন লাভ হবে।

প্রশ্ন ৩৭। অধিকাংশ মানুষই তো তামসিক ও রাজসিক। তাদের জন্য কিরূপ কর্ম সম্পাদন করা উচিত হবে?

উত্তর ঃ বর্তমান কলিযুগকে ধন্য কলিযুগ বলা হয়েছে। মহাবদান্যস্বরূপ ভক্তরূপে ভগবান শ্রীহরি সবার জন্যই হরিনাম মহামন্ত্র সংকীর্তনের পন্থা নির্দিষ্ট করেছেন। গুণ-কর্ম যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্বিশেষে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে ব্রতী হয়ে মাংসাহার-নেশা-জুয়া-অবৈধসঙ্গাদি এড়িয়ে যে কেউই সচ্চিদানন্দময় ভক্তিজীবনে উন্নীত হতে পারে। এটাই ধন্য কলিযুগের বিশেষ মাহাত্ম্য।

প্রশ্ন ৩৮। আপনারা বলেন হরিনাম উচ্চারণ করে জপ করতে। কিন্তু আমাদের এখানে বৈষ্ণবরা বলেন মনে মনে জপ করতে। তারা বলেন—'আপন ভজনকথা না কইবে যথাতথা'। —তা কি ঠিক নয়?

উত্তর ঃ মনে মনে হরিনাম করাকে স্মরণ বলা হয়, উচ্চারণ করে হরিনাম করাকে কীর্তন বলা হয়। পরমবৈষ্ণব শিব ঠাকুর বলছেন, হরিনাম স্মরণ অপেক্ষা কীর্তনই শ্রেষ্ঠ। পার্বতীদেবীকে শিব ঠাকুর তাই বলছেন—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোঃ বহ্বায়াসেন সাধ্যতে ।
ওষ্ঠ স্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনন্তু ততো বরম্ ॥

অর্থাৎ, "শ্রীহরির নাম স্মরণ করলে বহু আয়াসে দুঃখময় পাপবন্ধন ছিন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু কীর্তনে ওষ্ঠ স্পন্দন বা উচ্চারণ করা মাত্রই অনায়াসে তা সাধিত হয়। এই জন্য হরিনাম স্মরণ অপেক্ষা কীর্তনই শ্রেষ্ঠ।" (হরিভক্তিবিলাস ১১/২৩৬)

তা ছাড়া হরিনাম উচ্চারণ করলে, নিজের তো মঙ্গল হয়, পরন্তু যারা হরিনাম বলতে পারে না তারাও হরিনাম শুনে উদ্ধার পায়। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তাই বলা হয়েছে—

পশুপাখী কীট আদি বলিতে না পারে ।
শুনিলেহ হরিনাম তারা সব তরে ॥

হরিনামের শব্দে জীব-হৃদয়ে অনর্থরাশিও দূর হবে। তাই বৈষ্ণব কবিগণ গান করেন—

শুনিয়া গোবিন্দ রব আপনে পলাবে সব ।

উচ্চতর ভক্তিভাবতরঙ্গে না হয় যার-তার কাছে 'আপন ভজন কথা' না বলাই ভাল, কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণে কোনও দোষ নেই।

প্রশ্ন ৩৯। হরিনাম গ্রহণে দেশকাল শুদ্ধি বিচার থাকা উচিত কিনা?

উত্তর ঃ কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে, ভগবানের নাম করতে হয় পবিত্র সময়ে, পবিত্র শরীরে, পবিত্র স্থানে। যখন তখন, যেখানে সেখানে, নাম করাটা শোভনীয় নয়। ভোরে স্নান সেরে হরিনাম জপে মনোনিবিষ্ট হতে হবে। কিন্তু কেবল পবিত্র সময়ে, পবিত্র স্থানে, পবিত্র শরীরে থেকে হরিনাম করা হবে আর অপবিত্র সময়ে, অপবিত্র স্থানে, অপবিত্র শরীরে যদি থাকা হয় তবে হরিনাম বাদ দিতে হবে—এমন কথা শাস্ত্রে বলা হয়নি। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব চিন্তামণি গ্রন্থে দেবর্ষি নারদ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন,—

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা ।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনে ॥

"হে রাজন, শ্রীহরির নাম কীর্তন করতে দেশ বা কালের নিয়ম নেই। এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়।"

পদ্মপুরাণে বৈশাখ মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে—

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্বত্র কীর্তয়েৎ ।
নাশৌচং কীর্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ ॥

"শ্রীহরি হচ্ছেন পবিত্রকারী, তাঁর নাম কীর্তনে অশৌচ আশঙ্কা নেই। সর্বদা সর্বত্র তাঁর দিব্য নাম কীর্তন করা কর্তব্য।"

শ্রীনারদমুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন—

কালোহস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোহসি সজ্জপে।
বিষ্ণুসংকীর্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥

"সংসারে দানকর্মে, যাগযজ্ঞে, স্নানে, অন্যান্য উপাসনা মন্ত্রে উপযুক্ত কাল কিনা বিচার করতে হয়, কিন্তু হরিনামসংকীর্তনে কালের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—

কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

"সর্বদাই হরিনাম কীর্তন করতে হবে।"

প্রশ্ন ৪০। সব সময় হরিনামকীর্তন করতে বলা হয়েছে। কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে 'হরি' কোথায় উচ্চারিত হচ্ছে?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি দুঃখকষ্ট ত্রিতাপ জ্বালা হরণ করেন, তাঁকেই বলা হয় 'হরি'। সম্বোধন পদে তাঁকে 'হরে' বলা হয়। আবার, হরির মনকে যিনি প্রেম-অনুরাগ দ্বারা আকৃষ্ট করেন সেই শ্রীরাধারাণীকে বলা হয় 'হরা'। 'হরা'কেও সম্বোধনে 'হরে' বলা হয়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জপ ও কীর্তন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন ৪১। হরিনাম না করলে নরকে যেতে হবে—এরকম কি কোনও কথা আছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, নরক গ্রহের অধিপতি শ্রীযমরাজ তাঁর দূতদের নির্দেশ দিয়েছেন—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোহকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥

"হে দূতগণ, সেই সমস্ত পাপীদেরই আমার কাছে নিয়ে এসো, যাদের জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ কীর্তন করে না, যাদের চিত্ত একবারও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না, এবং যাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হয় না। আর যারা মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্তব্য বিষ্ণুব্রত বা হরিভক্তি অনুশীলন করে না, তাদেরও আমার কাছে এই নরকে নিয়ে এসো।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৬/৩/২৯)

প্রশ্ন ৪২। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মনে মনে জপ না করে উচ্চস্বরে কীর্তন করতে হবে কেন?

উত্তর ঃ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নিজে শোনার মতো জপ করা যায়, আবার উচ্চস্বরে কীর্তন করাও যায়। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের উক্তি—

জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্তনে পর-উপকার করে ॥
অতএব উচ্চ করি' কীর্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব শাস্ত্রে বলে ॥
জগকর্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্তনকারী।
শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬/২৮১-২৮৪)

শ্রীনারদীয় পুরাণে ভক্ত প্রহ্লাদের নির্দেশ এই যে—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ ॥

অর্থাৎ, "উচ্চ স্বরে হরিনাম গ্রহণ করলে জপ এবং স্মরণাদির অপেক্ষা শতগুণ ফল অধিক লাভ হয়ে থাকে।"

প্রশ্ন ৪৩। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে, তবে আমরা রাধারাণীর নাম করব কেন?

উত্তর ঃ মহাপ্রভু বলেছেন 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন' করতে। শ্রী + কৃষ্ণ অর্থাৎ রাধা ও কৃষ্ণ এই দুইনামই সংকীর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন ৪৪। শ্রীকৃষ্ণের ১০৮টি নাম আছে। তবে আমরা কেন তার মধ্যে 'কৃষ্ণ' নামটি বেছে নিলাম? 'হরেকৃষ্ণ' না বলে অন্য কিছু নামমন্ত্র বলি না কেন?

উত্তর ঃ শ্রীঅনন্তদেব দেবী বসুন্ধরাকে শ্রীকৃষ্ণের ১০৮টি নাম বলেছিলেন, তাতে প্রথম নামটি ছিল কৃষ্ণ। ভৌম বৃন্দাবনে যশোদাদেবী পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠানের সময় মহর্ষি গর্গ ধ্যান করে জেনেছিলেন যে, এই শিশুর নাম হচ্ছে কৃষ্ণ। শ্রীব্রহ্মা যখন পরমেশ্বর ভগবানের স্তব গান করলেন, তখন তিনি বললেন, 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণই মূল নাম। ভগবানের বিভিন্ন লীলা বিলাসের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য বিভিন্ন নাম প্রকাশিত।

তবে শ্রীকৃষ্ণের কেবলমাত্র ১০৮ টি নাম আছে এরকম মনে করা উচিত নয়। তাঁর অনন্ত অসংখ্য নাম রয়েছে। পার্বতীদেবীর কাছে মহাদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ১০০০টি নাম বলেছিলেন মাত্র।

এই জগতে প্রতিযুগের জন্য ভগবানের নামমন্ত্র বা তারকব্রহ্ম নাম রয়েছে। কলিযুগের জন্য বেদনির্ধারিত মহামন্ত্রটি হচ্ছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

অতএব নিজেদের মনগড়া কোনও একটা মন্ত্র ব্যবহার করার আদৌ কোনও প্রয়োজন পড়ে না।

প্রশ্ন ৪৫। কোথায় গেলে সুখ-শান্তি পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ হরিনাম গ্রহণ করে বৈকুণ্ঠে গেলে সুখশান্তি পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ৪৬। কলিযুগের মানুষের প্রকৃত ধর্ম কি?

উত্তর ঃ কলিযুগের মানুষের প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ইতি ষোড়শকম্ নাম্নাম্ কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

এই ষোলো নাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই কলির কলুষতা থেকে আমাদের মুক্ত করবে। সমগ্র বেদশাস্ত্রে এ ছাড়া আর শ্রেষ্ঠতর উপায় দেখা যায় না। (কলিসন্তরণ উপনিষদ)

প্রশ্ন ৪৭। কলিযুগে হরিনামই মুক্তির উপায়। কিন্তু খ্রিস্টান, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি মানুষ—তারা কেন হরিনাম থেকে বঞ্চিত এবং তারা কিভাবে মুক্তি পাবে?

উত্তর ঃ ভগবানের অসংখ্য নাম রয়েছে, সেই নামের মধ্যে প্রবল শক্তি রয়েছে। যে কোন ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানের যে কোনও নাম করলেও মুক্তি পেতে পারে। নামাভাসেও মুক্তি হয়। 'হারাম' কথাটি গালিগালাজ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেই 'হা রাম' কথাতেও অন্তিমে মুক্তি হতে পারে। GOD কথাটিতে 'গৌর' নামের এক আভাস হয়। তাছাড়া নাম কীর্তন শুনেও মুক্তি হয়। কোনও ক্রমে হরিনামকারী ভক্তদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সেবা করেও পরজন্মে ভক্তরূপে জন্ম গ্রহণের সুযোগ হয়। এভাবেই লোকে উদ্ধার পায়। অবশ্য ভক্তরা অপরাধমুক্ত হয়ে শুদ্ধ হরিনাম উচ্চারণ করেন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ-কীর্তন করেন নিছক মুক্তির জন্য নয়, ভগবানের নিত্য লীলায় সংযুক্ত হওয়ার জন্যে।

প্রশ্ন ৪৮। রামচন্দ্রের জন্ম আগে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম পরে। তবে কেন মহামন্ত্রে আগে কৃষ্ণের নাম করা হয়, পরে রামের নাম করা হয়?

উত্তর ঃ ভগবানের জন্ম নেই। আগে পরে প্রশ্ন নয়। শ্রীকৃষ্ণই মূল। রামচন্দ্র তাঁর অংশ প্রকাশ। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে যে 'রাম' বলা হয়—তা রামচন্দ্রকে বোঝায় না। শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝায়। যেমন—

গোপাল, গোবিন্দ, রাম, শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী, গোপীনাথ, মদনমোহন ॥

এ পদটিতে সবই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নাম। এখানে 'রাম' মানে ভক্তদের আনন্দবর্ধনকারী ভগবান।

প্রশ্ন ৪৯। লোকে বলে জাগতিক কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদিই মানুষের চরিত্র কলুষিত করে। তবুও দেখা যায় মানুষ সেই একই কলুষে কলুষিত হয়েই পড়ে। এমনকি, যারা বলে, তারাও। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ কলিযুগের ধর্ম হচ্ছে, হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন করা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলি কল্মষ নাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

"ষোলনাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে মানুষ কলিযুগের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারবে। এমন শ্রেষ্ঠ উপায় সমস্ত বেদে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।"

শ্রদ্ধাবান মানুষেরা মন দিয়ে এই মহামন্ত্র কীর্তন করেন, জপ করেন। কিন্তু অলস জড়ধী মানুষেরা হরিনাম গ্রহণ করতে চায় না।

মুকুন্দমালা স্তোত্রে কবি কুলশেখর বলছেন—

বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিদ্
অহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্ ॥

"ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে মানুষ সক্ষম হলেও কেউই হরিনাম বলে না। এটিই আশ্চর্যের বিষয়। এই কারণে জনগণের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্যাদি ব্যসনে প্রবৃত্তি হয়।"

প্রশ্ন ৫০। আমার চঞ্চল মন কিভাবে স্থির হবে, দয়া করে বলুন।

উত্তর ঃ জপের মালা নিয়ে আসন করে সোজা হয়ে বসে একশ্বাসে পরিষ্কারভাবে পূর্ণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রটি যতবার পারেন উচ্চারণ করতে থাকুন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এভাবে সময় মতো অভ্যাস করলে চঞ্চলতা প্রশমিত হয়। মন স্থির ও আনন্দিত থাকে।

প্রশ্ন ৫১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু তো হরিনাম করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম' কিংবা 'জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল্ রে' কিংবা 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধা গোবিন্দ' ইত্যাদি মন্ত্রগুলি কোনও শাস্ত্রে আছে কি না?

উত্তর ঃ কলিসন্তরণ উপনিষদ, অনন্ত সংহিতা, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ইত্যাদি বৈদিক শাস্ত্রে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ বা কীর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র ।
ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র ॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে ।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১৪/১৪৫-১৪৭)

কিন্তু কোনও রকমের ছড়াবাঁধা মনগড়া মন্ত্র কীর্তন করা ঠিক নয়, কারণ তা পূর্বতন গুরুপরম্পরা সূত্র ধরে আগত নয়। সেসব কলিযুগের কোন কোন 'গুরু' রূপধারী ব্যক্তির মনগড়া রচনা মাত্র। *শ্রীঅনন্ত সংহিতা* শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি ।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে ।
বর্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জনৈঃ পরিকল্পিতম্ ।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্ ॥

অর্থাৎ, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত মন্ত্রই কলিযুগের মহামন্ত্র এবং এই মহামন্ত্র বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করতে সম্মত। এই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র বাদ দিয়ে দুর্জন ব্যক্তির পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ সুসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কোনও পদ অভ্যাস করা নিষিদ্ধ।"

কলিসন্তরণ উপনিষদে বলা হয়েছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলি কল্মষনাশনম্ ।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

"এই ষোল নাম বিশিষ্ট মহামন্ত্র কলির কলুষ নাশকারী। সমগ্র বেদের মধ্যেও এই মহামন্ত্রের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এমন অন্য কোন কিছু দেখা যায় না।"

সুতরাং হরিনাম জপ বা হরিনাম সংকীর্তন বলতে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ বা কীর্তন করাকে বোঝায়। অন্য রকমের মনগড়া মন্ত্র কখনই মহামন্ত্র পদবাচ্যই নয়।

প্রশ্ন ৫২। পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে শুনেছি সত্য দ্বাপর ত্রেতা কলি এইভাবে যুগপর্যায় হয়। কিন্তু এখন আমরা শাস্ত্র পড়ে জানছি সত্যের পরে ত্রেতা তারপর দ্বাপর যুগ। এর কারণ কি? হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্মের লোকেরা কি এই যুগধর্মে বিশ্বাসী? চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর পরে কি আবার সত্যযুগ আসবে?

উত্তর ঃ যুগপর্যায়ের ব্যতিক্রম ঘটে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপরে। যে যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিকালে প্রচ্ছন্ন অবতার মহাবদান্য ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন সেই চতুর্যুগের দ্বাপর যুগটি সত্যের পরে না হয়ে ত্রেতার পরেই আসে। আর সেই দ্বাপরেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। এছাড়া সব কলিতে মহাবদান্য অবতার মহাপ্রভু আসেন না এবং সব দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণও আসেন না। সেই জন্য বর্তমান কলিযুগকে বলা হয় ধন্য কলিযুগ।

এই ধন্য কলিযুগের জীবকুলের প্রতি ভগবানের একটি বিশেষ কৃপা মহাবদান্যতা রয়েছে। কেবল ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট তারকব্রহ্ম নাম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তন করে এবং আমিষাহার-নেশাভাঙ-জুয়া-অবৈধযৌনতাদি পাপকর্ম এড়িয়ে মানুষ এই জন্মেই ভগবদ্ধাম গোলোক-বৃন্দাবনে অনায়াসে গতি লাভ করতে পারবে।

এই যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন জাতি-বর্ণ-ধর্ম নারী-পুরুষ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্যই নির্ধারিত। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (১১/৫/৩২) বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই সংকীর্তন যজ্ঞে ব্রতী হন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকট কালীন সময়েও দেখা যায় জাতি-বর্ণ-ধর্ম শিক্ষা-সম্পদ-উপাধি নির্বিশেষে কত জনেই না সংকীর্তন যজ্ঞে সামিল হয়েছিলেন। যেমন—ব্রাহ্মণ অদ্বৈত আচার্য, মুসলমান হরিদাস ঠাকুর, পাঠান বিজলী খান, কায়স্থ কালিদাস ঠাকুর, ভুঁইমালী ঝড়ু ঠাকুর, বেদজ্ঞ পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য, নিরক্ষর দক্ষিণ ভারতের বিপ্র, দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী, মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী, রাজ্যপাল রামানন্দ রায়, রাজা প্রতাপরুদ্র, জেলাশাসক চাঁদকাজী, ধনাঢ্য সন্তান রঘুনাথ দাস, অতি দরিদ্র শ্রীধর পণ্ডিত, কুষ্ঠরোগী বাসুদেব বিপ্র, খোঁড়া ভগবান আচার্য, গৃহস্থ শিবানন্দ সেন, ব্রহ্মচারী প্রদ্যুম্ন, ব্রহ্মচারিণী মাধবীদেবী, শিশুকন্যা নারায়ণী, কাশীর মায়াবাদী দল, দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধগণ—সকলেই মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তনে ব্রতী হয়েছিলেন। আর বর্তমানেও দেখা যায়, সমগ্র পৃথিবীর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কত মানুষই না আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সংস্পর্শে এসে হরিনাম সংকীর্তন করে মানব-জন্ম ধন্য করে তুলেছেন। অতএব আপনার প্রশ্নানুসারে বলা যায় যে, তথাকথিত সব ধর্মের মানুষই এই হরিনাম সংকীর্তন রূপ যুগধর্মে আস্থাবান।

তার পরের প্রশ্নের উত্তর এই যে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) এর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, আগামী দশ হাজার বছর অবধি মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ আন্দোলন এই পৃথিবীতে কার্যকরী হবে। তারপর ভয়ংকর কলির প্রভাবে প্রভাবিত মানুষ আর 'হরেকৃষ্ণ' করবে না। এই আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষ সব রকমের পাপকর্ম করেই চলবে। সেই সময়টা অত্যন্ত ভয়ংকর। কলির সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করবার জন্যে যুগের শেষ দিকে উড়িষ্যার সম্বল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র রূপে ভগবান শ্রীহরি 'কল্কি অবতার'

আবির্ভূত হয়ে সমস্ত দস্যু রাজন্যবর্গকে ব্যাপক হারে বধ করবেন। তারপর কলিযুগের আয়ু সম্পাদিত হবে। আজ থেকে চারলক্ষ বত্রিশ হাজার বছর পরে আবার সত্যযুগ আসবে।

প্রশ্ন ৫৩। 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রের শব্দগুলির অর্থ ও তাৎপর্য কি? দীক্ষার আগে জপ করা যায় কি না?

উত্তর। কলিযুগের যুগধর্ম হল 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত মহামন্ত্র কীর্তন করার কথা বলা হয়েছে। হরে—কথাটির অর্থ হল 'হে পরমেশ্বর ভগবানের হ্লাদিনীশক্তি (বা হরা শক্তি) শ্রীমতী রাধারাণী।' কৃষ্ণ—কথাটির অর্থ হল 'হে পরমেশ্বর ভগবান সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ!' রাম—কথাটির অর্থ হল 'হে পরমানন্দময় ভগবান।' এইভাবে সম্বোধন করে ভগবৎ-পাদপদ্মের সেবা প্রার্থনা করতে হয়। অর্থাৎ মহামন্ত্রের তাৎপর্য হল "হে ভগবানের অন্তরঙ্গা হ্লাদিনীশক্তি রাধারাণী! হে সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ! হে আনন্দবর্ধনকারী পরমেশ্বর ভগবান। কৃপা করে আমাকে আপনাদের পাদপদ্ম সেবায় নিয়োজিত করুন।"

দীক্ষার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আগে থেকেই প্রতিদিন মালাতে ঠিক ঠিকমতো জপ করতে শিখে রাখা আবশ্যক।

প্রশ্ন ৫৪। শ্রীশ্রীনামমাহাত্ম্য বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জীবের নিস্তার ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র মর্ম ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭/২২, ৭/৭৪)

কলিবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র প্রদান করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন এই দিব্য হরিনাম থেকেই 'সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।'

শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশ রয়েছে—

কলের্দোষনিধে রাজন্ অস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গ পরং ব্রজেৎ ॥

"হে রাজন্! কলিযুগ সমস্ত দোষের আকর। কিন্তু এই কলিযুগে একটি মাত্র মহান গুণ রয়েছে। তা হল কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করে জীব সংসার-বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করতে পারে।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদি ৭/৭৩) তাই বলা হয়েছে,

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৩/৫১-৫২) বলা হয়েছে—

কৃতে যৎ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ হরিকীর্তনাৎ ॥

"সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, আর দ্বাপরযুগে অর্চন দ্বারা যা লাভ হয়, কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্তন দ্বারা তা লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীবিষ্ণুরহস্যে উল্লেখ রয়েছে—

এতদেব পরং জ্ঞানম্ এতদেব পরং তপঃ।
এতদেব পরং তত্ত্বং বাসুদেবস্য কীর্তনম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তনই পরম জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ তপস্যা এবং পরম তত্ত্ব বলে অভিহিত।"

বৈষ্ণব চিন্তামণি শাস্ত্রে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শ্রীনারদ মুনি উপদেশ দিচ্ছেন—"হে রাজন্। ভগবানের নাম করতে দেশ বা কালের কোনও নিয়ম নেই, এই বিষয়ে কারও সন্দিগ্ধ হওয়া উচিত নয়। এই পৃথিবীতে দান, যজ্ঞ, স্নান এবং মন্ত্রাদি বিষয় সময়সাপেক্ষ ব্যাপার; কিন্তু শ্রীহরির নাম সংকীর্তন করতে কোনও সময়ের অপেক্ষার প্রয়োজন নেই।"

প্রায় সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হরিনাম পরম পবিত্রকারী, তাঁর নাম কীর্তনে শৌচ-অশৌচের কোনও বিচার নেই। সর্বদা এবং সর্বত্র তাঁর নাম কীর্তন করা কর্তব্য।

শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণে ভগবদ্ভক্ত শ্রীবলি মহারাজ শুক্রাচার্যের কাছে বলেছিলেন—

জিহ্বাগ্রে বর্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বিষ্ণোর্লোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥

"যাঁর জিহ্বাতে হরিনামের দুটি অক্ষর বিরাজমান থাকে, তাঁর বিষ্ণুলোকে গতি লাভ হয়, তাঁকে কখনও আর এই দুঃখপূর্ণ সংসারে ফিরে আসতে হয় না।"

শ্রীনারদ মুনি নির্দেশ দিয়েছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কেবলমাত্র হরিনাম, কেবলমাত্র হরিনাম, কেবলমাত্র হরিনাম কীর্তনই কলিযুগের মানুষের একমাত্র পথ। এ ছাড়া অন্য কোন গতি বা উপায় নেই, নেই, নেই। (শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণ)

আরও বলা হয়েছে যে, "একবার মাত্র চৈতন্যময় হরির দিব্য নাম উচ্চারণে যে ফললাভ হয়, সহস্রমুখ অনন্তদেব এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মাও সেই ফল বর্ণনায় সমর্থ হন না।"

আদি পুরাণে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—"হে অর্জুন! শ্রদ্ধা বা অবহেলাক্রমে যারা আমার নাম জপ করে, সর্বদা আমার হৃদয়ে তাদের নাম জাগরিত থাকে। আর অধিক বলতে কি, আমার নামের সদৃশ জ্ঞান, আমার নামের তুল্য ব্রত,

ধ্যান, দান, শান্তি, পুণ্য গতি আর কিছুই নেই। .....এই নামই পরম মুক্তি, নামই পরম গতি, নামই পরম শান্তি, নামই পরম স্থিতি, নামই পরম বুদ্ধি, নামই পরম প্রীতি, নামই পরম স্মৃতি, নামই পরম প্রভু-এই নামই পরম আরাধনার বিষয়।"

শ্রীপদ্ম পুরাণের বৈশাখ মাহাত্ম্যে বর্ণিত হয়েছে—"পাপী ব্যক্তিরা যদি হরিনাম জপে একান্ত আসক্তচিত্ত হয়, তা হলে যমরাজের ভীষণ দূতেরা তার কাছেও অগ্রসর হতে পারেন না।"

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বর্ণনা করেছেন—

তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতম্ ।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে ॥

"হে নৃপ! যারা কলিযুগে কেবল হরিনাম স্মরণ করে, বা অন্যকে হরিনাম স্মরণ করিয়ে দেয়, তারাই মানব-সমাজে ভাগ্যবান এবং কৃতার্থ।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী কৃষ্ণনাম-স্তোত্রে ব্যাখ্যা করেছেন—"ভগবৎ-নামরূপ সূর্যের আভাসেই সংসার-অন্ধকার বিনষ্ট হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানহীন অন্ধ ব্যক্তি ভক্তিচক্ষু লাভ করতে পারে। এই জগতে কোনও বিদ্বান ব্যক্তিই শ্রীনামের মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে সমর্থ হন না।"

প্রশ্ন ৫৫। আমরা তো সকলেই জানি যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এই তারকব্রহ্ম নাম কখন, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতি আটাশ চতুর্যুগের মধ্যে শেষ কলিযুগে আবির্ভূত হন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চারি যুগ ২৮ বার আবর্তিত হলে ২৮ নম্বরে যে কলিযুগ হয়, সেই যুগেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। অর্থাৎ, আজ থেকে আটাশ চতুর্যুগ পূর্বেও নাম সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধরাধামে এসেছিলেন। এইভাবে অনন্তবার মহাপ্রভু এসে নাম প্রচার করেছিলেন। 'সম্ভবামি যুগে যুগে'।

প্রতি যুগেই ভগবানের দিব্য তারকব্রহ্ম নামও রয়েছে। ভগবান যেমন নিত্য তাঁর নামও নিত্য। নিত্য বস্তুর কিভাবে কবে সৃষ্টি হল, এইরূপ প্রশ্নই অবান্তর। "গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন।' নিত্য গোলোক ধামের দিব্য প্রেমধন শ্রীহরিনাম সংকীর্তন এই ধরাধামে কৃপা করে অবতীর্ণ হয়েছেন। "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার"। নিত্য ধামের নিত্য বস্তু কোনও কালের অধীন নয়। যা কালের অধীন, তা-ই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। তার সৃষ্টি-ধ্বংস রয়েছে। কিন্তু নিত্য বস্তু মানে অবিনশ্বর অর্থাৎ যার সৃষ্টি-ধ্বংস নেই। 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র নিত্য।

প্রশ্ন ৫৬। 'হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের মাসিক পত্রিকা' কথাটির মধ্যে 'আন্দোলন' শব্দটি কেন ব্যবহার করা হল? 'আন্দোলন' ছাড়া কি হরেকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রচার সম্ভব নয়?

উত্তর ঃ 'হরেকৃষ্ণ আন্দোলন' প্রবর্তন করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের নাম মহিমা প্রচারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং। ভক্তরা যখন নাম কীর্তন করতে থাকেন, তখন আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অনর্থক খেয়াল বশে ভক্তদের উপর যথেচ্ছ উৎপাত শুরু করে। যেমন, শ্রীবাস-অঙ্গনে হরিনাম সংকীর্তন চলা কালে নদীয়ার শাসনকর্তা চাঁদ কাজী তার অনুচরদের দিয়ে খোল ভেঙে দিয়েছিল এবং ধর্মান্তরিত করার ও ঘরে আগুন দেবার ভয় দেখিয়ে নানারকম ভাবে উৎপাত করছিল। তখন নাম প্রচারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই শুরু করলেন মহা আইন অমান্য আন্দোলন।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যখন তাঁর গুরুদেবের আদেশে পাশ্চাত্য বিশ্বে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে এগিয়ে গেলেন, তখন প্রভুপাদের কাছ থেকে অফুরন্ত হরিকথামৃত লাভ করে বহু ভবঘুরের দল তাদের হতাশাজ্জ্বর জীবন থেকে জেগে উঠল। "জীব জাগো জীব জাগো গোরাচাঁদ বলে।" সেই সময় পাশ্চাত্যদেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ কিংবা ধর্মশূন্য রাষ্ট্রগুলি ভক্তদের উপর সম্পূর্ণ নির্বিচারে অকথ্য অত্যাচার শুরু করতে লাগল। এইসব অত্যাচারকে ভ্রূক্ষেপ না করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন চলতে থাকে। সেই আন্দোলন কোনও জড় অস্ত্র কিংবা পারমাণবিক বোমার হুমকি দিয়ে নয়। তা সম্ভব হয়েছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র রূপ অস্ত্রের মাধ্যমে। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থগুলি যেন 'টাইমবোম'। এই সব টাইম বোমার ব্যাপক বর্ষণে মানুষের আসুরিক প্রবৃত্তি ধ্বংস হচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে। এই বিচারে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে এক রক্তপাতহীন বিপ্লব বলা যেতে পারে। এই আন্দোলনের ফল স্বরূপ সারা বিশ্বে দেশ-জাতি-বর্ণ-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার মুখেই আজ উচ্চারিত হচ্ছে কলিযুগের মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রশ্ন ৫৭। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কি অন্য কোনও যুগে ছিল? শ্রীমন্ মহাপ্রভু বর্তমান কলিযুগের পূর্বে কি কখনও জগতে আবির্ভূত হয়ে নাম প্রচার করেছিলেন?

উত্তর ঃ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নিত্য। তবে এই দিব্য নাম কলিযুগের বদ্ধ জীবদের জন্য নির্ধারিত, যাতে তারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে জড় কলুষ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

অনন্ত সংহিতা শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি ।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে ॥

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কলিযুগের মহামন্ত্র। এই মহামন্ত্র কলিবদ্ধ জীবকে রক্ষা করবে।

কলিসন্তরণ উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

এই ষোল নাম সমন্বিত মহামন্ত্র কলি কলুষনাশকারী, এর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় সমগ্র বেদের মধ্যেও দেখা যায় না। অতএব কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র। অন্যান্য যুগের তারকব্রহ্ম নাম ভিন্ন রকমের। যেমন সত্যযুগের মন্ত্র হল—

নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণ পরামুক্তির্নারায়ণ পরা গতি ॥

ত্রেতাযুগের মন্ত্র হল—

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠবামন ॥

দ্বাপর যুগের মন্ত্র হল—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

এবং কলিযুগের মন্ত্র হল—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈবস্বত মন্বন্তরে আটাশ নম্বর চতুর্যুগের অন্তর্ভুক্ত কলিযুগের প্রথমভাগে পরম উদার-স্বভাব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হন। একটি মন্বন্তর বলতে ৭১ চতুর্যুগ বোঝায়। প্রতি মন্বন্তরের জন্য ভগবানের এক-একজন অবতার অবতীর্ণ হন। যেমন, বর্তমান মন্বন্তরাবতার শ্রীবামনদেব। কোনও মন্বন্তরের সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে ভগবদ্ উপাসনা পদ্ধতি কি হবে, তা প্রবর্তন করেন সেই মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতার। সেই মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতারই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হন। যুগ বিশেষে এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে, যেমন যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে বা মহাপ্রভুরূপে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হন। এ ছাড়া সমস্ত সাধারণ কলিতে মন্বন্তরাবতারই যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গোলোকের মহাপ্রেম বিতরণ করতে একমাত্র এই বিশেষ কলিযুগেই অবতীর্ণ হন।

প্রশ্ন ৫৮। হরিনামের প্রতি অপরাধ কিরূপ?

উত্তর ঃ শ্রীপদ্ম পুরাণে স্বর্গখণ্ডে ৪৮ অধ্যায়ে হরিনামের প্রতি অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। দশ রকমের নাম-অপরাধ হয়। সেই সকল অপরাধ থেকে মুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। দশবিধ নাম অপরাধ হল—

(১) যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের দিব্য নাম প্রচার করার জন্য নিজেদের সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নিন্দা করা।

(২) শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের নাম ভগবানের নামের সমান অথবা তা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা। অর্থাৎ শিব শিব, ব্রহ্মা ব্রহ্মা উচ্চারণ করা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের উচ্চারণের সমান বলে মনে করা।

(৩) শ্রীগুরুদেবকে অবজ্ঞা করা।

(৪) বৈদিক শাস্ত্র কিংবা বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা করা।

(৫) হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাহাত্ম্যকে কাল্পনিক বলে মনে করা।

(৬) ভগবানের নামে অর্থবাদ আরোপ করা।

(৭) নামবলে পাপ আচরণ করা। অর্থাৎ পাপ করতে থাকব আর ভাবব নামকীর্তনে পাপ নষ্ট হয়, অতএব পাপও করতে থাকব, এমন প্রবৃত্তি।

(৮) হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করাকে বৈদিক কর্মকাণ্ডে বর্ণিত কোন পুণ্যকর্ম বলে মনে করা।

(৯) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ভগবানের দিব্য নামের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ করা।

(১০) ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা এবং তাঁর অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরও 'আমি' ও 'আমার' এই দেহাত্মবুদ্ধি বজায় রাখা।

প্রতিটি ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে—ভগবৎপ্রেম লাভ করার জন্য এই সমস্ত অপরাধগুলি থেকে মুক্ত হওয়া।

প্রশ্ন ৫৯। হরেকৃষ্ণ নাম ব্যতীত কি কোনও মানুষের কোনও মূল্য নেই?

উত্তর ঃ কলিযুগের ধর্ম হরেকৃষ্ণ কীর্তনই কলিবদ্ধজীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায়। অন্যথায় জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির দুঃখময় জড় সংসারে বিভিন্ন দেহ নিয়ে বদ্ধ থাকতে হয়। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্র থেকে উদ্ধারের অন্য কোনও পন্থা নেই। শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ব্যাসদেব লিখে গেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"একমাত্র হরিনাম, একমাত্র হরিনাম, একমাত্র হরিনাম কীর্তন ছাড়া কলিযুগে অন্য কোন গতি নেই, অন্য কোন গতি নেই, অন্য কোন গতি নেই।"

মনুষ্য জন্মে সুযোগ আছে শাশ্বত আনন্দময় জীবনে ফিরে যাওয়ার। আর আমাদের জানতে হবে এই জীবনটি ক্ষণস্থায়ী। সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম আর পাওয়া যাবে কিনা তার কোনও ঠিক নেই। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের জন্ম পাওয়ার পথই প্রশস্ত, তা অনস্বীকার্য।

যত বড় পদাধিকারী মানুষ হোন না কেন হরিভজন ব্যতীত মৃত্যুর পর কুকুর বেড়াল ইঁদুর আরশোলা কেঁচো পিঁপড়ে ইত্যাদি রূপে তাকে জন্ম নিয়ে জন্মজন্মান্তরে দুঃখপূর্ণ জগতে থাকতে হবে। তা হলে এই ক্ষণিক মনুষ্যদেহ ধারণের আর কিইবা মূল্য থাকল! এই সব কথা বুদ্ধিমান জীবের বিচার করা কর্তব্য।

প্রশ্ন ৬০। আমি জপমালাতে, জিহ্বা নেড়ে মানসে হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে জপ করি। এভাবে কি জপ করা যাবে?

উত্তর ঃ মনে মনে জিহ্বা নেড়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা যায়। নিজের কানে শ্রবণের মতো উচ্চারণ করেও জপ করা ভালো, আবার পার্শ্ববর্তী জীবগণও যাতে নাম শ্রবণ করতে পারে সেইভাবেও জপ করা যায়। মহাপ্রভু বলেছেন *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ* —হরিনাম কীর্তন কর সর্বদা। নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীধর গোস্বামী ঠাকুর উচ্চস্বরে হরিনাম জপ করতেন।

প্রশ্ন ৬১। 'আমরা শুধু যুগধর্ম হরিনাম কীর্তন করব। আর তার সঙ্গে আমরা আমাদের মতেই চলব।' এটা কি ঠিক নয়?

উত্তর ঃ সর্বদাই আমাদের জানতে হবে যে, আমরা ভবরোগী। এই ভবসংসারে পতিত জীব। রোগ থেকে উপশম পাওয়াই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। তারপর সুস্থভাবে ভগবৎভক্তি অনুশীলন আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য। অসুস্থ অবস্থাটা অতিক্রম করতে হলে ওষুধ সেবন করতে হবে। আমাদের রোগেরও রকমফের আছে। তাই চিকিৎসকের নির্দেশমতো ওষুধ ও পথ্যাদি খেতে হবে। চিকিৎসকের দেওয়া ওষুধ শুধু সেবন করব, আর তার সঙ্গে আমরা আমাদের মতোই অর্থাৎ খেয়ালখুশিমতো যা ইচ্ছা তাই করব, যা ইচ্ছা তাই খাব, সেটি রোগ সারবার লক্ষণ নয়, রোগ সারবে না বরং আরও বাড়তে পারে।

অর্থাৎ, হরিনাম কীর্তন করতে হবে, একাকীও জপ করতে হবে এবং পাপাচার এড়িয়ে যাবজ্জীবন কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে থাকতে হবে। তা হলেই ঠিক হবে।

প্রশ্ন ৬২। দীক্ষা গ্রহণ না করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপচর্চা করা উচিত কি?

উত্তর ঃ শ্রীহরিনামতত্ত্ব সম্পর্কে 'পদ্যাবলী' শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে—

নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষতে।
মন্ত্রোহয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥

"দীক্ষাদি সৎকার্য বা পুরশ্চরণ, এ সমস্তর জন্য কিছুমাত্রও অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র জিহ্বায় উচ্চারিত হলেই তা কার্যকরী হতে থাকে।"

'বৈষ্ণবচিন্তামণি' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
কৃষ্ণসঙ্কীর্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥

"দান ও অন্য যজ্ঞে কাল-নিয়ম আছে, স্নানে ও অন্য বৈদিক মন্ত্র জপে কালনিয়ম আছে, কিন্তু এই পৃথিবীতলে কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে কোন কাল বা নিয়ম বিহিত হয়নি।"

প্রশ্ন ৬৩। নির্ভীক চিত্ত বিশিষ্ট ভক্ত হতে গেলে কেমন ভজন করতে হবে?

উত্তর ঃ 'হরে কৃষ্ণ' নামের প্রভাবে কলি থেকে ভয় দূর হয়। হরিনাম জপ কীর্তন বাদ গেলেই ভয়ের কারণ থাকে। হরিনাম জপ কীর্তন থেকে বিচ্যুত হওয়ার ভয় অবশ্যই থাকতে হবে। অন্যথায়—সাধন ভজনও অনর্থক অহমিকায় পরিণত হয়। সে ব্যাপারে ভয় থাকা দরকার।

প্রশ্ন ৬৪। আমরা জানি কলিযুগে 'হরের্নামৈব কেবলম্'। অথচ দেখা যায়, আপনারা রোজই শ্রীহরি বিগ্রহ নিয়মিত অর্চনা করছেন। কেন?

উত্তর ঃ আপনার আরও জানা উচিত যে, কলিযুগে 'সততং হরিমর্চয়েৎ'। রোজই নিয়মিত শ্রীহরি বিগ্রহ অর্চনা কর্তব্য। কলিযুগের মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মা-নারদ সংবাদে বলা হয়েছে—

যুগেঽস্মিন্ তামসে তস্মাৎ সততং হরিমর্চয়েৎ।

"বিশেষতঃ এই কলিযুগ তমসায় সমাচ্ছন্ন, সুতরাং এ সময়ে সর্বদা শ্রীহরির অর্চনা করণীয়।" আজকাল মানুষ ভগবান সম্বন্ধে অজ্ঞ। যারা নিজেদের বড় ভক্ত, বড় ভগবদ্‌বিশ্বাসী মনে করে—তারা অনেকেই মূর্খতাবশত বলে যে, ভগবান নিরাকার। সবাই ভগবান। সে নিজেও। কিন্তু যুগে যুগে ভগবানের অর্চারূপ এই জগতে বিরাজ করছেন, সেই সম্পর্কে তারা উদাসীন। সেই জন্য শ্রীব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে কলিগ্রস্ত মানুষদের উদ্দেশ্যে বলছেন—

কলৌ কলিমলাক্রান্তা ন জানন্তি হরিং পরং।
যে অর্চয়ন্তি তমীশানং কৃতকৃত্যাস্ত এব হি ॥

(স্কন্দপুরাণ)

অর্থাৎ, "কলিযুগের মানুষেরা পাপভারে সমাক্রান্ত হয়ে পরমেশ্বর শ্রীহরিকে উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু তারা যদি এই সময়েও শ্রীহরির অর্চনায় প্রবৃত্ত হয় তা হলে অবশ্যই তাদেরকে কৃতকৃত্য বলতে হবে।"

শুধু হরিনাম করলেই নয়, হরির সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ কি, হরির ক্রিয়াকলাপ কি ধরনের, তাঁর পরমধাম কোথায়, এই জগৎ এবং বৈকুণ্ঠজগৎ কিরকম। এ সব যদি কোনও ধারণা না থাকে তা হলে বেশিক্ষণ হরিনাম করাও সম্ভবপর নয়। তাই প্রতিদিন হরিকথা শ্রবণ করাও কর্তব্য। সেই জন্য বলা হয়েছে—

যত্র বিষ্ণুকথা নিত্যং যত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ।
কলিবাহ্যা নরাস্তে বৈ যেঽর্চয়ন্তি সদা হরিং ॥

অর্থাৎ, "যেখানে নিত্যকাল ভগবৎকথা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়ে থাকে, যেখানে বৈষ্ণবগণ বাস করে থাকেন, যাঁরা শ্রীহরির অর্চনা করেন, কলি তাঁদের বাহন হয়ে থাকে। তাঁদের প্রতি কলির প্রভাব প্রকাশ পায় না।" (স্কন্দপুরাণ)

প্রশ্ন ৬৫। অনেকে বলছেন, যে কোন মতপথ ধরেই ভগবানকে পাওয়া যায়। আর আপনারা বলছেন একমাত্র হরিনাম। কোন্‌টা ঠিক?

উত্তর ঃ কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি একথা বলেন না যে, যে কোনও মতপথ ধরেই চললে ভগবানকে পাওয়া যাবে। নরকের পথ ধরে স্বর্গে যাওয়া যায় না। কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে যেতে হলে, আগে জানতে হয় সেই পথটা কোনটি, কতদূরে, কিভাবে যেতে হবে ইত্যাদি। যে কোনও পথে, যে কোন বাসে বা ট্রেনে বা নৌকায় চড়ে একই লক্ষ্যে পৌঁছে যাব—এটি উন্মত্ত ব্যক্তির কথা। পথহারা হলে লোকে গাইড-বুক দেখে, ট্রাফিক পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে, ভদ্রলোকদের কাছে জেনে নিয়ে থাকে। কলিযুগের মানুষকে যদি ভগবানের কাছে ফিরে যেতে হয় তবে শাস্ত্রীয় নির্দেশ রয়েছে—*কীর্তনাদ্ এব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গ পরং ব্রজেৎ।* কৃষ্ণনাম কীর্তন করে পরম ধামে উন্নীত হওয়া যাবে। হরিনাম ছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই নেই নেই।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা ॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

প্রশ্ন ৬৬। আমরা শুনেছি বর্তমান কলিযুগটি হচ্ছে 'ধন্য কলি যুগ'। কেননা এই যুগে হরিনাম করে জীব ভগবদ্ধামে চলে যেতে পারবে। তা হলে অন্য সমস্ত কলিযুগের যুগধর্মটি কি? অন্য কলিযুগ ধন্য নয় কেন?

উত্তর ঃ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনই সব কলিযুগের যুগধর্ম। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলিযুগটিকেই বলা হয় ধন্য কলিযুগ। কারণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরূপে অর্থাৎ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে পাপী-তাপী নির্বিশেষে সবাইকে হরিনামে উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবে এই কলির জীবেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভগবৎ কৃপা লাভের সুযোগ পেয়ে থাকে। কিন্তু মন্বন্তরের অন্য সমস্ত কলিযুগে কিংবা বাদবাকী সমস্ত মন্বন্তরেও এই বিশেষ কৃপা করতে মহাপ্রভু আসেন না। আর যুগধর্ম হরিনাম হলেও মানুষেরা হরিনাম করে না। তারা সবরকমের কদাচার করতে করতে জীবন শেষ করে। এ থেকে বোঝা যায়, ধন্য কলিযুগে পৃথিবীতে মানুষ জন্ম পেয়ে হরিনাম করতে পারা পরম ভাগ্যের কথা।

প্রশ্ন ৬৭। 'অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তির কাছে হরিনামের মহিমা প্রকাশ করা অপরাধ'। পদ্মপুরাণে একথা বলা হয়েছে। আবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, 'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।' তা হলে কি নামমাহাত্ম্য এবং মহাপ্রভুর নির্দেশের মধ্যে কোনও স্থান-কাল-পাত্র ভেদের অপেক্ষা নির্দেশ করছে?

উত্তর ঃ কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা সবার কাছেই বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর যখন দেখা যায়, তাদের মধ্যে যারা কৃষ্ণনাম করতে, কৃষ্ণের উপদেশ শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করছে না, শ্রদ্ধাবান নয়, তাদের কাছে জোর করে কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য কৃষ্ণ-উপদেশ কথা প্রকাশ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ৬৮। মায়ার তিনগুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীব কর্ম করে এবং তার কর্মের ভাল-মন্দ ফল লাভ করে। কিন্তু সমস্ত কর্ম তো ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে জীব তার ভাল কর্মের জন্য পুরস্কৃত ও মন্দ কর্মের জন্য তিরস্কৃত হবে কিংবা সুখ ও দুঃখ তাকে ভোগ করতে হবে কেন?

উত্তর ঃ আমাদের একটি স্বাধীনতা আছে। ভগবান সেটি দিয়েছেন। সেই স্বাধীনতা হল এই যে, আমরা কৃষ্ণকে ভালবেসে কৃষ্ণের নির্দেশমতো চলব; অন্যথায়, কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করব এবং সেই সমস্ত কর্মের ভাল-মন্দ ফল ভোগ করব। আমাদের বুঝতে হবে কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে আমরা মায়াতে আপন ইচ্ছায় এসেছি এবং মায়ার জগতের পুরস্কার তিরস্কার বা সুখ দুঃখ পাচ্ছি।

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥

আপন স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা স্বাধীনতার অপব্যবহার করার জন্যেই আমরা জাগতিক বিষয়ে যা ভোগ করছি এজন্য আমরাই দায়ী। মায়ার সত্ত্ব, রজো কিংবা তম—এই তিন গুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করতে কৃষ্ণ নির্দেশ দেননি। কৃষ্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন—*নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব* (গীতা ২/৪৫)—ত্রিগুণের উর্ধ্বে থাক। আমরা যখন আপন ঐকান্তিক ইচ্ছানুসারে জাগতিক কোনও উদ্দেশ্য, ভোগ, মোক্ষ—সবকিছু বাদ দিয়ে কেবলমাত্র কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণপ্রীতি সাধনের জন্য আত্মনিবেদন করব, তখন সেই স্তরে জড় জাগতিক সুখদুঃখের কোনও বালাই নেই।

প্রশ্ন ৬৯। কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম মহামন্ত্র এবং 'জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' এই মন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম মহামন্ত্র হচ্ছে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত মন্ত্র। যথা—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

এই মহামন্ত্র জপ, কীর্তন ও সংকীর্তন করতে বৈদিক শাস্ত্রে নির্ধারিত হয়েছে। আর, 'জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম'—এটি মন্ত্র নয়। এই পদ্যের মাধ্যমে সংসারবদ্ধ জীবকে 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্র জপ করতে এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র এবং শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরের ভজনা করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন ৭০। জপ করার হিসাব রাখতে সাক্ষীমালায় একদিকে ষোল মনি এবং অন্যদিকে চার মনি রাখা হয়। কুড়ি আর পাঁচ মনি রাখা হয় না কেন?

উত্তর ঃ দৈনিক কমপক্ষে ষোলমালা জপ করবার জন্য হিসাব রাখতে ষোল মনি রাখা হয়। আর একলক্ষ বা চারবার ষোলমালা জপের জন্য চার মনি রাখা হয়। এটাই সহজ হিসাব।

৬

মায়াবদ্ধ জীবের দশা

প্রশ্ন ১। অনেক সময় দেখা যায়, কোন মানুষ হঠাৎ উন্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল, আজে বাজে বকতে শুরু করল, সারাদিন অনর্থক বকর বকর করে কথা আওড়াতে লাগল। তার সেরূপ আচরণের কারণ এবং প্রতীকার কি?

উত্তর ঃ হঠাৎ উন্মাদ আচরণ দেখে লোকে 'গ্রহদশা'র কথা উল্লেখ করে। বিভিন্ন রকমের গ্রহ সূক্ষ্ম কলেবর ধারণ করে মানুষকে আক্রমণ করে। তখন মানুষের উন্মাদ দশা উপস্থিত হয়। মহাভারতের বনপর্বে ২৩০ অধ্যায়ের শেষদিকে গ্রহদশার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

কেউ নিদ্রা বা জাগরণ অবস্থায় কোনও দেবতাকে দেখা মাত্রই যে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তাকে দেবগ্রহ বলে। কোনও পিতৃপুরুষকে দেখামাত্র উন্মাদগ্রস্ত হলে তাকে পিতৃগ্রহ বলে। কোনও সিদ্ধ পুরুষকে অবমাননা পূর্বক তাঁর ক্রোধের কারণ হয়ে, অভিশপ্ত হয়ে যে ব্যক্তি হঠাৎ উন্মত্ত হয়, তার নাম সিদ্ধগ্রহ। বিভিন্ন রকমের গন্ধ বা রস আঘ্রাণ করা মাত্র হঠাৎ উন্মত্ত হলে তাকে রাক্ষস গ্রহ বলে। এইভাবে গন্ধর্ব গ্রহ, পিশাচ গ্রহ, যক্ষ গ্রহ রয়েছে।

দোষ বশত চিত্ত অত্যন্ত কুপিত হওয়াতে যে ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, শাস্ত্রমতে অতি শীঘ্র তার চিকিৎসা করা বিধেয়। যে ব্যক্তি ভয়ে বা ভয়ংকর কিছু দেখে হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে রোগের উপশম করা উচিত।

হাবভাব ভেদে তিন ধরনের গ্রহ আছে। কোন কোন গ্রহ আবিষ্ট হলে সারাটা দিন শুধু খেলা, লাফানো, ঘুরে বেড়ানো, আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি করে মানুষ পাগলের মতোই আচরণ করে, কোন কোন গ্রহ আবিষ্ট হলে সারাটা দিন শুধু খাওয়া, ভোগ অভিলাষী হয়ে উঠে। আবার, কোনও গ্রহ আবিষ্ট হলে মানুষ কামক্রীড়া ছাড়া অন্য কিছুই বুঝতে চায় না। কামাসক্ত হয়ে সে এমন উন্মত্ত হয়ে উঠে যে, অত্যন্ত গর্হিত কর্ম করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না, বিয়েপাগলা হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এই সব গ্রহ মানুষের সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত অহিত আচরণ করে থাকে। তার পর একটা জ্বর আসে, তাকে গ্রহজ্বর বলে।

এই সমস্ত গ্রহের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে হলে পারমার্থিক অনুশীলন একান্তই আবশ্যক। কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকার অভ্যাস করা, মনোসংযম, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পূজা অর্চনা, গীতা-ভাগবত পাঠ, হরিনাম জপকীর্তন, ভগবানে প্রণতি নিবেদন, ভগবৎ প্রসাদ সেবন, সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ, কাপড়-চোপড় ও ঘরদুয়ার পরিষ্কার রাখা, ধূপধুনোর গন্ধ দেওয়া ইত্যাদি দৈনিক মাঙ্গলিক কর্ম করতে হয়। তার ফলে গ্রহগুলি কখনও আক্রমণ করতে সমর্থ হয় না।

প্রশ্ন ২। মানুষ ভগবানকে কেন ভুলে যায়?

উত্তর ঃ পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সবার হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকে সমস্ত জীবের স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়, আবার বিলুপ্ত হয়"। (গীতা ১৫/১৫) অর্থাৎ আমরা যদি ভগবদ্ অনুগত হয়ে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করি, তবে আমাদের স্মৃতি ও জ্ঞান জাগ্রত হবে। নতুবা, যদি আমরা বৈদিক শাস্ত্র বিরুদ্ধ জীবন প্রণালীতে চলি, তবে আমাদের স্মৃতিশক্তি, জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হবে।

লীলাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চান, যাতে আমরা তাঁর সঙ্গে আমাদের আসল স্বরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ, 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস' এই পরিচয় জেনে তাঁর প্রতি আমাদের মন প্রাণ সমর্পণ করে তাঁর নিত্য আনন্দময় সেবায় যুক্ত হই। এইভাবে আমরা আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে সচ্চিদানন্দময় শাশ্বত জীবনে ফিরে যেতে পারি।

ভগবান আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা দিয়েছেন। সেই ক্ষুদ্র স্বাধীনতার জন্যে আমরা আপন ইচ্ছামতো কাউকে ভালবাসতে পারি। ভালবাসা আত্মার ধর্ম। এই স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির উপর শ্রীকৃষ্ণ হস্তক্ষেপ করেন না, কারণ ভালবাসা কখনও বাধ্যতামূলক হতে পারে না। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ভালবাসা সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম প্রীতির পাত্র, পরম প্রেমাস্পদ। আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি সেবা দিয়ে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

(গীতা ১৮/৬৫)

ভগবান বলেছেন—'হে প্রিয়, আমার ভক্ত হও, আমাতে মন দাও, সত্যিই প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি আমাকে পাবে।'

কিন্তু আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করে শ্রীকৃষ্ণে মন রাখছি না। শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরম ভোক্তা। তাঁর অণুঅংশস্বরূপ ভোক্তৃত্ব গুণ আমাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিভু, পরম নিয়ন্তা এবং আমরা তাঁর দাসমাত্র। তাই তাঁর ইচ্ছার অনুকূলে আমাদের অণুস্বতন্ত্র শক্তিকে নিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ, কৃষ্ণ যা চান না আমরা যেন তা না করে বসি। কিন্তু সেই স্বতঃস্ফূর্ত অপ্রাকৃত প্রীতি মায়ামোহময় জগতে বিকৃত রূপ ধারণ করে। যেমন তেঁতুলের স্পর্শে দুধ দইতে পরিণত হয়। সেরকম শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির সংস্পর্শে এসে অপ্রাকৃত প্রেম বিকৃত হয়ে মায়ামোহগ্রস্ত জড় কামে পরিণত হয়। স্বাধীনতার অপব্যবহার করার ফলে এই দুঃখক্লেশপূর্ণ জড় জগতে আমরা সুখভোগ করবার জন্য সর্বদা লেগে পড়েছি এবং মায়ার ক্ষণস্থায়ী মরণশীল নারী-পুরুষ, পতি-পত্নী, পুত্র-কন্যা কুকুর-বেড়াল সবাইকে মন প্রাণ অর্পণ করছি।

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এই কথা ভুলে ।
মায়ার নফর হৈয়া চিরদিন বুলে ॥ (প্রেমবিবর্ত)

ভগবান বলেছেন "জড় জাগতিক রূপরসের চিন্তা করতে করতে আসক্তি হয়, আসক্তি থেকে কামনা, কাম তৃপ্তিতে বাধা হলে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে ঘটে স্মৃতিবিভ্রম। ফলে সৎ-অসৎ বিচার-বুদ্ধিহীন হয়ে জীব জড় জগতের অন্ধকূপে পতিত হয়।" (গীতা ২/৬২) "যারা গৃহ পরিবার বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত এবং সর্বদাই সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে, পরম দুস্তর অনন্ত কাল অজ্ঞাতসারে তাদের অতিক্রম করে যায়।" (ভাঃ ১/১৩/১৭) অর্থাৎ, দুর্লভ মানব জন্ম ব্যর্থ হয়ে যায়।

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল ।
এই দোষে মায়া তারে গলায় বাঁধিল ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২/২৮)

কিন্তু মায়াসক্তরা ভুলে গেলেও ভক্তরা ভগবানকে কখনো ভুলে যায় না। তাই ভগবান বলেছেন, "আমি ভক্তজনপ্রিয়, ভক্ত সর্বদাই আমাকে চিন্তা করে, আমিও ভক্তের জন্য চিন্তা করি।" (ভাঃ ৯/৪/৬৩) যদি কেউ অকপট চিত্তে ভগবানের শরণাগত হয় তবে ভগবানের অংশস্বরূপ পরমাত্মা, যিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান, তিনি সহযোগিতা করবেন যাতে ভগবানকে লাভ করা যায়। সেক্ষেত্রে ভগবান স্বয়ং বলেছেন, *দদামি বুদ্ধিযোগং তং*—"আমিই তাকে বুদ্ধি দান করি।" (গীতা ১০/১০) কিন্তু কপটতা করলে অর্থাৎ, তাঁকে ভুলে যেতে চাইলে তিনিও সেই বুদ্ধি দান করবেন যাতে তাঁকে ভুলে থাকতে পারা যায়।

প্রশ্ন ৩। অনর্থ কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ অনর্থ চার প্রকার—(১) স্বরূপ ভ্রম—আমরা যে নিত্যকালই শ্রীকৃষ্ণের দাস, তা ভুলে গিয়ে আমাদের এই দেহটাকেই 'আমি' বলে মনে করা। (২) অসৎ-তৃষ্ণা—যা চিরকাল থাকবে না, অথচ সেই বস্তু পাওয়ার জন্য কামনা করা। (৩) হৃদয় দৌর্বল্য—প্রকৃতির বিধিতে যখন আমাদের অনিত্য সুখ বিধানের জন্য প্রাপ্ত প্রিয় বস্তু আমাদের কাছ থেকে সরে যায়, তখন আমরা শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। (৪) অপরাধ—ভগবান বা ভগবানের ভক্তের চরণে অপরাধ, অর্থাৎ তাঁদের এই জগতের সাধারণ মানুষ বলে মনে করা।

এই সব অনর্থ আমাদের মধ্যে থাকলে আমরা কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল আচরণই করতে থাকব। কৃষ্ণভক্ত এই সব অনর্থ থেকে নিজেকে সযত্নে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেন।

প্রশ্ন ৪। আমাকেও কি কৃষ্ণভক্ত হতে হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ভক্ত হতেই হবে। একবার শ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্তনের পর সমবেত ভক্তগণ সবাইকে নির্দেশ দেন, 'সবাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে প্রণাম করুন'। তখন দুইজন দর্শনার্থী নির্দেশ পেয়েও দাঁড়িয়েই থাকল। প্রভুপাদ যখন পুনরায় প্রণাম করতে তাদের বললেন, তখন তারা ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে প্রশ্ন করল, "ওঃ আমরাও প্রণাম করব? আমাদেরও প্রণাম করতে হবে?" অর্থাৎ, পরম প্রভুর কাছে নতি স্বীকার করাই যে আমাদের প্রকৃত পরিচয়, সেইটি তারা বুঝতে পারে না। তারা আগের থেকেই ধরে নিয়েছে যে, ভক্তরাই

প্রণাম করবে। আমরা অভক্ত থাকব—আমাদের প্রণাম করার ঝুট ঝামেলা নেই। এই রকম চিন্তা করা উজবুকী নয় কি?

প্রশ্ন ৫। জগতে ব্রহ্মার পূজা হয় না কেন?

উত্তর ঃ ব্রহ্মা যখন তাঁর পুত্র-পৌত্রদের দাম্পত্য জীবন গঠন করার মাধ্যমে বিশ্ব প্রজা বৃদ্ধিতে প্রেরণা দান করছিলেন, তখন অন্যদিকে দেবর্ষি নারদ সংসার-বৈরাগ্য বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে ভগবানের ভজনা করার জন্য প্রেরণা দিতে লাগলেন। ফল-স্বরূপ সন্তান-সন্ততিরা অনেকেই ব্রহ্মার কথা অবজ্ঞা করে নারদের কথায় ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করে সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্‌ধামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। তখন শ্রীনারদকে ব্রহ্মা অভিসম্পাত দিলেন, 'হে নারদ! তুমি আমার মতো পিতারও অবজ্ঞা করছ। তুমি কোন দিনও এক জায়গায় স্থির থাকতে পারবে না।' এই অভিশাপ শিরে ধারণ করে দেবর্ষি নারদও শ্রীব্রহ্মাকে অভিসম্পাৎ দিলেন, 'হে লোকপিতামহ! আপনি ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন হয়েও আমাদের সবাইকে সংসারী হওয়ার প্রেরণা দিয়ে চলেছেন, যার ফলে লোকে যৌনসুখমোহাচ্ছন্ন হয়ে মৃত্যুময় জগতে বদ্ধ হয়ে থাকবে। অতএব, আপনি যতই পূজ্য হন না কেন, জগৎজীব কেউ আপনার পূজা করবে না।' এই বলে শ্রীনারদ অন্তর্হিত হলেন।

প্রশ্ন ৬। লোকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে কেন?

উত্তর ঃ যাদের কোনও কাজ থাকে না—অর্থাৎ যারা পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের সেবা বাদ দিয়ে অন্য তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়, তারা বিষ খেয়েই থাকে।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (৬০/৩৩) একস্থানে উল্লেখ আছে—

বিনা তৎসেবনং যো হি বিষয়ানন্যং বাঞ্ছতি ।
বিষমত্তি প্রণাশায় বিহায়ামৃতমীপ্সিতম্ ॥

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য বিষয় বাঞ্ছা করে, সেই ব্যক্তি বাঞ্ছিত অমৃত পরিত্যাগ করে নিজের বিনাশের জন্য বিষ ভক্ষণ করে।'

প্রশ্ন ৭। মন শয়তান। তাকে ভগবৎচরণে কিভাবে নিবেদন করা যাবে? গীতায় বলা হয়েছে, 'মম মায়া দুরত্যয়া' কেউই মায়াকে ত্যাগ করতে পারে না। 'আমি' ও 'আমার' এই কথাগুলিই বা কিভাবে লোকে ত্যাগ করতে পারে?

উত্তর ঃ মনকে শয়তান বলেও কোন লাভ নেই। শয়তানী বৃত্তি থেকে মনকে সরালেই সমাধান হয়। ভগবানের সুন্দর মনোহর ছবি ও সুসজ্জিত শ্রীবিগ্রহ দর্শন, ভগবানের সুস্বাদু প্রসাদ গ্রহণ, ভগবানের মধুর মধুর কথা শ্রবণ ও দিব্য হরিনাম কীর্তন করে আনন্দে নৃত্য করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। এই সব করলে মনের উপর পবিত্রতার প্রভাব আসবে।

'মায়া দুরত্যয়া' হলেও মায়াদেবী অবশ্যই মুক্তির পথ ছেড়ে দেবেন, যদি তিনি দেখেন পরমেশ্বর ভগবানের আপনি ঐকান্তিক ভক্ত। ভগবৎ চরণে যারা প্রপত্তি করে, *মায়ামেতাং*

তরন্তি তে—'তারা মায়াকে অতিক্রম করতে পারে'। (গীতা ৭/১৪) কিন্তু আসল কথা হল, গণ্ডমূর্খ নরাধমরা প্রপত্তি স্বীকার করবে না, তারা কৃষ্ণের ভক্ত হয় না। *ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ* (গীতা ৭/১৫)।

কিন্তু কৃষ্ণানুকূল জীবনানুশীলনে ভক্ত বলতে থাকেন, 'আমি' কৃষ্ণের দাস। 'আমার' তিনি প্রভু। 'আমি' যা করছি এবং 'আমার' যা করণীয়—তা 'কৃষ্ণ-ইন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা' হেতু।

সুতরাং, সে ক্ষেত্রে 'শয়তান মন'কে মেরে ফেলবার, কিংবা মায়াকে ঘৃণা করবার, অথবা 'আমি-আমার' ভাবকে ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই?

প্রশ্ন ৮। দীর্ঘদিন নাম করেও ইন্দ্রিয়ের প্রভাব কমে না কেন?

উত্তর ঃ উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্তন, নিত্য ভাগবত পাঠ, রাধামাধবের পাদপদ্ম স্মরণ, ভগবান ও ভক্তসেবা, সাধুসঙ্গ করতে করতে হৃদয়ের কলুষরাশি ক্রমে ক্রমে দূর হয় এবং জড় বিষয়ে মন বিচলিত হয় না। আমাদের ভক্তি যত শুদ্ধ হবে, গুরুর কৃপা যত বেশি লাভ হবে, ইন্দ্রিয়ের প্রভাব ততই শিথিল হবে।

প্রশ্ন ৯। সর্বজীবের মধ্যে ভগবান বিরাজ করছেন। তবে জীবকে সন্তুষ্ট করলে কি ভগবান সন্তুষ্ট হন?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি কোনও জীবকে তার জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিপূর্ণ জীবন থেকে চিরকালের মতো সম্পূর্ণরূপে উদ্ধারের পন্থা দিতে পারে না, অথচ সেই ব্যক্তি যদি বলে ওঠে "আমি পর হিতাকাঙ্ক্ষী, আমি জীবের সন্তুষ্টি বিধান করছি," তা হলে বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে সে একটা প্রতারক মাত্র।

সুদুর্লভ মনুষ্য-জন্ম হরিভজনেরই জন্য। নিজে ভক্তি অনুশীলন করে এবং অপরকে ভক্তি অনুশীলনের প্রেরণা দিয়ে যে-কেউই তাদের মূল সমস্যার সমাধান করতে পারে। ভগবানের দিব্য নাম জপ কীর্তন, স্মরণ, ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করাই যথার্থ কর্ম। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—*স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্।* আমরা যা করছি, সেই কর্মে যদি ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা হয়, তবে আমাদের সেই কর্ম সার্থক। (ভাঃ ১/২/১৩) বৃক্ষের মূলে জল সেচন করতে হয়, মূল বাদ দিয়ে বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখায়, ফুলে, ফলে, পাতায় জল দেওয়া মূর্খের কর্ম। মূলে জল দিলে শাখা-প্রশাখা ফুল ফল পুষ্টিলাভ করে। ঠিক সেইরূপ আমাদের সমস্ত জীবনীশক্তির মূল সেই পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করলে তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ স্বরূপ সমস্ত জীব সুখ-শান্তি লাভ করতে পারবে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন—"*মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎ-প্রসাদাত্তরিষ্যসি*"। মদ্‌গতচিত্ত হয়ে আমার কৃপায় জড় জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে উত্তীর্ণ হতে পারবে। (গীতা ১৮/৫৮)

কিন্তু তথাকথিত হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা ভগবানের নির্দেশের বিরোধী কর্মের মাধ্যমে জীবের সন্তুষ্টি—ইন্দ্রিয়তুষ্টির বিধান করছে। তারা সন্তুষ্টি বিধানের নামে প্রতারণা করছে।

যেমন, ভগবানের একটি নির্দেশ হল, 'জীবহিংসা করো না।' মানুষ তার রক্তমাংস-লোলুপতার তৃপ্তি সাধনের জন্য কসাইখানা খুলছে। সেই কসাইখানা খুলে বহু মাংসভুকের জীবনের তুষ্টি সাধিত হচ্ছে। যদিও তাদের পরিণতি ভয়ংকর। মানুষ দাতব্য হাসপাতাল খুলেছে, যাতে লোক ভ্রূণহত্যা করার সুযোগ পায় এবং সমানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিও বজায় রাখতে পারে এবং বীর্যক্ষয় করতে পারে। এইভাবে বহু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি তাদের আয়ু ও শুভচেতনা হারিয়ে তৃপ্তি-তুষ্টি লাভ করছে। মাদক দ্রব্যের ব্যাপক উৎপাদনের ফলে বহু নেশাখোরের তুষ্টি সাধিত হয়। তা ছাড়া বিড়ি সিগারেটের উপর কর ধার্য করেও সরকার আর্থিক ভারসাম্য বজায় রেখে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। পথেঘাটের দরিদ্র ছেলেদের টাকাপয়সা সাহায্য করে তাদের ভিডিও ও নেশাদ্রব্যের চাহিদা পূরণ করা যায়। এইভাবে বহু জীবের সন্তুষ্টিবিধান করা যায়।

কিন্তু প্রকৃত সন্তুষ্টি বিধান করতে হলে জীবকে এই মৃত্যুময় জগৎ থেকে উদ্ধারের পন্থা—কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে ব্রতী করাতে হবে। ফলে ভগবানও সন্তুষ্ট হন। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—"ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য সব কিছুই নিরর্থক। যিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান স্বয়ং ভগবান কর্তৃক পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হন।" (ভাঃ ৩/১৩/৪৯)

আমাদের জানতে হবে যে প্রত্যেক জীবের মূল সমস্যা হল জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি। এগুলির সমাধান কেউ করতে পারে না। অথচ, জড় বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা অবশ্যম্ভাবী রূপে জীবকে এই সমস্যাগুলির মধ্যে রেখে তার সন্তুষ্টিবিধানের কথা চিন্তা করছে। এরূপ বিড়ম্বনাতে কখনই জীবের প্রকৃত তুষ্টিসাধন সম্ভব নয়।

সমাজে বহুধরনের মানুষ রয়েছে। তাদের বাসনাও বহুরকমের। তাদের এমন কি পরস্পর বিপরীতমুখী বিরুদ্ধ বাসনাও রয়েছে। গরীব ব্যক্তিও উদ্বেগগ্রস্ত, কোটিপতিও উদ্বেগগ্রস্ত। দেখা যায়, কোটিপতি ব্যক্তিও মনের অসন্তুষ্টিবশত আত্মহত্যা করে। কারণ তার জীবনে ধন জন স্ত্রী পুত্র প্রভাব প্রতিপত্তি তাকে তৃপ্তিদান করতে পারেনি।

পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, (গীতা ৩/৯) 'হে অর্জুন! কেবলমাত্র ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্যই কর্ম করা উচিত।' *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ।* তা হলে সমস্যাপূর্ণ জগৎ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। মুক্তসঙ্গ সমাচর। নতুবা সমস্ত জড়জাগতিক কর্ম জীবকে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে।

প্রশ্ন ১০। অহরহ সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা সত্ত্বেও একটা ২৪ বছর বয়সের ছেলে আত্মহত্যা করল। সদ্‌গ্রন্থ পাঠের কোন প্রভাব তাকে এই নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত করতে পারল না কেন?

উত্তর ঃ সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করার উদ্দেশ্য হল নিজেকে জানা। আমি কেন জন্মালাম, কেন মরব, কেন দুঃখ পাচ্ছি, কি আমার করণীয়, আমার সঙ্গে এই জগতের সম্পর্ক কি, এই জগৎ কি, জগতের পরম নিয়ন্তা কে, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? এই

বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করা। যারা এই সকল আত্মজ্ঞান লাভ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব, তারা কখনও আত্মহত্যা করে না।

যারা মূর্খ, যারা পরমার্থ ছেড়ে জড়জাগতিক বিষয় সম্পর্কে বেশি চিন্তা করে, যাদের মধ্যে জাগতিক সুখ-সুবিধা ভোগ করার মনোবাসনা প্রবল, যাদের অন্তরে অন্তরে অহংকার, চিত্ত বিক্ষেপ, চঞ্চলতা, হয়তো বাইরে কখনও কখনও শান্তশিষ্ট ও ধীর বলে মনে হতে পারে, সেই ধরনের লোকেরা লোক-দেখানো হাজার সদ্‌গ্রন্থ পড়লেও যে কোনও সময় বিপজ্জনক পন্থা গ্রহণ করতে পারে।

তারা মূর্খ, কারণ তারা জানে না যে, প্রকৃতপক্ষে কেউই আত্মাকে হত্যা করতে পারে না। আত্মা অমর। বহু ভাগ্যের ফলে জীব উন্নত মানব শরীর ধারণ করেছে। মানব-জন্মের উদ্দেশ্য হল পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করা। সদ্‌গ্রন্থ পাঠের উদ্দেশ্য তাই।

প্রশ্ন ১১। বেদে বলেছে, 'মানুষ অমৃতের পুত্র'। তবে সে কেন আনন্দ পায় না? কেন অশান্তি ভোগ করে?

উত্তর ঃ অমৃত হল কৃষ্ণভাবনার অমৃত। কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত না হলে কেউই শান্তি লাভ করতে পারে না। সবাই এটা ওটা এই জড় জগতের ভোগ বাসনা চরিতার্থ করতে চায়। এই জড় জগৎ আনন্দলোক নয়। এটি মৃত্যুময় লোক। দুঃখ পূর্ণ জগৎ। আনন্দময় লোক হচ্ছে—যেখানে কোনও দুঃখ নেই, উদ্বেগ বা কুণ্ঠা নেই—বৈকুণ্ঠ জগৎ বা ভগবদ্‌ধাম। সেই জগতে উন্নীত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। অন্যথায় অশান্তিই নিরন্তর প্রাপ্য।

প্রশ্ন ১২। বর্তমানে এই কলিযুগে এমন কোন্ মানুষ আছে যে, ভগবানকে দর্শন করেছে?

উত্তর ঃ কলিযুগের অসংখ্য মানুষ ভগবানকে দর্শন করবার জন্য তীর্থে তীর্থে আসছেন, মন্দিরে ভিড় করছেন। সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্‌বিগ্রহ দর্শন করে তাঁরা প্রতিদিন প্রণতি নিবেদন করছেন। অপূর্ব ঐশ্বর্য ও মাধুর্যমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহরূপে পরমেশ্বর ভগবান এই ধরাধামে নিত্যকাল বিরাজমান।

সুতরাং ভগবানকে দর্শন করেনি এমন নিতান্ত দুর্ভাগা মানুষ খুঁজে পাওয়া দায়।

প্রশ্ন ১৩। ভগবানকে দর্শন পেলে তো মানুষ এই জগতের সমস্ত দুঃখ ভুলে যাবে। তাই নয় কি?

উত্তর ঃ না, বহু মানুষ আছে তারা ভগবানকে দেখেই ঈর্ষাকাতর হয়, হিংসা ও বিরোধিতা করে, ভগবানকে বিদ্রূপ করে। তখন তারা সুখ শান্তির কথা ভুলে গিয়ে ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ হয়ে ওঠে। রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, শিশুপাল, রুক্মী, পৌণ্ড্রক, বাণ প্রভৃতি ব্যক্তিরা ভগবানকে দেখেই অশান্ত হয়ে উঠত। বিক্ষুব্ধ হত। আবার অনেক মূঢ় মানুষ আছে যারা ভগবানকে দর্শন করেও অবজ্ঞা

করে, ভগবদ্দর্শনে তাদের মনে কোনও আনন্দই আসে না। অতএব ভগবানকে দর্শন পেলেই যে, মানুষ সমস্ত দুঃখ ভুলে যাবে। একথা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ১৪। প্রেতাত্মা কোথায় থাকে?

উত্তর ঃ প্রেতাত্মা অন্তরীক্ষে ঘুরে বেড়ায়। যারা মানবদেহের মর্যাদা না রক্ষা করে আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেছে তারা অশরীরী প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এরা সাধারণত নিশাচর প্রাণী। মহাভারতে অনুশাসন পর্বে ১৩১ অধ্যায়ে প্রেতপিশাচাদির অধিকার স্থান বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত উচ্ছিষ্ট শরীর, অপবিত্র ও নীচমনা ব্যক্তিদের প্রেতপিশাচেরা নিজ অধিকারে আনতে প্রয়াসী হয়। তারা কোন্ ধরনের ব্যক্তিদের উপর উপদ্রব করে, আর কোন্ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে যায় না—এই রকম একটি প্রশ্ন দেবতা, মহর্ষি ও পিতৃলোক দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে সেই প্রেতপিশাচেরা প্রমথেরা বলতে লাগল—যারা সাধুলোকের অপমান করে, যারা বেদবিরুদ্ধ মাংস ভক্ষণ করে, যারা মস্তকে আমিষ জাতীয় বস্তু স্থাপন করে, যারা জলে কফ থুথু সর্দি ফেলে, যারা গাছের তলায় ঘুমায়, যারা অবৈধ যৌন সঙ্গ করে, মৈথুনের পর যারা স্নান করে না, যারা শয়নে মাথার স্থানে পা রাখে পায়ের স্থানে মাথা রাখে, সেই সমস্ত বহু ছিদ্র সম্পন্ন অপবিত্র লোকেদের আমরা আক্রমণ করি এবং আমাদের ভোগ্যবস্তু বলে তাদের গ্রহণ করি।

সেই প্রমথেরা যাদের কাছে যায় না সেই কথাও বলতে লাগল ঃ যাদের গৃহে দিনরাত অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, যারা মাথায় ঘৃতমিশ্রিত আতপ তণ্ডুল প্রদান করে, যারা অন্য প্রাণীর রক্তমাংস ভক্ষণ করে না, যাদের শরীরে গোরোচনা গোদুগ্ধ বিদ্যমান থাকে, যাদের গৃহে যজ্ঞীয় ধূম বিদ্যমান, আমরা পিশিতাশন নিদারুণ নিশাচরগণ কখনই সেই সমস্ত গৃহ আক্রমণ করতে সমর্থ হই না।

যাঁরা শ্রীহরির নামমহিমা কীর্তন, জপ, কৃষ্ণসেবাযত্ন, কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন, কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করেন তাঁরা সর্বদা পবিত্রই থাকেন। ভক্তিমান মানুষ যেখানে সেখানে পড়ে ঘুমায় না, মাছ মাংস খায় না, নেশা ভাং করে যত্র তত্র ঘুরে বেড়ায় না, অবৈধসঙ্গ করে না, তাঁরা হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞে ব্রতী হয়ে উন্নত জীবন যাপন করেন। তাঁদের কাছে ভূতপ্রেত পিশাচ তো দূরের কথা সাক্ষাৎ যমদূতও দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে প্রস্থান করে। এ সকল শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন না করে, আমাদের আনন্দময় জীবনের জন্য শ্রীকৃষ্ণভজন অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন ১৫। গ্রামে গঞ্জে মাঝেমধ্যে প্রায় দেখা যায়, মানুষ ফাঁসি দিয়ে, রেলে মাথা চাপা দিয়ে, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করছে। তারা তো সৎ ব্যক্তি বলেই মনে হয়। তবুও কিজন্য বা কোন্ পাপে তাদের এরকম অপঘাতে মৃত্যু ঘটে?

উত্তর ঃ সত্যি বলতে কি, সৎ ব্যক্তি কখনও আত্মহত্যা করতে যায় না। জগতে তিনটি সত্য আছে, এক—কৃষ্ণ সত্য, দুই—কৃষ্ণভক্তি সত্য, তিন—কৃষ্ণভক্ত সত্য।

কৃষ্ণভাবনার প্রতিকূলে যা সত্য বলে মনে হয়, তা সবই অ-সত্য। এই অ-সত্যকে নিয়ে যে বেশী মাথা ঘামায়, সে আত্মহত্যা করছে। মহর্ষি শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে তাই উল্লেখ করেছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভম্
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

"এই শ্রেষ্ঠ মানবদেহ আমরা লাভ করেছি বহু বহু জন্মের পরে। এই মানব দেহটি একটি মজবুত নৌকার মতো। পারমার্থিক কৃষ্ণভক্ত গুরুদেবই সেই মানব-জীবনরূপ নৌকার মাঝি। কৃষ্ণভাবনার অনুকূলে সংকীর্তন আন্দোলনরূপ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। এই ভব-সংসার-সমুদ্র উত্তরণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি উত্তরণের চেষ্টা করছে না, সে আত্মঘাতী।"

মানুষ অনিত্য সম্বন্ধের উপরই বেশী জোর দেয় এবং অনিত্যকেই নিত্য বলে মনে করে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ভালবাসার পাত্র—এ সমস্ত অনিত্য সম্বন্ধেই মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। আর, সেই মায়ামোহগ্রস্ত হওয়ার জন্য সে মায়াসুখের স্বপ্নে ঘুরে বেড়ায়। আর মনে করতে থাকে—সেই খানেই জীবনের সমস্ত সুখ, ভিত্তি, আশা, ভরসা এবং লক্ষ্য। কিন্তু সেই মায়ামোহগ্রস্ত মনের উপরে যখন আঘাত বা খোঁচা লাগে, অমনিই সে ভেঙে পড়ে, আর মনে করতে থাকে—এ জীবনে বেঁচে থেকে আর আমার কোনও লাভ নেই।

কিন্তু সেই মায়াভাবনা হল কৃষ্ণভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কৃষ্ণভাবনার মধ্যে যে আশা, ভরসা, সুখ, ভিত্তি ও লক্ষ্য রয়েছে তা কোনদিনই বৃথা হয় না বলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

জড়জাগতিক ভালবাসা যত বেশী গভীর হবে ততই পরিণামে হতাশা ও যন্ত্রণাদায়কই হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা সমস্ত হতাশা ও যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা ভগবানের সম্বন্ধ চিরন্তন। মানুষ বুদ্ধিমান জীব। এই জন্য সে জানতে চেষ্টা করে বুঝতে চেষ্টা করে—কেন সে মানুষ জন্ম পেয়েছে, কেন এই জগতে জন্মেছে, তাকে কেন থাকতে হবে, কেন মরতে হবে, এই জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি, এই জগৎ কে বানিয়েছে, সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি। কিন্তু সে যদি এসব মুখ্য চিন্তা বাদ দিয়ে নির্বোধের মতো কতকগুলি জীবের সঙ্গে জাগতিক মায়া-সম্বন্ধটার চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকে তবে পরিশেষে সে আত্ম-উপলব্ধির বদলে আত্মহত্যার সামিল হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তিনি পরমাত্মারূপে সবার হৃদয়ে রয়েছেন। তাঁর প্রতি যাঁর মন, তিনি কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত থাকেন। ভক্তিপরায়ণ হলে সর্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে হৃদয় থেকে শুভবুদ্ধি প্রদান করেন। আর কৃষ্ণভক্তিকে এড়াবার ইচ্ছা করলে শ্রীকৃষ্ণ সুবুদ্ধি সরিয়ে নেন। পূর্বজন্মের অপকর্মের ফলস্বরূপও জীবের এই জন্মে

অপঘাতে মরবার কারণ হয়। কিন্তু কৃষ্ণনাম কীর্তনের ফলে অজ্ঞাত অপকর্মের ফলও ক্ষয় হয়ে যায়, আর তেমন গুরুতরভাবে ভয়ংকর কর্মফল ভোগ করতে হয় না।

প্রশ্ন ১৬। মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান ও আসুরিকভাবসম্পন্ন মানুষেরা ভগবানের শরণাগত হতে পারে না কেন?

উত্তর ঃ মূঢ় বা মূর্খ ব্যক্তি সর্বদা দিনরাত পশুর মতো খেটে চলাটাই একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করে। জাগতিক লাভটাই তাদের কাছে সবকিছু। জাগতিক বিষয় লাভের জন্য সে সব রকমের শ্রম, পীড়া, ক্লান্তি ভোগ করে। দুর্ভাগ্য হলে সে ভগবানের কথা শুনতে সময় দিতে পারে না। ভারবাহী গাধার মতো জীবন। "গদর্ভের মতো আমি করি পরিশ্রম। কা'র লাগি এত করি, না ঘুচিল ভ্রম ॥" (উপদেশ)

নরাধম বলতে বোঝায় যে মানুষ হয়েও অধম। অর্থাৎ সে ভগবানকে বাদ দিয়ে নানাবিধ পরিকল্পনা করে, সে সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত বলে মনে হয়, কিন্তু মানুষদেহ পেয়েও যে ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্ক আছে—তা শেখে না, এবং প্রকৃত ধর্ম যে ভগবৎপ্রণীত এবং তা অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন তা সে গুরুত্বই দিতে চায় না।

মায়াপহৃতজ্ঞান বলতে বোঝায় যার মায়ার প্রভাবে শুদ্ধজ্ঞান ভ্রষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ, সে খুব জ্ঞানী ব্যক্তি, বিদ্বান বলে সমাজে পরিগণিত হতে পারে। তার দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য ও সাহিত্য ইত্যাদিতে খুব পাণ্ডিত্য থাকতে পারে, তাতে মায়াবদ্ধ জীবের সুখ-দুঃখটাই সব কিছু—তা-ই প্রতিফলিত হয়। তার সেই সব রচনা সাধারণ মানুষকে খুবই ভাবিয়ে দিতে পারে, বিভিন্ন বিষয়-চেতনায় মাতিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে কখনও পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি উন্মুখ হতে শেখায় না এবং নিজেও শেখে না।

অসুরভাবাপন্ন বলতে যার চেতনা অসুরের মতো। সে ভগবানকে অবতাররূপে স্বীকার করে না। সে নিজেকেই ভগবান বলে। পরমেশ্বর হর্তা কর্তা বিধাতা যে একজন ব্যক্তিপুরুষ তা সে স্বীকার করে না, পরমেশ্বর ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গিয়ে সে শুরু করে যারা ভগবানের ভক্ত তাদের বিরোধিতা করতে।

এই চার ধরনের মানুষের মনোভাব কখনও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ হয় না। তাই তারা ভগবানের শরণাগত হতে পারে না। তারা তথাকথিত মানব-সমাজে সেরা নামজাদা ব্যক্তিরূপে গণ্যমান্য হলেও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা অনুসারে তারা গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হয়।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থে বলা হয়েছে—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

অর্থাৎ, "পরমেশ্বর ভগবানে ভক্তিবিহীন মানুষ, তা তিনি যত বড় জাতীয়তাবাদী, কর্মবীর, রাজনীতিবিদ্, সমাজসেবক, বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক হোন না কেন, তাদের সমস্ত সদ্-গুণগুলি মৃতদেহের উপর জড়িয়ে দেওয়া মূল্যবান ভূষণের মতো।"

প্রশ্ন ১৭। অনর্থ কি?

উত্তর ঃ যা শ্রীকৃষ্ণভক্তির পথে বাধাস্বরূপ তা-ই অনর্থ। কৃষ্ণভক্তিই পরমার্থ। কৃষ্ণভক্তির অন্তরায়ই অনর্থ।

জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় সংসার-বদ্ধ জীবের ভোগ-বাসনা বা দুর্বাসনাই সমস্ত অনর্থের মূল। সেই অনর্থ চার প্রকারের। যথা—দুষ্কৃতিজাত বা দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ, সুকৃতি জাত বা সুকৃতোত্থ অনর্থ, অপরাধজাত বা অপরাধোত্থ অনর্থ এবং ভক্তিজাত বা ভক্ত্যুত্থ অনর্থ। এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা জানা কর্তব্য।

১) দুষ্কৃতিজাত অনর্থ—অবিদ্যা (অজ্ঞানতা), অস্মিতা (মোহ), রাগ (আসক্তি), দ্বেষ (বিরক্তি), অভিনিবেশ (দেহাসক্তি ও মৃত্যুভয়)—এগুলি দুষ্কৃতি থেকে জাত অনর্থ। অবিদ্যাগ্রস্ত কৃষ্ণভক্তিহীন জীবের ভোগবাসনার ফলে দেহ ও দৈহিকাদিতে 'আমি ও আমার' বলে কোন কিছুতে মোহ, ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি, ত্রিতাপ-দুঃখের প্রতি বিরক্তি বা দ্বেষ—এইভাবে দেহ-দৈহিকাদিতে প্রচণ্ড অভিনিবেশের প্রবল সংস্কার সবসময় জীবের হৃদয়ে বদ্ধমূল রয়েছে। ভজন কালে ঐ সংস্কার হরিকথা হরিনাম শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দনে অন্তরায় বা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই হল দুষ্কৃতিজাত অনর্থ।

২) সুকৃতিজাত অনর্থ—সকাম পুণ্যকর্ম অর্থাৎ অনিত্য স্বর্গলোকের ভোগসুখের যে কামনা, তা সুকৃতিজাত অনর্থ। ভক্তসাধকের ভজনকালে পূর্বজন্মের সংস্কার বশে স্বর্গভোগের কামনা অন্তরে জাগে, এটাই সুকৃতিজাত অনর্থ। মুক্তিকামনাও এই অনর্থের অন্তর্ভুক্ত। 'ভুক্তি ও মুক্তি এই দুই স্পৃহা বা বাসনারূপ পিশাচী যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভক্তিসুখের উদয় হয় না।' (ভঃ রঃ সিঃ ১/২/২২)

৩) অপরাধজাত অনর্থ—শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীকৃষ্ণধাম—এই সকল চিন্ময় বস্তুতে জড় বুদ্ধিবলে অবজ্ঞা, অনাদর ইত্যাদি গর্হিত কর্মই অপরাধ। এই অপরাধের ফলে সাধকের ভজন বল নষ্ট হতে থাকে। তাই নাম-অপরাধ, ধাম-অপরাধ, সেবা-অপরাধ থেকে সতর্ক থাকতে হয়।

৪) ভক্তিজাত অনর্থ—যাঁরা হরিভজন করেন, স্বভাবতই সকলে তাঁদের প্রতি অনুরক্ত থাকে, ভজনকালে ভক্তিসাধকের স্বাভাবিকভাবেই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উপস্থিত হয়ে থাকে। এগুলি সাধকের ভজন-উন্নতির বা প্রেম-প্রাপ্তির পথে প্রচণ্ড বাধা। সাধক নিষ্কিঞ্চনভাবে দৈন্যের সঙ্গে ভজনপথে অগ্রসর হবেন। কিন্তু লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির কামনায় যদি হৃদয় একবার উপরঞ্জিত হয়ে যায়, তবে ভজনসাধন করেও ফলস্বরূপ অনর্থগুলিই লাভ হয়। তাই ভক্তি কল্পলতাকে বাঁচাতে হলে তার মূল থেকে ধন-যশ প্রতিপত্তি-প্রতিষ্ঠারূপ পরগাছা বা আগাছাগুলিকে পরিহার করতে হয়।

পূর্বতন আচার্যগণ বলেন, পরমেশ্বর শ্রীহরির প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি থাকলে দুষ্কৃতিজাত ও সুকৃতিজাত অনর্থ দূর হয়। শ্রীহরি ও শ্রীহরির সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুর প্রতি শ্রদ্ধাভাব বা আদর মনোভাব থাকলে অপরাধজাত অনর্থ আসে না। ভজনপরায়ন সাধকের হৃদয়ে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা মোহ স্বভাবতই নিবৃত্ত হয়ে যায়।

ভজনক্রিয়াতে দৃঢ়তা জাগলে সমস্ত অনর্থনিবৃত্তি ঘটতে থাকে। ভজনে শিথিলতা বা গড়িমসি জন্মালে অনর্থগুলিও উপস্থিত হয়ে ভজন-ইচ্ছাকে গ্রাস করে ফেলে। তাই উৎসাহ, ধৈর্য ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নিয়ে শ্রীহরির পাদপদ্মে শরণাগত ভক্ত ভক্তিসাধনায় অবিচলিত থাকেন।

প্রশ্ন ১৮। অবিদ্যা কি?

উত্তর ঃ প্রকৃত বিদ্যার বিপরীতকে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা বলে। যথা—

অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, যেমন—দেহ, ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র—এই সব নিত্য বা স্থায়ী নয়; তবুও মানুষ মনে করতে পারে যে, এই সব নিয়ে সে চিরকাল থাকবে।

অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, যেমন—রক্ত মাংস মেদ অস্থি কফ পিত্ত মল মূত্র ইত্যাদিতে পূর্ণ এই জড় দেহ অশুচি বা ঘৃণ্য হলেও আমরা মনে করতে পারি, 'আ-হা কত সুন্দর উপভোগ্য দেহ!'

দুঃখে সুখবুদ্ধি, যেমন—জন্মযন্ত্রণা, মৃত্যুযন্ত্রণা, ব্যাধিযন্ত্রণা ইত্যাদি বর্তমান থাকাতেও আমরা মনে করি বিষয়-আশয় বন্ধুজন নিয়ে সুখে থাকতে পারব। যদিও বা সেই সব তুচ্ছ সুখ আমাদের সমস্ত দুঃখেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি, যেমন—পরমাত্মা পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধজ্ঞান নেই, কিন্তু জড় দেহ-সম্বন্ধ যদি থাকে অর্থাৎ মরণশীল দেহগুলিকে আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজন এবং 'আমার অত্যন্ত প্রিয়জন' বলে মনে করি। এই সবই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা।

প্রশ্ন ১৯। যারা শ্রীহরির আরাধনা করে না তারা কি কেউ সুখে নেই? বরং যারা শ্রীহরির আরাধনা করছে তারাও তো কষ্ট দুঃখ ভোগ করছে?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে জানা যায় ভগবানের পরম ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ তাদেরই জন্য দুঃখ করছেন যারা জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থেকে ভগবান শ্রীহরিকে ভুলে আছে। আর যারা জাগতিক দুঃখের মধ্যে থেকেও হরিনাম করছে, তাদের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেননি। এর কারণটি হল সেই তথাকথিত সুখী ব্যক্তিরা মনুষ্য জন্মের সদ্ ব্যবহার না করার ফলে অবধারিত ভাবে ইতর জন্মচক্রে অনন্তকাল পতিত হয়ে দুঃখকষ্ট ভোগ করে চলবে। জাগতিক সুখ-দুঃখের কথাটাই বড় নয়—যে মানুষ শ্রীহরির আরাধনা করছে না সেই হচ্ছে পতিত অধম জীব। আর হরিভজনশীল অত্যন্ত দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তি জড়-জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পতিত বলে মনে হলেও তিনি অবশ্যই ভগবদ্ ধামের যাত্রী। তিনি সর্ব দেবতারও প্রণম্য।

অনেকেই আছে যারা শ্রীহরির আরাধনা না করেই অত্যন্ত সুখেই জীবন অতিবাহিত করছে। কিন্তু তাদের সুখকে বলা হয় শূকরের সুখ। যেমন একটা শূকর এতই আনন্দে দিন কাটায় যে, একজন মানুষও সেই পরিমাণ সুখী হতে পারে না। সারাদিন পচা পাঁক ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত স্থানেও শূকর দিব্যি সুখেই কাটাচ্ছে। তাদের মতো আহার-নিদ্রা-মৈথুন জনিত সুখ লাভ একটি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ মানুষের নানা উদ্বেগ

আছে। অসুখ-বিসুখের জন্য ভয় আছে। নানা রকমের দায়িত্বও আছে। কিন্তু শূকরের অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি কোন চিন্তাই নাই। শ্রীহরির আরাধনা না করে শূকর দিব্যসুখেই আছে। কিন্তু মানুষকে ভগবান শিখিয়েছেন ধর্ম আচরণ করতে—*ধর্মন্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রণীতম্।* যারা ধর্মজ্ঞানহীন তারা শূকরের মতোই সুখ লাভের জন্য সদাপ্রয়াসী। *ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানা*—ধর্মহীন ব্যক্তি পশুর মতোই। জড় জগতে অবশ্যম্ভাবী জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনদশা থেকে উদ্ধারের পথ তারাই জানতে পারে যারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। ভগবদ্ ভজন বা শ্রীহরির আরাধনা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই করেন—*যজন্তি হি সুমেধসঃ।* যে ব্যক্তিরা স্বভাবতই দুষ্কৃতিপরায়ণ মূঢ় নরাধম, তারা হরিভজন করে না বলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন—*ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।* (গীঃ ৭/১৫)

ভজনহীন ব্যক্তি আর ভজনপরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ একটি উদাহরণ দেখিয়েছিলেন, বিড়াল তার বাচ্চাগুলোকে মুখে কামড়িয়ে অন্যত্র সরিয়ে নেয়। সেইভাবে ইঁদুরগুলোকেও মুখে কামড়িয়ে নিয়ে যায়। দেখতে একই রকমের হতে পারে। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি পরিস্থিতিগুলি ভক্ত ও অভক্ত উভয়ের ক্ষেত্রে দেখতে একই রকমের হতে পারে। কিন্তু বিড়ালের মুখে ইঁদুরগুলি মহাবিপদ দুর্বিসহ মারাত্মক যন্ত্রণা অনুভব করলেও বিড়ালের মুখে বিড়াল-ছানাগুলি নিরাপদ স্নেহময় আনন্দ অনুভব করে। সেইরকম, ভক্ত ও অভক্তের গতি পরিণতি আসলে কখনোই এক হয় না।

কলিযুগের মানুষের—যাদের চিত্ত পাষণ্ড মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত তারা হরিভজনে মোটেই আগ্রহী হয় না। সেই কথাটি পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মহর্ষি ব্যাসদেবের মহান পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীঅর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছিলেন।

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্ ।
প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ড বিভিন্নচেতসঃ ॥

"হে রাজন্! ব্রহ্মাদি ত্রিলোকেশ্বরগণও যাঁকে আরাধনা করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে কলিযুগের সেই সব মানুষেরা আরাধনা করবে না—যাদের চিত্ত পাষণ্ডদের মত-প্রভাবে বিকারগ্রস্ত।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১২/৩/৪৩)

প্রশ্ন ২০। ভয় আতঙ্ক মানসিক অসুস্থতা যদি কারও মধ্যে জাগ্রত হয় তার প্রতিকার কি?

উত্তর ঃ অতীতকালের কোন নিষ্ঠুর ঘটনার স্মৃতি জেগে উঠে মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। বদ্ধ সংসারে মানুষ যখন নিজেকে অসহায় একাকী বোধ করতে থাকে তখন অসুস্থ ভাব আসে। নানা রকমের গ্রহ দশাও জীবনের উপর প্রভাব ফেলে। এ সবের প্রতিকার করতে হলে ভগবান শ্রীহরির শ্রীচরণামৃত পান করতে হয় ও মাথায়

ধারণ করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেবাভক্তি প্রার্থনা করতে হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। সহজ পাচ্য খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে হয়। বদ্ধ সংসারে একঘেয়েমিতার মধ্যে না থেকে ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের ধাম পরিক্রমা বা মন্দির দর্শন করলে, ভগবানের কথা শ্রবণ করলে হৃদয় শুদ্ধ হয়। বহু জীবনের দুঃখভরা স্মৃতি কালের স্রোতে তখন অনায়াসে ভেসে যায়। যদি মানুষ বুঝতে পারে যে, সে শ্রীকৃষ্ণের সেবক আর কেউ নয়, জগতের বহু লোক কেউ আঘাত দিবে কেউ আদর করবে, কিন্তু কারও প্রতি অপেক্ষমান না হয়ে কৃষ্ণভাবনাময় জীবনে থাকতে হয়। চুপচাপ বসে না থেকে কিছু না কিছু ভক্তিমূলক কাজকর্মে নিযুক্ত থাকতে হয়। প্রবাদ আছে—অলস মন শয়তানের কারখানা।

বৈদিক প্রথায় আগে মানুষ ঘরে ঘরে শ্রীতুলসী সেবাযত্ন করত। সকালে ও বিশেষত সন্ধ্যায় হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন করত। শ্রীহরির মন্দিরে প্রদীপ দান করত। প্রার্থনা গীতি গাইত। তাতে মন পবিত্র হত, শুদ্ধ হত। ছোট বেলা থেকে নিয়ম নিষ্ঠা শিষ্টাচার শেখানো হত। যার ফলে অপশক্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অবশ্য মানসিক ও শারীরিক চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন, রোজ তুলসীতে জল দান করলে সর্ব ভয় দূর হয় বলে শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের অভয়চরণারবিন্দ বাদ দিয়ে এই অনিত্য জগতের কোন কিছুর প্রতি মন অভিনিবিষ্ট হওয়ার ফলে ভয় উৎপন্ন হয়। *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ* (ভাঃ ১১/২/৩৭)

ভাবছি—আমাকে কেউ মেরে ফেলবে। কিন্তু আত্মা মরে না—চিরন্তন। দেহ তো অবশ্যই মরবে। এই জাগতিক সমস্ত সম্বন্ধও নষ্ট হবেই। কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধ নিত্য। সেই সম্বন্ধ স্মরণ করতে হবে। কৃষ্ণপদে মতি হলে ভয় হওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। তখন বাঁচলেও কৃষ্ণসেবা, মরলেও কৃষ্ণসেবাময় জীবনে উন্নীত হতে পারা যাবে। কিন্তু কৃষ্ণ-অভিনিবিষ্ট না হয়ে মায়াভিনিবিষ্ট হলে সব ভয়াদি রোগমুক্তিও সুদূরপরাহত।

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন
অভয়চরণারবিন্দ রে ॥

প্রশ্ন ২১। মায়াবদ্ধ জীবদের চেতনার প্রকার ভেদ কিরকম?

উত্তর ঃ চেতনার দিক থেকে ব্রহ্মাণ্ডের জীব পাঁচ রকমের অবস্থায় রয়েছে। ক্রমানুসারে সেগুলি হল—

(১) আচ্ছাদিত চেতন ঃ যাদের চেতনা লুপ্ত প্রায়। যেমন গাছপালা, ঘাস ইত্যাদি।
(২) সংকুচিত চেতন ঃ পশু, পাখী, সরীসৃপ, মাছ, কীটপতঙ্গ।
(৩) মুকুলিত চেতন ঃ নীতিশূন্য মানুষ, নাস্তিক মানুষ।
(৪) বিকশিত চেতন ঃ নীতিজ্ঞান-যুক্ত মানুষ, আস্তিক মানুষ, ভক্তিসাধনা-যুক্ত মানুষ।
(৫) পূর্ণ বিকশিত চেতন ঃ ভাবভক্তি-যুক্ত মানুষ।

প্রশ্ন ২২। রাত্রে আমার ঘুম হয় না। সারা রাত হরিনাম জপ করলেও ঘুম আসে না। কি করলে ঘুম হবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি না ঘুমিয়ে হরিনাম জপ করেই কাটিয়ে দিতে পারে, সে তো অত্যন্ত সুন্দর কথা। কিন্তু দিনের বেলায় ঘুমের কথা লেখেননি। দিবানিদ্রা উচিত নয়। আপনার যদি দিনরাত অনিদ্রায় কাটে কিংবা খুব কম ঘুম হয় তবে সেটি অসুস্থতা বলে বুঝতে হবে। মানসিক উত্তেজনা, মস্তিষ্কে রক্তের চাপ, উত্তেজক জিনিষ খাওয়া, অতিভোজন কিংবা উপবাসী থাকা—ইত্যাদি কারণে অনিদ্রা হয়। অনিদ্রা নিরাময়ের জন্য ভেষজ চিকিৎসকেরা বলেন মাংস ডিম পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি খাওয়া নিষিদ্ধ। অবশ্য বৈষ্ণব মানুষ এ সমস্ত খান না। ঠাণ্ডা জাতীয় জিনিস খাওয়া উচিত।

গ্রামাঞ্চলে মাঠে ঘাটে বিলে শুষনী শাক পাওয়া যায়। চার পাপড়িওয়ালা সবুজ শাক। সেই শাক রান্না করে ভাতের সঙ্গে খেতেও সুস্বাদু। এই শাক খেলে ভাল ঘুম আসে। তাই অনেকে শুষনী শাককে 'ঘুমশাক' বলেন। কিংবা পনেরো দিন মতো রোজ ভোরে খালি পেটে শুষনী শাকের রস দুচামচ করে খেলে অনিদ্রা ঘুচে যাবে।

অসংখ্য অগণিত ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণুর গাত্র থেকে প্রকাশিত হচ্ছে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম আকারে। আর সেই মহাবিষ্ণু কারণ সমুদ্রে যোগনিদ্রায় সমাসীন। কিংবা গোচারণে গিয়ে শ্রীবলরাম ঘোরাঘুরি করে কোনও এক বৃক্ষছায়ায় সবুজ ঘাসের উপরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর সখাগণ তাঁর সুখনিদ্রার উদ্দেশ্যে কেউ পদ্মপাতায় মৃদুমন্দ বাতাস করছে, কেউ তার কোলে বলরামের মাথা ধরে রয়েছে, কেউ তাঁর শ্রীপাদপদ্ম টিপে দিচ্ছে, কেউ মৃদুমন্দ গুনগুন করে ভগবৎ সম্বন্ধীয় গান করছে, প্রভু বলরাম গভীর সুখনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন। এইভাবে শয়নকালে ভগবানের চিন্তা করলে ভাল ঘুম হয়।

প্রশ্ন ২৩। সকলে বলে ভগবান আছেন। ভগবান থাকলে দেশে এত দুঃখ কষ্ট কেন?

উত্তর ঃ সকলেই যদি বলে তবে আপনার সন্দেহ থাকবে কেন? দেশে রাজা-প্রজা আছে বলেই দেশে আইন আছে। দেশে আইন আছে বলেই আইন ভঙ্গকারীর দণ্ডবিধান আছে। দণ্ডবিধানের জন্য জেলখানাও আছে। তখন কি আপনি মনে করেন যে, জেলখানায় আইন ভঙ্গকারীকে কষ্ট ভোগ করতে হয়, অতএব দেশে রাজা মনে হয় নেই? সেইরকম, শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

কৃষ্ণভক্তি বহির্মুখ হয়ে আমরা জীব কোনও একসময় এই দুঃখময় জগতে মহামায়ার তত্ত্বাবধানে পতিত হয়েছি। এখানে তো দুঃখকষ্ট ভোগের জন্যই মায়াবদ্ধ হয়েছি। অর্থাৎ, কৃষ্ণভক্তি শূন্যতাই আমাদের দুঃখকষ্টের কারণ। সুতরাং, 'দুঃখকষ্ট পাচ্ছি মানেই কৃষ্ণ নেই, ভগবান নেই' এইরকম কথা ঠিক নয়।

তারপর বলা হয়েছে যে, আমরা তো কষ্ট পেতেই থাকলাম বহুকাল। নিস্তার পাব কি করে? তখন বলা হয়েছে—

সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণ-উন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

সাধু-শাস্ত্র সিদ্ধান্তে কৃষ্ণভক্তিময় জীবনযাপনের ফলে দুঃখময় সংসারবদ্ধ জীব নিস্তার পেতে পারে, মায়ামুক্তির পরপারে আনন্দময় জগতে উন্নীত হতে পারে।

প্রশ্ন ২৪। যিনি নিজেকে জেনে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি করেন তিনিই জগৎপিতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারেন—এ কথা কি সত্য?

উত্তর ঃ নিজেকে জানা বলতে বোঝায় আমরা আত্মা—আত্মার সঙ্গে পরমাত্মা ভগবানের সম্বন্ধ চিরন্তন। আমরা আত্মা কর্মবিপাকে লক্ষ লক্ষ জন্ম গ্রহণ করেছি। প্রতি জন্মেই পিতামাতা লাভ করেছি। কত জন্মের পিতামাতা গ্রহণ ও ত্যাগ করেছি। তারপর মানব দেহ পেয়েছি। এই জন্মেও পিতামাতা লাভ করেছি।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

সেই সে পরমবন্ধু সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে তাঁরাই হচ্ছেন পিতা-মাতা যাঁরা সন্তানকে কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে জন্মমৃত্যুর সংসার চক্র থেকে উদ্ধার করেন। পরম পিতামাতা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলে জাগতিক সকল জন্মের অসংখ্য পিতা মাতার সেবা করা হয়ে যায়। কৃষ্ণভক্তি বাদ দিয়ে আর সমস্ত তথাকথিত অর্থাৎ জাগতিক ধর্ম-কর্ম-কর্তব্য—কোনটাই আমাদের আবহমান কালের দুঃখময় জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির প্রবাহ বন্ধ করে শাশ্বত পরমগতি দান করতে পারে না। তাই কৃষ্ণভক্তি বিনা সমস্ত ধর্মও একটা বিড়ম্বনা মাত্র। এ সব কথা কৃষ্ণভক্তির সংস্পর্শ থেকে দূরে অবস্থিত মানুষের উপলব্ধির বিষয় হয় না।

প্রশ্ন ২৫। ভগবান যদি আমাদের সুখে শান্তিতে রাখেন তা হলে তো আমরা তাঁর ভজন সাধন ঠিকমতো করতে পারবো?

উত্তর ঃ জড়জগতে সাধারণত উৎকণ্ঠাগ্রস্ত ব্যক্তিরাই ভগবানের শরণাগত হয়। সুখে শান্তিতে যারা থাকে তারা সাধারণত ভগবানকে ভুলেই থাকে। সুখের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে মানুষ ভজন সাধনের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকে। তাছাড়া ভক্তের কাছে সুখ-দুঃখ দুটোই সমান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, 'সুখে থাকো, দুঃখে থাকো, সদা হরি বলে ডাকো।'

প্রশ্ন ২৬। নৃশংস কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি হিংস্র বা নিষ্ঠুর তাকেই নৃশংস বলে। সাত ধরনের নৃশংস ব্যক্তির কথা মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ৪২ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। যেমন (১) যে ব্যক্তি স্ত্রীসম্ভোগই জীবনের পুরুষার্থ জ্ঞান করে সেভাবে ব্যবহার করে। (২) যে ব্যক্তি অত্যন্ত অহংকারী। (৩) যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দান করে অনুতাপ করে। (৪) যে ব্যক্তি তার জীবনান্তে ধন ব্যয় করতে চায় না। (৫) যে ব্যক্তি পূর্বতন রাজাদের চেয়ে

প্রজাদের কাছে অধিক কর গ্রহণ করে। (৬) যে ব্যক্তি অপরের পরাভব দেখে সুখী হয়। আর (৭) যে ব্যক্তি ভার্যার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। এই সাত ধরনের ব্যক্তি নৃশংসের মধ্যে পরিগণিত।

প্রশ্ন ২৭। কোনও ব্যাপারে ভগবানের নাম নিয়ে শপথ করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ শ্রীবরাহ পুরাণে উল্লেখিত সেবা-অপরাধগুলির মধ্যে অন্যতম অপরাধ হল, ভগবানের নাম নিয়ে শপথ করা।

প্রশ্ন ২৮। জন্মগত গোস্বামী সন্তানরা মঠের ভক্তদের দিয়ে বিগ্রহপূজা করতে রাজী নন। মঠের পত্রপত্রিকাগুলিকে ঘৃণার চোখে দেখেন। কেন?

উত্তর ঃ অনেক জাত-ব্রাহ্মণ বা জাতগোঁসাইর বংশধর আছেন যাঁরা মঠের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং পত্রপত্রিকার প্রশংসাও করে থাকেন। তাঁরা অনেকেই মঠে কিংবা তাঁদের আবাসে বাস করেন, তাঁরা হরেকৃষ্ণ নাম ও ভাগবত সেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁরা নিরামিষাশী। কিন্তু যাঁরা আমিষাশী যাঁরা বহুদিন ধরে আমিষ ও নেশাদ্রব্যে সেবিত হয়ে আসছেন তাঁরা যখনই ভক্তদের কাছে শুনে থাকেন যে, মাছ-মাংস-ডিম ও চা-বিড়ি-দোক্তা শাস্ত্রনিষিদ্ধ অমনি তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। তবে ভক্তিমার্গে আসীন হতে ইচ্ছুক মানুষ তাঁর জীবনের ভুলভ্রান্তিগুলি সংশোধন করতেই পারেন।

প্রশ্ন ২৯। কোন্ ধরনের মানুষেরা হরিনাম স্মরণ, হরিনাম কীর্তন করতে পারে না?

উত্তর ঃ স্কন্দপুরাণে শ্রীপরাশরমুনি উল্লেখ করেছেন—

ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে স্মরণং কীর্তনং তথা॥

যারা দুষ্কৃতিশালী, যাদের হৃদয় অত্যন্ত কুটিল, যারা নিতান্তই মূঢ়, সেই সব মানুষদের শ্রীগোবিন্দচরণে ভক্তির উদ্রেক হয় না। তাদের শ্রীহরির নাম স্মরণ বা কীর্তনের অধিকার ঘটে না।

প্রশ্ন ৩০। আমরা তো বিষয়ী মায়াগ্রস্ত জীব। আমরা হরিনাম কীর্তন কি করতে পারব?

উত্তর ঃ মায়াগ্রস্ত জীব যদি মায়ামুক্ত হতে চায় তবে হরিনাম কীর্তন তারপক্ষে একান্তই কর্তব্য। অন্য কোনও উপায় নেই। 'সাধুসঙ্গে হরিনাম এইমাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোনও বস্তু নাই॥' বৃহন্নারদীয় পুরাণে নির্দেশ করা হয়েছে—

নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাং।
একমেব হরের্নাম সর্বপাপবিনাশং॥

"যারা বিষয়ান্ধ ও মায়াকুলিতচিত্ত, সেই সব ব্যক্তিদের পক্ষে হরিনাম কীর্তনই সমস্ত পাপ বিনাশক হয়ে থাকে।" হরিবিমুখ জন চিরকালের জন্য মায়াচ্ছন্ন থাকে।

প্রশ্ন ৩১। জড়া প্রকৃতির তিনগুণের দ্বারা জগতে জীব আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সেই গুণগুলি কি কি?

উত্তর ঃ জীবাত্মার স্বরূপ হচ্ছে নির্মল জ্ঞানময়, চেতনময় ও আনন্দময়। কিন্তু জড়া প্রকৃতি বা মায়ার তিনগুণের দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার ফলে সে জড় সংসারবদ্ধ রূপে পরিচিত হয়েছে। জড়া প্রকৃতির সেই তিনটি গুণ হল—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

সত্ত্বগুণ প্রকাশ-স্বভাব ও শান্ত। কিন্তু জীবকে সুখ ও জ্ঞানে আসক্তি দিয়ে আবদ্ধ করে। রজোগুণ বিষয়তৃষ্ণা ও আসক্তি থেকে জাত। এই গুণ জীবকে কর্মাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে। তমোগুণ অজ্ঞানজাত। জীবকে মোহিত করে। এই গুণ প্রমাদ, অলসতা, অবসন্নতা মাধ্যমে জীবকে আবদ্ধ করে। এভাবে গুণগুলি জীবাত্মাকে এ জগতে জড় সম্বন্ধে আবদ্ধ করে রাখে। এই বদ্ধ অবস্থা থেকে যথার্থ মুক্তি লাভ করে সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে উন্নীত হতে হলে অবশ্যই কৃষ্ণভজন অনুশীলন করতে হবে।

প্রশ্ন ৩২। মাৎসর্য পরায়ণ ব্যক্তির আচরণ কি রকম?

উত্তর ঃ মাৎসর্য পরায়ণ বলতে সেই সব ব্যক্তিদের বোঝায়—যাদের জাতির গর্ব, ধনের গর্ব, বিদ্যার গর্ব, রূপের গর্ব রয়েছে, কিন্তু অন্য কারও প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। অন্যের দুঃখে মাৎসর্য পরায়ণ ব্যক্তি সুখ অনুভব করে। অন্যের সুখ, যশ, সম্মান দেখলে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়। জীবে দয়া নেই, হরিনামে তার রুচি নেই, বৈষ্ণব সেবা সে পছন্দ করে না। ভক্তদের প্রতি সে বিদ্বেষভাবাপন্ন থাকে। সাধুনিন্দা করা তার স্বভাব। মাৎসর্যশূন্য না হলে সাধনভজনে অগ্রসর হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। মাৎসর্যশূন্য ব্যক্তি নিজেকে তৃণ অপেক্ষা হীন বলে মনে করেন, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণু হন, দয়ালু হন। তিনি সম্মান নিতে চান না, অন্যকে সম্মান দান করেন। তিনি সব সময় কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন।

প্রশ্ন ৩৩। মানুষ কখন কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসে?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।

ভক্তসঙ্গ বা সাধুসঙ্গক্রমেই কারও হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি জন্মায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহারাজ মুচুকুন্দের উক্তিটি লক্ষনীয়—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

"জীব নানা যোনি ভ্রমণ করতে করতে বহু জন্মের পর কোনও সৌভাগ্যক্রমে যে-জন্মে তার ভব বন্ধন দশার ক্ষয় হয়, সেই কালে হে অচ্যুত! তার ভাগ্যে ভক্তজনের সঙ্গ ঘটে। আর সেই ভক্তসঙ্গের ফলে পরমগতি স্বরূপ নিখিল-কার্যকারণ-নিয়ন্তা কৃষ্ণ তোমার প্রতি তার ভক্তি উদয় হয়।" (ভাগবত ১০/৫১/৫২)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল বল্লভাচার্য উল্লেখ করেছেন—মহৎব্যক্তির কৃপার মাধ্যমে ভগবান যখন কাউকে ভক্তিদান করেন, তখন সে ভগবানের নাম কীর্তন করে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন ৩৪। মধুসূদন কথাটির অর্থ কি?

উত্তর ঃ মধু নামক দৈত্যকে সূদন বা বধ করেছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম হচ্ছে মধুসূদন।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে—

পরিণামাশুভং কর্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু ।
করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ ॥

অর্থাৎ, "ভ্রান্ত জনের সমস্ত কর্ম আপাতভাবে মনে হয় মধুর কিন্তু যার পরিণাম অশুভ। সেই কর্মচক্রকে বলা হয় মধু। আর যিনি সেই কর্মচক্র সূদন বা বিনাশ করেন, তিনিই মধুসূদন।"

আমাদের দুঃখময় সংসার চক্র থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি বিনা অন্য কোনও পন্থা নেই। সেইজন্যে বলা হয়, *অগত্যা মধুসূদনঃ।*

প্রশ্ন ৩৫। ত্রিতাপ দুঃখ কি এবং কেন? এ থেকে মুক্তির উপায় কি?

উত্তর ঃ জড় জগতে জীব তিন রকমের দুঃখের অধীন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ ॥

পূর্বে, কোনকালে আমরা কৃষ্ণসেবা বর্জন করে সুখভোগের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলাম তার ফলে মায়া-সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে দুঃখময় জগতে পতিত হতে হয়েছে। আধ্যাত্মিক দুঃখ হচ্ছে—দেহ ও মন জাত দুঃখ। যে জড় দেহটি ধারণ করে আমরা রয়েছি সেই দেহটি নানা ব্যাধি ব্যাথা বেদনার আকর। যার ফলে আমরা দুঃখ পাই। তারপর মনজাত দুঃখ—যেমন দৈহিক সম্বন্ধে সম্বন্ধিত আত্মীয় স্বজনের বিচ্ছেদ, মৃত্যুর কারণে দুঃখ। প্রিয় বস্তু হারানোর দুঃখ, অপ্রিয় বস্তুর সংযোগও দুঃখ। আধিভৌতিক দুঃখ হচ্ছে—অন্য জীবের দ্বারা প্রাপ্ত দুঃখ। যেমন বিষাক্ত পোকামাকড় জীব জন্তুর দংশন, চোর ডাকাতের উৎপাত, প্রতারকের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি আমাদের দুঃখ প্রদান করে। আধিদৈবিক দুঃখ হচ্ছে—দেবতাদের দ্বারা সংঘটিত যে দুঃখ। ভূকম্প, ঝড়, প্রবল বৃষ্টি, বন্যা, প্রচণ্ড গরম, কনকনে ঠাণ্ডা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদিজনিত দুঃখ। প্রত্যেকেই কমবেশী এ সমস্ত দুঃখে মর্মাহত হয়। এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে হলে কৃষ্ণসেবা উন্মুখ মানসিকতা গ্রহণ করতে হবে।

সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণ-উন্মুখ হয় ।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

দুঃখময় সংসারের পরপারে যাওয়ার জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ রয়েছে—

সাধুসঙ্গে হরিনাম এইমাত্র চাই ।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥

প্রশ্ন ৩৬। 'পূর্বজন্ম মনে থাকে না, তা-ই মঙ্গল।' এই বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ পূর্বজন্মের কথা মনে থাকলে মানুষ মঙ্গল-অনুসন্ধানী হয়ে ভগবদ্ভক্তিময় জীবন যাপনে যত্ন নিত। পূর্বজন্ম ভুলে গেছে বলেই তো মঙ্গল-অমঙ্গল কিছুই বুঝতেই চাইছে না। যদি কেউ জানত যে, সে পূর্বজন্মে একটি মাছ ছিল, কিংবা একটি গরু বা ছাগল কিংবা কুকুর ছিল, তা হলে বর্তমান মানব-জন্মে সে কখনও মাছ মাংস খাওয়া, গো-হত্যা, ছাগল কাটা ইত্যাদি নারকীয় কর্ম করতে ইচ্ছাই করত না। যদি কেউ স্মরণ করতে পারত যে, পূর্বজন্মের বহু অসৎকর্ম করার ফলে বর্তমান জন্মে তাকে বহু দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে, তা হলে সে নাস্তিক, পাষণ্ডী, বিদ্বেষী, বদমাশ না হয়ে বিনয়-নম্রতা নিয়ে ভক্তিময় জীবন যাপন করত, যাতে পরজীবনে আর কখনও এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্রে না আসতে হয়। যারা পূর্বজন্মের কথা বলতে পারেন, তাঁদের জাতিস্মর বলা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে জড়ভরতের কথা জানা যায়। তিনি জাতিস্মর ছিলেন। পূর্বজীবনে ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত থাকলেও একটি মাতৃহারা হরিণ-শিশুকে তিনি পালন করেছিলেন। সারাদিনের মধ্যে তিনি হরিণের কথাও চিন্তা করতেন। হরিণটার কথা চিন্তা করতে করতে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। ফলে পরজন্মে হরিণদেহ লাভ করে পশুকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে সেই হরিণ দেহত্যাগ করে মানুষ-জন্ম লাভ করে। পূর্বজীবনের সেই স্মৃতিগুলি জড়ভরতের হৃদয়ে জেগে উঠল। ফলে তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে কেবলমাত্র পরমেশ্বর শ্রীহরির কথা ছাড়া অন্য সমস্ত কথাবার্তা বর্জন করেছিলেন। ভগবদ্-ভাবনা ছাড়া অন্য কোন ভাবনা থেকে নিজেকে এড়িয়ে রাখতেন। জড়-জাগতিক ভাবাপন্ন মানুষের কাছে তিনি একজন বোবা, বধির, পাগল, চেতনাহীন বা জড়ধী বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। তাই সাধারণের কাছে তিনি জড়ভরত নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্-চিন্ময় মগ্ন থাকার ফলে নিত্যধামে প্রত্যাবর্তনের সুদুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিলেন।

আমরা পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারি না, কারণ আমরা আমাদের নিত্য সনাতন প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবা ভুলে অনিত্য বিষয় ভোগ বাসনা নিয়েই জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভবচক্রে ঘুরপাক খেয়েছি। সেই কথা শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে—

কৃষ্ণ ভুলি সে-ই জীব অনাদি-বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১১৭)

শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে ভোগাকাঙ্ক্ষী জীব কেবল এই মায়িক সংসারে এসে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় দুঃখ তথা ত্রিতাপ ক্লেশ ভোগ করছে। অতএব ভুলে যাওয়াটা মোটেই মঙ্গলজনক নয়, তা বিপজ্জনক।

তবে পূর্বজন্ম শুধু নয়, এই জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথাও মানুষ ভুলে যায়। দেখা যায়, ধূমপানে আসক্ত ব্যক্তির টি.বি. ক্যানসার হল। ডাক্তার টি.বি. রোগীকে ধূমপান করতে নিষেধ করল। তারপর কোনও ক্রমে তাকে ওষুধ-পথ্যাদি দিয়ে সুস্থ করে তুলল। কিছুদিন পরে সেই ব্যক্তিটি ডাক্তারের কথা ভুলে গেল। সে বিড়ি বা সিগারেট কাউকে খেতে দেখলেই সেই দিকে যায় আর 'একটু দাও না' বলতে থাকে। পুনরায় সে ধূমপানে আসক্ত হয়। কারণ সেই রোগের যন্ত্রণাটি সে ভুলেই গেছে।

তবে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিস্মৃতির প্রয়োজন আছে। যেমন, কোনও অত্যন্ত ভয়ানক ঘটনার স্মৃতি মানসপটে এসে ভিড় করলে মানসিক ভারসাম্যতা মানুষ হারিয়ে ফেলে। সে শয়নে স্বপনে আঁৎকে উঠে চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে, কখনও অনিদ্রা রোগে কষ্ট ভুগতে থাকে, কখনও বা কেউ উন্মাদ হয়ে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। তাই আমাদের মঙ্গলকর পন্থা হচ্ছে *'নিত্যং ভাগবত সেবয়া'*। প্রতিদিন নিয়মিত ভগবৎ সেবা, গীতা-ভাগবত পাঠ কীর্তন শ্রবণ, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ, আরতি দর্শন, ভক্ত সেবা ইত্যাদি পরম মঙ্গলময় কার্য অনুষ্ঠান করতে হবে।

প্রশ্ন ৩৭। কিভাবে এই সংসারে অবস্থান কালে মায়ার প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি?

উত্তর ঃ ভগবান বলছেন *"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"* (গীতা ৭/১৪) "যারা আমার শরণাগত হয়, তারাই আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে।" বলা হয়েছে—"কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।" অর্থাৎ, আমিষ-আহার, নেশা-ভাং, তাসপাশা, অবৈধ যৌনতা ইত্যাদি সম্পূর্ণ বর্জন করে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করে সংসারটিকে শ্রীকৃষ্ণের সংসার করে গড়ে তুলতে হয়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে কৃষ্ণভক্তরূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন ৩৮। লোকে বলে মায়া ত্যাগ করতে না পারলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। কিন্তু মানুষের যদি মায়াই চলে গেল তা হলে তো সে ভূত-পিশাচ-অসুরের মতো হয়ে যাবে। তা ছাড়া কৃষ্ণই তো মায়াময়, ভক্তের সুখে সুখী ভক্তের দুঃখে দুঃখী। তবে মায়া পরিত্যাগ করতে হবে কেন?

উত্তর ঃ দয়ামায়াহীন মানুষ ভূত-পিশাচ-অসুর প্রকৃতির। তাহলে যারা জীবহত্যা করছে, মাছ-মাংস খাচ্ছে তারাও অসুর প্রকৃতির। *আসুরীং বৃত্তিমাশ্রিতা* (ভাঃ ৪/১৮/২১) তারা ভূতপ্রেত পিশাচ শ্রেণীর। *ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ।* (ভাঃ ৪/১৮/২১) কারণ শাস্ত্রে অন্য প্রাণীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গরু শূকর ছাগল কুকুর ব্যাঙ মাছ হাঁস কাক মোরগ কেটে যারা খাচ্ছে তারাই পিশাচ প্রকৃতির। আর যারা অবশ্যম্ভাবী বারে বারে জন্ম ও মৃত্যুর চক্র—*পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*—থেকে উদ্ধারের জন্য পিতামাতা ভাইবোন সন্তানসন্ততি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা দিচ্ছেন না, কিংবা নিজেরা কৃষ্ণভক্তি

অনুশীলনের প্রয়োজন বোধ করছেন না, তারা অবশ্যই অসুর প্রকৃতির। *আসুরং ভাবমাশ্রিতা* (গীতা ৭/১৫)

মায়াপহৃতজ্ঞান যারা, মায়া যাদের কৃষ্ণচেতনা অপহরণ করেছে, তারা বিষয়ভোগ লালসা চরিতার্থ করবার জন্য দিনরাত প্রয়াসী হয়। মায়া মোহাচ্ছন্ন জীব মনে করে এই জড়জাগতিক সুখই জীবনের একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু। তখন সে কৃষ্ণভক্তির কথা বিলকুল ভুলে যায়। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই প্রার্থনা গাইছেন—

বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি ।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী ॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায় ।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায় ॥

মায়া ত্যাগ করার অর্থ হচ্ছে ভোগ-উন্মুখী স্পৃহা বা জড়জাগতিক বিষয় ভোগবাসনা ত্যাগ করতে হবে। আবার ভোগ করতে পারছি না বলে মুক্তি চাই—এরূপ মুক্তি বাসনাও বর্জন করতে হবে। সেই জন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী বলছেন—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে ।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

অর্থাৎ, "ভোগবাসনা ও মুক্তিবাসনা—এই দুই পিশাচী যতদিন পর্যন্ত কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্তমান থাকে, ততদিন পর্যন্ত তার হৃদয়ে ভক্তিসুখের উদয় হবে না।" (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ)

পরমেশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করাই মানবজন্মের কর্তব্য। কিন্তু সে যদি ভগবানকে বাদ দিয়ে নিজের ভোগসুখের চিন্তা করে তখনই সে মহামায়ার জড়জাগতিক গুণের শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে যায়। মায়ার বন্ধন লাভ করে।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস—জীব তাহা ভুলি গেল ।
এই দোষে মায়া তারে গলায় বাঁধিল ॥

মায়া চলে গেলে অর্থাৎ, মানুষের ভোগ-উন্মুখী মনোভাব চলে গেলে সে ভূত-পিশাচ হয়ে যায় না, বরং মায়ার বশেই মানুষ ভূত-পিশাচ-অসুরের মতো হয়ে যায়।

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় ।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সেই ভাব উদয় ॥

(প্রেমবিবর্ত)

মায়াগ্রস্ত জীব কৃষ্ণভক্তি থেকে সরে থাকে। ভূতে পাওয়া ব্যক্তিকে তার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলে সে ভূতের বাসা তালগাছ কিংবা অন্য কোনও জঙ্গলের নাম বলবে। তেমনি মায়াগ্রস্ত জীব হর্তাকর্তাবিধাতা কৃষ্ণের শরণাপন্ন না হয়ে সে অন্য কোনও মায়াবদ্ধ জীবের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। যেমনভাবে কত আনাচে কানাচে গজিয়ে ওঠা ভগবান—কত বাবা, কত যোগী পুরুষকে লোকে ভগবান বলে মনে করেই তাদের শরণাগত হচ্ছে। আসলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাই মায়ার কাজ। কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তির সেটাই দুর্ভাগ্য।

মায়াকে অন্ধকার রূপে এবং ভগবানকে সূর্যরূপে ব্যাখ্যা করা হয়—

কৃষ্ণ-সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার ।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার ॥

অন্ধকারে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। যেমন—দড়িকে সাপ মনে করে, গাছকে ভূত মনে করে, শিশির টুপিকে পয়সা মনে করে। মায়ার বশে মানুষ কৃষ্ণকেও মায়া বলে মনে করে, অনিত্য সংসারকে নিত্য বলে মনে করে, দুঃখপ্রদ বস্তুকেও সুখপ্রদ বলে মনে করে। কিন্তু আলো জ্বালালে বা সূর্যালোকে দড়িকে সাপ নয়, দড়ি রূপেই দর্শন হয়। গাছকে ভূত নয় গাছ রূপেই দর্শন হয়। কৃষ্ণভক্তির আলোকে কৃষ্ণকে মায়া নয়, পরমেশ্বর পরমবন্ধু পরমনিয়ন্তা রূপে দর্শন হয়, জড় সংসার অনিত্যরূপেই দর্শন হয়, চিন্ময় বস্তুর নিত্যতা দর্শন হয়।

সুতরাং, মায়া মোহাচ্ছন্ন হয়ে হ্যবিখাবি চিন্তা ত্যাগ করে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে হবে।

মায়ার ত্রিগুণে অর্থাৎ, সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণে বা জড় শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে আবহমান কাল ধরে জীব এই দুঃখপূর্ণ জন্মমৃত্যুর জগতেই পড়ে আছে। সে যদি নিত্য শাশ্বত আনন্দময় জীবন লাভ করতে চায় তবে সে অবশ্য অবশ্যই পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভয়চরণ কমলে প্রপত্তি স্বীকার করবে অর্থাৎ, শরণাগত ভক্ত হবে। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

অর্থাৎ, "আমার এই ত্রিগুণময়ী মায়াকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না, কিন্তু যদি কেউ আমাতে প্রপত্তি করে তবে সে এই মায়া থেকে উত্তীর্ণ হতে পারবে। (গীতা ৭/১৪)

প্রশ্ন ৩৯। অনেকেই বলে থাকে যে, ঈশ্বর লাভ করলেই সব মুক্তি। প্রশ্ন হচ্ছে, ঈশ্বর লাভ করলে কেমন ধরনের মুক্তি পাওয়া যায়? এবং তার প্রয়োজনীয়তা বা কতখানি?

উত্তর ঃ আমাদের জানতে হবে, যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সেই জগৎটি হচ্ছে দুঃখময়। কারণ এখানে জন্মযন্ত্রণা, মৃত্যুযন্ত্রণা ও ব্যাধির যন্ত্রণা নিয়ে আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে রয়েছি। এরই নাম ভববন্ধন। এই বন্ধন ছেদন করলেই মুক্তি। সেই মুক্তি পাওয়া যায় একমাত্র মুক্তিদাতা শ্রীহরির সাধনভজন করার ফলে।

সাধনভজন করার ফলে মানুষ ভগবদ্ধামে উন্নীত হয়। যে একবার ভগবৎ-ধাম বৈকুণ্ঠ অথবা গোলোক ধামে যেতে পারবে, তাকে আর কখনও এই জড় জগতে দুঃখকষ্ট উদ্বেগ ভোগ করতে বারে বারে জন্মগ্রহণ করতে হবে না, সে নিত্য আনন্দময় ধামে চিন্ময় দিব্য শরীরে নিত্যকালই অবস্থান করতে পারবে। ভববন্ধনে বদ্ধ হয়ে পশুপক্ষী

কীটপতঙ্গ জন্ম নিয়ে বারে বারে দুঃখযাতনা ভোগ করতে যাঁরা ভাল পান, তাঁরা মুক্তির চিন্তা না করলেও চলে, কারণ তাঁরা বন্ধনই ভালবাসেন।

প্রশ্ন ৪০। জীবনে ভয় লাগে কেন? এই ভয় কি কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল? ভয়ের প্রতিকার কি?

উত্তর ঃ মৃত্যু ভয়, অঙ্গহানির ভয়, ধন সম্পদ হারানোর ভয়, প্রহার খাওয়ার ভয়, ভূতের ভয়—কত রকমের ভয় আছে। যখন মানুষ শ্রীকৃষ্ণের অভয়চরণপদ্মে মন-প্রাণ সমর্পণ না করে অন্য কোনও কিছুতে নিবিষ্ট হয় তখন স্বভাবতই এই ধরনের ভয়ের অধীন থাকতে হয়। *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশং।*

শ্রীকৃষ্ণের ভজনসাধন নাই, আর অন্য কিছু বিষয় নিয়ে হটোপুটিতে ব্যস্ত থাকলে যে ভয়ের কারণ হয়, তা অবশ্যই কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল। কিন্তু কৃষ্ণের সন্তোষ বিধান যদি না করা হয়, সাধন ভজন যদি না করা হয় তা হলে অবশ্যই নরকগতি হবে এবং এই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি দুঃখ উদ্বেগপূর্ণ জগতে বদ্ধজীবনে পড়ে থাকতে হবে। উদ্ধারের কোন পন্থা পাব না। এই ভয়ে যদি কৃষ্ণভজন, নাম-কীর্তন, প্রার্থনাদি করা হয়, তবে তা কৃষ্ণভজনের অনুকূল। ভক্তচরণে যেন অপরাধ না হয় সেইজন্য সর্বদা সতর্কভাবে থাকা—অপরাধের প্রতি ভয় বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবিষ্ট হলে সর্ব ভয় দূর হয়।

প্রশ্ন ৪১। শান্তিলাভ করার উপায় কি? যখন কোন ভক্ত শান্তিলাভ করতে পারে না তখন তার কি ভক্তির স্খলন ঘটে?

উত্তর ঃ আমরা মনে করতে পারি যে, এই জগতে আমিও কিছু করতে পারি। আমার এই সংসারে কিছু প্রাপ্য আছে। আমি সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এই ভাবনা কখনই আমাকে শান্তি দেবে না। যদি মনে করি যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কর্তা। সকল জিনিস তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়াই সেই জিনিসের যথার্থ ব্যবহার। তিনিই সকলের বন্ধু। এই ভাব রেখে যখন আমরা জীবন অতিবাহিত করি তখন শান্তি লাভ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"আমাকে সমস্ত আয়োজন ও তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে জেনে, সর্বলোকের মহেশ্বর ও সকলের উপকারী সুহৃদরূপে জেনে, লোকে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করে।" (গীতা ৫/২৯)

যখন কেউ তার নিজের জন্য ভোগ্য বস্তু প্রাপ্য বলে মনে করে, তখন সে পরিণামে শান্তি পেতে পারে না।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত ।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত ॥

সরল জীবন যাপনে যে সন্তুষ্ট, সে-ই শান্তি লাভ করে।

ভগবানের উদ্দেশ্যে কোন কিছু চাওয়াটা ভজন প্রতিকূল নয়। কিন্তু অন্যথায় নিজ-ইন্দ্রিয় তোষণে কোন কিছু কামনা করে বসলে ভজন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ৪২। পূর্ণ বিশ্বাস বা ভক্তি লাভ করার উপায় কি?

উত্তর ঃ সাধুমুখে ভগবানের কথা ভাল করে মন দিয়ে শুনতে হবে। যুক্তিপূর্ণ ভাবে বুঝতে হবে। তা হলেই বিশ্বাস হবে, ভক্তি হবে।

প্রশ্ন ৪৩। মানুষের জীবনে গ্রহ কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করে?

উত্তর ঃ ভাল-মন্দ বিভিন্ন প্রকার গ্রহ রয়েছে। ভাল গ্রহ মানুষকে ভাল বা প্রশংসনীয় পথেই নিয়ে যায়। মন্দ গ্রহ মানুষের শুভবুদ্ধির বিঘ্নস্বরূপ হয়। মন্দ গ্রহ প্রভাবিত ব্যক্তির আচরণ উদ্দেশ্যহীন উন্মত্তের মতো হয়। অস্বাভাবিক মন্দ আচরণের ফলে সমাজের অধিকাংশ লোকের কাছে সেই ব্যক্তি নিন্দনীয় ও ঘৃণার্হ হয়। মহাভারতে হাবভাব-ভেদে তিন ধরনের গ্রহ প্রভাবিত ব্যক্তির মন্দ আচরণের কথা লক্ষ্য করা যায়।

যেমন, সারাদিন যার-তার বাড়ি, বন-বাদাড়, রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়ানো, স্নান বা খাওয়া-দাওয়া কিংবা ঘরের কোন কর্তব্য কর্মে কোনও খেয়াল থাকে না। তাকে কেউ ডাকছে না, চাইছে না, তবুও তাদের বাড়িতে সে যাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কথা বলতে পছন্দ করছে না তার সঙ্গে, তবুও সে কথা বলছে আর দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আর এক প্রকার আচরণ হচ্ছে, খাই খাই ভাব। যেখানেই যাচ্ছে খালি তার খাওয়া। নিজের বাড়ি, বন্ধুর বাড়ি, হোটেল, বাজার যেখানে যা পাওয়া যাচ্ছে খালি ঘন ঘন খেয়েই চলেছে।

আর এক প্রকার বিপজ্জনক আচরণ হচ্ছে যৌন উত্তেজনা। সে কি ছেলে, কি মেয়ে, কে কোন্ সম্পর্ক—বাছ বিচার না করেই অবৈধ যৌনতার শিকার হয়।

গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তিরা ওঝার কাছে প্রচণ্ড প্রহার খেয়ে কিংবা যথাযথ মনোচিকিৎসার মাধ্যমে গ্রহমুক্তি লাভ করতে পারে। এই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া দুর্ভাগ্যজনক। যদি কেউ আগের থেকে সতর্ক থাকতে আগ্রহী হন, তবে সর্ব গ্রহের নিয়ামক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করতে হবে। কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণনাম জপকীর্তন, কৃষ্ণবন্দনা, কৃষ্ণপ্রসাদসেবন, ঊষা ও সন্ধ্যায় আরতিতে যোগদান ইত্যাদি ভক্তিমূলক কর্মে যুক্ত থাকলে কুগ্রহগুলি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সর্বদা শুচিতা পবিত্রতা বজায় রেখে চলা কর্তব্য।

প্রশ্ন ৪৪। শ্মশান বৈরাগ্য কি?

উত্তর ঃ ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলেন, দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন, কোনওকোনও সময়ে আঘাত পেলে দুঃখ-শোক হলে সংসার বৈরাগ্যের কথা আওড়ান। বিষয়ী লোকের এইরূপ মনোভাবকেই শ্মশান বৈরাগ্য বলে।

যখন কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তখন মানুষ স্বভাবতঃই দর্শনতত্ত্বে আগ্রহী হয়। কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর তারা আবার জড় সংসার বিষয়ে মন দিয়ে

থাকে। অত্যন্ত বিষয়ী আসুরিক ব্যক্তিরাও আত্মীয়জনের মৃত্যুতে দার্শনিক বিষয় চিন্তা করতে শুরু করে। শ্মশান চিতায় আত্মীয়ের মৃতদেহ দাহ করতে নিয়ে যাওয়ার সময় কত কান্না, কত শোক, কত দুঃখ অনুভূত হয়। তারপর মনকে সান্ত্বনা দিতে, প্রবোধ দিতে দর্শনতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ জাগে। তখন মুখে আওড়াতে থাকে, 'হায়, এ সংসারের কি মূল্য? কে কার? সবাই কে তো নিজ নিজ কর্মফলে আয়ু শেষে চলে যেতেই হচ্ছে। কেউ কারও নয়। প্রত্যেককেই এইভাবে আজ নয় কাল যেতেই হবে। ভোগসুখের জন্য সংসার পাতানোর কোনও মূল্য নেই', ...ইত্যাদি কথা আওড়াতেই থাকে। কিন্তু এক-দুদিন যেতে না যেতেই জড়বিষয় ভোগের উদ্দেশ্যেই সে সংগ্রাম চালিয়ে যায়, এমনকি তার আত্মীয় সহোদর ভাইদের সঙ্গেও শত্রুতা বাধিয়ে রাখে। এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে বলে শ্মশান বৈরাগী।

প্রশ্ন ৪৫। জগতে সব চেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়টি কি?

উত্তর ঃ শ্রীযমরাজ এক সময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন, "এই সংসারে সব থেকে আশ্চর্যজনক বস্তু কি?"

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন—

অহনি অহনি ভূতানি গচ্ছন্তি ইহ যমালয়ম্ ।
শেষাঃ স্থাবরম্ ইচ্ছন্তি কিম্ আশ্চর্যম্ অতঃ পরম্ ॥

(মহাভারত বনপর্ব ৩১৩/১১৬)

প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খ জীবেরা মনে করছে তারা বেঁচে থাকবে। সেইজন্য অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য তারা প্রস্তুত হয় না। সংসারে এটাই সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়।

অনেকেই বলছেন যে, 'টাকা থাকলে মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। ওষুধ, ডাক্তার, নিরাপত্তা কমিটি, সমাজসেবী, বৈজ্ঞানিক আত্মীয় বন্ধুরা আমাকে বাঁচাবে। আমি টিকে যাব'। এমনকি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আমেরিকার কোটিপতি মিঃ ডিস্নীর মতো বিখ্যাত মানুষও মনে করেছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তুলবে। সেই জন্য তাঁর মৃতদেহকে নষ্ট না করে জ্যান্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে হিমঘরে রাখার জন্য উইল করে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৪৬। সাধুগুরুর মুখে শুনেছি অহঙ্কারী ব্যক্তির কৃষ্ণভজনে মতি থাকে না। কেন না তাদের চিত্তে আঠারো রকমের দোষ আছে। সেই দোষগুলি কি কি?

উত্তর ঃ মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে উল্লেখ রয়েছে—

মদোঽষ্টাদশদোষঃ স্যাৎ পুরা যঃ স প্রকীর্তিতঃ ।
লোকদ্বেষ্যং প্রাতিকূল্যমভ্যসূয়া মৃষাবচঃ ॥
কামক্রোধৌ পারতন্ত্র্যং পরিবাদোঽথ পৈশুনম্ ।
অর্থহানিবিবাদশ্চ মাৎসর্যং প্রাণিপীড়নম্ ॥

ঈর্ষামোহোঽতিবাদশ্চ সংজ্ঞানাশোঽভ্যসূয়িতা ।
তস্মাৎ প্রাজ্ঞো ন খাদ্যেত সদা হ্যেতদ্বিগর্হিতম্ ॥

অহঙ্কারী ব্যক্তির মধ্যে আঠারো রকমের দোষ দেখতে পাওয়া যায়। অহঙ্কার দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি সর্বদা লোকের *বিদ্বেষভাজন* হয়ে থাকে। অনেক সময় সে তার অভিমানে আঘাত পড়েছে এরূপ কল্পনা করে নানাবিষয়ে লোকের *প্রতিকূল আচরণ* করে থাকে। সে গুণীজনের প্রতি *অসূয়াপরবশ* হয়ে তাঁদের দোষারোপ করে থাকে। কেউ যাতে তার সমান আদরণীয় না হয়, সেজন্য কারও নামে নানারকমের *মিথ্যাবাক্য* বলতে সঙ্কুচিত হয় না। যে বিষয়টি নিয়ে তার অহঙ্কার, সেই বিষয়ে তার নিতান্ত কামনা বা *আসক্তি* জন্মে। তার কাম্য বস্তুর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে সে *ক্রোধে* অগ্নিবৎ জ্বলে ওঠে। তার অভিমান-অগ্নিতে যে ব্যক্তি ইন্ধন জোগায় সে তারই *অধীন* হয়ে থাকে। অভিমানী সর্বদাই *অন্যের দোষকীর্তন* করে থাকে। সে নানা রকমের *কপটতা* বা খলতার আধার হয়ে থাকে। অহঙ্কারের বিষয়গুলি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মামলা প্রভৃতিতে অনর্থক প্রচুর *অর্থ ব্যয়* করে। অন্যের সঙ্গে তার সর্বদা *বাদ-বিসম্বাদ* লেগে থাকে। *মাৎসর্য* বা পরশ্রীকাতরতা অহঙ্কারী ব্যক্তির হৃদয় জুড়ে অবস্থান করে। *প্রাণিপীড়ন* বা অন্যকে কষ্ট দেওয়া তার স্পর্ধার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। *ঈর্ষার* অনলে সর্বদা তার অন্তর জ্বলতে থাকে। তার চিত্ত *মোহগ্রস্ত* হয়ে বিভ্রান্ত হয়। অহঙ্কারী ব্যক্তি সর্বদা অন্যের *মর্যাদা অতিক্রম* করে থাকে। অভিমানের বশে *কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়ে* থাকে এবং *পরদ্রোহ* তার মজ্জাগত হয়ে যায়। সে নিজেও মরবে আর অপরকেও মারবে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এভাবে সর্বদোষের আকর এবং সর্ব বিগর্হিত কর্মের হেতু স্বরূপ অহঙ্কারী হন না।

যে ব্যক্তি জানতে পারেন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকণা আত্মা এবং তাঁর স্বরূপটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবায় যুক্ত হওয়া—জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস—তিনি সর্বদা ভক্তিপূর্ণ আচরণে নিযুক্ত থাকেন। তাঁর চিত্ত সর্বদা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে কৃষ্ণভক্তি-বিরুদ্ধ বিষয়ে তিনি বিক্ষোভ প্রকাশ করলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি কারও প্রতি ভক্তি-প্রতিকূল আচরণ করেন না। অহঙ্কারী ব্যক্তি আঠারো দোষে দুষ্ট হওয়ার ফলে তার কৃষ্ণভক্তি চেতনা থাকেই না।

প্রশ্ন ৪৭। এই জগতে কিরকম চেতনা নিয়ে জীব অবস্থান করে?

উত্তর ঃ বদ্ধজীব পাঁচ প্রকার অবস্থায় রয়েছে। কেউ আচ্ছাদিত চেতন, কেউ সংকুচিত চেতন, কেউ মুকুলিত চেতন, কেউ বিকশিত ও পূর্ণ বিকশিত চেতন।

গাছ-পালা, পাথরের গতি প্রাপ্ত জীব আচ্ছাদিত চেতন। তাদের চেতনধর্ম পরিচয় লুপ্তপ্রায়। তারা কৃষ্ণভক্তির কথা ভুলে সম্পূর্ণ জড়গুণে অভিনিবিষ্ট বলা যায়। নন্দ মহারাজের বাড়ির সামনে দুটি অর্জুন বৃক্ষ ছিল। অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার ফলে ধনকুবেরের দুইজন পুত্র বৃক্ষজন্ম নিয়ে বহুদিন সেখানে অবস্থান করছিল।

পশু, পাখী, কীটপতঙ্গ, জলচর প্রাণীরা সংকুচিত চেতন। এদের চেতনা আছে—আহার, নিদ্রা, ভয়, যাওয়া, আসা, বিবাদ করা ইত্যাদি। মানুষের মধ্যে তিনটি অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। মুকুলিত চেতন, বিকশিত চেতন ও পূর্ণ বিকশিত চেতন।

কিছু মানুষ আছে যারা অজ্ঞতাক্রমে কিংবা জ্ঞানবিকার ক্রমে নীতিশূন্য ও নাস্তিক হয়; আবার কিছু মানুষ আছে যারা সামাজিক নীতি মানে কিন্তু ভগবান মানে না—এই দুই শ্রেণীর মানুষ মুকুলিত চেতনের অন্তর্গত। কিছু মানুষ আছে যারা সামাজিক নীতির সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসও করে থাকে; আবার কিছু মানুষ আছে যাদের শাস্ত্র বিধিক্রমে সাধন ভক্তিতে মতি হয়েছে—এই দুই শ্রেণীর মানুষ বিকশিত চেতনের অন্তর্গত।

কিছু মানুষ আছে যারা ভগবান সম্বন্ধে অনুরাগপ্রাপ্ত, এই ধরনের মানুষই পূর্ণ বিকশিত চেতনের অন্তর্গত।

প্রশ্ন ৪৮। আনন্দ লাভ করাই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাই জড় জগতে লোকে যে আনন্দ পায় সে সবের কি একটুও মূল্য নেই?

উত্তর ঃ ভগবানের অচিন্ত্য অসংখ্য শক্তির মধ্যে প্রধান তিনটি শক্তি রয়েছে—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। আমরা জীব হচ্ছি ভগবানের তটস্থা শক্তি। অন্তরঙ্গা শক্তির মধ্যে—তিনটি ভাগ রয়েছে সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনী শক্তি হচ্ছে আনন্দদায়িনী শক্তি। এই আনন্দ আস্বাদন করার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে রয়েছে। তাই আমরা সকলেই আনন্দ লাভের চেষ্টা করে চলেছি। এটি জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

আনন্দ পেতে হলে আনন্দময় স্থানে থাকতে হবে। আনন্দ দায়িনীশক্তির আশ্রয়ে থাকতে হবে। কিন্তু আমরা রয়েছি কোথায়? এই দুঃখময় জড় জগতে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন—এই জড় জগৎটি *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্।* দুঃখময় এবং অনিত্য জগৎ।

এই দুঃখময় জগতে কারা থাকে? শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—কৃষ্ণসেবার প্রতি যারা বিমুখ তারাই দুঃখময় জগতে থাকে।

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি-বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

ভগবানের আনন্দদায়িনী শক্তি সর্বদাই ভগবৎসেবায় যুক্ত। তাই আনন্দময় জীবনে অধিষ্ঠিত হতে হলে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবায় যুক্ত হতে হবে। আর সেটিই জীবের স্বরূপ-অবস্থা।

চিন্ময় জগতের আনন্দামৃতসিন্ধুর প্রতিবিম্ব বা ছায়ার মতো এই জড় জগতের যে বিকৃত আনন্দ—তার আর কতটুকু মূল্য!

৭

ভজনসাধন ও দরিদ্রতা

প্রশ্ন ১। কেবল হরিকথা হরিনাম করলে আমাদের দিন চলবে কি করে?

উত্তর ঃ হরিনাম হরিকথা বিনা মনুষ্য জীবনের একটি দিন যদি অতিবাহিত হয়, তবে মূল্যবান জীবনের সেই দিনটি অনর্থক নষ্ট হয় বলে মহর্ষি ব্যাসদেব নির্দেশ দিচ্ছেন।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্ব-ধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/৮)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলছেন, "হে রাজশ্রেষ্ঠ, আত্মতত্ত্বজ্ঞান আলোচনায় যারা উদাসীন, তারা গৃহমেধী বিষয়াসক্ত ভোগী, তাদের এই সংসারে অসংখ্য বিষয় শুনবার, কীর্তন করবার ও স্মরণ করবার আছে।" (ভাঃ ২/১/২) তাদের রাজনৈতিক চিন্তা করতে হয়, জড় বিজ্ঞানের কথায় তাদের মাথা ঘামাতে হয়, সামাজিক বাদ-বিবাদ শ্রবণ এবং গ্রাম্যকথা কীর্তন করতে হয়, অর্থনৈতিক ব্যাপারটা ভালভাবেই স্মরণ করতে হয়। তারা সব কিছুতেই আগ্রহশীল, কেবল মাত্র হরিকথায় হরিনাম কীর্তনে ভদ্রতার খাতিরে নাক গলাতে রাজী নয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/১/৩) বলা হয়েছে—"মানব সমাজ প্রধানত রাত্রে নিদ্রায় অথবা মৈথুন কর্মে ব্যস্ত থাকে এবং দিনের বেলায় পরিবার-পরিজনদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে।" ইন্দ্রিয় তর্পণ ও অর্থ উপার্জন ছাড়া জীবনের উদ্দেশ্য বলে অন্য কিছুই আছে কিনা সেই সম্বন্ধে তারা জানতেও আগ্রহী নয়। কেবল গর্দভের মতো খাটুনি ও ইন্দ্রিয় তর্পণের ব্যস্ততার দরুন কলিযুগের মতিচ্ছন্ন মানব সমাজে হরিকথায় হরিনামে কারও তেমন রুচি হয় না। নেশা ভাং, প্রজল্প, গালগল্প, সিনেমা, তাস, পাটিবাজী, বিবাদ, কূটবুদ্ধি, জ্ঞাতিভাই ও প্রতিবেশীকে প্রতারণা, অবৈধ সঙ্গ ইত্যাদি অনর্থ বিষয়ে দিন অতিবাহিত হলেই তারা তাদের মনুষ্য-জন্ম সার্থক হল বলে মনে করে, কিন্তু হরিনাম ও হরিকথায় দিন অতিবাহিত হলে তারা মনে করে যে, তাদের জীবনটা মাটি হয়ে গেল, কেননা কুকর্ম করার সুযোগ হারিয়ে গেল।

অবশ্য জন্মান্তর সূত্রে কৃপাময় ভগবান শ্রীহরি একটি নতুন জীবন—কুকুর, শূকর কিংবা গর্দভের শরীর দান করবেন যাতে হরিনাম বা হরিকথা বাদ দিয়ে যথেচ্ছ আহার-নিদ্রা-মৈথুনাদি যাবতীয় সুখসুবিধা পাওয়া যাবে। এইভাবে জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই দুঃখ ও উদ্বেগপূর্ণ জড় জগতে পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু মনুষ্য জন্মই একমাত্র সুযোগ হরিনাম কীর্তন করে পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দময় পরমধামে উন্নীত হয়ে নিত্য জীবনে ফিরে যাওয়ার।

প্রশ্ন ২। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও শিক্ষা হীন জীবনে ভগবদ্‌প্রীতি কিভাবে বাস্তব রূপ লাভ করবে?

উত্তর ঃ অনেকে মনে করে যে, খাওয়া পরা থাকার সুবিধা থাকলে ভগবদ্ভক্তি থাকা সম্ভব, নতুবা দারিদ্রপীড়িত জাগতিক শিক্ষাহীন জীবনে ভগবদ্ ভজনা শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার নয়। জড় জগতে কামতৃপ্তিপরায়ণ ব্যক্তিরা শর্তসাপেক্ষভাবে অন্য মানুষের সঙ্গে স্বার্থের প্রীতি করে বসে। কিন্তু ভগবদ্ প্রীতি সম্পূর্ণ বিপরীত।

তা ছাড়া জগতে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের অভাব নেই। পিঁপড়ে থেকে হাতি পর্যন্ত সমস্ত জীবের খোরাকের বন্দোবস্ত প্রকৃতি করে রেখেছে। কেবল কৃষ্ণভক্তির অভাবে মানুষ এই জড়া প্রকৃতির উপর জোরপূর্বক আধিপত্য বিস্তার করার জন্য সমাজে নানা জিনিসের অভাব দেখা যায়। কৃষ্ণভক্তি-বহির্মুখ মানুষ তার লোভ এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় মশগুল থাকার জন্য সে তার প্রয়োজনের অধিক দ্রব্য মজুত রাখার চেষ্টা করে এবং অপরকে বঞ্চনা করে। শ্রীল প্রভুপাদ একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—রাস্তায় এক বস্তা চাল পড়ে থাকলে কোন পাখী, গরু, ভেড়া এসে সেই চাল খেতে থাকে এবং পেট পুরলে তারা চলে যাবে। কিন্তু একটি মানুষ এসে চালের সেই গোটা বস্তাটাই নিয়ে পালাবে। এইভাবে একজন মানুষ অন্যান্য বহু মানুষকে বঞ্চিত করে আপন স্বার্থ ও ভোগদখল দাবি করতে থাকে। ফলে সমাজে বৈষম্য ও খাদ্যবস্তু ইত্যাদির অভাব দেখা দেয়।

আবার, জাগতিক দিক থেকে অসহায় মানুষই ভক্তিপথের দিকে উন্মুখ হয়। বরং অভাব না থাকলে ভক্তি নষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনাই বেশি। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন—

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ (গীঃ ২/৪৪)

"যারা ভোগ-ঐশ্বর্যপরায়ণ, বহু শাখাময়ী বুদ্ধি দ্বারা তাঁদের চিত্ত অপহৃত হয়।' শ্রীমদ্ভাগবতেও পরিষ্কার উল্লেখ আছে—

জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্ ।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥

কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করে বলছেন, "হে ভগবান, নিষ্কিঞ্চনদের কাছে তুমি সুলভ, যারা বিষয়মার্গে অগ্রগামী, উচ্চকুলে জাত, অতুল ঐশ্বর্য, উচ্চ শিক্ষা ও দেহ-সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে প্রয়াসী, তারা সরল ও নিষ্কপটভাবে তোমার শ্রীচরণে শরণাগত হতে পারে না।" (ভাঃ ১/৮/২৬)

বেদবিরুদ্ধ তথাকথিত উচ্চশিক্ষার প্রভাবে মানুষ পরম নিয়ন্তার অস্তিত্বকেও পর্যন্ত অস্বীকার করতে শিখেছে। তারা ধনবল, জনবল ও বুদ্ধিবল দ্বারা নিজেদেরই সর্বনিয়ন্তা ও হিক্‌মৎওয়ালা মনে করতে পারে। এমন কি পৃথিবীতে যা কিছুই সুখ বলে সাধারণ জনমানসে নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই সমস্ত জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করেও মানুষ শান্তিতে থাকতে

পারে না। কারণ প্রত্যেকেই জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন এবং ত্রিতাপ ক্লেশের বশীভূত। ধনী গরীব নির্বিশেষে এই প্রপঞ্চে বদ্ধ জীবমাত্রই আধ্যাত্মিক ক্লেশ, আধিভৌতিক ক্লেশ ও আধিদৈবিক ক্লেশের অন্তর্ভুক্ত।

এই ক্লেশনিবৃত্তির একমাত্র মঙ্গলময় পথ হল কৃষ্ণভাবনাময় জীবনযাপন করা। কিন্তু সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকলে ভগবদ্ প্রীতিভক্তি করব, নতুবা দরিদ্র হলে ভক্তির প্রতিকূল জীবন গ্রহণ করব—মাংস খাব, অবৈধ যৌনসঙ্গে থাকব, বিড়ি খেয়ে তাস জুয়া খেলে জীবন কাটাব—এইরকম বিদঘুটে যুক্তি কখনই খাটে না। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট; এই প্রবাদ দেখিয়ে কেউ বলতে পারে যে, দরিদ্রজনের পেটের চিন্তাই সার, হরিভজনের দরকার নেই। কিন্তু ধনীব্যক্তিরা যে স্বভাব নষ্ট না করে সাধু হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে পড়েছে। এইরকম কথা কেউ বলতে পারে না।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে উল্লেখ করেছেন, 'নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।' ভগবদ্স্মরণের কোনও কাল-নিয়ম বা বিধিবিচার করা হয়নি। 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।' সর্বদা হরিকীর্তন করতে হবে। যখন সুখ আসবে, তখন সুষ্ঠুভাবে হরিভজন করব, দুঃখের দিনে হরিভজন বাদ দেব—এ হল নির্বুদ্ধিতা। আবার দুঃখের দিনে ভগবানকে স্মরণ করব, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিনে ভজনসাধন বাদ দিয়ে ভোগতৃপ্তিতেই দিন কাটিয়ে যাব—এ সবই হল অভক্তের লক্ষণ।

প্রশ্ন ৩। ভাল কাজ করলে হয় তো আধ্যাত্মিক সুখ পাওয়া যাবে, কিন্তু মানুষের যা কাম্য সেই পার্থিব সুখ পাওয়া যাবে না কেন? পৃথিবীতে কেন এত দুঃখ-দারিদ্র্য অনাচার?

উত্তর ঃ এই মনুষ্য জন্মে পার্থিব সুখ কখনই কাম্য নয়। আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা এবং মৈথুন—এই চতুর্বিধ পার্থিব সুখ প্রকৃতির বিধানে সবাইকেই দেওয়া হয়েছে। শুধু মানুষ কেন কুকুর, বিড়াল, শূকর, পাখি, পোকা, সাপ, মাছ, পিঁপড়ে—যে কোনও জীবনেই আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা এবং মৈথুনের ব্যবস্থা রয়েছে। অতএব পার্থিব সুখ পাওয়া যাবে না—এটি ভুল ধারণা।

কিন্তু আহার নিদ্রা আত্মরক্ষা মৈথুনটাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। এগুলি পরিণামে দুঃখময়। ভগবান বলছেন *'দুঃখালয়ম্'*—এই জগৎ দুঃখময়। এখানে প্রকৃতপক্ষে সুখ নেই। এখানে আমাদের প্রাপ্য সুখ এবং দুঃখ না চাইলেও ভগবদ্ বরাদ্দ মতো আমরা লাভ করি। মানুষ যেহেতু ভগবদ্‌বিমুখ হয়ে 'অনাচার' করছে, তাই 'দারিদ্র্য' দেখা দিচ্ছে। অন্যান্য পশু তাদের প্রয়োজন মতো জাগতিক খাদ্য বস্তু ইত্যাদি গ্রহণ করে কিন্তু মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু স্বার্থপরের মতো আহরণ করতে থাকে, ফলে জগতে 'দারিদ্র্য' বৃদ্ধি হয়।

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন জীবনে পরম সুখ-শান্তি লাভ করতে হলে বিশ্বব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে কৃষ্ণভক্তির জীবন অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তা হলে তাঁর কৃপায় সমস্ত অভাব অভিযোগ মিটবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

"যারা অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে আমার উপাসনা করে, আমি তাদের সমস্ত অভাব অভিযোগ পূরণ করি এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।" (গীতা ৯/২২)

তাই অনন্য চিত্তে অর্থাৎ পার্থিব সুখ ভোগের চিন্তা না করে, কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষা অনুশীলন করে চলতে হবে।

প্রশ্ন ৪। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম প্রচার করেন অত্যন্ত দীনভাবে। যেখানে কোটি কোটি মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে জীবন যাপন করছে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মন্দির নির্মাণ করার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ মন্দির নির্মাণ করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা হচ্ছে, আর নাকি সেই কারণেই মানুষ আরও দারিদ্রসীমার নীচে চলে যাচ্ছে, অর্ধাহার অনাহার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে—এই ধরনের যুক্তি বা চিন্তা করা সম্পূর্ণরূপে অনর্থক। বরং বিপরীত কথাটাই সত্য যে, মানুষ যদি মন্দির তৈরির জন্য মন দিত, মন্দিরে এসে ভগবানের কথা শুনত—তবে কি করে দারিদ্র্য ঘুচানো যায় এবং দরিদ্রতার মূল কারণটি সম্পর্কে এক শুভ চেতনা অতি সহজেই লাভ করতে পারত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তাঁর ভক্তদের কৃষ্ণনাম প্রচার কার্যে লোকের দ্বারে দ্বারে পাঠাতেন তখন তাঁরা প্রচার করে তাঁদের গৃহে ফিরে আসতেন। তাঁরা প্রায় অধিকাংশই ছিলেন গৃহস্থ, তাঁরা তাঁদের গৃহটাকেই মন্দিরের মতো ব্যবহার করতেন। যে সকল ব্যক্তি ঘরছাড়া ছিলেন তাঁদের গৃহস্থ ব্যক্তিগণ তাঁদের একটি ঘর ছেড়ে দিতেন যাতে ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী সেই ঘরে বাস করতে পারে। যেমনটি কাশীমিশ্র তার বাড়িটি মহাপ্রভুর জন্য নির্ধারিত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে অসংখ্য অল্পবয়সী ছেলেরা তথাকথিত বড় বড় বিল্ডিং সমন্বিত শিক্ষায়তন গুলিতে শিক্ষিত হয়েও বেকার ভবঘুরে হয়ে নানাবিধ মানসিক যন্ত্রণা ভুগতে ভুগতে তারা মঠমন্দিরে আকৃষ্ট হয়ে সাধুসন্ন্যাসীর শরণাগত হচ্ছে। এটা যে কোন বুদ্ধিমান মানুষ তাঁদের সহানুভূতি সম্পন্ন দৃষ্টিপাত করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এই লক্ষ লক্ষ মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত বেকার শিক্ষিত যুবকদের ব্যথা। চিন্তা করা উচিত, তাদের থাকবার মতো যদি জায়গা বা গৃহ মন্দির না থাকে, যাঁকে কেন্দ্র করে জীবন পরিচালিত হওয়া মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্তব্য, সেই পরমেশ্বর ভগবানের অর্চাবতার যদি সুসজ্জিতভাবে সুশোভনীয় মন্দির মধ্যে না উপস্থাপনা করা হয়, তবে কি ফাঁকা মাঠে তাঁদেরকে থাকা উচিত বলে মনে করেন? অবশ্য বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠে এই দরিদ্র দেশেও কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়ে থাকে শুধু বল আর ব্যাট ঠুকানোর উদ্দেশ্যে—স্টেডিয়াম নির্মাণের উদ্দেশ্যে। তবে কি ভক্তরা বন জঙ্গলে থাকবে? তপোবনের মতো পরিবেশ এই সভ্যতায় নেই বললেই চলে। বনজঙ্গল কেটে মানুষ অনর্থক ইন্দ্রিয়ভোগের বিশাল বিশাল ইমারত সৌধ অট্টালিকা এবং ফাইভস্টার হোটেল নির্মাণ করছে। তবে কি মনে করেন পাহাড়ের

গুহা বা গাছের তলায় বা সমুদ্রসৈকতে ভক্তরা থাকবে? নিশ্চয়ই ভক্তরা অসুর নয় যে পাহাড়ের গুহায় থাকবে, বানর নয় যে গাছের তলায় থাকবে কিংবা পিকনিকপার্টির লোক নয় যে, সমুদ্রসৈকতে ঘুরে বেড়াবে।

আর দৈন্য সহকারে প্রচারের কথা আপনার মতো অনেকেই বলেন। খুব ভাল কথা। কিন্তু আমাদের মতো ভবঘুরেদের হরিকথা বহু অভিজাত্যপূর্ণ ব্যক্তিই শুনতে চায় না, তাদের দ্বারে পৌঁছালেই তাঁরা প্রচারকের প্রচার কার্যের মূল্য দেবে না, তারা কেবল ভিখারী মনে করেই অবহেলা ক্রমে কিছু ভিক্ষা দিয়ে বা না দিয়ে বিদায় দিলেই বাঁচি—এইরকম মনে করে। জোর করে তাদেরকে কিছু কথা বলতে চাইলে তারা বলে—না আমাদের ওসব দেখার সময় নেই। তাতে প্রচারক নিরুপায়। এইরকম অবস্থা প্রত্যক্ষদর্শীরা ভালভাবেই বোঝেন। কিন্তু মানুষ যখন ভগবৎ লীলাস্থলী, তীর্থধামে মন্দিরে এসে শ্রীবিগ্রহ দর্শন, হরিনাম কীর্তন এবং ভক্তদের ক্রিয়াকলাপ সেবা সাধনা দর্শন করবে, মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শুনতে সুযোগ পাবে তখন আপনাদের হৃদয়ের পরিবর্তনও হয়ে যাবে। আর সেই সবের ব্যবস্থাপনা ফাঁকা মাঠে বা কুঁড়ে ঘরে বা বনে জঙ্গলে রাস্তাঘাটে কখনই সম্ভব নয়। কারণ যে কেউ বুঝতে পারেন যে, ঝড় বাদলা, রোদ বৃষ্টি, শীত গ্রীষ্ম, চোর ডাকাত, মদ্যপ উন্মাদ ইত্যাদির মাঝে ভজন-কীর্তন সেবা-সাধনা সম্ভব নয়। সেই জন্য তাদের থাকবার মতো বড় বড় ঘর বাড়ি নির্মাণ করতেই হবে। আর মন্দির যদি বাদ দেওয়া হত তাহলে বনজঙ্গলে বা কুঁড়েঘরে কয়টা মানুষ মুখ বাড়াতেও আসত কিনা সন্দেহ। বহু দূরদূরান্ত থেকে সাংসারিক নানা হটাপুটি, কর্মব্যস্ততা ও ক্লান্তি অবসাদ থেকে একটু শান্তির নিশানা পেতে লক্ষ লক্ষ লোক মঠমন্দিরে দৌড়ে আসে কেন—বনজঙ্গল দেখতে? নিশ্চয়ই নয়। তারা জানে যে, সেখানে অনেক ভক্ত আছে, বড় মন্দির আছে, ভগবানের পূজা আরতি হচ্ছে, কীর্তন হচ্ছে, হরিকথার আসর বসে, থাকবার, খাওয়া শোওয়ার জায়গা আছে, নিরাপত্তা আছে, তাই তো তারা আশা করে আসে। নইলে কেউই তীর্থে বা ধামে আসতেই চাইত না। তাই পৃথিবীতে ভগবানের মন্দিরের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আর মানুষ অযথা 'অনাহারে' মরবে কেন? চুরাশী লক্ষ প্রকারের জীব আছে ব্রহ্মাণ্ডে, কাউকে অনাহারে মরতে দেখা যায় না। সবাই আহার করেই মরে। তবে মানুষ বুদ্ধিমান এবং শ্রেষ্ঠ জীব বলে পরিগণিত হয়েও কেন সে অনাহারে মরবে? বরং অন্যান্য জীবজন্তুরা চাষবাস জানে না। কিন্তু মানুষ তো সব কাজে দক্ষ। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে না। প্রকৃত পক্ষে এই অফুরন্ত ভাণ্ডার পৃথিবীতে মোটেই খাদ্যের অভাব নেই। এখন যে সমস্ত 'দারিদ্র্য' দেখা যায়—সেইগুলির আসল কারণ হচ্ছে মানুষ ভগবানকে মানে না, মন্দির মানে না, শাস্ত্র মানে না। মানুষ ঘোরতর বদমায়েশী করছে। রাক্ষসসুলভ লোভের বশে একে অপরকে প্রতারণা করে ভোগদখল করছে। কেবল ভোগদখল মামলা নিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধরে সুপ্রীম কোর্টে কোটি কোটি মামলা জমা হচ্ছে। সেই মামলা চালিয়ে যেতে টাকা দিতে দিতে লোক হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

খাদ্য থাকলেও হিংসা চরিতার্থ করতেই এক ভাই অপর ভাইকে বঞ্চিত করছে। সমুদ্রের গর্ভে জাহাজ ভর্তি টন টন খাদ্য ফেলে দেওয়াও হচ্ছে কতিপয় স্বার্থান্বেষী পুঁজিবাদী মানুষের কারসাজিতে। শ্রীল প্রভুপাদ এই রকম ভয়ংকর ঘটনার কথা বলেছিলেন। অতএব এই সমস্ত বদচরিত্র মানুষের বদমায়েশীর ফলেই দারিদ্র্য বা অনাহার সৃষ্টি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভগবানের মন্দির হচ্ছে না বলেও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণটা বোঝা দরকার। শাস্ত্রবিহিত মন্দির থাকলে সেখানে ভক্তরা সমবেত হবে, কীর্তন হবে, হরিকথার আসর বসবে, পূজা-অর্চনা হবে—তখন পারিপার্শ্বিক অশুভ প্রভাব গুলিকেও মানুষ এড়িয়ে চলতে শিখবে। সেই অশুভ প্রভাবগুলিই মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করছে। যেমন মদের নেশা, জুয়ার আড্ডা, হিন্দী ছায়াছবি দেখা, ধোঁয়া খাওয়া, মাংস খাওয়া, বেশ্যাখানা, নাইটক্লাব—যেগুলিতে প্রতিদিন মানুষ ভীড় পাতাচ্ছে। ঘরে খেতে পরতে থাকুক কিংবা নাই থাকুক—এগুলিতেই অনেক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছেই। সরকারী ইনকাম ট্যাক্সের খাতায় এক বিরাট অংকের অর্থ ওসব থেকেই আসছে। আর কেবল এইগুলির খাতে কত লক্ষ কোটি মানুষ কত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে—যার ফলে সমগ্র মানব সভ্যতা পিশাচ-সভ্যতায় পরিণত হয়ে হাহাকার করছে। সেটাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির চোখের পর্দায় সহজে প্রতিভাত হওয়াই উচিত বলে মনে করি। সারা পৃথিবী জুড়ে ভক্ত পরিবেষ্টিত ভগবানের অর্চন ও কীর্তনময় মন্দির বানিয়ে যদি মানুষের মস্তিষ্কে দিব্য চেতনা জাগ্রতকারী হরিকথার আসর বসত, তা হলে দারিদ্র্য তো কোন্ চুলায় পড়ত, বরঞ্চ এই অনটনময় পৃথিবীটা ঐশ্বর্যময় বৈকুণ্ঠে পরিণত হত বলেই মহাজনেরা উল্লেখ করে থাকেন। নাস্তিক কলুষময় সভ্যতার মানুষেরা এই সমস্ত কথা সহজে বুঝে উঠতে পারবে না। কিন্তু ভগবদ্ মন্দির সারা পৃথিবীর শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষের হৃদয়কে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অবশ্যই আকর্ষণ করছে সন্দেহ নেই। জড় জাগতিক শিক্ষার জন্য কতশত স্কুল কলেজ ইউনিভারসিটি সিনেমা হল—বড় বড় কত সৌধ রয়েছে, তেমনি চেতনা জাগ্রতকারী ঐকান্তিক পারমার্থিক আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র হচ্ছে ভগবানের মন্দির।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ মহান প্রচারকবর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভবিষ্যৎ ইচ্ছা পোষণ করে বলেছেন—

> "অদ্ভুত মন্দির সেই হইবে প্রকাশ।
> গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা হইবে বিকাশ॥"

(নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য)

ভগবানের জন্য মন্দির নির্মাণ করার নির্দেশন গোস্বামীগণও রেখে গেছেন।

প্রশ্ন ৫। কোন ভগবদ্ অনুরাগী ভক্ত যদি কৃষিকার্য করে জীবন-যাপন করে, তবে কৃষিকার্য করতে কত জীবের না প্রাণনাশ হয়। তাছাড়া বর্তমান যুগে বিষ প্রয়োগ ছাড়া ফসল রক্ষা করা যায় না। আবার, এদিকে জীবহিংসা হল

ভগবদ্‌বিরোধী কাজ। তাহলে তার কি দশা হবে? পেটের চিন্তা করলে ভগবদ্ সেবা হয় না, অন্য দিকে ভগবদ্ সেবা করলে পেটের যোগান বা কে দেবে?

উত্তর ঃ কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহারে অনেক প্রকারের পাপকর্ম হচ্ছে। জীব হত্যা পাপ তো হচ্ছেই, আবার শস্যও বিষময় হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে সেই শস্যই আমাদের দৈহিক নানাবিধ অমঙ্গলকর ক্ষণিক ও দীর্ঘকালীন ব্যাধি-বিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। আবার জল, বাতাস, ভূমিও দূষিত হচ্ছে। যার ফলে অনেক রোগ-জীবাণু প্রতিরোধক ব্যাক্টেরিয়াও হত হচ্ছে। পাখি, মাছ, কেঁচো, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণীও অনর্থক মারা যাচ্ছে। গো-জাতিও বিষাক্ত লতা-পাতা, ঘাস, খড় খেয়ে রোগাকীর্ণ, অল্প আয়ু ও ভগ্ন স্বাস্থ্য হচ্ছে। আধুনিক অবৈদিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত সেই খাদ্যশস্য মানুষের পক্ষে পর্যাপ্ত শক্তি স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দিতে পারে না।

চাষ না করলেও দোষ। কেউ যদি কৃষিকার্য না করে শস্য কিনে খায়, তবে সেও একই দোষে দোষী। কারণ সেই শস্য জীবহত্যা করেই উৎপাদিত হয়েছে। যে হত্যা করছে সে একা পাপী নয়, যে তা কিনে খাচ্ছে সেও সমান পাপী। কলিযুগ এইভাবে পাপে ভরা। অন্যযুগে এইরকম ব্যাপক দুরবস্থা ছিল না।

প্রাণীহত্যা কোন শাস্ত্র সমর্থন করে না। এমনকি অজ্ঞাতেও প্রাণীহত্যা হয়ে যাবার দরুন শাস্তি ভোগ করতেই হয়। সতী গান্ধারী দেবী পূর্বজন্মে জলপূর্ণ সোনার কলসী একটি জায়গায় বসিয়ে ছিলেন। তিনি জানতেন না যে সেটি ছিল একশটি ডিম সাজানো একটি কচ্ছপের বাসা। কলসীর ভারে ডিমগুলি নষ্ট হওয়ার ফলে মা-কচ্ছপ মর্মাহত হয়ে অভিশাপ দেয়। পরবর্তী জন্মে এই পাপকর্মের ফল স্বরূপ সতী গান্ধারী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একশটি পুত্র হারিয়ে অনুরূপ শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন।

তাই বৈদিক পন্থা অনুসরণীয়। যেমন ঝাড়ু দিলে মাকড়সা মরে, কিন্তু মাকড়সার বাসা করার আগে থেকে রোজ পরিষ্কার রাখলে মাকড়সা বাসা হয় না। ফলে জীবহত্যাও হয় না। মশা মারলে পাপ হবে। কিন্তু মশারী ভাল করে টাঙাতে হবে, ধূপ-ধুনার গন্ধ দিতে হবে, যাতে মশা বাসা না করে। নালা নর্দমা পরিষ্কার রাখলে মশা মাছির বাসা হয় না। তেমনই, চাষাবাদেও প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক কিছু প্রয়োগ করা যায়, যাতে পোকাও আসবে না, অন্য কারও ক্ষতি হবে না। সেই রকম কিছু প্রয়োগ করা দরকার। যেমন বৈদিক পন্থা হল, চাষ-আবাদ খানা-খন্দতে বিষ প্রয়োগ করে পোকা মারার চেয়ে নিমপাতার তিক্ত রস প্রয়োগ করলে পোকা ছেড়ে যায়। পোকা তখন শস্যাদি নষ্ট করতে পারে না। আর এই নিম রস পরিবেশকে দূষিতও করে না। জল বাতাস মাটি থেকে রোগ-জীবাণুকেও সরিয়ে দেয়। শিশু, নারী কিংবা মানসিক ভারসাম্য বিচ্যুত মানুষ কীটনাশক বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করছে, নিম রস থেকে সেই বিপদের ঝুঁকিও নেই।

জিংক সালফেট ইত্যাদি রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করে কেবল গোবর সার প্রয়োগ করা হয় তাহলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। আর গোবর পরিবেশকে রোগজীবাণু থেকে মুক্ত রাখে। চাষাবাদও খুব ভাল হয়। এগুলি হচ্ছে বৈদিক পন্থা।

দুর্বিসহ কলিযুগে যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন ভাল করে করতে হবে। দিন দিন কৃষ্ণস্মরণ করতে হবে। আর যতদূর সম্ভব সযত্নে জীবহত্যা এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ জীবহত্যা করতে কোন শাস্ত্রে নির্দেশ নেই। বেদের নির্দেশ আছে যারা বিষ প্রয়োগ করে, ঘরে আগুন লাগায়, বিবাহিত পত্নীকে হরণ করে, মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে, অন্যায় ভাবে জমি দখল করে, ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে সেই সব ক্ষেত্রে দুষ্কৃতকারী মানুষকে হত্যা করলে কোনও পাপ হয় না।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নাম ভজন করতেন। তিনি একটা বিষধর সাপকেও পর্যন্ত মারতে যান নি। তাঁর ভজন কুটীর থেকে সাপটিও স্থানান্তরে চলে যায়। পরম বৈষ্ণব সনাতন গোস্বামী ব্রজে চাকলেশ্বর শিব মন্দিরের পাশে মশার কামড়ে অস্থির হয়ে চিন্তা করলেন, অন্যত্র চলে যাব। আর এখানে ভজন করব না। কিন্তু চাকলেশ্বর মহাদেব শিব বললেন, ওহে সনাতন, তুমি মন দিয়ে এখানে ভজন কর। কাল থেকে একটাও মশাকে দেখতে পাবে না। মহাদেব সেখান থেকে সব মশাকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছিলেন। এই সব ব্যাপারও কলিযুগের ঘটনা।

নারদমুনি একটি ব্যাধকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে সে আর জীবহত্যা না করে। ব্যাধ বলেছিল জীবহত্যা করাটাই তার পেশা। নারদমুনি বললেন তার সেই পেশাই পরিণামে তাকে নরক যাতনা ভোগ করাবে। যদি সে পাপমুক্ত হতে চায় তবে তাকে প্রথমে পশুবধের অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে, তারপর হরিনাম করতে হবে। এই সব নির্দেশ শুনে ব্যাধ বলে, 'তা হলে আমার পেট চলবে কি করে?' তখন নারদমুনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, ভালভাবেই পেট চলবে। সত্যি সে যখন পশুহত্যা ছেড়ে দিয়ে তার উপার্জিত অর্থ মুনি নির্দেশে সাধুদেরকে দান করে স্ত্রীসহ একটি নদীতীরে কুটির বানিয়ে সেখানে তুলসীপূজা, হরিনাম জপ, নিরামিষ প্রসাদ ভোজন করে সংযত জীবন-যাপনে ব্রতী হল তখন গ্রামবাসীরা ব্যাধের অদ্ভুত মতি পরিবর্তন দেখে, তাকে হরিভজন করতে দেখে প্রতিদিন চাল ডাল তেল নুন সবজি বসন দান করতে লাগল। ব্যাধ আশ্চর্যান্বিত হয়ে গুরুদেব শ্রীনারদমুনির কথাই কেবল স্মরণ করতে লাগল। কারণ সে হৃদয়ঙ্গম করেছিল যে, শ্রীনারদমুনির কৃপাতেই মহাপাপ থেকে উদ্ধার পেয়ে এত কুশলে থাকতে পারছে।

পরিশেষে মূল কথা হল এই যে, ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যেই কৃষিকার্য করবে এবং উৎপাদিত শস্য ভগবানের নৈবেদ্য হিসাবে ব্যবহার করবে আর তাঁর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে জীবন-যাপন করবে। তার কাজকর্মে কোন পাপ-প্রবণতা থাকবে না। সেই জন্য তাকে সাবধানে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে চলতে হয়।

প্রশ্ন ৬। এই জড়দেহটি যদি সুস্থ সবল না হয় তাহলে কি করে হরিভজন করা যাবে?

উত্তর ঃ কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধ যদি না থাকে তবে দীর্ঘ জীবন নিরোগ সুস্থসবল শরীরটাও অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেউ যদি সংযত ইন্দ্রিয় ও নানাবিধ ব্যায়াম চর্চা করে সবল সুস্থ শরীর গঠনও করে অথচ তার যদি কৃষ্ণভক্তির অভাব থাকে তবে সেই রকম জীবন আর সুস্থ সবল হাতী গণ্ডারের জীবনের কোনও পার্থক্য নাই। কৃষ্ণভক্তিবিহীন বৈরাগ্যও নিরর্থক। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যারা রোগে কষ্ট পাচ্ছে তারা ভগবানের নাম আকুলভাবে জপ কীর্তন করছে, আবার যারা স্বাস্থ্যবান সবল তারা জগতের অন্যান্য চিন্তা ভাবনায় ব্যস্ত। অতএব হরিভজন আমাদের চেতনার উপর নির্ভর করে, দৈহিক পরিস্থিতির উপর নয়।

প্রশ্ন ৭। ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত রূপ ও সনাতন গোস্বামী বিষয়-সম্পদ ত্যাগ করে কেন নির্জনে গোবিন্দভজন করলেন? কেন তাঁরা আপনাদের মতো বিশাল বিশাল মন্দির গড়ে নামপ্রচার করলেন না?

উত্তর ঃ শ্রীল রূপ গোস্বামী সেবিত শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির ছিল সাততলাযুক্ত এত উঁচু যে, সুদূর আগ্রা থেকে ভারতের মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব সেই মন্দিরের চূড়া দেখতে পেতেন। মন্দিরের চূড়াতে রোজ কয়েক মণ ঘিয়ের উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলত সারারাত। দামীদামী পাথরের তৈরী অদ্ভুত রকমের কারুকার্য ছিল তাতে। 'হিন্দু বিদ্বেষী' আওরঙ্গজেব সেই বিশাল মন্দিরের চূড়াসহ কয়েকতলা ভেঙে দিয়েছেন। ইংরেজ লেখক গ্রৌজ সাহেবের 'মথুরা' নামক গ্রন্থে বিশাল বিশাল মন্দির ভাঙচুরের ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

নীলাচলপুরীধাম থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পত্র মাধ্যমে ব্রজধামে স্থিত শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে জানিয়েছিলেন যে, বৃন্দাবনে তাঁর থাকার জন্য যাতে সনাতন গোস্বামী একটু স্থান রাখেন। সেই নির্দেশ অনুসারে শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর সেবিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীমদনমোহনদেবের বিশাল মন্দিরের পাশেই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভুর জন্য আরও একটি বিশাল মন্দির তৈরি করেছেন।

সুতরাং আপনার মতো প্রশ্নকর্তার বৃন্দাবনে গিয়ে সেই মন্দির সমূহ দেখে আসা কর্তব্য বলে মনে করি। এইভাবে হাজার হাজার প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন সমগ্র ব্রজমণ্ডলে আপনি পেতে পারবেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী প্রভুগণ কেবল নির্জন ভজন করতেন এরূপ নয়, তাঁরা ঘন জনবহুল এলাকা বিখ্যাত মথুরা শহরেও হরিনাম প্রচার করতেন। তাঁরা নিরিবিলিতে বৃক্ষতলে বসে ভক্তিগ্রন্থ লিখতেন, আবার লোকালয় এলাকায়ও যেতেন। কেবল মনে মনে নির্জন বনের মধ্যে গোবিন্দ ভজনা করতেন এরকম নয়, তাঁরা বিশাল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ বিগ্রহ পূজার্চনাও করতেন।

আরও জানা উচিত এই যে, বিশাল বিশাল মন্দির বানিয়ে নিজের নাম খ্যাতি লাভ করার মানসিকতা কোনও ভক্তের নেই। আপনি প্রথমেই 'অন্তরঙ্গ ভক্ত' কথাটি উল্লেখ করেছেন। আপনার প্রশ্ন পড়ে মনে হচ্ছে যেন, আমরা সেই অন্তরঙ্গ ভক্তের অনুগামী না হয়ে ভক্তি বিরুদ্ধ আচরণ করছি। কিন্তু সেই শ্রীল রূপগোস্বামী বলেছেন,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥

অর্থাৎ, "মানুষেরা লৌকিক ও বৈদিক যে সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করে, ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিরা সেই সমস্ত কার্যই করবে কৃষ্ণসেবার অনুকূলে।"

তাৎপর্য হল এই যে, লোকেরা বহু অর্থ রোজগার করে নিজেদের ভোগবিলাস উদ্দেশ্যে বড় বড় অট্টালিকা গড়ছে। আর ভক্তদেরও সেইরকম অট্টালিকা গড়তে হবে কৃষ্ণসেবা বৃদ্ধির জন্য। গো হত্যা ও নানাবিধ পশু-পাখি হত্যার জন্য বিশাল বিশাল কসাইখানা ভবন গড়ে উঠেছে। মাছ-মাংস ভোজের জন্য বিশাল বিশাল হোটেল গড়ে উঠেছে। অশ্লীল নানাবিধ রঙিন ছায়াছবি দেখানোর জন্য অসংখ্য পরিমাণে বিশাল বিশাল সিনেমা হল গড়ে উঠেছে। এইভাবে জড় ইন্দ্রিয় সুখতর্পণ উদ্দেশ্যে কত কিছু গড়ে উঠেছে। আর মানুষের চরিত্রদূষণও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেজন্য বিশাল বিশাল কয়েদখানাও গড়ে উঠেছে।

আর, রূপ-সনাতনীয় ধারায় পূর্বতন ও অনুগামী আচার্যবৃন্দ চিন্তা করছেন যদি বিশাল বিশাল শ্রীকৃষ্ণমন্দির নির্মাণ হয়, এবং অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে পূজার্চনা আরতি নৃত্যকীর্তন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে পৃথিবীর অগণিত মানুষ বিশাল বিশাল মন্দিরে আকৃষ্ট হয়ে আসবে, থাকবে, বসবে, ভক্তিকথা শুনবে এবং কৃষ্ণপ্রসাদ পাবে। দুতিন দিন থেকে ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং হৃদয়ে শুদ্ধতা আসবে। আর এইভাবে সারা মানবসমাজ সুন্দর পবিত্রময় মঙ্গলময় হয়ে উঠবে। সুতরাং শ্রীল রূপ গোস্বামীর শিক্ষা অনুসারে চলতে হলে এই জগতে সমস্ত বিষয় আশয় কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করতে হবে। আরও বেশি অট্টালিকা, আরও টাকা, আরও জমি দরকার। সবই কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হবে। শুধু তাই নয়, সমগ্র পৃথিবীটাকে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাই হচ্ছে সমগ্র মনুষ্য প্রজাতির একমাত্র কর্তব্য। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশ্বব্যাপী হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন আন্দোলনে আরও অনেক অনেক ভক্ত, আরও অনেক মন্দির, আরও বড় বড় বাসভবনের প্রয়োজন তো আছেই। এই অত্যন্ত সহজ কথাটি নতুন করে কাউকে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। যে কেউই বুঝতে পারে যে, বড় মন্দির, থাকার স্থান যদি না থাকে, তবে সেখানে লোকে মুখ দেখাতেও যেতে চাইবে না। নির্জন বন কিংবা পাহাড়ের গুহাতে কোনও ভক্ত থাকলে সেখানে কে যাবে আর হরিনাম প্রচারই বা হবে কি করে?

প্রশ্ন ৮। এই জগতে এত সমস্যা কেন? আর্থিক সামাজিক বহু সমস্যা লেগেই রয়েছে। সমাধান কিভাবে হবে?

উত্তর ঃ এই কুণ্ঠাময় জগতে সমস্যা থাকবে। এখানে বিভিন্ন রকমের সমস্যায় বদ্ধজীব দুঃখভারাক্রান্ত হবে। তাই বলা হয়েছে *দুঃখালয়মশাশ্বতম্*—এই জগৎ দুঃখের আগার। বৈকুণ্ঠ জগতে কোনও সমস্যা নেই। এই কুণ্ঠাপূর্ণ জগতে যদি কেউ বৈকুণ্ঠ জগতে যাওয়ার জন্য প্রয়াসী হয় তা হলে তার অচিরেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে

যায়। আর সেইটাই মনুষ্য জীবনের করণীয় বিষয়। কি করণীয় আছে—গীতা ভাগবতাদি বৈদিক শাস্ত্রে সেই সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সেই সব নির্দেশ মেনে চলি না বলেই আমাদের নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয় এবং সেই সমস্ত সমস্যায় আমরা জর্জরিত হই, দিশাহারা হই। আর বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'বিপদ কখনও একাকী আসে না।' অর্থাৎ, এক একটি ক্ষুদ্র সমস্যা অসংখ্য বড় সমস্যাকেও ডেকে আনে।

স্বাভাবিক নিয়মগুলি মেনে চললেই আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা দূর হয়ে যায়। একটু একটু করে অর্থ সঞ্চয় করে মানুষ ধনী হয়ে যায়। কিন্তু অতিরিক্ত ধনলোভ কিংবা সঞ্চয় মাত্রই যার লক্ষ্য, হয়তো পরিণামে সেই ধনও তাকে নিরাশ করে তুলতে পারে। বেশী টাকা থাকলে মিথ্যা অহমিকা বৃদ্ধি পায়। শত্রুতাও বৃদ্ধি পায়। এক ধনী অন্য ধনীর সঙ্গে ঈর্ষাভাবাপন্ন হয়। ধন-অর্থ চিন্তাই যখন মানুষের জীবনের ব্রত হয় তখন পরিণামে জীবনটা অনর্থেই পর্যবসিত হয়, তাই বলা হয় অর্থই অনর্থের মূল। কিন্তু অর্থ হচ্ছে লক্ষ্মীর প্রকাশ। সেই হিসাবে লক্ষ্মীকে নারায়ণের সেবায় যুক্ত করতে হয়। নারায়ণের ভোগ্য বস্তু লক্ষ্মী যদি নারায়ণবিহীন হন তবে তিনি চঞ্চলা। চঞ্চলা লক্ষ্মী নিয়ে কেউ শান্তি পেতে পারে না। যখন মানুষ বুঝবে সমস্ত কিছুই ভগবানের সম্পদ, তখন ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে সবকিছুর সদ্ব্যবহার করবে। অর্থ যদি ভগবৎ-ভক্তির অনুকূলে ব্যবহৃত হয় তবে অর্থ আহরণকারী ব্যক্তির পরমার্থ সঞ্চিত হয়। তখন অর্থ অনর্থে পর্যবসিত হয় না।

আর সামাজিক নিয়ম লংঘন করার ফলে মানুষ নিজের ও সবার সমস্যা তৈরি করছে। শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন পরিচালিত করে ভগবৎভক্তি অনুশীলন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চার বর্ণ ও ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বাণপ্রস্থ-সন্ন্যাস এই চার আশ্রমের মধ্যে যে ব্যক্তি যেখানে থাকুন না কেন সেই বর্ণ সেই আশ্রমের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে চলবেন। যখনই সেই নিয়মকানুন ভঙ্গ করে অনাচার শুরু হয়ে যায় তখনই সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। নিয়মকানুন সম্পর্কে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বা শাসনব্যবস্থা তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে মনে হয়। মানুষ তামসিক খাবার খাচ্ছে, ধূমপান করছে, মদের ছড়াছড়ি, ছায়াছবি, বহুল প্রকাশিত সংবাদপত্র, দূরদর্শন এমন সব চিত্রকাহিনী পরিবেশন করছে যেখান থেকে অনেকে অশ্লীলতা শিখছে।

মাংস আহার, জুয়া, নেশাভাঙ ও অবৈধ যৌনতা মানবসভ্যতায় অধর্মকেই আশ্রয় দিচ্ছে। এই অধর্মের প্রভাবে সর্বত্রই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি এই সমস্যা সঙ্কুল পৃথিবীতে থেকেও মূল সমস্যা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিপূর্ণ সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চান তাঁকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত হতে হবে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—"যতদিন পর্যন্ত সংসার বদ্ধ জীবের পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ-কীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধা না আসে, ততদিন পর্যন্ত আহার-নিদ্রা-দেহরক্ষা-মৈথুন উদ্দেশ্যে সে কর্ম করতে থাকবে আর নানাবিধ সমস্যা ভুগতে থাকবে এবং সেই সমস্ত কর্মের ফল তার আবহমান কাল

ধরে দুঃখের কারণ হয়ে থাকবে অথচ সেই দুরবস্থা থেকে উদ্ধারের পন্থা খুঁজে পাবে না।" (ভাঃ ১১/২০/২৯)

বাবুই আদি পাখী, মৌমাছি কিংবা পিঁপড়ের জীবনেও দেখা যায় তারা তাদের খাওয়ার জন্য, থাকার জন্য কেমন সুন্দর বন্দোবস্ত করে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করছে। যদিও তাদের মানুষের মতো উন্নত বুদ্ধি নেই তথাপি কিন্তু তাদের জীবনেও সুন্দর নিয়মশৃঙ্খলা রয়েছে। যখনই বুদ্ধিমান মানুষ তার বুদ্ধির অপব্যবহার করে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, ভোগপরায়ণ, হিংস্রভাব পোষণ করে তখনই নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু যখন মানুষ এর বিপরীত ভাবগুলি আয়ত্ত করতে শেখে, সর্বোপরি সর্বান্তর্যামী ভগবানকে ভালবাসতে শেখে তখন তার কি ঐহিক কি পারত্রিক সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণকেন্দ্রিক সমাজ হচ্ছে বৈকুণ্ঠধাম।

প্রশ্ন ৯। আমরা এ জগতে এত দুঃখ যাতনা ভোগ করি কেন?

উত্তর ঃ আমাদের ভগবদ্‌সেবা-বিমুখ আচরণই সমস্ত দুঃখভোগের কারণ। মানব জাতির পিতা মহর্ষি মনু উল্লেখ করেছেন—

অধর্মপ্রভবং চৈব দুঃখযোগং শরীরিণাম্ ।
ধর্মার্থপ্রভবং চৈব সুখসংযোগমক্ষয়ম্ ॥

"জীবের সমস্ত দুঃখ অধর্ম থেকেই উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে ধর্ম পালনের ফলে জীবের অক্ষয়সুখ লাভ হয়।"

প্রশ্ন ১০। একজন মাংস ব্যবসায়ী ও মদব্যবসায়ী যদি কৃষ্ণভক্ত হয়, তা হলে তাদের মাংস-মদ ব্যবসা ছেড়ে দিতে হবে কি? যদি ছেড়ে দিতে হয় তবে তাদের জীবিকা নির্বাহ কিভাবে হবে?

উত্তর ঃ মদ ও মাংস ব্যবসা না করেও লোকে অন্য ব্যবসা করে ভালভাবে বাঁচতে পারে। মদ ও মাংস ব্যবসাটি ছিল না, সেটিকে গ্রহণ করে মনে করা হচ্ছে যে, এটাই আমার জীবন ধারণের উপায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মদ ও মাংস ব্যবসা জীবন নাশের প্রক্রিয়া। চারাগাছ, ফুল, সবজি, কাপড়, দড়ি, অন্য খাদ্যবস্তু কত সুন্দর ব্যবসা থাকতে থাকতে ভক্তিবিরোধী জঘন্য ব্যবসা করে মোটা মোটা পাপ অর্জন করে অনন্ত কোটি ভাবী নারকীয় যাতনা সঞ্চয় করে জীবন নির্বাহের আশা করা নিদারুণ মূঢ়তা।

প্রশ্ন ১১। সকলে বলে ভগবান আছেন। ভগবান থাকলে দেশে এত দুঃখ কষ্ট কেন?

উত্তর ঃ আপনার দেশে দুঃখকষ্ট থাকা না থাকার উপর ভগবানের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। সৃষ্টি আছে মানেই স্রষ্টা আছেন। ভগবানের প্রতি বিমুখ হওয়ার ফলেই জীব এই দুঃখকষ্টের জগতে এসেছে। তাই দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে।

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

ভগবানের নির্দেশ হচ্ছে, এই জগৎটা দুঃখকষ্ট দিয়েই তৈরি। তাই কৃষ্ণভজন মাধ্যমে পরমানন্দময় ধামে উন্নীত না হওয়া অবধি এখানে দুঃখকষ্টই পেতে হবে।

৮

সনাতন ধর্ম ও ছলধর্ম

প্রশ্ন ১। প্রকৃত ধর্ম কি? ধর্ম বড়, না কর্ম বড়?

উত্তর ঃ প্রকৃত ধর্ম হল ভগবানকে ভালোবাসা। ভগবানের দেওয়া নিয়মনীতিগুলির দ্বারা পরিচালিত হওয়া। *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবদ্ প্রণীতম্।* ধর্ম হল স্বয়ং ভগবানের দ্বারা প্রণীত নিয়মকানুন। আর, কর্ম বলতে কোনও কিছু করাকে বোঝায়। কিন্তু যে কোনও কর্ম করা উচিত নয়। একমাত্র ধর্ম অনুমোদিত কর্মই করণীয়। ধর্ম ছাড়া কর্ম কুকর্ম, কর্ম ছাড়া ধর্ম সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ধর্মশাস্ত্র একমাত্র মানুষদের জন্যই রচিত, পশু-পাখিদের জন্য নয়। তাই মানুষকে ধর্মবিহিত কর্ম করে চলতে হয়। কি কর্ম করতে হবে, কি কর্ম বর্জন করতে হবে সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ সমাচর ॥

"শ্রীহরির প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত, অন্যথায় সেই সমস্ত কর্মই জীবকে দুঃখময় জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই হে কুন্তীপুত্র অর্জুন, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কেবল তোমার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করো এবং তার ফলে তুমি সদাসর্বদা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। (গীতা ৩/৯)

"প্রকৃতপক্ষে যে কর্ম মানুষকে কৃষ্ণভক্তির পথে পরিচালিত করে না, তা পাপকর্ম এবং যে বিদ্যা কৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে না, তা ভ্রান্ত। যদি কৃষ্ণভাবনামৃতের অভাব হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেই কর্ম এবং সেই বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।" (ভাঃ ৪/২৯/৪৯ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

প্রশ্ন ২। মা-বাবা কুলগুরু আশ্রিত, তাঁরা মাছ-মাংস, পিঁয়াজ-রসুন, চা, বিস্কুট সবই খায়। কিন্তু আমাকেও তাঁরা কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিতে বলছেন। এটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ আমিষভোজী ও নেশাসেবীরা যাঁরা কুলগুরু রূপে সমাজে আদরণীয় হচ্ছেন, তাঁরা আসলে গুরু নন। সেই সমস্ত কুলগুরু, জাতগোঁসাই, সহজিয়া, মায়াবাদীদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করা কখনও উচিত নয় বলে শাস্ত্রে নির্দেশ রয়েছে। কুলগুরু বা বেদাধ্যায়ী অবৈষ্ণব ব্যক্তি গুরু নন।

মহা-কুল-প্রসূতোঽপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥

"মহাকুল-প্রসূত, সর্ব যজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্র শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হলে গুরুপদে অভিষিক্ত হতে পারেন না।" (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১/১৪০)

প্রশ্ন ৩। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত'*— এখানে ধর্ম কথাটির বৈদিক ব্যাখ্যা কি? নিশ্চয়ই হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান বা কোনও ধর্মানুষ্ঠানের গ্লানি নয়?

উত্তর ঃ ধর্ম হল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া আইন। *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রণীতম্।* (শ্রীমদ্ভাগবত ৬/৩/১৯) মানুষ যখন ভগবৎ প্রণীত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে কিংবা ভগবদ্ নির্দেশকে বিকৃত করে নাস্তিক, পাষণ্ডী, দুরাচারী হয়ে যায়, তখন সেই দুষ্কৃতকারীদের দমন এবং ভক্তদের রক্ষা করার জন্য ভগবান আবির্ভূত হন।

হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ইত্যাদি সম্প্রদায় তাদের ভগবদ্-প্রতিনিধিদের উপেক্ষা করে নিজ নিজ মনগড়া পন্থাকে মহাজন-নির্দেশিত কিংবা ভগবদ্ নির্দেশিত ধর্ম বলে মনে করছে। যদিও তা নিছক অধর্ম ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। এই সমস্ত সম্প্রদায় তাদের ধর্মশাস্ত্রকে বিকৃত করে ফেলেছে। তারা সবাই ধর্মানুষ্ঠানের নামে অধর্ম আচরণ করছে।

কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিলে সহজেই তা বোঝা যায়। যেমন, মহাভারত হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র বলে পরিচিত। তাতে বলা হয়েছে, কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষা অনুশীলনই যথার্থ ধর্ম—

যে চ বেদবিদো বিপ্রা যে চাধ্যাত্মবিদো জনাঃ।
তে বদন্তি মহাত্মানং কৃষ্ণং ধর্মং সনাতনম্ ॥

"যিনি সঠিকভাবে বেদ অধ্যয়ন করেছেন, তিনি প্রকৃত বিপ্র অথবা বেদজ্ঞ; যিনি আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করাকেই জীবের সনাতন ধর্ম বলে বর্ণনা করেন।"

অথচ, পরমেশ্বর ভগবানকে বাদ দিয়ে আধুনিক হিন্দুজাতির তথাকথিত পণ্ডিত মানুষেরা নতুন করে মূর্খের মতো বলতে শিখেছে "মানুষই ভগবান, জীবই ঈশ্বর।"

কোরান মুসলমানদের পবিত্র ধর্মশাস্ত্র বলে পরিচিত। তাতে বলা হয়েছে—"এদের মাংস এবং এদের রক্ত আল্লার কাছে পৌঁছায় না, কিন্তু তোমার ভক্তি তাঁর কাছে পৌঁছায়.....' (সুরা ২২/৩৭), যা ভগবদ্গীতাতেও বলা হয়েছে (*ফলং তোয়ং*.....৯/২৬)।

অথচ, নারকীয় গতি লাভের জন্য মুসলমানেরা পশুমাংস—বিশেষত গোমাংসকে প্রিয় খাদ্যরূপে গ্রহণ করছে।

বাইবেল খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মশাস্ত্র বলে পরিচিত। তাতে বলা হয়েছে—"কাউকে হত্যা করিও না।" (জুডাস ২০/৩০) কিন্তু খ্রিস্টানেরা বড় বড় কসাইখানা খুলে সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক গোহত্যা করছে। তাদের শাস্ত্রেই বলা হয়েছে—"যখন তুমি আমার প্রীতির উদ্দেশ্য বিনা ভিন্ন প্রার্থনা কর, তখন আমি কর্ণপাতই করি না; যেহেতু তোমার হাত রক্তে রঞ্জিত।" (ঈশাঃ ১/১৫)

অথচ, খ্রিস্টানেরা সপ্তাহের মধ্যে প্রচুর পশুহত্যাদি পাপকর্ম করার পর শেষে রবিবার দিন গির্জায় গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে; পুনরায় সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত আবার পাপকর্ম করে চলে। এইরকম তাদের জঘন্য স্বভাব।

এইভাবে দেখা যায়, মানুষেরা ধর্মশাস্ত্র উপেক্ষা করে মনগড়া পন্থায় চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে, অধিকাংশ মানুষই অধর্ম অনুষ্ঠান করছে। তাই এইভাবে ধর্মের গ্লানির জন্যে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। অত্যন্ত অধঃপতিত বদ্ধ

জীবদের প্রকৃত ধর্ম শিক্ষা দিতে তিনি গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন নিয়ে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২) বলা হয়েছে, "যাঁরা এই যুগে সুমেধা সম্পন্ন তাঁরাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের সমস্ত জীবের জন্য হরিনাম সংকীর্তন মাধ্যমে সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিশ্বজয়ী ধর্মশাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও নির্দেশ দিচ্ছেন আমাদের সদাসর্বদা কৃষ্ণকীর্তন করতে। *সততং কীর্তয়ন্তো মাং।* (গীতা ৯/১৪) জগতের মানব জাতির পরম ধর্মই হল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

এতবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

অর্থাৎ, "দিব্য নাম কীর্তন দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানে যে ভক্তিযোগ—তা-ই মানব-সমাজে জীবের পরম ধর্ম।" (ভাঃ ৬/৩/২২)

অনেকে মনে করতে পারে, মহাপ্রভু অপ্রকট হয়েছেন। কিন্তু এখনও ধর্মের গ্লানি রয়েছে, এখন তবে কেন ভগবান অবতীর্ণ হচ্ছেন না? এর উত্তর হল—ভগবান এখনও নামরূপে জগতে বিরাজমান। ভগবান ও ভগবানের নামের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগত নিস্তার॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭/২২)

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্র সার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭/৭৪)

তাই জাতি, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে সারা বিশ্বের মানুষ আজ কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত কলির কলুষিত আড্ডা তথা পাপকর্ম—মাছ-মাংস আহার, নেশাদ্রব্যের ব্যবহার, অবৈধ যৌনতা ও তাস-জুয়া খেলা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে পবিত্র জীবন-যাপন করতে শুরু করেছে, এবং শাস্ত্রানুমোদিত সেই হরিনাম সংকীর্তনই জীবনের পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করার যথার্থ উপায় বলে তারা সুদৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে।

প্রশ্ন ৪। একজন বিধর্মী ব্যক্তি হিন্দুধর্ম কিভাবে গ্রহণ করতে পারে? জন্মগত ধর্ম ত্যাগ করে কি অন্য ধর্ম গ্রহণ করা উচিত? হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান এই তিন ধর্মের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ?

উত্তর ঃ ভগবৎ প্রণীত নিয়মকানুনই ধর্ম। ভগবান স্বয়ং অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তরা জগতে ধর্ম প্রচার করেন। প্রত্যেক ধর্মের মূল কথা ভগবানকে ভালবাসা এবং তাঁর নিয়মকানুন পালন করা। সেই নিয়মের বিরুদ্ধ আচরণকারীকে বিধর্মী বলে। প্রত্যেকের

প্রতি ভগবানের সাধারণ বিধিনিষেধ রয়েছে, যেমন—জীব-হিংসা বা জীবহত্যা না করা, অবৈধ যৌনসঙ্গ না করা, তামসিক দ্রব্য গ্রহণ না করা, অলসমতি হয়ে বৃথা দিন না কাটানো ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান সভ্যতায় মানুষ নির্বিচারে নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করে কেবল জিহ্বার লালসে যাবতীয় মৃতদেহের রক্ত-মাংস-হাড়-পিত্ত ভক্ষণ করছে। এইভাবে সমস্ত ভগবদ্‌বিধি প্রায় মানুষই লঙ্ঘন করে চলেছে। সেক্ষেত্রে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রিস্টান, প্রত্যেকেই বিধর্মী বলে বিবেচিত।

'হিন্দুধর্ম' বলে কোন প্রকার ধর্মের কথা কোনও বৈদিক শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিস্টান—এইগুলি কোনও সনাতন (eternal) দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ধর্ম বলেই মনে করেন না। মহাবিশ্বের পরম নিয়ন্তা মাত্র একজন। তাঁকে কেউ 'ঈশ্বর', কেউ 'আল্লা' কিংবা 'গড'—বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না যে, ভগবান কে, তাঁকে দেখতে কেমন, তিনি কোথায় থাকেন? তাঁরা কেউ বলেন—তিনি শূন্য বা নিরাকার, কেউ বলেন—তিনি আমিই। আমি ভগবান, জীব ভগবান, সবাই ভগবান—এইভাবে উজবুকের মতো কত রকমের উদ্ভট মন্তব্য অনেকে করে বসেন। এগুলি ধর্মের নামে প্রতারণা।

বৈদিক শাস্ত্রসমূহে অসংখ্য উল্লেখ রয়েছে যে, পরম নিয়ন্তা হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত দেবদেবী সমস্ত প্রাণী তাঁর অধীন দাস মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ, আল্লা, কিংবা গড—একই পরম পুরুষ। তাঁকে ভগবানরূপে ভজনাই প্রত্যেকের ধর্ম। সমস্ত দেবদেবী, ব্রহ্মা, শিব পর্যন্ত প্রত্যেকেই ভগবানের আরাধনা করছেন। অথচ তথাকথিত হিন্দু নামক ব্যক্তিরা নিজেদের ভোগতৃপ্তির উদ্দেশ্যে খেয়াল-খুশি মতো নানা দেবদেবীর উপাসনা করছেন এবং তাঁরা মন্তব্য করে বসেছেন যে, পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য দেবদেবী—শিব, দুর্গা, কালীও সব এক।

এই রকম ধর্মধ্বজীরা 'পাষণ্ডী' বলে শাস্ত্রে অভিহিত। বৈদিক শাস্ত্রে ৩৩ কোটি দেবদেবীকে একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ৩৩ কোটি দেবতা শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই ভগবান, দেবতারা ভগবান নন। আল্লা এবং গড শব্দে ৩৩ কোটি দেবতাকে বোঝানো হয় না, ভগবানকেই বোঝানো হয়।

প্রকৃতপক্ষে পরম স্রষ্টার সৃষ্ট জীব হয়ে আমাদের কর্তব্য হল সেই পরমেশ্বরের নির্দেশের অনুকূলে জীবন যাপন করা। সমগ্র বৈদিক গ্রন্থসম্ভারে এটিই নির্দেশিত হয়েছে যে, আমরা সেই সৎ, চিৎ ও আনন্দময় পরমেশ্বরের অংশ-স্বরূপ চিরন্তন আত্মা। তাঁর কোনও জাতপাত নেই, আমাদেরও কোন জাতপাত নেই। আমাদের এই ক্ষণিক জীবনের পর যখন কর্মবাসনানুসারে হয়তো একটি আরশোলা বা ব্যাঙ-শরীর ধারণ করব, তখন সেই জীবনে কোনও অহঙ্কারের মর্যাদা থাকে না। তেমনি নিয়তির অধীনস্থ হয়ে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান—নানা উপাধি ধারণ করে জাতপাতের অহঙ্কার করা অতি গণ্ডমূর্খ ব্যক্তির উৎপাত মাত্র। এই জন্মে যে হিন্দু, পরজন্মে সে মুসলমান হতে পারে, মুসলমানও পরজন্মে হিন্দু হতে পারে।

কোনও শাস্ত্রে মানব সমাজকে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান—এইভাবে বিভাগ করা হয়নি। এই সবই কতকগুলি স্বার্থপর ধর্মধ্বজীদের ব্যবস্থাপনা। মানুষ এগুলির মধ্যে যে কোনও উপাধিযুক্ত হোক, যদি সে ভগবানের প্রতি অকৃত্রিম অকপট প্রীতিযুক্ত না হয়, তবে সেই কলুষিত জীবন অনর্থক এবং জগতে উৎপাত সৃষ্টিকারী ও অকল্যাণকর।

অনেক ধর্মান্ধ মূঢ় ব্যক্তি নিজেদের হিন্দু, মুসলিম বা খ্রিস্টান বলে মনে করে বসে। যদিও-বা সেই বংশগত রোগটার জন্য তাদের কাউকে দোষী করা যায় না। যেমন ছোটবেলা থেকে যদি কেউ বিড়ি খেতে শুরু করে এবং একজন বড় বিড়িখোর হয়ে বসে, তখন তাকে সেই বদ্ অভ্যাস ছাড়ানোর কথা বললে তার নেশা তো সে ছাড়বে না, বরং সে নানারকম বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকবে। সেইরকম জন্মগত জাতপাতের অহঙ্কার নিয়ে যাদের জীবন বহুদূর অধঃপাতের দিকে গড়িয়ে গেছে, তাদের 'হিন্দু' 'মুসলিম' 'খ্রিস্টান' স্ট্যাম্পগুলো বাদ দিয়ে একমাত্র ভগবানের ভজনা করার কথা বললে তারা প্রচণ্ডভাবে অনর্থক বিক্ষুব্ধ হবেন। কারণ, জন্মগত জাতপাতটা হচ্ছে অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিদেরই সৃষ্টি।

প্রতিটি জীবেরই নিত্য ধর্ম রয়েছে এবং তা জন্ম নিরপেক্ষ। এই ধর্মের দেশে বহু প্রাচীন রাজর্ষি ও মহা মহা মুনিঋষিরা তাঁদের বাণীতে, তাঁদের আচার আচরণে একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়ার কথা নির্দেশ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও একই নির্দেশ করেছেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের জন্য।

বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হল *কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।* শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের আদেশের সঙ্গে কোরান বা বাইবেলের মূল শিক্ষার কোন বিরোধ নেই। বরং বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা অনেক ব্যাপক এবং গভীর। তাই ভক্তিভরে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর সেবা করাই জগতের সকল দেশের সকল জাতির সকল যুগের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম।

প্রশ্ন ৫। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ কর্মীরা সাধারণতঃ দেবদেবীদের কৃপা অন্বেষণ করে। আপন ইন্দ্রিয় সুখভোগই তাদের একমাত্র চেষ্টা। জ্ঞানীরা ভগবানের ব্রহ্মজ্যোতির সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। তারা জড় জগতে সব কিছু অনিত্য জেনে মুক্তির জন্য পরমতত্ত্বের সাথে মিশে যাওয়ার চিন্তা করে। যোগীরা কেবল পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানের আংশিক দর্শন করেই সন্তুষ্ট হন, এবং চরমে তাঁরা তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান। কিন্তু ভক্তেরা কেবল ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত হয়ে তাঁর সেবা করতে চান। (ভাঃ ৩/১৬/১৯ প্রভুপাদ তাৎপর্য)

প্রশ্ন ৬। জগতে যদি কোনও ব্যক্তি কোনও প্রকারে কৃষ্ণভক্তি না করে, অথচ সেই ব্যক্তি দান, পুণ্যকর্ম, তীর্থভ্রমণ করে, তবে তার সদ্‌গতি আছে কি না?

উত্তর ঃ শ্রীব্রহ্মা তাঁর পুত্র সনৎকুমারকে শিক্ষা দিচ্ছেন—

শ্রীকৃষ্ণবিমুখং মূঢ়ং দ্বিজমেব নরাধমম্ ।
তীর্থং দানং তপঃ পুণ্যং ব্রতং নৈব পুনাতি তম্ ॥

অর্থাৎ, "ব্রাহ্মণ হলেও যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ, সেই মূঢ় নরাধম তীর্থপর্যটন, দান, তপস্যা, পুণ্য কর্ম, ব্রত পালন করে কখনই পবিত্র হতে পারে না।" (নারদপঞ্চরাত্র ২/১/৬০) সুতরাং তার সদ্‌গতি নেই। জড় জাগতিক সুখ-সুবিধা লাভের অধিকারী হবে মাত্র।

প্রশ্ন ৭। ভারতের সংবিধান ভারতবাসীদের মেনে চলতে হবে, তেমনই এমন একটি কোন্ শাস্ত্রে আছে যে, বিশ্ববাসী সকল মানুষকে মেনে চলতে হবে?

উত্তর ঃ *একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্*
একো দেবো দেবকীপুত্র এব ।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥

"সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য একক শাস্ত্র—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। *একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীতম্।* সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের একক ভগবান—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। *একো দেবো দেবকীপুত্র এব।* সকল মানুষের একক মন্ত্র—ভগবানের নাম সংকীর্তন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

একো মন্ত্রঃ তস্য নামানি। সমস্ত মানুষের একটাই বৃত্তি হোক—পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। *কর্ম অপি একং তস্য দেবস্য সেবা।"* (গীতামাহাত্ম্য ৭)

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা *ভারতামৃত-সর্বস্বং*—মহাভারতের অমৃত রস। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা *সর্বোপনিষদঃ*—সমস্ত উপনিষদের সারাৎসার। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি শ্রীব্যাসদেব নির্দেশ দিয়েছেন—

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্ববেদময়ী যতঃ ।
সর্বধর্মময়ী যস্মাত্তস্মাদেতাং সমভ্যসেৎ ॥

"গীতা সাক্ষাৎ পদ্মনাভ শ্রীহরির মুখপদ্ম থেকে নিঃসৃত, তা সম্যকরূপে অধ্যয়ন করা কর্তব্য। অপরাপর নানা শাস্ত্রের কি প্রয়োজন? গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, সর্ববেদময়ী ও সর্বধর্মময়ী। সুতরাং, গীতা অভ্যাস করা উচিত।" (স্কন্দপুরাণ) ভগবদ্‌গীতা যথাযথ পাঠ করলেই মানুষ সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারবে।

প্রশ্ন ৮। অন্য কোনও গুরুর মন্ত্রে দীক্ষিত ভক্ত কি কৃষ্ণভক্ত নন?

উত্তর ঃ পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞানহীন এরূপ গুরুর দেওয়া মন্ত্রে দীক্ষিত হলে কেউ কৃষ্ণভক্ত পদবাচ্য হয় না।

প্রশ্ন ৯। ভগবান কি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন?

উত্তর ঃ ভগবানের শ্রীমুখের অমৃতময় কথাগুলি সর্বমানবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়। তাতে ভগবান সরাসরি আমাদের বলছেন কিভাবে আমরা এই দুঃখময় জগৎ অতিক্রম করে আমাদের আপন আলয়ে আনন্দময় ধামে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারব।

তা ছাড়া পরমাত্মারূপে সবার হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান আমাদের আন্তরিকতা অনুসারে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। শ্রীগুরুরূপে, প্রতিনিধিরূপে, বন্ধুরূপে কথা বলেন, সদ্‌ উপদেশ দেন।

প্রশ্ন ১০। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছেন (৩/৩৫) নিজের ধর্মে কিছু ত্রুটি থাকলেও ভিন্ন ধর্মে যাওয়া উচিত নয়। অথচ আমরা নিজের থেকে অন্যের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়ি। বাইরের মোহে আমরা ছুটে যাচ্ছি। আবার বিদেশীরা ভারতের সনাতন ধর্মে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এমনটি হওয়ার কারণ কি?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্বধর্ম বলতে তাঁর ক্ষত্রিয় ধর্ম বীরের মতো যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেনাপতি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ থেকে বিরতি বা পলায়নপর ধর্মটি বীর যোদ্ধার ধর্ম নয়, সেটি কাপুরুষের ধর্ম। কাপুরুষের যেটি আচরণ, একজন ক্ষত্রিয় বীরের সেরূপ আচরণ করা উচিত নয়। অস্ত্রশস্ত্র ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে বিরাট ভিক্ষুক বৈরাগী হয়ে যাওয়া কোন বীর যোদ্ধার পক্ষে কর্তব্য নয়, তা নিন্দনীয়। বরং যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ শ্রেয়।

আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা জন্মগত সূত্রে সেই বর্ণে পরিচিত হলেও কর্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের আপন আপন ধর্ম তারা পালন করে না। ব্রাহ্মণ শূদ্র-জাতির মতো খাদ্যরূপে মাছ মাংস নেশা জাতীয় দ্রব্য আহরণ করছে। কলিযুগে প্রায় সর্বশ্রেণীর লোকেরাই শূদ্রভাবাপন্ন। শূদ্রদের ধর্মই হল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শ্রেণীর লোকদের সেবা করা। কিন্তু সবাই যদি শূদ্র হয় তাহলে কে কার সেবা করবে। তাই ভগবান ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়ে মানব-সমাজকে শিক্ষা দিলেন সবাইকে কৃষ্ণভজন করতে হবে। কে কোন্ জাত, কোন্ উপাধি, কোন্ শ্রেণীর সে সব মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেবল কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করলে তবে জীবের মঙ্গল হবে, অন্যথায় মনুষ্য জন্ম অধঃপাতে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই কথা বলেছেন। *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।* 'সব রকমের উপাধিমূলক ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও।' আর সেই কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে জীবের সনাতন ধর্ম। তা আমরা বৈদিক শাস্ত্র থেকে ভুরি ভুরি সেই সিদ্ধান্ত পেতে পারি। সেই সনাতন ধর্ম এই ভারতবর্ষ নামে ভূলোকের ধর্ম। বর্তমানের মতো ভারত বলতে একটি অতি ক্ষুদ্র দেশকে বোঝাতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সনাতন ধর্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মনুষ্যদের জন্য নির্ধারিত। এটি কোন স্বদেশী বা বিদেশী ধর্ম বোঝায় না। এককালে হয়ত আমরাই বিদেশী ছিলাম। কৃষ্ণভক্তি কোনও জাতি ধর্ম দেশ কাল উপাধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

ভারতীয়রা পাশ্চাত্য দেশের জড় ভোগের প্রতি আগ্রহী। আর বিদেশীরা ভারতের সাধনার প্রতি আগ্রহী। কারণ তাদের ভোগ জীবনটাই হতাশাকর ও বিরক্তিকর বলে ধারণা জন্মেছে।

আমাদের অনেক তথাকথিত পণ্ডিত বলে থাকেন যে, আগে তাদের মতো ভোগ হোক, তারপর যখন জীবনটা বিকল বিতৃষ্ণ হয়ে যাবে তখন হরিভজন করলে ঠিক হবে। তারা বলেন, ভোগ জিনিসটা সম্পর্কে পুরোপুরি না জেনে কৃষ্ণভজন করে কোন আনন্দ পাওয়া যায় না। ভোগ করে আনন্দস্ফূর্তি করতে করতে যখন রক্তের তেজ কমে যাবে, যৌন উত্তেজনা ক্লান্ত হয়ে পড়বে, গৃহস্থালীর লোকেরা যখন অবহেলা অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখতে অভ্যস্ত হবে তখন লাঠি-নেংটি নিয়ে ত্যাগব্রত ধারণ করে বুড়া-কালে যমদুয়ারে যাওয়ার পূর্বে, আড়ষ্ট মুখে, ছানি পড়া চোখে, অসাড় হাত-পা নিয়ে, নাকি হরিভজন ভালো জমবে।

সর্বাধিক শতবর্ষ আয়ুষ্কালের মধ্যে জীবনটা ভোগ-উন্মুখ ভাবধারায় নষ্ট না করে ছোটবেলা থেকে হরিভজন করে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার পন্থা বৈদিক যুগ থেকে মানুষ অনুশীলন করে আসছে। কেবল কলিযুগে মানুষ পশুর ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছে। দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম পেয়ে পশুর মতো আহার নিদ্রা নিরাপত্তা মৈথুনাসক্তিময় জীবন-যাপন করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ১১। জগতে ধর্ম বহু প্রকারের কেন? মানুষের ধর্ম তো এক হওয়ার কথা।

উত্তর ঃ শুদ্ধ অবস্থায় ধর্ম এক। জড়বদ্ধ হয়ে জীবের ধর্ম প্রথমে দুই প্রকার হয়েছে। উপাধি যুক্ত এবং উপাধি মুক্ত ধর্ম। উপাধি মুক্ত ধর্ম কখনও দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন রকমের হয় না। উপাধি যুক্ত ধর্ম মানুষের বিভিন্ন গুণের পার্থক্য অনুসারে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সহজেই পৃথক পৃথক হয়ে যায়। উপাধি থেকে যত পরিষ্কার বা মুক্ত হওয়া যায় ততই শুদ্ধ নিত্য ধর্মে বা উপাধি মুক্ত অবস্থায় আসা যায়। উপাধি মুক্ত ধর্মই জীবের নিত্য সনাতন ধর্ম। জীব শ্রীকৃষ্ণের দাস। শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব সেবা-আনুকূল্যে জীবন পরিচালনা করাটাই ধর্ম। সমগ্র প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রে তাই-ই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

জনসমাজে চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমে প্রত্যেকেরই কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণভজন করা। শুধু তাই নয়, পতিত অধম হেয় জনও কৃষ্ণভজন করে যথার্থ জীবনে উন্নীত হতে পারে। কৃষ্ণভজনে জাতি-কুলাদির বিচার হয় না। কেবল কৃষ্ণভজনের আনুকূল্যে থাকতে বলা হয়েছে। জাত-কুলের বিচার নেই বলতে এমন নয় যে, সরাসরি মন্দিরে উঠেই বিগ্রহ অর্চনায় লাফিয়ে পড়া যাবে। তা নয়, ভজন-অনুকূল পন্থা অনুশীলনের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

উপাধি যুক্ত ধর্ম বলতে বোঝায়, যে ব্যক্তি যে বর্ণের ও আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত তাকে সেই সেই বর্ণ-আশ্রমের নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। অবশ্য বর্তমান অধঃপতিত সভ্যতায় যে উপাধি যুক্ত ধর্ম তা হলো জন্মগত বিচার। কতকগুলো লোক হিন্দু, কতকগুলো মুসলিম কিংবা খ্রিস্টান ইত্যাদি। কোন জীবাত্মা হিন্দুর ঘরে জন্মালে সে হিন্দু, আবার জীবাত্মা মুসলিম ঘরে জন্মালে তার পরিচয় হয় সে মুসলমান। আর তারা হিন্দু হোক কিংবা মুসলিম কি খ্রিস্টান যাই হোক না কেন, তারা বিভিন্ন পন্থায় গিয়ে একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ, প্রায় সকলেই তারা ভগবানকে বাদ দিয়ে ভগবানের নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতির উপাসনা করছে। তারা ভগবানের দাসত্ব সেবা করছে না। তারা ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হওয়ার সাযুজ্য মুক্তি কামনা করছে। যা কোন সনাতন ধর্মের সাধক পছন্দই করে না।

আর সেই সমস্ত ব্রহ্মবাদীদের চেয়েও নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা অনর্থক উপাধির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের হিন্দু কিংবা মুসলিম কিংবা ক্রিশ্চান মনে করে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাবার চেষ্টা করছে। যদিও সকল পূর্বসূরীগণ শিখিয়েছেন আমরা জীব হচ্ছি ভগবানের নিত্য সেবক। কিন্তু ভগবৎ সেবা না করে আমরা কেবল আপন ইন্দ্রিয় সুখভোগ সেবায় জীবন অতিবাহিত করছি। আর অন্যদের উদ্বেগের কারণ হচ্ছি। এটি ধর্ম নয়। এটি বদমায়েসী। হরিভজনই একমাত্র ধর্ম। হরিভজনের বিপরীত সমস্ত তথাকথিত 'ধর্মই অধর্ম।'

প্রশ্ন ১২। বহুধর্মপথে কলিজীব উদ্ধার হবে কি না?

উত্তর ঃ পাঁচমিশালী ধর্মপথে কলিজীবের উদ্ধার পাওয়া তো দূরের কথা, বিভ্রান্ত হয়ে জড়জগতেই তারা দুঃখ ভোগ করতে থাকবে। পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ।* তথাকথিত বহু রকমের ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে। মহাজনেরাও একমাত্র কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের নির্দেশ দান করেছেন।

প্রশ্ন ১৩। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মের প্রাধান্য কম কেন?

উত্তর ঃ অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন ভগবান, হিন্দুদেরও একজনই ভগবান। কিন্তু হাজার গণ্ডা দেবদেবীকেও পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করতে গিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। আবার কেউবা জীবকেই ভগবান বলে ব্যাখ্যা করছেন। এইভাবে বৈদিক শাস্ত্র বিরোধী জগাখিচুড়িতে প্রাধান্য থাকবে কেন?

প্রশ্ন ১৪। সনাতন ধর্ম কোন্‌টি?

উত্তর ঃ কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করাই জীবের সনাতন ধর্ম।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যে চ বেদবিদো বিপ্রা যে চাধ্যাত্মবিদো জনাঃ ।
তে বদন্তি মহাত্মানং কৃষ্ণং ধর্মং সনাতনম্ ॥

"যিনি সঠিকভাবে বেদ অধ্যয়ন করেছেন, তিনি প্রকৃত বিপ্র বা বেদজ্ঞ, যিনি আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করাকেই জীবের সনাতন ধর্ম বলে বর্ণনা করেন।" (মহাভারত)

প্রশ্ন ১৫। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন 'ধর্ম হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ অংশের ধারণা।' এটা কতদূর সত্য?

উত্তর ঃ যদি মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ অংশ ধর্মের ধারণা হয় তাহলে আপনার সেই আধুনিক বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্কের বাকি বড় অংশটাই অধর্ম দিয়ে গড়া। সুতরাং, তারা আর বেশিদূর সত্য জানতে পারে না। ধর্ম আধুনিক কোনও কিছু নয়। কিন্তু আপনার বিজ্ঞানীরা আধুনিক।

প্রশ্ন ১৬। গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ সৃষ্টির প্রধান দেবতা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু এবং ধ্বংসকর্তা মহেশ্বর অবশ্যই গুরু। তাঁরা জগতে ধর্ম প্রচার করেন। সনাতনপুরুষ শ্রীবিষ্ণু থেকে যে ধর্ম মানবসমাজে প্রচারিত হয়েছে সেই ধর্মকে বৈষ্ণব-ধর্ম বলে। শ্রীবিষ্ণু সর্বপ্রথমে ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, শিব ও চতুষ্কুমারকে ধর্মজ্ঞান উপদেশ করেন। তাঁরা সেই ধর্মতত্ত্ব যথাক্রমে মধ্বাচার্য, রামানুজাচার্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্কাচার্যের মাধ্যমে বিশ্বে প্রচার করেন। এভাবে তাঁরা সবাই বৈষ্ণব জগতের গুরু।

তাঁদেরই পরম্পরা ধারায় যাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম আচার ও প্রচার করবেন তাঁরাই গুরু হওয়ার উপযুক্ত হবেন। সেক্ষেত্রে গুরুদেব আদিগুরুর প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শিক্ষা বা উপদেশ এবং তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ পরম্পরার গুরুদেবের শিক্ষা বা উপদেশের কোনও পার্থক্য নেই। যে কোনও বদ্ধ জীবের পক্ষে ভগবানের সঙ্গে যোগ-সাধনের পরম উপায় হচ্ছে গুরুপাদপদ্ম, তাই গুরুদেবই সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে নিত্য আরাধ্য। গুরুদেবের কৃপা বলে কেউ ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে। সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, গুরুপরম্পরার ধারায় দিব্যজ্ঞান এই জগতের জীব লাভ করে থাকে। অর্থাৎ, গুরুদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মতোই পূজনীয়, কিন্তু গুরুদেবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা পার্বতীপতি শিব নন।

প্রশ্ন ১৭। বিভিন্ন ধর্মে ধর্মের বিরোধ দূর করা কিভাবে সম্ভব হবে?

উত্তর ঃ ধর্ম দুই রকম—ভগবৎ উন্মুখী ধর্ম আর ভগবৎ বহির্মুখী বা বিপরীতমুখী ধর্ম। এই দুই দলের বিরোধ থাকবে।

ধর্মের উদ্দেশ্য যদি যথার্থভাবে ভগবানকে ভালবাসা হয়, এবং সকলেই নিজেকে ভগবানের বিনীত নিত্যদাস বলে মনে করে ভোগবুদ্ধি পরিহার করে, তা হলে অতিসহজেই ধর্মের বিরোধ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ১৮। নানা মুনির নানা মত। তা হলে ধর্ম-অধর্ম কিভাবে নির্ণেয়?

উত্তর ঃ সব মুনিকে বাদ দিলে সর্বজনের প্রিয় মুনি হচ্ছেন শ্রীনারদমুনি। তিনি সদা আনন্দিত, সর্বদাই কৃষ্ণনাম করে চলেন। তিনি মানব সমাজের মঙ্গলের জন্যই

তাঁর প্রিয় শিষ্য ব্যাসদেবকে অমলপুরাণ ভাগবত রচনা করতে নির্দেশ দেন। ভাগবতে ধর্মরাজ যম ঠাকুরের উক্তি হল এই যে, দ্বাদশ মহাজনই মূল ধর্মতত্ত্বজ্ঞ। তাঁদের মতটাই ধর্মমত। তাঁরা যা নির্দেশ দেবেন সেই মতো চলাটাই যথার্থ ধর্ম। তাঁরা হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, শিবঠাকুর, দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মাপুত্র চতুষ্কুমার, দেবহূতিপুত্র কপিল, মহর্ষি মনু, প্রহ্লাদ, রাজর্ষি জনক, গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম, দৈত্যরাজ বলী, শুকদেব গোস্বামী এবং ধর্মরাজ যম। (ভাগবত ৬/৩/২০) তাঁরা সকলে কৃষ্ণভক্তি করতেই নির্দেশ দিয়েছেন। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যা তাই-ই অধর্ম।

প্রশ্ন ১৯। ব্রহ্মের ধ্যান করা সনাতন ধর্ম কিনা?

উত্তর ঃ অনেকেই বলে যে, ভগবান নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম। তাই তারা সেই নিরাকার জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করে, সেটি গীতা-ভাগবত নির্দিষ্ট সনাতন ধর্মের আদৌ অনুশীলন নয়। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি নিরাকার বা নির্বিশেষ নন। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অর্থাৎ, তাঁর নিত্য সনাতন চিন্ময় আনন্দময় আকার বৈশিষ্ট্য রয়েছেই। আর, সনাতন ধর্ম হচ্ছে সেই সনাতন পুরুষের প্রীতিসেবায় যুক্ত হওয়া। শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই জীবের সনাতন ধর্ম। নিরাকার নির্বিশেষ শূন্যের ধ্যান করা জীবের সনাতন ধর্ম নয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিচ্ছেন, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। গীতা-ভাগবত প্রমুখ শাস্ত্রের সার কথা হচ্ছে কৃষ্ণসেবা করা। কৃষ্ণচেতনায় থাকা। ব্রহ্মের ধ্যানের কথা বলা হচ্ছে না।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ 'মুনিগণের মতিভ্রম' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, এই জড়জগতে মহাপাপীরা যেরকম জড় স্থূল শরীর না পেয়ে সূক্ষ্ম শরীরে ভূত-প্রেত হয়ে অন্তরীক্ষে ঘুরে বেড়ায়, সেই রকম চিন্ময় আকাশে নিরাকার ব্রহ্মবাদীরা ভগবানের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা মুক্ত প্রায় হয়ে পুনরায় এই মায়িক জড়জগতে পতিত হয়। সুতরাং নিরাকারনির্বিশেষ বাদীদের এই ধরনের ক্লেশ-সাধনা সনাতন ধর্ম নয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।* যাদের মন সেই অব্যক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত, তাদের পক্ষে পারমার্থিক লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর। *অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।* সেই অব্যক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে, ধ্যান করার ফলে কি লাভ হয়? লাভ হয় *হি গতির্দুঃখং।* দুঃখময় গতিই লাভ হয়।

বদ্ধ জীবের পক্ষে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সর্ব অবস্থাতেই ক্লেশদায়ক। অনুশীলনও ক্লেশদায়ক এবং তার উপলব্ধিও ক্লেশদায়ক, এবং আমাদের চিন্ময় সত্তার আনন্দময় প্রবৃত্তির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ এই পন্থা নিষেধ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিময় সেবায় যুক্ত থাকাই জীবের সনাতন ধর্ম। ব্রহ্মের ধ্যান ভক্তিবিরোধী শুষ্ক জ্ঞানীদের ধর্ম।

প্রশ্ন ২০। বৈষ্ণব ধর্ম থেকে জগতের সমস্ত ধর্মমতের উৎপত্তি হয়েছে বা হবে। এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর ঃ বৈষ্ণবধর্ম হচ্ছে ভাগবতধর্ম, সনাতনধর্ম। জগতে নানা লোকে নানা মতাবলম্বী থাকতেই পারেন কিন্তু ভাগবতধর্ম বিরোধী মতগুলিকে ধর্ম নামে জগতে প্রচারিত হচ্ছে। সেগুলি নিশ্চয়ই বৈষ্ণব ধর্ম থেকে উৎপত্তি নয়। ভাগবত ধর্ম বিরোধী সমস্ত মত-পথগুলি সমগ্র মানব সমাজের উৎপাত মাত্র।

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে ।
ভাগবতে কহে, তাহা পরিপূর্ণ ছলে ॥

যাঁরা ভাগবতধর্ম বুঝেছেন তাঁরা জানতে পারবেন যে, *ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতব অত্র*— এই জগতে হাবিজাবি মনগড়া মতগুলিকেও ধর্ম নামে প্রচার করে লোক প্রতারণা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২১। ধর্ম কয় প্রকার ও কি কি? কোন্ ধর্ম শ্রেষ্ঠ?

উত্তর ঃ ধর্ম দুই প্রকার। নিত্য বা সনাতন ধর্ম এবং নৈমিত্তিক বা অনিত্য ধর্ম। কৃষ্ণদাসত্ব বা কৃষ্ণভক্তিসেবাই জীবের নিত্যধর্ম বা সনাতন ধর্ম। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। আর, এই জড় জগতে জাতি বা কুলধর্ম, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম—সেগুলি পালন করে চলাই জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন, কেউ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র কিংবা ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী হতেই পারে, সেগুলি তার অনিত্য পরিচয় মাত্র। তার নিত্য স্বরূপ পরিচয়টি হচ্ছে সে শ্রীকৃষ্ণের দাস। সুতরাং কৃষ্ণভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

প্রশ্ন ২২। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, সর্বকারণের পরম কারণ। তা হলে তিনি কেন বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করেছেন। সবাই কেন এক ধর্ম মানবে না?

উত্তর ঃ ভক্তি সহকারে ভগবৎ সেবা করাই ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব লাভই জীবের স্বরূপগত ধর্ম। কিন্তু কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু বাসনা মনের মধ্যে পোষণ করার ফলে আমরা এই জড় জগতে পতিত হয়েছি।

কৃষ্ণ ভুলি যে-ই জীব অনাদি বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥

প্রথমতঃ কৃষ্ণকে ভুলে গিয়েই, আমার স্বরূপগত ধর্ম বাদ দিয়েই আমরা এই দুঃখময় সংসারে জন্ম পেয়েছি। এখানে দুঃখ পাচ্ছি। দুঃখ নিবৃত্তির জন্য আমরা নানারকমের প্রয়াস করছি। কিন্তু গোড়ায় গলদটি হল কৃষ্ণ বিস্মৃতি। তার ফলেই আমরা এই ধর্ম, সেই ধর্ম, অমুক ধর্ম, তমুক ধর্ম করেই দুঃখ মুক্তির চেষ্টা করছি।

পৃথিবীতে যত কিছু 'ধর্ম' নামে চলে ।
ভাগবতে কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে ॥

আমরা মায়ার জগতে মায়ার—স্বত্ব, রজ ও তমোগুণে আবদ্ধ জীব। নিজেদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা গুণ অনুসারে আচরণ করে থাকি। আর সেটাকেই আমরা মনে করি ধর্ম। তিন গুণের উর্ধ্বে যেতে পারলে তবেই তো শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হবে। সেই

জন্যে কৃষ্ণের নির্দেশ হল—*নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।* হে অর্জুন, তুমি ত্রিগুণ থেকে মুক্ত হয়ে আমার নির্দেশে জীবন যাপন কর। কিন্তু যতদিন আমরা গুণ ধরেই যা কিছু করব, তাতে দেখতে পাব নানা মুনির নানা মত, নানাবিধ ধর্ম আর বিভ্রান্তি। ভগবদ্ধামে বৈকুণ্ঠ জগতে সবাই ভগবদ্-উন্মুখ জীব, তাদের কোনও বিভ্রান্তি নেই। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে একবার সেখানে উন্নীত হতে পারলেই সর্ব সমস্যার চির সমাধান হয়।

প্রশ্ন ২৩। কোনও কোনও স্থানে নামযজ্ঞ হওয়ার পর বৈষ্ণবেরা কেন আনন্দবাজারে প্রসাদ গ্রহণ করেন না? তাতে কোনও দোষ হয় কি?

উত্তর ঃ যারা তিলক পরে, হরিনাম করে অথচ মাছ মাংস বিড়ি তামাক সেবন করে, তাতে প্রমাণ হয় যে তারা শুদ্ধ আচারে অভ্যস্ত নয়। নিয়মিত প্রসাদভোজী না হওয়ার দরুন তারা সদাচারী নয়। সহজিয়া অপধর্মের সংস্পর্শে কনিষ্ঠ ভক্তদের মতিও কলুষিত হয়ে যায়। সেজন্য সেই বাজারের আনন্দ তারা পেতে চায় না।

প্রশ্ন ২৪। 'জীবে দয়া পরম ধর্ম' বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ বদ্ধ জীবদের প্রতি তিন প্রকারের দয়া করার কথা বলা হয়েছে। দেহ সম্বন্ধীয় দয়া, মন সম্বন্ধীয় দয়া এবং আত্মা সম্বন্ধীয় দয়া। স্থূল দেহ সম্বন্ধীয় দয়া বলতে বোঝায়—ক্ষুধার্ত জীবকে খাদ্য দান, পীড়িত জীবকে ঔষধ দান, তৃষ্ণার্ত জীবকে জল দান, শীত পীড়িত জীবকে আচ্ছাদন দান ইত্যাদি। মন সম্বন্ধীয় দয়া বলতে বোঝায়—বিদ্যা দান, বুদ্ধি দান ইত্যাদি।

আত্মা সম্বন্ধীয় দয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ। জীবদেরকে কৃষ্ণভক্তি দিয়ে সংসারক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্য যত্ন নেওয়াই জীবাত্মার প্রতি মহান দয়া।

কর্মকাণ্ডীয় ব্যক্তিরা জীবের নিত্যমঙ্গল সম্বন্ধে ততদূর অন্বেষণ করেন না, তাই তারা দেহ সম্বন্ধিনী দয়াকেই বড়ই শুভ বলে মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্যক্তিরা মন—সম্বন্ধিনী দয়াকেই অধিক আদর করেন। শুদ্ধ ভক্তরা ভক্তির প্রচার দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল সাধনের জন্য যত্ন করেন। দুঃখময় জড় জগৎ থেকে সচ্চিদানন্দময় পরম ধামে পৌঁছবার সুযোগ করে দেওয়াই জীবের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া।

প্রশ্ন ২৫। বৈষ্ণব ধর্মের মূলে চারটি বিধি-নিষেধ রয়েছে। যারা তা আচরণ করে না অথচ গুরু সেজে বৈষ্ণব বলে পরিচয় দেয়, তারা কোন্ ধরনের বৈষ্ণব?

উত্তর ঃ বৈষ্ণব মানেই ভগবানের ভক্ত। ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ মাছ-মাংস আহার, অবৈধ যৌনবাসনা, বিড়ি-মদের নেশা, তাস-জুয়া খেলা, তা ছাড়া আড্ডা-প্রজল্প ইত্যাদি তিনি অবশ্যই পরিত্যাগ করেন। কারণ এসবই দেহ ও মনের উত্তেজনা ও মোহসৃষ্টিকারী। এগুলি মনকে জড়জাগতিক দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে। ফলে জড়জাগতিক আসক্তি বশত জড় জগতেই তাকে দুঃখ ভোগ করার জন্য জন্ম-জন্মান্তর ঘুরতে হয়। তার কপট ভক্তি নিষ্ফল।

উদাহরণস্বরূপ, ধানক্ষেতে দেখা যায় ধানগাছও আছে, আবার শ্যামাঘাসও আছে, সবগুলিকে ধানগাছ বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু কৃষক যদি প্রতারিত হতে না চান, তবে সতর্কতার সঙ্গে ধানগাছ ও শ্যামাঘাসের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে শ্যামাঘাসকে তৎক্ষণাৎ উপড়ে ফেলেন। কোন কোন অনভিজ্ঞ চাষী অনেক সময় মাঠে নিড়ুনি দেওয়ার সময় সবুজ শ্যামল উজ্জ্বল শ্যামাঘাসগুলিকে ভাল ধানচারা মনে করে যত্ন করে রেখে দেয়, আর অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল ধানগাছকে উপড়ে বাদ দিয়ে দেয়। পরিণামে ফসলহীন গাছ দেখে অনভিজ্ঞ চাষী দুঃখ ও হতাশাগ্রস্ত হয়। কারণ শ্যামাগাছ থেকে কখনো ধান ফলে না। ঠিক সেইরূপ ভক্তিচর্চা না করে নিজেকে খাঁটি বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিয়ে গুরুগিরি যারা করে, তারা সেই শ্যামাঘাসের মতো। তাই যারা বৈষ্ণব-বিধিনিষেধ মানে না, তাদের সঙ্গ একেবারেই বর্জন করতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম-
ব্যাখ্যা-রহো জপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্ ॥

(ভাগবত ৭/৯/৪৬)

অর্থাৎ, মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম (বর্ণাশ্রম ধর্ম), শাস্ত্র ব্যাখ্যা, নির্জন বাস, জপ এবং সমাধি—এই দশটি অপবর্গ, বা মুক্তিলাভের হেতু বলে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় গো-দাসেরা অর্থাৎ যারা জড়জাগতিক ভোগ-আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ—তারা উল্লিখিত অপবর্গের এই দশটি পন্থাকে নিজেদের ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের জন্য একটি উপায় হিসাবে গ্রহণ করে। যাঁরা নিজ ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্য কর্ম করেন না, সেই সব গোস্বামীরা সেক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্যই উপরোক্ত বিষয়গুলির অনুষ্ঠান করেন। সেক্ষেত্রে গোদাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগলিপ্সু দাম্ভিকেরা দেহসম্পর্কীয় স্ত্রী-পুত্রের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যই সেগুলির অপপ্রয়োগ করে। তাই বিধিবিচারহীন বৈষ্ণব নামধারী গো-দাসদের সংস্পর্শে থাকা উচিত নয়।

প্রশ্ন ২৬। ধর্ম কি? তার উদ্দেশ্য কি? শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন?

উত্তর ঃ *'ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবদ্ প্রণীতম্।'* (ভাঃ ৬/৩/১৯)। ধর্ম হল স্বয়ং ভগবানের প্রণীত আইন। সেই আইন অনুসারে মানুষের চলা উচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল ধর্মের প্রাথমিক শাস্ত্র, যাতে ভগবান সরাসরি উপদেশ দান করেছেন। ধর্ম এই জগতে সঞ্চালিত হচ্ছে শ্রীগুরুশিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে। *'এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।'* (গীঃ ৪/২)। এইভাবে পরম্পরার মাধ্যমে এই পরমবিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩৪৮/৫১-৫২) বলা হয়েছে—ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে ভগবান বিবস্বান মনুকে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান দান করেন। মানবজাতির পিতা মনু এই জ্ঞান সারা পৃথিবীর অধীশ্বর ও রঘুবংশের জনক ইক্ষ্বাকুকে দান করেন। এই রঘুবংশে শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন। সুতরাং, ভগবদ্গীতা মহারাজ ইক্ষ্বাকুর সময় থেকে

মানবসমাজে বর্তমান। গণনাসূত্রে জানা যায়, বারো কোটি চার লক্ষ বছর আগে গীতা-জ্ঞান মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান পুনরায় সেই একই তত্ত্বজ্ঞান দান করেন। ভগবানই ধর্মের সৃষ্টিকর্তা। গীতার চূড়ান্ত কথা হল *'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'* (১৮/৬৬) সব রকমের ছলধর্ম বাদ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিতে হবে। *'মন্মনা ভব'* (১৮/৬৫) কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ত্রিকালজয়ী সর্বজন-বরণীয় ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বপ্রথমেই বলা হয়েছে—*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।'* বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করাই সকল ধর্মের সার।

সর্বধর্মসার ধর্ম মহাভাগবতে।
ব্যাসমুনি কহিলা চিন্তিয়া লোকহিতে ॥
শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণের সার।
বেদব্যাস বিচারিয়া করিলা উদ্ধার ॥
সকল ধর্মের সার কৃষ্ণ-আরাধন।
মহাভাগবত বলি, এই সে কারণ ॥
কহিতে লাগিলা সূত সর্বধর্মসার।
যাহা হৈতে হৈব সর্বজীবের নিস্তার ॥
সেই সে পরম ধর্ম সর্ব বেদে কহে।
যাহা হৈতে হরির চরণে ভক্তি রহে ॥

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ২ ও ৩ অধ্যায় থেকে)

নৈমিষারণ্যের মহান ঋষিবৃন্দ পরমভাগবত ব্যাসপুত্র শ্রীসূত গোস্বামীকে প্রশ্ন করেন, "এই কলিযুগের মানুষ সকলেই অল্প আয়ু, কলহপ্রিয়, মন্দগতি, ভাগ্যহীন, অলস এবং নিরন্তর নানা রোগে উপদ্রুত। বহুবিধ ধর্ম শাস্ত্রের বহু বহু রকমের কর্তব্যকর্মের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু কলির অধঃপতিত মানুষ সেইসব সহজে বুঝে উঠতে পারবে না। তাই সমস্ত শাস্ত্রের মূল কথা বিশ্লেষণ করে শোনান, যাতে আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে সুপ্রসন্ন হয়।" (ভাঃ ১/১/১০-১৩)

উত্তরে শ্রীসূত গোস্বামী বলেন, "সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত এই পার্থিব জ্ঞানের অতীত পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। এই ভক্তিবলে মানুষের সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে। ভক্তিসহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলেই অচিরে শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়জাগতিক সমস্ত বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে। মানুষ যে বর্ণের হোক, যে জাতির হোক, যে আশ্রমের হোক—তার যাবতীয় স্বধর্ম অনুষ্ঠান করেও যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণকীর্তনে আসক্তি না উদয় হয়, তবে সমস্ত আয়োজন বৃথা শ্রমমাত্র।" (ভাঃ ১/২/৬-৮)

"কামনাবাসনা চরিতার্থ করাটা কখনই জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। সুস্থ জীবন যাপন করে আত্মাকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ রাখার বাসনাই করা উচিত। কারণ মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান করা। এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করা উচিত নয়।" (ভাঃ ১/২/১০)

"সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্" অর্থাৎ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধান করাই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য।

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরা ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেব পরং জ্ঞানং বাসুদেব পরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥

"বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞানের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতিবিধান, সমস্ত যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা, সমস্ত সকাম কর্মের চরম ফল তিনিই দান করেন, পরম জ্ঞান ও তপস্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা এবং তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য। তিনিই হচ্ছেন জীবনের পরম গতি পরম উদ্দেশ্য।" (ভাঃ ১/২/২৮-২৯)

সনাতন ধর্ম বা ভাগবত ধর্ম হল সচ্চিদানন্দময় ভগবানের নিত্য সেবায় যুক্ত থাকা। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-সহ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ-পূর্ণ জড় জগতে ভবরোগীর মতো না পড়ে থেকে আপন সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণভক্তিময় সত্তার অনুসন্ধান করা। ভবরোগের নিরাময় করাই দুর্লভ মানবজীবনের লক্ষ্য।

ভগবদ্ প্রীতি ভগবদ্ সেবা বাদ দিয়ে জীবনের নিয়মনীতি ধর্মকর্ম, অর্থ উপার্জন, কামনাবাসনা চরিতার্থ ও শেষে সংসারমুক্তির কথা আমরা চিন্তা করতে থাকি। কিন্তু এ সমস্তই প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। কৃষ্ণভক্তিছাড়া ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ হচ্ছে ছল বা কৈতব বা প্রতারণার এক ভয়ংকর পন্থা। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১/৯০)

অথচ এই কপটধর্মটাই অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত জীবন বলে মনে করছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের ১/১/৩ শ্লোকের অনুসরণে বলা হয়েছে—

"পৃথিবীতে যাহা কিছু ধর্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে ॥"

তথাকথিত ধার্মিকেরা বলেন, মোক্ষই জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। যারা সংসার মুক্তি কামনা করে, যারা নির্বাণ লাভ করতে চায়, যারা ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যেতে চায়, তারা কৃষ্ণভক্তিপথের পথিক নয়। তারা নাস্তিক। ব্রহ্মে লীন হওয়ার মোক্ষবাসনা হচ্ছে সবচাইতে বড় আত্ম প্রবঞ্চনা।

'তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১/৯২)

যতই শুভ হোক, বা যতই অশুভ হোক, কৃষ্ণসেবার কৃষ্ণভক্তির প্রতিবন্ধক সমস্ত চিন্তাভাবনা কার্যকলাপ—সে সবই তামসিক গুণপ্রভাবিত অজ্ঞানতা মাত্র। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ আছে—

"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো-ধর্ম ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১/৯৪)

পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যা কিছু তথাকথিত ধর্মশাস্ত্র—সবই প্রতারণা মাত্র। কলিযুগের যুগধর্ম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের নির্দেশ রয়েছে। হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের সহজ অর্থ হল—"হে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি রাধারাণী, হে পরমেশ্বর ভগবান! দয়া করে আমাকে আপনাদের পাদপদ্মসেবায় নিয়োজিত করুন।" অর্থাৎ, আমাদের নিত্যস্বরূপে ফিরে যাওয়াই কাম্য। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।' গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।* (১৫/৭) জগতের সকল জীবই ভগবানের অংশস্বরূপ শাশ্বত সত্তা। অতএব আমাদের সচ্চিদানন্দময় আপনসত্তার উপলব্ধি আমরা করতে পারি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অকপট প্রীতিবিধানের মাধ্যমে। যেহেতু সমস্ত ধর্মের মূল উৎস মূল কেন্দ্র তিনিই। কেবল তাঁরই শরণাপন্ন হতে হবে। তাই বলা হয়েছে—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ (গীঃ ১৮/৬৫)

জগতের সমস্ত রকমের আয়োজন সমস্ত ধর্মের ব্যবস্থাপনা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্যান্য কোন্ ধর্ম করা হল, না হল, কোন্ পাপ হল, না হল—সে সব দায়িত্ব পরমেশ্বর নিজেই গ্রহণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং কোন সংশয় রাখতেও নিষেধ করেছেন—*'মা শুচঃ'।* এটাই ভগবানের চূড়ান্ত নির্দেশ, যা বিশ্বের সর্বযুগের সর্বজনের পরম শ্রদ্ধেয় ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সন্নিবেশিত।

প্রশ্ন ২৭। জগতে ধর্ম তো অনেক রকমের। কোন্ ধর্ম গ্রহণ করব?

উত্তর ঃ যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রশ্ন করেছিলেন, 'হে পিতামহ, কোন্ ধর্ম শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করা উচিত?'

পিতামহ শ্রীভীষ্মদেব উত্তর দিলেন, 'হে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে নির্দেশ দিচ্ছেন সেই নির্দেশ মতোই চলাটাই একমাত্র ধর্ম।'

যে চ বেদবিদো বিপ্রা যে চাধ্যাত্মবিদো জনাঃ।
তে বদন্তি মহাত্মানং কৃষ্ণং ধর্মং সনাতনম্ ॥

"যিনি সঠিকভাবে বেদ অধ্যয়ন করেছেন, তিনি প্রকৃত বিপ্র বা বেদজ্ঞ। যিনি পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করাকেই জীবের সনাতন ধর্ম বলে বর্ণনা করেন।" (মহাভারত)

প্রশ্ন ২৮। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বললেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

ক) 'সর্বধর্ম' বলতে কোন্ কোন্ ধর্মকে বলা হয়েছে?
খ) পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মমতের সৃষ্টি হল কেন?
গ) সবাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হচ্ছে না কেন?

উত্তর ঃ ক) পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে, তাঁর সঙ্গে জীবের নিত্য সম্বন্ধের কথা বর্জন করে এই পৃথিবীতে যত কিছু আয়োজন ধর্ম নামে প্রচলিত হয়েছে, তা সমস্তই প্রতারণা মাত্র।

পৃথিবীতে যাহা কিছু ধর্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে ॥

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

কহিতে লাগিলা সূত সর্ব-ধর্ম-সার।
যাহা হৈতে হৈব সর্ব জীবের নিস্তার ॥
"সেই সে পরম-ধর্ম সর্ব-বেদে কহে।
যাহা হৈতে হরির চরণে ভক্তি রহে ॥
হরিভক্তিহৈলে তত্ত্বজ্ঞান-পরকাশ।
ছিণ্ডয়ে সংসার-পাশ, অবিদ্যা-বিনাশ ॥"

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ১/৩/১৬-১৮)

কিন্তু কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণের নির্দেশ এড়িয়ে মানুষ মাতৃ-পিতৃ ধর্ম, দেব-দেবী ধর্ম, ভূত-প্রেত ধর্ম, লোক ধর্ম, পরিবার ধর্ম, জাতি ধর্ম, দেশ ধর্ম ইত্যাদি যত রকমের ধর্ম আচরণ করুক না কেন তাতে কখনও জন্ম-মৃত্যুর সংসার-চক্র থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এমন কি বিষ্ণু ভক্তিহীন বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণও পণ্ডশ্রম মাত্র।

খ) মানুষ সাধারণত কৃষ্ণভক্তি-বিমুখ হয়ে নিজ নাম, খ্যাতি, যশ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ইত্যাদি কামনার বশীভূত হয়ে মূল ধর্মকে বিকৃত করে আপন আপন মনগড়া ধর্ম শুরু করে। যেমন, কোনও মূল ধর্মগ্রন্থে গো-হত্যা করে মাংস খাওয়ার নির্দেশ নেই। কিন্তু মাংস-প্রিয় তথাকথিত যবন বা খ্রিস্টানেরা গো-হত্যা করে চলেছে। সর্বশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলা হয়েছে। কিন্তু তথাকথিত হিন্দুরা কালী, দুর্গা, শিবকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করছে।

বেদের তিনটি কাণ্ড রয়েছে, যথা—কর্মকাণ্ড, বা সকাম কর্ম, জ্ঞানকাণ্ড বা দার্শনিক গবেষণা, এবং উপাসনাকাণ্ড বা জড় জাগতিক লাভের জন্য দেব-দেবীদের পূজার্চনা। এই সব কাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ জড়জাগতিক সুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারে।

যদিও কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডের অনুষ্ঠানে রত জড় দেহ-বদ্ধ জীবেরা—সে দেবতা হোক আর পশুই হোক যেই হোক না কেন—তাদের সকলের পক্ষেই জড়া প্রকৃতির ত্রিতাপ দুঃখ সমভাবে ক্লেশকর, তবুও তারা জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভনে এই সব কাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ রয়েছে—

বাচা নু তন্ত্যা যদি তে জনোঽসিতঃ।
কথং পুনঃ কর্ম করোতি মোহিতঃ॥

"হে ভগবান, আপনি যে প্রলোভন প্রদান করেছেন, তা অবশ্যই আপনার শুদ্ধ ভক্তদের উপযুক্ত নয়। কেবল সাধারণ মানুষেরাই বেদের সেই সব মধুর মধুর বাণীতে মোহিত হয়ে, তাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুনঃ পুনঃ সকাম কর্মে রত হয়।" (ভাঃ ৪/২০/৩০)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।

অর্থাৎ, "অল্পবুদ্ধি মানুষেরা বেদের সুন্দর সুন্দর কথায় আকৃষ্ট হয়ে জড়জাগতিক লাভের জন্য সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়।" (গীতা ২/৪২)

বিশেষতঃ বহু বর্ষ ধরে স্বর্গলোকের নন্দনকাননে আনন্দ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে বেদের কতকগুলি নির্দেশ রয়েছে। সেই নির্দেশ পালন করে স্বর্গে উন্নীত হওয়া যায়। সেই প্রলোভন অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত মোহকারিণী, কিন্তু তা অবশ্যই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড় বন্ধনে বদ্ধ হয়ে থাকার একটি ফাঁদ মাত্র। বিশেষতঃ রজ ও তমোগুণের দ্বারাই বদ্ধ থাকতে হয়। ফলে, তারা অত্যন্ত লোভী ও কামাসক্ত হয়ে থাকে। তারা সারাদিন ও সারারাত কঠোর পরিশ্রম করে। এক যোনি থেকে অন্য যোনিতে তারা জন্ম নিতে বাধ্য হয় এবং কোনও জীবনেই তারা শান্তি লাভ করতে পারে না।

তাই বৈষ্ণব আচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর লিখেছেন—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

ভগবানের বিধানে, আমাদের গতি নির্ধারিত হয় আমাদের কর্ম ও বাসনা অনুসারে। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেত স তু সত্তমঃ॥

"ধর্মশাস্ত্রে আমি যা 'ধর্ম' বলে আদেশ করেছি, তার গুণ-দোষ বিচারপূর্বক সেই সমস্ত ধর্মপ্রবৃত্তি ত্যাগ করে যিনি আমা ভজনা করেন, তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট সাধু।" (ভাঃ ১১/১১/৩২)

মহাভারতেও নির্দেশ রয়েছে—

যে চ বেদবিদো বিপ্রা যে চাধ্যাত্মবিদো জনাঃ।
তে বদন্তি মহাত্মানং কৃষ্ণং ধর্মং সনাতনম্॥

"যিনি সঠিকভাবে বেদ অধ্যয়ন করেছেন, তিনি প্রকৃত বিপ্র বা বেদজ্ঞ, যিনি আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করাকেই জীবের সনাতন ধর্ম বলে বর্ণনা করেন।"

গ) কিন্তু মূঢ় ও ভোগাসক্ত ব্যক্তিরা সব সময় চেষ্টা করে কিভাবে বেশি করে জড়-ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করা যায়। দিনরাত তারা সেই চিন্তা করে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন—

ভোগৈশ্বর্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

"যারা জড়জাগতিক ভোগ ও ঐশ্বর্য সুখের প্রতি একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেক-বর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ, ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।" (গীতা ২/৪৪)

প্রশ্ন ২৯। মাতা-পিতার সেবা বড়, না গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা বড়?

উত্তর ঃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা বড় বলেই আদর্শ মাতা-পিতা সন্তানদের শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় নিয়োজিত করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ হচ্ছেন পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় প্রতিনিধি পতিতপাবন। আর, আদর্শ মাতা-পিতা সন্তানের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনার্থে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষার জন্য প্রেরণা দেন। "সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতা-মাতা শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি দাতা॥" (শ্রীচৈতন্যমঙ্গল) কৃষ্ণভক্তি ছাড়া পৃথিবীর কোনও কর্মই আমাদের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিপূর্ণ দুঃখ ও উদ্বেগজনক ভবদশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে না বলেই শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে।

তাই, বিশ্ববিখ্যাত বৈষ্ণব কবি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

অর্থাৎ, "বদ্ধ জীব যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠা পরায়ণ হন এবং গুরুদেবের সেবা করেন, তা হলে তিনি এই মায়ার ভব জাল থেকে মুক্ত হয়ে অচিরেই কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন।" (চৈঃ চঃ ম ২২/২৫)

কিন্তু সব রকম কর্তব্যকর্ম পালন করে গিয়েও যদি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা না হয়, কৃষ্ণভজন না হয়, তবে নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের অহংকারে ভগবদ্ভজনের অবজ্ঞা করার ফলে মানুষ অধঃপতিত হয়। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩ শ্লোক) নির্দেশিত হয়েছে।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

(চৈঃ চঃ ম ২২/২৬)

অর্থাৎ, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যদি তাদের স্ব-স্ব-ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করেও, অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী যদি তাদের নিজ নিজ ধর্ম সর্বতোভাবে পালন করেও, কৃষ্ণভজন না করে, তা হলে তারা প্রাকৃত অভিমান বশে উচ্চতা লাভ করেও অবশেষে পুণ্যক্ষয়ে অবশ্যই রৌরব নরকে পতিত হয়। অপ্রাকৃত ভক্তির অনুশীলন ব্যতীত বিষয়ী বর্ণাশ্রমের কোনই মঙ্গল হয় না।" (চৈঃ চঃ ম ২২/২৬ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

তাই পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

"এই জগতে তোমার সমস্ত মনগড়া ধর্ম, নানাবিধ কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তা হলে সমস্ত দুর্বিপাক থেকে আমি তোমাকে উদ্ধার করব, এই ব্যাপারে কোনও সংশয় কর না।" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮/৬৬)

কোনও মাতা-পিতা আমাদের জন্ম-মৃত্যুর ভবযন্ত্রণা থেকে কখনই উদ্ধার করতে পারবেন না যদি তাঁরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবায় আমাদের নিয়োজিত না করেন। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা-আশীর্বাদে মাতা-পিতাও আনন্দময় জীবনের সন্ধান পেতে পারবেন। এটিই আমাদের বোঝা উচিত। অত্যন্ত জড়ধীসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই কথা বুঝতে না পারলেও ভক্তরা অতি সহজেই বুঝতে পারেন। দেখা যাবে, হয়তো কখনও কখনও ক্ষেত্রবিশেষে মাতা-পিতার সেবা করাটা অত্যন্ত জরুরী; কিন্তু পারমার্থিক শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগৌরাঙ্গের ঐকান্তিক সেবা ভিন্ন এই মনুষ্য-জন্ম কখনই সার্থক হয় না।

প্রশ্ন ৩০। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৩/৩৫) বলেছেন যে, 'সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা সদোষ স্বধর্মই শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ।' ভগবান 'স্বধর্ম' ও 'পরধর্ম' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? স্বধর্ম ও পরধর্ম কি?

উত্তর ঃ স্বধর্ম বলতে নিজ নিজ আশ্রম ও বর্ণের ধর্মকে বোঝায়, যেমন—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রমগুলির মধ্যে যিনি যে আশ্রমে রয়েছেন, তিনি সেই আশ্রমের নিয়মনীতিগুলি অবশ্যই পালন করে চলবেন এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও

শূদ্র এই বর্ণগুলির মধ্যে যিনি যে বর্ণের অন্তর্ভুক্ত তিনি সেই বর্ণের নিয়মনীতিগুলি রক্ষা করে চলবেন। ব্যক্তির গুণ, মনোবৃত্তি ও কর্মপ্রবণতা বা স্বভাব-চরিত্রই তার পরিচয় নিরূপণ করে সে কোন্ বর্ণের বা কোন্ আশ্রমের।

এমন নয় যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেই ব্রাহ্মণ হবেন বা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করলেই ক্ষত্রিয় হবেন। না, এইভাবে বিচার্য নয়। শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেও কোনও ব্যক্তির মধ্যে যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ বা লক্ষণ থাকে তবে সে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও কোনও ব্যক্তির মধ্যে যদি শূদ্রোচিত গুণ বা লক্ষণ থাকে তবে সে শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মচারী যদি ব্রহ্মচর্য ব্রতের নিয়মগুলি লঙ্ঘন করেন তবে তিনি অধঃপতিত বা গৃহমেধী রূপে নিন্দনীয় হন। কেউ যদি সারা জীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করে পরমধামে উন্নীত হওয়ার বাসনা করেন তবে তাঁর সেই ব্রতের নিয়মগুলি পালন করে চলা উচিত। কেউ যদি গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করে থাকেন তবে তাঁর আত্মীয় কুটুম্ব স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণাদি সহ সকল বৈদিক বিধিগুলি পালন করে চলা উচিত।

কে কোন্ গুণে কোন্ যোগ্যতার অধিকারী অর্থাৎ কে কোন্ আশ্রমের বা কোন্ বর্ণের উপযুক্ত তা নিজের মনগড়া বুদ্ধিতে বিচার না করে যথার্থ অভিভাবক বা পারমার্থিক পথপ্রদর্শক শ্রীগুরুদেবের সন্নিকটে জেনে নিতে হয়।

অর্জুন ছিলেন বীর যোদ্ধা। ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুদ্ধ করাই যথার্থ বীর যোদ্ধার ধর্ম। যুদ্ধক্ষেত্রে সজ্জিত পক্ষ ও বিপক্ষের সকল সেনাবাহিনীর মাঝখানে এসে যুদ্ধ না করে কান্নাকাটি করে পালিয়ে যাওয়াটা কোনও বীর যোদ্ধার ধর্ম নয়—এই কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জানিয়ে দিলেন। সেই ক্ষেত্রে যুদ্ধ করাটা অর্জুনের ক্ষত্রিয়োচিত 'স্বধর্ম', কিন্তু যুদ্ধ না করে পালিয়ে যাওয়াটা কাপুরুষের ধর্ম অর্থাৎ 'পরধর্ম'।

অর্জুন ভাবছিলেন যে, এই মহা সমরে প্রতিহিংসায় উদ্যত সমস্ত ভ্রাতা, পিতামহ, পিতৃব্য, বন্ধু-বান্ধবেরা রাজ্য ও সিংহাসনের লোভে রক্তপাত হানাহানি করে জীবন বিসর্জন দিতে এসেছে, এই সময় আমি হানাহানি কুলক্ষয় কর্মে না গিয়ে ভিক্ষুক জীবন গ্রহণ করে অন্যত্র চলে যাই, আর বিপক্ষীয় দল হানাহানি না করে রাজ্য নিয়েই থাকুক। কিন্তু একজন বীর যোদ্ধার পক্ষে এই মনোভাবটি শূদ্রোচিত বলে গণ্য হয়। কারণ উপস্থিত বিশাল সেনাবাহিনীর মধ্যে সম্মুখসমরে উপনীত হয়ে একজন সেনাপতির পক্ষে এরূপ মনোভাব কখনই শোভনীয় নয়। যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে গেলে ভিক্ষুকবৈরাগী রূপে গণ্য না হয়ে কাপুরুষ হিসাবে সমাজে তিনি নিন্দনীয় হয়ে থাকবেন, পরক্ষণে সেই সুতীব্র নিন্দা এবং সমাজে তাঁর মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত সুপ্ত গুণ তাঁকে বৈরাগ্য ছাড়িয়ে বারে বারে যুদ্ধ করবার জন্যই বাধ্য করাবে। অবশেষে, তিনি বৈরাগ্যের স্বস্তি লাভের পরিবর্তে যুদ্ধের উত্তেজনায় সর্বদা অস্বস্তি ভোগ করবেন।

পক্ষান্তরে, যদি তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করেন তবে ক্ষত্রিয়ধর্ম রক্ষা হয় এবং যুদ্ধে যদি জয়ী হন তবে সাম্রাজ্য সুখ ভোগ করবেন, আর যদি নিহত হন তবে স্বর্গগতি লাভ করে স্বর্গসুখ ভোগ করবেন। দুই দিকই মঙ্গল, যেহেতু অর্জুনপক্ষ পুণ্যবান ও

ন্যায়বান ছিলেন তাই স্বর্গগতি লাভ করতে কোনও বাধা নেই। তাই বলা হয়েছে—*স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।*

যদিওবা এই যুদ্ধে বহু বীরের মৃত্যু হবে এবং তাঁদের পত্নী পুত্র মাতা পিতার আর্ত ক্রন্দন শুরু হবে, তাই এই 'স্বধর্ম' আচরণটির মধ্যে অনেকেই অনেক কিছু দোষ দেখতে পাবেন এবং আক্ষেপ প্রকাশ করবেন, তবুও এই স্বধর্ম অনুষ্ঠান করতে হবে। দোষযুক্ত স্বধর্ম অনুষ্ঠান করাই ভাল।

এত কিছু বলার পরেও আমাদের জানতে হবে যে, 'স্বধর্ম'টাও বড় কথা নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী তাঁদের নিয়মনীতিগুলি পালন করে চললেও যদি তাঁদের পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে মতি না হয়—যদি তাঁরা ভক্ত না হন, তবে তাঁদের সেই সমস্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত স্বধর্মও অর্থহীন বলে বিবেচিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে চূড়ান্ত উপদেশ দিচ্ছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

"সব রকমের 'ধর্ম' পরিত্যাগ করে কেবল মাত্র আমার শরণাপন্ন হও, তা হলে আমিই তোমার কর্তব্য-অকর্তব্যজনিত সমস্ত রকমের পাপ থেকে তোমাকে রক্ষা করব। এই ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" (গীতা ১৮/৬৬) কৃষ্ণভক্তি বিনা সমস্ত রকমের কৈতব ধর্মকেই পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। সেই জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/২৬)

আপনি যে আশ্রমে থাকুন না কেন, যে কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, আপনাকে অবশ্য অবশ্যই কৃষ্ণভজন করতে হবে। অন্যথায়, জন্ম-জন্মান্তরের নানাবিধ জানা-অজানা পাপকর্মের ফল থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনও উপায় থাকবে না, যার ফলে নরকগতি লাভ করে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে চলতে হবে। তাই পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—তাঁর শরণাগত ভক্তকে তিনি নিঃসন্দেহে রক্ষা করবেন। ভক্তপ্রবর শ্রীউদ্ধবকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

"ধর্মশাস্ত্রে আমি যা 'ধর্ম' বলে আদেশ করেছি, তার দোষগুণ বিচার করে সেই সব ধর্মপ্রবৃত্তি ত্যাগ করে যিনি আমাকে ভজনা করেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু।"

শ্রীমদ্ভাগবতের (১১/৫/৩) শ্লোকে বলা হয়েছে—"নির্দিষ্ট বর্ণে নির্দিষ্ট আশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তি স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে গেলেও যদি নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের অহঙ্কারে

শ্রীহরির ভজনে অবজ্ঞা করে, তবে সে স্বস্থান-ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।" তাই হরিভজনই আসল ধর্ম আর সব ভয়াবহ।

হরিভজনই সনাতন জীবের সনাতন ধর্ম। একমাত্র হরিভক্তি ছাড়া জগতে সমস্ত ধর্মই কৈতবধর্ম। কারণ হরিভক্তি ছাড়া কোনও ধর্মই এই জড় জগতের বদ্ধ জীবকে চিরতরে উদ্ধার করতে পারে না। মনুষ্য-সমাজে যে হিন্দু ধর্ম, মুসলিম ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম ইত্যাদি কথা অধিকাংশ মানুষ ব্যবহার করে চলেছে—সেগুলি কোনও ধর্মই নয়। সেগুলি নিছক মনগড়া মতবাদ মাত্র। আমরা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান যা-ই হই না কেন, আমাদের হরিভজন করতে হবে।

তা ছাড়াও, এই কলিযুগে আদর্শ বর্ণাশ্রমী প্রায় নেই বললেই চলে। কলিযুগে সবাই শূদ্র। *কলৌ শূদ্র সম্ভবাঃ।* কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই হরিনাম সংকীর্তন ধর্মকে আসল ধর্ম বলে গ্রহণ করে চলবেন। *সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।* হরিনাম ভজনে যদি রুচি না থাকে তবে মনুষ্য জীবন নিরর্থক, আর সেই অবস্থাই ভয়াবহ। হরিভক্তিহীনতাই আমাদের জাগতিক দুঃখের কবলে জন্ম-জন্মান্তর ধরে বদ্ধ রাখবে। তাই আমাদের নির্মল চিত্তে *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রশ্ন ৩১। 'জীবই ঈশ্বর'—এই কথাটি কি সত্য?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান বলছেন, *'মমৈবাংশো জীবলোকে* সমস্ত জীবই আমার অংশ।' ভগবান হচ্ছেন পরম পূর্ণ *ওঁ পূর্ণম্ ইদম্।* পূর্ণ এবং অংশ কখনই এক নয়। অংশের কাজ পূর্ণের সেবা করা। যেমন হাতটির কাজ সর্বাঙ্গের সেবা করা।

একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।

(চৈঃ চঃ আদি ৫/১৪২)

কৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান আর সকলেই তাঁর ভৃত্য। ভৃত্যের কাজ হচ্ছে প্রভুর সেবা করা। তাই কেউ যদি বলে যে 'প্রভুই ভৃত্য' বা 'জীবই ঈশ্বর তবে তার কথাটির মূর্খতা প্রকাশ পায়। কৃষ্ণের দাসত্ব প্রকৃতপক্ষে জীবের ধর্ম।

জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১০৮)

জীব অণু আর ঈশ্বর বিভু। তারা কখনই সমান হতে পারে না। সমুদ্র আর সমুদ্রের এক বিন্দু জল—দুটোই সমুদ্র—এরূপ বলা যায় না।

জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮/১১৩)

"জীব এবং ভগবান কখনই সমান নন, ঠিক যেমন একটি স্ফুলিঙ্গকে কখনই জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের সঙ্গে সমান মনে করা হয় না।" পরমেশ্বর ভগবান একজন। তিনি সমস্ত জীবদের পালন করেন। এই কথা বেদে বলা হয়েছে—

একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিরাকরঃ॥

"পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা সৎ, চিৎ ও আনন্দময়, এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তির দ্বারা আশ্লিষ্ট। কিন্তু জীব সব সময়েই স্বীয় আরোপিত অবিদ্যার দ্বারাই আচ্ছাদিত, তাই সে সর্ব প্রকার ক্লেশের আকর।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাবধান করে দিয়েছেন—

জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮/১১১)

"অধম জীবকে কখনও কৃষ্ণ বলে মনে করবেন না।" জীব যতই মহৎ হোক না কেন, ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা কখনই উচিত নয়।

মায়াবদ্ধ অধীন জীব মায়াধীশ ভগবানের সঙ্গে 'এক' বা সমজ্ঞানকারীরা অবশ্যই 'পাষণ্ডী' বলে বিবেচিত হন।

যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮/১১৫)

"যে মূর্খ বলে যে, জীব এবং ঈশ্বর সমান, সে একটি পাষণ্ডী, এবং শ্রীযমরাজ তাকে দণ্ডদান করেন।"

সাধারণ এই মর্ত্যজীব তো দূরের কথা, যদি কেউ মনে করে যে, সমস্ত দেব-দেবী এবং ভগবান—সব একই তবে সে-ও পাষণ্ডী বলে নির্ধারিত হয়।

উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ।
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্মসু॥

(ভক্তিসন্দর্ভ)

"যে ব্যক্তি দেব-দেবীদের পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক বলে মনে করে সে পাষণ্ডী। তাই পাষণ্ডীরা ভগবান জ্ঞানে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে।"

শ্রীপদ্মপুরাণে এই কথাটি পরিষ্কারভাবেই মহর্ষি ব্যাসদেব উল্লেখ করেছেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

"যে ব্যক্তি ব্রহ্মা, শিব ইত্যাদি দেবতাদের সঙ্গে শ্রীনারায়ণকে সমান করে দেখেন, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/২) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ॥

"দেবতাগণ কিংবা মহর্ষিগণও আমার উৎপত্তি অবগত হতে পারেন না। কারণ আমি সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ।"

পাশ্চাত্য দেশে যখন শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃষ্ণভক্তি প্রচারে গিয়েছিলেন, তখন এক খ্রিস্টান ধর্মযাজক বলেছিলেন, 'যীশুখ্রিস্টই ঈশ্বর।' শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর প্রতিবাদ করে বলেন সেটি একটি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা। তিনি বলেছিলেন, "আপনাদের বাইবেল শাস্ত্রে কোথাও যীশুখ্রিষ্টই ঈশ্বর—এই রকম কথা বলা হয়নি। বরং যীশুখ্রিস্ট সর্বদাই বলেছেন—"আমি ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বর আমার পিতা।" সেটিই ছিল যথার্থ শাস্ত্রীয় বাক্য। যথার্থ ধর্ম প্রচারক কখনও নিজেকে অথবা যাকে-তাকেই ঈশ্বর বলে মনে করেন না। তিনি নিজেকে এবং অন্য সবাইকে ঈশ্বরের সন্তান বলে মনে করেন। ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ* (ব্রহ্মসংহিতা ১) কৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।* (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৩/২৮) আর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : *অহং বীজপ্রদঃ পিতা।*" "আমিই বীজপ্রদানকারী পিতা।" পিতা ও পুত্র এক নয়। জীবই ঈশ্বর নয়।

ভগবান চিরকালই ভগবান। ভগবান এই জড় জগতে সাধারণ মানুষরূপে লীলাবিলাস করলেও কখনই তাঁর ভগবত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না। আর, জীব চিরকালই জীব। ভগবদ্ আরাধনা করে নিত্য ভগবৎ ধামে শাশ্বত আনন্দময় জীবনে উন্নীত হয়ে অপ্রাকৃত ভগবদ্ সেবায় নিয়োজিত হতে পারে। অথবা, ভগবদ্বিমুখ হয়ে এই জড়জগতে বদ্ধ হয়ে জন্মজন্মান্তরে পড়ে থাকতে পারে। অথবা, মায়াবাদী ভাবধারা, নিয়ে ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে মিশে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু জীবের অস্তিত্ব কখনও বিলীন হয় না, কিংবা কেউই ভগবান হয়ে যায় না।

প্রশ্ন ৩২। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ঈশ্বর উপাসনার পদ্ধতিও ভিন্ন প্রকার। তাহলে তাদের মুক্তির পথ কি ভিন্ন প্রকার, নাকি সব জীব মুক্ত হয় না? সবাই তো নিজ নিজ ধর্মটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে দাবী করেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ধর্ম কোন্‌টি এবং কেন?

উত্তর : বেদ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই পরমেশ্বর ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সব ধর্ম বাদ দিতে। *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।* (গীতা ১৮/৬৫) এই চরম কথাটি অন্য কেউ বলতে পারে না। এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিতে হবে তাহলেই—*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।* শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরণাপন্ন জীবের এই জাগতিক তথাকথিত লক্ষ কোটি ধর্মাধর্ম কর্তব্য-অকর্তব্য জনিত সব রকমের উৎপাত থেকে মুক্তিদান করবেন। সেজন্য কোন রূপে চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। *মা শুচঃ।* তিনি বদ্ধ জীবের দুঃখময় জন্ম-মৃত্যুর সংসারচক্র থেকে মুক্তি দেন বলেই শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম মুকুন্দ।

প্রকৃত মুক্তি বলতে বোঝায় জড় বদ্ধ জীবনধারা থেকে মুক্তি। কিন্তু তার পর শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় সৎ, চিৎ ও আনন্দময় জীবনধারায় চিরকালের জন্য যুক্ত হওয়া বোঝায়। শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনা সেই মুক্তি কখনই সম্ভব নয়। শ্রীমদ্ভাগবত নির্ধারিত দ্বাদশ মহাজনই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আর সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। বাদবাকী সমস্তই মনগড়া ধর্ম।

প্রশ্ন ৩৩। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করা উচিত নয়—কি করে বুঝব?

উত্তর ঃ ভগবানের ভক্ত হলে বোঝা যাবে। ভগবান যে নির্দেশ করেছেন সেই মতো চলাটাই ভগবানের ইচ্ছা। ভগবানের ইচ্ছায় যদি না চলা হয়, তবে সেটাই ভগবানের ইচ্ছার বিরোধিতা করা হয়। ভগবানের ইচ্ছার কথাই মহাত্মা ঋষিগণ শাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন। যেমন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ*—"আমাতে মন রাখো, আমার ভক্ত হও।" কিন্তু কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মন না রাখে, তাঁর ভক্ত যদি না হয়, তা হলে সে নাস্তিক ভগবদ্‌বিদ্বেষী লোক রূপে পরিগণিত হবে। এটি বুঝতে না পারার কি আছে।

প্রশ্ন ৩৪। জীব তো স্বতন্ত্র আত্মা। ভগবান তাকে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা দিয়েছেন। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে চললে জীবের কোনও দোষ আছে কি?

উত্তর ঃ ভগবান আমাদের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন এবং সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা অনুসারে বোঝা যায় যে, যখন জীবের ইচ্ছাশক্তি কৃষ্ণভক্তির অনুকূলে থাকে না, তখনই সেই স্বাধীনতা নিরর্থক।

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আত্মতত্ত্বের অধীনতা। আত্মার স্বরূপ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। অতএব শ্রীকৃষ্ণসেবা-বিমুখ না হয়ে আপন আপন অভিরুচি অনুসারে জীবন যাপন করাকেই বলে স্বাধীনতা। যখনই কৃষ্ণভক্তি সেবা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, অনুশীলন হচ্ছে না, মনগড়া খেয়ালখুশি মতো চলা হচ্ছে, তখন তাকে স্বাধীনতা বলে না, তাকে বলে স্বেচ্ছাচারিতা অর্থাৎ, যা ইচ্ছে তাই করা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন--

যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিম্ অবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

"যারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে নিজের খেয়াল-খুশি মতো আচরণ করে, তারা কখনও সিদ্ধি লাভ করতে পারে না, তারা কখনও সুখী হতে পারে না, এবং তারা পরম গতি ভগবদ্ধামেও যেতে পারে না।" (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১৬/২৩)

দেবর্ষি নারদ মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে বলছেন—

অন্যথা কর্ম কুর্বানো মানারূঢ়ো নিবধ্যতে ।
গুণপ্রবাহপতিতো নষ্ট প্রজ্ঞো ব্রজত্যধঃ ॥

"জগতে যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশি মতো আচরণ করে, সে তার অহঙ্কারের প্রভাবেই অধঃপতিত হয় এবং এইভাবে সে জড়াপ্রকৃতির তিনটি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার ফলে জীব বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। এইভাবে তাকে যাতনাময় জগতে মলের কীট থেকে শুরু করে ব্রহ্মলোকের উচ্চ পদ পর্যন্ত বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে হয়।"

ভগবান আমাদের অবাধ-স্বাধীনতা দেননি, স্বেচ্ছাচার করতে অনুমোদন করেননি। স্বাধীনতা হচ্ছে সংযত শুদ্ধভাবে থাকবার স্বাধীনতা। প্রকৃতিকে বেশি করে শোষণ করা, অন্যের স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা, আপন ভোগবাসনা বেশি করে চরিতার্থ করা—এরকম স্বাধীনতা ভগবান কখনও দেননি। এই ধরনের স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার মূলক তথাকথিত স্বাধীনতার মাধ্যমে মানুষ গভীর নরক-যাতনায় গতি লাভ করে। সেই কথা প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।
অদান্ত গোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বনানাম্ ॥

"জড় সুখ ভোগের চেষ্টায় গভীরভাবে যুক্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা তাদের জড় অভিজ্ঞতার অতীত আর কিছুই বোঝে না, এবং তারা প্রকৃতির তরঙ্গে প্রবাহিত হয়। তাদের সুখভোগের প্রচেষ্টা চর্বিত বস্তু চর্বনের মতো, এবং তারা তাদের অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। এইভাবে তারা নারকীয় জীবনের অন্ধতম প্রদেশে অধঃপতিত হয়।" (ভাগবত ৭/৫/৩০)

প্রশ্ন ৩৫। ধর্মগ্রন্থের নাম 'গীতা' হল কেন?

উত্তর ঃ চিন্ময় জগতের কথাগুলি গানের মতো। *কথা-গানং* (ব্রঃ সঃ) যেন সুন্দর সংগীত বা গীত। ভগবানের মুখপদ্ম থেকে নিঃসৃত কথা এই জড় জগতের কথা নয়—চিন্ময় গীত। তাই নাম ভগবদ্‌গীতা।

প্রশ্ন ৩৬। সৎপথে চলব, কারও কোনও ক্ষতি করব না। মিথ্যা বলব না। তা হলেই ধর্ম হবে। না কি বিগ্রহ সেবার প্রয়োজন আছে? প্রমাণ সহ বলবেন।

উত্তর ঃ আপনি বলছেন সৎপথে চলবেন আর সেটাই ধর্ম হবে। প্রথমতঃ সৎ বস্তুটি কোন্‌টি সেটি জানতে হবে। পরমেশ্বর ভগবান যে পন্থা মানবসমাজের জন্য দিয়েছেন সেটিই সৎপথ। শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর ভগবান। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ* (ব্রহ্মসংহিতা ৫/১) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সৎ-চিৎ-আনন্দময় বিগ্রহ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে পরমসত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের পরম কারণ। যে ব্যক্তি এই জড় জগতের মিথ্যা

মোহ থেকে মুক্ত হতে চান তাঁকে সেই পরমসত্য শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করতে হবে। *সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।*

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎ সংসার সম্বন্ধে বলছেন *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্*—এই জড় জগৎ হচ্ছে দুঃখের আগার এবং অনিত্য স্থান। এখানে এসে কেউ যদি ভাবে 'আমি কারও ক্ষতি করব না,' সেটি ভাল কথা, কিন্তু প্রতিনিয়ত শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে হাঁটা-চলার মাধ্যমে ভুলবোঝাবুঝি বা কথাবার্তার মাধ্যমে আপনি অন্যের ক্ষতি করছেনই। আপনি মিথ্যা বলবেন না—সেটি ভাল কথা হতেই পারে কিন্তু মহাভারতে সত্যবাদী কৌশিক সত্যকথা বলার জন্যই কয়েক জন নিরীহ সৎ মানুষের প্রাণহানির কারণে নরকে তাকে শাস্তিভোগের জন্য যেতে হয়েছিল। অতএব ধর্ম বস্তুটি কতই না সূক্ষ্ম। সেটি কারও মনগড়া মতে মনগড়া পথে চলার মতো ব্যাপার নয়। *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রণীতম্* (শ্রীমদ্ভাগবত ৬/৯/১৯) ধর্ম হচ্ছে ভগবানের দ্বারা প্রণীত আইনকানুন যা মানুষদের মেনে চলতে হয়। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করলে হৃদয়ে শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন জড়জাগতিক সত্য-মিথ্যা বিষয়ে অনীহা আসে। আমাদের জীবন পরম সত্যের অনুকূলে প্রবাহিত হলে তবে সেটি সৎপথ। পরমসত্য শ্রীকৃষ্ণের কথাই হচ্ছে চিরন্তন সত্য কথা। আর বাদবাকী সব জড়জাগতিক আপাত সত্য এবং অনিত্য কথা। শ্রীমদ্ভাগবতে এইজন্য নির্দেশ করা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথাতে যদি মন না থাকে তা হলে এই জগতে ধর্ম করাটাই অনর্থক। (ভাঃ ১/২/৮)

ভগবানের স্বরূপ, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ এব ভগবানের নাম সবই চিন্ময়, তাতে জড়জাগতিক নাম রূপ ও মূর্তির মতো ভেদ নেই। বিগ্রহরূপে ভগবান যুগে যুগে ভক্তগণ কর্তৃক সেবিত হচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন 'পরমসত্য আমাকে যদি পেতে চাও তবে তোমার মন আমাতে রাখো, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম কর এবং আমার পূজা কর। এভাবে পূর্ণরূপে আমাকে আশ্রয় করো।' (গীতা ৯/৩৪) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমিই ধর্ম সংস্থাপনা করি, বেশি মাথা না ঘামিয়ে আমারই শরণাগত হও (মাম্ একং শরণং ব্রজ)। (গীতা) কিন্তু নাস্তিক লোকেরা বলছে—কৃষ্ণকে নয়, পরম সত্য কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অন্য নতুন রকমের নাকি সৎ পথ আছে এবং কৃষ্ণের নির্দেশিত পন্থার প্রয়োজন নেই, তাদের নিজেদের মনগড়া পন্থাই ধর্ম। সেটি হচ্ছে আসুরিক পন্থা।

৩৭। অনুকূল ঠাকুর বলেছেন, মনে বিশ্বাস থাকলে শূকরের মাংস খেলেও কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে। একথা সত্য না মিথ্যা বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর ঃ শূকর-কুকুরের মাংস খাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও কেবলমাত্র দুধ খেয়েও কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না। যদি কেউ বলে, আমার কৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমি কেবল ফল ও দুধ খেয়েই ভগবানকে পেয়ে যাব—সেরকম অন্ধবিশ্বাসেও কখনও কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না। পয়োব্রতধারী এক ব্রহ্মচারীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এরকম শিক্ষা দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু বলছেন—

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥

অর্থাৎ, কৃষ্ণের অভয় পাদপদ্মে শ্রদ্ধা থাকবে। বিশ্বাসটি কোনও ভাবলুতা নয়। অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং সুনিশ্চিত বিশ্বাস। কি সেই বিশ্বাস?—তা হল কৃষ্ণভক্তি করলে দুনিয়ায় কোনও করার বাকি কিছু থাকে না। সব কিছু কর্তব্যই সম্পাদিত হয়ে যায়।

শূকরের মাংস খাওয়াটা নিশ্চয়ই কৃষ্ণভক্তির অনুকূল নয়, বরং ভক্তিপ্রতিকূল বা বিঘ্নস্বরূপ। কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজনই ভক্তির অঙ্গ। মাংস খেয়ে দুঃখময় প্রপঞ্চ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।

প্রসাদ সেবা করিতে হয় ।
সকল প্রপঞ্চ জয় ॥

প্রশ্ন ৩৮। আমরা শুনে থাকি 'ধর্মের জয়' হয়। কিন্তু দেখতে পাই 'অধর্মের জয়'। এর শাস্ত্রীয় যুক্তি কি?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে এরকম কথা বলা হয়েছে যে,—

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি ।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

"অধর্মের মাধ্যমে কাউকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে দেখা যায়, নানারূপে অভীষ্ট লাভ করতে দেখা যায়, তার শত্রুদেরও জয় করতে দেখা যায়। কিন্তু পরিশেষে অধর্মকর্তা সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।" (মনুসংহিতা ৪/১৭৪)

প্রশ্ন ৩৯। বহু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবৈধ সম্প্রদায় কিভাবে চিহ্নিত করা যায়?

উত্তর ঃ কলিযুগের যুগধর্ম হচ্ছে হরেকৃষ্ণ কীর্তন, কলিযুগে পাবনাবতারী ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। ধর্মের চারটি স্তম্ভ—দয়া, শৌচ, সত্য ও সাধনা সবই নষ্ট হয়ে যায় কলির চারটি পাপকর্মের ফলে, সেগুলি হল যথাক্রমে আমিষ আহার, নেশাভাঙ, জুয়া ও অবৈধ যৌনতা। এই বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশগুলি স্বীকার না করে যারা নিজ মনগড়া মতকেই ধর্মাচার বলে জাহির করে, তারা বৈধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন ৪০। সর্বদা সত্য কথা বলা যথার্থ নীতি কি না?

উত্তর ঃ মহর্ষি মনু বলেছেন—

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্ ।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদ্ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥

অর্থাৎ, "সত্য কথা বলা উচিত, অথচ তা প্রিয় হওয়া চাই। অপ্রিয় সত্য কথা কখনও বলা উচিত নয়, যা লোকের মর্মভেদ করে। লোকের প্রীতিকর এমন তোষামোদ ইত্যাদির মতো মিথ্যা কথা বলাও উচিত নয়। এই হচ্ছে বেদের সনাতন ধর্ম।" (মনুসংহিতা ৪/১৩৮)

প্রশ্ন ৪১। বেদ থেকে সব ধর্ম এসেছে। সমস্তই ভগবানের থেকেই প্রকাশিত। অতএব যে কোনও ধর্ম গ্রহণ করলেই তো প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে?

উত্তর ঃ না! সব ধর্ম বেদ থেকে আসেনি। বেদবিরুদ্ধ নানারকমের 'ধর্ম' পৃথিবীতে প্রচলিত যা ছল ধর্ম বা কৈতব ধর্ম বলে অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১/২) নির্দেশিত হয়েছে—

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরণাং সতাং।
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ॥

অর্থাৎ, 'জড়জাগতিক ভুক্তি-মুক্তি-কামনাবাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে ভাগবত নির্দেশিত পরম সত্য পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তুকে গ্রহণ করতে হবে যা একমাত্র নির্মৎসর অর্থাৎ, সম্পূর্ণ নির্মল হৃদয় ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করেন।'

ভগবানের বহিরঙ্গা মায়া শক্তি প্রভাবিত এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে ভাল-মন্দ সব রকম রয়েছে। সেই হিসাবে সমস্তই ভগবানের থেকে প্রকাশিত বটে। তবে কোন্‌টা গ্রহণীয় আর কোন্‌টা গ্রহণীয় নয়, সে সম্বন্ধেও পরম নিয়ন্তা ভগবানের নির্দেশ রয়েছে। ভগবৎ নির্দেশিত পথটাই গ্রহণ করতে হবে। যে কোনও ধর্ম, যে কোনও পথ গ্রহণ করলেই সুদুর্লভ মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। একই গাভী থেকে দুধও আসে, গোবরও আসে। দুধ উপাদেয় খাদ্য হলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি গোবরকেও উপাদেয় খাদ্য বলে কখনও মনে করেন না।

৯
জাতি বর্ণ আশ্রম

প্রশ্ন ১। যবন ও ম্লেচ্ছ কাদের বলা হয়?

উত্তর ঃ " 'যবন' মানে হচ্ছে মাংসাহারী। মাংসাশী সম্প্রদায়ের মানুষদের বলা হয় যবন। যারা নিষ্ঠাভরে বৈদিক বিধি-নিষেধ পালন করে না তাদের বলা হয় ম্লেচ্ছ। এই শব্দ দুটি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে বোঝায় না। কেউ যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও বৈদিক বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন না করে অথবা পশু-মাংস আহার করে, তা হলে সেও ম্লেচ্ছ বা যবনে পরিণত হয়।" (চৈঃ চঃ মঃ ১৮/২১৩ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

প্রশ্ন ২। যারা ধূমপান করে মাছ-মাংস খায়, তারা ম্লেচ্ছ কি না?

উত্তর ঃ কলিযুগের মানুষকে প্রধানত যে চারটি বৈদিক নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেইগুলি হল—১) আমিষ আহার, ২) মাদক দ্রব্য সেবন, ৩) জুয়া তাস পাশা খেলা ও ৪) অবৈধ যৌনসঙ্গ। এই নিষিদ্ধ কর্মগুলি যারা বর্জন করে চলে না তারা অবশ্যই যবন বা ম্লেচ্ছ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ৩। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে কেন যবন বলা হয়?

উত্তর ঃ পরম ভাগবত শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যবন কুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে উচ্চ ব্রাহ্মণ-গুণ সম্পন্ন ছিলেন এবং তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তিনি যবন ছিলেন না। যেহেতু, যবন কুলে আবির্ভাব লীলা প্রকাশ করেও তিনি শ্রীহরির দাসত্ব কিভাবে বরণ করতে হয়, সেটিই মানব-সমাজকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, তাই তিনি যবন হরিদাস নামে পরিচিত হয়েছেন। বিশ্ববাসী মানুষ যদি শুচিশুদ্ধ সুন্দর জীবন গঠন করতে চান, তবে এই কৃষ্ণভক্তি প্রচারক পরম পূজনীয় শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মতো উজ্জ্বল নক্ষত্রকেই অনুসরণ করবেন।

প্রশ্ন ৪। শ্রীহরির পূজা করার অধিকার কার—ব্রাহ্মণের, না বৈষ্ণবের?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীহরি সর্বময় আরাধ্য। তিনি সবারই ঈশ্বর—সর্বেশ্বর। তিনি কেবল ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব-নামধারীর শ্রীহরি মাত্র নন। তাঁর পূজা-অর্চনা, তাঁর নাম কীর্তন যিনিই করেন তিনিই ভক্ত, এবং হরিপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই ভগবানের প্রিয়। বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলা হয়েছে—

হরিনামপরা যে চ হরিকীর্তন তৎপরাঃ।
হরিপূজাপরা যে চ তে কৃতার্থা কলৌযুগে ॥

অর্থাৎ, "যাঁরাই হরিনাম-পরায়ণ, হরিকীর্তনে তৎপর ও হরিপূজা-পরায়ণ, তাঁরাই কলিযুগে কৃতার্থ।" শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন—*'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'* (১৮/৬৬) 'সর্বধর্মান্' বলতে মাতৃপিতৃ ধর্ম, লোকধর্ম, সমাজধর্ম, জাতিধর্ম সব বাদ দিয়ে একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিতে হবে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—এই

সকল বর্ণধর্মের উর্ধ্বে বৈষ্ণবের স্থান। (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০/১০০, ১০২) অর্থাৎ, বৈষ্ণব জাতিধর্মের অন্তর্ভুক্ত নন এবং বৈষ্ণব সবারই পূজনীয়। আবার চার বর্ণের প্রত্যেকের শ্রীকৃষ্ণের সেবা-অর্চনা করা কর্তব্য। কেবল ব্রাহ্মণ নামধারী ব্যক্তিই নয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ২২/২৬) উল্লেখ আছে—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে ।
স্বকর্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥

জাতি-বর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করবেন। এ সম্বন্ধে শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে (২/৭/৩৭) বলা হয়েছে—

চতুর্ণামপি বর্ণানাং গুরুকৃষ্ণার্চনং পরম্ ।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

মুখ বাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

অর্থাৎ, "বিরাট পুরুষের মুখ-বাহু-উরু-পদ থেকে সত্ত্ব ইত্যাদি গুণ ও ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমের সাথে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণ উৎপন্ন হয়েছে। এদের যারাই সাক্ষাৎ নিজ পিতা পরমেশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করে থাকে, তারাই নিজ নিজ স্থান অর্থাৎ, বর্ণাশ্রম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।"

জড় ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গাকে সদাশিব বলছেন—

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্বধর্মবিবর্জিতাঃ ।
বাসুদেবপরা মর্ত্যাস্তে কৃতার্থ ন সংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ, "ঘোর কলিযুগ সমাগত হলে সব রকমের তথাকথিত ধর্মবর্জিত মর্ত্যের জীব ভগবদ্‌পরায়ণ হয়ে নিঃসন্দেহে কৃতার্থ হয়ে থাকেন।" (সৎক্রিয়াসার দীপিকা)

যেহেতু এ যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র প্রত্যেকেই ভ্রষ্ট, অধঃপতিত ও মিথ্যা গর্বে গর্বিত, তাই বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হল মানুষকে বৈষ্ণব নির্দেশিত বৈদিক শাস্ত্রানুমোদিত আচার-অনুষ্ঠানে জীবনযাপন করতে অনুপ্রেরণা দেওয়া।

কলিযুগের চারটি সাধারণ পাপকর্ম অর্থাৎ, আমিষ ভক্ষণ, অবৈধ যৌনসঙ্গ, নেশা অর্থাৎ, তামাক-বিড়ি-সিগারেট-চা-দোক্তা ইত্যাদি সেবন, জুয়া-তাস-পাশা খেলা—যা কলির আশ্রয় বলে শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশিত, সে সব পাপকর্ম বর্জন করতে হবে, এবং কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম কীর্তন করতে হবে। পরমেশ্বর ভগবানকে কেন্দ্র করে যাঁদের সমস্ত কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনা—সেই সকল ভক্তি-অনুশীলনকারী ব্যক্তিগণই ভগবানের পূজক বা সেবক বলে পরিগণিত। তাঁরা যে আশ্রমে থাকুন, কিংবা যে বর্ণে থাকুন, সে সকল বিচার করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অপরাধমূলক। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১০/৯১) গ্রন্থে বলা হয়েছে—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥

অর্থাৎ, "ভগবান বলছেন, "অভক্ত চতুর্বেদপাঠী ব্রাহ্মণও আমার প্রিয় নয়, আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ হলেও আমার প্রিয়, এবং তার দেওয়া দ্রব্যই আমি গ্রহণ করি। আমি যেমন সবার পূজ্য, তেমনি আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে উদ্ভূত হলেও সেও ব্রাহ্মণাদি সকলের কাছে পূজ্য।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় উল্লেখ আছে—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য ।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার ।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৪/৬৬-৬৭)

প্রশ্ন ৫। মহাপ্রভু কেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে রেখে সন্ন্যাস নিলেন? সংসারে থেকে কি জীব উদ্ধার হত না?

উত্তর ঃ জগতের অধিকাংশ মানুষ কৃষ্ণকে চায় না। তারা কেবল পতি-পত্নী পুত্র-কন্যা ধন-রত্ন এই সব অনিত্য বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে। সারা জীবন স্ত্রী-পুত্রের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের যত রকমের অনর্থক আয়োজন। অথচ তারা বিলকুল ভুলে যায় যে, এই জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুময় জগতে একমাত্র উদ্ধারের পথ হল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করা। স্ত্রীসঙ্গ বাসনা এবং দুঃখময় সংসারের জটিলতায় জড়িয়ে পড়া কৃষ্ণভক্তি বিরুদ্ধ। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষানুশীলনকারীকে জড়জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। যদিও বা ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের ক্ষেত্রে গৃহত্যাগেরও কোন প্রয়োজন পড়ে না, তবুও কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য বৃহত্তর স্বার্থে এবং লোকশিক্ষাহেতু তিনি অতি প্রিয়তমা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ৬। সকল জাতি বর্ণ-ই কি বৈষ্ণব-মত গ্রহণ করতে পারে?

উত্তর ঃ বৈষ্ণব-মত বলে বিশেষ কোনও মতকে বোঝায় না। বৈষ্ণবতা মানুষের প্রকৃত লক্ষণ। বৈষ্ণব হচ্ছেন বিষ্ণুর উপাসক,—ভগবানের ভক্ত। ভগবদ্ভক্তি জীবের সহজাত অধিকার। এটিই বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভগবান পরম নিয়ন্তা। তিনি কোনও বিশেষ জাতির বা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নন। প্রত্যেকেই ভগবানের দাস। তাঁর দাসত্ব গ্রহণ করার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। এরকমটি নয় যে, এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ ভগবানের দাসত্ব করবে, আর অন্য শ্রেণীর মানুষ কুকুরের দাসত্ব করবে। যেমন আধুনিক যুগে শহরের কোন কোন ধনী ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠেই কুকুরের সেবা দিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারা গড় বাদ দিয়ে ডগ্—অর্থাৎ, ঠাকুরসেবা পছন্দ না করে কুকুরসেবা করতে ভালবাসে। কিন্তু সনাতন ধর্ম হল ভগবদ্ভক্তি-জীবনে আসীন হওয়া। এই ভক্তিজীবন ব্যতীত সমস্ত জীবনই পশুর জীবন মাত্র। *'ধর্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানা'।*

প্রশ্ন ৭। ধর্ম কি? ভাগবত ধর্ম কি শুধু হিন্দুদের জন্য, না সকল জাতির জন্য?

উত্তর : *'ধর্মং তু সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতম্।'* (শ্রীমদ্ভাগবত ৬/৩/১৯) ধর্ম হল স্বয়ং ভগবানের প্রণীত আইন। এই আইন অনুসারে মানুষের আচরণ করা বিধেয়। নতুবা *'ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ'* ধর্মহীন ব্যক্তি পশুর সমান। কারণ, ধর্ম মানুষের জন্য রচিত, পশুর জন্য নয়। সারা পৃথিবীর মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য সকলের ধর্মজ্ঞান অর্জন করা উচিত। ধর্মগ্রন্থ পাঠ শ্রবণ করা উচিত। প্রশ্নানুসারে, কেবল হিন্দুরাই ভাগবত ধর্ম অধ্যয়ন করবে, বাদবাকী মানুষেরা পশুর মতো থাকবে—এমন নয়।

প্রশ্ন ৮। গৃহে থেকেই কি ঈশ্বর দর্শন লাভ হয় না? না কি গৃহত্যাগ করতে হয়?

উত্তর : গৃহে থেকেও, গৃহত্যাগ করেও নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ভগবানের ভক্ত না হয়, ততক্ষণ সে একটা হীন, ছার এবং মূর্খ। গৃহমেধীরা গৃহে থেকে নরকগামী হয় এবং ফল্গুবৈরাগীরা গৃহত্যাগ করে নরকগামী হয়। যারা ইন্দ্রিয় লালসায় জড় বিষয় ভোগ এবং কাম চরিতার্থ করার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না দেখে লোকদেখানো বৈরাগ্য অবলম্বন করে, তারা ফল্গুবৈরাগী। যাঁদের মনোভাব পরমসুন্দর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের প্রতি সর্বদা উন্মুখ, তাঁরাই ভগবানকে লাভ করতে পারেন। প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা বলছেন—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন—'প্রেমের অঞ্জনে রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুতে ভগবৎদর্শন হয়।' (ব্রহ্মসংহিতা) কামচক্ষুতে কখনই ভগবৎ দর্শন হয় না।

প্রশ্ন ৯। জাতিবৈষ্ণব বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : বৈষ্ণবের বংশে যার জন্ম হয়েছে, তাকে জাতবৈষ্ণব বলা হয়। কিন্তু জাতবৈষ্ণব বৈষ্ণব নাও হতে পারে, সে অবৈষ্ণব হতে পারে। বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করলেই যে কেউ বৈষ্ণব হবে এমন নয়। সে ম্লেচ্ছও হতে পারে। বৈষ্ণবতা বিচার হয় জন্ম দিয়ে নয়। ভক্তিময় জীবনধারার মাধ্যমেই বৈষ্ণবতা বোঝা যায়। কুল পরিচয়ে কোন কিছু যায় আসে না। সবার পূজনীয় পরম বৈষ্ণব শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, প্রহ্লাদ মহারাজ অসুর কুলে জন্মগ্রহণ করেন। আবার, চাপাল গোপাল, জগাই ও মাধাই ইত্যাদি পাপাচারী ব্যক্তিরা উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যদিও বা তাঁরা পরবর্তী সময়ে মহাপ্রভুর কৃপায় মহান বৈষ্ণবে পরিণত হন। যারা বিষ্ণুপ্রসাদে রুচিবিশিষ্ট নয়, যাদের অপ্রসাদ বা অমেধ্য দ্রব্যে রুচি আছে, যারা মাছ, মাংস, বিড়ি, নস্যি ইত্যাদি গ্রহণে পটু, তারা তুলসীমালা পরলেও বৈষ্ণব শ্রেণীর নয়। আশার কথা এই যে, জাতগোসাঁই বা জাতব্রাহ্মণ, জাতবৈষ্ণব পরিচয়ধারী ব্যক্তিগণের অনেকে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ক্রমশ কলিযুগের যে চারটি নিয়ম—আমিষ আহার বর্জন, নেশা ভাঙ্ বর্জন, তাস জুয়া বর্জন ও অবৈধ সঙ্গ বর্জন—এই গুলি পালন এবং সংখ্যাপূর্বক হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছেন।

প্রশ্ন ১০। জগতে শূদ্রজাতি কারা?

উত্তর : শ্রীপদ্মপুরাণের মাঘমাহাত্ম্যে বলা হয়েছে—

সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে।

"ভগবান শ্রীহরির প্রতি ভক্তি না থাকলে যে কোন জাতিই হোক না কেন, তারাই শূদ্র বলে গণনীয়।" (হঃ ভঃ বিঃ ১০/১১২)

প্রশ্ন ১১। ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান। তা হলে অর্চাবিগ্রহ পূজার অধিকার ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সবাই পায় না কেন? তা হলে স্বয়ং ভগবান কি শুধু ব্রাহ্মণদের জন্যই?

উত্তর : পিতার কাছে সব সন্তান সমান হলেও, সবাই পিতার কথামতো চলে না। কেউ কেউ পিতার নির্দেশের বিপক্ষে পরিচালিত হয়। তার ফলে তারা পিতার প্রসন্নতার কারণ হতে পারে না। পিতার নির্দেশের বিরোধিতা করলে তার সেবা গ্রহণ করতে পিতা ইচ্ছা করেন না। যারা নির্দেশ মেনে চলে তাদেরই সেবা গ্রহণ করেন অর্থাৎ নির্দেশ পালনকারীদের সেবা-অধিকার লাভ হয়।

ব্রাহ্মণ সর্বজীবকে ভগবানের অংশকণারূপে দর্শন করেন। তিনি ভগবানের প্রসন্নতার জন্যই সদা সযত্ন প্রয়াসী থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে ভাগবতের (৭/৬/২৪) শ্লোকে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন, "হে আমার দৈত্য বন্ধুরা, তোমরা সকলে এমনভাবে আচরণ কর যাতে ভগবান তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। তোমাদের আসুরিক প্রবৃত্তি ত্যাগ করে শত্রুতা ও দ্বৈতভাব রহিত হয়ে কর্ম কর। সমস্ত জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শন কর। তোমরা অন্যদের ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান প্রদান কর।

এগুলিই হচ্ছে ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য। যে কেউই এই গুণবৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেন। অর্থাৎ, জীবহিংসা, মাছমাংসাদি ভক্ষণ, উচ্চনীচ বর্ণবিদ্বেষ ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না—যেগুলি ব্রাহ্মণগুণবিরোধী, তাতে ভগবান তথা অর্চাবিগ্রহ কখনও প্রসন্ন হন না। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

সেই মূর্তি করি' যেবা ভজে নারায়ণ।
জীব-হিংসা করে যদি নাহি প্রয়োজন ॥

(কৃঃ প্রেঃ ৭/৫/৩২)

সুতরাং, ভগবদ্ বিগ্রহ অর্চনার উদ্দেশ্যে শুদ্ধ আচরণশীল হওয়ার জন্য কলির চারটি পাপকর্ম—নেশা করা, মাছমাংস খাওয়া, তাসজুয়া খেলা ও অবৈধ মেলামেশা—পরিহার করে চলতে হয় এবং ভগবানের দিব্য নাম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপকীর্তন করতে হয়। এইভাবে শুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে যে কেউ ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন।

প্রশ্ন ১২। জাত বৈষ্ণব বা জাত গোঁসাই কি বৈষ্ণব?

উত্তর : বৈষ্ণবতা না রক্ষা করলে কেউ বৈষ্ণবকুলে জাত বা জন্মগ্রহণ করলেই যে বৈষ্ণব হয়ে যাবে এমন নয়। সে অবৈষ্ণব ম্লেচ্ছ হতে পারে। যেমন, বড় ডাক্তারের

ছেলে ডাক্তারী যদি না শেখে, না চর্চা করে, তবে তাকে ডাক্তার বলা হয় না। আবার ডাক্তারের ছেলে না হয়েও চাষীর ছেলে হয়েও ডাক্তার হতে পারে। তেমনই, চণ্ডালের কুলে জন্মগ্রহণ করেও মানুষ পরম পূজনীয় বৈষ্ণব হতে পারে। বৈষ্ণব ভগবৎপ্রসাদসেবী হন, তাঁরা আমিষ ভোজন, নেশা সেবন, জুয়া খেলা কিংবা অবৈধ যৌনতায় যুক্ত হন না, ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১৩। কলিযুগে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও মানুষ শূদ্রত্ব অর্জন করেছে। এ কথা কোন্ ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ মহাভারতের শল্য পর্বে (১৮৮/১৩ শ্লোকে) বলা হয়েছে—

হিংসানৃত-প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥

অর্থাৎ, "হিংসা (পরবিদ্বেষ, প্রাণীহত্যা), অনৃত (মিথ্যা ভাষণ, কুৎসা রটনা, অনর্থক প্রজল্প), লুব্ধ (লোভ, চৌর্যবৃত্তি, লাম্পট্য), সর্বকর্মোপজীবি (পাপপুণ্য যে-কোনও রকমের কর্ম করে জীবিকানির্বাহ), শৌচভ্রষ্ট (শুচিহীনতা)—এই সমস্ত দোষে কলুষিত ব্রাহ্মণেরা শূদ্রত্বই প্রাপ্ত হয়।"

মহাভারতের শল্যপর্বে (১৮৯/৭ শ্লোকে) বলা হয়েছে—

সর্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্বকর্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সর্বভক্ষ্যরতি (খাদ্য-অখাদ্য সব কিছু ভক্ষণে রতিবিশিষ্ট, শস্য ফুল ফল পাতা এবং পোকামাকড় জীবজন্তুর রক্ত মাংস হাড় পিত্ত—সব কিছুই খেতে পটু), সর্বকর্মকারী (পাপপুণ্যবিচার-শূন্য অসংযত সব কর্মই করতে পারে), অশুচি (নেশাভাঙ ধূমপানাদি করে কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা নাশ করে), ত্যক্তবেদধর্ম (বেদবিহিত পন্থা পরিত্যাগ করে), অনাচার (অবৈধ সঙ্গ, ব্যভিচার ইত্যাদি দোষে দুষ্ট), সেই ব্যক্তি শূদ্র বলেই কথিত হয়।"

কলিযুগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই সমস্ত দোষগুলি প্রবেশ করছে। দেখা যায়, ব্রাহ্মণ হয়েও ভাতের সঙ্গে মাছ, সকাল সন্ধ্যায় পুকুর ডোবায় জাল ফেলতে যাওয়া, কানে বিড়ি, গামছায় খৈনিজর্দার কৌটো, এইগুলি সবই নিম্নতর উপজাতির মানুষের নিদর্শন। প্রকৃত পক্ষে এরা ব্রাহ্মণ নয়।

প্রশ্ন ১৪। বর্তমান সামাজিক জীবনে জন্ম অনুসারে বর্ণপ্রথা প্রকটিত। এই জঘন্য বর্ণপ্রথা সংস্করণে আপনাদের প্রচেষ্টা আছে কি?

উত্তর ঃ যে যে-কুলেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার কোন্ ধর্তব্য নেই। কে কোন্ বর্ণ তাও দেখার দরকার কি? একদিক থেকে কলিযুগে আমরা সবাই শূদ্র। *কলৌ শূদ্র সম্ভবাঃ।* কিন্তু যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তনে ব্রতী হওয়াই আমাদের আসল কর্ম। আমরা যে যেখানে থাকিনা কেন, আমরা গণ্যমান্য হই কিংবা ফকির হই, সকলে চারটি

পাপকর্ম—নেশাভাঙ, আমিষাহার, অবৈধ যৌনতা এবং জুয়া-লটারি খেলা—বর্জন করে হরিনাম জপ-কীর্তন করে কৃষ্ণভক্তিময় জীবন-যাপন করতে চেষ্টা করি এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করি। তাতেই মানুষ বর্ণ-আশ্রমের উর্ধ্বে ধীরে ধীরে উঠতে পারবে। বড় জোর কমপক্ষে ব্রাহ্মণগুণ-সম্পন্ন হওয়ার জন্য মানুষকে চেষ্টা করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণ বিভাগের কথা, কৃষ্ণভাবনাময় জীবনে গুণ, কর্ম প্রবৃত্তি, রুচি ও যোগ্যতা অনুসারে কেউ তার বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কখনও কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূলে নয়। অবশ্য পরিশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শিক্ষা দিলেন, *নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুনঃ*—গুণের উর্ধ্বে যেতে হবে। অর্থাৎ, কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে যত্নপরায়ণ ব্যক্তি ব্রাহ্মণেরও উর্ধ্বে উন্নীত হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে বর্ণ বিচারের প্রশ্ন উঠে না। আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ভক্তবৃন্দ দেশ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার আহ্বান করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— *সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।* সব রকমের অনিত্য অস্থায়ী তথাকথিত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল হর্তাকর্তা বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাপন্ন হতে হবে। কৃষ্ণভক্তি বিনা জাগতিক সব বর্ণ-ধর্ম মূল্যহীন। মানুষ যে গুণের কিংবা আপন যোগ্যতায় যে কর্মে যুক্ত হোক না কেন কৃষ্ণভক্ত হয়ে তাকে ভক্তির অনুকূলে কর্ম করবার অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ১৫। সংসার ধর্ম শ্রেষ্ঠ, না সন্ন্যাস ধর্ম শ্রেষ্ঠ?

উত্তর ঃ গার্হস্থ্য জীবনের বৈদিক নিয়মকানুনগুলি মেনে চলাই গৃহস্থ ধর্ম, এবং সন্ন্যাস জীবনের বৈদিক নিয়মকানুনগুলি মেনে চলাই সন্ন্যাস ধর্ম। গৃহ-সংসারে থেকে শ্রীহরির পূজা অর্চনা, তুলসী সেবা, আরতি কীর্তন, কুটুম্ব ভরণ, অতিথি সেবা, গৃহস্থের বিবিধ সংস্কার সাধন, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা শুশ্রূষা, মাতা-পিতা পত্নী-সন্তানের পরিসেবা, সকলকে কৃষ্ণভাবনামৃতে ব্রতী করানো, স্বজন-পরিজন পোষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ, অত্যন্ত ধৈর্য ও সংযত ভাবে জীবন-যাপন করে চলতে হয়।

গৃহ-সংসার ছেড়ে একমাত্র শ্রীহরির চিন্তায় রত হয়ে, বিশ্বের সকলের মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা পরায়ণ হয়ে সকল জীবকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিবেন। যাতে অন্যান্য মানুষ গৃহ-সংসারে থেকে কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে কলত্র-মিত্র-অপত্য নিয়েই সারা জীবন গৃহমেধী চিন্তাধারা বজায় রেখে নরকগামী না হয়। তাই সন্ন্যাসীর কর্তব্য তাদের হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তিভাব জাগিয়ে তোলা। আবার গৃহস্থের কর্তব্য সাধু-সন্ন্যাসীগণ যাতে কোন কারণে কৃষ্ণভক্তি পথে বিঘ্নিত না হন সেজন্য তৎপর থাকা এবং শ্রীকৃষ্ণের করুণা প্রার্থনা করা।

বৈদিক ভারতবর্ষের ভগবৎ নির্ধারিত চারটি আশ্রম ব্যবস্থা ছিল। প্রথমে ২৫ বর্ষ অবধি গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি শিক্ষা, তারপর বিবাহ করবার ইচ্ছা হলে গুরুদেবের নির্দেশে গৃহে এসে বিবাহ যজ্ঞ সম্পাদন করে গৃহস্থ-জীবনের নিয়ম-কানুন দায়দায়িত্ব বহন করে চলা, তারপর ৫০ বছর বয়সের পর শিক্ষিত পুত্রের হাতে সংসার দায়িত্ব

দিয়ে কন্যাদের বিবাহাদি সম্পাদন করে বাণপ্রস্থী জীবনে প্রবেশ করতেন। পত্নীও ইচ্ছা করলে পতির সহগামিনী হতে পারেন। তারপর ৬৫-৭০ বছর বয়সে একাকী সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ ভগবৎ স্মরণ কীর্তন বন্দনাদি ভক্তিশিক্ষামৃতে আত্মনিয়োগ করেন এবং সারা দেশে পরিভ্রমণ করে মানুষকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। তারপর সম্পূর্ণ কৃষ্ণপাদপদ্মে মনোস্থির করে দেহত্যাগ করে ভগবদ্ ধামে উন্নীত হন।

কিন্তু বর্তমান যুগে বহু জটিল সমস্যা রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সুদৃঢ় মতি না থাকলে মানুষ যে আশ্রমে থাকুক না কেন সে সংসারী হোক কিংবা সন্ন্যাসী হোক—নরকেই তার গতি হয়। দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে কৃষ্ণভজনের অনুকূলেই নিয়ে যেতে হবে।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে ।
স্বধর্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥

গৃহস্থ জীবনের সব দায়দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ভজনে ব্রতী হয়েছেন, সেই গৃহস্থগণ ধন্য, সন্দেহ নেই।

কলিযুগে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপায় যাঁরা সন্ন্যাসী হয়ে সারা পৃথিবীতে যুগধর্ম হরিনাম বিতরণ করছেন তাঁরা সাধারণ মানুষ নন। তাঁরা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং ভগবানের করুণার সমুজ্জ্বল মূর্তি।

প্রশ্ন ১৬। আর্য সভ্যতা কাকে বলে?

উত্তর ঃ শ্রীহরির নাম মহিমা কীর্তন, ভগবদ্ভক্তি আচরণ যে সভ্যতায় হয়ে থাকে তাকেই আর্য সভ্যতা বলে। শ্রীদেবহূতিদেবী ভগবান শ্রীকপিলদেবকে বলছেন—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

"হে ভগবান। যাঁদের জিহ্বায় আপনার দিব্য নাম বিরাজ করে, তাঁরা যদি অত্যন্ত নীচকুলেও জন্ম গ্রহণ করেন, তা হলেও তাঁরা শ্রেষ্ঠ। যাঁরা আপনার নাম কীর্তন করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই সব রকমের তপস্যা, যজ্ঞ, তীর্থস্নান, বেদপাঠ করেছেন। সুতরাং, তাঁরাই আর্য মধ্যে পরিগণিত।" (ভাঃ ৩/৩৩/৭)

প্রশ্ন ১৭। সমস্ত জীব তো ভগবানের সৃষ্টি, তবে অনেক জীবের প্রতি ঘৃণা করা হয় কেন?

উত্তর ঃ এই জগতে ভগবানের সৃষ্ট জীব হলেই যে আকর্ষণীয় তা নয়। ব্রাহ্মণের সন্তান যে ব্রাহ্মণই হবে এমন নয়, সে শূদ্র হতে পারে। শূদ্রাধম হতে পারে, আমিষভোজী বা নেশাখোর হতে পারে। কুকর্ম করতে পারে। তখন সে অন্যের কাছে ঘৃণার পাত্র হবে। মানুষ যখন কুকর্মফলে শূকর জন্ম পেয়ে বিষ্ঠা খেতে আরম্ভ করে তখন অন্য মানুষ তাকে বিষ্ঠা খেতে দেখে থুৎকার দেবে। এটাই তো জড় জগতের

নিয়ম। প্রকৃতপক্ষে এখানে কেউই প্রশংসা বা ঘৃণার পাত্র নয়। প্রত্যেকেই তার কর্মফল অনুসারে জীবনলাভ করছে। কোন কোনও কুকুরকে লোক পরম সমাদরে সেবা করছে, কোন কোনও মানুষকে লোকে লাঞ্ছিত করছে। এরকমই এক এক জনের ভাগ্য। সবাই যদি সুখী হতে চায়, শান্তি পেতে চায়, আনন্দ পেতে চায়, আদর পেতে চায়, তা হলে পন্থা হচ্ছে, অবশ্যই সচ্চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠ জগতে পালাতে হবে। সেজন্য সুখ-দুঃখ আদর-ঘৃণা সবগুলিই তুচ্ছজ্ঞান করে একান্তভাবে হরিনাম করতে হবে। এমনকি এ জগতে এও ঘটে যে, আমি ঘৃণ্য কাজ না করলেও এক শ্রেণীর মানুষের কাছে আমি ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হব। তা ছাড়া আত্মাকে বাদ দিলে এই কফ পিত্ত বায়ু ও মলমূত্র-পূর্ণ জড় শরীরটা তো ঘৃণার বস্তু বলেই দেহ ত্যাগের পর দাহ করে ফেলা হয়।

প্রশ্ন ১৮। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেশভ্রমণ কালে ব্রাহ্মণগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন বা ভোজন করতেন। কিন্তু বর্তমানে মহাপ্রভুর ভক্তরা ব্রাহ্মণগৃহে ভোজন করেন কিনা?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে শিক্ষা দিলেন যে, চারি বর্ণের মধ্যে যারা অভিশপ্ত, পতিত বা নিন্দনীয় তাদের গৃহে ভোজন করা নিষিদ্ধ। একাদশ স্কন্ধের সেই ভাগবতীয় কথার বিবৃতিতে মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীপাদ বলেছেন, যাঁরা সদ্‌বৃত্তিতে যুক্ত, যাঁরা মাছ-মাংস ভক্ষণ করেন না, যাঁরা হরিভজন করেন, সেই গৃহস্থের গৃহে ভোজনে দোষ নেই।

প্রশ্ন ১৯। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ বৈষ্ণবদের পক্ষে গ্রহণ করা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ আমিষ আহারী, নেশাসেবী তথাকথিত বহু ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপূজায় অংশগ্রহণ করে থাকেন বিশেষত এই কলিযুগে। তাঁরাও নিজেদের বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞান করে থাকেন। সেক্ষেত্রে প্রসাদ না গ্রহণ করলে ভাল হয়।

প্রশ্ন ২০। মেয়েরা শালগ্রাম শিলার অর্চনা করতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ মঠ-মন্দিরের অভ্যন্তরে স্ত্রীলোকের সেবাদি নিষিদ্ধ। কিন্তু সদ্‌গুরুর নিকট যথাবিধি দীক্ষিত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হলেও নিজ গৃহের সেবা-মন্দিরে অবশ্যই সেবা-পূজা করতে পারেন। নিষ্ঠাবতী দীক্ষিতা ব্রহ্মচারিণী বা ব্রাহ্মণীকে ব্রহ্মচারীদের মতো উপবীত ধারণ করতে হয় না। তিনি শালগ্রাম অর্চনা করতে পারেন। কর্মজড় স্মার্তরা সাধারণতঃ শালগ্রামকে চিড়া, ফলমূল বা মালসাভোগ নিবেদন করে থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণবরা পক্ক অন্নাদি উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্যও নিবেদন করবেন।

প্রশ্ন ২১। বৈষ্ণবরা মাথায় শিখা রাখেন কেন?

উত্তর ঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে, শ্রীচৈতন্যশিক্ষার সঙ্গে নিজের মস্তক বন্ধন করবার উদ্দেশ্যে দীক্ষিত ও হরিনামাশ্রিত ব্যক্তিমাত্রেরই শিখা রাখার দরকার। শিখার অপর নাম—শ্রীচৈতন্য শিক্ষা।

প্রশ্ন ২২। বৈষ্ণব কি এক প্রকার বংশ বা জাতি?

উত্তর ঃ বৈষ্ণব-বংশ বা বৈষ্ণব-জাতি বলে কোন কথা হয় না। বংশ পরম্পরায় যে বৈষ্ণব হবে, সেরকম কোনও ঠিক নেই। অনেক বৈষ্ণব-বংশে কুলাঙ্গারও জন্ম নিয়ে অসুরের মতো কাজ করতে পারে। আবার চণ্ডাল বা যবনকুলেও অনেকে জন্ম নিয়ে শুদ্ধভক্তির বলে বৈষ্ণব হয়েছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি' প্রবন্ধে বলেছেন, "বৈষ্ণব-জাতি বা বৈষ্ণবাচার্য-বংশ বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণবধর্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্ধা বাড়িয়া যাইতেছে।" (সজ্জনতোষণী ৯/৯)

প্রশ্ন ২৩। কলিযুগে মাংসভোজী রাক্ষসরা ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করবে। এ কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে?

উত্তর ঃ যদিও বলা হয়েছে—

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু (বরাহপুরাণ)

'রাক্ষসেরা কলিযুগের সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে' তবুও ব্রাহ্মণ পরিবার মাত্রই যে রাক্ষসশ্রেণীর মানুষ হবে এরকম মনে করা উচিত নয়। কারণ ব্রাহ্মণকুলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং অনেক পরম বৈষ্ণবের আবির্ভাব ঘটেছে। কলিযুগের শেষভাগে ব্রাহ্মণ কুলেই ভগবান কল্কির আবির্ভাব হবে। তবে বরাহপুরাণে বলা হয়েছে যে, 'পূর্ব যুগের অসুর বা রাক্ষসেরা কলিযুগে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিয়ে সাধু ব্যক্তিদের উৎপীড়ন করে থাকে।'

প্রশ্ন ২৪। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন্ শ্রেণীর লোককে কৃষ্ণভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আপামর জনসাধারণ সবাইকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর লোক ভক্ত হবে বাদবাকিগুলো অভক্ত থাকবে—এই ধরনের শিক্ষা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেননি। তিনি শিখিয়েছিলেন 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। 'জীব মাত্রই কৃষ্ণভক্তিতে থাকা দরকার। অন্যথায় কৃষ্ণভক্তিহীন জীবন হচ্ছে জীবের বিকৃত অবস্থা। তিনি কৃষ্ণভক্তিহীন হিন্দুকেও কৃষ্ণভক্তিতে এনেছিলেন। মুসলমান, বৌদ্ধ ইত্যাদি তথাকথিত ধর্মশ্রেণীর লোককেই কেবল নয়, মায়াবাদী, নিরাকার ব্রহ্মবাদী, যোগী, তপস্বীকেও কৃষ্ণভক্তিতে এনেছিলেন, পণ্ডিত, মূর্খ, রুগ্ন, সুস্থ, পঙ্গু, অন্ধ—সবশ্রেণীর লোককেই শুধু নয় মহাপাপাচারীদেরও কৃষ্ণভক্তিপথে আসীন করিয়েছেন। নারী, পুরুষ, ভোগবাদী, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী সবাইকেই কৃষ্ণভক্তির উপদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তৃণ গুল্ম, পশু, পাখী সকলেই তাঁর কৃপায় বৈষ্ণবধর্ম সনাতন ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আর তিনি যাঁদের কৃষ্ণভক্তি উপদেশ বা শিক্ষা দিয়েছিলেন তারাই একে একে অন্যদের কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের শিক্ষা দান করেছেন। এভাবে সারা জগদ্বাসীকে কৃষ্ণভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতেই মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রশ্ন ২৫। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (গীতা ২/৩) শ্রীপাদ অর্জুনের হৃদয়ের দুর্বলতাকে কেন 'ক্লীবতা' এই ক্ষুদ্র শব্দে আখ্যায়িত করলেন? আবার 'উঠে দাঁড়াও' বলতে কি সামর্থের সেবা করা বোঝাচ্ছেন?

উত্তর ঃ ক্লৈব্যং বা ক্লীবতা বলতে বোঝায় 'কাতরতা।' একজন বীর সেনাধ্যক্ষের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সজ্জার মাঝখানে এসে কাতর হওয়া বা বিষণ্ন ভাব পোষণ করা ক্ষাত্র ধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যাপার। শৌর্য ভাব অবলম্বন করে অধর্মের বিরুদ্ধে বীরের মতো যুদ্ধ করতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে 'ক্লীব' বলে ধিক্কার দিয়ে তাঁর হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন এবং 'উত্তিষ্ঠ পরন্তপ—উঠে দাঁড়াও হে শত্রুতাপন' বলে ধর্ম শত্রুর বিরুদ্ধে বীরের মতো যুদ্ধ করতে প্রেরণা দিলেন।

প্রশ্ন ২৬। শ্রীকৃষ্ণ পরম ইচ্ছাময়। অনাদিরও আদি। তাঁর মৃত্যু বলে কিছু নেই। অথচ তিনি এক নিচু জাতের হাতে তীরের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন কেন?

উত্তর ঃ যেহেতু তিনি পরম ইচ্ছাময়, সেই হেতু তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল পূর্ব অবতারে বালীপুত্র ভক্তিমান অঙ্গদের তীরের আঘাতে মৃত্যু লীলা করবেন, তাই তেমনটি ঘটেছিল, সেখানে নীচু জাতের হাতে কিংবা উচ্চ জাতের হাতে মৃত্যুবরণ করবার প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। যেহেতু তাঁর ইচ্ছাই পরম।

প্রশ্ন ২৭। সদাচার সম্পন্ন গৃহস্থ-গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া যায় কি?

উত্তর ঃ 'কিবা বর্ণী কিবাশ্রমী কিবা বর্ণাশ্রমহীন ।
কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা যেই, সে-ই আচার্যপ্রবীণ ॥' —(*প্রেমবিবর্ত*)

গুরু সন্ন্যাসী, না গৃহস্থ—সেটা বড় কথা নয়। সদ্গুরুপরম্পরা ধারায় আশ্রিত শাস্ত্রীয় আচরণবিধি যুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ কৃষ্ণভক্তের কাছে দীক্ষা নেওয়া যায়। তবে অন্ধ বিশ্বাস কিংবা সন্দিগ্ধ চিত্তে কখনও দীক্ষা নেওয়া উচিত হবে না, তাতে বিপদ বেশি। এছাড়া পরিষ্কারভাবে জানা দরকার যে, সেই গৃহস্থ বৈষ্ণব কোনও যথার্থ সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা। চারটি যথার্থ সম্প্রদায় হল ঃ (১) ব্রহ্ম-মধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়, (২) কুমার সম্প্রদায়, (৩) শ্রীসম্প্রদায় এবং (৪) রুদ্র সম্প্রদায়। এছাড়া সব অপসম্প্রদায়।

প্রশ্ন ২৮। বিষয়ী ব্যক্তি কি এই সংসারে থেকে কৃষ্ণভজন করতে পারে?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ রয়েছে—

'গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে ।
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে ॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫/১০৩)।

শ্রীসত্যরাজ খান মহাপ্রভুকে বলছেন—'দয়া করে আজ্ঞা করুন আমার মতো গৃহস্থ বিষয়ী লোকের সাধন ভজন কিরূপে করতে হবে।' তখন—

'প্রভু কহেন—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব সেবন ।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন ॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫/১০৪)

সুতরাং, কৃষ্ণভজনে বিষয়ী অবিষয়ী জাতকুল বিচার অনর্থক। বরং—

'যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/৬৭)

প্রত্যেকেরই কৃষ্ণভজন করা উচিত—এটাই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ। কৃষ্ণভজনাকারীর সমস্ত জড় বিষয়বাসনা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে যায়। গৃহে থেকেও যিনি কৃষ্ণসেবা করছেন, তাঁকে কখনই বিষয়ী বলা যায় না।

প্রশ্ন ২৯। কোনও হিন্দু ব্যক্তি যদি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, তার ফল কি হবে?

উত্তর ঃ সনাতন ধর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব-বিধি না মানলে হিন্দুধর্মেরও কোনও মূল্য নেই। যারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানে না, যারা জাগতিক কামনাতৃপ্তির জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা জাহির করে, তারাও হিন্দু। কেউ কেউ আবার জীবকেই ভগবান বলে, অথচ অন্যান্য জীবদের যেমন মাছ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী ইত্যাদির মাংস পুষ্টিকর খাদ্য জ্ঞানে গ্রহণ করে। তারাও হিন্দু। এই ধরনের ব্যক্তিরা ভগবানকে জানে না।

আবার, মুসলমানদের ধর্মে এক আল্লা—একজনই পরমেশ্বর এই কথাটি সত্য হলেও তারা পরমেশ্বরের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। মূল কোরাণ গ্রন্থে কোথাও পশুবধের কথা উল্লেখ নেই। অথচ তারা নির্বিচারে গোহত্যা করে চলেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং মুসলমান চাঁদকাজীর কথোপকথনে বোঝা যায় যে, মুসলিম ধর্ম শাস্ত্রের ভিত্তি যথার্থ নয়। মহাপ্রভু চাঁদকাজীকে বলেছিলেন, গোহত্যা করলে অনন্তকোটি বছর ধরে রৌরব নামক নরকে গিয়ে যমযাতনা ভোগ করতে হবে।

গো-অঙ্গে যত লোম, তত সহস্র বৎসর ।
গোবধী রৌরব-মধ্যে পচে নিরন্তর ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১৭/১৬৭)

প্রশ্ন ৩০। বিবাহের ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণভেদ মানা উচিত কি না? বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়তে হলে বিবাহ কিভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ অবশ্যই বিবাহ সম্পর্কে পাত্রপাত্রীর জাতিবর্ণভেদ বিচার করা উচিত। পাত্রী সাধারণত পাত্রের চেয়ে নিম্ন বর্ণের বা সমবর্ণের হলে ভাল। পাত্র-পাত্রীর জন্ম কোষ্ঠী বিচার করে বিবাহ যোটক নির্ধারিত হয়। খেয়ালখুশি মতো বিবাহ হলে জীবনে মনোমালিন্য ও অশান্তি নেমে আসে।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়তে হলে বিজাতি বা বিদেশী কাউকে বিয়ে করলেই বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে না। বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে—সবাই ভগবানের সন্তান, এই বুদ্ধিতে বিশ্বব্যাপী সর্বত্র হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে।

প্রশ্ন ৩১। বিবাহিত জীবনে সিঁদুর পরা বা না পরা ধর্মীয় কোন বাধা আছে কি না?

উত্তর ঃ বিবাহিত জীবনে পতি বর্তমানে আর্য সভ্যতার সতী রমণীগণ সিঁদুর পরতেন। শাঁখা এবং সিঁদুর সতীত্বের প্রতীক।

প্রশ্ন ৩২। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহঃ ॥ (গীতা ৩/৩৫) তবে পৃথিবীর যে সব অন্য ধর্মের লোক সনাতন ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাদের পরিণতি কি ক্ষতিকর?

উত্তর ঃ স্বধর্ম বলতে মানুষের বর্ণাশ্রম ধর্মকে বোঝায়। ভগবান সমাজকে সুষ্ঠু পরিচালনার্থে বিচিত্র মানুষদের গুণ ও কর্মবৈশিষ্ট্য অনুসারে চার বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং চার আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এইভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম সৃষ্টি করেছিলেন।

এরূপ ভগবদ্‌বিহিত দৈববর্ণাশ্রমের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের বিধিনিয়ম পালন করে ভগবান শ্রীহরির সন্তোষবিধানের যত্ন করবেন। এটিই তাঁর স্বধর্ম।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৩/৮/৯ শ্লোক এবং শ্রীপদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে ৫৩ অঃ বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

অর্থাৎ, "বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম আচারযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান আরাধিত হন। বর্ণাশ্রম-আচার ব্যতীত তাঁকে পরিতুষ্ট করবার অন্য কোন কারণ নেই।"

সমস্ত ধর্ম কর্ম ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হওয়া উচিত। এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বার বার উল্লেখ করেছেন।

কারও বৃত্তিগত ধর্ম ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কেবলমাত্র পরমেশর ভগবানের আরাধনার দ্বারাই বৃত্তিগত ধর্মানুষ্ঠান সার্থক হয়। (গীতা ১৮/৪৬) আপন বৃত্তি অনুসারে কেউ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ বা শূদ্ররূপে বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধিবিধান পালন করে গেলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা স্মরণ করে ভগবানের ভক্ত না হন, তা হলে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তির সমস্ত কার্যকলাপ সমস্ত বৃত্তি ও ধর্ম অনুষ্ঠান কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। (ভাঃ ১/২/৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ রয়েছে—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে ।
স্বকর্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥ (মধ্য ২/২৬)

প্রতিটি জীবই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। 'জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস'। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ* (গীতা ১৫/৭) অর্থাৎ, সমস্ত জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সনাতন অংশস্বরূপ। তাই কৃষ্ণভক্তিই জীবের সহজাত প্রবৃত্তি।

কিন্তু মানুষ ঐধর্ম, সেই ধর্ম, অমুক ধর্ম, তমুক ধর্ম করে করে মাথা ঘামিয়ে ফেলছে। শ্রীকৃষ্ণ তাই ঘোষণা করছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত রকমের ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে কোন দুশ্চিন্তা করো না।"

শ্রীকৃষ্ণ ভজনই সনাতন জীবের সনাতন ধর্ম। একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ছাড়া জগতে সমস্ত ধর্মই কৈতব ধর্ম। কারণ কৃষ্ণভক্তি ছাড়া কোনও ধর্ম এই জড় জগতের বদ্ধ জীবকে চিরতরে উদ্ধার করতে পারে না।

অনেকের মনে একটি বদ্ধমূল বাজে ধারণা গেঁথে রয়েছে যে জন্যে তারা হিন্দু ধর্ম, মুসলিম ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্ম ইত্যাদির মধ্যে নিজেকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান—এগুলি মানুষের নিছক মনগড়া অতি তুচ্ছ উপাধি বিশেষ, এগুলি প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মই নয়, মতবাদ মাত্র।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন, *মামনুস্মর যুধ্য চ* (গীতা ৮/৭) অর্থাৎ, ভগবানের চরণে শরণাগত হয়ে ভগবানের দ্বারা আয়োজিত যুদ্ধে নিযুক্ত হয়ে ক্ষত্রিয় বীরের মতো যুদ্ধ করতে শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন। পরমনিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান সবাইকে ভক্ত হতে নির্দেশ দিয়েছেন—*মন্মনা ভব মদ্ভক্ত*। আমাতে মন রাখ, আমার ভক্ত হও। অভক্ত হয়ে থাকাটাই অপর ধর্ম। আর সেটিই ভয়াবহ। *পরধর্ম ভয়াবহঃ।*

প্রশ্ন ৩৩। 'যারা কৃষ্ণভজন করে না তারা ম্লেচ্ছজাতের অন্তর্ভুক্ত।' এ কথার অর্থ কি?

উত্তর ঃ এই কথাটা কোথায় আছে জানি না। তবে শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে না, তারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য কিম্বা শূদ্রশ্রেণীর মধ্যেও পরিগণিত হয় না। তারা চারি বর্ণের স্তর থেকেই ভ্রষ্ট।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

"সেই পরম পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ থেকে সত্ত্বাদি গুণ এবং ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস আশ্রমের সঙ্গে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ উৎপন্ন হয়েছে। এদের মধ্যে যে সব ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজপিতা পরমেশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করে থাকে, তারা নিজ নিজ স্থান অর্থাৎ, চারিবর্ণ ও চারি আশ্রম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।" (ভাঃ ১১/৫/২-৩)

যারা কৃষ্ণভজন করে না তারা ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—যে আশ্রমেই থাকুক না কেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—যে বর্ণেই অবস্থান করুক না কেন, তারা নারকী। সেই কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ উল্লেখ করেছেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে ।
স্বকর্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/২৬)

অর্থাৎ, চারি বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যে থেকেও নিজ নিজ ধর্ম পালন করে গেলেও যদি কৃষ্ণভজন না করা হয়, তা হলে জড়জাগতিক অভিমানবশে উচ্চতা লাভ করেও অবশেষে পুণ্যক্ষয়ে অবশ্যই রৌরবে পড়তে হবে।

সেইজন্যে, মানুষ যে বর্ণাশ্রমের হোক না কেন, এমনকি পাপযোনিও যদি হয় তাকে কৃষ্ণভজন করেই দুঃখময় জগৎ উত্তীর্ণ হতে হবে। শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"সর্বপ্রকার কামনাযুক্তই হোক, কিংবা সম্পূর্ণ নিষ্কাম হোক, কিংবা মুক্তিকামীই হোক্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তীব্র শুদ্ধভক্তি যোগে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবেন।" (ভাঃ ২/৩/১০)

প্রশ্ন ৩৪। আমরা বৈশ্য জাতি। ব্রাহ্মণ নই। আমরা ভগবদ্ বিগ্রহ রেখে সেবা করতে পারি না। কিন্তু ভগবানের কোনও চিত্র রেখে সেবা-পূজা করলে তা যথার্থ কি না?

উত্তর ঃ জন্মগতভাবে যে ব্রাহ্মণ হতে হবে এমন কথা নেই। তবে ভগবানের ভক্ত হতে হবে। তার জন্য আমিষ আহার, নেশাভাঙ, জুয়া তাস, অবৈধ সঙ্গ থেকে সযত্নে এড়িয়ে থাকতে হবে। এভাবে কমপক্ষে ব্রাহ্মণগুণ সম্পন্ন হওয়া যায়। ভগবানের নামগ্রহণ এবং দীক্ষা সংস্কারাদির মাধ্যমে ব্রাহ্মণের উপনীত গ্রহণ করা যায়। তখন বিগ্রহ স্থাপন করে সেবাপূজা করার অধিকার জন্মায়।

বৃন্দাবনে অধিকাংশ ব্যক্তিই বৈশ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। যশোদা-নন্দমহারাজ বৈশ্য ছিলেন। তাঁদের সেবাপূজা কি ভগবান কৃষ্ণ গ্রহণ করতেন না? ব্রজবাসীদের ঘরে ঘরে লুকিয়ে রাখা খাদ্যদ্রব্য ভগবান চুরি করেও খেতেন।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থী-সন্ন্যাসী এই—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/২৬)

ভগবদ্ ভজন বিনা কারও সদ্গতি হয় না। তার মধ্যে আবার গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহে ভগবদ্ বিগ্রহের অর্চনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য বিগ্রহ আট রকমের হয়—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী ।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥

(ভাগবত ১১/২৭/১২)

অর্থাৎ, "পাথরের, কাঠের, লোহা, সোনারূপাদি ধাতুর, মাটির, চিত্রপটের, বালুকার, হৃদয়ে মানসের, মণিরচিত এই আট রকমের প্রতিমা বা ভগবদ্ বিগ্রহের কথা শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ রয়েছে।"

সুতরাং, আপনি ছবি বা চিত্রপট রেখে সেবা পূজা করছেন। এইভাবে বিগ্রহসেবা অনেক ভক্তই করে থাকেন।

প্রশ্ন ৩৫। দীক্ষাগ্রহণ করলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। এটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ কলিযুগে সবাই শূদ্র। *কলৌ শূদ্র সম্ভবাঃ।* কিন্তু পারমার্থিক গুরুদেবের কাছে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হওয়া যায়। নিশ্চয়ই দীক্ষা না নিয়ে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। দীক্ষা সংস্কার হলেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। প্রতিদিন বেশ কয়েক মাস সংখ্যাপূর্বক ঠিক ঠিক ভাবে হরিনাম জপ, আমিষ-নেশা-জুয়া-অবৈধসঙ্গাদি পাপকর্ম বর্জন করে চললে হরিনাম দীক্ষা দেওয়া হয়, এবং তারপর নিয়ম নিষ্ঠামতো ভগবৎ সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ করে চলছে এরূপ পরীক্ষা করে ব্রাহ্মণদীক্ষা দেওয়া হয়। অতএব দীক্ষা মাধ্যমেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়।

পক্ষান্তরে উপবীত গলায় রয়েছে, আর মাছ মাংস খাচ্ছে, পূজায় ঘণ্টাও নাড়ছে, ধূমপানও করছে আর বৈদিক মন্ত্রও প্রচুর পাঠ করছে—তাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

প্রশ্ন ৩৬। আমি যদি কৃষ্ণভজন না করি, আমি যদি সমাজ সংসারের নিয়ম বা কর্তব্যগুলি পালন করে চলি। তবে কি আমার সদ্‌গতি হবে না?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

অর্থাৎ, 'সমাজ সংসারে মানুষ তার নিজ বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যে যাবতীয় নিয়মকানুন বা কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে গেলেও, সাক্ষাৎ সকলের উৎস পরমেশ্বরকে ভজন না করে, তা হলে ভজন অবজ্ঞা হেতু স্বস্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সে অধঃপতিত বা নারকীয় অবস্থায় পতিত হয়। (ভাঃ ১১/৫/৩)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে ।
স্বকর্ম করিতেহ সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যদি তাদের নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম পালন করে চলেও, কিংবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী যদি তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম সর্বতোভাবে পালন করেও, কৃষ্ণভজন না করে তা হলে তারা জড় জাগতিক অভিমান বশে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেও পরিণামে পুণ্যক্ষয়ে অবশ্যই নরকে নিমজ্জিত হয়। (চৈঃ চঃ মধ্য ২২/২৬)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা এই, যে যেখানে থাকুক না কেন, যে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করুক না কেন, সমাজে যে শ্রেণীর লোক হোক না কেন তার অবশ্যই কৃষ্ণভজন করতে হবে। গৃহে থাকো, বনে থাকো, সদা 'হরি' বলে ডাকো।

যাঁরা আপনার মতো 'জীবনের সদ্‌গতি' বাসনা করেন তাঁকে অবশ্যই সদ্-চিদ্-আনন্দময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করতে হবে।

প্রশ্ন ৩৭। কলিযুগে তো ব্রাহ্মণ নেই। অর্চনা করবে কে? যুগধর্ম তো হরিনাম সংকীর্তন। তা হলে বিগ্রহ অর্চনা না করলেও তো চলে?

উত্তর ঃ কলিযুগের মানুষ নারায়ণপরায়ণ হবে। ভগবানের নাম কীর্তন করবে। তারাই পূজা-অর্চনা করবে। যারা মাছ-মাংস-ডিম ভক্ষণ করে, ধূমপান করে তারা পূজার্চনার অযোগ্য। নাম কীর্তন পরায়ণ ব্যক্তিরাই ব্রাহ্মণ। হরিনাম কীর্তনকারীরা নিশ্চয়ই আহারাদি বন্ধ করে সারাদিন কেবল হরিনামই করতে থাকবে না। তাদেরও কিছু ভোজন করতে হবে। কি ভোজন করবে? শ্রীহরির মহাপ্রসাদ। তা হলে শ্রীহরির পূজা-অর্চনা, শ্রীহরিকে ভোগ নিবেদন অবশ্যই করতে হবে। কলির জাত-ব্রাহ্মণেরা রোজ পূজা-অর্চনায় যাওয়ার আগে মাছ-মাংস ভক্ষণের জন্য চিন্তা করেন। তাই সকাল সকাল আমিষ বাজারে কিংবা খালবিলে জাল ফেলতে যান। তারা অপ্রসাদ ভক্ষণে অভ্যস্ত।

ভাগবতে, নিজ শরীর পুষ্টি ও ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য মাছ-পশু-পাখী তথা জীবহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ম্লেচ্ছদের কর্ম হচ্ছে জীবহত্যা জীবহিংসা করা। ব্রাহ্মণ যদি সেই কর্ম করে তা হলে সে বিগ্রহ অর্চন করার অযোগ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী গ্রন্থে সেরকম ব্যক্তিকে ভগবদ্ বিগ্রহ অর্চন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

সেই মূর্তি করি' যেবা ভজে নারায়ণ ।
জীব-হিংসা করে যদি, নাহি প্রয়োজন ॥

(কৃঃ প্রেঃ ৭/৫/৩২)

প্রশ্ন ৩৮। ভগবান বলছেন স্বধর্ম আচরণই শ্রেষ্ঠ, পরধর্ম ভয়াবহ। তা হলে একজন কসাই, তার ধর্ম হচ্ছে জীবহত্যা করা। সেটাই কি শ্রেষ্ঠ?

উত্তর ঃ সমাজে চার আশ্রম ও চার বর্ণের মানুষদের মধ্যে যে যে আশ্রমে ও যে বর্ণের অন্তর্ভুক্ত আছে, সে সেই আশ্রমের এবং সেই বর্ণের বিধিনিষেধগুলি পালন করে চলাই তার স্বধর্ম। স্বধর্ম আচরণের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। ভগবদ্গীতায় এই পন্থাটিকে কর্মযোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সকলেরই স্বধর্ম রয়েছে, কিন্তু সেই জড় জাগতিক বৃত্তিটি কখনই জড়জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে সাধন করা উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তার বৃত্তিগত কর্মটি ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত করা।

সেই জন্য ভগবানের উক্তি হল—

যঃ স্বধর্মেণ মাং নিত্যং নিরাশীঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
ভজতে শনকৈস্তস্য মনো রাজন্ প্রসীদতি ॥

"কেউ যখন তার স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে, কোনরকম জড়জাগতিক লাভের প্রত্যাশা না করে আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে তার অন্তরে অনাবিল তৃপ্তি লাভ করবে।"

অর্জুন ক্ষত্রিয়। বীরের মতো যুদ্ধ করাটাই তার ধর্ম। কিন্তু পত্নী লাঞ্ছনা, গৃহদাহ, বিষপ্রয়োগ, রাজ্য হরণ ইত্যাদির প্রতিশোধ নেওয়া কিংবা হস্তিনাপুর রাজ্য ফিরে পাওয়াটা সেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়। কেবলমাত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্যে, শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে যুদ্ধ করা হচ্ছে মূল কথা। সেটাই পরম ধর্ম।

কসাই হতে, কসাইখানা খুলতে, পশুহত্যা করতে কোনও শাস্ত্রে কোনও ধর্মে অনুমোদন করা হয়নি। কৃষ্ণবিরুদ্ধ ক্রিয়াকলাপের জন্য কসাইকে অত্যন্ত নারকীয় যাতনা পেতেই হবে। কসাই-বৃত্তিটি যদি ধর্ম হত তা হলে, শাস্ত্রে বলা হত না যে, যারা পশুহত্যা করে, হত্যার অনুমোদন করে, মাংস বিক্রি করে, মাংস ক্রয় করে, মাংস রান্না করে, মাংস ভক্ষণ করে—এরা সবাই একই পাপে যুক্ত বলে পরিগণিত।

মনুষ্য সমাজে কসাই হওয়াটা স্বধর্মও নয়, পরধর্মও নয়। সম্পূর্ণ ধর্ম বিরুদ্ধ।

প্রশ্ন ৩৯। নীচ ও হীন জাতি কারা?

উত্তর ঃ মানুষ মাত্রেই উচ্চ জাতি। কিন্তু অজ্ঞতা ও অহমিকা বশত যিনি শ্রীকৃষ্ণভজনে অবজ্ঞা বা অবহেলা করেন তিনিই নিজস্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত জীবরূপে গণ্য হন।

এ বিষয়ে শ্রীরামচরিতমানস কাব্যের রচয়িতা শ্রীতুলসীদাসের একটি দোঁহা আছে—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সব্‌কোই করত বিচার
হরি না ভজে ত চারো চামার ॥

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—সব শ্রেণীর মানুষকে বিচার কর। আর যদি দেখো, তারা কেউ কৃষ্ণভজন করছে না, তবে সেই চার শ্রেণীর মানুষই চামার অর্থাৎ, নীচ জাতি।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন—

যেই ভজে, সে-ই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥

"যাঁরা কৃষ্ণভজন করছেন তাঁরাই মহান, আর যারা ভজনহীন তারাই হীন ও অধম। যাঁরা ঐকান্তিক কৃষ্ণভজনা করছেন, তাঁরা জড়জাগতিক সমস্ত জাতপাতের উর্ধ্বে।"

১০

নিরাকার ও সাকার ভগবানের উপাসনা

প্রশ্ন ১। ভগবান এক। আল্লাহ্ সেই একজনই। মুসলমানেরা তো এত মূর্তি তৈরি করে না। কিন্তু হিন্দু সমাজে বিভিন্ন মূর্তি তৈরি করে পূজা করা হয় কেন? মনে মনে ভগবানের পূজা করলেই তো হয়?

উত্তর ঃ ভগবান বা আল্লাহ্ মাত্র একজন। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণকারণম্ ॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

'অনাদিরও আদি, সর্ব কারণের কারণ সচ্চিদানন্দময় পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।' শ্রীবিগ্রহরূপে এই ধরাধামে তিনি নিত্য বিরাজমান। শ্রীপদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে '*অর্চ্যে বিষ্ণু শিলাধীঃ...যস্য নারকীঃ সঃ*' অর্থাৎ, পূজার বিগ্রহকে শিলা বুদ্ধি করা অপরাধ। *ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার*। (চৈঃ চঃ মঃ ৬/১৬৬)

পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীমূর্তি বা বিগ্রহ সৎ এবং চিন্ময় ও আনন্দময়। ভগবান যুগে যুগে বিভিন্ন রূপে জগতে লীলাবিলাস করতে অবতরণ করেন। তাই প্রতিটি অবতার—মৎস্য অবতার, কূর্ম অবতার, বরাহ অবতার, নৃসিংহ, বামন, রামচন্দ্র, অবতারের বিগ্রহ অর্চিত হয়।

নিছক নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করার বা আরাধনা করার কোনও অর্থই হয় না। মুসলমানেরা যে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন এবং অনেক হিন্দুরা যে পরমেশ্বর ভগবানকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করছেন, দেব-দেবী ও ভগবানকে 'এক' বলে মনে করছেন, উভয়েই অশাস্ত্রীয় আচরণ করছেন বলে সিদ্ধান্ত হয়। ভগবানের যে একটি সবিশেষ রূপ রয়েছে, তা মুসলমানেরা তাদের মনগড়া ব্যাখ্যার জন্য বুঝতে পারেন না, যদিও পবিত্র কোরাণ শাস্ত্রেই তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। হজরত মহম্মদ স্বয়ং আল্লাহ্-র শরীরীরূপের বর্ণনার আভাস বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন গঙ্গার তীরে একদল পাঠান সেনা সহ দলপতি বিজলী খাঁর সাক্ষাৎ হল, তখন কোরাণ শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছিল—

প্রভু কহে—তোমার শাস্ত্র স্থাপে 'নির্বিশেষে'।
তাহা খণ্ডি 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষে ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৮/১৮৯)

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, 'তোমাদের শাস্ত্র কোরাণে অবশ্যই নির্বিশেষবাদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কিন্তু কোরাণের শেষে সেই নির্বিশেষ তত্ত্ব খণ্ডন করে সবিশেষ তত্ত্ব স্থাপিত হয়েছে।"

তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে 'একই ঈশ্বর'।
সর্বৈশ্বর্য পূর্ণ তেঁহো—শ্যাম-কলেবর ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৮/১৯০)

"কোরাণে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, চরমে ভগবান একই। তিনি সর্ব ঐশ্বর্যে পূর্ণ এবং তাঁর অঙ্গকান্তি বর্ষার জলভরা মেঘের মতো।" অর্থাৎ, শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকেই কোরাণে ভগবান বলে স্বীকার করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে—মুসলমানদের 'সুফি' বলে যে সম্প্রদায় আছে, তাঁদেরই মহাবাক্য—'অনহলক্'। তাঁদের অভিমতই নির্বিশেষ ব্রহ্ম। কিন্তু মহম্মদীয় শাস্ত্রে মহম্মদের সপ্তম সর্গে ঈশ্বর দর্শন বর্ণনায় ঈশ্বরের পূর্ণ বিগ্রহ স্বীকার করা হয়েছে।

তারপর মহাপ্রভুর অমিয় বাক্য সুধা গ্রহণ করে বিজলী খাঁ অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁর দলবলসহ মহান বৈষ্ণবে পরিণত হলেন। তাঁরা লোকসমাজে 'পাঠান বৈষ্ণব' নামে পরিচিত হলেন। তাঁরা মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতেও লাগলেন।

তবে, হিন্দুরাও যে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করছেন এবং দেব-দেবীদের তাঁরা ভগবান বলছেন, এটি বোকামি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যারা নানাবিধ জড়জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে চায়, তারাই বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ* (গীতা ৭/২০)—"তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কামনা-বাসনার দ্বারা হত হয়েছে।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে, একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। সমস্ত দেব-দেবীরা ভগবানের ভৃত্যস্বরূপ। ভগবানের দেওয়া বিশেষ ক্ষমতায় আসীন হয়ে তাঁরা জড় জগতের বিভিন্ন দিক পরিচালনা করেন মাত্র। যারা জাগতিক কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে সচ্চিদানন্দময় ভগবৎ সেবা-আনন্দ লাভ করতে চান, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকেই একান্তভাবে কামনা করেন।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ পূজা অর্চনা, কলিযুগের যুগধর্ম কৃষ্ণনাম কীর্তন, কৃষ্ণকথা প্রচার—কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনে সামিল হওয়া বিশ্বব্যাপী সকল জাতের সকল বর্ণের মানুষের পক্ষে একান্ত কর্তব্য বলে বৈদিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই মহাপ্রভুর সংকীর্তন যজ্ঞে যুক্ত হন। *যজন্তি হি সুমেধসঃ।*

প্রশ্ন ২। মানুষের ঈশ্বর যদি মানুষের মতো দেখতে হয়, তবে অনুন্নত জীবজন্তুদের ঈশ্বর কি তাদের মতোই দেখতে হবে? ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? সাকার হলে তাঁর দিব্যরূপ কেমন? মানুষ কিভাবে তাঁকে দেখতে পাবে?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান কেবল মানুষের ঈশ্বর নন, তিনি সকল জীবেরই ঈশ্বর। তিনি মনুষ্য আকার হলেও আমাদের মতো কদাকৃতি ও জড়দেহ সম্পন্ন নন। মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি রূপে অবতীর্ণ হলেও ভগবান যথাক্রমে মাছেদের, কচ্ছপদের, শূকরদের কিংবা সিংহদের ঈশ্বর হয়েছেন এরূপ মনে করা নিতান্তই মূর্খতা। একটি মানুষ যদি কুকুর, গরু, গাধা, ঘোড়া, বিড়াল ইত্যাদি পালন করতে থাকে, তবে সেই সব পশুগুলি সেই মানুষকেই তাদের মালিক বা প্রভু বলে চিনতে পারে। সেই জন্য তাদের প্রভু হিসাবে সেই মানুষকে কুকুর বা গরুর আকার ধারণ করতে হয় না।

পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য অঙ্গজ্যোতিকে নিরাকার বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্যোতি বলা হয়। কিন্তু পরমেশ্বর হচ্ছেন আদি পুরুষ সর্বকারণের পরম কারণ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কখনও নিরাকার নন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের দিব্য রূপের বর্ণনা রয়েছে।

শ্রীব্রহ্মা ভগবানের দিব্যরূপের বর্ণনা করে স্তুতি করছেন—

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"যিনি বংশী বাদন করছেন, যাঁর আয়ত নয়ন পদ্মের মতো, যাঁর শিরোভূষণ ময়ূরের পুচ্ছে শোভিত, যাঁর সুন্দর অঙ্গকান্তি নীল জলভরা মেঘের বর্ণের মতো, কোটি কোটি কন্দর্পকেও মোহিত করে এরূপ বিশেষ শোভা বিশিষ্ট যাঁর অঙ্গকান্তি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩০)

সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর শুদ্ধভক্ত প্রেমের অঞ্জনে রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুতে দর্শন করতে পারেন।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।

অর্থাৎ, "পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠ সাধুগণ প্রেমভক্তিযোগ সর্বদাই আপন শুদ্ধ হৃদয়ে তাঁকে অবলোকন করে থাকেন।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৮)

প্রশ্ন ৩। কৃষ্ণ আর আল্লার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ কৃষ্ণ হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যময় অপূর্ব রূপ বিদ্যমান, অর্থাৎ, তাঁর চিন্ময় আকার রয়েছে। কিন্তু আল্লা নির্বিশেষ নিরাকার।

প্রশ্ন ৪। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, না সাকার ভগবানের উপাসনা শ্রেষ্ঠ?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এই যে—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

"যাদের মন নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত, তাদের ক্লেশ অধিকতর। কারণ নিরাকারের উপাসনার ফলে দেহধারী জীবদের কেবল দুঃখই লাভ হয়।" (গীতা ১২/৫)

বক্তা শ্রীকৃষ্ণ একজন ব্যক্তি। ভগবান ব্যক্তি। তিনি সমগ্র সৃষ্টির হর্তা কর্তা বিধাতা। তিনি সাকার। তাঁর উপাসনা করলে কি লাভ হয়? শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ঠিক পরবর্তী শ্লোকে রয়েছে—

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥

"যারা আমাতেই আবিষ্টচিত্ত, তাদের আমি মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।" (গীতা ১২/৭)

প্রশ্ন ৫। সত্যযুগে ভগবানের ধ্যান করা ছিল যুগধর্ম। সেই ধ্যান কি ব্রহ্মের ধ্যান?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৩/৫২) উল্লেখ রয়েছে, *কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং*—সত্য যুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান। বিষ্ণু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ পীতবসন পরমসুন্দর রূপসম্পন্ন পরমেশ্বর। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে পরম ব্রহ্ম বলা হয়। কলিযুগে কিছু মানুষ শাস্ত্র নির্দেশ অনুসরণ না করে নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করে। সেই প্রকার ধ্যানের পন্থা নিন্দা করে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (১২/৫) বলেছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

"যাদের চেতনা ভগবানের অব্যক্তরূপের প্রতি আসক্ত তাদের পক্ষে পারমার্থিক বিষয় লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ অব্যক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে কেবল দুঃখই লাভ হয়।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলছেন—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥

"আমাতেই তোমার মন সমাহিত কর, আমাতেই তোমার বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। এভাবে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে পেতে পারবে। এই সর্বোচ্চ গতির প্রতি কোনও সন্দেহ করো না।" এখানে সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন অনুশীলনের কথাই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬। বৈষ্ণবগণ বলছেন, বিষ্ণুই একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান, অন্য কেউ নন; শৈবগণ বলছেন, শিবই দেবাদিদেব; শাক্তগণ বলছেন শক্তিই সব, তিনিই জগৎ প্রসবিণী; নিরাকারবাদীগণ বলছেন, নিরাকার ব্রহ্মই সত্য। এই সমস্ত সিদ্ধান্তের মীমাংসা কি?

উত্তর ঃ প্রত্যেকেই ঠিক কথাই বলেছেন, কেউই মিথ্যা বলেননি। কিন্তু সাধারণ মানুষ বোঝবার চেষ্টা না করেই মনে করছে এই সবই বিপরীত দ্বন্দ্বমূলক কথা।

শ্রীবিষ্ণুই পরমেশ্বর ভগবান। দেবাদিদেব শিব পরম বৈষ্ণব। জড় জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়সাধিনী মহাশক্তি দুর্গা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় পরিচালিত হন। নিরাকার ব্রহ্ম অবশ্যই সত্য, কারণ তা শ্রীভগবানের দিব্য অঙ্গজ্যোতি বা ব্রহ্মজ্যোতি। এই সমস্তই শাস্ত্রের কথা।

প্রশ্ন ৭। শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যদি কেউ শূন্যের ধ্যান শুরু করে, তবে তার ফলাফল কি হবে?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে শূন্যের ধ্যান করা যায় না। কোন কিছু ছাড়া ফাঁকা বা শূন্য ধ্যানযোগ্য নয়। হয় ব্রহ্মজ্যোতি, নতুবা নীল আকাশ, নতুবা মহাসমুদ্র, নতুবা কোন কিছু চিহ্ন—কিছু না কিছু বস্তু বা বিষয় থাকতে হবে। কোনও বস্তুর উপর মন নিবিষ্ট করাকেই ধ্যান বলে। বস্তু নেই, নিছক শূন্য—এমনভাবে ধ্যান হয় না। এইভাবে যদি কেউ চোখ বন্ধ করে বস্তুহীনভাবে বসে থাকে, তাহলে তাকে বাতাসের শব্দ, দূরের পাখির ডাক, টিকটিকির আওয়াজ, খসখস শব্দ—এই সবকিছু নিয়ে ঘোর অন্ধকার স্থান অথবা নির্জন ফাঁকা স্থানের ধ্যান করতে হবে। এটা যে কেউ করে দেখতে পারেন। সারাজীবন যে বিষয় আমরা ধ্যান করব তাই-ই আমাদের সিদ্ধ হবে—লাভ হবে। সারাজীবন যদি কেউ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করে তবে শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হওয়া যাবে। শূন্যের ধ্যান শুরু করলে শূন্যই লাভ হবে, অর্থাৎ কোন ফল হবে না—কেবল পণ্ডশ্রম হবে।

প্রশ্ন ৮। সাকার ভগবানের উপাসনা করা ঠিক, না নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করা ঠিক?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, হে কৃষ্ণ! যারা তোমার আরাধনা করে এবং যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের আরাধনা করে তাদের উভয়ের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ? তখন উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

"যারা আমার প্রতি অনুরক্ত ও নিবিষ্টমনা হয়ে পরম ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করে তারাই শ্রেষ্ঠ। কারণ আমিই নিত্য পরমব্রহ্ম।" (গীঃ ১২/২)

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

"আর যারা আমার নির্বিশেষ ব্রহ্মের আরাধনা করে তারা দেহাভিমানি, তারা অধিকতর দুঃখই ভোগ করে থাকে।" (গীঃ ১২/৫)

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যে সমস্ত অসুর ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিরোধিতা ও যুদ্ধ করেছিল তারাই নির্বিশেষ ব্রহ্মে গতি লাভ করেছিল। অথচ সেই ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবার জন্য কিছু তথা কথিত অধ্যাত্মবাদীরা নানা ধ্যান-তপস্যায় রত। কোনও ভগবদ্ভক্ত অসুরদের গতি নির্বিশেষ ব্রহ্মে বিলীন হতে চান না। তারা ভগবানের সেবা ভক্তি নিত্যকাল সম্পাদন করতে চান।

প্রশ্ন ৯। ভগবান ও ব্রহ্ম—এই দুই একই, না আলাদা?

উত্তর ঃ ভগবানের তিনটি প্রকাশ। ১) স্বয়ং রূপ পরমেশ্বর ভগবান। তিনি শ্রীকৃষ্ণ। তিনি গোলোকধামে নিত্য অবস্থান করেন। ২) সেই ভগবানের অংশপ্রকাশ পরমাত্মা। তিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণু। তিনি সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন। আর ৩) ভগবানের অঙ্গজ্যোতি। ভগবানের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা সর্বব্যাপ্ত জ্যোতিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম সর্বত্রই বিরাজমান। নিরাকার ব্রহ্ম। ভগবান হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম আর ভগবানের অঙ্গজ্যোতি হচ্ছে নিরাকার ব্রহ্ম।

প্রশ্ন ১০। 'আল্লাহ' ও 'কৃষ্ণ' কি একই?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান একই। হিন্দুরা তাঁকে কৃষ্ণ, মুসলমানেরা তাঁকে আল্লাহ বলেন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশাল পার্থক্য—কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় পরম সুন্দর রূপ সম্পন্ন, কিন্তু আল্লাহ নিরাকার। নিরাকার আল্লাহের উপাসনার অপেক্ষা সাকার ভগবানের উপাসনা অনেক শ্রেয়ঃ বলে বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোরাণ শাস্ত্রেও আল্লার দুই উদার হস্ত ঊর্ধ্ব দিকে প্রসারিত বলে বর্ণিত হয়েছে। আর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও বর্ণনা রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য রূপ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দুই হস্ত ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

প্রশ্ন ১১। কেউ কেউ সাযুজ্য মুক্তি অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, তাকেও কি পুনরায় দুঃখময় জড় জগতে অধঃপতিত হতে হয়?

উত্তর ঃ ভক্তিযোগে যারা ভগবানের সেবা করে না, কেবল ভগবানের অঙ্গ বা নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের ধ্যান করে, তারা নির্বিশেষ ব্রহ্মে কিছু কালের জন্য মিশে থাকে। কিন্তু পুনরায় তাকে জড় জগতে অধঃপতিত হতেই হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২/৩২) সেই কথা বলা হয়েছে।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ।

অর্থাৎ, "বহু কষ্ট স্বীকার করে কেউ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপী পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে পুনরায় জড় জগতে অধঃপতিত হতে হয়।"

প্রশ্ন ১২। শুষ্ক বৈরাগী কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি এই জগৎকে মিথ্যা বলে মনে করে এবং নিজেকে ব্রহ্ম স্বরূপ বলে মনে করে ইন্দ্রিয়গুলিকে বলপূর্বক সংযত রেখে নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হওয়ার জন্য প্রয়াস করে তাদের শুষ্ক বৈরাগী বলে। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় জগতের যে বৈচিত্র্য রয়েছে। ভগবানের সৃষ্ট এই জগৎ যে মিথ্যা নয়, ভগবানের সেবায় তার উপযোগ করা যায়—এই বুদ্ধি যার নেই। সে কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মে বিলীন হতে চায়। সেক্ষেত্রে ভগবানের নিত্য সেবকরূপে চিন্ময় সম্বন্ধে রসানন্দ বা ভগবদ্ সেবানন্দ লাভ করতে চায় না। তাই তাকে নিরস বা শুষ্ক বৈরাগী বলে। সে কেবল জড় বিষয়েই বৈরাগী নয়, ভগবদ্ভক্তিসেবায়ও বৈরাগী।

প্রশ্ন ১৩। ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি ভক্তরা পছন্দ করেন না কেন?

উত্তর ঃ যারা বলে ভগবান নিরাকার, নির্বিশেষ ও নির্গুণ, সেই নিরাকার ব্রহ্মবাদীরা ভগবানের অঙ্গপ্রভা যে ব্রহ্মজ্যোতি সেই জ্যোতিতে নিরাকারভাবে ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন থাকতে বাসনা করে। সেখানে পরম সুন্দর রসময় পুরুষ শ্রীভগবানের সঙ্গে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য মধুর রসের সম্পর্কে সেবানন্দ সুখ নেই। কোনও প্রকার প্রেমানন্দ সুখের লেশমাত্র নেই। কোন বৈচিত্র্য নেই। কেবল অনাবিল নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতিতে মিশে থাকার মতো অবস্থা। সেই অবস্থা সম্পর্কে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ তার নহে এক বিন্দু ॥

"কৃষ্ণভক্তিসুখ-সমুদ্রের এক বিন্দুর কাছেও সাযুজ্য মুক্তির কোটি কোটি ব্রহ্মসুখ অতি তুচ্ছ।" ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥

"জড়া মায়ার অধিকার-সীমার বাইরে সিদ্ধলোক অবস্থিত। যারা নির্বেদ ব্রহ্ম-উপাসনায় সিদ্ধ হয়েছেন সেই সিদ্ধগণ সেখানে ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হয়ে বাস করেন। আবার, যে সমস্ত ভগবদ্-বিরোধী অসুরেরা শ্রীহরি কর্তৃক নিহত হন, তারাও সেখানে সেই ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হয়ে বাস করেন।" সুতরাং, ভগবানের বিরোধিতা করে ভগবানের হাতে নিহত হয়ে অসুরেরা যে গতি লাভ করতে পারে, ভগবানের সেবা সম্পর্কে অধিষ্ঠিত ভক্তগণ কেনই বা সেই তুচ্ছ অনর্থক ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তি লাভ করতে চাইবে?

প্রশ্ন ১৪। দেহত্যাগের পর ভগবানের সঙ্গে মিশে যাওয়া বা বিলীন হয়ে যাওয়াটা কি ধর্মের লক্ষ্য?

উত্তর ঃ কখনই নয়। চিরকালের জন্য ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই ধর্মের যথার্থ লক্ষ্য। ভগবানের সঙ্গে মিশে যাওয়া বা বিলীন হওয়া ব্যাপারটি আত্মপ্রতারণা বলা চলে।

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।'

সেটিই জীবের স্বরূপ ধর্ম। ভগবানের সঙ্গে মিলে যাওয়াটা জীবের বিরূপতা মাত্র। ব্রহ্মবাদীরা নিরাকারবাদীরা ভগবানের দিব্য অঙ্গজ্যোতিতে মিশে যেতে চায়। ভক্তরা সেই সাযুজ্যমুক্তি নরকতুল্য জ্ঞান করেন।

প্রশ্ন ১৫। অনেকে বলেন, ভগবান এক মহাশক্তি মাত্র, তা নিরাকার। সত্যি কি?

উত্তর ঃ সেটি পাগলের প্রলাপমাত্র। যেমন সূর্যরশ্মিকে আমরা অনুভব করতে পারি, আর সূর্যরশ্মি নিরাকার হতে পারে। কিন্তু সূর্যরশ্মির উৎস যে সূর্য, এবং সূর্য আকারযুক্ত, নিরাকার নয়, সেটা তারা বুঝতে চায় না। মেঘ সূর্যকে ঢাকতে পারে না। মেঘের দ্বারা আমাদের চক্ষু ঢাকা পড়ে। সেজন্য সূর্যকে আমরা দেখতে পাই না। তেমনই অজ্ঞানতায় জড়বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয়ে আমরা বৈকুণ্ঠের সচ্চিদানন্দময় ভগবানকে দেখতে পাই না।

সুতরাং, আমি তাঁকে না দেখতেও পারি, কিন্তু তাই বলে বেদনির্ধারিত দলিলটাতে তাঁর সচ্চিদানন্দময় রূপ বা আকারের বর্ণনা মিথ্যা বলে আদৌ মন্তব্য করতে পারি না। সরাসরি বৈদিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই কর্তব্য।

প্রশ্ন ১৬। 'ওঁ' এই প্রতীকের তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন, *প্রণবঃ সর্ববেদেষু*—'সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে আমি হচ্ছি প্রণব 'ওঁ' (গীতা-৭/৮) অর্থাৎ, ওঁ-কার হচ্ছে শব্দব্রহ্ম রূপে ভগবানের অবতার। গোস্বামীগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, ওঁকার হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ। সেই ওঁ-এর বিশ্লেষণ করেছেন এইভাবে—

অ-কারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্বলোকৈক নায়কঃ ।
উ-কারেণোচ্যতে রাধা ম-কারো জীব বাচকঃ ॥

অর্থাৎ, ওঁ-কার হচ্ছে অ, উ এবং ম—এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়। অ-কারে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝায়, যিনি হচ্ছেন চিৎ-অচিৎ সমগ্র জগজ্জীবের ঈশ্বর। উ-কার শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি শ্রীমতী রাধারাণীকে ইঙ্গিত করে, এবং ম-কার জীবকে ইঙ্গিত করে। এইভাবে 'ওঁ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর শক্তি এবং তাঁর নিত্য সেবকদের পূর্ণ সমন্বয়। (চৈঃ চঃ আঃ ৭/১২৮ প্রভুপাদ তাৎপর্য)

প্রশ্ন ১৭। মূর্তিপূজা না করে কি ভগবানের দেখা পাওয়া যায় না? মূর্তিপূজা আমরা করি কেন?

উত্তর ঃ মূর্তি হল ভগবানের মূর্ত প্রকাশ। নামরূপে ও অর্চাবিগ্রহরূপে শ্রীভগবান জগতে অবতীর্ণ। ভক্ত ভগবানের রূপ-মাধুরী দর্শনে আগ্রহী। তাঁরা কখনও ভগবান নিরাকার নির্বিশেষ—এই রকম মনে করে শূন্যের ধ্যানে মগ্ন থাকেন না। যার রূপ নেই তার কথা চিন্তা করা কিংবা ধ্যান করা অসম্ভব। ব্রহ্মাণ্ডের আদি জীব শ্রীব্রহ্মা নির্দেশ দিয়েছেন, *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ* (ব্রঃ সঃ) 'পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ।'

সেই অপ্রাকৃত রূপ আমাদের চর্মচক্ষুতে দৃষ্টিগোচর না হলেও এই ভূমণ্ডলে নাম ও অর্চা বিগ্রহরূপে আমরা অনবরত তাঁকে স্মরণ ও দর্শন করতে পারি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ-রূপ ॥

(চৈ. চ. মধ্য ১৭/১৩১)

ভগবানের নাম, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবৎস্বরূপ—এই তিনের মধ্যে কোনও ভেদ বা পার্থক্য নেই। কারণ, তা চিন্ময় বস্তু। অতএব, চিন্ময় বস্তু স্থূল-বুদ্ধি জড়-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধ হয় না।

"প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ।"

(চৈ. চ. মধ্য ১৭/১৩৪)

বিগ্রহ-রূপে ভগবান প্রকাশিত হলেও মায়াবাদী-নির্বিশেষবাদীরা মূর্খের মতো মন্তব্য করে যে, মূর্তিপূজা ভুল। শ্রীপদ্মপুরাণে নির্দেশিত হয়েছে—শ্রীবিষ্ণুর পূজাবিগ্রহে পাথর-বুদ্ধি যার হয়, সে নারকী।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার ।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড ।
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ড্য ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬/১৬৬)

ভগবদ্বিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। অথচ মায়াবাদীরা তা সত্ত্বগুণের বিকার বলে মনে করে। চিন্ময় বিগ্রহের অবজ্ঞাকারীর মুখদর্শন করা উচিত নয়, স্পর্শ করা উচিত নয়। কারণ সে পাষণ্ডী এবং সে যমপুরীর শাস্তিভোগের জন্য নির্দিষ্ট।

বিগ্রহপূজা কখনই কলির মানুষের মনগড়া ধারণা নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে—*ত্রেতাদিষু হরেরর্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥* (ভাঃ ৭/১৪/৪০) ত্রেতাদি অর্থাৎ, ত্রেতা-দ্বাপর যুগেও ঋষিগণ শ্রীহরির বিগ্রহের আরাধনা করেছেন।

এই ভারতবর্ষে অনেক বিগ্রহ অধিষ্ঠিত রয়েছেন, সেই সকল বিগ্রহের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের উজ্জ্বল ইতিহাস বিদ্যমান। ভারতবর্ষের সেই সেই স্থানগুলিও মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বলা হয়েছে—

যত্র যত্র হরেরর্চা স দেশঃ শ্রেয়সাং পদম্ ।
যত্র গঙ্গাদয়ো নদ্য পুরাণেষু চ বিশ্রুতাঃ ॥

"যে যে স্থানে শ্রীহরির প্রতিমা থাকে এবং যে স্থানে পুরাণ-প্রসিদ্ধ গঙ্গানদী বর্তমান, সেই দেশ মঙ্গলের আশ্রয়।" (ভাঃ ৭/১৪/২৯)

এই কথা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে—

মূর্তিরূপে যথা হরি করেন বিহার ।
ভকত-জনের হয় যথা অবতার ॥
সেই সব পুণ্য-ভূমি, জানিহ বিশেষে ।
যত যত কর্ম; ধন্য হয় সেই দেশে ॥

কিন্তু কলিযুগে নাস্তিক সভ্যতার দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের উৎপাতমূলক কার্যকলাপের ফলে সাধারণ জনমানসে ধাম-তীর্থের মাহাত্ম্যই ধরা পড়ে না। বর্তমানে মানুষ নানা দেবদেবীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করছে, নেশা করছে। নাচছে, মদ খাচ্ছে। বহু জীবজন্তু বধ করছে। মাছ-মাংস খেয়ে ফূর্তি করছে।

আবার দেখা যায়, অনেকে ভগবদ্ বিগ্রহ রেখেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ কিংবা শালগ্রামের অর্চনা করছে,—অথচ তারা মাছ-মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি ভগবদ্ বিরোধী আচরণে তৎপর হয়ে তাদের রক্ষিত ও অর্চিত ভগবদ্ মূর্তির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে। সেক্ষেত্রে শ্রীবিগ্রহ পরমার্থপ্রদ হন না। বরং অনর্থই ভোগ করতে হয়। তাই মাছ-মাংসভোজীদের দ্বারা ভগবানের বিগ্রহ-পূজা একেবারেই নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে নির্দেশিত—

সেই মূর্তি করি যেবা ভজে নারায়ণ ।
জীবহিংসা করে যদি, নাহি প্রয়োজন ॥

(কৃঃ প্রেঃ তঃ ৭/৫/৩২)

প্রশ্ন ১৮। ভগবান সর্বত্রই আছেন, তা হলে আমাদের সাথে স্পর্শ হচ্ছে' ভগবানের স্পর্শ পেয়ে কেন আমাদের জড় বাসনা কমে না; মায়া মমতা কমে না?

উত্তর ঃ স্পর্শ হলেই যে লোকে জড় বাসনা মুক্ত হয়ে যাবে এরূপ নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেব স্পর্শ করেছিলেন, কংসও স্পর্শ করেছিলেন। কিন্তু বসুদেবের স্পর্শে ছিল বাৎসল্য রসসিক্ত ভক্তিভাব; কংসের স্পর্শে ছিল ক্রোধান্বিত জিঘাংসাভাব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শৈশবকালে বহু দেব-দেবী সাধারণ নর-নারীরূপে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শিশু মহাপ্রভুকে দর্শন করবার জন্য ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে আগমন করতেন এবং তাঁকে আদর করতেন, স্পর্শ করতেন। এইভাবে নিজেদের জীবন ধন্য হল বলে মনে করতেন। কিন্তু তৎকালীন নবদ্বীপের দুটি চোর শিশু মহাপ্রভুর অঙ্গের দামী গয়নার লোভে মহাপ্রভুকে আদর করে কাঁধে তুলে নেয় এবং ছলে বলে তারা গয়না ছিনতাই করবার চিন্তায় মশগুল থাকে। যদিও তারা মহাপ্রভুকে কাঁধে নিয়ে অলি গলি দিয়ে বহুদূর যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, তবুও মহাপ্রভুর প্রতি তাদের কোনও প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল না অথচ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করেছিল। সুতরাং, আমরা যদি ভক্ত হওয়ার মানসিকতা না নিই, তবে এরূপ স্পর্শের কোনও মূল্য মর্যাদা থাকে না।

ভগবান প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বাধীনতা দিয়েছেন, সে ইচ্ছা মতো বিভিন্ন বাসনা করতে পারে। সেই স্বাতন্ত্র্যে ভগবান হস্তক্ষেপ করেন না। আমরা ভগবানকে ভালবাসতে পারি কিংবা ভগবদ্‌বিমুখ হয়ে অন্য কিছুকে ভালবাসতে পারি—সেই স্বাতন্ত্র্য ভগবান আমাদের দান করেছেন। জোর করে জড় বাসনা তৃপ্তিতে বাধা প্রয়োগ করে তাঁকে ভালবাসতে ভগবান কোনও জীবকে বাধ্য করান না। কেন না তা প্রীতি-স্বভাব বিরুদ্ধ।

জড় বাসনা জীবকে দুঃখময় জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক করায়। তাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব যদি জড় বাসনা ছাড়তে চায়, তবে তাকে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনে ব্রতী হতে হবে। অন্তরের সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি জাগাতে হবে। ভগবানকে ভালবাসতে হবে।

জীবের বাসনা প্রতিক্ষণেই থাকবে। তবে হয় জড় বাসনা, নতুবা চিন্ময় বাসনা। চিন্ময় বাসনা বাড়তে থাকলে জড় বাসনা কমতে থাকবে।

প্রশ্ন ১৯। শ্রীহরির রূপ কেমন? আমাদের মন্দিরে সমস্ত দেব-দেবীর প্রতিকৃতি আছে, আমরা শ্রীহরির পূজা করি। কিন্তু শ্রীহরির রূপটা কিরকম?

উত্তর ঃ শ্রীহরির রূপের বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীব্রহ্মা—শ্যামবর্ণ, দ্বিভূজ, ত্রিভঙ্গ মূর্তি, হাতে বাঁশি। শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখেননি এই ভারতভূমির এমন মানুষ খুব কমই আছে। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যদি থাকেন, তবে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছাড়া কোন দেবদেবীর প্রতিকৃতি না রাখাই কর্তব্য। কারণ শ্রীহরিকে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে পূজা করা অপরাধমূলক।

প্রশ্ন ২০। অনেকে বলেন ঈশ্বর মায়াময়। নিরাকার ব্রহ্মই মায়ারহিত। এই মন্তব্য কেন করে?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবানের উক্তি—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার দৈবী মায়া ত্রিগুণময়ী এবং তাকে অতিক্রম করা কারও পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু কেউ যদি আমার শরণাগত হয়, তবে সেই ব্যক্তি আমার এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে।" (গীতা ৭/১৪)

পরমেশ্বরের শরণাগত হলে মায়া অতিক্রম করা যায়। তা হলে পরমেশ্বর ভগবান যদি 'মায়াবদ্ধ' হন তবে আমাদের মতো মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে আবার তাঁর কাছে শরণাগত হওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু মায়াবাদী দলের লোক সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, ভগবানের দিব্য অঙ্গের জ্যোতিই ব্রহ্মজ্যোতি বা 'নিরাকার ব্রহ্ম' নামে নির্দিষ্ট। অথচ আপনার প্রশ্নটিতে বলা হচ্ছে, ভগবান মায়াময় আর তাঁর অঙ্গের জ্যোতিটা মায়ারহিত। সেই কারণে মায়াবাদী অপসিদ্ধান্ত হচ্ছে ভগবানকে বাদ দিয়ে ভগবানের অঙ্গজ্যোতিটাকে আদর করা দরকার। এখন জ্যোতিটাই মায়ারহিত আর জ্যোতির উৎসটা মায়াবদ্ধ-এই ধরনের বিকৃত প্রলাপ কখনও শুনতে নেই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন—"মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।"

প্রশ্ন ২১। যাঁরা সারা জীবন কৃষ্ণসেবাপূজা করছেন, তাঁরা কি জীবন শেষে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লীন হয়ে যান? না কি কোন্ লোকে যান?

উত্তর ঃ ভক্তিযোগী কখনও কৃষ্ণ অঙ্গে লীন হয়ে যেতে চান না। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিমূলক সেবা করার অভ্যাস করতে হয়। তারপর অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় ধামে কৃষ্ণলোকে চিন্ময় শরীর লাভ করে ভগবানের নিত্যলীলার নিত্যসেবায় যুক্ত হন।

প্রশ্ন ২২। 'ওঁ' এবং ওঁ-এর পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ 'ওঁ' বলতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বোঝায়। এটি শুদ্ধ অক্ষর। 'ওঁ' শব্দটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বোঝালেও এটি একশ্রেণীর আঞ্চলিক লোকেরা ব্যবহার করেন মাত্র।

প্রশ্ন ২৩। অনেকেই বলছেন ভগবানের কোনও রূপ নেই কোন আকার নেই। ভগবান রূপহীন নিরাকার। এ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ সচ্চিদানন্দময় পরম আকর্ষণীয় রূপ সম্পন্ন ভগবানের অঙ্গের দিব্য জ্যোতি প্রকাশিত হয়। সেই জ্যোতিকে বলে ব্রহ্মজ্যোতি। যারা ভগবানের সেবা করতে চায় না, নিরাকার ব্রহ্মে মিশে যেতে চায়, সেই সব ভগবৎ সেবা বিমুখ মোক্ষকামী ব্যক্তিরা সাযুজ্য মুক্তি লাভের জন্য সেই নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করেন। সেই ধরনের অভক্ত

ব্যক্তিরা বলে থাকে ভগবান নিরাকার। শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত অসুরেরাও সেই গতি লাভ করেছিল। সেই স্তরের অনেক গুণ উর্ধ্বে ভক্তদের গতি, যেখানে ভগবানের সঙ্গে নিত্যলীলায় তাঁরা যুক্ত হতে পারেন। ভগবানের নিত্য চিন্ময় আনন্দময় রূপ এবং আকার অবশ্যই রয়েছে। সেইজন্য মহাজন ব্রহ্মা উল্লেখ করেছেন,

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব কারণকারণম্ ॥

"সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সৎ চিৎ আনন্দময় মূর্তি। তিনিই অনাদিরও আদি, সেই গোবিন্দ সর্বকারণের পরম কারণ।"

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"তাঁর মুখে বংশী, তাঁর নয়ন পদ্মপাপড়ির মতো উৎফুল্ল, তাঁর শিরে ময়ূরপুচ্ছ, তাঁর সুন্দর শরীর নীল মেঘের রঙ, কোটি কোটি কন্দর্পের রূপকে মোহিত করে বিশেষরূপে শোভাবিশিষ্ট মাধুর্যময় সেই গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

এভাবে ব্রহ্মা ভগবানের দিব্য রূপের বর্ণনা দিচ্ছেন। মূর্খেরা মনে করে, আমার পিতার রূপ আছে কিন্তু জগৎপিতার রূপ নেই, তিনি নিরাকার। এটি মূর্খদের ভাগবতবিরুদ্ধ মনোকল্পিত ধারণা।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

তাবদ্‌ভ্রমন্তি সংসারে মনুষ্যা মন্দবুদ্ধয়ঃ ।
যাবদ্ রূপং ন পশ্যন্তি কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥

"যতদিন পর্যন্ত কেশবের কমনীয় রূপ সমন্বিত শ্রীমূর্তি দর্শন না ঘটে, ততদিন পর্যন্ত দুর্মতি মানুষেরা সংসারে ভ্রমণ করতে থাকে।"

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

যত্র কুত্রাপি প্রতিমাং বেদধর্মসমন্বিতাং ।
ন পশ্যন্তি জনা গত্বা তে দণ্ড্যা যমকিঙ্করৈঃ ॥

"যেখানে হোক না কেন, বৈদিক ধর্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভগবানের শ্রীমূর্তি যারা দর্শন করে না, মৃত্যুকালে যমকিঙ্করেরা তাদেরকে দণ্ডিত করে থাকে।"

১১

আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

প্রশ্ন ১। 'শুভ বিবাহ' বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ বৈদিক গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করে যে দম্পতি তাঁদের পারমার্থিক জীবনে উন্নীত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করেন, তাঁদের বিবাহিত জীবন ধন্য। সেই ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী বিশেষরূপে দায়িত্ব বহন করতে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু যে বিবাহ সংসার-ভোগবাসনা আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য মানুষকে সামিল করায়, তা শুভ নয়, তা অশুভ। মৈথুন-প্রবণতা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য নয়, তা কেবল নরকে অধঃপতিত হওয়ার জন্যই। বিবাহিত জীবনের পূর্ণতা হল কৃষ্ণভক্ত সন্তানের পিতামাতা হওয়া। সন্তান যদি কৃষ্ণভক্ত না হয়, তবে বিবাহিত জীবনের শুভ তাৎপর্যও বিনষ্ট হয়। পাত্র-পাত্রী যদি ভক্ত না হয়, তবে তাদের বিবাহ বিপজ্জনক। *শ্রীমদ্ভাগবতে* দেখা যায়, শ্রীঋষভদেব তাঁর শত পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন ভক্তিপথের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর দুঃখময় ভবচক্র থেকে পত্নীকে উদ্ধার করবার যোগ্যতা না থাকলে কারও পতি হওয়া উচিত নয়—বিবাহ করা উচিত নয়।

শুভ বিবাহ বলতে বুঝি শ্রীনিমাইসুন্দর ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিবাহ। তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠান দর্শন করতে অসংখ্য লোক এসেছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণনা রয়েছে যে, যারাই সেই বিবাহ অনুষ্ঠান দর্শন করতে এল, তারাই বৈকুণ্ঠ গতি লাভ করল।

অতীতে বৈদিক ভারতবর্ষের বিবাহ চিত্র আমরা দেখতে পাই, সেখানে পিতা-মাতা তাঁদের ছোট ছোট পুত্র-কন্যাদের বিবাহ দেন। কন্যাটি বিয়ের পর বাপের বাড়িতে থাকে। সে ঘরকন্নার যাবতীয় কাজ-কর্ম, নিয়মনিষ্ঠা, ভক্তিসেবা সব কিছু মা-বাবার তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করে। আর, বরটি পড়াশুনা, বৈদিক শিক্ষা চর্চা, বিভিন্ন পেশাগত বৃত্তি শিক্ষা করে। মেয়েটি জানত যে, তার একজন পতি আছেন, তাই সে ধীর স্থির থাকত এবং বর্তমানের মতো বেশভূষার চটকদারী সাজে সজ্জিত হয়ে অন্য পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করত না। আর ছেলেটি জানত যে, তার একজন পত্নী আছে, তাই সে বর্তমানের বহু ছেলেদের মতো ছন্নছাড়া বিয়েপাগলা হয়ে ঘুরে বেড়াত না। সব চেয়ে তাদের ভাল গুণ ছিল যে, আদর্শ পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে তারা পরিচালিত হত। তারপর শুভ লগ্ন নির্ধারণ করে উপযুক্ত সময়ে পিতা-মাতা নব দম্পতির গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি শুভ অনুষ্ঠান পালন করতেন।

কিন্তু বর্তমানে সমস্যা অত্যন্ত জটিল। পিতা-মাতারাই অভক্ত, তারপর, সন্তানেরাও পিতা-মাতাকে বাহ্যত শ্রদ্ধা করলেও করতে পারে, কিন্তু সমস্ত রকমের মনগড়া পন্থা নিয়ে সন্তানেরা নিজেদের সবজান্তা 'হিরো' বলে মনে করে। কেবলমাত্র মৈথুনসুখ চরিতার্থ করবার তাগিদেই তাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তারপর নানা কুসঙ্গ প্রভাবেও তারা প্রভাবিত হয়ে চলে। দেখা যায়, অধিকাংশ বিবাহই অশুভ। পতি-পত্নী তাই সুখী হয়

না। কুটুম্ব কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পতিহত্যা, পত্নী নির্যাতন, বধূহত্যা, ভ্রাতৃবিরোধ, ভ্রূণহত্যা, বিষপান, ফাঁসি, দৈহিক ও মানসিক নানাবিধ ব্যাধি, মানসিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যা ঘরে ঘরে দেখা দিচ্ছে। এমন কি, দেখা যায়, পতিটি অন্য মেয়ের প্রতি আসক্ত, পত্নীটি অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট। এইভাবে দেখা যায়, সমাজের অধিকাংশ মানুষই বিবাহিত জীবনে সুখী নয়। আর তা ছাড়া সংসারের নানা হট্টোপাটিতে মশগুল থেকে জীবন অতিবাহিত হয় বলে পারমার্থিক মঙ্গল সাধন সম্ভব হয় না। তাই সেই ক্ষেত্রে বিবাহটি নরকদর্শনের সামিল হয়।

প্রশ্ন ২। প্রতি মানুষের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান। তবে মানুষ কেন পাপকার্যে প্রবৃত্ত হয়?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবকে স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। সেই স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির যথার্থ ব্যবহার হল ভগবদ্ প্রীতি সাধন করা। যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে ভালবাসতে চায়, তবে তার স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি পরমাত্মা তথা শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল হওয়ার জন্য পরমাত্মাই তাকে সাহায্য করবেন যাতে সে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে পারে। পক্ষান্তরে, যদি জীব তার স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার করে, অর্থাৎ, ভগবানের নিয়মনীতি অবজ্ঞা করে চলে, তবে ভগবদ্ প্রতিকূল হওয়ার জন্য পরমাত্মা তাকে বিস্মৃতি দান করবেন যাতে সে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে থাকতে পারে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।

"আমি সবার হৃদয়ে অবস্থিত আছি এবং আমার থেকে সমস্ত জীবের স্মৃতি এবং জ্ঞান উৎপন্ন হয়, আবার বিলোপও হয়।" (গীতা ১৫/১৫)

সুতরাং, কৃষ্ণ-উন্মুখ হয়ে চলা এবং কৃষ্ণ-বিমুখ হয়ে চলা—এই দু'রকম প্রবৃত্তি যে কোনও মানুষেরই থাকতে পারে। তবে, পাপপ্রবণ ব্যক্তি প্রতিপদে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞাই করে চলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবার হৃদয়ে থাকলেও সচরাচর তাঁর প্রতি উন্মুখ হয়ে চলতে কারও উপর বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করেন না। কারণ যে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে চায়—ভালবাসতে চায়, সে স্বভাবতই কৃষ্ণ-উন্মুখ হয়। বাধ্য-বাধকতার দ্বারা ভালবাসা হয় না। তাই মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহারের জন্য পরমাত্মাকে দায়ী করা যায় না।

প্রশ্ন ৩। 'সমাচারে' প্রশ্ন-উত্তর বিভাগে দেখলাম 'ইতিহাসে কোনও আদর্শ সতী নারীকে মাছ-মাংস রান্না করতে দেখা যায় নি। বর্তমানেই যা কেবল দেখা যাচ্ছে।' কিন্তু সতীর কাজ পতির নির্দেশ মতো চলা নয় কি? পতি যদি মাছ-মাংস খেতে চান, তখন কি পতির বিরোধিতা করা দরকার?

উত্তর ঃ পতি যদি পাপকর্ম করতে আগ্রহী থাকেন, তবে সতীর কাজ হচ্ছে সেই পাপকর্ম থেকে পতিকে বিরত রাখার অনুপ্রেরণা দান করা। মাছ-মাংস ভক্ষণের পাপে

পাপীকে রৌরব নরকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, মাছ-মাংস রান্না করলে কুম্ভীপাক নরকে বিকটমূর্তি যমদূতের দ্বারা নিজেকে রান্না হওয়ার জন্য যেতে হয়। আবার, পতি যদি নরকগামী হতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁর ঐকান্তিক সহবর্তিনী সতীও নরক ভোগ করবেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু জেনে-শুনে এইরকম মূর্খামি করার দরকারটা কি?

আমরা মহর্ষি বাল্মীকির পূর্ব ইতিহাস শুনেছি। তিনি ছিলেন রত্নাকর নামে বিখ্যাত এক দস্যু। প্রতিদিনই সেই দস্যুটি পাপকর্ম করছিল। একদিন ভাগ্যক্রমে দস্যুটি নারদ মুনির দর্শন পায়। নারদ মুনি তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি যে এত পাপকর্ম করে গৃহপরিবার পালন করছ—এই সমস্ত পাপের ভাগী তোমার কে হবে? রত্নাকর দস্যু মনে করেছিল যে, তার পাপের বোঝার ভাগী হতে পারে তার মা-বাবা, তার পত্নী। কিন্তু রত্নাকর যখন সেই প্রসঙ্গ মা-বাবা এবং সহধর্মিণী পত্নীর কাছে তুলল, তখন তারা কেউই তার পাপের ভাগী হতে চাইল না। তার পত্নী বলতে লাগল, 'আমার ভরণপোষণ করাই তোমার কর্তব্য এবং তোমার সেবা করাই আমার কর্তব্য। কিন্তু তুমি আমার ভরণ পোষণের জন্য কিরকম পাপ করছ না করছ সেইজন্য আমি তোমার পাপের ভাগী হতে যাব কেন?'

সেই ঘটনার পর রত্নাকর সমস্ত পাপকর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নারদ মুনির শরণাগত হলেন এবং নারদ মুনির নির্দেশে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। তারপর তিনি সর্বজন-শ্রদ্ধেয় মহর্ষি বাল্মীকিরূপে পরিচিত হন।

এক্ষেত্রে দেখা যায়, রত্নাকর পাপকর্ম করলেও তার সতী পত্নী পাপ করতে চায়নি, পতির সঙ্গে পাপের ভাগীও হতে চায়নি। ফলস্বরূপ, রত্নাকরের জীবনের মতিগতি পরিবর্তিত হয়েছিল। তাই সতী যদি প্রকৃতই পতিকে ভালবাসেন, তবে অবশ্যই পতিকে পাপকর্ম থেকে বিরত করতে অনুপ্রেরণা দেবেন। তবেই ত সংসার জীবন পবিত্র হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন ৪। মানব সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা কোন্‌টি?

উত্তর ঃ যে সেবার মাধ্যমে মানুষকে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে সাহায্য করা হয়, সেইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা।

প্রশ্ন ৫। বাইরের পরিবেশ আদৌ কৃষ্ণভজনের উপযোগী নয়, এমতাবস্থায় কি করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কৃষ্ণভক্তিতে পরিচালিত করা যায়?

উত্তর ঃ বড় বড় আনন্দজনক অনুষ্ঠান—যেমন, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রথযাত্রা, চন্দনযাত্রা, দোল পূর্ণিমা—এই সমস্ত উৎসবে ছেলে-মেয়েদের যুক্ত করানো, মঠ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া, ভগবদ্‌বিগ্রহ দর্শন করানো, ভক্ত ও ভগবানকে প্রণতি নিবেদন শেখানো উচিত। বড়দের অর্থাৎ, পরিচালকদের অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে প্রতিদিন রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ, তুলসী-শালগ্রাম, গৌর-নিতাই কিংবা জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা—যে কোনও বিগ্রহ স্থাপন করে পূজা, ভোগ নিবেদন ও আরতি করা উচিত। রোজ ভগবানের মহাপ্রসাদ ছেলে-মেয়েদের ভোজন করানো, অপ্রসাদ এবং বাজারের আজেবাজে জিনিস

খাওয়া যে আমাদের দেহ ও মনের পক্ষে ক্ষতিকর তা শেখানো, প্রতিদিন নিজেরা এবং ছেলে-মেয়েরা যাতে জপমালায় নির্দিষ্ট সংখ্যায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে তা লক্ষ্য রাখা। সুযোগ-সুবিধা হলে মাঝে মাঝে ভগবৎলীলা বিষয়ক ছায়াচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, প্রতিদিন সহজ সরল গল্পমূলক ভগবৎ-গ্রন্থ পাঠ, ভক্তিগীতি চর্চা, ভগবৎ বিষয়ক লীলাকাহিনী এবং চিত্রাবলীর মর্মার্থ বোঝানো কর্তব্য। ছেলে-মেয়েদের প্রতিবেশী সমবয়সীরা যাতে ভক্তিমূলক অনুশীলনে মনোনিবেশ করে, সেই জন্য তাদেরও উৎসাহ দান করা, ভগবানের জন্য ফুল তোলা, চন্দন ঘসা, পূজার বাসন মাজা, ধূপ ও দীপ জ্বালানো, খোল করতাল বাজানো, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে লতা-পাতা ফুল দিয়ে ভগবানের মঞ্চ সাজানো ইত্যাদি সেবায় ছেলে-মেয়েদের আদরের সঙ্গে নিযুক্ত করা, তাদের সকলকে নিয়ে কীর্তন করা অবশ্যই কর্তব্য।

কৃষ্ণভক্তি জিনিসটি আনন্দময়। তাই এতে কারও নিরুৎসাহিত হবার কথা নয়, তবে বড়দের ভক্তি-নিষ্ঠা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, প্রীতি-প্রেরণা তাদের সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের অন্তরে ভক্তিময় চরিত্র লাভ করবার মানসিকতা জাগিয়ে তোলে।

প্রশ্ন ৬। যারা মাদক দ্রব্য সেবন করে, তারা বলে যে মাদক ছাড়া তারা বাঁচতেই পারে না। তাদের পক্ষে কি করা উচিত?

উত্তর ঃ মাদক দ্রব্য—যেমন বিড়ি, সিগারেট, চা, কফি, খৈনি, জর্দা, দোক্তা, গাঁজা, চরস, এল-এস-ডি, হিরোইন—আরও নানাবিধ জঘন্য মাদক রয়েছে। সেইগুলি খেতে যারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তারা সেগুলি ছাড়া বাঁচতেই যে পারে না তার কারণ হল, সেই মাদককে তারা আর খাচ্ছে না, মাদকই তাদের খেয়ে চলেছে। তারা মাদক দ্রব্যের অধীন হয়ে পড়েছে। মাদকই তাদের জীবনসাথী হয়েছে। তবে মাদক ছাড়াতে হলে মাদকসেবনের মাত্রা দিন দিন ক্রমশ কমাতে হবে। মাদকের পরিবর্তে হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, মৌরি, এলাচ, লবঙ্গ, পিপল, জ্যেষ্ঠীমধু—এইগুলির মধ্যে কিছু একটা সেবন করলে ভাল হয়। বড় জোর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে সমস্ত মাদক-সেবনের অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে ছাড়াতে পারবেন এবং হরিনাম করে পবিত্র জীবন গড়তে পারবেন।

প্রশ্ন ৭। কলিযুগের মানুষের জন্য প্রধানত যে চারটি নিয়ম আছে অর্থাৎ আমিষ আহার, মাদক সেবন, জুয়া তাস-খেলা ও অবৈধ যৌনসঙ্গ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলি লঙ্ঘন করলে কি ক্ষতি হয়?

উত্তর ঃ মানুষ যদি সুন্দর জীবন গঠন করতে চায় তবে তাকে ধর্ম পালন করতে হয়। ধর্মের চারটি স্তম্ভ যেমন—১) সত্য, ২) শৌচ, ৩) দয়া ও ৪) তপঃ। এই চারটি বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে থাকবে। কিন্তু বেদ নিষিদ্ধ কর্ম করার ফলে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিঘ্নিত হয়, তখন ধর্ম নষ্ট হয়। মানুষ ব্যভিচারী, নাস্তিক ও ধর্মহীন হয়ে যায়। যেমন, আমিষ আহার করলে 'দয়া' গুণটি নষ্ট হয়, মাদক সেবনে 'শৌচ' বা পবিত্রতা নষ্ট হয়, জুয়া তাস খেলায় 'সত্য' নষ্ট হয় এবং অবৈধ যৌনতায় 'তপস্যা' নষ্ট হয়। তাই মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি নিষিদ্ধ কর্ম সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে চলেন।

প্রশ্ন ৮। রামরাজ্য কি?

উত্তর ঃ রাজা দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের শাসিত রাজ্যকে রামরাজ্য বলে। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি শ্রীব্যাসদেব রচিত মহাভারত গ্রন্থের শান্তি পর্বে উনত্রিশ অধ্যায়ে রামরাজ্যের বর্ণনা রয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র শ্রীজনমেজয়কে মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলছেন—শ্রীরামচন্দ্র পুত্রের মতো সমস্ত প্রজাদের প্রতিপালন করতেন। রামচন্দ্রের রাজত্ব কালে কোন কামিনীই বিধবা বা অনাথ ছিল না। যথা সময়ে মেঘ থেকে বারি বর্ষিত হত, তাই রাজ্যে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হত। কখনই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হত না। কারও অকাল মৃত্যু হত না। অগ্নিদাহ রোগব্যাধির ভয় ছিল না। প্রজারা পুত্রদের নিয়ে সহস্র বর্ষ পর্যন্ত সুস্থ শরীরে জীবিত থাকত। সকলেই করিতকর্মা ছিল। অর্থাৎ, কেউ আলস্যভাবে বসে থাকত না বা ঘুরে বেড়াত না। পুরুষদের মধ্যে পরস্পর কোনও বিবাদ হওয়া তো দূরের কথা, এমন কি মেয়েদের মধ্যেও কখনও কলহ উপস্থিত হত না। অর্থাৎ, তাঁরা শান্ত ও বুদ্ধিমান ছিল। প্রজারা সকলেই ধর্মপরায়ণ ও সন্তুষ্টচিত্ত ছিল। রাজ্যের কোথাও চোর, ডাকাত, বাটপাড়, লম্পটের ভয় ছিল না। কুচরিত্রের লোকের অভাবহেতু সকলেই নির্ভীক ছিল এবং ইচ্ছামতো সর্বত্র যাতায়াত করতে পারত। রাজ্যের সর্বত্র প্রচুর সুমিষ্ট ফল গাছে গাছে পূর্ণ ছিল, নানা সুগন্ধি ফুলের গন্ধ সর্বত্র বিরাজ করত। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বিস্তীর্ণ ছিল। গাভীগুলি প্রত্যেকে রোজ বড় বড় কলসী ভর্তি দুধ দিত। নদীগুলিতে স্বচ্ছ সুনীল জল প্রবাহিত হত। সমস্ত পরিবেশ শান্ত স্নিগ্ধ সুসজ্জিত থাকত, তেমনই মানুষের মধ্যে ধর্মপরায়ণতা, কর্তব্যবোধ, সৌহার্দ্য ভাব বজায় থাকত। ফলে, সকলের মনে সুখশান্তি প্রস্ফুটিত ছিল। শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বছর বনবাসের পর অযোধ্যার অধিপতি হয়ে এগারো হাজার বছর যাবৎ রাজ্য প্রতিপালন করেছিলেন।

প্রশ্ন ৯। এই জগতে নীতি আদর্শ কর্তব্য নিয়ে চললে বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয়। আমার জীবনে আমি তাই উপলব্ধি করছি। ভগবানের কৃপা পাচ্ছি না বলেই কি আমার এত অশান্তি ও দুর্ভাগ্য? মনে শান্তি কিভাবে পাবো?

উত্তর ঃ এই জগতে যারা সুখ শান্তি কামনায় নীতি আদর্শ কর্তব্য নিয়ে চলে তাদের বলে ভুক্তিকামী, যারা জগৎ দুঃখময় জেনে মুক্তি কামনা করে তারা মুক্তিকামী, যারা কোন বিশেষ যৌগিক ক্ষমতা আকাঙ্ক্ষা করে তারা সিদ্ধিকামী। শাস্ত্রে বলা হয়েছে এই ধরনের ব্যক্তিরা শান্তি লাভ করতে পারে না।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলে অশান্ত।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৪৯)

একমাত্র সর্বপ্রযত্নে কৃষ্ণসেবাপর ভক্তিই পরম শান্তি লাভের পন্থা।

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৪৯)

যে ব্যক্তি মনে করে, 'আমি কোনও অন্যায় করিনি, আমি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, আমি সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃৎ। আমি পরিবার বা সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমার এই জগতে সুখ ও শান্তি লাভের অধিকার আছে। আমি বহু কষ্ট সহ্য করে রয়েছি। আমি শান্ত নিরীহ সরল সুন্দর নির্দোষ মানুষ। আমার প্রতি কোনও দুঃখজনক বা উদ্বেগকর আচরণ করে আমাকে কষ্ট দেওয়া বা আঘাত দেওয়া কারও উচিত নয়।' এইরকম মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি প্রতি পদে পদে অশান্তি ও কষ্টই লাভ করে।

পক্ষান্তরে, যিনি পরম নিয়ন্তার পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেন এবং নিজের কামনা বাসনাময় কলুষতা হৃদয় থেকে দূর করে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধানার্থে সমস্ত রকমের আয়োজন করেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সকলের অন্তর্যামী এবং সর্বলোকের হিতাকাঙ্ক্ষী বা সুহৃৎ বলে জানেন, তিনিই পরম শান্তি লাভ করেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শান্তি লাভের সেই পন্থাই উল্লেখ করেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোক মহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমাকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, সমস্ত তপস্যার লক্ষ্য এবং আমাকে সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ জেনে জড়জাগতেক দুঃখদুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে অশেষ শান্তি লাভ করেন।" (গীতা ৫/২৯)

প্রশ্ন ১০। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এই কথাটি বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস লিখেছেন। উক্তিটি বুঝিয়ে দেবেন?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় একশ বছর আগে অর্থাৎ, আজ থেকে প্রায় ছয়শ বছর আগে বৈষ্ণব সাহিত্যে চণ্ডীদাসের লেখা রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বেশ কিছু পদাবলী পাওয়া যায়। কিন্তু 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এই কথাটি বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং এটি রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়ও নয়। অতএব উক্তিটি বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের লেখা নয়। এটি কোন আধুনিক কবিরই রচনা।

মানুষ কখনই সবার উপরে হতে পারে না। কারণ, শুধু মানুষ কেন, সমস্ত দেবদেবীরাও পরম নিয়ন্তার অধীন। মানুষ নামটিই এসেছে পূর্বপুরুষ মনু থেকে। মহান্ ঋষি পরম ভগবদ্ভক্ত মনুই মানব-জাতির পিতা। কিন্তু সে-সব ভুলে গিয়ে আমরা ভাবছি আমাদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে বানর এবং তার বিবর্তিত রূপ কাঁচামাংসভুক্ অসভ্যরাই হচ্ছে আমাদের পূর্বসূরী।

অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গৌণ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা উল্লেখ করেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

অর্থাৎ, 'শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান সচ্চিদানন্দময়। তিনি সমস্ত কিছুর আদি এবং সমস্ত কারণের পরম কারণ।' কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ভাবছে—শ্রীকৃষ্ণ কেন ভগবান হবেন? আমিই ভগবান, জীবই ভগবান। আমরা ভালভাবেই জানি যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের একটি

ধূলিকণা পর্যন্ত মানুষ সৃষ্টি করেনি। তা হলে সে ভগবান হল কী করে? শুধু তাই নয়, কলিযুগে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হয়ে পড়েছে। যে সমস্ত কদাচার অন্যান্য জীব-জন্তুকে দেখা যায় না, সেগুলিও মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। যেমন, পরিবার পরিকল্পনার দোহাই দিয়ে গর্ভবতী মায়েরা আজকাল গর্ভস্থ শিশুদের হত্যা করছে। দেখা যায়, হিংস্র পশুর ভয় মানুষ করছে না বটে, কিন্তু মানুষ সব চেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে অপর মানুষকে। কারণ মানুষ কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণায় পারদর্শী, যা পশুরা পারে না। ইন্দ্রিয় ভোগ তৃপ্তির জন্য মানুষ নানা রূপ ধারণ করছে। যাঁরা শাসন, আইন ও বিচার কার্য পরিচালনা করেন, তাঁরাও বৈদিক অনুশাসন চর্চা করেন না। অগণিত জনগণ যতই যা করুক— শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি—সমস্ত দিকটাই নিরাশাব্যঞ্জক ও উদ্বেগযুক্ত। কেউই সুখী নয়।

সবাই স্থান, কাল ও পরিবেশের অধীন। তাই মানুষ যদি মনে করে, সে সবার উপরে এবং তার জীবনটি সর্বাঙ্গ সুন্দর, তা হলে তা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরিশেষে বলা যায়, এই অনিত্য জগতে ক্ষণস্থায়ী অথচ সুদুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে যদি কেউ পরম নিয়ন্তা পরম সত্যের অনুসারী না হয়, তবে যতই সে জ্ঞানী, গুণী, মানী বা পণ্ডিত হোক না কেন, তার চেতনা পশু-স্তরেই আবদ্ধ থাকে। সুতরাং, মানুষ কখনই সবার উপরে নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন পরম সত্য।

প্রশ্ন ১১। প্রায় দেখা যায় প্রচারক্ষেত্রে কোনও নবীন সাধুকে দেখলে কিছু লোক তার সঙ্গে মজা করে এবং অবজ্ঞা করেই থাকে। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ কেউ ভাল হোক সেটা ঈর্ষাপরায়ণ সমাজ চায় না। কেন না, বৈদিক বিধিবিরুদ্ধ নানা রকমের নেশাদ্রব্যের ব্যবহার, রাজসিক ও তামসিক খাদ্য উৎপাদন, কাম-উত্তেজক সিনেমা ও পত্র-পত্রিকার ব্যাপক প্রচলন ইত্যাদি জনমানসে উগ্র রজো ও তমোগুণের প্রভাব বিস্তার করছে। এরূপ সমাজ ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে যখন কোন সাধু কথা বলতে শুরু করেন, মূর্খ সমাজে তখন তিনি উপহাসের পাত্র হয়েই পড়েন।

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি মনে করে, 'অন্য সবাই আমার মতো হবে, নতুবা আমার চেয়ে মন্দ হবে। আমার চেয়ে কেউ ভাল হোক—তা আন্তরিকভাবে আমি চাই না।' এই মানসিকতার জন্য যখন নতুন সাধু ভগবৎ কথা প্রচার করে, তখন ঈর্ষাকাতর ব্যক্তিরা বলে ওঠে—'ওটা আবার কোন্ পেঁচো এসে আমাদের উপদেশ দিচ্ছে রে?'

সাধুরা চান—মহাপ্রভুর বাণী সফল হোক। মানুষ বৈদিক বিধিনিষেধ পালন করে জগৎ-হিতকর হরিনাম কীর্তন করুক। কিন্তু ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও সুখভোগ-বাসনা বাদ দিয়ে দেহসর্বস্ব ব্যক্তিরা ভগবৎ কথা শুনতে রাজি নয়। তাই সাধুদের প্রতি তারা শ্রদ্ধাবান নয়।

যদিও বা ভগবান ঋষভদেবের পুত্র পরম বৈষ্ণব রাজা ভরতঋষির নাম অনুসারে ভারতবর্ষ নামকরণ হয়েছে, কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি ভারতবর্ষেই অবতীর্ণ হয়ে

সংকীর্তন আন্দোলন প্রবর্তন করেছেন এবং ভারতেরই মহাত্মা শ্রীল প্রভুপাদ সারা পৃথিবীতে হরিনাম বিতরণ করেছেন, তবুও ভারতবর্ষের বহু মানুষ নামপ্রচারক হরিকথা-বিতরণকারী সাধুদের অবজ্ঞা করে। যেহেতু তারা অবৈষ্ণবীয় জীবনধারায় দিন যাপনে অভ্যস্ত, তাই তাদের সামনে ধুতি, তিলক, কণ্ঠিমালা, শিখাধারী বৈষ্ণব উপস্থিত হলে তারা কিম্ভূতকিমাকার জীব বলে মনে করে।

অনেক সময় সাধুর ভেক ধরে বহু ভণ্ড গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে বেড়ায়। তারা নানা ফালতু মন্ত্রবুলি আওড়ায় এবং নিজেদের বড় জ্যোতিষীরূপে পরিচয় দেয়। এইভাবে চাল, ডাল, টাকাপয়সা সংগ্রহ করে। তাদের প্রতারণা ও ভণ্ডামি যখন প্রকাশ পায়, তখন তাদের নাগাল পাওয়া যায় না। পরিণামে সেই ভণ্ডদের প্রতি জনসাধারণের মনে গভীর অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা জন্মে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তাদের কাছে যদি কখনও সরল সাধু ব্যক্তি এসে উপস্থিত হন, তখন তারা মনে করে—ঐ ব্যক্তিও সেই রকমের কোনও ভেকধারী এসেছেন। এইভাবে লোকে তাঁকে এড়িয়ে যায় ও অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

তবে লোকে যতই অবজ্ঞা করুক, সাধুসঙ্গ প্রভাবে মানুষ একদিন না একদিন বুঝতে পারবে এবং তার সুমতি আসবে। তখন তারাও সাধুকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করবে। 'তার সাক্ষী জগাই মাধাই'।

প্রশ্ন ১২। লোকে বলে, মহাজনদের নির্দেশিত পন্থাটাই প্রকৃত পথ। মহাজন কারা? তাঁদের নির্দেশিত পথই বা কি?

উত্তর : মহাজন বলতে শ্রীমদ্ভাগবতে ১২জন বিশেষ বিশেষ ভগবদ্ভক্ত বা অবতারকে নির্দেশ করা হয়েছে। শ্রীযমরাজ তাঁর দূতদের বলছেন—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভটাঃ ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥

(ভাঃ ৬/৩/২০-২১)

অর্থাৎ, 'হে দূতগণ, স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা), নারদ, শম্ভু (শিব), কুমার (ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার), কপিল (দেবহূতির পুত্র), মনু, প্রহ্লাদ, জনক (সীতার পিতা), ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি (ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব) এবং আমি (যমরাজ)—আমরা এই দ্বাদশ জন মাত্র ভাগবত-ধর্মতত্ত্ব বিদিত আছি। এই অতিশয় নির্মল, দুর্বোধ্য ও পরম গুহ্য তত্ত্ব জানলে জীবের ভগবানের পরম পদ প্রাপ্তিরূপ মুক্তি লাভ হবে।'

প্রত্যেক মহাজন বিশ্বের পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্বের জীব সৃষ্টিকর্তা শ্রীব্রহ্মা ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

(ব্রঃ সঃ ৫/১)

অর্থাৎ, 'সৎ, চিৎ ও আনন্দময়-শ্রীবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনিই অনাদি ও অনাদিরও আদি এবং সমস্ত কারণের কারণ।' যদিও বা জগতের মূঢ় ব্যক্তিরা যাকে-তাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করতে পারে, কিংবা নাস্তিকও হতে পারে।

এই কলি যুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন—এই কথা সমস্ত পাপী জীবের দণ্ডদাতা শ্রীযমরাজও তাঁর দূতদের বলছেন—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ (ভাঃ ৬/৩/২২)

অর্থাৎ, 'নামসংকীর্তনাদির মাধ্যমে শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ—এই হল ইহ জগতে জীব সকলের পরম ধর্ম।' সুতরাং, জগতে বহু জনের বহু রকমের মত-পথ থাকলেও আমাদের মহাজনদের নির্দেশিত পন্থাটিই গ্রহণীয়।

প্রশ্ন ১৩। আপনাদের মন্দিরের পাঁচতলার ঘরে নাকি গোপনীয় অস্ত্রশস্ত্র মজুত রয়েছে, তাই কাউকে ওখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না। আমার বন্ধুদের এই মন্তব্যের উত্তর কি?

উত্তর : সবচেয়ে গোপনীয় অস্ত্র হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি। যে অস্ত্রের দ্বারা সংসারভয় দূরীভূত হয়। সেই অস্ত্রের সন্ধান যারা করে না, তারা অনর্থক জীবন ধারণ করে রয়েছে বলে শাস্ত্রের নির্দেশ। তাই আপনার বন্ধুদেরকে বাইরে থেকে সংশয়ের মধ্যে না রেখে শীঘ্রই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রেরণা দিন এবং মন্দিরে এসে ভক্তজীবন যাপনে সহায়তা করুন, যাতে তারা এখানে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রগুলি সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন।

প্রশ্ন ১৪। পারমাণবিক বিজ্ঞান সভ্যতার অগ্রগতিতে না কি বিংশ শতকের মধ্যে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এই অবস্থায় কৃষ্ণনাম কতটা বিপদ থেকে রক্ষা করবে?

উত্তর : আমাদের বুঝতে হবে যে, এই জগতে অনবরত বহু রকমের বিভীষিকা রয়েছে। সে পারমাণবিক বোমার উৎপাতেই হোক, কিংবা বন্যা-ভূমিকম্পই হোক—দুঃখের অনেক প্রকার কারণ রয়েছে। যে কোনও কারণেই পৃথিবীর বড় বড় সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৫) ভগবান বলেছেন, '*দুঃখালয়মশাশ্বতম্*'—জড় জগৎ হল দুঃখের আলয় এবং অশাশ্বত। অর্থাৎ, এই জগতে এমন কিছু নেই যেটা স্থায়ী সুখের জিনিস হবে। কারণ জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুময় জগতে আমরা বাস করছি। জড় জগতের প্রতিটি বদ্ধ জীবকে যে কোনও সময়, যে কোনও পরিস্থিতিতে, বাধ্য হয়ে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে হবে। এজন্য নির্দিষ্টভাবে বিংশ শতকের হিসাব করার দরকার নেই, কিংবা পরমাণু বোমায় মরবার চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই। যে কোনও সময়েই মৃত্যু হবে।

কিন্তু সেটিই শেষ নয়। মৃত্যুর পর একই সমস্যা থেকে যাবে। '*পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্*' (গীতা ৮/১৫)—পুনরায় যে কোনও একটি দেহ নিয়ে এই

দুঃখময় জগতে জন্ম নিতে হবে। যতই ভাল ভাল পুণ্যকর্মাদি আচরণ করা হোক না কেন, এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও শান্তি পাওয়া যাবে না। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণসেবা বাদ দিয়ে যতই গুণমণি হন না কেন, জন্মজন্মান্তর ধরে দুঃখময় সেই জড় ব্রহ্মাণ্ডেই থেকে যেতে হবে। *'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনঃ'* (গীতা ৮/১৬)।

কিন্তু কৃষ্ণনাম একমাত্র পথ। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্বরূপ অভিন্ন। সেই কৃষ্ণ এই সব উৎপাতপূর্ণ প্রকৃতির অতীত—*'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'* (গীতা ৮/৯)। যাঁরা কৃষ্ণানুকূল জীবন গ্রহণ করছেন, তাঁরা মৃত্যুর সময় স্থির চিত্তে দিব্য কৃষ্ণনাম স্মরণ করলে সেই পরমতত্ত্ব লাভ হবে—*'প্রয়াণকালে মনসাচলেন'* (গীতা ৮/১০) এই অনিত্য জগৎ থেকে নিত্য ভগবৎ-লোকে উপনীত হতে হলে পরমনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে। গীতায় বলা হয়েছে—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

"হে ভারত, সর্বদা সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হও, তা হলেই তাঁর কৃপায় পরাশান্তি লাভ হবে, এবং তাঁর নিত্য জগৎ প্রাপ্ত হবে।" (গীতা ১৮/৬৫)

নাস্তিক ও জড় অহমিকাপূর্ণ আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা সমস্ত রকমের ধ্বংসমুখী কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাতে বিমর্ষ হন না। কারণ এই সমস্ত বিভীষিকাই আমাদের যে কোনও মুহূর্তে মৃত্যুবরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব বিলম্ব না করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকাই আমাদের কর্তব্য। আর সেই প্রস্তুতি হল কলিযুগের একমাত্র ধর্ম—*'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'*—এই হল মহাপ্রভুর নির্দেশ।

একজন ছাত্রকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে যেমন আগের থেকেই প্রত্যহ পাঠ অভ্যাস করতে হয়, সেই রকম মৃত্যু-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে সর্ব প্রযত্নে ভগবানের দিব্য নাম 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র গ্রহণ করতে হয়। ভগবান বলছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্তা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

"মৃত্যুর সময় আমাকে স্মরণ করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।" (গীতা) সেইজন্য অজানা মৃত্যুর মুখে শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখতে হলে জীবনের সূচনা থেকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে সর্বক্ষণ অবিরামভাবে দিব্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয়। **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥**

তা ছাড়া, বিশ্বময় ভগবানের এই নাম মহিমা প্রচারের ফলে জগতের মানুষ যখন নামপরায়ণ ভগবদ্ভক্তের সংস্পর্শে আসবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের জীবনের মূল্যটি কোথায়। ভক্তদের অনুসরণ করে তারা যখন হরেকৃষ্ণ সংকীর্তনে যোগ দিতে থাকবে, তখন তাদের বহু অভ্যস্ত কুপ্রবৃত্তিগুলি সংশোধিত হয়ে তারা সাত্ত্বিক গুণের দ্বারা প্রভাবিত হবে। তারা তখন উত্তেজক আমিষ আহার, নেশাভাঙ, অনর্থক খেলা, অবৈধ

যৌনাচার ইত্যাদির মাধ্যমে জড় কামনাবাসনার মধ্যে মন প্রাণ কলুষিত করতে কখনই চাইবে না। তা চাক্ষুষ প্রমাণ বহু রয়েছে। কৃষ্ণনাম কীর্তন কৃষ্ণকথা ছাড়া প্রপঞ্চের আজেবাজে কথায় তারা বৃথা কালাতিপাত করে না। কেননা কৃষ্ণভাবনার অনুশীলনকারীর চেতনা ক্রমশঃ শুদ্ধ হয়ে যায়।

জগৎ জুড়ে মানুষের মস্তিষ্কে এই শুভ চেতনা জাগ্রত হলে বিশ্বযুদ্ধও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ইউনেস্কো বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়ে একমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণের কথাই ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন ১৫। শাস্ত্রে বলা হয়েছে "মহাজনো যেন গতঃ পন্থাঃ"—মহাজন নির্দেশিত পন্থায় চলা উচিত। এই মহাজন কে? রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দ না কি গান্ধীজী?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বারো জন মহাজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেই দ্বাদশ মহাজন প্রকৃত ভগবৎ-তত্ত্ব বা ধর্ম-তত্ত্ব জানেন। তাঁরা হলেন—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

স্বয়ম্ভূ—যিনি ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে উদ্ভূত, সৃষ্টির আদি জীব, জড় ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা শ্রীব্রহ্মা; শ্রীনারদ মুনি—যিনি জড়লোক ও বৈকুণ্ঠলোক সর্বত্র অনায়াসে যাত্রা করেন, ব্যাসদেবের গুরুদেব; শম্ভু—পার্বতীদেবীর পতি শ্রীশিব; কুমার—ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার; শ্রীকপিলদেব—শ্রীদেবহূতির পুত্র; মহর্ষি মনু—মানব জাতির আদি পিতা শ্রীস্বায়ম্ভুব মনু; শ্রীপ্রহ্লাদ—হিরণ্যকশিপুর পুত্র, যাঁকে ভগবান শ্রীনৃসিংহরূপে কৃপা করেছিলেন; রাজর্ষি জনক—সীতাদেবীর পিতা; শ্রীভীষ্মদেব—শ্রীগঙ্গার পুত্র; শ্রীবলিমহারাজ—যিনি ভগবানের বামন অবতারে আত্মসমর্পণ করেছিলেন; বৈয়াসকি—ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি শ্রীব্যাসদেবের পুত্র মুক্তপুরুষ শ্রীশুকদেব গোস্বামী; শ্রীযমরাজ—মৃত্যুর দেবতা। (শ্রীমদ্ভাগবত ৬/৩/২০)

শ্রীমদ্ভাগবতে এই দ্বাদশ মহাজনের কথা বলা হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই পরমনিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভজন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভটাঃ ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥

শ্রীযমরাজ তাঁর দূতদের বলছেন—"আমরা এই বারো জন প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব জানি। হে ভৃত্যগণ, এই দিব্য ধর্ম যা ভাগবত-ধর্ম বা ভগবৎ প্রেম ধর্ম নামে পরিচিত, তা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। তা অত্যন্ত গোপনীয় এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য, কিন্তু কেউ যদি ভাগ্যক্রমে তা হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পায়, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের আনন্দময় ধামে ফিরে যায়।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৬/৩/২১) ধর্মতত্ত্ব 'গোপনীয়' হলেও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগত জন তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, 'দুর্বোধ্য' হলেও মহাজন পরম্পরা ধারায় আশ্রিত হলে তা সহজেই বোধগম্য হয়।

এই থেকে সহজেই বোঝা যায়, যে ব্যক্তি শ্রীহরির উপাসনা করেন না বা কৃষ্ণভক্ত নন, তিনি মহাজন হতে পারেন না; যে ব্যক্তি কৃষ্ণভজনের নির্দেশ দেন না, তিনি মহাজন নন; যিনি পরম্পরা আশ্রিত হয়ে কৃষ্ণভজন করেন না, তিনি মহাজন পন্থায় স্থিত নন; যাদের জীবন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূলে প্রবাহিত, তারা মহাজন নির্দেশিত পন্থার থেকে বিচ্যুত।

কৃষ্ণভক্ত সর্বদা কৃষ্ণনাম মহিমা কীর্তন করেন, গীতা, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন, জগদ্বাসীকে কৃষ্ণভক্তিসেবায় উদ্বুদ্ধ করেন, কৃষ্ণভক্তি-প্রতিকূল বিষয় বর্জন করেন—যেমন আমিষ আহার, চা বিড়ি তামাক চুরুট সেবন, অবৈধ যৌনতা, তাস জুয়া খেলা ইত্যাদি। অতএব, শাস্ত্রে যাকে-তাকেই মহাজন বলা হচ্ছে না।

প্রশ্ন ১৬। নিজের চোখে দেখে তবে বিশ্বাস করতে আছে। ভগবানকে যেহেতু দেখা যায় না এবং স্বর্গ নরক দেখা যায় না। এগুলিতে বিশ্বাসের প্রয়োজন কি?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, 'উলুকে না দেখে কভু সূর্যের কিরণ।' অর্থাৎ, পেঁচা কখনও সূর্যকে দেখতে পায় না। একটা পেঁচা বড় জোর ইঁদুর, আরশোলা, পোকামাকড়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারে। সারারাত সেগুলির সন্ধান করাটাই তার কাজ।

যে ব্যাঙ কুঁয়োতে বাস করে জীবন অতিবাহিত করছে, সেই ব্যাঙ কখনও অতলান্তিক মহাসাগরের কথা বিশ্বাসই করতে পারবে না। কারণ তাদের দৃষ্টিশক্তি জ্ঞানবুদ্ধি অত্যন্ত নগণ্য ও সীমিত। তাদের সেই বুদ্ধিসীমার বাইরে কিছু আছে কি না আছে তারা বুঝতেই পারে না।

খরগোস খুব দৌড়াতে পারে। কোন শত্রুর আগমন বুঝতে পারলে সে খুব দৌড় দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু তার একটা বদ্ স্বভাব আছে। সে কিছুদূর দৌড়িয়েই চোখ বন্ধ করে ফেলে। কারণ সে মনে করে আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, অতএব কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। সুতরাং, আমি গুপ্টি মেরে বসে থাকতে পারি। যার ফলে খরগোস সহজেই ধরা পড়ে যায়।

ভগবান, স্বর্গ-নরক—ইত্যাদি বলে কিছু নেই—এইভাবে অস্বীকার করতে পারলেই যা ইচ্ছা এই জগতে খেয়ালখুশি মতো তা-ই করা যাবে। কিন্তু শেষে যে কি দুর্গতি হবে, পরে সে দেখতে পাবে। তখন হয়তো নরকের বেদম খোঁচা খেয়ে খেয়ে বিশ্বাস করবে যে, 'ও হ্যাঁ! নরক বলে কিছু তো আছে। এই তো খুব খোঁচা খাচ্ছি।'

বিদ্যুতের তার লাগানো আছে। একটি খুঁটির গায়ে লেখা আছে 'সাবধান!' কিন্তু কেউ যদি বলে 'আমি বিশ্বাস করি না যে ওতে বিদ্যুৎ আছে। কারণ, দেখতে তো পাচ্ছি না। কিন্তু সেরূপ দুর্বুদ্ধি করে সে যদি তারে হাত লাগায় অমনি বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, 'ও হ্যাঁ! বিদ্যুতের প্রতি সাবধান কথাটির একটি গুরুত্ব আছে বৈকি।' কিন্তু সেই বিশ্বাসের কি মূল্য?

একজন লোক শুনেছিল চুরি করলে দণ্ডভোগ করতে হয়। কিন্তু সে যদি ভাবতে থাকে যে, 'দণ্ডভোগ করাটা নিজের চোখে দেখি, তারপরে বিশ্বাস করব। নইলে চুরি করা ক্ষতিকর কিছু নয় বলে মনে করি।' তখন হয়ত চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল, অমনি লোকেরা তার মাথায় লাঠির ঘা লাগালো। তখন সে রক্তাক্ত মাথায় বিশ্বাস করতে থাকবে 'ও হ্যাঁ! চুরি করলে দণ্ডভোগ করতে হয়—কথাটিতে বিশ্বাস থাকা উচিত।' পাপী মানুষেরা মৃত্যু লগ্নে এসে বুঝতে পারে, 'হায়! আমার দেহ ছেড়ে আমি এখন নরকেই যাচ্ছি। আমার দুর্দশা কেউ দেখছে না।'

বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে—সত্যিই এই রকম পেঁচা, ব্যাঙ, খরগোস, চোর ইত্যাদির মতো—দেখে বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা অনেক কিছু দেখিনি, অথচ সহজেই বিশ্বাস করি। দাদু কিংবা তাঁর বাবাকে দেখি নি। তবুও বিশ্বাস করি তিনি ছিলেন। আমেরিকা দেখিনি, তবুও বই পড়ে লোকমুখে শুনে বিশ্বাস করি। কেউ যদি বলে 'আমি আগে আমেরিকা দেখব তারপর আমেরিকা বলে কিছু আছে সেই বিশ্বাস করব।' সেরকম মূর্খের বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন নেই। যারা দাদুকে দেখেনি অথচ তার কথাগুলি বাবার মাধ্যমে পেয়ে বিশ্বাস করতে পারেন তারা অবশ্য মুনি-ঋষিদের নির্দেশ, তাঁদের ভগবান সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। অন্যথায় যদি কারও মুনি-ঋষিদের কথায় বিশ্বাস না থাকে, ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকে তবে তার আর কোন কিছু বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই—কারণ অবিশ্বাসী জীবনের কোন মূল্য নেই।

কোন একটি বস্তু দেখতে হলে কতগুলি শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার থাকে। অনেক বস্তুই আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে, তাই বলে কি সেই সব বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যাবে না? আমি দেখছি না বলে অন্য কেউও দেখছে না—এই রকম এক নম্বর পাগলের মতো কথা কোন সুস্থ ব্যক্তি মেনে নিতে পারে না।

অতি ক্ষুদ্র জিনিস দেখতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগে। অতি দূরের বস্তু দেখতে হলে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগে। সঠিক দেখার জন্য সুস্থ চক্ষু লাগে। পরিষ্কার দেখার জন্য আলো লাগে। নিজের চক্ষুকে দেখার জন্য আয়না লাগে। অর্থাৎ, কতগুলি মাধ্যম ব্যতিরেকে কিছুই দেখা যায় না। তেমনই পারমার্থিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তির বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ নির্দেশ ইত্যাদির মাধ্যমে ভগবানকে দেখতে হয়। পৃথিবী থেকে স্বর্গ-নরক কতদূর, সেখানে কে থাকে, সেখানকার অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। সেখানে যাওয়ার পদ্ধতি রয়েছে। দেখার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু কট্টর অবিশ্বাসী লোকের পক্ষে সেই সব জানার জন্য ব্যস্ততার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ১৭। এই জগৎটি ত্যাগের জন্য না ভোগের জন্য ব্যবহার করা উচিত?

উত্তর ঃ ত্যাগের জন্যও নয় ভোগের জন্যও নয়, ভগবানের সৃষ্টি এই জগৎটি ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হওয়াই উচিত।

প্রশ্ন ১৮। বেদের উৎপত্তি কোথা থেকে?

উত্তর ঃ শ্রীব্রহ্মার মুখ দিয়ে 'ওঁ' উচ্চারণ হল। সেই 'ওঁ' শব্দ থেকে বেদ জন্ম হল।

'ওংকারে জন্মিল বেদ হঞা চারি ভেদ।'

(কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী ১২/৬/৭১)

প্রশ্ন ১৯। বৈষ্ণব ধর্মে আমিষ আহার বর্জনীয় ও জীবহিংসা নিষিদ্ধ। কিন্তু শাক-সব্জিতে প্রাণ বা চেতনসত্তা বিদ্যমান, তা হলে কি গ্রহণ করা যাবে?

উত্তর ঃ বৈষ্ণব ধর্মের বিধি হল ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করা। শাক-সবজি ফল-মূল ভগবানকে অর্পণের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। তাই শাক-সবজি ভগবদ্‌প্রসাদরূপে গ্রহণে কোনও দোষ নেই। ভগবানের নির্দেশ অমান্য করাটাই দোষ। যেমন, রাষ্ট্রে সেনাপতির নির্দেশে যখন বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তখন দণ্ডভোগের জন্য সরকারের আইনের দ্বারস্থ হতে হয় না। কিন্তু যখনই কেউ নিজের কোনও আত্মীয় স্বজনকেও খুন করে বসে, তখন তাকে দণ্ডভোগ করার জন্য আদালতে আটক থাকতে হয়। ঠিক সেই রকম, কেউ নিজ বুদ্ধিতে যদি এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, শাক-সব্জি শস্য খাদ্য না গ্রহণ করে কেবলমাত্র জল কিংবা বাতাস খেয়ে জীবন ধারণ করা উচিত, তা হলেও তার জীবহিংসা হচ্ছে। কারণ, জলে কিংবা বাতাসে অসংখ্য জীব রয়েছে। আমাদের খাদ্যগ্রহণ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে সেই সমস্ত জীবের প্রাণহানি হচ্ছে। অতএব কেবল বাতাস খেয়ে থাকলেও জীবহিংসা হচ্ছে। সুতরাং, নিজ নিজ মনগড়া মতে না গিয়ে ভগবৎ-নির্দেশ—বৈদিক শাস্ত্রবিধি গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

প্রশ্ন ২০। দশ-বারো বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মতি করানো যায়? আধ্যাত্মিক গভীর তত্ত্ব তাদের কিভাবে বোঝানো যায়?

উত্তর ঃ সরলমতি বালক-বালিকারা অতি সহজেই ভগবানের কথা গ্রহণ করতে পারে, জটিলমতি বয়স্ক ব্যক্তিরা তা পারে না। এক আচার্যের মুখে শুনেছিলাম—একজন বয়স্ক পণ্ডিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "মশাই বলুন তো—ভগবান কে?" তখন তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তি মুখ কুঁচকিয়ে বলতে লাগলেন—"তা সহজে বলা সম্ভব নয়। ভগবৎ-তত্ত্ব! সেটি খুব কঠিন তত্ত্ব। খুব গভীর তত্ত্ব। সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।" অথচ, কাছেই ছিল এক বাচ্চা মেয়ে। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, "বল তো—ভগবান কে?" অমনি সে চিৎকার করে বলতে লাগল—"কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। ভগবান কৃষ্ণ!" শ্রীমদ্ভাগবতের কথা "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"—তা পণ্ডিত ব্যক্তিটি জটিলবুদ্ধি হওয়ার জন্য বলতে না পারলেও সরলমতি বালিকাটি সহজে বলতে পেরেছিল।

এমন কি, প্রত্যক্ষ দেখেছি যে, ভগবানের মন্দিরে যে সমস্ত শিশুরা আসে তারা অনেকেই অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে শ্রীবিগ্রহ, দেওয়াল চিত্র, ভক্তবৃন্দকে দর্শন করে। কেউ

বলে—"কত সুন্দর রাধাকৃষ্ণ। এত সুন্দর! বাবা, আমাকে ছোট ছোট রাধাকৃষ্ণ এনে দেবে, আমি রোজ পুজো করব।" কখনও দেখি বড়রা ধমক দিয়ে বাচ্চাদের বকে—"চল্ চল্ আর দেখতে হবে না।" কারণ তাদের কাছে এমন কিছু আকর্ষণীয় নয়। বেশির ভাগ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হচ্ছে নানা প্রজল্প, জড়জাগতিক আহার বিহার মৈথুন ইত্যাদি। বড়রা যদি ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মতি রেখে চলেন, তবে ছোটরা স্বাভাবিকভাবেই বড়দের কাছে ভক্তি শিক্ষার আলো লাভ করবে। বড়দের আচরণ যদি ভক্তিবিরোধী হয়, তবে বড়দের কাছে ছোটরা সেই বদ-অভ্যাসই শিখবে। এই হচ্ছে আসল কথা। সেইজন্য ছোটদের ভক্তি-আনুকূল্যে রাখতে হলে সযত্নে বড়দের ভক্তি-আনুকূল্যে থাকতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা কথা, তাঁর মধুর রূপ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা, মহামন্ত্র কীর্তন, প্রণাম মন্ত্র—এই সব সহজেই শিখিয়ে দেওয়া যায়। শিশুদের বোধগম্য করে রামায়ণ মহাভারত আদি গ্রন্থের ভক্তিমূলক কাহিনী নিয়মিত বলতে হবে। এতে শিশুরা আকৃষ্ট হয়। ভগবানের সুন্দর সুন্দর ছবি, ভগবানের সুস্বাদু মহাপ্রসাদ, মধুর ভগবৎ-প্রীতি এবং উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্তন ও নৃত্যের প্রতিও শিশুরা আকৃষ্ট হয়। অনেক সময় জটিল তত্ত্বকেও সহজ করে বোঝানো যায়। এই জন্য বড়দের দক্ষ এবং নিষ্ঠাপরায়ণ হতে হবে।

বাইবেলেও দেখা যায়, যিশুখ্রিস্ট ঘোষণা করেছিলেন—"শিশুর মতো সরল না হলে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যাবে না।" আধুনিক জড় শিক্ষায় শিক্ষিত জটিল মস্তিষ্কসম্পন্ন বিষয়ী ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু শিশুরা সরল ও কোমলমতি হওয়ার জন্য সহজে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। তাদের শুধু কুসঙ্গ-দুঃসঙ্গ থেকে সরিয়ে সযত্নে কৃষ্ণসেবায় যুক্ত করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কাজ। অবশ্য কখনও কখনও অভিভাবকের চেষ্টা এবং যত্ন সত্ত্বেও সন্তানেরা ভক্ত না-ও হতে পারে। তবুও অভিভাবকের কর্তব্য অভিভাবককে করতেই হবে।

প্রশ্ন ২১। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, রেশম পবিত্র বস্ত্র। কিন্তু রেশম তৈরি হয় গুটি পোকাকে হত্যা করে; বৈষ্ণবদের পক্ষে তা পবিত্র হল কি করে?

উত্তর ঃ বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত এবং মহাজন ও আচার্যগণ কর্তৃক গৃহীত বলে তা পবিত্র বস্তুরূপেই গণ্য। যেমন, মধু পবিত্র বস্তু। মৌমাছি ফুল থেকে মধু গ্রহণ করে মুখে পুরে, তারপর উড়ে এসে চাকের মধ্যে সেই মধু সঞ্চিত রাখে। সেই মধু যখন ভগবৎ সেবার্থে সংগ্রহ করা হয়, তখন অনায়াসে মৌচাকের মৌমাছির ডিম নষ্ট হয়। শঙ্খ পবিত্র বস্তু। ভগবৎ সেবার্থে শাঁখের খোলা সংগ্রহ করতে হলে, জীবন্ত শঙ্খকে হত্যা করতেই হয়। সেই রকমই অজিন বা হরিণের চর্ম, যা মুনিঋষিগণ অত্যন্ত পবিত্র আসনরূপে ব্যবহার করেন। তা ছাড়া এমন অনেক বস্তু আছে, যেগুলি পবিত্র বলে শাস্ত্রে গৃহীত হয়েছে। যেমন, মৃদঙ্গ যা গো-চর্ম দিয়ে তৈরি। পক্ষীর পালক নিশ্চয় পবিত্র নয়। কিন্তু ময়ূর পক্ষীর পালক পবিত্র বস্তুরূপে গণ্য। মলমূত্র অবশ্যই

অপবিত্র হলেও গোবর বা গোমূত্র পবিত্র। মরাপ্রাণীর দাঁত পবিত্র নয় কিন্তু হাতির দাঁত পবিত্র। সুতরাং, ভগবৎ-সেবা বিধানার্থে গৃহীত বেদবিহিত বস্তুই পবিত্র বলে গণ্য।

প্রশ্ন ২২। একই জমিতে পাঁচ প্রকার ডাল একই পঞ্চভূত সমন্বিত বস্তুর উৎপাদন হচ্ছে। তার মধ্যে সব ডাল নিরামিষ হল, বাকি মসুর ডাল আমিষ হল কি করে? বিভিন্ন শাস্ত্র পুরাণ শুনেও মনে প্রবোধ পাচ্ছি না।

উত্তর ঃ প্রশ্নটি ঠিক এই রকম—একই গরুর শরীরে একই পঞ্চভূত সমন্বিত বস্তু দুধ এবং গোবর উৎপন্ন হচ্ছে। তার দুধ পুষ্টিকর খাদ্য বলে পরিগণিত হল বাকি গোবর খাদ্য হিসাবে গণ্য নয় কি করে? উত্তর হল এই যে, যে খাদ্যগুণ দুধের মধ্যে আছে তা পুষ্টিকর। কিন্তু গোবরের মধ্যে সেই খাদ্যগুণ নেই। গোবর গোবরে পোকার খাদ্য হতে পারে, কিন্তু মানুষের খাদ্য নয়। তেমনই, আমিষ জাতীয় পদার্থের গুণ মসুর ডালের মধ্যে রয়েছে যা অন্য ডালে নেই। তাই মসুর ডাল আমিষ ভোজীদের খাদ্য হতে পারে কিন্তু নিরামিষাশীরা খান না।

প্রশ্ন ২৩। গরুর চামড়া অপবিত্র। অথচ গোচর্মের তৈরি মৃদঙ্গ বৈষ্ণবরা ব্যবহার করেন কেন?

উত্তর ঃ বহু জিনিস অপবিত্র হলেও বেদ নির্ধারিত বিশেষ বিশেষ দ্রব্য পবিত্র বলেই গৃহীত হয়। যেমন, চামড়া অপবিত্র, কিন্তু হরিণের চর্মের আসন পবিত্র। অস্থি অপবিত্র, কিন্তু শঙ্খ পবিত্র। দাঁত অপবিত্র কিন্তু হাতির দাঁত পবিত্র। মরা পাখির পালক অপবিত্র, কিন্তু ময়ূরের পাখা শুদ্ধ পবিত্র।

প্রশ্ন ২৪। সোনার চূড়া বহু মূল্যবান, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মাথায় সেগুলি না দিয়ে তুচ্ছ ময়ূরের পালক দেওয়া হয় কেন?

উত্তর ঃ জলের চেয়ে মধু অনেক মূল্যবান। কিন্তু যখন কেউ জল খেতে চায়, তাকে মূল্যবান মধু পান করতে দেওয়ার অর্থ হল অতি বড় পাকামি করা। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ময়ূরপালকে ভূষিত হবেন, তা না দিয়ে তার পরিবর্তে মূল্যবান সোনার দ্রব্য এনে হাজির করাটা অতি পাকামি।

প্রশ্ন ২৫। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) বিশ্ববিখ্যাত ধর্মসংস্থা বলেই জানি। কিন্তু ভারতের বড় বড় সংবাদপত্রে কেন ভাল ভাল লোকেরা মাঝে মধ্যে ইসকনবিরুদ্ধ কথা প্রকাশ করেন?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ আন্দোলন অতীব মহান আন্দোলন। কিন্তু তদানীন্তন বড় বড় ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী যাঁরা তথাকথিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের কম বিরোধিতা করেননি। এই জগতে বিরোধিতা আবহমান কাল ধরেই রয়েছে।

প্রশ্ন ২৬। শ্রীধাম মায়াপুর হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব লীলাক্ষেত্র। অথচ, মায়াপুরের লোকেরা কেন সবাই কৃষ্ণভক্ত হচ্ছে না? তারা কেউ মাছ খাচ্ছে, মাংস খাচ্ছে, ডিম খাচ্ছে, বিড়ি চা খাচ্ছে। কেউ লোকনাথ বাবার ভক্ত, কেউ অনুকূল ভক্ত, কেউ হজরতের ভক্ত। অথচ, দূরদূরান্তের সারা পৃথিবীর মানুষেরা মায়াপুরকে কতটা না ভালবাসে।

উত্তর ঃ শ্রীধাম মায়াপুরে বাস করার সৌভাগ্য লাভ করলেই মানুষ যে, শ্রীমায়াপুরের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করবে এমন কথা বলা যায় না। ভ্রমর, প্রজাপতি, মৌমাছিরা ফুলের মধু সংগ্রহের জন্য দূরদূরান্ত থেকে উড়ে এসে আনন্দে মাতোয়ারা হয়। মাছি, মশা ও ফড়িংগুলো ফুলবাগানে বাস করতেও পারে, কিন্তু ফুলের প্রতি তাদের মনোভাবই অন্য রকম। তাই শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রসাদের প্রতি সবাই আকৃষ্ট নয়। তারা কেউ কেউ অন্য বাবা—অন্য কারও প্রতি আকৃষ্ট, তাই তারা মাছ মাংস চা বিড়ি—যেগুলি অমেধ্য বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, সেইগুলিই গ্রহণ করতে উৎসাহী এবং অত্যন্ত পটু।

অবশ্য, এই ব্যাপারে কাউকে দোষারোপ করা বৃথা। কারণ, কলির প্রভাবে বদ্ধ জীবের রজো-তমোগুণের প্রাধান্য প্রবল। মানুষকে মাছি-মশার সঙ্গে তুলনা করাও ভুল হবে—কারণ, মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব, সে ক্রমশ শুভবুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করলে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারবে এবং এই কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশ্বব্যাপী হরিনাম সংকীর্তনে আত্মনিয়োগ করে আনন্দময় জীবনের সন্ধান পাবে।

প্রশ্ন ২৭। বিনামূল্যে জগতে ভগবদ্ভক্তি ও হরিনাম বিতরণ করা হচ্ছে। তবুও সকলে তা গ্রহণ করছে না। মানুষ বুঝেও বুঝছে না। তবে কি শ্রীকৃষ্ণ সবাইকে আকর্ষণ করতে অক্ষম?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ সর্বাকর্ষক। তিনি প্রত্যেককেই অনবরত আকর্ষণ করছেন। তবে, কাউকে কাউকে ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপেও আকর্ষণ করেন।

প্রশ্ন ২৮। শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করলে তিনি যে গ্রহণ করেন তার প্রমাণ কি?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—"*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*" (গীতা ৪/৯) অর্থাৎ, তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই দিব্য। দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা ভগবানের সেই সব দিব্য ক্রিয়াকলাপ দর্শন করতে পারেন। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে সেই সকল ক্রিয়াকলাপ হৃদয়ঙ্গম হয় না। শুদ্ধ ভক্তগণ চাক্ষুষ দেখতে পান। মহাপ্রভুর বহু পার্ষদগণের জীবনীতে ভগবানের আহার গ্রহণের চাক্ষুষ প্রমাণ রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলছেন—"কেউ যদি ভক্তিসহকারে আমাকে কিছু অর্পণ করে (*যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি*) তবে, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপ্লুত উপহার আমি প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি (*তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ*)" (গীতা ৯/২৬)।

তা ছাড়া শ্রীব্রহ্মা ভগবানের স্তব করতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন—

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি।

আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩২)

"সেই আদিপুরুষ গোবিন্দ বিগ্রহ আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল, সেই বিগ্রহের অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎ সমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন করেন।"

এখানে *সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি* কথাটিতে বলা হয়েছে যে, তিনি যে-কোনও ইন্দ্রিয় দিয়ে যে-কোনও ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ, তাঁকে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার জন্যে চর্বণ, গলাধঃকরণ ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট পন্থা ধরে আমাদের মতো হাত দাঁত জিহ্বা উদরাদির ব্যবহার করতে হয় না। তিনি নিছক দৃষ্টিপাতের মাধ্যমেও খাদ্যগ্রহণ করতে পারেন।

ভক্ত যখন ভগবানকে ভোগ্যদ্রব্য নিবেদন করেন, তখন ভগবান ভক্তের ভাবটুকুই গ্রহণ করেন। ভাবগ্রাহী জনার্দন। ভাগবত বিদুরের ভক্তিমতী পত্নী যখন শ্রীকৃষ্ণকে সাদরে খুদ ভাজা ও পাকা কলা খেতে দিয়েছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে কলার খোসা খেতে লাগলেন। ভাববিহ্বলচিত্ত বিদুরপত্নীর একেবারেই খেয়াল নেই যে, শ্রীকৃষ্ণ কলা খাচ্ছেন না কি কলার খোসা খাচ্ছেন। যখন বিদুর এসে অবাক হয়ে সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তাঁরা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের কাছে লজ্জানম্র ভাবে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "আমি কলাও খাই না, কলার খোসাও খাই না। আমি আমার ভক্তের ভাবটুকুই গ্রহণ করি।"

সুতরাং, ভগবানকে ভক্তি সহকারে খাদ্যবস্তু ভোগ নিবেদন করা মানুষের কর্তব্য।

প্রশ্ন ২৯। লোকেরা প্রায় বলে, 'ভক্তের মধ্যে ভগবান'—এই কথার তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ পরমাত্মারূপে ভগবান প্রত্যেক জীবের অন্তরে নিত্য বিরাজমান। *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো* (গীতা ১৫/১৫) কিন্তু ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তি কখনই তাঁকে জানতে পারে না। মূঢ় ব্যক্তিরা ভগবানকে অবজ্ঞা করে। *অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ* (গীতা ৯/১১)। ভগবান প্রতি অণু-পরমাণুতেও রয়েছেন, *অণ্ডান্তরস্থ পরমাণুচয়ান্তরস্থং' (ব্রহ্মসংহিতা)* কিন্তু তাঁকে জানতে হলে শ্রদ্ধাভক্তি দরকার। যার মধ্যে ভগবদ্ভক্তি রয়েছে সে-ই ভক্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি* (গীতা ১৮/৫৫) ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে জানা সম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের উক্তি—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্ ।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

"শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা আমার হৃদয়ে থাকেন এবং আমিও সর্বদা শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে থাকি। ভক্তরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে জানে না, আমিও তাদের ছাড়া আর কিছুই জানি না।" (ভাঃ ৯/৪/৬৮)

ভগবান সর্বদা ভক্তবৎসল। ভক্ত সর্বদা ভগবানের নামকীর্তন, মহিমা প্রচার, স্তবস্তুতি করেন। ভগবানের নাম, মহিমা, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি কীর্তন করলে ভগবান অত্যন্ত প্রীত হয়ে ভক্তস্থানে অবস্থান করেন।

শ্রীনারদ মুনিকে ভগবান বলছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েষু বা ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

"হে নারদ, বৈকুণ্ঠে কিংবা যোগীদের হৃদয়ে আমি থাকি না। যেখানে আমার ভক্তরা গান করে, সেইখানেই আমি অবস্থান করি।" (পদ্মপুরাণ)

অনেক সময় লোকে ভগবানের ভক্ত হতে চায়, কিন্তু তাঁর ভক্তের ভক্ত হতে চায় না। কিন্তু ভক্তরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করছেন যে, তিনি হচ্ছেন *গোপীভর্তুঃ পদকমলোর্দাসদাসানুদাসঃ*—ভগবানের ভক্তের দাসানুদাসানুদাস।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—

মম ভক্তা হি যে পার্থ ন মে ভক্তাস্তু তে মতাঃ ।
মদ্ভক্তস্য তু মে ভক্তা-স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

"হে পার্থ! যারা কেবল আমার ভক্ত অর্থাৎ, কেবল আমার পূজা করে, কিন্তু আমার ভক্তের পূজা করে না, তারা প্রকৃতপক্ষে আমার ভক্ত নয়; কিন্তু যাঁরা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁরাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।" (আদি পুরাণ)

সুতরাং, ভক্তের মাধ্যমে ভক্তবৎসল ভগবানকে জানা সম্ভব। অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন ৩০। অফিসে, বাসে, ট্রেনে, তেল পাম্পে, সিনেমা হলে, মন্দিরে বহু জায়গায় 'ধূমপান নিষেধ' বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকে। তবু এই নীতিটি কার্যকরী হতে দেখা যায় না। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন দিয়েই খালাস। কার্যকরী হচ্ছে কি না হচ্ছে তা লক্ষ্য রাখার জন্য সচেষ্ট হন না। কোনও কর্তৃপক্ষ যদি বলপ্রয়োগ বা বাধ্যবাধকতা প্রচলন করতেন, তবে হয় তো ধোঁয়া খাওয়া বদ খসরত হ্রাস পেত।

দেখা যায়, প্রচণ্ড গরমে কাঠফাটা রোদেও যুবক ছোকরার দল ঘন ঘন বিড়ি আর সিগারেটের উত্তেজক ধোঁয়া পান করে চলেছে। যে উগ্র ধোঁয়া একটি জীবনের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর।

একটা দেশের পক্ষে, সমগ্র মানব জাতির পক্ষে, ধূমপান যে কি রকম ক্ষতিকর তা খতিয়ে দেখবার মতো মানসিকতা বুঝি দেশনেতাদের আছে কিনা সন্দেহ হয়। ক্ষতিকর দিকটা বুঝতে পারলে যারা এখনও অত্যন্ত নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েনি, যারা ধূমপান করা শিখছে বা শুরু করবার জন্য চিন্তা করছে, তারা এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে সুযোগ পাবে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিরাও নেশাভাং করার মতিগতি পরিবর্তন করতে পারবে।

সবাই জানে যে, বিধাতা আমাদের বুকের ভিতরে শক্ত মজবুত হাড়ের পিঞ্জরের মধ্যে অত্যন্ত যত্ন সহকারে একটি অতি সৌখীন জটিল যন্ত্র স্থাপন করেছেন, যার নাম

হৃৎপিণ্ড। সেই যন্ত্রটি সর্বদা সচল। কোনও কারণে মেসিনটি বন্ধ হলেই আমাদের আয়ু শেষ। সেই মেসিনের মধ্যে রয়েছে শিরা, ধমনী, রক্তজালিকা, শ্বাসনালী ইত্যাদি কত জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। আমাদের প্রাণের অস্তিত্ব সেই চলমান মেসিনটির উপর নির্ভর করছে, ফলে আমরা যাবতীয় কর্ম করছি। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, বায়ু চলাচল, তাপশক্তি চলাচল, খাদ্যরস সরবরাহ, অক্সিজেন গ্রহণ, কার্বণ ডাইঅক্সাইড বর্জন, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের কেন্দ্রই হল এই হৃৎপিণ্ড।

অথচ, এই সমস্ত অতি সহজ কথা না চিন্তা করেই মানুষ অত্যন্ত গণ্ডমূর্খের মতো বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, তামাক, চুরুট ইত্যাদির উগ্র মারাত্মক ধোঁয়া দিন দিন শ্বাসনালীতে ঢোকাচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বিষাক্ত ধোঁয়া ফুসফুসে গিয়ে তা ক্ষতসৃষ্টি করে অত্যন্ত দামী মেসিনটিকে সম্পূর্ণরূপে বিকল না করছে।

সাধারণ ধোঁয়াতেই পরিষ্কার ঘর কালো হয়ে যায়। দিন দিন ধোঁয়া লাগালে সেই কালো এমন হয়ে যায় যে, মাজা ঘসা করেও কালো তোলা যায় না। তা হলে আমাদের শরীরে অতি সৌখীন যন্ত্রটির অবস্থা কি হতে পারে?

বিড়ি সিগারেটের মধ্যে নিকোটিন নামক এক ক্ষতিকর পদার্থ থাকে, যা ক্ষয়রোগ, হার্ট ক্যানসার, শ্বাসকষ্ট, রক্তদোষ ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি করে। শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট করে।

নেশাদ্রব্য কেবল শারীরিক ক্ষতিই নয়, মানসিক বহু রোগ বৃদ্ধি করায়। যেমন আলস্য, ইন্দ্রিয় উত্তেজনা, বদ মেজাজ, রুক্ষস্বভাব, অবসন্নতা, কলহপ্রিয়তা, খলস্বভাব, ধৈর্যহীনতা, উন্মত্ততা ইত্যাদি রোগগুলি প্রকট হয়।

ধূমপানকারীর শুধু নিজেরই ক্ষতি হয়, তা নয়; সেই নেশারোগ প্রতিক্রিয়া সন্তান-সন্ততির শরীরেও বর্তায়। তা ছাড়া বিষাক্ত ধোঁয়ার গন্ধ যে কোনও ব্যক্তির নাকে মুখে ঢোকে, তাতে সূক্ষ্মভাবে মানুষের সুস্থতা ক্ষুণ্ণ হয়। মানসিক শুদ্ধতা ও শুচিতাও ধূমপানে নষ্ট হয়।

আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতির পথে ধূমপান একটা মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন *'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো'* (গীতা ১৫/১৫) সবার হৃদয়ে ভগবান অবস্থান করছেন পরমাত্মারূপে। অন্ততপক্ষে হৃদয়মন্দির পবিত্র রাখাই যে কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী জনের একান্ত কর্তব্য। মন্দিরে বিশুদ্ধ ধূম এবং ধূনোর ধোঁয়া কিংবা যজ্ঞের ধোঁয়া পবিত্র। তা মনের পবিত্রতা রক্ষা করে। শরীরের পক্ষেও ক্ষতিকর নয়। কিন্তু বিড়ি, সিগারেট, গাঁজার ধোঁয়া হৃদয়কে অপবিত্র করে। সেই জন্য যারা ধূমপান করে, তারা ভগবানের পূজা অর্চনায় অযোগ্য বলে বিবেচিত, শুধু তাই নয়, মন্দিরে প্রবেশ করারও অযোগ্য।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাতেও মানুষ বিড়ি সিগারেট তামাক ইত্যাদি নেশাপদার্থ গ্রহণ করত না। কালক্রমে এই ভারতে বিদেশী ম্লেচ্ছর আধিপত্য বিস্তার করে। বাণিজ্যিক মুনাফার লোভে তারা ভারতবাসীকে নেশাভাং করতে শিখিয়েছে। শোনা যায়, হল্যাণ্ডের অধিবাসী ওলন্দাজেরা ভারতবাসীকে বিড়ি খাওয়া শিখিয়েছে।

একটি পরিবারে মোট আয়ের এক বিরাট অংশ খরচ হচ্ছে কেবল বিড়ি আর সিগারেটের মারাত্মক ধোঁয়া খাওয়ার খাতেই। যে ব্যক্তি ধোঁয়া খাচ্ছে, দিন দিন তার শরীর ক্ষয়ের দিকে চললেও সে বিড়ির বাণ্ডিলের সংখ্যা বা সিগারেটের প্যাকেট পরিমাণ বাড়িয়েই চলে। এই থেকেই বলা বাহুল্য যে, ধোঁয়া সে খাচ্ছে না, ধোঁয়াই তাকে গ্রাস করছে।

তবে, মানুষ স্বভাবতই চিন্তাশীল প্রাণী, কোনও সূত্রে যদি তার মনে শুভ চিন্তার উদয় হয়, তবে সে এই অপবিত্র ধোঁয়া খাওয়া বরদাস্ত করবে না। ধূমপানে অভ্যস্ত বহু মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃতের সংস্পর্শে এসেছেন, যাঁরা হরিনামের মালা যেদিন থেকে গ্রহণ করলেন, অমনি সেদিন থেকেই তাঁদের ধূমপান করা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন।

প্রশ্ন ৩১। আপনারা তাস-জুয়া-পাশা-দাবা খেলা নিষেধ করেছেন। কিন্তু পাণ্ডবেরা কেন পাশা খেলা করেছিলেন?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে তাস-পাশা ইত্যাদি খেলাস্থলীকে কলির আড্ডারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে যে সব স্থানে আশ্রয় নিতে নির্দেশ করেছিলেন, তার মধ্যে তাস-পাশা-জুয়া হল একটি। দ্বাপর যুগে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে পাশা দাবা খেলার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু কলি যুগের মানুষকে এই সকল সময়-নষ্টকারী খেলা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাস-পাশা খেলতে খেলতে অল্পায়ুযুক্ত মানুষ কখন যে দিন কাবার হয়ে যায় তা বুঝতেই পারে না। খেলায় উন্মত্ত হয়ে তারা এমন বুদ্ধিহারা হয়ে যায় যে, পারমার্থিক চর্চার কথা তো অনেক দূরের ব্যাপার, এমন কি জাগতিক সাধারণ কর্তব্যগুলিও তারা অতি সহজেই ভুলে যায়।

যদি সমীক্ষা করে দেখা যায় তবে নজরে পড়বে যে, তাস-পার্টির লোকেরা বাজার করা, ছেলেকে ডাক্তার দেখানো, শ্রমিকদের পরিচালনা করা, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা, বাচ্চাদের পড়ানো, সময় মতো স্নান আহার, কোনও দরকারী কাজে যুক্ত হওয়া—সব কিছু ভুলে বসে থাকে। কেবল তাসের কথাই মাথার ঘুরতে থাকে। জুয়াড়ীরা জুয়া খেলার নেশায় সম্পত্তি, ধনসম্পদ বিক্রি করে বসে। এইভাবে পারিবারিক ক্ষেত্রে তারা বিরাট অশান্তি সৃষ্টি করে।

বহু অর্থ বাজি রেখে জুয়া খেলা হয়। এই ধরনের লোকেরা হিংসুটে ও অত্যন্ত মাৎসর্যপরায়ণ হয়। কারণ খেলায় যার লাভ হয়, তাকে খেলা ছেড়ে উঠতে দেওয়া হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই লাভগুলি খোয়ানো না হচ্ছে। যদি লাভ করে কেউ চলে যায়, তবে তাকে প্রতিপক্ষ সময়ে সময়ে ঈর্ষাকাতর হয়ে ছিনতাই বা খুন করতে উদ্যত হয়। কেউ বা অতিরিক্ত লোভের বশে খেলা ছেড়ে উঠতে চায় না।

পাণ্ডবগণ যে অক্ষক্রীড়া করেছিলেন, তাতে দুর্মতি দুর্যোধনের কূটকৌশলে সতী দ্রৌপদীকে পর্যন্ত বাজি রাখা হয়েছিল। পঞ্চপাণ্ডবদের রাজ্যছাড়া করবার দুষ্ট অভিপ্রায়ে তারা এই খেলার আয়োজন করেছিল। পূর্বে ক্ষত্রিয় রাজপুরুষদের নিয়ম ছিল এরূপ যে, যদি কেউ মল্লক্রীড়া কিংবা অক্ষক্রীড়ায় অন্য ক্ষত্রিয়বীরকে আহ্বান করে, তবে সেই

বীর কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারত না। বীরত্ব প্রদর্শন করাই ক্ষত্রিয়-রীতি।

কিন্তু সেই খেলার ফলে সতী দ্রৌপদীকে রাজসভার মধ্যে লাঞ্ছনা করা হলে কুরুবংশের ভয়ংকর পরিণতি নেমে আসে। কুরুবংশের সমস্ত বীর ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,—এক সময় শ্রীবলরামকে খলচরিত্র রুক্মী পাশা খেলায় আহ্বান জানায়। রুক্মী ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্মিণীদেবীর ভাই, অত্যন্ত কৃষ্ণবিরোধী। কলিঙ্গরাজের কুপরামর্শ নিয়ে সে চেষ্টা করেছিল যে, বলরামকে পাশাখেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বসিয়ে এমনভাবে হারাতে হবে যাতে অপমানিত হয়ে বলরাম সহ কৃষ্ণ লজ্জায় আর মুখ দেখাতে না পারে। এই ছিল অভিসন্ধি।

যদিও বলরাম পাশাখেলায় আদৌ উৎসাহী ছিলেন না, তবুও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাড়া দিতে সেই খেলায় রত হলেন। বহু স্বর্ণমুদ্রা পণ রেখে খেলা চলছিল। প্রথম প্রথম বলরাম পরাজিত হচ্ছিলেন। ফলে, বিজয়ী রুক্মী ও তার সহচর রাজন্যবর্গ কৃষ্ণ ও বলরামকে অপমান ও নিন্দা করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল এবং কলিঙ্গরাজ প্রতিবারই দাঁত বের করে অট্টহাস্য করছিল।

তাদের সবার তীব্র ব্যঙ্গোক্তি ও উপহাসে অসহিষ্ণু হয়ে বলরাম উত্তেজিত হয়ে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পণ ডাকলেন। এবার বলরাম জয়ী হলেন। কিন্তু কপট রুক্মী দাবী করল যে, সে-ই জয়ী হয়েছে, বলরাম পরাজিত। আর সবাই অন্যায়ভাবে রুক্মীকেই সমর্থন করল। তখন বলরাম রক্তচক্ষু হয়ে দশ কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা পণ রেখে খেললেন। এবারও বলরামেরই জয় হল। কিন্তু রুক্মী ও তার দল নানা রকম কপট যুক্তি দেখিয়ে বলরামের পরাজয় ঘোষণা করল। সৎভাবে বলরাম খেলেও কেবল অপমান ও উপহাস শুনতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা অট্টহাসির উচ্চরোলও বলরামকে অপমানের অতিরিক্ত মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

শ্রীবলরাম কোনও কথা না বলে একটা ভারী গদা হাতে তুলে নিয়েই সহসা রুক্মীর মাথা ফাটিয়ে দিলেন। রুক্মী শেষবারের মতো দাঁত খিঁচিয়ে রক্তাক্ত বিচূর্ণ মস্তকে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বলরাম রুক্মীর দলের কটূভাষী পলায়নপর রাজন্যবর্গের হাত পা ভেঙে দিলেন, আর অট্টহাস্যকারী কলিঙ্গরাজকে ধরে তার দাঁতগুলো সব ভেঙে ফেললেন।

এইভাবে পাশাখেলার আসর গেল ঘুচে। সেই গৃহে বিরাট বিবাহ-উৎসবের শুভদিনেই বেচারা রুক্মীকে শ্মশানচিতায় পাঠানো হল।

যারা জীবনের উদ্দেশ্য বোঝে না, তারাই অনর্থক আজেবাজে খেলায় মশগুল থেকে অকালে প্রাণ হারায়। সেই জন্যে কথায় বলে 'তাসপাশা সর্বনাশা'।

প্রশ্ন ৩২। অনেকে বলে "আত্মা যা চায়, তাই খাও। এত বাছবিচার দরকার নেই।" এরূপ কথার অর্থ কি?

উত্তর ঃ 'আত্মা যা চায়, তা-ই খাও' এরূপ কথার অর্থ হল 'শূকরের মতো হও।' শূকর খাদ্য-অখাদ্য বাছবিচার না করেই ফলমূল, পচা কাদা, মলমূত্র, দুনিয়ার নোংরা—সব কিছুই খেয়ে চলে। একটা পাগল বিষ খেতে চায় বলে তাকে বিষ খেতে অনুমোদন করা কি ঠিক? বাচ্চারা ওষুধ খেতে চায় না। তাই বলে ওষুধ খাওয়া বাদ দিতে হবে? ম্যালেরিয়া রোগী আমসী-তেঁতুল খেতে চায়, সেক্ষেত্রে কি বলা যাবে যে, 'হ্যাঁ, যা চাও, তা-ই খাও'।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা রয়েছে যে, রাক্ষস-পিশাচ শ্রেণীর প্রাণীরা মাছ-মাংস খেতে অভ্যস্ত। সাধারণত মাংসখেকো বা মছলিখেকো মানুষদের ম্লেচ্ছ বলা হয়। পিশাচতুল্য অতি নিম্ন স্তরের মানুষেরা অন্য প্রাণীর রক্ত, মাংস, হাড়, পিত্ত ইত্যাদি খাদ্যরূপে গ্রহণ করতে পছন্দ করে। তারা পোকা মাকড়, কাঁকড়া, চিংড়ি, কেঁচো, গোসাপ, কাছিম, ব্যাঙ, মাছ, কাক, মোরগ, হাঁস, ভেড়া, কুকুর, শূকর, ছাগল, উট, গরু ইত্যাদি প্রাণীর রক্ত-মাংস খেতে খুবই পছন্দ করে। কিন্তু সভ্য মানুষকে তা খেতে শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে। পিশাচত্ব অর্জন করা সভ্য মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। পাশ্চাত্যে দেশের কোনও কোনও অতি অসভ্য অঞ্চলের মানুষেরা বৃদ্ধ রুগ্ন শয্যাশায়ী পিতামহকে মেরে নরমাংস ভোজ উৎসব শুরু করে। ভ্রূণ হত্যা করে ভ্রূণ নিয়ে রান্না চড়ায়। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে, এই যুগের শেষ পর্যায়ে মানুষ মানুষকে কেটে খাওয়ার জন্য লালায়িত হবে।

বর্তমান বিশ্বে বহুসংখ্যক মানুষ আর এক ধরনের অতি জঘন্য জিনিস খেতে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তা হল দূষিত ধোঁয়া, কদর্য পানীয় এবং উগ্র উত্তেজক নানা ধরনের অখাদ্য। সেগুলির তালিকাও বিরাট। যেমন—বিড়ি, চা, কফি, জর্দা, খৈনি, দোক্তা, তামাক, আফিং, মদ, চরস, গাঁজা, সিগারেট, হিরোয়িন, এল্-এস-ডি ইত্যাদি, যেগুলি মানব জীবন কলুষিত করে। কেবলমাত্র পারমার্থিক বিজ্ঞান কেন, আজ পর্যন্তও কোনও বিজ্ঞান এই সব নেশাদ্রব্য গ্রহণ করতে অনুমোদন করেনি।

বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যদি খাদ্য-অখাদ্য বাছবিচার না করে, তবে মানব-সভ্যতার বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন ৩৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উৎস কি?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উৎস স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি শ্রীল ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে—

ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ।
মনুশ্চ লোক ভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বকবে দদৌ।
ইক্ষ্বাকুণা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ ॥

অর্থাৎ, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান বিবস্বান (সূর্যদেব) মনুকে দান করেন। মানব সমাজে পিতা মনু এই জ্ঞান তাঁর পুত্র সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর এবং রঘুবংশের জনক ইক্ষ্বাকুকে দান করেন। এই রঘুবংশে শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন। সুতরাং, ভগবদ্গীতা

মহারাজ ইক্ষ্বাকুর সময় থেকেই মানব সমাজে বিদ্যমান। যুগের হিসাবে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর পূর্বে মানব জাতির পিতা মহর্ষি মনু পৃথিবীর অধীশ্বর ইক্ষ্বাকুকে ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান দান করেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

"আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্যদেব তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। (গীতা ৪/১) এইভাবে কোটি কোটি বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে গুরু থেকে শিষ্যতে পরম্পরা ক্রমে গীতা-জ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

"এইভাবে পরম্পরা মাধ্যমে এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং সেই জ্ঞানযোগ বিনষ্ট হয়ে যায়। (গীতা ৪/২) সেই জন্য পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভগবান পুনরায় এই জ্ঞান অর্জুনকে দান করেন কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। মহাভারতের মধ্যে সমস্ত উপনিষদের সার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা রূপ পরম জ্ঞান দান করলেন সর্বকালের সর্ব দেশের মানবজাতির উদ্দেশ্যে। দিব্য উপলব্ধির মাধ্যমে ব্যাসদেব গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রীনারদমুনির কাছ থেকে গীতার জ্ঞান লাভ করেছিলেন। শ্রীনারদ মুনি তা গ্রহণ করেছিলেন শ্রীব্রহ্মার কাছ থেকে। আর সর্বপ্রথমে ব্রহ্মাকে সেই জ্ঞান প্রদান করেন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার আদি প্রবক্তা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

কলিযুগে ইতিমধ্যে পৃথিবীতে বহু ব্যক্তি গীতা গ্রন্থের শ্লোক ব্যাখ্যা করে গেছেন। সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ সহজিয়া বা মায়াবাদী ব্যাখ্যা যা মানব মনে কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার করে না। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান—তা-ও খুঁজে পাওয়া যায় না।

কিন্তু শ্রীগুরু পরম্পরাধারায় আশ্রিত আমাদের পরম গুরুদেব আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ গীতাতত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করে, তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে সমগ্র পৃথিবীতে তা প্রচার করলেন। ফলে জনমানসে বিরাট আলোড়ন শুরু হল। দলে দলে লক্ষ কোটি মানুষ আজ কৃষ্ণভক্ত হয়ে মনুষ্য জন্ম সার্থক করবার জন্য বাসনা করছে। তাদের কলুষিত ভাবধারার পরিবর্তন করে শুদ্ধ পবিত্র হয়েছে।

ভগবানের মুখপদ্ম থেকে বিনিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারবস্তু। শ্রীল প্রভুপাদ এবং আমাদের সকল আচার্যবর্গ চান এই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পৃথিবীর প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিতে।

প্রশ্ন ৩৪। সাধু কাকে বলে? যে-কেউ কি সাধু হতে পারে?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে সাধুর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবস্থিতো হি সঃ ॥

অর্থাৎ, "অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন, তাঁকেও 'সাধু' বলে মনে করতে হবে, কারণ তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।" (গীতা ৯/৩০) কৃষ্ণভক্তিই জীবের সহজাত অধিকার। জীবের স্বরূপ পরিচয় হল, সে নিত্য কৃষ্ণদাস। তাই ঐকান্তিক কৃষ্ণভজনাকারী জনই সাধু। যে কেউই সাধু হতে পারে।

শ্রীপদ্মপুরাণে বিস্তৃত ও সুন্দরভাবে সাধুর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

কৃষ্ণার্পিত-প্রাণ-শরীর-বুদ্ধিঃ শান্তেন্দ্রিয়-স্ত্রী-সুত-সম্পদাদিঃ ।
আসক্তচিত্তঃ শ্রবণাদি ভক্তির্যস্যেহ সাধু সততং হরের্যঃ ॥

অর্থাৎ, "যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রাণ, বুদ্ধি সমস্তই সমর্পণ করেছেন, যিনি ইন্দ্রিয়, স্ত্রীপুত্র, বিষয়াদি সমস্ত ভোগবিলাস থেকে বিরত হয়েছেন, যিনি শ্রীহরির প্রতি সদা সর্বদা আসক্ত চিত্ত এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণমহিমা কীর্তন ইত্যাদি ভক্তি-অঙ্গ সমূহের যাজন পরায়ণ, এই জগতে তিনিই সাধু অর্থাৎ, সৎ।"

প্রশ্ন ৩৫। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান। তবে মানুষ কেন পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়?

উত্তর ঃ পরমাত্মারূপে ভগবান যেমন আমাদের হৃদয়ে রয়েছেন তেমনই আমাদের প্রতি তাঁর শুভ নির্দেশও রয়েছে আমাদের এই জগতে বিশেষত মানব-জীবনের কর্তব্যকর্ম বিষয়ে। কিন্তু সেই সকল নির্দেশ অগ্রাহ্য করতেও আমরা সুযোগ নিতে পারি। সেই স্বাতন্ত্র্য আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন, সমস্ত ধর্মের মূল নীতি হল "ভগবানকে ভালবাস।" কিন্তু আমরা যদি ভাল না বাসি, তাতে ভগবান জোর করে তাঁকে ভালবাসতে বাধ্য করবেন না। কারণ, সবাই জানে যে, বলপ্রয়োগ করে ভালবাসা হয় না। প্রেমময় পরম পুরুষও আমাদের মতো জীবের উপর বাধ্যতা প্রয়োগ করেন না। আমরা ইচ্ছা করে তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে পারি, তাঁকে ভালবাসতে পারি আবার তাঁকে না-ও মানতে পারি, ভাল না-ও বাসতে পারি। সেই স্বাতন্ত্র্য আমাদের রয়েছে। তবে পরিণামে সদ্‌গতি বা দুর্গতি—সব লাভই নিজেদের। তাতে পরমাত্মা নির্বিকার সাক্ষীরূপেই বিরাজমান। তাঁর কোনও লাভ-ক্ষতি নেই। পরমনিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ । (গীতা ১৫/১৫)

অর্থাৎ, "সমস্ত জীবের হৃদয়ে আমি অবস্থান করি। তবুও জীবের কর্ম ফল-অনুসারে স্মৃতিজ্ঞান কিংবা স্মৃতিজ্ঞানের অপগতি ঘটে থাকে।"

তবে, যেহেতু তিনি কৃপাময় প্রেমময় পুরুষ তাই আমাদের মতো স্মৃতিহারা পাপীদের কাছে তাঁর প্রিয় পার্ষদদের প্রেরণ করেছেন যাতে তাঁরা কৃষ্ণকথা প্রচারের মাধ্যমে আমাদের

সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সম্পর্ক স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই পাপপঙ্কিল দুরবস্থা থেকে আমাদের উদ্ধার করে নিত্যধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ভগবান সমদর্শী, তাঁর কাছে সবাই সমান, আমরা শুদ্ধ হয়ে তাঁর কাছে ফিরে যাব, নতুবা পাপকর্ম করে জগতে পড়ে থাকব সেই স্বতন্ত্র ইচ্ছাটি একান্ত নিজেদের।

প্রশ্ন ৩৬। আমি খবরের কাগজ পড়ি না, টিভিও দেখি না। আমি ইসকনের পত্রিকাই পাঠ করি। লোকেরাই আমাকে দেখালো ইসকনের কেলেঙ্কারির কথাগুলি কিভাবে খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। আমি এতে মর্মাহত, এর সত্যতা কিংবা চক্রান্ত—তা জানতে চাই।

উত্তর ঃ আপনি খবরের কাগজ পড়েন না, যতদূর সম্ভব না পড়াই ভাল। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে ইসকন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর 'বৃন্দাবন ভজন' নামক কবিতায় লিখেছিলেন—

মায়ার কচ্‌কচি সব সংবাদের পত্র।
কীর্তন করহ্ তাহে জগতে সর্বত্র ॥
ঘরে বসে চেঁচাইয়া পিত্তবৃদ্ধি করি।
কোটি জন্মেও সন্তুষ্ট হবে না শ্রীহরি ॥

কলির সংবাদপত্রে মায়ার কত রঙ্গই না থাকতে পারে, তাতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। একটি প্রবাদ আছে, 'পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়।' পাগল-ছাগলের কথা না পড়ে হরিনাম করলে নিজের ও জগতের মঙ্গল হয়।

ইসকনের কেলেঙ্কারির কথা যা সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে তা নিছক ষড়যন্ত্র প্রসূত। যাঁরা বুক ফুলিয়ে হাত উঁচিয়ে এসব লিখতে শুরু করেছেন—তাঁরা যে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগামী নন বরং তাঁরা নিজেদের প্যাঁচালো বুদ্ধি নিয়ে জনমানস থেকে ইসকনের ভাবধারা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, সে কথাও অনেকেই ভালভাবে জানেন।

ইসকনের নিয়মশৃঙ্খলা অত্যন্ত কঠোর। নিয়ম ভঙ্গ করলে দুষ্কৃতকারীকে অবশ্যই ইসকন কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত শাস্তি দিবেই। আর যে সব 'কেলেঙ্কারির কথা' রয়েছে তার কিঞ্চিৎ ঘটনা হলো—নীতিলংঘনকারী বলে বিবেচিত ব্যক্তিরা ইসকন থেকে অতীতের কবে থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেছে। সেই পুরনো পচা খবর নিয়ে কাকের মতো পচা জিনিস নিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে জনমানসকেই বিভ্রান্ত ও কলুষিত করা হচ্ছে। আর অধিকাংশই মিথ্যা ও বিকৃতভাবে সংবাদগুলি পরিবেশিত হয়েছে। আপনি পরে পরে সব কিছু জানতে পারবেন। এ বিষয়ে বিশদভাবে তথ্যাদি জানতে যদি চান তবে আপনি শ্রীমায়াপুরে আসুন, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তা হলে কাকছড়ানো কলুষতা থেকে আপনি অবশ্যই মুক্ত থাকতে পারবেন।

প্রশ্ন ৩৭। অধিকাংশ ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি ইসকনের মতো বৃহত্তর সংস্থার নামে কোন ভাল খবর দেয় না কেন?

উত্তর ঃ হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে যুক্ত কত শত শত ভক্ত নীরবে নিঃস্বার্থভাবে উদয়াস্ত নিয়মনিষ্ঠা পরায়ণ হয়ে সারা জীবন শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় আত্মনিবিষ্ট রয়েছে। কিভাবে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগে নিজেদের জীবনের নানা ঝুঁকি নিয়ে দেশদেশান্তরে জনগণের কাছে তাদেরই মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণ করছে, তাদের সংবাদ কেউ লেখে না। এখনও ব্যক্তিগত ভাবে বহু ভক্তের মনোভাব প্রকাশ করতে শোনা যায়—'পেপারে ইসকনের দুর্নাম শুনেই ইসকনে যোগ দিয়েছি কিন্তু ইসকনে না এলে আমি চিরবঞ্চিত থেকে যেতাম।' গীতা ভাগবতের মূল তত্ত্ব গুলি একমাত্র প্রভুপাদের মাধ্যমেই বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে। এতে মনুষ্য জন্মের মূল তাৎপর্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। কিসে মানব জাতির সবার মঙ্গল হয় তার বীজ একমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতেই বিদ্যমান। এতেই আমাদের চরিত্র শুদ্ধ হয় এবং আমরা সুখী হতে পারি।

কিন্তু হাবিজাবি সংবাদগুলি শুনে দুর্লভ মনুষ্যজন্মে কিসের মঙ্গল হবে তা বোঝা দুরূহ ব্যাপার। যেমন—কে কত বল করল, কে কত সুন্দর ফর্সা হতে চায়, আকাশ থেকে কতটা উল্কা পড়ল, কে কার গায়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারল, কোথায় কাকে পিটিয়ে মারা হলো, কোন্ অশ্লীল ছায়াছবি কত ভাল, কোন্ নেশা করলে আমেজ বৃদ্ধি হয়, কোন্ মন্ত্রীকে গুলি করে মারা হলো, কোথায় ধর্মঘট ডাকা হলো, আরো কত লোক মরবে, কত লোক পড়বে—এই সমস্ত সংবাদ শুনে কোন মানুষের হৃদয়ে কিছু শান্তি বা স্বস্তি কাজ করছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া দিন দিন কত রকমের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি সমন্বিত অগণিত দুর্ঘটনা সংবাদপত্রের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। তা ছাড়া অধিকাংশ মানুষই তো জানে যে, রাজনৈতিক সংবাদগুলি নিরপেক্ষহীন, অন্যান্য সংবাদগুলি কিছু সত্য ও কিছু মিথ্যা দিয়ে আনুমানিকেই ভরা।

ইসকনের ভক্তরা কতবার কত স্থানে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে, দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে কিভাবে লোকেদের কাছে গিয়ে মহাপ্রসাদ বিতরণ, কাপড়চোপড় দান, ওষুধপত্র সরবরাহ করছে। সেসব কথা লেখা হয় না। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী শ্রীমায়াপুরে এসে ভিড় করছে, তাদের যাতায়াতের কোন সুবন্দোবস্ত নেই। রাস্তাঘাট কত খারাপ। সুস্থিরভাবে থেকে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি দর্শন করবে—সে-সবের কতই না অসুবিধা রয়েছে। হাজার হাজার যুবক চাকরীর ক্ষেত্রে হতাশ হয়ে, মানসিকভাবে নানা যন্ত্রণা পেয়ে মঠ-মন্দিরে এসেছে, এমন কি অনেকের আত্মঘাতী হওয়ার মানসিকতা কিংবা মনের নানা উন্মাদনা, বিক্ষোভ ভাব ইত্যাদি দুর্ঘটনা প্রশমিত হয়েছে এই কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে। সেই সব কথা সংবাদপত্র লেখে না। কিন্তু সেই সব যুবকগুলি যদি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বদমাস হয়ে যেত কিংবা খুন-খারাপি করে বসত, কিংবা আত্মঘাতী হত, তবে সংবাদপত্রে কলম ঝাঁকিয়ে তাদের কথা কালো কালো অক্ষরে লক্ষ লক্ষ কপি ছাপিয়ে সারা ভারতবর্ষে শহর নগর গ্রাম গঞ্জের সর্বত্র ফলাও করে প্রচার করা হত। এই হচ্ছে জড় জগতের তথাকথিত ভারতীয় সংবাদপত্রের তাৎপর্য। অতএব সংবাদপত্রের যে কোনও সংবাদ পড়েই উদ্‌ভ্রান্ত হওয়া ঠিক নয়।

প্রশ্ন ৩৮। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে বহু মানুষ নিহত হল, রক্তে মাঠ লাল হয়ে গেল। সবার মুখে শোকের ছায়া নেমে এল। সেই কুরুক্ষেত্র কি করে পবিত্র স্থান হল?

উত্তর ঃ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ রাজর্ষি কুরু যজ্ঞ করবার জন্য এই ক্ষেত্রের কর্ষণ করেছিলেন। তাই নাম কুরুক্ষেত্র। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র মানব সমাজের উদ্দেশ্যে শ্রীঅর্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপদেশ দান করেছিলেন কুরুক্ষেত্রে। ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে যুদ্ধে ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় হয়েছিল এই কুরুক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ উপস্থিত ছিলেন। বহুকাল অদর্শনের পর ব্রজবাসী ও দ্বারকাবাসী ইত্যাদি ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দর্শন ও আদর অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে এই কুরুক্ষেত্রেই মিলিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে স্বর্ণরথে বসিয়ে শ্রীমতী রাধারাণী ও তাঁর সহচরীবৃন্দ তাঁদের বৃন্দাবন অভিমুখে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন অর্থাৎ, ভগবানের রথযাত্রা এই কুরুক্ষেত্রেই সূচনা হয়েছিল। তাই কুরুক্ষেত্র একটি অত্যন্ত পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিচিত, কেবল রক্ত আর মৃত্যু দেখে স্থানের পবিত্রতার বিচার হয় না। তা হলে তো পবিত্র স্থানে কেউ আর দেহত্যাগ করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিতে হতো।

প্রশ্ন ৩৯। দিন দিন মানুষের চরিত্র খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন?

উত্তর ঃ কলির প্রভাবে মানুষের চরিত্র খারাপ হয়। কিন্তু মানুষ যদি সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মন দিয়ে রোজ কীর্তন করে, তবে সে-ও সৎ, চিন্ময় ও আনন্দময়—তার প্রকৃত স্বভাব জাগ্রত করতে পারবে।

প্রশ্ন ৪০। গীতা ২/৬৩ তাৎপর্যে বলা হয়েছে—'যজ্ঞে পশুবলি দিলে তা হিংসাত্মক কাজ বলে গণ্য হয় না।' এই কথাগুলি বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ঃ এখানে যজ্ঞ বলতে স্বর্গ গমনের উদ্দেশ্যে নানাবিধ পবিত্র উপচার সাজিয়ে, অথবা কোন উচ্চসিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করাকে বোঝায়। সেই অগ্নিতে কোন পশুও আহুতি দেওয়ার প্রথা বেদে প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণরা সেই পশুকে আহুতি দিয়েই দেখতে পেতেন আহুত পশুটি সরাসরি উন্নত শরীর প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গগতি লাভ করছে। যার ফলে যজ্ঞের সাফল্য প্রমাণিত হত। সেই পশুরও অশেষ উপকার হত। কিন্তু এই যুগে সেসব যজ্ঞ করা কিংবা পশুকে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ সেই সমস্ত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করবার মতো উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কলিযুগে নেই বলে শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। পাপময় কলিযুগে রক্তমাংস খাওয়ার লোভে লোকে পশুকে হত্যা করে। তাই পশুবলি মহাপাপ কর্ম কোনও ধর্মশাস্ত্রেই সমর্থন করে না।

প্রশ্ন ৪১। রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যের মতো বর্তমানে কোন মহাকাব্য সৃষ্টি হচ্ছে না কেন? নাকি কারও কোন প্রতিভা নেই?

উত্তর ঃ রামায়ণ মহাভারতেই লোকে ঠিকমতো পড়ছে না, জানছে না। তাতেই সব কথা রয়েছে। নতুন করে আপনাকে কোন মহাকাব্য রচনা করতে হবে না। আসল প্রতিভা হচ্ছে রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষা অনুসরণ করা। নতুন করে কিছু রচনা করে নয়।

প্রশ্ন ৪২। আশে-পাশে পাপময় পরিবেশের মধ্যে কি করে ভগবদ্ আরাধনা করব?

উত্তর ঃ যেখানে পাপময় পরিবেশ দেখছেন না সেই খানেই করুন। অর্থাৎ, আশে-পাশে ছেড়ে নিজের মধ্যে নিষ্পাপ পরিবেশে ভগবদ্ আরাধনা করতে হয়।

প্রশ্ন ৪৩। অনেকে বলে দীক্ষা না হলে গোবিন্দের পূজা শুদ্ধ হয় না। আমার দীক্ষা হয়নি। আমি কোন মন্ত্র জানি না। রোজ সকালে একটু ফল, মিষ্টি ও জল দিয়ে গোবিন্দের সেবা করি। সন্ধ্যায় ১০৮ বার হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি। এতে কোন অসুবিধা আছে কি?

উত্তর ঃ দীক্ষা নেওয়ার জন্য চিন্তা করা উচিত। তবে দীক্ষা না নিয়ে যে গোবিন্দ পূজা হবে না—এটা বাজে ধারণা। দীক্ষার অপেক্ষা না করেও ক্ষেত্রবিশেষে পারিবারিক বা ব্যক্তিগতভাবে গোবিন্দ পূজা করা উচিত। যারা দীক্ষা নিয়েও মাছ-মাংস খেয়ে বিড়ি সেবন করে পূজা করে, তারা গোবিন্দ পূজার সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু দীক্ষা না হলেও, কোন মন্ত্র না জানলেও যাঁরা আমিষ-নেশা-জুয়া-অবৈধ সঙ্গ অনাচার থেকে এড়িয়ে গোবিন্দকে পূজা করে চলেছেন, তাঁরা অবশ্যই শুদ্ধ বলে বিবেচিত হন। তবে দীক্ষার আগে কেবল ১০৮ বার অর্থাৎ, এক মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপই যথেষ্ট নয়। ক্রমশঃ দিন দিন সংখ্যামান বাড়িয়ে ১৬ মালা জপ অভ্যাসের চেষ্টা করতে হবে। আর, কেবল সকালে ফল মিষ্টি জল কেন, যতবার রান্না করবেন ততবারই ভোজ্যদ্রব্য গোবিন্দকে নিবেদন করে তাঁর মহাপ্রসাদ পরিবারের সকলে গ্রহণ করবেন। তবে ত পরিবারের মঙ্গল। গোবিন্দকে খেতে না দিয়ে খালি বসিয়ে রেখে কেবল নিজেরা খাব—এই মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রশ্ন ৪৪। সংসার ধর্ম বড় ধর্ম, অন্য ধর্ম নেই। এই কথার মানে কি?

উত্তর ঃ এখানে সংসার ধর্ম বলতে গৃহস্থ ধর্মকে বোঝাচ্ছে। পতি, পত্নী ও সন্তান নিয়ে মানুষ ঘর করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। পতি-পত্নী যদি না থাকে, তবে সন্তান আসবে কোথা থেকে। আর ধর্মই বা পালন করবে কে? তাই গৃহস্থ জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। তাঁরা সৎ সন্তান উৎপাদন করে দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন করতে পারেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটছে অন্যরকম। বহু পিতামাতা নাস্তিক ধর্মাচারহীন সন্তান সৃষ্টি করছেন। যারা এক একটি সংসার তছনছ করে দিচ্ছে। সমাজের বহু ক্ষতি সাধন করছে। স্বার্থপর, ব্যভিচারী, খুনী, নেশাখোর, বাটপাড়, ডাকাত, মাতাল, বদরাগী, ন্যাকা, বদমাশ,

অসৎ প্রকৃতির বহু মানুষে জগৎ ভরে যাচ্ছে। গৃহস্থ জীবনের পালনীয় বৈদিক সংস্কারগুলি লোকে আর তেমন পালন করছে না বললেই চলে।

অধিকাংশ লোক গৃহস্থ না হয়ে গৃহমেধী জীবন যাপন করছে। সেই সমস্ত গৃহে হয় না হরিপূজা, চলে না হরিনাম কীর্তন, করে না সাধুবৈষ্ণবের সেবা, শোনে না গীতা-ভাগবত, রাখে না শ্রীকৃষ্ণের অর্চা বিগ্রহ, খায় না কৃষ্ণপ্রসাদ। কেবল করে টাকা রোজগার। খায় মাছ-মাংস, মজে নেশাদ্রব্যে, দেখে আধুনিক ছায়াছবি, শোনে অভক্তি গান। বৈবাহিক জীবনের সংস্কারগুলি সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল নয়। মানে না ব্রতব্রত। থাকে না সংযত।

বৈদিক পন্থায় বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে গৃহস্থ ব্যক্তিরা বিশেষত গৃহবধূরা সুসজ্জিত হয়ে মন্দিরে ভগবানের সন্ধ্যা-আরতিতে যুক্ত হয়ে অর্চা বিগ্রহের সামনে ঘৃত প্রদীপ নিবেদন করতেন। সেখানে প্রণতি, প্রার্থনা নিবেদন ও ভজন কীর্তন করতেন।

বর্তমানেও বিকেল বা সন্ধ্যাবেলায় দম্পতিগণ খুব সাজগোজ করেন বটে, কিন্তু মন্দিরে যাওয়ার জন্য নয়। তাঁরা আধুনিক সিনেমা-হলে যাওয়ার জন্যই ব্যস্ত।

বৈদিক ভাবাপন্ন স্বামী-স্ত্রী সুপুত্র লাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের কাছে ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করতেন। কিন্তু বর্তমানের স্বামী-স্ত্রী সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা তো দূরের কথা, তাঁরা সন্তান লাভ করতেই চান না। সেই জন্যে তাঁরা সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই মেরে ফেলবার পরিকল্পনা করছেন।

অধিকাংশ মানুষ সংসার-ধর্ম ছেড়ে অধর্মের সংসার করছে সন্দেহ নেই। এইজন্যই আত্মহত্যা, সন্তান হত্যা, ভ্রূণহত্যা, মাতৃপিতৃ হত্যা, বধূ হত্যা, ভ্রাতৃবিরোধ, নানাবিধ উৎপাত প্রতিদিন ঘটে চলেছে।

আমাদের পরম গুরুদেব সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন আদর্শ গৃহস্থ। তিনি কৃষ্ণভক্তিময় সংসারের কথা বলেছেন। 'কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।'

সংসার না করে ধর্ম আচরণ করা যায়। কিন্তু ধর্ম আচরণ না করে সংসার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

প্রশ্ন ৪৫। গত বছর দোলপূর্ণিমাতে দেখলাম বেশির ভাগ ভক্তই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা কেন বেশি থাকবে?

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে সারা পৃথিবীর ভক্তই থাকার কথা। সেখানে কেবল ভারতীয়রাই থাকবে কেন? তাছাড়া ইন্ডিয়ানরা যদি বেশি সংখ্যক ভক্ত হত তবে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারত না। শুধু সারা ভারতের কেন, কেবল এই নদীয়া বাসীরা যদি সংযুক্ত হত তাহলে তো বিদেশীরা বেশি সংখ্যক বলে মনে হত না। এই মহাপ্রভুর দেশের লোক হয়েও হরিনামে রুচি হয় না। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরাই আমাদের দেশের মানুষদের এখন শেখাচ্ছে কিভাবে হরিনাম করতে হয়। কিভাবে ভগবানকে প্রণাম করতে হয়। আমাদের এই নদীয়া বাসীরা অধিকাংশই অবৈষ্ণবীয় ভাবধারা বজায় রাখতে চায়। তারা তীর্থে মাছ-মাংসের হোটেল বসাচ্ছে।

সিগারেট-গাঁজার পসরা সাজাচ্ছে। ঘরে, দোকানে, বাজারে নানা বাবার ছবি, নানা শাক্ত ছবি রাখছে। কিন্তু মহাপ্রভুর ছবি অল্পই দেখা যায়।

আর সেই মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি দর্শন করবার জন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবসে সারা বিশ্বের ভক্তগণ শ্রীমায়াপুর ধামে আসছেন। তাদেরকে আপনার সাদর অভ্যর্থনা জানানো কর্তব্য। তা না হয়ে বরং উল্টোভাবে যদি চিন্তা করেন, কেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা মায়াপুরে আসবে। কেন তারা বেশি সংখ্যক ভক্ত হবে? এই ধরনের মনোভাব তো হিংস্র প্রাণীর ক্ষেত্রেই মানায়।

শ্রীল প্রভুপাদ একবার বলেছিলেন, এটা কুকুর সভ্যতা। কারও বাড়িতে গিয়ে পৌঁছালে বাড়ির লোক অতিথিকে দর্শন করে আপ্যায়ন করবে তো দূরের কথা, দরজার সামনে গেলেই কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। যেন বলতে চায়, কেন তুমি এখানে আসবে? যাও ভাগ যাও। ঘেউ ঘেউ।

আজ থেকে দু'শ বছর আগে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তৎকালীন নির্জন বনানী এলাকা শ্রীমায়াপুর ধাম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ একদিন এই পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমিতে এসে মায়াপুরের ধূলি মাথায় নিয়ে দুহাত তুলে 'জয় শচীনন্দন গৌরহরি' বলে নৃত্য-কীর্তন করতে থাকবে। তার বহু বছর পরে আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিদেশে হরিনাম প্রচার কালে তাঁর অনুগামী ভক্তদের মহাপ্রভুর লীলাস্থলী দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। তাই তাঁরা আসছেন, বিশেষত গৌর-পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে। আর আমি যদি বলি কেন এখানে তারা আসবে, এত লোক কেন এখানে থাকবে, কেন ভক্ত হবে, আমরাই কেবল ভক্ত হব, বিদেশীরা কেন হবে? এই মনোভাব ইতরামি।

প্রশ্ন ৪৬। কৃষ্ণভক্তি প্রচারের মাধ্যমে দেশের কি উন্নতি হতে পারে?

উত্তর ঃ কৃষ্ণভক্তি প্রচারিত হলে মানুষ নেশাচ্ছন্ন তামসিক কিংবা উগ্র রাজসিক ভাবাপন্ন না হয়ে কমপক্ষে পবিত্র সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়ে সুন্দর জীবন-যাপনে আগ্রহী হবে। মানুষ অবশ্যম্ভাবী দুঃখময় জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির সংসার চক্র থেকে চিরতরে উদ্ধারের নির্ভরযোগ্য সন্ধান পাবে। মানুষের সমাজে দ্বন্দ্ব হিংসা দম্ভ বিদ্বেষ অশান্তি দূর হয়ে যাবে। অবশ্য মানুষ ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভাবনামৃত যদি গ্রহণ করে। অন্যথায় উলুবনে মুক্তো ছড়ানোর মতোই কাণ্ড হবে।

প্রশ্ন ৪৭। শুনেছি যে নিরামিষ যদি খেতে হয় তাহলে দুধ ঘি ইত্যাদি বেশি করে খেলে শরীর স্বাস্থ্য ভাল হয়। নচেৎ মাছ মাংস খাওয়াই ভাল বলে মনে করি। তাই নয় কি?

উত্তর ঃ উত্তর ভারতের এক খ্যাতনামা কবিরাজী ডাক্তার ও খাদ্য-বিশেষজ্ঞ ইসকনের অন্যতম গুরু ও জিবিসি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, তুলনামূলকভাবে জগতে খাদ্যগুণ বেশি পরিমাণে উদ্ভিজ্জ শাক-সবজী-শস্য থেকেই উৎপন্ন হয়, প্রাণীজ বা আমিষ জাতীয় খাদ্য থেকে ততপরিমাণে উৎপন্ন হয় না।

সেই ডাক্তার উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে, দশ কিলোগ্রাম চাল বা গম খেয়ে যে শক্তি মানুষের শরীরে তৈরি হয়, এক কিলোগ্রাম চর্বি খেয়ে সেই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। আবার দশ কিলোগ্রাম মাংস-চর্বি খেয়ে শরীরে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়, মাত্র এক কিলোগ্রাম ঘি খেয়ে সেই পরিমাণ শক্তি হয়। আবার দশ কিলোগ্রাম ঘি খেয়ে শরীরে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়, মাত্র এক কিলোগ্রাম সরিষার তেল গায়ে মাখলেই সেই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়।

সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, বিশেষ করে সরিষার তেল অথবা ঘি, বিকল্পে বাদাম বা সূর্যমুখী ইত্যাদি তেল ব্যতিরেকে মানব সমাজ অচল বলেই বুঝতে হবে। কারণ সেক্ষেত্রে লোকে যত বড় মাংসাশী হোক না কেন একটুও মাছ-মাংস তারা খেতে পারবে না। উদ্ভিজ্জ খাদ্য সম্পদ ছাড়া নিছক মাছ-মাংস খেয়ে মানুষ কখনও বাঁচতে পারে না। বরং আমিষ ব্যতিরেকে কেবল নিরামিষ খাদ্য খেয়েই মানুষ খুব ভালোভাবেই বাঁচতে পারবে।

রামায়ণ ও মহাভারতে দেখা যায় বনবাসী শ্রীরামচন্দ্র কিংবা পাণ্ডবগণ নিরামিষাশী হয়েও মহাশক্তিধর ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক যুগের মানুষ নিরামিষাশী ছিল। অপেক্ষাকৃত তামসিক প্রকৃতির, অসভ্য ম্লেচ্ছ প্রকৃতির লোকেরাই আমিষ খেতে অভ্যস্ত ছিল।

মাছ-মাংসে থেকে স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়—এটা ভুল ধারণা। মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, বিহারী, অনেক মানুষ আছে যারা নিরামিষাশী। কিন্তু মাছ-মাংসভোজী বাঙালী অপেক্ষা তারা অনেক স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় মনে হয় বেশির ভাগ লোক মাংসাশী। মাছ-মাংসে প্রীতি থাকলে স্বভাবতই মাংসাশীরা কৃষ্ণভক্তি থেকে দূরে থাকবেন। স্থান বিচারে লক্ষিত হয়, আমরা যখন উত্তরপ্রদেশ বিহার ইত্যাদি রাজ্যে যাই তখন দেখা যায় লোকেরা প্রায় ভক্তিভাবাপন্ন। সর্বত্র যদিও না হতেও পারে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাবে পশ্চিমবাংলার লোকেরা ততটা নয় বলেই মনে হয়। কারণ মাংস খাওয়া শরীরে রজঃ-তমো গুণের প্রকাশ বেশি ফুটে ওঠে।

সমগ্র ভারতের মধ্যে পশ্চিমবাংলা গো-হত্যায় প্রথম স্থান অধিকার করে বসে আছে। মাংস খাওয়া আর চালান কারবারেও। অতএব গো-হত্যা করে রক্তমাংস খাওয়া চলতে থাকলে দুধ-ঘি আসবে কোথা থেকে?

একটি বড়শি বা ছিপ নিয়ে আমাদের বাঙালী লোকেরা ঘন্টার পর ঘন্টা, প্রহরের পর প্রহর ধৈর্য ধরে নদী বা জলাশয়ের পাড়ে বসে থাকে মাছ ধরবার জন্য। অথচ তারা বাংলার ভূমিতে আবির্ভূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রচারিত যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তনে একটুও আগ্রহী নয়। হরিনাম করতে নাকি তাদের একটুও সময় নাই।

তা ছাড়া, মানুষ মাছ-মাংসের জন্য যতটা সময় দেয়, ততটা সময় যদি গো-পালন, গরুর জন্য খড় কুচি করে কাটা, ভাল ভাল ঘাস লতাদি সংগ্রহ করা ইত্যাদি করত তবে অনেক দুধ আর ঘি লাভ করতে পারত। অনেক স্থানেই দেখা যায়, তারা খড়গুলোও কুচি করে গরুকে দেয় না। গরুরা সেই লম্বা খড় সুবিধামতো তাই খেতেও পারে না।

বেশ কয়েক বছর আগে বিশ্ব দৌড় প্রতিযোগিতায় যে দুইজন ব্যক্তি প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল তারা দুজনেই ছিল নিরামিষাশী। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' থেকে প্রকাশিত একটি বৃহৎ গ্রন্থে এরূপ নানাবিধ পরিসংখ্যান দিয়ে নিরামিষের উপযোগিতা সম্পর্কেই বেশি প্রশংসিত হয়েছে।

সাধারণত আমিষপ্রিয় ব্যক্তিগণই আমিষ খাওয়ার অনুমোদন ও প্রশংসা করে থাকলেও বৈদিক শাস্ত্রে তা কখনও অনুমোদিত হয়নি। আমিষ খাওয়ার কুফল কেবল বৈদিক শাস্ত্রেই নয়, বর্তমান যুগের খাদ্য-বিশেষজ্ঞগণও সতর্কতা দেখিয়েছেন।

সমগ্র পৃথিবীতে যত রকমেরই জটীল রোগ-ব্যাধি আমাদের শরীরে দেখা যায় তার মূলে অন্যান্য অনেক কারণ থাকলেও আমিষ রূপী কুখাদ্যের প্রভাবও কম নয়। কোলেস্টরল নামে রক্তদূষণকারী পদার্থটি মাছ-মাংস থেকেই আসে। অন্ত্রবিদ তথা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ ঘোষণা করেছেন যে, আমাদের মানব-শরীরের অন্ত্র মাংস-পরিপাক করার উপযোগী নয়।

প্রশ্ন ৪৮। ভগবান মঙ্গলময়, সব কিছুই ভগবানের কাছ থেকে সৃষ্ট। অথচ জগতে আমরা অমঙ্গলকর অন্যায় অবিচার দুঃখ কষ্ট দেখি কেন?

উত্তর ঃ আমাদের দেখার মধ্যে বহু ত্রুটি আছে। আমরা কোন একটি বস্তু বা ঘটনাকে আপাতভাবে দেখে আমাদের মনগড়া ব্যাখ্যা করি। অথচ সেই বস্তু বা ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধ আমরা দেখি না। অধিকন্তু আমরা সমালোচনা করতে ভারি ওস্তাদ। অতীত ঘটনা এবং পরিণতি ঘটনার মধ্যে আমরা যদি সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারি তাহলে দেখতে পাওয়া যেত, যা কিছু ঘটছে মঙ্গলই হচ্ছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই। উদাহরণ দিয়ে এক ভক্ত বলেছিলেন, দুর্যোধনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দেন যে, সে যুদ্ধ না করে হিংসা না করে মাত্র পাঁচটি গ্রাম পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের জন্য দিয়ে দিলেই আর সমস্যা থাকবে না, তাতেই তারা সন্তুষ্ট থাকবে এবং দুর্যোধন হস্তিনাপুর রাজসিংহাসনে ভালোভাবেই থাকতে পারবে। কিন্তু দুর্যোধন নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে জোর দিয়ে বলে যে, একবিন্দু ভূমিও বিনা সংগ্রামে পাণ্ডবদের দিতে সে রাজী নয়। তার সঙ্গে যুদ্ধ করে পাণ্ডবেরা সম্পূর্ণ রাজ্য নিতে পারে অন্যথায় এক বিন্দুও ভূমি দুর্যোধন দিতে রাজী নয়। তাই কালক্রমে উভয় পক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হল। শেষে ভীমসেনের গদার ঘায়ে দুর্যোধনের উরু ভেঙ্গে গেল। দুর্যোধন ভীষণ ছটফট করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণও সেখানে ছিলেন। কিন্তু সেই কাণ্ড দেখে তিনি কিছুই মনে করেননি। যেন উরু ভাঙ্গা অবস্থায় পতিত দুর্যোধনের যন্ত্রণাটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নয়। কারণ সে তার কর্মফল

মাত্র ভোগ করছিল। সে ভগবানের নির্দেশ অবজ্ঞা করেছিল। সে শান্তি চাইছিল না। সে সংগ্রাম করতেই চাইছিল। তাই তার পরিণাম সে ভোগ করছিল। কেউ যদি মনে করে হায় হায় ভগবান কি নিষ্ঠুর! তিনি উরু ভাঙ্গা ব্যক্তিটাকে দেখে কিছু মনে করছেন না। ছটফটানি দেখেও ভগবানের কোন দয়ামায়া নেই। সেই ধরনের অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত মানুষেরা যদি জানতে পারত যে, উরুতে বসিয়ে অন্যায়ভাবে সতী দ্রৌপদীর অবমাননা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা, অনর্থক জ্ঞাতি ভাইদের প্রতি অজস্র জঘন্য হিংস্র ভাব পোষণ করবার জন্যই অহংকারী দুর্যোধনের এই দুর্গতি হল, তখন তাদের দূরদৃষ্টি আছে বলে মনে হত। জীবের স্বতন্ত্র বুদ্ধির অপব্যবহারের ফলে মানুষ অমঙ্গলকর আচরণ করে জগতে অমঙ্গলকর পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে।

প্রশ্ন ৪৯। কেন আধুনিক যুবক ছেলেরা ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিপোষণ করে না?

উত্তর ঃ বেদবিরোধী নাস্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দুঃসঙ্গ জনিত কারণে।

প্রশ্ন ৫০। 'বাইরে থেকে সাহেব প্রভুরা এসে পূর্বের মতো ভারতকে আবার পরাধীন করতে চাইছে' এই মতামত সম্পর্কে আপনারা কি বলেন?

উত্তর ঃ আপনাদের কাছে 'সাহেব' নামে পরিচিত 'বিদেশী' কৃষ্ণভক্তরা আপনাদেরই 'স্বদেশী' শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে ভারতে এসে আপনাদের মতো 'ভারতবাসীদেরকে' এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, বিদেশী সাহেবিয়ানা পরিত্যাগ করে বিদেশী মদ মাংস বিড়ি চুরুট সহ ম্লেচ্ছ সভ্যতা বর্জন করে বৈদিক ভারতের মহান সম্পদ গীতা-ভাগবতের শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং পরচর্চা পরশিক্ষা নিয়ে পরাধীন না হতে। কমপক্ষে কলির চারটি পাপকর্ম নেশা-জুয়া-আমিষ ও অবৈধ যৌনতা এড়িয়ে বেদনির্ধারিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে থাকলে 'ভারতবাসী' বলে তাঁরা মনে করেন। আর আপনার রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর আসনে আপনি স্বদেশী মানুষ জাঁকিয়ে বসুন তাতে কোনও বাধা নেই।

প্রশ্ন ৫১। মানুষ কিভাবে 'জাতিস্মর' হতে পারে? কিভাবে এই জন্মের কথা পরজন্মে কিংবা পূর্বজন্মের কথা বর্তমান জন্মে স্মরণে থাকে?

উত্তর ঃ বৈদিক শাস্ত্র 'মনুসংহিতা'তে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেন চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্বিকীম্ ॥

অর্থাৎ, "সর্বদা ভগবদ্ শাস্ত্র অভ্যাস, কায়-মনো-বাক্যে শুচিতা, তপস্যা এবং সর্বজীবের প্রতি মৈত্রীভাব—এই সমস্ত আচরণ করলে জাতিস্মর হওয়া যায়, পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করা যায়।" (মঃ সঃ ৪/১৪৮)

প্রশ্ন ৫২। মহান বিজ্ঞানী গ্যালিলিও বলেছেন সূর্য স্থির, পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে। তিনি চির ধ্রুব প্রমাণসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি বলেছেন স্বর্গ-নরক বলে কিছু নেই। আপনারা কেন তাঁর বিপক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন? তা হলে ঈশ্বরের উপস্থিতি যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদের সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে পারবেন কি?

উত্তর ঃ আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে ভারতীয় বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র বলে আসছে সূর্যকে কেন্দ্র করে আমাদের এই সৌর জগতের গ্রহগুলি আবর্তনশীল। কিন্তু সূর্যও যে আবর্তনশীল সেই চির ধ্রুব প্রমাণসিদ্ধ বিষয়টি গ্যালিলিওর ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ধরা পড়েনি। আর আপাত অদৃশ্যমান স্বর্গ-নরক সম্পর্কে তিনি কি বলবেন? দুর্ভাগ্যবশত আপনার মতো পাশ্চাত্য মতের অনুগামী মানুষেরা আমাদের ভারতের প্রাচীন মহান বিজ্ঞানীরা যা বলে গিয়েছেন তা পাঠ করেন না, নিজের দেশের সংস্কৃতি ও শাস্ত্র (বিজ্ঞান) জানার চেষ্টা করেন না। তাছাড়া আপনি কয়জন বিজ্ঞানীর কথা পড়েছেন? স্যার আইজ্যাক নিউটন নামে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী বলেছেন, মহাবিশ্বে সমস্ত জ্যোতিষ্ক, সমস্ত গ্রহপুঞ্জ আবর্তনশীল। এটাও কি আপনি পাঠশালায় শেখেননি? আইনষ্টাইন বলেছেন "এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনার পেছনে এক পরম নিয়ন্তা রয়েছেন।" আর বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে পরম নিয়ন্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

আপনি তো নদীয়াবাসী। এই নদীয়াতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়ে সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে হরিভজন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেটাই জীবনের পরম কর্তব্য। আজ যখন শত শত শিক্ষিত পাশ্চাত্যবাসী সেই পরম কর্তব্য পালনের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে গ্রহণ করেছেন, তখন আপনি কোথায়! আচ্ছা, আপনিই ভেবে দেখুন না, কোন দর্শন বা মতবাদের মধ্যে যদি উপযুক্ত বিজ্ঞান ও যুক্তি না থাকে সেই দর্শন বা মতবাদ কি কখনও হাজার হাজার বছর টিকে থাকতে পারে?

প্রশ্ন ৫৩। এই জগতে চেতনার তারতম্য অনুসারে জীব কত প্রকারের?

উত্তর ঃ চেতনার তারতম্য অনুসারে জীব পাঁচ প্রকারের। যথা—(১) আচ্ছাদিত চেতন। যেমন—বৃক্ষ। (২) সঙ্কুচিত চেতন। যেমন—পশু-পাখি। (৩) মুকুলিত চেতন। যেমন—ভগবদ্‌ভক্তিশূন্য মানুষ। (৪) বিকশিত চেতন। যেমন—সাধন ভক্ত, ভক্তি অনুশীলনকারী মানুষ। (৫) পূর্ণবিকশিত চেতন। যেমন—স্থায়ীভাবভক্ত, ভক্তিপূর্ণ মানুষ।

আচ্ছাদিত চেতন, সঙ্কুচিত চেতন ও মুকুলিত চেতন—এই তিন প্রকার জীব নিত্য বদ্ধ। বিকশিত চেতন ও পূর্ণবিকশিত চেতন—এই দুই প্রকার জীব বদ্ধমুক্ত অর্থাৎ, জড় জগতে থাকলেও আবদ্ধ নয়।

মুকুলিত-চেতন অভক্ত মানুষ ছয় রকমের। যথা—

(১) অসভ্য মূর্খ মানুষ। যেমন পুলিন্দ, শবর ইত্যাদি।

(২) সভ্যতা, জড়বিজ্ঞান ও শিল্প বিজ্ঞানাদি সম্পন্ন মানুষ। যার নীতি ও ঈশ্বর বিশ্বাস নেই। যেমন ম্লেচ্ছ ইত্যাদি স্তরের মানুষ।

(৩) নিরীশ্বর অথচ সুন্দর নীতি পরায়ণ মানুষ। যেমন বৌদ্ধ ইত্যাদি।

(৪) কল্পিত ঈশ্বরবাদযুক্ত নীতি পরায়ণ মানুষ। ঈশ্বর সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই অথচ 'ঈশ্বর আছেন' বিশ্বাস করে এবং নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন।

(৫) ভগবানকে স্বীকার করে, অথচ ভক্তি স্বীকার করে না। এই ধরনের মানুষ।

(৬) নির্বিশেষবাদী মানুষ। এই ধরনের মানুষ বলে 'ভগবান নিরাকার জ্যোতি মাত্র।'

প্রশ্ন ৫৪। অসৎ বাক্য প্রয়োগের ফলে মানুষ কলুষিত হয়। অসৎ বাক্য কোন্‌গুলি?

উত্তর ঃ সৎ কথাটির অর্থ হচ্ছে নিত্য, আর অসৎ কথাটির অর্থ হচ্ছে যা নিত্য নয়, ক্ষণিক। যে বাক্য কথন হলে নিত্য জীবনের সন্ধান পাওয়া যায় সেই বাক্যই মহর্ষি সাধু মহাত্মাগণ ব্যবহার করে থাকেন। আর মূর্খ জনেরা অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মধ্যে সুখ দুঃখ বিষয়ক বাক্য কথন করে তা অসৎ বাক্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা ন
কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্‌গুণোদয়ম্‌ ॥

"যাতে অধোক্ষজ ভগবান শ্রীহরির প্রসঙ্গ কীর্তিত হয় না, সেই রকম বাক্যরাশিই মিথ্যা বা অসৎ। যাতে ভগবানের গুণমহিমার অভ্যুদয় হয় সেইরকম বাক্যই সত্য। সেই সত্য বাক্যই নিত্য পুণ্যকারক এবং সর্বতোভাবে জীবের মঙ্গলপ্রদ।" (ভাঃ ১২/১২/৪৯)

ন তদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্‌ ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং
যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ ॥

"যে বাক্য বিচিত্র পদযুক্ত হয়েও কখনও শ্রীহরির জগৎপবিত্র যশঃ বর্ণন করে না, সেই বাক্য কাকতুল্য অসারগ্রাহী ব্যক্তিদের কাছে আকর্ষণীয় হলেও হংসতুল্য সারগ্রাহী জ্ঞানীব্যক্তিদের কাছে আকর্ষণীয় নয়। বিমলচিত্ত সাধুগণ ভগবানের মহিমাসূচক বাক্যেই রতিযুক্ত হয়ে থাকেন।" (ভাঃ ১২/১২/৫১)

আত্মকল্যাণ ও জগৎকল্যাণের জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে '*সততং কীর্তয়ন্তো মাং*'—সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা কীর্তন কর। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও একই উপদেশ দিয়েছেন—*কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।* সর্বদা হরি কীর্তন কর।

প্রশ্ন ৫৫। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ বিষয়ে পুরাণ, না বিজ্ঞান কোন্‌টির ব্যাখ্যা কতদূর সত্য ও সামঞ্জস্য পূর্ণ?

উত্তর ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং পুরাণ ও মহাভারতাদি শাস্ত্রে রাহু নামক গ্রহের কথা রয়েছে। কোনও কোনও জড় বিজ্ঞানী রাহু গ্রহের কথাটিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে এখনও পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। রাহু নামক গ্রহের প্রভাবে চন্দ্র কিংবা সূর্যকে পৃথিবী গ্রহ থেকে বিভিন্ন স্থান থেকে আংশিক কিংবা পূর্ণরূপে অদৃশ্যমান দেখা যায়।

প্রশ্ন ৫৬। ত্রিভুবন কথাটি আমরা শুনেছি। কিন্তু চৌদ্দ ভুবন বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমরা যে ভুবনে আছি তাকে ভূলোক বা মর্ত্যলোক বলা হয়, এর উর্ধ্বদিকের গ্রহলোকগুলোকে লৌকিক কথায় স্বর্গলোক বলা হয় এবং নিম্নদিকের গ্রহলোকগুলোকে লৌকিক কথায় পাতাললোক বলা হয়। এভাবে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালকে ত্রিভুবন বলা হয়ে থাকে। উর্ধ্ব, মধ্য ও অধঃ এভাবেও অনেকে ভাগ করে থাকেন।

সুতরাং, ভূলোকের ক্রমশঃ উর্ধ্বের ছয়টি গ্রহলোকের নাম শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে যথা—ভূবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক এবং ক্রমশঃ নিম্নের সাতটি গ্রহলোক, যথা—অতল, বিতল, সুতল, মহাতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল লোক অবস্থিত। এইভাবে আমাদের এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটি চৌদ্দভুবনবিশিষ্ট। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, তার মধ্যে আমাদের এই চৌদ্দভুবন-বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডটি সবচেয়ে ছোট বলে শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে।

প্রশ্ন ৫৭। মূল শাস্ত্র কোন্‌টি?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উল্লেখ করেছেন—

সে-ই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥

যস্মিন্‌ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥

"যে শাস্ত্রে বা পুরাণে একমাত্র শ্রীহরিভক্তিই মুখ্য তাৎপর্যরূপে দৃষ্ট হয় না, সাক্ষাৎ ব্রহ্মাও যদি সেই শাস্ত্র বর্ণনা করে শুনাতে আসেন, তা হলেও কখনই কোন প্রকারেই তা কারও শ্রবণ করা উচিত নয়।" (চৈ. ভা. ম ১/১৯৫-১৯৬)

প্রশ্ন ৫৮। আমাদের সমাজে মানুষে মানুষে স্নেহ-মৈত্রীর এত অভাব কেন?

উত্তর ঃ সমাজে স্নেহ ও মৈত্রীর উজ্জ্বল প্রতীক হচ্ছে শিশুজাতি ও গোজাতি। কিন্তু ভ্রূণ হত্যা এবং গো হত্যায় যে সমাজ অভ্যস্ত, সেই সমাজে স্নেহ-মৈত্রী থাকে না। সে সমাজ অভিশপ্ত।

প্রশ্ন ৫৯। হরিনাম না করে জীবসেবা করলে কি তাতে ভগবানকে পাওয়া যায় না?

উত্তর ঃ না। ভগবানের সেবার অভিলাষ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। জীবের সেবা অভিলাষ থাকলে সব বদ্ধ জীবই লাভ হবে। জীবসেবাকারী পুণ্যাত্মা বড় জোর কয়দিন জড় সুখভোগের জন্য স্বর্গীয় পরিবেশ লাভ করবেন মাত্র।

প্রশ্ন ৬০। আমরা জানি জীবকে ভালবাসাই ধর্ম। তাই নয় কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। জীবকে ঘৃণা করতে কোনও শাস্ত্রই নির্দেশ দেয় না। অন্যায়ভাবে জীবকে ঘৃণা করা বা হত্যা করা অধর্ম। যাতে সমস্ত জীব তাদের জীবনীশক্তির পরম

উৎস শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে পারে সেইরকম ব্যবস্থা করাই পরম ধর্ম। ভগবানকে ভালবেসে এই আবহমানকাল ব্যাপী দুঃখময় জীবনচক্র থেকে উদ্ধার পেয়ে শাশ্বত জীবন লাভ করাই সমস্ত জীবের আসল ধর্ম। 'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।'

প্রশ্ন ৬১। আমরা জানি যে, ভারত ধর্মের দেশ। অতএব ভারতবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে বেশ কিছুটা জ্ঞান আছে। তাই নয় কি?

উত্তর ঃ ভারতবাসী হলেই যে ধর্মজ্ঞান সম্পন্ন, তা বলা যায় না। আজ থেকে পাঁচহাজার বছর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে দুই দল যুদ্ধ করছিল। এক পক্ষে ধর্মের প্রতিনিধি যুধিষ্ঠির এবং অন্যপক্ষে অধর্মের প্রতিনিধি দুর্যোধন। সেই মহাযুদ্ধে পৃথিবীর অসংখ্য রাজা যোগ দিয়েছিলেন। বেশীর ভাগ দেশই অধর্মের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। এমনকি আমাদের বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাও অধর্মাচারী দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ তথা ভারতের বাসিন্দারা যদি ধর্মজ্ঞ হতেন তা হলে তো এরকমটি করতেন না।

প্রশ্ন ৬২। পুরাকালে যখন বই লেখা বা ছাপানোর কোনও ব্যবস্থা ছিল না, তখন কি পড়াশুনার কোনও ব্যবস্থা ছিল?

উত্তর ঃ পুরাকালে বৈদিক জ্ঞান লিখে রাখার কোনও প্রয়োজন হয় নি। কারণ তখনকার মানুষ আধুনিক মানুষের মতো ক্ষীণস্মৃতি বা মননহীন ছিল না। পুরাকালের মানুষ অত্যন্ত মেধাবী ও স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা তাঁদের পারমার্থিক গুরুদেবের নির্দেশাবলী একবার মাত্র শুনেই তা স্মরণ রাখতে পারতেন। বৈদিক তত্ত্ব ভগবানের কাছ থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাসদেব, ব্যাসদেব থেকে অন্যান্য শিষ্যরা—এভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় নেমে এসেছে। লেখা-ছাপার প্রয়োজনও পড়েনি, কেবল শুনে শুনেই বেদের জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে হত বলেই বেদের অপর নাম হল শ্রুতি।

প্রশ্ন ৬৩। নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁদের প্রহারকারীদের প্রতিও অভিশাপ না দিয়ে উদ্ধার করেন, কিন্তু নারদমুনি, গৌতমমুনি আদি বহু ঋষি অন্যায়কারীদের অভিশাপ প্রদান করেন কেন? অভিশাপদাতারা মুনিঋষি হন কি করে? এখানে উত্তম কারা?

উত্তর ঃ শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু অভিশাপ দেননি, তাঁরা অহৈতুকী কৃপাবশতঃ জীবের প্রতি মহাবদান্যতা প্রদর্শন করেছেন। নারদমুনি-গৌতমমুনি অভিশাপ দিয়ে এই মর্ত্যধামে ভগবানের বিশেষ লীলা পুষ্টি সাধন করেছেন।

মুনিঋষিরা অভিশাপ প্রদান করেন বলেই লোকে মুনিঋষিদের প্রতি সম্মান সম্ভ্রম রক্ষা করে চলে। এভাবে নিজেদের সংযত করতে যত্ন নেয়। মহাত্মা ব্যক্তিদের প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা থাকে বলেই লোকে ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে সতর্ক থাকে। মুনিঋষিদের অভিশাপের ভয়ে লোকে অপরাধ শূন্য হয়ে থাকার জন্য যত্ন করে।

মুনিঋষিরা যে অভিশাপ দিয়ে থাকেন, সেটা জীবের প্রতি তাদের হিংসা চরিতার্থ করার জন্য নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যে। আমাদের দেশে অনেক পাগল আছে যারা সন্দেহবশতঃ কাউকে লক্ষ্য করে অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করে। আবার বিনা কারণে ছন্নমতি লোক অনুচিত অভিশাপ প্রদান করে থাকে। সেই অভিশাপের কোনও মূল্য নেই।

আবার অপরাধীকে ক্ষমা করা তারই সাজে যার শাস্তি দেওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। হীনবল ভীরু লোক যদি কোনও অপরাধকারীকে বলে, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম তা হলে সেই ক্ষমা নিরর্থক।

প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে—যারা অভিশাপ দেয় আর যারা অভিশাপ না দিয়ে ক্ষমা করেন এই উভয়ের মধ্যে কারা উত্তম? উত্তর হল—অভিশাপ দেওয়া থেকে ক্ষমা করার গুণ উত্তম। আমাদের পক্ষে কাউকে অভিশাপ না দেওয়া ভাল। আমরা সংসারবদ্ধ জীব যখন ক্রোধান্বিত হই তখনই নানারকম অভিশাপ উচ্চারণ করে থাকি। সেটি মোটেই ভাল নয়। সেটি একপ্রকার বদ অভ্যাস। মুনি-ঋষি-মহাত্মাদের মধ্যে কারা উত্তম, কারা মধ্যম বা অধম—এ বিচার না করে তাঁরা কিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত সেই বিচার করা শ্রেয়ঃ।

প্রশ্ন ৬৪। শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত না হয়ে আমি যদি সৎ পথে চলি, সৎ কথা বলি, গরীবদের সাহায্য করি, বাবা-মার সেবা করি, তবে কি ভগবান প্রীত হবেন না? এভাবে কি ভগবানের কাছে আমি ফিরে যেতে পারব না?

উত্তর ঃ সমস্ত কর্ম কৃষ্ণভক্তির অনুকূলে পরিচালিত করা হলে কৃষ্ণপ্রীতি সাধিত হয়। কৃষ্ণভক্ত না হলে কি করে কৃষ্ণ প্রীত হবেন? কৃষ্ণভক্ত না হয়ে কৃষ্ণের কাছে ফিরে যাওয়ার বাসনা নিষ্ফল হয়। বরং কৃষ্ণভক্ত হয়ে গরীবদের সাহায্য কর, বাবা-মার সেবা কর, তাতে দোষ নেই। কৃষ্ণভক্তির প্রেরণা দিয়ে জীবকে ভগবদ্ধামে উপনীত হওয়ার জন্য সাহায্য করাই যথার্থ বৈদিক পরোপকার। কৃষ্ণভক্ত না হয়ে জাগতিক সমস্ত কর্তব্য কর্মগুলি সম্পাদন করতে থাকলে তাতে কিছু পুণ্য সঞ্চিত হবে। সেই পুণ্যবলে বড় জোর কিছু দিনের জন্য স্বর্গসুখ ভোগের সুযোগ পাওয়া যাবে বলে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু জড় সংসারের অতীত সৎ-চিদ্-আনন্দময় ভগবদ্ ধামে কখনও পৌঁছানো যাবে না।

প্রশ্ন ৬৫। গুরুপরম্পরার ধারায় ভগবদ্গীতার জ্ঞান প্রবাহিত হয়। পরম্পরা ছিন্ন হওয়ায় পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই জ্ঞান দান করছেন। তা হলে আমরা যে গীতার জ্ঞান পাচ্ছি সেটি কি অর্জুনের পরম্পরা ধারায়?

উত্তর ঃ আমরা গীতার জ্ঞান গ্রহণ করার যে সুযোগ পাচ্ছি, তা হচ্ছে মহর্ষি ব্যাসদেবের পরম্পরা ধারায়।

প্রশ্ন ৬৬। একজন সাধুর গুণাবলী কি কি?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/২১) বলা হয়েছে—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

তিতিক্ষা—কৃষ্ণভজনের জন্য সব রকম কষ্ট সহ্য করে চলেন। তিনি সহনশীল। নানান্ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও তিনি ভক্তিপ্রচার করেন।

কারুণ্য—তিনি কেবল নিজের মুক্তিতেই সন্তুষ্ট নন। তিনি সর্বদা অন্যের মঙ্গলের চিন্তা করেন। সমস্ত অধঃপতিত জীবেদের প্রতি তিনি কৃপালু।

সুহৃদভাবাপন্ন—কেবল মানুষদের প্রতিই নয়, *সর্বদেহিনাম্* বা সমস্ত জীবেরই শুভাকাঙ্ক্ষী। সর্বজীবের প্রতি তিনি এমন আচরণ করেন যাতে তারা চরমে দুঃখময় জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

অজাতশত্রু—তিনি কারও প্রতি শত্রুভাব পোষণ করেন না। যদিও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা সাধুদের সঙ্গে কখনও কখনও শত্রুতা করে চলে। কাউকে শত্রু কাউকে মিত্র—এরকম দৃষ্টি বিষয়-জড়বাদীদের হয়ে থাকে। সমস্ত জীবের প্রতি সাধুর যে আচরণ তা বদ্ধ জীবেদের ভববন্ধন মোচনের জন্যই।

শান্ত—তিনি শান্তিপূর্ণভাবে শাস্ত্রের নিয়মকানুন পালন করেন। কায়মনোবাক্যে সংযত থাকেন।

সাধক—তিনি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলি মেনে চলেন। কায়মনোবাক্যে শ্রীহরি সেবা চিন্তা করে চলেন। তিনি কৃষ্ণৈকশরণ কৃষ্ণভক্ত।

প্রশ্ন ৬৭। লোকে বলে থাকে, কুলক্ষণে জন্ম হলে শিশু কুলাঙ্গার হয়। এ কথা কি সত্য?

উত্তর ঃ বিভিন্ন লক্ষণ দেখেই জ্যোতিষ বিজ্ঞানীরা শিশুর চরিত্রগতি নির্ধারণ করে থাকেন। মহাভারতের আদিপর্বে দেখা যায়, যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধনের জন্ম হয়, সেই সময় নানাবিধ কু-লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। দুর্যোধন জন্মমাত্রই গাধার মতো কর্কশ শব্দ উচ্চারণ করেছিল। সেই সময় গাধা, শকুন, শেয়াল, কাক প্রভৃতি প্রাণীরা ভয়ানক চীৎকার করতে লাগল। প্রবল বেগে বাতাস বইতে লাগল। চতুর্দিক যেন দগ্ধীভূত হচ্ছিল।

সেই সমস্ত কু-লক্ষণ শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হয়ে ভীষ্মদেব, বিদুর, ব্রাহ্মণদের এবং অন্যান্য সুহৃদদের আহ্বান করলেন। শিশুর জন্মক্ষণে কু-লক্ষণ প্রকাশিত হচ্ছে—এটিই তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের সামনে বলেই বসলেন যে, রাজপুত্র যুধিষ্ঠির সবার বড় এবং গুণবান। তাই সে-ই রাজা হবে। এতে আমার কোন বক্তব্য নেই। এখন, আমার যে পুত্র জন্মালো, যুধিষ্ঠিরের পর সে কি রাজাভোগী হতে পারবে?

ব্রাহ্মণরা এবং পণ্ডিত বিদুর বলতে লাগলেন, রাজন! আপনার পুত্র জন্মমাত্রই শেয়াল, শকুন, কাক ও কুকুরদের কর্কশ ডাক এখনও চলছে। এতে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে এই শিশুটি দুরাত্মা। এর থেকে আমাদের কুরুবংশ ধ্বংস হবে। এই শিশুকে পরিত্যাগ করা উচিত। অন্যথায় এই শিশুই মহা অনর্থের কারণ হবে। হে রাজন্, যদি বংশ রক্ষা করবার বাসনা থাকে তবে একটি দুরাত্মাকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। কিন্তু পুত্রস্নেহান্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণদের মতে কাজ করেননি।

সেই দুর্যোধনই ছিল অধর্মের অনাচারের মূর্তিমন্ত রূপ। হস্তিনাপুরের রাজা হওয়ার মতলবে ছোটবেলা থেকেই বহু রকমের মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা ও কুকর্ম করতে পটু ছিল। সে-ই সমগ্র কুরুবংশের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।

প্রশ্ন ৬৮। মহাত্মা কাকে বলে? মহাত্মা জনের ক্রিয়াকলাপ কি ধরনের?

উত্তর ঃ যিনি ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভজন করেন তিনিই মহাত্মা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মার সংজ্ঞা ও ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করেছেন।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ! যাঁরা আমার দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করে এই জড়জাগতিক বিষয়ের মোহ থেকে মুক্ত, এবং আমাকে সমগ্র সৃষ্টির কারণ ও অবিনাশী জেনে অনন্যচিত্তে আমারই ভজনা করেন তাঁরাই মহাত্মা।" (গীতা ৯/১৩)

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

"সেই মহাত্মারা নিরন্তর আমার মহিমা কীর্তন করেন, তাঁরা ব্রহ্মচর্য ব্রতে দৃঢ়নিষ্ঠ ও যত্নশীল হন, তাঁরা ভক্তি সহকারে আমাকে প্রণতি নিবেদন করেন। মহাত্মারা আমার উপাসনার নিমিত্ত সর্ব কর্মে যুক্ত থাকেন। (গীতা ৯/১৪)

প্রশ্ন ৬৯। যোগী কাদের বলে?

উত্তর ঃ ভগবানের সেবায় যাঁরা নিজেদের যুক্ত করার জন্য যত্ন করেন তাঁরাই যোগী। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন তাঁরাই যোগী। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

যিনি সর্বক্ষণ প্রীতি সহকারে তাঁর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন, যিনি নিরন্তর শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। (গীতা ৬/৪৭)

প্রশ্ন ৭০। আমরা জানি পিতা-মাতার গুণ সন্তানের মধ্যে বর্তায়। মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র হয়েও রাবণ কেন ব্রাহ্মণ, ঋষি, সাধুলোকের বিরোধী হয়েছিল?

উত্তর ঃ ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্য। পুলস্ত্য ঋষির পুত্র বৈশ্রবণ। বৈশ্রবণ পিতাকে ত্যাগ করে পিতামহের কাছে উপস্থিত হলে পিতা পুলস্ত্য ক্রোধে তনুত্যাগ করেন। তারপর তিনি বিশ্রবা নাম ধারণ করে দ্বিজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। এদিকে পিতামহ ব্রহ্মা বৈশ্রবণকে পুষ্পক বিমান ইত্যাদি নানা বৈভব দান করেন, এবং রাক্ষস পরিপূর্ণ

লঙ্কা নগরী তাঁর রাজধানী বলে নির্দিষ্ট করে দেন। বৈশ্রবণ শ্রীব্রহ্মার কৃপাবলে যক্ষ-রক্ষগণের আধিপত্য রাজরাজত্ব লাভ করলেন।

এদিকে বিশ্রবা বৈশ্রবণের প্রতি সবসময় ক্রোধদৃষ্টিতে দর্শন করতেন। সব সময় তার ক্রুদ্ধভাব দেখে তাঁর পুত্র কুবের চেষ্টা করলেন পিতাকে শান্ত করার জন্য। সেইজন্য লঙ্কারাজ্যে তিনজন সুন্দরী রাক্ষসীকে পিতার পরিচর্যায় নিযুক্ত করেন। নিকষা, রাকা ও মালিনী—এই তিন রাক্ষসী ছিলেন নৃত্য গীতে অতিশয় সুনিপুণ। তাদের নৃত্যগীত সেবাদি যত্নের মাধ্যমে বিশ্রবার সন্তোষ বিধান হত। তাদের সন্তান একমাত্র বিভীষণ ছাড়া রাবণ, কুম্ভকর্ণ, খর, শূর্পনখা সবাই ছিল উগ্রভাবাপন্ন। এ থেকে বোঝা যায়, বিভীষণমাতা মালিনী ছিল শান্ত প্রকৃতির, নিকষা ও রাকা এবং তাদের পতি বিশ্রবা উগ্রভাবাপন্ন।

অবশ্য সাধুগুরু বৈষ্ণবের আশীর্বাদ থাকলে মন্দ ব্যক্তিও সুন্দর চরিত্র অর্জন করতে পারে। জন্মগত এবং সংসর্গগত দিকও লোকের মানসিকতা বা চরিত্র গঠনের উপাদান হয়ে থাকে। মনীষীরা গান করেন—

জন্ম হউক যথা তথা,
কর্ম হউক ভালো ॥

প্রশ্ন ৭১। কৃষ্ণভক্তিই যখন সবারই অনুশীলন করা উচিত বলে মনে করেন, তা হলে লোকেরা অধিকাংশই কৃষ্ণভক্তি করে না কেন?

উত্তর ঃ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই জড়জাগতিক সুখ-দুঃখ ভোগ বিষয়ে বিচলিত ও মোহগ্রস্ত। যার ফলে মানুষ পাপাচারী হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় থেকে মানুষ কৃষ্ণভক্তিতে উন্মুখ হয় না। যাদের পাপ ক্ষয় হয়েছে তারাই কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত থাকে। অন্যথায় পাপী মানুষেরা কৃষ্ণভজন করতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা বলেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

অর্থাৎ, "যে সমস্ত পুণ্যকর্মা লোকের পাপ ক্ষয় হয়েছে, তাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আমাকে ভজনা করেন।" (গীতা ৭/২৮)

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের পিতা শ্রীপরাশর মুনি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন—

ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্ ।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে স্মরণং কীর্তনং তথা ॥

অর্থাৎ, "যারা অপুণ্যবান বা পাপাচারী, যারা মূঢ়মতি, যাদের হৃদয় কুটিল, তাদের শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মে ভক্তির উদয় হয় না। তারা ভগবানের নাম স্মরণ বা কীর্তন করতেও পারে না।" (স্কন্দপুরাণ)

শ্রীব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলেন—

নিমিষং নিমিষার্ধং বা মর্ত্যানামিহ নারদ ।
নাদগ্ধাশেষপাপানাং ভক্তির্ভবতি কেশবে ॥

"হে নারদ! মর্ত্যলোকে যে সব ব্যক্তির অশেষ পাপরাশি দগ্ধ হয়নি, এক নিমেষ বা অর্ধনিমেষ সময়টুকুও তাদের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত হয় না।" (স্কন্দপুরাণ)

প্রশ্ন ৭২। আমি মনে করি যে, মানব সমাজের মধ্যে নীতি মেনে চলাই কর্তব্য। সেই নীতিই ভগবান। এছাড়া ভগবান নেই। তাই নয় কি?

উত্তর ঃ আপনি মনে করলেই তো নীতিটাই ভগবান হয়ে যাবেন না। মানব-সমাজের জন্য ভগবান নীতিবিধান করেছেন। তার মানে এই নয় যে সেই নীতিই ভগবান। আপনি কারও জন্য কিছু কর্তব্য সম্পাদন করতে নির্দেশ দিতে পারেন, তার মানে এই বোঝায় না যে সেই নির্দেশটাই আপনি। কর্তব্য নির্দেশের বাইরে আপনার অস্তিত্ব রয়েছে। সেইরকম ভগবানও সমস্ত নীতির উর্ধ্বে অবশ্যই আছেন।

প্রশ্ন ৭৩। 'হিন্দু' কথাটি বিদেশীয় কি?

উত্তর ঃ ভারত ছিল আর্যদের দেশ। পশ্চিমী দেশগুলি ছিল অনার্যদের। অনার্য ম্লেচ্ছরা ভারত দখল করবার চেষ্টা করল। ভারতকে আক্রমণ করবার সুগম পথটি ছিল সিন্ধুনদের উপর দিয়ে। সিন্ধু নদের উপত্যকায় বহু লোক বাস করত। ম্লেচ্ছদের ভাষা ছিল অন্যরকম। তারা 'সিন্ধু' কথাটি উচ্চারণ করতে পারত না। 'স' কে 'অ' বা 'হ'-এর মতো উচ্চারণ করত। 'দ' বা 'ধ'-কে 'ড' বলত। 'সিন্ধু' কে 'ইণ্ডু' বলত। এভাবে এই সিন্ধু উপত্যকা তথা সারা ভারত দেশটিকে তারা 'ইণ্ডুয়া' বা 'ইণ্ডিয়া' নামকরণ করল। আর ভারতবাসীদের সেই অর্থে 'ইণ্ডু' বা 'হিন্দু' বলে অভিহিত করল। শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, কোনও বৈদিক শাস্ত্রে 'হিন্দু' কথাটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'হিন্দু' নামটি যবনদের দেওয়া নাম।

প্রশ্ন ৭৪। ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতে 'জনগণমন-অধিনায়ক' এবং 'ভারতভাগ্যবিধাতা' বলতে গান্ধীজী, নেতাজী, ভারতমাতা, প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতিকে বোঝায়, এরকমভাবে নানাজনের নানা মত। ইসকন অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিতে প্রার্থনাকালে হরিনাম করাকে হিন্দুমৌলবাদ বলেন। এই সমস্যাগুলির সমাধান কি?

উত্তর ঃ আমাদের দেশের নাম ভারত। এই নামটি বর্তমানে একটি ছোট ভূখণ্ড মাত্র। আগে এই পৃথিবীর নাম ছিল অজনাভবর্ষ। মহাভাগবত শ্রীভরত মহারাজের রাজত্বকাল থেকে নাম হল ভারতবর্ষ। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৭/৪) বর্ণিত হয়েছে। তখন ছিল রাজতন্ত্র। প্রজারা যাতে জাগতিক এবং পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে সেই বিষয় সরকার লক্ষ্য করতেন। কেউই নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করতেন না। স্নেহপ্রীতি ও কর্তব্যময় সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা ছিল। বেকারত্বের লেশমাত্রও ছিল না। মহারাজ ভরত পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতেন। মহাভাগবত শ্রীভরত মহারাজ পরম আগ্রহের সঙ্গে ভগবান শ্রীহরির সেবায় রত হয়েছিলেন।

বেদে শ্রীহরিকে বলা হয়েছে 'সর্বলোকৈক নায়ক'। সর্ব লোকের একমাত্র নায়ক তিনি। শ্রীহরি বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোক মহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

'আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্ব লোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড়জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।' (গীতা ৫/২৯)

বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষা 'অ' মানে কৃষ্ণ। তারপরেও যখন হস্তাক্ষর লেখা শেখানো হয়, প্রথমেই 'শ্রীশ্রীহরি' লিখতে হয়।

সমস্ত আয়োজন ও ক্রিয়াকলাপের ভোক্তা, সর্বলোকের অধিনায়ক, পরমবিধাতা শ্রীহরিই আমাদের আরাধ্য ভগবান বলে সর্বপ্রথমে জানা কর্তব্য। কিন্তু 'জনগণমন-অধিনায়ক', 'ভারতভাগ্যবিধাতা' বলতে যদি শ্রীহরিকে না বোঝায় তবে ভাগ্যদোষ। কলিযুগের লোকেরা যদি শ্রীহরিনাম কীর্তন যুগধর্মটি শিক্ষা না করে তবে তো শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দেশ অনুসারে তারা *সুমন্দমতয়ো।* অত্যন্ত দুর্ভাগা।

প্রশ্ন ৭৫। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে 'বৃথা হিংসা', 'বৃথা মদ্যপান'। তা হলে যথার্থ হিংসা ও যথার্থ মদ্যপান কি?

উত্তর ঃ 'বৃথা' মানে 'অনর্থক'। যে কর্ম আমাদের জীবনে অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেই সব কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। বলা হয় 'বৃথা প্রজল্প করবেন না' তার অর্থ বোঝায়, প্রজল্প করে সময় অপচয় করবেন না। 'বৃথা শ্রম' কথাটির মানে হল 'পণ্ডশ্রম' অর্থাৎ শ্রমের ফলে কোনও সুফল নেই। কেবল বিড়ম্বনাই লাভ হয়। শ্রমের ফলে ভালো কিছু লাভ হলে 'শ্রম সার্থক' বলা হয়।

হিংসা কর্মটিও সার্থক হয় যখন ভক্তিবিদ্বেষী বা ধর্মবিরোধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। যেমন, রামভক্ত হনুমান লংকারাজ্যে গিয়ে পরস্ত্রীহরণকারী রাবণের কাছে অপমানিত হলে রাবণের প্রাসাদ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। হিংস্রভাব না থাকলে কেউ কাউকে হত্যা করতে পারে না। কুরুক্ষেত্রের মহারণাঙ্গণে অধর্মের প্রতিমূর্তি দুর্যোধনের সপক্ষে যুক্ত আক্রমণাত্মক গুরুতুল্য আত্মীয়বর্গকেও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে হত্যা করতে বদ্ধ পরিকর হলেন। এটি যথার্থ হিংসা। জীবহিংসা মহাপাপ। কৃষ্ণের নির্দেশে উদ্ভিদ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে ভগবানকে ভোগ নিবেদন পূর্বক মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলে কোনও দোষ হয় না। তামসিক পুরাণের নির্দেশ মতো মাংসভোজীরা একটি বিশেষ দিনে গভীর রাতে মা কালীর কাছে মন্ত্রযোগে পাঁঠা বলি দিয়ে বলির মাংস ভক্ষণ করতে পারে কিংবা মদ্যপায়ীরা একটি বিশেষ দিনে মা কালীর কাছে সুরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্বক সেই মদ্য পান করতে পারে। তামসিক লোকদের পক্ষে সেটা যথার্থ মাংস ভক্ষণ বা মদ্য পান রীতি বলা যেতে পারে। কিন্তু কলিযুগে সেই সব তামসিক শাস্ত্র নির্দেশও বরবাদ করে দিয়ে মানুষ পাইকারী হারে পশুহিংসা ও রোজ রোজ নেশাকর পদার্থ গ্রহণের প্রতি আগ্রহী হয়েছে যা সম্পূর্ণ বেদবিরোধী।

প্রশ্ন ৭৬। ধর্ম কি? ধর্মের স্বরূপ ও ধর্ম পালনের আবশ্যকতা কি? হিংসোন্মত্ত পৃথিবীতে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর ঃ ধর্ম হল ভগবানের দ্বারা নির্ধারিত মানব সভ্যতার জন্য আইনকানুন, *ধর্মংতু সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতম্।*

ধর্মের স্বরূপ হল, মানুষেরা ভগবানের নির্দেশমতো জীবন অতিবাহিত করবে।

ধর্ম পালনের আবশ্যকতা হল এই যে, ভগবৎ প্রীতি লাভ করে নিত্য সেবানন্দময় জীবনে উন্নীত হওয়া, অন্যথায় দুঃখময় জগতেই বদ্ধ পতিত থাকতে হবে।

পৃথিবীটা অধর্মে হিংসায় ভরে গেছে। সেই জন্যেই ধর্ম-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অধর্মের হিংসা প্রভাব যতই বৃদ্ধি পাক না কেন ধর্মকে টলাতে পারে না। দুর্যোধনেরা ছিল অধর্মের প্রতিমূর্তি, হিংসার আশ্রয়। কিন্তু ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরেরাই জয়ী হয়েছিলেন, যেহেতু ধর্মরক্ষক শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশেই তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন।

প্রশ্ন ৭৭। (ক) শুনেছিলাম প্রত্যেক মানুষের পুনর্জন্ম হয়, একমাত্র ভগবানের ভক্ত ছাড়া,

(খ) তা হলে রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষ ইত্যাদি বড় বড় মানুষদের পুনর্জন্ম হয়নি কেন?

(গ) আমি মনে করি না যে, কোন মানুষ অন্যায় না করে থাকতে পারে,

(ঘ) কারণ, আমরা জানি যে যুধিষ্ঠিরও 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বলার জন্য কিছুদিন নরকে বাস করতে হয়েছিল তাঁকে, তাঁদের পুনর্জন্ম হয়নি কেন?

(ঙ) না কি এমন হয় যে, মানুষ আগের জন্মে যে কাজ করে জীবন যাপন করে, তা পরজন্মে করে না?

(চ) যদি না করে, তা হলে আপনারা কোন্ ভিত্তির উপর নির্ভর করে বলেন যে, মানুষের পুনর্জন্ম হয়?

(ছ) তাছাড়া আমরা তো কারও পুনর্জন্ম দেখছি না, তবে কি করে বিশ্বাস করব?

উত্তর ঃ (ক) ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি শ্রীব্যাসদেব মহাভারতের সারকথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করেছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত অমৃত বাণী—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

অর্থাৎ, "হে অর্জুন! এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত গ্রহলোকই জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবর্তনশীল। কিন্তু হে কুন্তীপুত্র অর্জুন, আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।" (গীতা ৮/১৬)

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করলে আর এই দুঃখময় নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয় না।" (গীতা ৮/১৫)

(খ) রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ইত্যাদি বড় বড় মানুষেরা যে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেননি, তা ভুল কথা। কারণ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলছেন—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ (গীতা ২/২৭)

অর্থাৎ, "যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। এটা ধ্রুব সত্য। ...."

তস্মাৎ অপরিহার্যে অর্থে—এই জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন চক্র পরিহার করা যায় না। অতএব তাঁদের পুনর্জন্ম হয়েছে।

(গ) পরমনিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ (গীতা ৪/১৪)

"যিনি কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণ মগ্ন তিনি অবশ্যই চিৎজগতে উন্নীত হবেন, কারণ তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়।" চিন্ময় কর্ম জড়জাগতিক ন্যায় অন্যায় বিচারের অধীন হয় না।

(ঘ) মহারাজ যুধিষ্ঠির পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ ক্রমেই অশ্বত্থামা নামে একটি হাতি নিহত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। কথাটি মোটেই মিথ্যা নয়। ভগবানের নির্দেশ মতো চললে কেউ নরকগামী হয় না। *মহাভারতের* স্বর্গারোহণ পর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টভাবেই লেখা হয়েছে—

"ব্যাজেনৈব ততো রাজন্ দর্শিতো নরকস্তব।
ন চ তে ভ্রাতরঃ পার্থনরকার্হা বিশাম্পতে।
মায়ৈষা দেবরাজেন মহেন্দ্রেণ প্রযোজিতা।"

ইন্দ্রদেব যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'হে রাজন্! আপনাকে ছলক্রমে নরক দর্শন করানো হয়েছে। আপনার ভ্রাতাগণও কখনো নরকগমনের যোগ্য নন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রযোজিতা মায়া দ্বারাই আপনার ছল-নরক দর্শন হয়েছে।"

শ্রীমধ্বাচার্যপাদ লিখেছেন, "যুধিষ্ঠির স্বর্গে যে নরক দর্শনের অভিনয় করেছিলেন, তা নরক নয়; কারণ স্বর্গে নরকের অবস্থান নেই। সেটি ইন্দ্রজালের ন্যায় ইন্দ্রমায়া-সৃষ্ট নরক মাত্র......" (মহাভারত ৩২ অঃ ১০৮-১০৯ শ্লোক)

(ঙ) পরমনিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ (গীতা ৮/৬)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি যেরকম চেতনা নিয়ে বা যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করে, সেই চেতনার উপযুক্ত দেহধারণ করে সে জন্ম লাভ করে।"

মানুষ যতই ভাল বা বড় বলে সমাজে পরিগণিত হোক না কেন, তার চেতনা যদি অন্য কোনও জীবের মতো হয়, তবে সে অনুরূপ জীবদেহ লাভ করবে এবং সেই জীবের কার্যকলাপই করতে থাকবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ (গীতা ২/১৩)

অর্থাৎ, "দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই দেহী বা আত্মা এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এইরকম পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।"

আমাদের শৈশবের দেহ, কৌমার দেহ ও বার্ধক্যের দেহ—

এইভাবে এই জীবনে নানা রূপের দেহ গ্রহণ করছি আর সেই দেহের কর্মেরও বৈচিত্র্য রয়েছে। তেমনই জন্মান্তরে অন্য জীবদেহ গ্রহণ করলে সেই জীবনের অনুরূপ কর্ম করতে হবে। মানুষের দেহ, কুকুরের দেহ, কৃমিকীটের দেহ কিংবা দেবতার দেহ— যে কোনও দেহ লাভ হতে পারে। সেই দেহ লাভ হয় বর্তমান মানব জন্মের কর্ম ও চেতনা অনুসারে।

(চ) বেদশাস্ত্রেই রয়েছে পুনর্জন্মের কথা। পিতা সম্বন্ধে জানতে যেমন মাতা হচ্ছেন প্রামাণিক সূত্র। মাকে বাদ দিয়ে কেউ যদি তার কে পিতা হতে পারে, এই প্রশ্ন নিয়ে বাজারে যায়, তবে সে বাজারের লোকেদের মধ্যে একটা মূর্খ পাগল বলে পরিচিত হবে। কিন্তু যখন তার মা বলে, "দেখ বাছা, ইনি হচ্ছেন তোমার পিতা।" তখন আর সন্দেহ বিভ্রান্তি, জল্পনা-কল্পনা না করে মায়ের কথামতো সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পিতৃরূপে গ্রহণ করতেই হয়। অনুরূপভাবে, বেদশাস্ত্র মাতৃবৎ। বেদশাস্ত্র যখন বলেন, 'জীবের পুনর্জন্ম হয়', তখন কেউ যদি সেই কথা অবজ্ঞা করে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করে একটা মনগড়া মন্তব্য করে বসে, তবে সে একটা নাস্তিক গণ্ডমূর্খ-উদ্ভ্রান্ত ব্যক্তি রূপে পরিগণিত হবে।

(ছ) আপনি আপনার নিজের জন্মই দেখতে পাচ্ছেন না। আগের জন্ম কিংবা পরজন্মের কথা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দিলেও, কেবলমাত্র বর্তমান জন্মের ব্যাপারে আপনি আপনার নিজের জন্ম-ই দেখছেন না। কিভাবে মাতৃজঠরে ছিলেন, কিভাবে ভূমিষ্ট হয়ে দিনযাপন করছিলেন, সেগুলি আপনি বলতে পারেন না, কারণ সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া একমাত্র পরমেশ্বর ছাড়া কোনও বদ্ধ জীবের পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু যাঁরা জাতিস্মর, যাঁরা দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষ, তাঁরা বলতে পারেন যে, পূর্বজন্মে তিনি কি করছিলেন, কোথায় ছিলেন, কেন বর্তমানে এরূপ জীবন লাভ করেছেন ইত্যাদি। তাই প্রত্যক্ষদর্শী পরমেশ্বরের কথা কিংবা মুক্ত পুরুষদের কথা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পুনর্জন্ম বিশ্বাস না করাটা ধুরন্ধরতার পরিচায়ক নয়, সেটি গণ্ডমূর্খামিরই পরিচায়ক। সেই কথাও গীতাশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥

অর্থাৎ, "মূর্খেরা বুঝতে পারে না জীব কিভাবে দেহ ত্যাগ করে অথবা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিভাবে তার পরবর্তী শরীর সে উপভোগ করে। কিন্তু যিনি জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট, তিনি সমস্ত বিষয় যথাযথভাবে দর্শন করতে পারেন।" (গীতা ১৫/১০)

প্রশ্ন ৭৮। একজন মানুষের কিরূপ শিক্ষিত হওয়া উচিত? তার কথাবার্তা চলাফেরা কিরূপ হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য জগদ্‌গুরু শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের (১৩/৮-১২) শিক্ষা অনুসারে বিদ্যানুশীলন বিধেয় এইভাবে—

১। ব্যক্তিবিশেষকে প্রথমে শালীন ও নম্র স্বভাবী হতে হবে এবং অন্যকে সম্মান করতে শিখতে হবে।

২। নামযশের আশায় কখনই তিনি নিজেকে ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবেন না।

৩। কায়, মন কিংবা বাক্য দ্বারা তিনি কখনও অন্যের উদ্বেগের কারণ হবেন না।

৪। এমন কি অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হলেও তিনি ধৈর্য ধারণ করবেন।

৫। অন্যের সাথে ব্যবহারে তিনি কখনই কপটতা বা ছলনার আশ্রয় নেবেন না।

৬। তিনি পারমার্থিক শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করবেন। গুরুদেব তাঁকে ক্রমান্বয়ে পারমার্থিক উপলব্ধির স্তরে পৌঁছতে সাহায্য করবেন এবং সেই আচার্যের চরণে নিজেকে নিঃশর্ত সমর্পণ করে সেবা ও পারমার্থিক প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের দ্বারা গুরুদেবের প্রীতি সাধন করবেন।

৭। আত্মানুভূতির স্তর লাভের জন্য তিনি শাস্ত্রানুমোদিত বিধিনিষেধগুলি অবশ্যই পালন করে চলবেন।

৮। কায়মনোবাক্যে তিনি অবশ্যই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসরণ করে চলবেন।

৯। আত্মোপলব্ধির পথে ক্ষতিকর সব রকম কাজ থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকবেন।

১০। দেহের প্রতিপালনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বেশি কিছু তিনি সঞ্চয় বা গ্রহণ করবেন না।

১১। তিনি জড় দেহ ও দেহের সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মিথ্যা আত্মাভিমান করবেন না।

১২। তিনি সব সময়ই স্মরণ রাখবেন যে, যতক্ষণ তাঁর জড় দেহ থাকবে, ততকালই তাঁকে পুনঃপুনঃ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির সম্মুখীন হতে হবে। এই পার্থিব শরীরের যন্ত্রণা থেকে নিস্তার লাভের জন্য কোন পরিকল্পনাই সফল বা কার্যকরী হবে না। আত্মস্বরূপ উপলব্ধির পথ অন্বেষণই একমাত্র উত্তম পরিকল্পনা হবে।

১৩। ভগবৎ-সাধনার পথে উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া অন্য কিছুতেই তিনি আসক্ত হবেন না।

১৪। শাস্ত্রের নির্দেশনা ছাড়া তিনি স্ত্রী, পুত্র, গৃহাদিতে অধিক আসক্ত হবেন না।

১৫। চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে বা না হলে তিনি আনন্দিত বা দুঃখিত হবেন না।

১৬। অনন্য ভক্তি দ্বারা কায়মনোবাক্যে ঐকান্তিকভাবেই তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করবেন।

১৭। পারমার্থিক সাধনার পক্ষে অনুকূল শান্ত পরিবেশে বসবাসের জন্যই তিনি কামনা করবেন এবং অবৈষ্ণব-সমাকীর্ণ স্থান ত্যাগ করবেন।

১৮। অধ্যাত্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা নিত্য, কিন্তু জড় দেহের অবসানের সাথে সাথে জড় বিদ্যা বা জড় জ্ঞানের বিনাশ হয়। এই সত্য উপলব্ধি করে তত্ত্ব অনুসন্ধানী-বিজ্ঞানী কিংবা দার্শনিকের মতো পরমার্থ বিদ্যার অনুশীলন করবেন।

এই আঠারোটি নিয়মই প্রকৃত জ্ঞান বিকাশের পন্থা, এছাড়া আর সব কিছুই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা মাত্র।

প্রশ্ন ৭৯। জড় বিদ্যার কি কোনও মূল্য নেই?

উত্তর ঃ জড় বিদ্যা মানুষকে গাধার মতো পশু-স্তরেই নিয়ে আসে। তা আত্মচেতনাবিরোধী বা ভগবৎবিরোধী বিদ্যা বললেও চলে। জড় বিদ্যার উন্নতির জন্যই মানুষ গর্ববোধ করতেই পারে কিন্তু তারা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করে পশুপর্যায়ে নেমে এসেছে, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না, তবুও আঠারোটি নিয়মের বিরুদ্ধাচারণগুলি জড় বিদ্যায় ভূষিত তথাকথিত উন্নত মানুষের চরিত্রে ধরা পড়ে, যেমন—

১। তিনি শালীন ও নম্রস্বভাবী নন। অন্যের সঙ্গে উপহাস ও মজা করতে পটু।

২। নামযশের আশায় নিজেকে ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন করেন।

৩। অন্যকে উদ্বেগ দেওয়া, হিংসা করা তাঁর কর্ম।

৪। ধৈর্যগুণ তো দূরের কথা, ছোটখাটো কথাই তিনি সহ্য করেন না।

৫। সহোদর ভাই, নিজ পরিবার, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও তিনি কপটতা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

৬। তিনি পারমার্থিক গুরুর সন্ধান করেন না। তিনি যদি কাউকে গুরুরূপে গ্রহণ করতে চান, সেই গুরু পারমার্থিক সদ্‌গুরু হন না। সহজিয়া, কুলগুরু, মায়াবাদী, যোগবিভূতি প্রদর্শনকারী এই ধরনের ব্যক্তির চরণে তিনি আশ্রয় নেন।

৭। তিনি আমিষভক্ষণে, নেশাসেবনে, জুয়ার আড্ডায়, অবৈধ সঙ্গের মধ্যে কোন না কোনটিতেই যুক্ত থাকেন।

৮। কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়া তিনি অন্য কিছুতে আগ্রহী নন।

৯। আত্মোপলব্ধির পক্ষে ক্ষতিকর সব রকমের কাজে প্রয়াসী হতে তিনি আগ্রহী। কিন্তু 'হরিভজন করতে সময় নেই' বলেই মন্তব্য করে বসেন।

১০। শুধু নিজ দেহ নয়, তাঁর আত্মীয় পরিবারের জন্য সারা বছরের যা খাদ্যাদি প্রয়োজন, তার অতিরিক্ত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তিনি অন্যদের সঙ্গে প্রতারণা বঞ্চনা করতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

১১। নিজ দেহ এবং দেহের সম্বন্ধে সম্বন্ধিত, অর্থাৎ পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র—এরাই আমার একান্ত আপন, এরাই আমার প্রাণের প্রাণ, এই মনোভাব পোষণ করেন।

১২। তিনি তাঁর জড় দেহকে সুসজ্জিত করা এবং মনকে জড়সুখ দানের জন্য সব রকমের পরিকল্পনা করে চলেন। ফলস্বরূপ তিনি জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় ভবসাগর থেকে উদ্ধার পান না।

১৩। ভগবৎ সাধনার পথে উন্নতির জন্য তিনি আসক্ত নন; অপ্রয়োজনীয় বিষয়েই তিনি আসক্ত হন।

১৪। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করেই তিনি স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত হন।

১৫। প্রিয় জিনিস পেলে উল্লসিত এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হন।

১৬। শ্রীকৃষ্ণভক্তিকে মনগড়া কোন কিছু বলে মনে করেন।

১৭। জড়জাগতিক উন্নতির পক্ষে যত সুখসুবিধা পাওয়া যায়, সেই পরিবেশেই তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন।

১৮। জড় দেহ অনিত্য জেনেও জড়া বিদ্যা অর্জনই তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তিনি অনেক সময় বলেন—মরে গেলে এই জীবনের সব শেষ, তাই এই জীবনেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চেষ্টা করা উচিত।

এইভাবে জড়াবিদ্যা গ্রহণ করে মানুষ পশুর মতোই আচরণ করে।

প্রশ্ন ৮০। সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কে?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির দিব্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলাসমূহ (১) শ্রবণ, (২) কীর্তন ও (৩) স্মরণ করা; (৪) ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করা; (৫) ষোড়শ উপচারে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের অর্চনা করা; (৬) ভগবানের বন্দনা, স্তুতি প্রার্থনা নিবেদন করা ও প্রণাম জানানো; (৭) তাঁর দাস হওয়া; (৮) ভগবানকে প্রিয়তম বন্ধু বা সখা বলে মনে করা এবং (৯) ভগবানের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করা অর্থাৎ কায় মনো বাক্যে তাঁর সেবা করা—এগুলি শুদ্ধভক্তির নয়টি পন্থা। যিনি এই নবধা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তাঁর জীবন অর্পণ করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান, কারণ তিনি পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন।" (ভাঃ ৭/৫/২৩-২৪)

প্রশ্ন ৮১। সাধু কাকে বলে?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (গীতা ৯/৩০) উল্লেখ করেছেন—
"যে ব্যক্তি অনন্য ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে, সে-ই সাধু।" তেমনি, *যঃ মাং ভজেৎ স সত্তমঃ* (শ্রীমদ্ভাগবত)—"যে আমারই ভজনা করে সে-ই সর্বোৎকৃষ্ট সাধু।"

প্রশ্ন ৮২। আমাদের পরম ধর্ম কোন্‌টি?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥

"নাম সংকীর্তন দ্বারা শ্রীভগবান বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ,—এই পর্যন্তই ইহজগতে জীবসকলের পরমধর্ম বলে কথিত।"

প্রশ্ন ৮৩। মহাজন নির্দেশিত পথই গ্রহণীয়। কিন্তু মহাজন কে?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ মহাজনের নাম উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই হরিভজনের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই দ্বাদশ মহাজন হলেন—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

"(১) শ্রীব্রহ্মা, (২) শ্রীনারদ মুনি, (৩) পার্বতীপতি শ্রীশিব, (৪) ব্রহ্মা পুত্র শ্রীসনৎকুমার, (৫) দেবহূতিপুত্র শ্রীকপিলদেব, (৬) মানবজাতির পিতা শ্রীস্বায়ম্ভুব মনু, (৭) প্রহ্লাদ মহারাজ, (৮) সীতাদেবীর পিতা রাজর্ষি জনক, (৯) গঙ্গাপুত্র শ্রীভীষ্মদেব, (১০) দৈত্যরাজ বলি, (১১) ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামী এবং (১২) মৃত্যুর দেবতা শ্রীযমরাজ।

প্রশ্ন ৮৪। জগতে কত প্রকারের জীব রয়েছে?

উত্তর ঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষণম্ ॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষা ॥

"৯,০০,০০০ জলজ প্রাণী, ২০,০০,০০০ গাছপালা, ১১,০০,০০০ কৃমি, কীট, সরীসৃপ ইত্যাদি, ১০,০০,০০০ পক্ষী, ৩০,০০,০০০ পশু এবং ৪,০০,০০০ মানুষ। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডে মোট ৮৪,০০,০০০ প্রকার জীবযোনি রয়েছে।"

প্রশ্ন ৮৫। গুরুগ্রহণের প্রয়োজন কি?

উত্তর ঃ আমরা যদি এই দুঃখময় জড়জগতে লক্ষকোটি বার জন্ম আর মৃত্যু নিয়ে ভবচক্রে ঘুরপাক খেতে না চাই, এই যন্ত্রণাময় জন্মমৃত্যুর পরপারে চিরশাশ্বত আনন্দময় বৈকুণ্ঠ বা ভগবৎ ধামে উন্নীত হওয়ার বাসনা করি তবে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই ভগবৎ প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

অর্থাৎ, "এই মনুষ্যদেহ সকল ফলের মূল এবং শ্রেষ্ঠ; বহু জন্মের পরে আমরা এই দেহটি লাভ করেছি। এটি একটি মজবুত নৌকার মতো। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন কর্ণধার বা মাঝি যিনি কৃষ্ণকৃপালাভের অনুকূল বায়ুর দ্বারা এই নৌকাটিকে পরিচালিত করবেন। এরূপ সুন্দর মনুষ্যজন্ম লাভ করেও যে ব্যক্তি এই জন্মমৃত্যুময় ভবসংসার সমুদ্র পার হতে চেষ্টা না করে, সে আত্মঘাতী।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/২০/১৭)

শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থে বলা হয়েছে—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে ।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥

অর্থাৎ, শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করার মানেই হল ভক্তিকে আশ্রয় করা। শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে তাঁর কৃপা লাভ করা যায়। যার ফলে এই জন্মমৃত্যুময় ভবসংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করা যায়।

গুরুমুখপদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা ।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি,
যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা ॥
(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীগুরুদেবের নির্দেশবাক্য হৃদয়ে বহন করা, শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করাই আমাদের কাম্য। অন্য কিছু চাইবার প্রয়োজন নেই। তাঁর কৃপাফলেই সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন ।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯/১৫১)

শ্রীমুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

অর্থাৎ, "ভগবদ্ বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করবার জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি উপহার হস্তে বেদ তাৎপর্য জ্ঞানী কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর কাছে কায়মনোবাক্যে গমন করবেন।" (মুণ্ডক ১/২/১২)

বেদান্তসার শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

জনমমরণাদি-সংসারানল-সন্তপ্তো দীপ্তশিরা জলরাশিমিব ।
উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি ॥

অর্থাৎ, "মাথা জ্বলে উঠলে লোক যেমন জলের কাছে যায়, সেইরকম জন্মমৃত্যুর সংসার আগুনে সন্তপ্ত হয়ে শিষ্য উপহার হাতে বেদবেদান্তপারগ ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের কাছে গমন করে এবং তাঁর অনুগত হয়।"

প্রশ্ন ৮৬। সাধারণ লোক ধর্ম বিষয়ে শ্রদ্ধা করে থাকে। এ কথাটি কি ঠিক নয়?

উত্তর ঃ বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রদ্ধা বিভিন্ন রকমের। যেটা ধর্ম নয়, সেটাও ধর্ম বলে মনে করে শ্রদ্ধা করে থাকে। সেই জন্যে শ্রদ্ধা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৫/২৭) ভগবানের উক্তি হল—

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম শ্রদ্ধা তু রাজসী ।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা ॥

অর্থাৎ, "আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাদিতে যে শ্রদ্ধা, তা সাত্ত্বিকী। কর্মকাণ্ডে যে শ্রদ্ধা, তা রাজসী। আর অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে যে শ্রদ্ধা, তা তামসী। আমার (কৃষ্ণের) সেবায় যে শ্রদ্ধা তা নির্গুণ বা শুদ্ধ সাত্ত্বিকী।"

প্রশ্ন ৮৭। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৯/২) আছে ব্রজপুরে গো সহিত ছাগ ও মহিষ ছিল। আমরা জানি ছাগ-মহিষের দুধ ভগবদ্ সেবায় নিষিদ্ধ আছে। তবে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন ছাগ-মহিষ পালন করেছিলেন?

উত্তর ঃ যখন দাবানল শুরু হয় অর্থাৎ, বনে আগুন লাগল তখন গো, ছাগ, মহিষ সব পশুই একই সঙ্গে দাবানলে সন্তপ্ত হয়ে ক্রন্দন করতে করতে ঈষিকা বনে প্রবেশ করল। এই কথাই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে। অতএব সব পশুকে তখন দলে দলে একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছিল, তাই বলে শ্রীকৃষ্ণ ছাগ ও মহিষ পালন করেছিলেন এরূপ বোঝায় না।

দ্বিতীয়ত, কেবল-যে দুধ পাওয়া যাবে সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ পশুদের পালন করছেন, এরূপ ধারণা যথার্থ নয়। বানর, ময়ূর, ঘোড়া এগুলিকে পালন করা হয় তাদের থেকে দুধ পাওয়ার জন্য নয়।

তৃতীয়ত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল গাভীই কেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব জীবের পালনকর্তা। পিঁপড়ে, বোলতা, টিকটিকি থেকে শুরু করে হরিণ, হাতি, বাঘ সব প্রাণীরই তিনি পালনকর্তা। আমাদের মনে হতে পারে একটা পিঁপড়ে কিংবা বোলতা আমাদের কি উপকারে আসছে? তাদের পালন করার কি তাৎপর্য আছে, তারা তো ভগবানের সেবার মধ্যে কিছুই করছে না। কিন্তু তবুও ভগবান তাদের এই জগতে বাস করার সুযোগ দিয়েছেন।

চতুর্থত, আমাদের কাছে লাভ-ক্ষতি সুখ-দুঃখের নানা হিসাব থাকতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ লাভ-ক্ষতি সুখ-দুঃখে চির-অবিচলিতই থাকেন। তিনি সকল দ্বৈতভাব বা দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে, তাঁর কোন অভাব নেই। অতএব দুধ পাওয়া যাবে কিংবা কিছু লাভ হবে এরূপ হিসাব করার তাঁর কোন প্রয়োজন নেই।

পঞ্চমত, কেবল দুধের জন্যই পশুপালন করা হয় তা নয়, লোকে ঘোড়া মহিষ গাধা পালন করে লাঙ্গল টানা, গাড়ি টানা, নানা বোঝা বহন করার কাজেও পশুপালন করে।

ষষ্ঠত, কৃষ্ণ গো-পালনের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। গোদুগ্ধই সমগ্র মানব-সমাজকে সুস্থ উজ্জ্বল ও আনন্দময় করে তোলে। কিন্তু বর্তমান মানুষ দুধের জন্যই কেবল নয়, রক্ত-মাংস খাওয়ার জন্যও পশুপালন করছে। যা মানবসমাজকে উগ্র হিংস্র ও স্বার্থপর করে তোলে।

বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণনা করেছেন যে, রক্ত-মাংস সমন্বিত দেহটাকে নিয়ে কুকুর, শেয়াল ও শকুনেরা ভোজ মহোৎসব করে। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রতিদিন রক্ত-মাংস সমন্বিত দেহটাকে নিয়ে মানুষেরাই ভোজ মহোৎসব করছে। কসাইখানায়, অলিতে গলিতে, হোটেলে, পথেঘাটে, জুয়াখেলার মাঠে, সমুদ্র সৈকতে, ঘরের মধ্যে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে রক্ত-মাংসের ভোজ মহোৎসব হচ্ছে। মানুষ তাই গরু, শূকর, ঘোড়া, ছাগল, মোরগ, মাছ ইত্যাদি প্রাণীদের পালন করছে, পাইকারী হারে কাটছে আর খাচ্ছে। এই সমস্ত ভোজ উৎসব করা হচ্ছে একমাত্র যমপুরীর দ্বারস্থ হওয়ার জন্য, সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন ৮৮। মহর্ষি ব্যাসদেব মানব সমাজের জন্য যে অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেছিলেন সেগুলি কি কি?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৭/২৩-২৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দ সংজ্ঞিতম্॥
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্॥

অর্থাৎ, আঠারোটি পুরাণ হল—(১) ব্রহ্মপুরাণ (২) পদ্মপুরাণ (৩) বিষ্ণুপুরাণ (৪) শিবপুরাণ (৫) লিঙ্গপুরাণ (৬) গরুড়পুরাণ (৭) নারদীয়পুরাণ (৮) ভাগবতপুরাণ (৯) অগ্নিপুরাণ (১০) স্কন্দপুরাণ (১১) ভবিষ্যপুরাণ (১২) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (১৩) মার্কণ্ডেয়পুরাণ (১৪) বামনপুরাণ (১৫) বরাহপুরাণ (১৬) মৎস্যপুরাণ (১৭) কূর্মপুরাণ (১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

মহর্ষি ব্যাসদেব মানব সমাজের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রেণীর মানুষদের উদ্দেশ্যে এই সকল পুরাণ লিখেছেন। সেই পুরাণ সমূহকেও ছয় ছয়টি করে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

সাত্ত্বিক পুরাণে ভগবান শ্রীহরির মহিমাই অধিক বর্ণিত হয়েছে। রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমার আধিক্য এবং তামসিক পুরাণে অগ্নি শিব ও দুর্গার মহিমা অধিক রূপে কীর্তিত হয়েছে।

ব্রহ্মবৈবর্তে উল্লেখ করা হয়েছে—

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চতথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে॥
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ।

মনীষিগণ বিবেচিত ছয়টি সাত্ত্বিক পুরাণ হল—(১) বিষ্ণুপুরাণ (২) নারদীয়পুরাণ (৩) মঙ্গলময় ভাগবতপুরাণ (৪) গরুড়পুরাণ (৫) পদ্মপুরাণ এবং (৬) বরাহপুরাণ।

ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥

ছয়টি রাজসিক পুরাণ হল—(১) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (২) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (৩) মার্কণ্ডেয়পুরাণ (৪) ভবিষ্যপুরাণ (৫) বামনপুরাণ এবং (৬) ব্রহ্মপুরাণ।

মাৎস্যং কৌর্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥

ছয়টি তামসিক পুরাণ হল—(১) মৎস্যপুরাণ (২) কূর্মপুরাণ (৩) লিঙ্গপুরাণ (৪) শিবপুরাণ (৫) স্কন্দপুরাণ এবং (৬) অগ্নিপুরাণ।

প্রশ্ন ৮৯। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে কার কার শ্রীচরণে তুলসীপত্র দেওয়া বিধেয়?

উত্তর ঃ পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে তিনজন বিষ্ণুতত্ত্বের শ্রীচরণে তুলসীপত্র নিবেদন করতে হয়। যেমন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—গৌরহরি, শ্রীবলরাম—নিত্যানন্দ প্রভু এবং মহাবিষ্ণু—অদ্বৈত আচার্য প্রভু। বাকি দুইজন শক্তিতত্ত্বের শ্রীচরণে তুলসীপত্র নিবেদন নিষিদ্ধ। যেমন, শ্রীরাধারাণী—গদাধর প্রভু এবং শ্রীনারদ অবতার—শ্রীবাস ঠাকুর।

প্রশ্ন ৯০। আমরা যদি জন্মগতভাবেই পাপী হয়ে থাকি, তবে কি করে ভক্ত হব?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, মানুষ যত পাপী হোক না কেন, আমাদের জানতে হবে শুদ্ধভক্তের কৃপার ফলে পাপী মানুষেরাও তাদের পাপপঙ্কিল জীবন থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে, তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। মানুষকে কেবল কৃষ্ণভক্তির পন্থার দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে। এভাবে সকলেই তাদের নিজ প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। সেই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

"হে পার্থ, যারা আমার শরণ গ্রহণ করেছে, তারা যদি জন্মগত ভাবে পাপী হয়ে থাকে (পাপযোনি সম্ভূত),—স্ত্রী, বৈশ্য বা শূদ্রও হয়—তবুও তারা পরমগতি লাভ করবে।" (গীতা ৯/৩২)

প্রশ্ন ৯১। আমরা হরিনাম করলে মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠ লোকে ফিরে যাবো। এর প্রমাণ কি?

উত্তর ঃ প্রাথমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মাধ্যমিকে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা আসে। এটি শিক্ষাপর্ষদের নিয়ম কানুন। হরিনাম স্মরণ করতে করতে মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠগতি লাভ হয় এটি গীতা ভাগবত শাস্ত্রের নিয়ম কানুন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে দেখতে পারেন, কেউ প্রাথমিক শিক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল সে তারপর যথারীতি মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরূপ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তেমনি হরিনাম করতে করতে কেউ যদি দেহ ত্যাগ করে, তবে বৈকুণ্ঠগতির আভাস তার চোখেমুখের ভঙ্গিমা থেকে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। শান্ত, স্নিগ্ধ ভাব ফুটে উঠে। নরকগতি হলে মৃতদেহে আতঙ্কসূচক অবস্থা প্রতীয়মান হবে। এটি মৃতদেহ দেখে সনাক্তকরণ করা যায়। কিন্তু দেহত্যাগকারী জীবাত্মা তো দেখতে পাচ্ছে। আমরা যখন যাব আমরা দেখতে পাব আমরা কিভাবে কোথায় চলেছি। তা হলেই তো চাক্ষুষ প্রমাণ মিলবে।

প্রশ্ন ৯২। গৃহস্থধর্ম বড়, না সন্ন্যাস ধর্ম বড়? এবং কেন?

উত্তর ঃ চার আশ্রমের মধ্যে প্রথমেই ব্রহ্মচারী, তারপর গৃহস্থ, তারপর বানপ্রস্থ এবং শেষে সন্ন্যাস। এভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর হচ্ছে সন্ন্যাস আশ্রম। প্রতি আশ্রমের বহু নিয়মকানুন ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। ব্রহ্মচারীগণ গৃহস্থ হতে পারেন অথবা সরাসরি সন্ন্যাসী হতে পারেন।

একজন আদর্শ গৃহস্থের ধর্ম হল, গৃহে কৃষ্ণ আরাধনা করা এবং গৃহের সদস্যদেরকে যথাযথভাবে ভরণপোষণ করা এবং কৃষ্ণভক্ত করে গড়ে তোলা। আর ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসীদের যত্ন সেবা শুশ্রূষা করা এবং সন্ন্যাসীর কাছ থেকে হিতোপদেশ গ্রহণ করা।

একজন আদর্শ সন্ন্যাসীর ধর্ম হল, জগতের সমস্ত স্তরের মানুষকে কৃষ্ণভজনের জন্য প্রেরণাদান এবং কৃষ্ণভক্তি মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচার করা। সুতরাং চার আশ্রমের মধ্যে নিজনিজ আশ্রমের ধর্ম যথাযথভাবে যিনি পালন করছেন তিনিই বড়।

প্রশ্ন ৯৩। মাথা ন্যাড়া না করে কৃষ্ণনাম করলে কি ভগবানকে পাওয়া যাবে না?

উত্তর ঃ কলিযুগের মানুষ চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, চুলের পরিপাটী চিন্তায় দিবসের অনেকটা সময় অতিবাহিত করেই থাকে। শাস্ত্রে দেখা যায় ব্রহ্মচারীগণ মস্তকমুণ্ডন করে শিখা ধারণ করে পারমার্থিক শিক্ষা অনুশীলনে ব্রতী হন।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় দর্শন ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাথার চুল। কাটোয়াতে সন্ন্যাস গ্রহণ কালে যথাবিধি মস্তক মুণ্ডনের জন্য মধু-নাপিতকে নির্দেশ দিলে, নাপিত তো চুলে হাত দিতেই চাইলেন না, আর অন্য উপস্থিত জনেরা কান্না করে বলতে লাগলেন, চুল থাক্। এভাবেই সন্ন্যাস গ্রহণ করলে ক্ষতি কি? কিন্তু মহাপ্রভু নাপিতকে তখন বাধ্য করেছিলেন।

প্রশ্ন ৯৪। বালক বয়সে ধর্মকর্ম আলোচনায় যুক্ত হওয়ার দরকার নেই। একথা কি রকম?

উত্তর ঃ আমাদের তবে কোন্‌টি আলোচনা করা দরকার আছে? ধর্ম আর কর্ম বাদ দিয়ে তবে কি অধর্ম বিধর্ম আর বিকর্ম কুকর্ম আলোচনা করা দরকার? বালক বা কিশোর বয়স খেয়াল-খুশিমতো কিংবা জড়বিদ্যা ও খেলাধুলায় যে কাটায় সেই মূঢ়ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে জীবনের অসারতা মাত্রই লাভ করে থাকে। তখন আর ধর্ম-কর্মের বয়স থাকে না। প্রহ্লাদ মহারাজ এই শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রশ্ন ৯৫। আমরা যদি গাছপালা, কীট পতঙ্গ বা পশুপাখি হয়ে জন্ম নিই, তবে সেই সব জীবনে আমাদের কি বোঝার ক্ষমতা থাকবে যে পূর্ববর্তী জীবনে পাপকর্মের ফলে এই নিম্নযোনি প্রাপ্ত হয়েছি? যদি না বোঝা যায় তবে আমাদের উচিত শিক্ষা হল কি? তা না হলে মানুষ পাপকর্ম করা থেকে বিরত হবে কেমন করে?

উত্তর ঃ আমাদের পূর্ববর্তী জীবনের বাসনা অনুসারে আমরা পরবর্তী জীবন লাভ করি। বর্তমানে যে জীবন পেয়েছি তা পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ। ৮৪,০০,০০০ প্রকার জীবযোনির মধ্যে কোন্‌টাতে পরবর্তী জন্মগ্রহণ করত তা নির্ভর করছে এই জীবনে এই জগতে আমাদের কার্যকলাপের প্রকৃতির উপর। আর এ সম্বন্ধে মানুষই একমাত্র বুঝতে পারে। কারণ মানুষের চেতনা শক্তি অন্য যে কোন প্রাণীর চেয়ে বহু উন্নত। বৈদিক জ্ঞান বা সনাতন শিক্ষা চর্চা মানুষের জন্য। অন্য প্রাণীর জন্য নয়। তাই মানুষকেই বলা হয় বিচারবুদ্ধি বিশিষ্ট জীব। গাছপালা পশুপাখি কীটপতঙ্গের যে সমস্ত কার্যকলাপ—সেই কার্যের কোনও পাপপুণ্যের বিচার নেই। তাই তাদের স্বাভাবিক দেহের ধর্ম অনুসারে তারা আহার-বিশ্রাম-আত্মরক্ষা-মৈথুনাদি কর্ম করে। তাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য তারা তাদের শরীরের উপযুক্ত জিনিস গ্রহণ করে। তাতে তাদের পাপও হয় না, পুণ্যও হয় না।

দুঃখময় জগতে যদিও সেই সব নিম্নযোনিজাত জীব বুঝতে পারে না যে তাদের প্রতিদিন কত কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে বা কত সুখ পাচ্ছে, কিন্তু মানুষের মতো তাদের প্রত্যেকের দুঃখ পেতেই হচ্ছে। এবার প্রশ্নানুসারে তাদের উচিত শিক্ষা হল কিনা—তা বুঝতে হলে মানব জীবনেই বুঝতে হবে। কারণ নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা জন্মান্তর চক্রের বিধান অনুসারে ক্রমান্বয়ে উন্নততর দেহ প্রাপ্ত হবে। এবং একদিন মানবদেহ গ্রহণ করারও সুযোগ পাবে।

একমাত্র মানুষের জীবনেই পাপপুণ্যের বিচার করা হয়েছে। পরমেশ্বরের আইন-কানুন মানুষ ভঙ্গ করলে তাকে দেহান্তে অন্য কোন নিম্নযোনিতে প্রবেশের আগে ব্রহ্মাণ্ডের নরক নামক লোকে যেতে হয়। সেখানে বিচার বিভাগের দণ্ড অনুসারে অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি পাওয়ার জন্য একটি যাতনা-শরীর দেওয়া হয়। সেই শরীরের বৈশিষ্ট্য

হল—অতি ভয়ংকর যাতনা পেয়েও সে শরীরটি বিনষ্ট হয় না। সাধারণ দেহের ক্ষেত্রে দেহ নষ্ট হয় অর্থাৎ, মৃত্যু ঘটে অথবা অচেতন হয়ে পড়ে। কিন্তু যাতনা-শরীরে যথোপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে করতে যখন ভীষণ আকৃতির যমদূতেরা সাজা উপযুক্ত হয়েছে বলে মনে করে, তখন তারপর তাকে আর একটা যে কোনও যোনিতে জন্মগ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করে। নরক এবং নরকের শাস্তির কথা ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু শাস্তি পেলেই যে উপযুক্ত শিক্ষা হবে এবং পাপকার্য থেকে বিরত হবে মানুষ—এটা ভুল ধারণা। যেমন চোর চুরি করার জন্য পুলিশের হাতে খুব শাস্তি পেয়ে জেলে ঢুকল। যখন জেল থেকে বেরিয়ে এল তখন কি সে চুরি করা বন্ধ করে দেবে? না, আবারও সেই চুরি করবার চেষ্টা করবে, আবার মার খাবে। অর্থাৎ, শাস্তি পেয়েও শিক্ষা হয় না। অনেক সময় অতিরিক্ত ধূমপান করে একজন যক্ষায় আক্রান্ত হয়। দেখা যায় সেও সংকল্প করে 'আর সিগারেট ছোঁব না'। ডাক্তার তাকে সুস্থ করে দেওয়ার পর কখনও দেখা যায় সে সিগারেটের ধোঁয়া খাচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রসূতি মহিলা প্রতিবার গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করার সময় মনে মনে সংকল্প করে—আর কোনদিন সে গর্ভধারণ করবে না। একে প্রসববৈরাগ্য বলা হয়। কিন্তু প্রসবের পর সে সব যন্ত্রণাই ভুলে যায় এবং পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ করে। এই সমস্ত হচ্ছে জীবের দুঃখ কষ্ট ভোগের প্রকৃতি। অর্থাৎ, জীব দুঃখভোগ করতেই এগিয়ে আসে। শাস্তিগুলোকে ভুলে যেতে চায়।

আবার শাস্তিগুলো যদি স্মৃতিতে এসে ভীড় করে, তবে আমাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আমরা উন্মাদ হয়ে পড়ব। মনস্তত্ত্ববিদ্ মাত্রই সে কথা জানেন। কোন ভয়ংকর ঘটনার স্মৃতি, কোন শোকজনিত ঘটনার স্মৃতি যদি মানসপট থেকে সরানোর জন্য কোন ব্যবস্থা না করা হয় তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উন্মাদ হয়ে পড়বে।

অতএব মানুষ মাত্রেরই জানা উচিত আমাদের কার্যকলাপ চিন্তাভাবনা কিরূপ হওয়া দরকার। পাপকর্ম থেকে বিরত হলেই যে আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে—তা নয়। এমন কি বহু পুণ্যকর্ম করার ফলে কোন মানুষ স্বর্গলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করার জন্য দেবতা হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেও সমস্যাটি থেকেই যাবে। কেননা সুখ ভোগ করতে করতে ক্রমশ তার সঞ্চিত পুণ্য হ্রাস পেতে থাকে এবং একসময় পুণ্য শেষ হয়ে গেলে আবার মনুষ্য লোকে মানবযোনিতে জন্ম গ্রহণ করতে হবে। পুনরায় সে পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে নরক গমন করতে পারে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন—'মন্মনা ভব'—আমাতে মন দাও। অর্থাৎ, আমাদের মন আমাদের সেবাপ্রবৃত্তি সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। ফলস্বরূপ, জন্মান্তের চক্রে পড়ে ঘূর্ণিপাক খাওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়বে না। কেবল মাত্র কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপ করে ভগবানের চির শাশ্বত সচ্চিদানন্দময় দিব্য ধামে আমরা যাত্রা করতে পারি। যেখানে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির—

অর্থাৎ, দুঃখময় জগতের জড়া-প্রকৃতির নিয়ম বা বিধান নেই। সবই পূর্ণানন্দময়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবেন।

যিনি বুদ্ধিমান তিনি দেখে অথবা শুনে শিক্ষা পেতে পারেন কিন্তু মূর্খ ব্যক্তির শতশত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেও শিক্ষা হয় না। অতএব শাস্তি সম্বন্ধে জানতে পারলেই যে পাপকর্ম লোকে ছেড়ে দিবে—এটা ঠিক ধারণা নয়। বরং যে ব্যক্তি পরম নিয়ন্তার শরণ নেন, ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদ্ সেবায় আত্ম নিয়োজিত, সেই ব্যক্তির কোন জড় আসক্তি নেই। জড় জাগতিক কাজকর্মে তিনি লালায়িত হন না। তাঁর শুদ্ধভক্তি-চেতনার জন্য তিনি পাপকর্ম ত্যাগ করেন। ভগবদ্ভক্তি আর জড়জাগতিক আসক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করেছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমি জড় এবং চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছুই আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব জেনে যাঁরা শুদ্ধভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন, তারাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী।"

প্রশ্ন ৯৬। একজন নাস্তিক ব্যক্তি কি কখনও সুখী হতে পারে না?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই সুখী হতে পারে। বরং যাদের মধ্যে ভগবৎ চেতনা নেই, তারা অনেক সময় এই জগতে বেশী বেশী সুখ ভোগ করতে পারে।

যেমন, একটি শূকর প্রত্যেক দিন বহু লোকের মল-মূত্র এবং নানা রকমের পচা নোংরা জিনিস খেয়ে খুব সুখে নর্দমার মধ্যে জীবন যাপন করতে পারে। তার বিরাট পরিবারে—বহু শূকরী, বহু বাচ্চা-কাচ্চা এবং সুস্থ সবল নাদুশ-নুদুশ চেহারা নিয়ে সে নর্দমার স্নিগ্ধ-শীতল দুর্গন্ধযুক্ত পচা পাঁক সর্বাঙ্গে মেখে অতীব সুখে নিদ্রা যেতে পারে। সেটা শূকরের কাছে যেমন স্বর্গসুখের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দময় অক্ষয় দিব্য ধামের কথা যারা মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে দেয় না, তাদের এই শূকরের মতোই এই জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুময় জগতে সুখভোগাকাঙ্ক্ষা নিয়ে জন্ম জন্মান্তরে ঘুরতে হবে।

অবশ্য শূকর কিংবা কৃমিকীট ইত্যাদি জীবনে সুখভোগ করার সুবিধা রয়েছে, সেই তুলনায় মানুষের ক্ষেত্রে সুখভোগের তাগিদে অনেক পরিশ্রম, উদ্বেগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু যাঁরা প্রকৃতপক্ষে আস্তিক, তাঁরা জানেন যে, জগৎ দুঃখময়। তাই তাঁরা নিত্য শাশ্বত জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

জগৎ দুঃখময়—এই কথাটি সর্ব শাস্ত্রে নির্দেশিত। কোনও বৈদিক শাস্ত্রে এই জগৎকে সুখময় বলে উল্লেখ করা হয়নি। অতএব যারা ভগবান বা বেদকে মানে না, সেই সব নাস্তিকদের এই জগতে পশুর মতো অনিত্য সুখভোগের আশায় পাগলামি করা নিরর্থক। আর নাস্তিকেরা যদিও পশুর মতো দেহ সুখে উন্মত্ত, অসংখ্য বদ অভ্যাস এবং কুকর্মের

শিকার হয়ে তাদের দুঃখেরও শেষ নেই, যদিও শূকরের মতোই তারা তাদের দুঃখ সম্বন্ধেও অজ্ঞ।

প্রশ্ন ৯৭। 'যত মত তত পথ' এই কথাটি বুঝিয়ে দেবেন?

উত্তর ঃ বিভিন্ন মত অনুসারে বিভিন্ন পথ রয়েছে। যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৫) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—দেবদেবীদের উপাসনা করে স্বর্গে যাওয়া যায়; ভূত-প্রেতলোকে যেতে হলে ভূত-প্রেতের উপাসনা করতে হবে, চির-আনন্দময় ভগবদ্ধামে যেতে হলে ভগবানেরই উপাসনা করতে হবে।

ঠিক তেমনি, এই জন্মের চিন্তাভাবনা পরবর্তী জীবনে বর্তায়। এই জীবনে যদি মাছ-মাংস খাওয়ার প্রতি লোভ থাকে, তবে পরবর্তী জন্মে বক, শেয়াল কিংবা কোন মাংসভুক্ জীবযোনিতে জন্ম নিতে হবে। এটিই হল জড়া প্রকৃতির বিধান। বেদ-বিরুদ্ধ আচরণ যে অবলম্বন করে চলে, তার জন্য নরকের পথও রয়েছে।

তাই কখনই মনে করা উচিত হবে না যে, যে কোনও মত বা পথ অবলম্বন করে ভগবানের কাছে যাওয়া যাবে। যে কোনও পথে ভগবদ্ধামে যাওয়া যায়—এ কথা উন্মাদের প্রলাপ মাত্র।

আবার দেখা যায় শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৩/৫২) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন যুগে ভগবানকে লাভ করবার পন্থা ভিন্ন রকমের। যেমন সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চনা এবং কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন।

কলিযুগে অল্প আয়ু, ক্ষীণ বুদ্ধি, নানা ব্যাধি নিয়ে মানুষ রয়েছে। তাই কলির মানুষের একমাত্র পন্থা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম-সংকীর্তন করা। বৃহন্নারদীয় পুরাণে উল্লেখ আছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

অর্থাৎ, "এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নামই একমাত্র পথ। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।"

কলিসন্তরণ-উপনিষদে বলা হয়েছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্ ।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

অর্থাৎ, 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কলিকলুষনাশকারী, এর চেয়ে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উপায় সমগ্র বেদের মধ্যেও দেখা যায় না।"

ব্রহ্মা আদি শ্রীগুরুপরম্পরা সূত্রে এই হরিনাম গৃহীত। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে তন্যৎ কল্পিতং পদম্ ।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ ॥

তত্ত্ব-বিরোধ-সম্পৃক্তং তাদৃশং দৌর্জনং মতম্ ।
সর্বথা পরিহার্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা ॥

অর্থাৎ, "এই মহামন্ত্র বাদ দিয়ে যারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলে ব্যাখ্যা করে, তারা শাস্ত্র ও গুরু লঙ্ঘনকারী। অতএব আত্ম-হিতার্থী ব্যক্তি সর্বদা সর্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধী মত-পথগুলিকে দুর্জনের সঙ্গ জ্ঞানে পরিত্যাগ করবেন।" (অনন্ত-সংহিতা)

প্রশ্ন ৯৮। ভগবদ্ভক্তি যদি মনুষ্য জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে জগতের অধিকাংশ মানুষ ভক্তজীবন গ্রহণ করে না কেন?

উত্তর ঃ ভগবদ্ভক্তি ছাড়া জীবন অনর্থক—এই কথাটি বহু মানুষ বোঝে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, চার শ্রেণীর দুষ্কৃতকারী মানুষ ভক্ত হতে চায় না।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

প্রথম শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীরা হল 'মূঢ়াঃ' অর্থাৎ, পশুর মতো। তারা দিনরাত গাধার মতো কঠোর পরিশ্রম করে, মনিবের চাবুক খেয়ে চাকরগিরি করে, আর একটু ঘাস পেলে খায়। তারপর যৌনক্ষুধা মেটাতে গিয়ে গর্দভীর লাথি খেতে খেতে মনে করে যে লাথিটি বড়ই মধুর। উদরপূর্তি ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য গাধাখাটুনি করে যে মূঢ়রা, তারা ভগবানের ভক্ত হয় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দুরাচারীরা হল 'নরাধমাঃ'। অর্থাৎ, নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ। যারা রাজনীতিতে মহা ধুরন্ধর, সামাজিক দিক থেকে উন্নত; কিন্তু কোন ধর্মানুশাসনের দ্বারা পরিচালিত নয়, তারা নরাধম। এই নরাধমরা ভগবানের কথা শুনতেও পর্যন্ত চায় না।

তৃতীয় শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীরা হল 'মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ'। যাদের পারমার্থিক জ্ঞান মায়া শক্তি দ্বারা অপহৃত। এই শ্রেণীর মানুষেরা খুব পণ্ডিত হয়। তারা বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক ইত্যাদি রূপে সমাজে পরিচিত হলেও গুরুপরম্পরার কোনও আশ্রয় না নিয়ে আপন আপন মনগড়া যুক্তিতে সব কিছু ব্যাখ্যা করে চলে।

চতুর্থ শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীরা হল 'আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ'। অর্থাৎ, অসুরভাবাপন্ন। এই ধরনের মানুষেরা মনে করে যে, ভগবান বলে কোনও কিছু নেই। আমরা নিজেরাই সব কিছু করতে পারি। আমরাই সমগ্র জগৎকে ভোগ করতে পারি। আবার কেউ কেউ বলে, আমরাও চেষ্টা করলে ভগবান হয়ে যেতে পারি। তা ছাড়া তাদের কাজ হল ভগবানের নিন্দা করা।

আমরা জানি, হিরণ্যকশিপু, রাবণ ইত্যাদি অসুরেরা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শক্তিমত্তায়, ধনসম্পত্তিতে, সুষ্ঠু রাজনীতিতে কারও চাইতে কোনও অংশে কম ছিল না। শুধু তাই নয়, তারা মস্ত বড় এক-একজন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শিক্ষক ও পরিচালকও। অধিকন্তু তারা ছিল কেউ ব্রহ্মার কিংবা দুর্গার অথবা শিবের উপাসক। কেউ কেউ আবার অমরত্ব লাভের বাসনায় বহু দিন ধরে কঠোর ও দৃঢ় তপস্যাও করেছে। অথচ তাদের সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। কারণ তারা ছিল ভগবৎ-বিদ্বেষী।

আধুনিক যুগে কিছু মানুষ নিজেদেরকেই ভগবান বলে জাহির করতে থাকে। কেউ কেউ বলে ভগবান নিরাকার নির্বিশেষ। কেউ কেউ বলে ভগবান নতুন কিছু নয়, জীবই ভগবান। এছাড়া ভগবান বলে কিছু নেই।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ একবার বলেছিলেন যে, একটু দাঁতে ব্যথা, কিংবা একটু আমাশয় হলে বহুদিনের পরিকল্পিত স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বৈভব, অট্টালিকা, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স সব কিছু এই জীবনের কাছে অতীব তুচ্ছ হয়ে যায়। জীবনের সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়। অথচ তারা কি না বুক ফুলিয়ে 'আমি ভগবান' বলে জাহির করে বসে। যখন সব কিছুতে নিরাশ হয়, তখন তারা বলে ওঠে, 'ভগবান বলে কিছু নেই।' এই হল অবস্থা।

যাই হোক, শাস্ত্রে বহু ক্ষেত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, বুদ্ধিমান না হলে ভগবানের ভক্ত কেউ হতে চায় না। *যজন্তি হি সুমেধসঃ* (ভাঃ ১১/৫/৩২)—সুমেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ভগবানের উপাসনা করেন। *জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে* (গীঃ ৭/১৯)—তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা ভগবানের শরণাগত হন। *ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনঃ* (গীঃ ৭/১৬)—সুকৃতিবান ব্যক্তিগণ ভগবানের ভজনা করেন। *ন মাং দুষ্কৃতিনো* (গীঃ ৭/১৫)—দুরাচারীরা ভক্ত হয় না।

প্রশ্ন ৯৯। এই জড় জগতের কোন বিষয়ী লোক কি ভগবানের চিন্ময় জগতে যেতে পারে?

উত্তর ঃ বিষয়ী অর্থাৎ, বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ উল্লেখ করেছেন—

মতির্ন [illegible] পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।
অদান্ত গোভির্বিশতাং তামিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বনানাম্ ॥

অর্থাৎ, "জড় সুখ ভোগের চেষ্টায় গভীরভাবে যুক্ত বিষয়ী ব্যক্তিরা তাদের জড় অভিজ্ঞতার অতীত আর কিছুই জানে না, এবং তারা প্রকৃতির তরঙ্গে প্রবাহিত হয়। তাদের সুখভোগের প্রচেষ্টা চর্বিত বস্তুকে পুনরায় চর্বণ করার মতো এবং তারা তাদের অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। এইভাবে তারা নারকীয় জীবনের অন্ধতম প্রদেশে অধঃপতিত হয়।" (ভাগবত ৭/৫/৩০)

বিষয়বাসনা আর ভগবদ্ভক্তি দুটি বিপরীতমুখী। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান বলছেন—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে ।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং মধ্যেব প্রবিলীয়তে ॥

অর্থাৎ, "সদা বিষয়ের চিন্তা করতে করতে মানুষের চিত্ত যেমন বিষয়েই নিমগ্ন হয়, সেই রূপ আমাতে আসক্ত ব্যক্তির চিত্তও আমাতে নিবিষ্ট থাকে।" (ভাঃ ১১/১৪/২৭)

ভগবানের চিন্ময় জগতে যেতে হলে জড়জাগতিক বিষয় কলুষ থেকে মুক্ত হতে হবে। ভক্ত সব সময় চিন্তা করেন—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন ।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর)

তবে বিষয়-আশয় অর্থাৎ, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, ধন-রত্ন, জমি-বাড়ি ইত্যাদি থাকলেই যে 'বিষয়ী' হয় এমন নয়। বিষয়-আশয় না থাকলেও 'বিষয়ী' বলে কেউ পরিগণিত হতে পারে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

অর্থাৎ, "কৃষ্ণেতর বিষয়াদিতে আসক্তিশূন্য হয়ে এবং বিষয়সমূহকে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে নিয়োজিত করে ভগবৎ সেবার অনুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণ করলে তাকে যুক্তবৈরাগ্য বলা হয়।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/১২৫)

এরূপ ব্যক্তিগণ বাহ্যত দেখতে বিষয়ীর মতো, কিন্তু অন্তরে নিষ্ঠাবান বৈরাগী এবং ভগবদ্ভক্ত। কিন্তু যারা বাহ্যতভাবে বিষয়ত্যাগ করেছে, কিন্তু অন্তরে জাগতিক ভোগ্য বস্তুর প্রতি প্রবল বাসনা রয়েছে, তারা কপটী।

এই ধরনের বিষয়ত্যাগীদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ হয়েছে—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

অর্থাৎ, "মুক্তিকামী ব্যক্তিরা শাস্ত্র, শ্রীমূর্তি, নাম, মহাপ্রসাদ, গুরু ইত্যাদি হরিসম্বন্ধীয় বস্তুকেও জড় প্রাকৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করে থাকে, এই রূপ বৈরাগ্যকে ফল্গু বৈরাগ্য বলা হয়।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২১৬)

এতে শ্রীহরির চরণে অপরাধই করা হয়, শ্রীহরির কৃপা লাভ হয় না।

তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥

অর্থাৎ, "দেহবিশিষ্ট জীব বিষয় বা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের আসক্তি থেকেই যায়। তবে পারমার্থিক উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে সেই বিষয়তৃষ্ণা থেকে সে চিরতরে নিবৃত্ত হয়।" (ভগবদ্গীতা ২/৫৯)

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন—প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভক্তিযোগ সাধন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পকোটি কমনীয় রূপকে উপলব্ধি করে; তার জড়জাগতিক তুচ্ছ আনন্দ আস্বাদন করার কোন বাসনা থাকে না।

প্রশ্ন ১০০। কৃষ্ণভাবনাময় পরিবারে কোন সাধ্বী পত্নী যদি তাঁর মৃত পতির চিতায় সহমরণে যেতে চান, তবে কোনও বিপদের ঝুঁকি আছে কিনা?

উত্তর ঃ সতী সাধ্বী স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় তাঁর ধর্মপ্রাণ এবং শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত স্বামীর সহগামিনী হতে প্রস্তুত হন, তবে তিনি যথার্থ অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে অবশ্যই সুফল লাভ করবেন সন্দেহ নেই। ভগবদ্ধামে উন্নীত হবেন। সতী মহিলাদের সেরূপ চেতনা থাকাই উচিত। পুণ্যবন্ত পতির প্রতি সতীর ঐকান্তিক আসক্তিই কাম্য।

তবে স্বামী যদি শুদ্ধ ভক্ত না হয় এবং স্ত্রীর চেতনা যদি শুদ্ধ না হয়, সেক্ষেত্রে সহমরণের অনুকরণ করা উচিত নয়। পতির বিচ্ছেদ ব্যথা সহ্য করতে অক্ষম হয়ে সহধর্মিনী পত্নীও স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় বিসর্জন দিয়ে পরলোকে সেই পতির সঙ্গিনী হওয়ার জন্য যাত্রা করেন। সেই সময়ে তাঁর হৃদয়ে তীব্র বিরহ জ্বালার উপর বাহ্য অগ্নিদগ্ধ জ্বালা প্রভাবিত করতে পারে না। ঠিক যেমন শিশুকে হারাবার ভয়ে মা তাঁর শিশুকে কাছে টেনে নেবার জন্য নিজের পারিপার্শ্বিক সমস্ত বিপদের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শিশুর কাছে দৌড়ে যান, তেমনি পতিশোকগ্রস্ত পত্নীও সেরূপ স্বামীর যাত্রাপথের সহগামিনী হন।

অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ভীতি তাঁর চিত্তকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু কৃত্রিমভাবে তা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

বৈদিক ভারতবর্ষের বহু পতিব্রতা মহীয়সী নারী তাঁদের সতীত্বের আদর্শ প্রদর্শন করে গেছেন। রমণীদের পক্ষে এটি অতীব গৌরবময় কার্য বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বর্তমান এই অধঃপতিত যুগে কারও পক্ষে গান্ধারী, মাদ্রী এবং পুরাকালের অন্যান্য রমণীর মতো পাতিব্রত্য অবলম্বন করে সতীপ্রথা অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

সতীপ্রথা কোন বাধ্যতামূলক পন্থা নয়। কালক্রমে সমাজের বেশ কতকগুলি উৎপাতসৃষ্টিকারী ব্যক্তি, স্বামীর চিতায় পুড়ে মরবার জন্য মৃত ব্যক্তির বধূদের উপর অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করতে শুরু করে এবং জোর করে তাদের ধরে নিয়ে এসে জ্বলন্ত চিতায় চড়িয়ে দেয়। এইভাবে বৈদিক আদর্শ সতীপ্রথা অত্যন্ত জঘন্য বিকৃত রূপ ধারণ করল। জোর করে 'সতী' হওয়ার কোনও মূল্যই নেই, কারণ সেক্ষেত্রে সহমৃতার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

কিন্তু পতির যদি কৃষ্ণভক্তিতে ঘাটতি থাকে, তবে সেই পতির ধ্যান করতে করতে মৃত্যুবরণ করলে তেমন কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে বরং পরমপতি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ গ্রহণই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সমস্ত প্রকার তথাকথিত ধর্মগুলি পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও।" *মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ*—"নিশ্চিতরূপে আমিই তোমায় উদ্ধার করব।" (গীতা ১৮/৬৬)

জীবনের অন্তিম সময় অবধি শ্রীকৃষ্ণের পূজা-অর্চনা, নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, প্রসাদ সেবন ইত্যাদি ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবায় নিয়োজিত হয়ে পরম দিব্যধামে উন্নীত হওয়াই জীবনের পরম লক্ষ্য।

প্রশ্ন ১০১। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া কি পিতা-মাতার কৃপা ছাড়া সম্ভব?

উত্তর ঃ আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার পথে মাতা-পিতার কৃপাশীর্বাদ থাকতেও পারে, আবার না-ও থাকতে পারে। সেটি কোনও বড় কথা নয়। শাস্ত্রে বহু পিতা-মাতাকে দেখা যায় যারা সন্তানকে ভগবদ্ভক্তির পথ থেকে বিচ্যুত করবার জন্যই ব্যস্ত। যেমন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিপরায়ণ ভরতকে মাতা কৈকেয়ী রাজ্যভোগ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে গৃহছাড়া করিয়েছিলেন। শিশুপুত্র প্রহ্লাদকে শ্রীহরির নাম ও মহিমা কীর্তন করতে দেখে পিতা হিরণ্যকশিপু শ্রীপ্রহ্লাদের উপর বহু রকমের জঘন্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন।

এই যুগের অধিকাংশ মাতা-পিতাই চায় না যে, তাদের সন্তানেরা হরিভজন করে জীবন ধন্য করুক। বরং কেউ যদি মঠবাসী হয়ে কৃষ্ণভজনে জীবনযাপন করতে আসে, তো মাতা-পিতারা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়, এমন কি মঠের ভক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ জানাতে যায়। কিন্তু তাদের সন্তানেরা বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, মদ সেবন করে, জুয়া, তাস, আড্ডাখানা খুলে, জীবহত্যাদি নানাবিধ অপকর্ম করেও বদ্ধ সংসারে মজে থাকুক, তাতে মাতা-পিতা চুপ থাকবে এবং তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে সন্তানের জন্য কারো কাছে নালিশ মোকদ্দমা চালাবে না।

বৈদিক শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সন্তানকে যারা কৃষ্ণভজন করতে শিক্ষা দেয় না, তারা আসলে পিতা-মাতা নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

পিতা ন স স্যাজ্ জননী ন সা স্যাৎ ।
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥ (ভাঃ ৫/৫/১৮)

অর্থাৎ, সন্তানকে ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার থেকে মোচন করতে না পারেন, সেই পিতা 'পিতা' নন। অর্থাৎ, তাঁর সন্তান উৎপাদন বিষয়ে যত্ন করা উচিত নয় এবং সেই জননী 'জননী' নন, অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্তব্য নয়।

প্রকৃত পিতা-মাতা তাঁরাই, যাঁরা তাঁদের সন্তানকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল কাব্যে তাই বলা হয়েছে—

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা ॥

অতএব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তিদাতা পিতা-মাতার আশীর্বাদ আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আনুকূল্যপ্রদ।

প্রশ্ন ১০২। প্রকৃতপক্ষে যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করছি, তা ভুল। তা হলে আমাদের কি করা উচিত?

উত্তর ঃ বর্তমান সমাজে প্রচলিত শিক্ষা ভুল। কারণ, তা বেদবিহিত নয়। তাই এরকম বৈদিক শাস্ত্র বিরোধী শিক্ষার পরিবর্তন আবশ্যক। কতকগুলি বিষয়বস্তুর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা বলছে, হঠাৎ কোন কারণে এই জগতের উত্থান পতন ঘটছে—আপনা-আপনি জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। বৈদিক শিক্ষা অনুসারে ভগবানের অংশ স্বরূপ জীব মাত্রই ভগবানের নিত্য দাস। যেহেতু অংশের কাজ পূর্ণের সেবা করা। কিন্তু আমরা শিখেছি—আমাদের আশেপাশের মানুষ, কুকুর, বেড়াল—এই সবের সেবা করাই কর্তব্য।

বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ হল, মানব জাতির পিতা পরম ভাগবত মহর্ষি মনু। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় আমরা শিখছি—মনু নয়, অসভ্য হনু—অর্থাৎ, বানর হল আমাদের পূর্বপুরুষ।

মুনিঋষিগণ বলে গেছেন, এমন কি স্বয়ং ভগবানের নির্দেশ হল, আমাদের দেহ নষ্ট হলে অর্থাৎ, দেহ ত্যাগের পর আমাদের কর্ম ও কামনা-বাসনা অনুসারে আমরা নতুন একটি দেহ লাভ করব। কিন্তু প্রকৃতির বিধান অগ্রাহ্য করে তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিত মানুষ বলছে, 'এই দেহের মৃত্যুর পর সব শেষ। অতএব এই জীবনেই দেহ ও মনের তৃপ্তি যত প্রকারে হয় ভোগ করে যাওয়া ভাল'—এইরূপ আসুরিক তত্ত্ব গ্রহণ করেছে।

প্রত্যেক মনীষী নির্দেশ দিয়েছেন, এই জগৎ দুঃখময় এবং উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলতে শুরু করেছে, 'এই সুন্দর ভুবন আমার স্বর্গ।' কোনও কোনও কবি গানও গেয়েছেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

বৈদিক শিক্ষার নির্দেশ হল, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় ভবচক্র থেকে জীবকে চিরতরে উদ্ধার লাভ করার পন্থা শিক্ষা দেওয়াটাই পরোপকার এবং জীবে দয়া। কিন্তু, বর্তমান উদ্ভট শিক্ষা বলছে ক্ষণভঙ্গুর জড় দেহটার সেবা যত্ন করাটাই হল একমাত্র জীব সেবা। অথচ সেই দেহকে তারা রক্ষাই করতে পারে না। দুঃখময় জীবনে পতিত বদ্ধ জীবের সেবা—ঠিক যেমন কসাইখানায় বাঁধা ছাগলকে একটু কচি ঘাস দেখিয়ে আদর করা—এইটাই নাকি পরম ধর্ম।

আমাদের প্রশ্ন করা উচিত—আমি কে, কেন জন্ম-মৃত্যুর অধীনে থাকব? এই জীবন কি? আমাদের কি করণীয়?—ইত্যাদি যে সমস্ত প্রশ্ন আমাদের পূর্বসুরীগণ তাঁদের আচার্যের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন। কিন্তু এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে না জেনে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা গর্বে ফেটে পড়ছি, অজস্র অনর্থক প্রশ্ন নিয়ে দিন-রাত মশগুল রয়েছি—যেমন, আমরা প্রশ্ন করা শিখেছি—ইলতুতমিস কবে ভারতে পদার্পণ করেন? আদ্যনাথবাবুর বিয়েবাড়িতে মাংসের ঝোল কেমন লাগল? কে কোথায় কাকে কি প্রসঙ্গে বলেছিল যে, 'আহা কী দেখলাম!' ব্যাখ্যা কর। মিঠুনের অ্যাক্ট্ ওই পিক্চারে কি রকম হয়েছে? আজ ক্রিকেটে কে কত উইকেট ভেঙেছে? আচ্ছা ভাই, বাজারে চারমস্ না উইলস্—কোন্টা ভাল চলছে?—এই সমস্ত অনর্থক প্রশ্ন-প্রজল্প জীবনের পরিহাস মাত্র।

বৈদিক শিক্ষা অনুসারে আমাদের লক্ষ্য হল পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে নিজেদের প্রকৃত সচ্চিদানন্দময় স্বরূপের পরিচয় পুনঃস্থাপন করা। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা অনুসারে আমাদের লক্ষ্য হয়েছে কোনও মতে ডিগ্রি পাশের সার্টিফিকেট নিয়েই চাকুরিতে যোগ দেওয়া।

বৈদিক সমাজে সরকার ছিল রাজর্ষি পরিচালিত। সেক্ষেত্রে প্রজারা সুখশান্তিময় জীবনযাপন করত এবং ধর্মপ্রাণ রাজার গুণকীর্তন ও বন্দনা করত। কিন্তু বর্তমানে কতকগুলি বৈদিক আচার অনুশাসনবিহীন অহংকারী নেতাদের সিংহাসনে বসানো হচ্ছে, আবার সিংহাসন থেকে হিঁচড়ে টেনে ফেলতে হচ্ছে। সৌন্দর্য ও পবিত্রতার আদর্শ রক্ষা করে চলত বৈদিক আর্যসভ্যতার জনগণ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা, পরিবারনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি—সর্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়েই চলেছে। অসংখ্য কারণে বর্তমান ভ্রান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

এখন আমাদের করণীয় হচ্ছে, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অনুমোদিত ভগবদ্ প্রতিনিধি সদ্‌গুরু পরম্পরায় শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করে জীবন গঠন প্রণালী শিক্ষা করা। কারণ শাস্ত্রবিহিত বৈদিক জীবনই একমাত্র পরম শান্তি পরম আনন্দের সন্ধান দেয়।

বিদ্যাদেবী সরস্বতীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত দিগ্‌বিজয়ী কেশব কাশ্মীরী পণ্ডিতকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দেন—

> 'দিগ্বিজয় করিব'—বিদ্যার কার্য নহে।
> ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥
> সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
> 'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়'॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদি ১৩/১৭৩,১৭৮)

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন—"প্রকৃতপক্ষে যে কর্ম মানুষকে কৃষ্ণভক্তির পথে পরিচালিত করে না, তা পাপকর্ম এবং যে বিদ্যা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে না তা ভ্রান্ত। যদি কৃষ্ণভাবনামৃতের অভাব হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেই কর্ম এবং সেই বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।" মানুষের কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হওয়াই তার যথার্থ শিক্ষার একমাত্র পরিচয়।

প্রশ্ন ১০৩। 'হরি' শব্দের অর্থ কি? 'হরি বল্'—কীর্তনানুষ্ঠানে, জীবনকালে, মরণকালে, শ্মশানঘাটে কেন উচ্চারণ করা হয়?'

উত্তর ঃ 'হরি' বলতে যিনি হরণ করেন। আমাদের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় মহাদুঃখ যিনি চিরতরে হরণ করে সচ্চিদানন্দময় পরম গতি দান করেন, তিনিই হরি।

'হরি বল্' বা হরিবোল কথাটিতে সবাইকে 'হরি' বলতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কলিযুগে পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—*কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ* —সর্বদাই হরিনাম কীর্তন করতে হবে। কারণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনই কলিযুগের বদ্ধ জীবের একমাত্র ধর্ম, একমাত্র উদ্ধারের পথ। হরিনামই শান্তির পথ।

এই মনুষ্য-জীবন হরিভজনের জন্যই নির্ধারিত। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্
ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

"এই মনুষ্যদেহটি সকল ফলের মূল, অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্লভ। এটিই পটুতর নৌকা। শ্রীগুরুই এর কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা পরিচালিত এরূপ নৌকা লাভ করেও যিনি এই সংসার সমুদ্র পার হতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।" (ভাঃ ১১/২০/১৭)

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জড়জাগতিক বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন মানুষ হরিনাম কীর্তনের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। সে সারা জীবন হাবিজাবি পরিকল্পনায় কাটিয়ে বার্ধক্যে হতাশগ্রস্ত অবস্থায় এই সংসারকে সম্পূর্ণ অসার মনে করে ভগবানের কথা হয়তো স্মরণ করতে পারে। মরণকালে সুকৃতিমান ব্যক্তি হরিনাম স্মরণ করে থাকে।

যখন লোক শব দাহ করতে শ্মশানে যায়, তারা 'হরি বল্' রব করে, কারণ তখন স্মরণীয় এই যে, আমাদের সকলের এই প্রিয় জড় শরীরটি যে কোনও মুহূর্তে ছেড়ে দিতে হবে। যদি এই জীবন সার্থক করতে হয় তবে 'হরি বল্', হরিনাম কীর্তন করা উচিত। এই জন্ম-মৃত্যুর দুঃখময় ভবচক্র থেকে চিরতরে উত্তীর্ণ হতে হলে হরিনাম কীর্তনে সদা যুক্ত থাকা উচিত। অত্যন্ত বুদ্ধিমান না হলে কেউ হরিভজন করে না, *যজন্তি হি সুমেধসঃ ।* (ভাঃ ১২/৫/৩২) সুমেধাগণই ভজন করেন।

প্রশ্ন ১০৪। কেন মানুষ পৃথিবীতে আসে? কিভাবেই বা সে ভগবদ্ ধামে যেতে পারে?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

"শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জীব অনাদিকাল ধরে জড়া প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। তাই মায়া তাকে এই জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করছে।" (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২০/১১৭)

চিন্ময় জগৎ ও জড় জগতের সন্ধি সীমায় তটস্থা শক্তিতে অবস্থিতি কালে জীব এই মায়িক বা জড় জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভোগের বাসনা করলে তাকে মায়িক জগতে প্রবেশ করতে হয় এবং তখন থেকে তার বদ্ধ দশা শুরু হয়ে যায়।

সৌভাগ্যক্রমে সেই বদ্ধজীব যখন পারমার্থিক গুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে শুরু করে, তখন তার ভবদশা থেকে উত্তরণের উপায় হয়।

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২০/১২০)

কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ জীব কখনও মায়িক সুখভোগের প্রতি আসক্ত নন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তির ফলে মানুষ কৃষ্ণলোকে উন্নীত হতে পারবে।

প্রশ্ন ১০৫। আমরা যদি সবাই শ্রীকৃষ্ণের সন্তান, তবে, মানুষের মধ্যে এত দম্ভ কেন, বা জীবজগতের মধ্যে এত কষ্ট কেন? ভাল মানুষের সন্তান সকলেই ভাল থাকা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের সন্তানদের মধ্যে এত হানাহানি কেন?

উত্তর ঃ সকলে পরমপিতার সন্তান হলেও সকলেই পিতৃ আনুগত্যে চলে না। পিতার নির্দেশ মতো যদি সন্তান না চলে এবং নিজের মনগড়া পন্থায় যদি সে পরিচালিত হয়ে দুঃখ-কষ্ট পায়, তবে সেজন্য পিতাকে দোষী করা যায় না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২০/১১৭)

অর্থাৎ, 'জীব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য গ্রহণ না করে কৃষ্ণভক্তি-বিমুখ হয়ে ভোগবাসনা হেতু ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি পরিচালিত এই ভবসংসারে পতিত হয়ে দুঃখ পায়।'

তাই ভগবান কপিলদেব মাতা দেবহূতি দেবীকে বলছেন—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ ॥
চিত্ত দিয়া শুন, মাতা! জীবের যে গতি ।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ১/২০২-২০৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে বিদেহরাজ নিমির প্রতি নব যোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীচমস মুনির উক্তিতে দেখা যায়—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

"যে সমস্ত মানুষ সাক্ষাৎ নিজ-পিতা পরমেশ্বর ভগবানকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করে থাকে, তারা তাদের প্রকৃত স্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৫/৩)

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপারটি হল এই যে, মায়াচ্ছন্ন জীব তার অধঃপতিত অবস্থাটিকেও মিথ্যা মোহবশত আপন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির স্থান বলে মনে করে। ফলে, সে শুচিশুদ্ধ ভাবধারা

পরিত্যাগ করে পশুর মতোই খেয়োখেয়ি, হানাহানি ও কোলাকুলি করে। যেমন, একটি জীব শূকর-জন্ম লাভ করেও সে অত্যন্ত আনন্দে পচা দুর্গন্ধপূর্ণ কাদামাটি, মলমূত্র ভোগ করার জন্য কাড়াকাড়ি করে তার অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে। শূকর-জীবনে যে তার গর্ব ও আনন্দ, একজন মানুষের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত জঘন্য এবং কদর্যকর। তেমনই উন্নত চেতনাসম্পন্ন কৃষ্ণভক্তি-উন্মুখ জীব বুঝতে পারেন যে, জড়জাগতিক জীবন নিয়ে কারও কোনও গর্ব করার কিছুই নেই। আমাদের জড় বদ্ধ জীবনধারা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দময় জগতে আপন আলয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন।

তাই মহারাজবৃন্দ আমাদের সবাইকে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এই কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনই জীবন ও জগৎকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে। সমস্ত অশুভ প্রভাব নষ্ট হবে এবং পরমপিতা শ্রীকৃষ্ণও আমাদের প্রতি প্রীত হয়ে আমাদের গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন ১০৬। আমরা আজ পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যাচ্ছি, তার জন্য দায়ী আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, না কি কৃষ্ণবিস্মৃতি আমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল?

উত্তর ঃ কৃষ্ণবিস্মৃতির কারণেই আমরা এই জগতে অধঃপতিত হয়েছি। আর তাই অধঃপতিত শিক্ষাটাকেই জীবনের সর্বস্ব বলে মনে করছি। যে-শিক্ষা আমাদের সর্বদা জড় জগতের বন্ধনে বেঁধে রাখে, কখনও পারমার্থিক জীবনে উন্নীত হয়ে পরমানন্দ আস্বাদনের জন্য উৎসাহ দেয় না, তা প্রাচীন বৈদিক ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিরা শিক্ষা দিতেন না—তাঁরা এই জগতে দুর্লভ মনুষ্য জীবনের পরম মঙ্গলের বিষয়ে শিক্ষাই দিতেন।

পূর্ব জীবনের কর্মফলে যদিও আমাদের এই জন্মের পরিবেশ, পরিস্থিতি, সমাজ লাভ করেছি, তবুও পর জীবনের প্রস্তুতির পর্বটিই হল এই জীবন, যাতে আমরা আমাদের বিচার-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করে যথার্থ জীবন গড়তে পারি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—যদি কেউ ভগবানের ভক্ত হয়, তবে তার সমস্ত পাপ ধ্বংস হবে এবং সে সচ্চিদানন্দময় জগতের অধিবাসী হবে। আবার, যদি কেউ সেই ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে পারে, তবে সে আর কখনও এই দুঃখময় জগতে কষ্টভোগ করতে আসবে না। *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।* (গীতা ১৫/৬)

জীব যেহেতু ভগবানের নিত্য অংশ নিত্য আত্মা, তাই তার সহজাত বৃত্তিই হল কৃষ্ণভক্তি। কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ এবং কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল বিষয় বর্জন করবার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিকূলকে এড়াবার চেষ্টা করব না এবং অনুকূলকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করব না, কেবল ভাগ্যের দোষ দিয়ে পড়ে থাকব—এই মনোভাব থাকা যে কোনও বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কখনই উচিত নয়। কাপুরুষের মতো দুর্ভাগ্যকে মেনে নেওয়া অপরাধ।

আমরা যে পরিবেশেই জন্ম নিই না কেন, আমাদের কর্মটি যেন শুভ হয়—ভগবদ্প্রীতি সাধনার্থে যেন আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। তবেই জীবন সার্থক হবে।

অন্যথায় কখনও নয়। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া জগতের সমস্ত আয়োজনই আমাদের জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্রে আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা মাত্র।

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের কৃষ্ণবিমুখ করে তুলছে বলেই সেই শিক্ষা ভক্তিপ্রতিকূল জ্ঞানে এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যদি তা অনুকূল হয়, গ্রহণ করা উচিত। বর্তমান কালের শিক্ষার্থীরা যে পরিমাণে দিন দিন ক্রমবর্ধমান হতাশাচ্ছন্ন এবং কি ভয়ঙ্কর ভাবে আত্মহননশীল হয়ে উঠছে, তা যে কেউই আন্তরিকভাবে বুঝতে হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ সত্য এই যে, কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষা অসংখ্য মানুষকে তাদের দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করেছে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষা বহু হতাশাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবকে কৃষ্ণভক্তির নিত্য আনন্দ দান করেছে। তাই অ-ভক্তিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই কাম্য।

প্রশ্ন ১০৭। পাশ্চাত্য জগতের মানুষ শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব এত আগ্রহের সঙ্গে পালন করছে কিভাবে? তারা তো জগন্নাথ সম্বন্ধে বেশি কিছু জানে না।

উত্তর ঃ পাশ্চাত্যের মানুষেরা ভারতের মহান পুরুষ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের সংস্পর্শে এসে এক নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে। আধুনিক সভ্যতার প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কারণ তারা তাদের সমস্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও কোনও মানসিক শান্তি পাচ্ছিল না, তারা প্রতি পদে মৃত্যুর হাতছানিও লক্ষ্য করেছিল—আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা তারা অনুভব করেছিল। তারা একটা নতুন কিছু চাইছিল, নতুন জগতের সন্ধানে যেতে চাইছিল। তাই তারা ছন্নছাড়া হয়ে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দৈবক্রমে সেই সময় গভীর অন্ধকারের মাঝে আশার আলো রূপে শ্রীল প্রভুপাদকে তারা কাছে পেয়েছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ তাদের বুঝিয়েছিলেন ভারতবর্ষের মহান ঐতিহ্যের কথা। তিনি তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কিভাবে সমগ্র পৃথিবীতে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে শান্তি, মৈত্রী ও পবিত্রতা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন, কিভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করে সমগ্র পৃথিবী আনন্দিত হতে পারে, কিভাবে সমগ্র জগতের নাথকে রথের উপর বসিয়ে জগদ্বাসী সেই জগন্নাথের কৃপা-আশীর্বাদ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ মানব জীবনের জন্য ভারতবর্ষের অমূল্য রত্ন শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাশ্চাত্যবাসীকে দান করলেন। ফলে তারা এক নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছিল। শ্রীল প্রভুপাদকে তারা তাদের গুরুরূপে বরণ করেছিল। রথযাত্রা সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ তাদের বুঝিয়ে ছিলেন যে, এই রথযাত্রা বৈদিক শাস্ত্র সম্মত এবং রথযাত্রার মাধ্যমে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতি সম্বন্ধ রক্ষিত হয়। তারা বুঝেছিল যে, রথোপরি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীজগন্নাথ সমগ্র জগতের নাথ, আর আমরা সকলেই তাঁর প্রজা। তিনি সকলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দান করতে রথভ্রমণে রাজপথে বেরিয়েছেন। শ্রীজগন্নাথের পরম ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে

যখন তারা উৎসব পরিচালনা করছিল, তখন তারা উপলব্ধি করেছিল যে, জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই সেই উৎসবে যোগ দিচ্ছে। তারা শ্রীজগন্নাথ সম্পর্কে কিছু জানুক আর না-ই জানুক, তাদের হৃদয়ে শ্রীজগন্নাথকে জানবার কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছিল। মানুষ প্রতিদিনকার হ-য-ব-র-ল ঘটনা নিয়ে আজে-বাজে বিবাদ-বিসংবাদে জড়ো হয়, কিন্তু সেদিন মানুষ শ্রীজগন্নাথকে জানবার জন্য জড়ো হয়েছিল, ভিড় জমিয়েছিল। আর তাতেই পাশ্চাত্যবাসীরা শ্রীজগন্নাথের অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিল। তাদের দেশের সংবাদপত্রগুলিও রথযাত্রার মহিমা প্রচার করতে লাগল।

যখন এক সময় শ্রীল প্রভুপাদকে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, স্বদেশে প্রচার না করে তিনি ভগবানের মহিমা বিদেশে গিয়ে প্রচার করলেন কেন? উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ জানিয়েছিলেন যে, পাশ্চাত্যের লোকেরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাই তাদের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যখন বলা হল, তখন তারা কৌতূহলী হয়ে আরও ভাল করে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল। কিন্তু ভারতের মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অতিরিক্ত জানে। তারা এতই জানে যে, তাদের কাছে কৃষ্ণকথা বলতে গেলেই তারা পাল্টা দু-চার কথা শুনিয়ে দেবে। বিদেশের মানুষ আধ্যাত্মিক মঙ্গল সম্বন্ধে কিছুই জানত না, তারা মায়াচ্ছন্ন হয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় পতিত ছিল। তাই তাদের ডাক দিলে তারা ঘুম ছেড়ে জেগে উঠল। কিন্তু ভারতের লোকেরা জেগে জেগে ঘুমোচ্ছে। তাই তাদের ডাকলে তারা ইচ্ছা করেই সাড়া দেয় না।

সনাতন ধর্মের দেশ, মুনি-ঋষিদের তপস্যার দেশ, সাধনার দেশ এই ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি পাশ্চাত্যের মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে, অথচ ভারতেরই মানুষ পাশ্চাত্যের জড় সভ্যতা, পাশ্চাত্যের চালচলন এবং নোংরামিকে অনুকরণ করছে। এটি এক লজ্জার ব্যাপার।

শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবর্গ জেনেছিলেন যে, এই সরল সুন্দর রথযাত্রা উদ্‌যাপিত হলে বহু মানুষ শ্রীজগন্নাথের কৃপা লাভ করবার সুযোগ পাবে। ফলে, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের পথ সুগম হবে। সর্বত্র মানুষ শুচিশুদ্ধ জীবনধারা গ্রহণ করতে তখন আগ্রহী হবে, তাই তাঁরা পরম আগ্রহভরে রথযাত্রা অনুষ্ঠান পালন করছেন।

প্রশ্ন ১০৮। ভারতভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের নানা অবতার অবতীর্ণ হয়েছেন—শত্রুবিনাশ ও ধর্মরক্ষার জন্য। ভারত ছাড়া অন্য দেশে ভগবানের অবতরণের কথা শোনা যায় না। তা হলে ভারতেই কি শত্রু এবং ধর্মের গ্লানি বেশি হয়েছে?

উত্তর ঃ শত্রু বা অসুর নাশ করতে ভগবানকে এই জগতে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি এই জড় জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়া দুর্গা অতি অনায়াসেই যে কোনও অসুরকে বিনাশ করতে পারেন। কিন্তু ভগবান ভক্ত-বাৎসল্য হেতু তাঁর ভক্তের আনন্দবিধান করতে, তাঁর ভক্তের আহ্বানে এই জগতে অবতীর্ণ হন। অসুরদমন করা ভগবানের আনুষঙ্গিক লীলা। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ নামে পরিচিত।

ভগবদ্ভক্তেরা বহু কাল ধরে এই ভারতভূমিতে ভগবানের আরাধনা করেছেন। তপস্যা করেছেন। ভগবানকে আহ্বান করেছেন। তাই ভগবান এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

প্রশ্ন ১০৯। আর্য এবং অনার্য কারা?

উত্তর ঃ পারমার্থিক দিক দিয়ে যারা উন্নত, তাদের আর্য বলা হয়। আর যারা পারমার্থিক বিষয়ে উন্নত নয়, তাদের অনার্য বলা হয়। আর্য কথাটির অর্থই হল পারমার্থিক দিক থেকে উন্নত। প্রাচীন ভারতবর্ষে বহু মহান মহান ঋষি বাস করতেন। রাজারাও ছিলেন ঋষিতুল্য। তাই তাঁদের রাজর্ষি বলা হত। তাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানসম্পন্ন। তাঁদের ক্রিয়াকলাপ কতই না উন্নত। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, ভরত, জনক, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ—অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

বৈদিক সংস্কৃতি অনুসরণ করে, বৈদিক বিধিনিষেধ পালন করে ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী বা আর্য হওয়া যায়। যথাযথ গুণ অর্জন না করলে ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী বা আর্য হওয়া যায় না। বৈদিক বিধিনিষেধ যারা পালন করে না, তাদের অনার্য বলা হয়।

শ্রীকপিলদেবের মাতা দেবহূতি বলছেন, যিনি শুদ্ধচিত্তে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ আর্য। সেইকথা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখিত হয়েছে—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা-
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

"আহা! যাঁদের জিহ্বায় আপনার পবিত্র নাম কীর্তিত হয়, তাঁরা কত ধন্য। চণ্ডাল-পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সেই ব্যক্তিরা পূজ্য। যাঁরা আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁদের সব রকমের তপস্যা এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞ আপনা-আপনি সম্পাদিত হয়েছে এবং আর্যদের সমস্ত সদাচার তাঁরা অর্জন করেছেন। আপনার পবিত্র নাম গ্রহণ করার জন্য তাঁদের নিশ্চয়ই সমস্ত পবিত্র তীর্থে স্নান হয়ে গেছে, বেদ অধ্যয়ন এবং সমস্ত আবশ্যকতা পূর্ণ হয়েছে।" (ভাঃ ৩/৩৩/৭)

অনার্য ব্যক্তিরা সদাচারী নয়। তারা বেদনিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপে সংযুক্ত। যেমন অন্য প্রাণীর রক্তমাংস হাড়পিত্ত ভক্ষণ, নেশাদ্রব্য ব্যবহার, জুয়ালটারী খেলা, অবৈধ স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গ। অনার্য সভ্যতা এইভাবে কলিযুগে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যত উচ্চকুল, আভিজাত্য পরিবার, জ্ঞানী-গুণী, পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হন না কেন, তিনি যদি ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনে কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তনে ব্রতী না হন, তিনি যদি মাছ-মাংস আহার করেন, ধূমপান মদ্যপান করেন, তাসজুয়া ইত্যাদি অনর্থক খেলায় সময় নষ্ট করেন, তিনি যদি অবৈধ সঙ্গের প্রতি আসক্ত থাকেন, তবে তিনি নিকৃষ্ট স্তরের ব্যক্তি বা অনার্য বলেই বিবেচিত হন।

প্রশ্ন ১১০। যাকে দেখা যায় না তার অস্তিত্বে বিশ্বাস কি? ভগবান আছেন তার প্রমাণ কি? বরং বিজ্ঞান সত্য, কারণ বিজ্ঞানের একটা যুক্তি বা প্রমাণ রয়েছে। এরূপ মন্তব্যের উত্তর কি?

উত্তর ঃ নিছক বিশ্বাসের উপর কারও অস্তিত্ব নির্ভর করে না। আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না, তাই আপনি যদি বলেন, "আমার বিশ্বাস যে ওর অস্তিত্ব নেই, যেহেতু দেখতে পাচ্ছি না। তা হলে তো আমি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছি না। তা ছাড়া আপনার দেখারও কি মূল্য আছে। কতটুকুই বা আপনি দেখতে পান। আপনার দেখার ক্ষমতাই অতি নগণ্য। আপনার মাথায় কয়টা চুল আছে দেখতে পান না। শরীরের ভেতরে কি আছে দেখতে পান না। পেছনের দিকে কি আছে দেখতে পান না। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পান না। চোখ রোগগ্রস্ত হলে দেখতে পান না। চোখের পাতাটিকেই দেখতে পান না। চোখের সামনে কোন আবরণী থাকলে তার সামনের বস্তুকেও দেখতে পান না। একেবারে চোখের কাছে একটি কাগজ ধরলে তাতে কি লেখা আছে দেখতে পান না। দূরের বস্তুগুলি কি রয়েছে তাও দেখতে পান না। আবার আপনি অনেক উল্টো পাল্টা বস্তু দেখেন যেগুলি সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি দেখে না। যেমন, অন্ধকারে দড়িটাকে সাপ দেখেন, গাছটাকে ভুত দেখেন, টিনকে পয়সা দেখেন, কাগজকে টাকা দেখেন, মদুকে মধু দেখেন। একটি লোকের অপেক্ষায় রয়েছেন তাই অন্য কেউ যদি এসে পৌঁছায় আপনি হঠাৎ সেই লোক বলেই দেখেন যার অপেক্ষায় রয়েছেন। আপনার সঙ্গে যদি কারও শত্রুভাব থাকে তবে তার সঙ্গে কোন কারণে আপনার গায়ে ধাক্কা লাগলে আপনি তখন দেখেন যে সে যেন ইচ্ছা করেই হিংসা করে ধাক্কা দিল। জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হলে সবুজ গাছপালাও হলুদ দেখতে পাবেন। এইরূপ বহুবিধ দৃষ্টান্ত রয়েছে। সুতরাং কারও অস্তিত্ব আছে কি নেই তা কেবল দেখেই বিশ্বাস করার কোনও যুক্তিই হচ্ছে না। কারণ যথার্থ ভাবে দেখা কর্মটিই সম্পাদিত হচ্ছে না।

প্রথমত, অল্প নগণ্য কিছু দেখছেন, অধিকাংশ বস্তুই দেখার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, অনেক বস্তু ভুল দেখছেন। তৃতীয়ত, এক প্রকার জিনিস আপনি দেখছেন, যার কোনও অস্তিত্বই নেই। যেমন, আপনি বিছানায় শুয়ে আছেন। অবশ্যই আপনার চোখ বন্ধ আছে। কিন্তু তবুও আপনি দেখছেন একটা বিশাল বন। ভয়ংকর একটা বাঘ আপনাকে তাড়া করছে। আপনি চিৎকার করে উঠলেন। বাঘ বাঘ বলে চেঁচালেন। লোকও চমকে উঠল। আপনিও ভয়ার্ত হয়ে জেগে উঠলেন। চোখ মেলে দেখলেন। বন নেই, কোনও বাঘেরও অস্তিত্বই নেই। আপনি আপনার ঘরের ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলেন মাত্র। অর্থাৎ, আপনার কাছে বন নেই, বাঘ নেই, আপনার কাছে বাঘের কোন অস্তিত্বই নেই, অথচ আপনি দেখলেন বাঘ আপনাকে তাড়া করছে। এই দেখার কি মূল্য?

অতএব আপনার দেখার ওপরে কারও অস্তিত্ব নির্ভর করছে না। যে বস্তু আপনি দেখেননি, সেই বস্তু সম্বন্ধে বই পড়ে, কারও কাছে শুনে, সেই বস্তুর অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন। অনুরূপভাবে, ভগবানকে আপনি দেখেননি, কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে শাস্ত্র পড়ে; মহাজনদের কথা শুনে, ভগবানের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতেই হয়।

নাস্তিক সংস্কৃতিতে যাদের জন্ম তারা ভগবান মানে না, তারা ভগবানকে দেখতে পায় না। ঠিক যেমন পেঁচার বংশে যাদের জন্ম তারা সূর্য দেখতে পায় না। "উলুকে না দেখে কভু সূর্যের কিরণ," (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত) পেঁচা সূর্যকে দেখতে পায় না। তাই বলে কি সূর্যের অস্তিত্ব নেই? রাত্রিতে সূর্য দেখা যায় না, তাই বলে কি সূর্যের অস্তিত্ব নেই? অতএব যারা পেঁচো দৃষ্টিসম্পন্ন তাদের দেখার বা বিশ্বাসের উপর ভগবানের অস্তিত্ব নির্ভর করছে না।

তার পরের প্রশ্নটি হচ্ছে, বিজ্ঞান সত্য কারণ তার যুক্তি আছে, ভগবান সত্য নয় কারণ তার যুক্তি নাকি নাই। এর উত্তর এই যে, ভগবানের কথা শাস্ত্র মাধ্যমে ভক্তরাই জানতে পারেন। সেখানে বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—ভক্তরাই ভগবানকে জানতে পারে। *মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি*—গণ্ড মূর্খেরা ভগবানকে জানতে পারে না। দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে, বিজ্ঞান সত্য। বিজ্ঞান একমাত্র ভক্তরাই মেনে চলে, অভক্তরা বিজ্ঞান অমান্য করছে। তারই প্রমাণ আধুনিক বিশ্বে দেখা যাচ্ছে। অভক্তরা বিড়ি, সিগারেট, খৈনি, দোক্তা, জর্দা, হিরোইন, গাঁজা, চরস, এলএসডি খেয়ে নিজেদের এবং সমাজের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করেছে। উচ্ছৃঙ্খলতা ও ইন্দ্রিয়তর্পণ তথা অসংযত কামুকতার বশে সমাজ-বিজ্ঞানকে কলুষিত করছে। তাসপাশা ও জুয়ার আড্ডা জাঁকিয়ে মনোবিজ্ঞান দূষিত করছে। মাছ-মাংস, ডিম, রক্ত, হাড়, পিত্ত খেয়ে মনুষ্য জাতির ধর্ম-বিজ্ঞানটাই নষ্ট করছে। এইভাবে সমগ্র মানব সভ্যতাকে তাদের খেয়াল-খুশিমতো তছনছ করছে। বিজ্ঞানের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু ভগবানের ভক্তরা কখনও এরকম পাপ আচরণ করে না। কারণ তারা বিজ্ঞানের আসল ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন। অভক্তরাই বিজ্ঞান মানে না।

তৃতীয় কথাটি হচ্ছে বহু বিজ্ঞানীই ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। স্টিফেন, আইজাক নিউটন, আইনস্টাইন ইত্যাদি বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। স্যার আইজাক নিউটন তাঁর এক নাস্তিক বন্ধুকে বলেছিলেন, "দেখ, এই মহা বিশ্বের কত বড় বড় অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জ শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। এর পেছনে এক পরম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব রয়েছে। নইলে কি করে সম্ভব হয়। কোন কিছু করতে গেলে আমাদের কত রকমের পরিকল্পনা, কত বুদ্ধি খাটাতে হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের আবহমানকাল ধরে নিয়মশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিভাবে ওসব পরিচালিত হচ্ছে? নিশ্চয়ই কেউ পরিচালক রয়েছেন।"

বড় বড় খ্যাতনামা ডাক্তারগণও বলেন, "একটি প্রাণীর প্রাণসত্তা রয়েছে, সব রকম সুবন্দোবস্ত রয়েছে, কে এসব বিধান করেছে? আবার সুবন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও কি করে

প্রাণসত্তা শরীর থেকে নির্গত হয়? কোন্ অদৃশ্য শক্তি কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায়? নিশ্চয়ই বিধাতার ক্রিয়া কৌশল।"

পরিশেষে, কেউ যদি বুঝতে না পারে সে চিন্তা করতে থাকে, বুঝতে চেষ্টা করে। চিন্তাশীল লোকেরাই ভক্ত ভাবাপন্ন হন। হট্ মেজাজী লোকেরা হট্ করে একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়। কোন প্রকৃত বিজ্ঞানী হট্ করে মন্তব্য করেন না। তা ছাড়া বিজ্ঞানযোগ নামে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায় অধ্যয়ন করলে মানুষ বুঝতে পারবে যে, ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞানই চূড়ান্ত ও পরম বিজ্ঞান।

প্রশ্ন ১১১। কৃষ্ণকে ভগবান না বলে আমরা বিজ্ঞানকে কি ভগবান বলতে পারি না?

উত্তর ঃ আধুনিক যুগের অনেক বিজ্ঞানী রয়েছেন, তাঁরাও কিন্তু কৃষ্ণকে ভগবান বলছেন। এই জীবনের অন্তিমে অনেক মানুষ কৃষ্ণ বা হরির নাম করে। মানুষকে যখন শ্মশান চিতায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন 'হরিবোল হরিবোল' ধ্বনি দেওয়া হয়। যখন প্রথম পাঠশালায় ছাত্রদের হস্তাক্ষর শেখানো হয় তখন খাতার উপরে 'শ্রীশ্রীহরি' লিখতে হয়। কিন্তু আপনার মতো ইদানীং কলির বিজ্ঞানীরা হয়তো খাতার উপরে 'শ্রীশ্রীহরি' না লিখে 'জয় বিজ্ঞানের জয়' লিখবে কিংবা শ্মশান চিতায় 'হরিবোল হরিবোল' ধ্বনি না দিয়ে 'বিজ্ঞানবোল বিজ্ঞানবোল' ধ্বনি দিতে পারবে।

প্রশ্ন ১১২। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান না বলে বাবা-মাকে ভগবান বলা কি উচিত?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে এক মহাপ্রতাপশালী দৈত্যের নাম পাওয়া যায়। তার নাম ছিল হিরণ্যকশিপু। তার এক পুত্র ছিল ভক্ত। তার নাম প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ বলেছিল, শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু হিরণ্যকশিপু বলেছিল, 'রে প্রহ্লাদ। আমিই ভগবান।' কিন্তু প্রহ্লাদ বলেছিল, 'হে অসুররাজ, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তোমার একতিলও ক্ষমতা নেই।' এই কথা শুনে হিরণ্যকশিপু খুব ক্ষেপে গেল। শেষ পর্যন্ত ভগবানের অবতার শ্রীনৃসিংহদেবের হাতেই নাড়িভুঁড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি হয়ে হিরণ্যকশিপুকে প্রাণ দিতে হল। তা ছাড়া অসুর হিরণ্যকশিপুর মতো এখন কেউ ক্ষমতাশালী নেই। আমাদের কারও পিতামাতাও দাবি করে বলেন না, 'হে পুত্র! আমরাই ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নয়।'

প্রশ্ন ১১৩। আমি মনে করি মানুষই ভগবান। এছাড়া আর কোন ভগবান নেই। কারণ, মানুষকে ডাকলে মানুষ কাছে আসে। সে বিপদে আপদে রক্ষা করে। কিন্তু সারাদিন ধরে ভগবানকে ডাকলেও তাঁর হদিশ পাওয়া যায় না। অতএব সেই রকম ভগবানকে বিশ্বাস কি?

উত্তর ঃ আপনার কথা হল মানুষই ভগবান। তা হলে আপনি একজন মানুষ। অতএব আপনিই ভগবান। সুতরাং আপনার আবার কি বিপদ থাকতে পারে যে, অপরকে রক্ষা করবার জন্য ডাকতে হবে। আপনার পরের কথা হল আর কোন ভগবান নেই। অর্থাৎ, মানুষ ছাড়া আর কোন ভগবান বলে কিছু নেই। তা হলে পৃথিবীতে

সাত শত কোটি মানুষ বাস করছে। অতএব আপনার কথা মতো পৃথিবীতে সাত শত কোটি ভগবান রয়েছে। কিন্তু আপনার একটি সুন্দর ধারণা আছে যে, ভগবান বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করেন। কিন্তু আপনি যদি ভগবান হন কিংবা অন্য কোন মানুষ যদি ভগবান হয় তবে আপনার কিংবা অন্য কোন ভগবানের আবার কিসের বিপদ থাকতে পারে। ভগবানের তো বিপদাপন্ন হওয়ার কথা নয়। ভগবানকে বলা হয় বিপদ-ভঞ্জন হরি।

যাকে ডাকলে কাছে আসবে সে-ই যে ভগবান হয়ে যাবে, এরকম যুক্তির কোন মূল্য নেই। পিতা তাঁর পুত্রকে, ব্যবসায়ী খরিদ্দারকে, শিক্ষক ছাত্রকে, প্রভু তাঁর ঝি-চাকরকে কাছে ডাকতে পারেন। তাতে যদি তাঁরা কাছে যায়, এমন কি কোন বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যও, তার ফলে কি পুত্র, খরিদ্দার, ছাত্র, ঝি-চাকর ভগবান বলে গণ্য হবে?

যে ব্যক্তি বিপদে রক্ষা করে সে-ই ভগবান। এই ধারণাও ভিত্তিহীন। যে মানুষটি আজ বিপদে রক্ষা করল, কালকে হয়তো অন্য বিপদে রক্ষা করতে পারল না। পরের দিন রক্ষাকর্তা না হয়ে সেই মানুষই নতুন রকমের বিপদ বা বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তা হলে কি, যখনই বিপদ থেকে রক্ষা করল তক্ষুণি ভগবান হয়ে গেল, আর যখনই সেরূপ করল না, তখনই অ-ভগবান হয়ে গেল। এরূপ উদ্ভট ধারণার কি মূল্য?

ভগবানকে ডাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, কিন্তু মানুষকে নাকি ডাকলে মানুষকে পাওয়া যায়। অতএব মানুষের মূল্যই অধিক। এরূপ কথা নির্বুদ্ধিতা। আমাদের জানতে হবে ভগবানকে পেতে হলে ভক্তিতে ডাকতে হয়। ভগবান আমাদের হুকুম পালনকারী নন যে, ডাকলেই পৌঁছে যাবেন। মানুষ নিজ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে বা নিজের বিপদ অনুভব করলে সেইসব মানুষকে শত শত ডাকাডাকি করলেও কর্ণপাত করবে না। সেই ধারণা অনেকের তো আছে।

ভগবানকে বিশ্বাস না করতেই পারেন। আগের থেকেই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে*—'হে রাজন্। অল্পপুণ্যবান ব্যক্তির বিশ্বাস জাগে না।'

প্রশ্ন ১১৪। ভগবদ্ শাস্ত্র বিনা অন্য কোনও শাস্ত্রের কি কোনও মূল্য নেই?

উত্তর ঃ প্রত্যেক শাস্ত্রের মূলসূত্র বেদ থেকেই এসেছে। এই জগৎ, পরমার্থজগৎ সম্পর্কে সমস্ত কিছু সেই শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি। কিন্তু সেই সবের মূল বা আদি উৎস্ পরমেশ্বর ভগবানই। অতএব যে শাস্ত্র হোক না কেন তার মধ্যে যদি ভগবানকে খুঁজে পাওয়া না যায়, সত্যি কথা বলতে কি সেই সব শাস্ত্র আমাদের জীবনে পরম শান্তি বা আনন্দের সন্ধান দিতে পারে না, বরং আপাত চমকপ্রদ বলে মনে হলেও সেই শাস্ত্রই আমাদের দুঃখযন্ত্রণা ও হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

জীব সৃষ্টিকারী শ্রীব্রহ্মা বলেছেন—"দুর্ভাগা মূর্খরাই ভগবৎকথা বাদ দিয়ে অনর্থক নানাবিধ জাগতিক বিভ্রান্তিকর কথায় মনোনিবেশ করে।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমার লীলাদি কথা বর্ণিত নেই এমন সমস্ত শাস্ত্রবাক্য কারা পোষণ করে,—যারা দুঃখভাগী ব্যক্তি এবং তাদের সেই শাস্ত্রপোষণের তাৎপর্য কি,—কেবল বিড়ম্বনা। যেমন—দুধহীন গাভী, সতীত্বহীন ভার্যা, পরাধীন দেহ, সৎপাত্রে অনর্পিত ধন কেউ যদি রক্ষা করে বা পোষণ করে তবে সেই সব কেবলই দুঃখের হেতু হয়ে দাঁড়ায়। তেমনই ভগবৎ কথাহীন শাস্ত্রবাক্যও বিড়ম্বনা স্বরূপ।

গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্যাং
দেহং পরাধীনমসৎ প্রজাঞ্চ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী॥

"হে উদ্ধব! উত্তরোত্তর দুঃখভাগী ব্যক্তিই দুগ্ধহীনা গাভী, অকামা ভার্যা, পরাধীন দেহ, সৎপাত্রে অদত্ত ধন এবং ভগবৎ লীলাদিবর্ণনারহিত শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করতে থাকে।" (ভাঃ ১১/১১/১৯)

সব শাস্ত্রই এই দুঃখময় জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভগবৎ শাস্ত্র দুঃখময় জগৎ থেকে নিত্য জীবনে প্রত্যাবর্তনের শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন ১১৫। জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে থেকে মানুষের পূর্বজন্মের কথা কেন মনে থাকে না?

উত্তর ঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বদ্ধ জীব স্বভাবতই বিস্মৃতি প্রবণ হয়। এটিই জড় বদ্ধজীবনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। নানা ঘটনা পরম্পরায় পরবর্তী ঘটনা ও পরিবেশের প্রভাবে জীব পূর্ববর্তী ঘটনাটির কথা বিস্মৃত হয়। গতকালে সব ঘটনার কথা স্মরণ করাও আজ সম্ভবপর হয় না। পূর্বজীবনের কথা কেউ যদি স্মরণ করতে পারে তবে সেটি তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বিশেষ রূপে স্মৃতি বহন করার শক্তি তার মধ্যে রয়েছে বুঝতে হবে। তাদের জাতিস্মর বলা হয়। জন্মাবার চার থেকে ছয় বছর পরও পূর্ব জন্মের কথা বলতে পারে। কিন্তু সেটি সবার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

প্রতিদিন নানাবিধ বিপরীত প্রতিক্রিয়া, নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনা স্মৃতিপটে ভীড় করার ফলে ঘটনাগুলি সঠিকভাবে প্রস্ফুটিত হয় না। তাই স্মরণ করাও যায় না। একজন একটি বিষয় একবার পড়ে সারাজীবন মনে রাখতে পারে, কেউ বা বার বার পড়েও স্মরণ করতে পারে না।

আমরা পূর্বজীবনের কথা ভুলে আছি বলে পূর্বজীবন ছিল না তা মনে করা ঠিক নয়। শাস্ত্রমত হল আমরা মনুষ্য জন্ম পেয়েছি মানেই আমরা ইতিমধ্যে কমপক্ষে আশিলক্ষ প্রকার জীবন অতিক্রম করে গেছি।

অতীতের জীবনগুলির কথা আমরা ভুলে বসে আছি। অতএব মাথা চুলকিয়ে স্মরণ করাও সম্ভব নয়। তাই ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য এই জীবন একটি প্রস্তুতি পর্ব মনে

করে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন প্রণালীতে দিন অতিবাহিত করাই কর্তব্য। এভাবে এই জীবনের অন্তিম দিনে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়া যায়। ভগবদ্ধামে যখন জীব ফিরে যায় তখন তার ইহ জন্মের কথাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয় না। যেমনটি স্বপ্নমধ্যে যা কিছু ঘটছে স্বপ্ন দেখাকালীন সেই সব ঘটনার গুরুত্ব অনেক বলে মনে হয়। কিন্তু জেগে উঠলে সেই স্বপ্নের তেমন গুরুত্বও থাকে না। কিছুক্ষণ পরে সেই সব কথা ভুলে যাওয়াই হয়।

প্রশ্ন ১১৬। কোনও তামসিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি কি নিজ চেষ্টায় সাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত হতে পারে, পরমেশ্বর শ্রীহরির কৃপা ব্যতিরেকে?

উত্তর ঃ উদাহরণ যোগে বিষয়টি সহজে উপলব্ধি করা যেতে পারে। যেমন, গীতায় শ্রীহরি বলছেন যে, *অমেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং।* তামসিক স্তরের মানুষদের প্রিয় খাদ্য হল রক্ত মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য। তামসিক ব্যক্তি এই ব্যাপারে না জানতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে মানুষ এই সব কথা বেদশাস্ত্র কিংবা শ্রীহরির ভক্তগণের মাধ্যমে জানতে পারে। এই সব বৈদিক নির্দেশের প্রতি যখন কারও হৃদয়ে শ্রদ্ধা থাকে, তখন সে সতর্ক হয়ে যায়। এই শ্রদ্ধা জিনিষটি মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। *শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।* শ্রদ্ধা থাকলে তবে সে ঠিকঠিকভাবে ভালমন্দ সব কিছু বুঝতে পারবে। *আদৌ শ্রদ্ধা।* মানুষের সর্বপ্রথমে দরকার শ্রদ্ধা। অজ্ঞানের অন্ধকারে অধিকাংশ জীব আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। এদিক থেকে প্রায় সবাই তামসিক ভাবাপন্ন। কিন্তু কোনও ত্রিগুণাতীত মহাজন আমাদেরকে অহৈতুকী কৃপাবশত জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির যাতনাময় সংসার চক্র থেকে উদ্ধার উদ্দেশ্যে শুদ্ধ-সাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত হওয়ার উপদেশ দেন। এমন কি কোনও সাত্ত্বিক ব্যক্তি কমপক্ষে সাত্ত্বিকস্তরে আসার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা না থাকলে আমি তাঁদের কৃপাদৃষ্টির সদ্ব্যবহার করব না। আমি তামসিক স্তরেই পড়ে থাকব। অর্থাৎ, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তামসিক ব্যক্তির প্রিয় খাদ্য মাছ-মাংস-ডিম ইত্যাদি ছাড়তে কোনও অসুবিধা না হলেও বেদবাক্যের প্রতি অশ্রদ্ধাহেতু কুসঙ্গ প্রভাবিত হয়ে আমি কখনও সেগুলি ছাড়ব না। নেশা করা ভাল নয় জেনেও বিড়ি-সিগারেট-গাঁজার ধোঁয়া খেতে ছাড়ব না। মন্দ হলেও আমি বদ অভ্যাস ত্যাগ করব না। চিন্তা ভাবনা আচরণও আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মন্দের বিপরীত অভ্যাস করলে সুফল লাভ হয়, *অভ্যাসযোগেন সিদ্ধতে।* শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা বলেছেন।

আমাদের উপর শ্রীহরির কৃপা থাকলেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য বা নিজ ইচ্ছাশক্তি সেই কৃপার অনুকূলে রাখব কিনা সেটিও ব্যক্তিগত প্রবণতা মাত্র। সাত্ত্বিক কেন, শুদ্ধসাত্ত্বিক হওয়ার জন্য ভগবৎকৃপা লাভের প্রতি উন্মুখ হওয়ার নিজস্ব ইচ্ছা যদি থাকে তা হলে অবশ্যই ঘোর তামসিক পর্যায়ের ব্যক্তিও সেই উন্নত স্তরে পৌঁছে যেতে পারে। আর একটি উদাহরণ হল, রাত্রে তামসিকগুণ আলস্য বশত ঘরের ভেতর বিছানায় পড়ে আছি। তারপর সকালে সূর্য তাঁর তাপ ও আলোক শক্তি সবার জন্য দান করতে পূর্ব আকাশে

উদিত হয়েছেন। ঘরের মধ্যে অলস ব্যক্তিকে কেউ না কেউ কৃপা করে ডাকেন, "উঠে পড়ো, সকাল হয়েছে।" কিন্তু তামসিক অলস ব্যক্তি সেই ডাক শুনেও লেপের ভেতরে ঢুকেই থাকে। এখন, তার যদি আগ্রহ না থাকে, ওঠার কোনও প্রকার প্রবণতা বা চেষ্টা না থাকে, তা হলে সূর্যদেব এসে তাকে উঠতে বাধ্য করবেন না। সূর্যদেব কখনও বলবেন না যে, "হে আলস্য পরায়ণ, তুমি আমার শুদ্ধ সাত্ত্বিক আলোকময় স্তরে স্থিত হও।"

অর্থাৎ, শ্রীহরির কৃপা রয়েছে, কিন্তু নিজের ইচ্ছাশক্তিটা যেদিকে ব্যবহার করব সেই ভাবের স্তরে থাকব। যস্য যাদৃশী ভাব তস্য তাদৃশী লাভ। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।

প্রশ্ন ১১৭। কোনও ব্যক্তির সার্বিক উন্নতি বা অবনতিতে দৈব অনুগ্রহ কিং বা পুরুষকার—কোন্‌টির প্রভাব বেশী?

উত্তর ঃ উভয়ই প্রয়োজন। দৈব অনুগ্রহ বা কৃপা ছাড়া নিছক চেষ্টা বা পুরুষকার পরিণামে বিফলতা দান করে। কৃপা ও চেষ্টা দুটিই দরকার। দৈব কৃপায় কেউ বহু ধনের অধিকারী হল, কিন্তু সেই ধনের যথার্থ ব্যবহার করার মতো যদি চেষ্টা না থাকে তবে সেই কৃপাও বিফলে পতিত হয়। সেই ধন হয়তো লোকে চুরি করল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই ব্যাপারে সুন্দর শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিড়াল ছানা নিজের থেকে চেষ্টা করে না, মা-বিড়াল সেই ছানাগুলোকে মুখে করে নিরাপদ আশ্রয়ে যত্ন করে রাখে। ছানাগুলি সম্পূর্ণ মা-বিড়ালের উপর নির্ভরশীল। আবার এর বিপরীত হচ্ছে বানর ছানা। বানর ছানা মা-বানরকে নিজের শক্তিসামর্থ্য দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকে। মা-বানর গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়ায়। ছানাদেরকে সে ধরে থাকে না। ছানারাই নিজেরা মা-কে ধরে থাকার চেষ্টা করে।

এক্ষেত্রে বিড়াল ছানা দৈব অনুগ্রহের এবং বানর ছানা পুরুষকারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

নিজে কিছু করব না, সব দৈবের উপর নির্ভর করে থাকব, কিংবা দৈব কৃপা ছাড়াই পুরুষকার দেখিয়ে সব কাজে সফল হব—এই দুইই অপূর্ণ মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভাবনা।

একই সঙ্গে এই দুটির সমন্বয় সাধনের কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন। গভীর কূপে পতিত জীবকে কৃপা করে তুলে টানবার জন্য কেউ একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে পতিত ব্যক্তিকে উঠে আসবার নির্দেশ দিল। আর সেই পতিত ব্যক্তি দড়িটাকে আঁকড়ে ধরে থাকল। এইভাবে দৈব অনুগ্রহ এবং পুরুষকার এই উভয়ের সমন্বয়ের ফলে ভবকূপ থেকে বদ্ধজীব উদ্ধার পায়।

প্রশ্ন ১১৮। দেবদেবীর পূজাতে হাঁস ছাগল মহিষ ইত্যাদি বলি দেওয়ার প্রচলন এখনও অব্যাহত। এটা কি কুসংস্কার, না শাস্ত্রসম্মত?

উত্তর ঃ ভাগবতের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য এস্থলে উল্লেখ্য—"গীতায় (৬/৪১) ভগবান বলেছেন, *শুচীনাং শ্রীমতাং গৃহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*—কিছুটা ভক্তি অনুশীলনের ফলে

মানুষ উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে। তখন তার কর্তব্য ভক্তি যোগে সিদ্ধিলাভের জন্য সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। কিন্তু অসৎ-সঙ্গের ফলে মানুষ ভুলেই যায় যে, সে সম্ভ্রান্ত পদ প্রাপ্ত হয়েছে, তাই সে কালীপূজা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি তথাকথিত যজ্ঞে অসহায় পশুগুলোকে বলি দিয়ে তার ব্রাহ্মণ জন্ম লাভের সুযোগের অপব্যবহার করে। সেই ধরনের মানুষের জন্য বিশসন নামক নরক অপেক্ষা করছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, *যে ত্বিহ বৈ দাম্ভিকা দম্ভ যজ্ঞেষু পশূন্ বিশসন্তি তানমুষ্মিন্ লোকে বৈশসে নরকে পতিতান্নিরয়পতয়ো যাতয়িত্বা বিশসন্তি।* অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ইহলোকে ধন ও প্রতিষ্ঠার গর্বে গর্বিত হয়ে, দম্ভ প্রকাশ করার জন্য যজ্ঞে পশুবলি দেয়, তাকে দেহত্যাগের পর বিশসন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমদূতেরা অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে তাকে বধ করতে থাকে।" (ভাঃ ৫/২৬/২৫)

মানুষকে যদি শুদ্ধ জীবনে ফিরে আসতে হয় তবে 'বলি' কুসংস্কারটি অবশ্যই বরবাদ করতে হবে।

প্রশ্ন ১১৯। হরিনামে ব্রতী হয়ে দীক্ষা নিতে গেলে কি আপনাদের ধারায় দীক্ষা নিতে হবে? কুলগুরু দ্বারা দীক্ষিত হওয়ার কী কোনও মূল্য নেই? দয়া করে যদি বিস্তৃতভাবে জানান তাহলে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ শ্রীপদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িণঃ॥
শ্রী-ব্রহ্মা-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥

"সম্প্রদায়বিহীন ব্যক্তির কাছ থেকে দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করলে সেই মন্ত্র নিষ্ফল হয়। কলিযুগে চারটি মূল সম্প্রদায় থাকবে। সেই জগৎ উদ্ধারকারী চার প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায় হল শ্রী-সম্প্রদায়, ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, রুদ্র-সম্প্রদায় ও সনক বা কুমার-সম্প্রদায়। পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত সনাতন শিক্ষা কলিযুগে এই চার সম্প্রদায় প্রচার করবে।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই চার সম্প্রদায়কে স্বীকার করেছিলেন। সনাতন বৈষ্ণবধর্ম শ্রীবিষ্ণুর থেকে শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী তাঁর প্রতিনিধি শ্রীরামানুজ আচার্যের মাধ্যমে, শ্রীব্রহ্মা মধ্বাচার্যের মাধ্যমে, শ্রীশিব বিষ্ণুস্বামীর মাধ্যমে এবং সনৎকুমার নিম্বার্ক আচার্যের মাধ্যমে জগতে প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবার নিজেকে মধ্ব আচার্যের ধারায় অন্তর্ভুক্ত করেন। আর এই সম্প্রদায়ের ধারায় আমাদের পূর্বতন আচার্য সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায় দুই শত বছর পূর্বে জগতে তথাকথিত কতগুলি ধর্মপ্রচারকারীদের লক্ষ্য করেন যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্ধারিত তথা শ্রীমদ্ভাগবত নির্দিষ্ট কলিযুগের চারটি পাপাচার—আমিষ আহার, নেশা ভাঙ, জুয়া খেলা ও অবৈধ যোষিৎসঙ্গ বর্জনের

নিয়মনীতি পালনে আগ্রহী নয়, সেই সম্প্রদায়বিহীন দলের লোকদের অপসম্প্রদায় বলে নির্দেশ করা হয়েছে। তেরো রকমের অপসম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ রয়েছে। যেমন—

আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাতগোসাঞি॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ নাগরী।
তোতা কহে, এ তেরর সঙ্গ নাহি করি॥

ইদানিং আরও নতুন রকমের কত দল বেরিয়েছে, মোটামুটি তাদের চেনার সহজ উপায় হল, তারা বিড়ি মাছ মাংসে আসক্ত রয়েছে। যদিও বা তারা হরিকথা গান করে আর তুলসীমালাও গলায় পরে।

প্রশ্ন ১২০। আমরা জানি গীতা মানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। কিন্তু গুরুগীতা, শিবগীতা, অর্জুনগীতা—এরকম প্রভেদ হওয়ার কারণ কি?

উত্তর ঃ 'গীতা' কথাটির অর্থ হচ্ছে যা গীত বা গান করা হয়েছে। চিন্ময় জগতের কারও মুখনিঃসৃত কথাগুলি গানের মতো, চলাফেরা নাচের মতো। *কথা গানং নাট্যং গমনমপি।* (ব্রহ্মসংহিতা) মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীগুলি সুন্দর ছন্দোবদ্ধ আকারে প্রকাশিত। গীতা মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে যে, *একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্*—জগতে সমস্ত শিক্ষার সারগ্রন্থ হচ্ছে দেবকীপুত্র বা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গীত—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সাধারণতই গীতা বলতে বোঝায় শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

কিন্তু গুরুগীতা, শিবগীতা, অর্জুনগীতা ভগবানের স্তুতি মূলক কোনও অধ্যায় থাকতেই পারে। শিব ঠাকুর গীত করছেন পুরাণের এমন কোনও অংশ বা অধ্যায় শিবগীতা নামে পরিচিত হতেই পারে।

প্রশ্ন ১২১। সমগ্র জগতে কয় প্রকার জীব আছে?

উত্তর ঃ জীব দুই প্রকারের। ১) বদ্ধ জীব এবং ২) মুক্ত জীব। মুক্ত জীব জড় জগতের উর্ধ্বে বৈকুণ্ঠ-জগতে থাকে, আর জড় জগতের মধ্যে যারা রয়েছে তারা বদ্ধ জীব।

সেই বদ্ধ জীব আবার দুই ধরনের—১) উদিত বিবেক এবং ২) অনুদিত বিবেক। যে সমস্ত জীব পরমার্থ সাধনায় যুক্ত হয়েছে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করছে, তাদের বলা হয় উদিত বিবেক।

আর যে সমস্ত জীব পরমার্থ চেষ্টাবিহীন, তাদের বলা হয় অনুদিত বিবেক।

প্রশ্ন ১২২। প্রাচীনকালে ধার্মিক রাজাদের একাধিক বিবাহ করবার রহস্য কি?

উত্তর ঃ প্রাচীনকালে ধর্মতঃ একাধিক বিবাহ করার প্রথা ছিল। রাজকন্যারা একজন যুবরাজকে পতিরূপে মনোনয়ন করতেন। লক্ষ্য করা যায়, কোনও রাজা তাঁর কন্যাকে

বিবাহিত রাজার হাতে সমর্পণ করেন এবং কন্যাও স্বভাবতই তাতে মত দিয়ে থাকে। যেমন, মদ্ররাজের কন্যা মাদ্রীকে হস্তিনাপুররাজ পাণ্ডু বিবাহ করেছিলেন, যদিও কুন্তীদেবী আগেই তাঁর পত্নী রয়েছেন। জগতে কন্যা অপেক্ষা বরের সংখ্যা কম। তাই উপযুক্ত বরের বহু বিবাহ স্বীকৃত হয়েছিল। একজন বীরপুরুষের অধিক পত্নী থাকলেও পত্নীরা স্বভাবতই পতিপরায়ণা ও নিষ্ঠাবতী থাকতেন।

কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজে কোন কোন নিয়মাচার বিহীন ব্যক্তি এক পত্নীতে সন্তুষ্ট নয়, নতুন নতুন পত্নীতে আকৃষ্ট হয়। শেষে কোনও স্বার্থ, কিংবা সামাজিক চাপের ফলে বিবাহ করতে হয়। কিংবা স্ত্রী বন্ধ্যা হলে অন্য পত্নী গ্রহণের চিন্তা করে। বহু পত্নীর পরিবারে সতীনকলহ একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন ১২৩। ধর্মপ্রাণ হয়েও রাজারা বনে শিকার করতে যেতেন কেন?

উত্তর ঃ মহাভারতে অনুশাসন পর্বে ১১৬ অধ্যায়ে শ্রীভীষ্মদেব ক্ষত্রিয় রাজাদের বনে শিকার করতে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মৃগয়াশীল ব্যক্তি প্রাণপণেই মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়। 'হয় বন্য জীবজন্তুরা আমাকে বিনাশ করুক না হয় আমি তাদের সংহার করব'। মৃগয়া কালে মানুষের অন্তঃকরণে এরকম ভাবের উদয় হয়ে থাকে। দেশে দেশে যুদ্ধকালে 'হয় মারব, না হয় মরব' এই মনোভাবের অনুশীলন করা ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই কারণে শিকার করা দোষাবহ ও পাপজনক নয় বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু তবুও পরমার্থ অনুশীলনকারী ব্যক্তির কখনও শিকার করা উচিত নয়। যখন রাজারা কোনও মুনিঋষির নির্দেশে পরমার্থ অনুশীলনে ব্রতী হতেন তখন এসব কর্ম ত্যাগ করেছেন। এ যুগে মৃগয়া নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ১২৪। আপনারা যে যাবতীয় প্রশ্নের বা সমস্যার সমাধান হিসাবে শাস্ত্রের দোহাই দেন, কিন্তু শাস্ত্রই যে ঠিক বা নির্ভুল তার প্রমাণ কি?

উত্তর ঃ এই জগতে কোন কিছু সমস্যার সমাধান করতে হলে, কোন কিছু উপলব্ধি করতে হলে তার জন্য সিদ্ধান্তসূত্র লোকে শাস্ত্র থেকেই প্রতিপন্ন করে। আমরা ভুল কি নির্ভুল রয়েছি তার জন্য শাস্ত্র থেকে প্রমাণ নিরূপণ করতে হয়। কিন্তু আপনার প্রশ্নটা উল্টো ধরনের। যেমন, অংকশাস্ত্রে বলা হয়েছে, দুই আর দুই যোগ করলে চার হয়। এটি একটি সূত্র। এখন আপনি যদি মনে করেন, এই অংকশাস্ত্র যথার্থ কিনা তার প্রমাণ কি? আপনি নিজেই প্রমাণ করতে পারবেন। বিষ্ণুপুরাণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে ব্রহ্মাণ্ডে চুরাশি লক্ষ রকমের জীব রয়েছে, তাদের মধ্যে গাছপালা বিশ লক্ষ রকমের। আপনি যদি প্রমাণ চান গাছের প্রাণ আছে—সেটি ভুল না ঠিক, তখন আপনি নিজে জগদীশ আচার্যের মতো গবেষণা করতে পারেন।

শাস্ত্র মায়ের মতো। মা যখন বলেন, 'বাছা এই ব্যক্তি হচ্ছে তোমার বাবা।' তখন সেটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য কথা বলে মেনে নিতেই হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে 'ইনি আমার বাবা'—প্রমাণ কি? সেইরকম প্রমাণ করতে হলে বুঝতে হবে আপনার মায়ের উপর আস্থা-শ্রদ্ধা নেই। তখন যথার্থ বাবা কিনা মাকে বিচার করতে যদি চান তবে একটা উজবুকের

মতো মা-বাবার শরীরের রক্ত নিয়ে দুজনার রক্ত মিশিয়ে বিশাল গবেষণার কাণ্ডকারখানা বসাতে হবে। তারপর হয়তো মায়ের আশীর্বাদ পেতে পারবেন, 'আহা! আমার পণ্ডিত পুত্র, আমি সতী কিনা তার বিচার করতে আমার রক্ত নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে!' তা ছাড়া সেই গবেষণা পদ্ধতির জন্যও কোনও বিজ্ঞানশাস্ত্রের সূত্র তো লাগবেই। আবার সেই বিজ্ঞানশাস্ত্রটাই নির্ভুল কিনা তার প্রমাণ করতে আর একটা গবেষণা-কেন্দ্র খুলতে হবে। তারপর যে মস্তিষ্ক নিয়ে আপনি গবেষণা বা প্রমাণ অনুসন্ধান করবেন—সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মস্তিষ্কটি নির্ভুল কিনা তারই বা প্রমাণ কে দেবে?

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী তিথি-নক্ষত্র-বার-ব্রত এগুলি ঘটে থাকে। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ কোথায় কখন দেখা যাবে এসব বলা হয়ে থাকে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আমাদের কোন্ কোন্ ব্যাধিতে কোন্ জাতীয় পথ্য ও ঔষধ খেতে হবে বলা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে কোন্ কোন্ কর্ম করার ফলে আমাদের কি ধরনের দশা লাভ হয়। কিন্তু সেই সব শাস্ত্র যথার্থ কিনা, নির্ভুল কিনা তার প্রমাণ চাইতে গেলে আপনাকে অবশ্যই প্রয়োগ কলাকৌশল চালিয়ে যেতে হবে। যেমন ভূগোলশাস্ত্রে বলা হল, আমাদের এই পৃথিবীগ্রহে ভারত বলে একটি দেশ আছে। ভারতের বিপরীত দিকে আমেরিকা। তখন আপনি প্রমাণ চাইতে গেলে আপনাকে ভিসা পাসপোর্ট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে পৃথিবীর অপর প্রান্তে যেতে হবে। তা হলে সত্যতা প্রমাণিত হবে। তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের কথাগুলি সত্য কিনা যদি প্রমাণ পেতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই ভাগবতধর্ম আচরণ করে প্রমাণ পেতে হবে।

আপনার ভালভাবেই বোঝা উচিত যে, ভুল-নির্ভুল সত্য-মিথ্যা প্রমাণের জন্য যে মানদণ্ড দরকার, সেই মানদণ্ডটি বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতেই গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু 'বৈদিক শাস্ত্র' যখন নির্ভুল নয় বলে মনে করেন, তখন আপনার প্রমাণ চাওয়ারও অধিকার নেই বলে জানতে হবে।

প্রশ্ন ১২৫। দ্রৌপদীর পাঁচজন স্বামী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সতী বলে বিখ্যাত। অথচ এ সমাজে কোন মেয়ের পাঁচটা স্বামী হলে তাকে অসতী বলা হবে কেন?

উত্তর ঃ যেহেতু কোন মেয়ে দ্রৌপদীর মতো হতে পারে না, তাই অসতী বলে প্রতিপন্ন হবে। দ্রৌপদী এ সমাজের মেয়েদের মতো কোনও সাধারণ মেয়ে ছিলেন না। দ্রুপদ রাজার যজ্ঞের অগ্নি থেকে তাঁর জন্ম হয়েছিল। পূর্বজীবনে তিনি এক ঋষির কন্যা ছিলেন। অতি কঠোর তপস্যা করে তিনি শ্রীশিব ঠাকুরের প্রীতি সাধন করে ছিলেন। তখন প্রসন্ন হয়ে শিব তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি করজোড়ে শিব ঠাকুরের কাছে পতি লাভের বাসনা ব্যক্ত করেন। "হে মহাদেব, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে যাতে আমি সর্বগুণ সম্পন্ন পতি লাভে চরিতার্থ হতে পারি, এরূপ বর প্রদান করুন।" এই কথা পাঁচবার উচ্চারণ করেন এবং প্রতিবারই শিব ঠাকুর 'তথাস্তু' বলেছিলেন। তারপর শিব বলেন, "হে কন্যা, তুমি পাঁচবারই পতি বাসনা করেছ, তাই পরজন্মে রাজকন্যা রূপে জন্ম নিয়ে দেবগুণসম্পন্ন পঞ্চপতি লাভ করবে।" তারপর পরজন্মে সেই ঋষিকন্যা

মহর্ষি উপযাজ কৃত যজ্ঞ থেকে উত্থিতা হন। দ্রুপদ রাজার কন্যারূপে তিনি দ্রৌপদী নামে আখ্যাতা হন। তারপর তাঁর পঞ্চপতি হওয়ার ঘটনাটিও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ সমর্থন করেছেন।

প্রশ্ন ১২৬। ছারপোকা, উকুন, ইঁদুর, আরশোলা, টিকটিকি, মাছি, পিঁপড়ে ইত্যাদি প্রাণীগুলির কবল থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য বৈদিক কলাকৌশল কি? আমরা নিরামিষাশী, কোনও প্রাণী হত্যা করতে চাই না।

উত্তর ঃ নিরামিষাশীরা কোনও প্রাণী হত্যা করে না—এটি ভুল কথা। গাছপালারও প্রাণ আছে কিন্তু সেটি বৈদিক শাস্ত্র অনুমোদিত বলে পাপ নয়। গাছপালাকে ভগবদ্ প্রসাদ রূপে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্বাসকার্য, জলপান, অগ্নি প্রজ্বলন, ঝাড়ু দেওয়া, ভূমি খনন, হাঁটাচলা ইত্যাদি কর্মে অসংখ্য প্রাণী হত্যা করা হয়েই থাকে। বেগুন ঢেঁড়স কাটতে গিয়ে পোকা কাটা হয়ে থাকে। যার জন্য বৈদিক শাস্ত্রে পঞ্চসূনা যজ্ঞ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অজান্তে বহু পোকামাকড় হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু জেনে শুনে হত্যা করা উচিত নয়। হাঁটা চলার ক্ষেত্রে পিঁপড়ের ওপরও যাতে পা না পড়ে তা লক্ষ্য করা উচিত। নিমপাতা থেঁতলে রাখলে ঘরের ভেতর মাছি আসে না। মিষ্টিজাতীয় বা তেলজাতীয় কোন কিছু দ্রব্য অযত্নে রাখলে তেলাপোকা বা পিঁপড়ের আমদানী হয়। অন্যের উকুনযুক্ত মাথার সংস্পর্শে থাকলে উকুন আসবে। আলো বাতাস লাগা ঘরে ছুঁচো ইঁদুরের বসবাস হয় না। আর যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকার আমদানী হয় সেখানেই টিকটিকি থাকতে চায়।

এমনকি যথাসাধ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন ভাবে ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছায়। আপনার ঘর আপনি পরিষ্কার রাখলেও আপনার ঘরের বাইরের পোকাগুলি ঘরের ভেতরে এসে ঢুকবে। আপনার ঘরের বাইরেটা পরিষ্কার থাকলেও অন্য স্থানের পোকাগুলি সেখানে আসতেই পারে। ফুল তুলতে গিয়ে ফুলগাছের পিঁপড়েগুলো ফুলের সঙ্গে মন্দিরে চলে আসে। মন্দির পরিষ্কার করতে গিয়ে সেগুলি মারা পড়তেই পারে। এইভাবে কীটাদি সমাকীর্ণ জগতে বাস করে কীটমুক্ত হয়ে থাকাও সম্ভব নয়। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পোকামাকড় হত্যা হয়েই থাকে। তাই এই জগতে একজনের বাস করার অর্থ হল অন্যদের অসুবিধা সৃষ্টি হওয়া এবং অন্যের প্রাণহানির কারণ হওয়া। এই জগতে অবস্থানের অর্থই হল জানা অজানা পাপ কর্মে লিপ্ত হওয়া এবং পাপকর্ম দোষে দুঃখময় জগতে আবদ্ধ হয়ে থাকার মেয়াদ বৃদ্ধি করা। তাই বিশুদ্ধ পন্থা হল, যতদিন এই জগতে থাকা যাবে ততদিন অনবরত পরমেশ্বর শ্রীহরির নাম জপ কীর্তন করে, ভক্তিসেবায় যুক্ত হয়ে, চিন্ময় জগতে উন্নীত হওয়ার জন্য যত্ন নিতে হবে। সেটিই যথার্থ বৈদিক কলাকৌশল। *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।*

প্রশ্ন ১২৭। মহাপ্রভু, মহামন্ত্র, মহাপ্রসাদ—মহা শব্দটির তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ বিশেষরূপে সর্বোচ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ এই অর্থে 'মহা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।

"পূর্বে যা দেওয়া হয়নি, সেই উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী প্রেমভক্তিসম্পদ দান করবার জন্য যিনি করুণাবশত এই কলিযুগে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন" তিনিই গৌরহরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'মহাপ্রভু'।

কলিসন্তরণ উপনিষদে বলা হয়েছে, "সমগ্র বেদের মধ্যেও কলির কলুষ নাশকারী অন্য কোনও পন্থা বা উপায় নেই, একমাত্র ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।" তাই সর্বমন্ত্রের ঊর্ধ্বে এই 'মহামন্ত্র'—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সমস্ত দেবদেবী যাঁর অধরামৃত প্রসাদ পাওয়ার জন্য বাঞ্ছা করেন, যে প্রসাদে বদ্ধজীব জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির সংসারচক্র অতিক্রম করতে পারে, "প্রসাদসেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়"—সেই প্রসাদ হচ্ছে শ্রীহরির উচ্ছিষ্ট 'মহাপ্রসাদ'।

প্রশ্ন ১২৮। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, "আমি কর্তব্যকর্মে সব সময় রত আছি।" এটি কিভাবে উপলব্ধি করা যায়?

উত্তর ঃ সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবারনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি-স্থাপন সব কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাতলে অবতীর্ণ হয়ে নিজে আচরণ করে মানব সমাজকে শিক্ষা দান করেছেন, তা আমরা শ্রীমদ্ভাগবত থেকে জানতে পারি।

অনন্ত মহাবিশ্বের হর্তা কর্তা বিধাতা পরমেশ্বর ভগবান কিছুই কর্ম না করে চুপচাপ বসে আছেন এ কথা কি করে আমরা মনে করতে পারি? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্*—তাঁরই অধ্যক্ষতায় জড়াপ্রকৃতি চরাচর মহাবিশ্ব পরিচালনা করছেন। অনন্ত গ্রহপুঞ্জ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে আবহমান কাল ধরে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। *যস্যাজ্ঞয়া সংভৃত কালচক্রো।* শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী।

আমাদের কথা বলার শক্তি, হাত-পা নাড়বার শক্তি, দেখার শক্তি, শোনার শক্তি, ঘ্রাণ নেওয়া বা স্বাদগ্রহণের শক্তি, খাদ্য হজমের শক্তি, চিন্তা-শক্তি, বুদ্ধি, রক্ত চলাচলের শক্তি, শ্বাসকার্য চালানোর শক্তি সর্বোপরি আমাদের জীবনী-শক্তি—এসব কে দিয়েছেন? এ সমস্ত ভগবান দিয়েছেন বলেই আমরা ক্রিয়াশীল। তাঁর থেকে জীবনের সমস্ত উপাদান আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা নিজেরা নিজের শরীটাকেও বানাইনি, কিছু করিনি—সবই শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন। আমরা গ্রহীতা হয়ে কত রকমের কর্তব্যকর্ম করে চলেছি, আর দাতা হয়ে শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করছেন না—এরকমটি আমরা বলতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর দেওয়া জিনিষগুলিকে আমরা তাঁর প্রীতির উদ্দেশ্যে সদ্ব্যবহার করে সুখী হবো। কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁর দেওয়া প্রীতির সদ্ব্যবহার যদি না করি তবে তিনি আমাদের শক্তি হরণ করে নেবেন। যেমন, সূর্যদেব আমাদের আলো ও তাপ দান করছেন, যার ফলে আমরা বেঁচে আছি—ক্রিয়াশীল হচ্ছি, না হলে তো খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। অন্ধকার বিশ্বে পতিত হতে হবে। কিন্তু সারাদিন আমরা ভেবেও দেখি না যে, সূর্যদেব প্রতিদিনই আলোক ও কিরণদানের মতো কর্তব্য কর্মটি করে চলেছেন। যখন ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকি, মেঘলা আবছা দিনে পতিত হই তখন সূর্যদেবের অবদান উপলব্ধি করা যায়। কথায় বলে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝা যায় না। দাঁতটা পড়ে গেলে তখন বোঝা যায় দাঁত কত কাজ করত, হায় কতই না কষ্ট। সেই জন্য অকর্তব্য দোষে আমাদের দুঃখ পেতে হয়, ঝামেলা ভোগ করতে হয়। সেই সবই ভগবানের দেওয়া।

সমস্ত কিছুর ব্যবস্থাপনা কে করেছেন বা করছেন? এর উত্তর শ্রীকৃষ্ণ নিজেই দিচ্ছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্ত সর্বং প্রবর্ততে ।

"আমিই সমস্ত ব্যবস্থাপনার উৎস, আমার দ্বারাই সবকিছু প্রবর্তিত। *ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ*—'এই তত্ত্ব জেনে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ভক্তিভরে আমার ভজনা করেন।' (গীতা ১০/৮)

প্রশ্ন ১২৯। পুরী জগন্নাথদেবের মন্দিরে যে ফল বাবার চরণে নিবেদন করা হয় সেটি আর সেই ব্যক্তি খেতে পারে না। এর কি কোনও কারণ আছে? না কি কুসংস্কার?

উত্তর ঃ ফল ভোজন করতে বাবাকে যদি প্রীতিভরে নিবেদন করেন তবে সেই ফল নিজে খাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কারণ দেখি না। জগন্নাথের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাওয়ার ইচ্ছা থাকলে সারা দিনরাত আনন্দবাজার প্রসাদ মেলা তো রয়েছেই। অতএব কুসংস্কার কেন হবে?

প্রশ্ন ১৩০। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ধর্ম আছে। বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত মানুষদের প্রধান আরাধ্য দেবতাও বিভিন্ন। যেমন আমাদের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। যেহেতু পৃথিবীর অধীশ্বর একাধিক হতে পারেন না, তাই সকল ধর্মের প্রধান আরাধ্য দেবতা একই—একথা তো বলতে পারি?

উত্তর ঃ প্রধান আরাধ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তেমনই ধর্মও এক। ধর্ম বিভিন্ন রকম নয়। ভগবানকে ভালবাসাই ধর্ম। যুগধর্ম ভগবানের নামকীর্তন করা, ভগবানের সেবায় জীবন যাপন করা। তাহলেই ভগবানের চিদনুকণা জীবের এই পৃথিবীতে মানুষ রূপে জন্ম চিরধন্য হতে পারে। কিন্তু সমস্যাটি হচ্ছে, পৃথিবীতে ধর্মের নামে বহু অধর্ম আচরিত হচ্ছে। যার ফলে মানুষ আসল ধর্ম যে এক—সেটাই বোঝে না। বিভিন্ন আজেবাজে মতবাদ গুলিকেও তারা ধর্ম বলে মনে করছে।

"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে।
ভাগবতে কহে, তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥"

ভগবান কোনও হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান নন। ধর্ম কোন হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান নয়। আদি শাস্ত্র হচ্ছে বেদ, বৈদিক শাস্ত্রও হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান শ্রেণী বিশেষের জন্য নয়। এ সমস্তই মানবজাতির জন্য উদ্দিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—*সর্বস্য চাহং হৃদিসন্নিবিষ্টো।* ভগবান পরমাত্মারূপে সবার হৃদয়ে রয়েছেন। সেখানে বলছেন না যে, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানদের কোন এক শ্রেণীতে তিনি আছেন। *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত সনাতনঃ* —আমার অংশ সমস্ত জীবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধও চিরন্তন। আবার বলছেন *অহং বীজপ্রদপিতা*—আমি সকলেরই পিতা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *যেঽপি ভজন্তে অন্য দেবতা তেঽপি মাম্ ভজন্তি অবিধিপূর্বকম্।* যারা অন্য দেবতাদের পূজা করছে তারাও অবিধিপূর্বক (বিধি বহির্ভূত আচরণ মাধ্যমে) আমার পূজা করছে। সেজন্য যারা বিভিন্ন মত-পথ নিয়ে ভগবৎ আরাধনা করছে—তাদের গতিও বিভিন্ন রকমের। সবার গতি কখনই এক নয়। সেই কথাও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন।

প্রশ্ন ১৩১। পৃথিবীতে যে সমস্ত মানুষ তাদের স্বধর্মের প্রধান দেবতাকে শাস্ত্র অনুযায়ী সঠিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম সহকারে আরাধনা করে, তাদের পরিণতি কি যথার্থ অর্থাৎ, শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তদের থেকে ভিন্নতর হবে?

উত্তর ঃ জীবের স্বরূপ হচ্ছে সে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ অর্চন, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ সেবন, শ্রীকৃষ্ণের সেবাদি করলে সে জীবনান্তে শ্রীগোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণের কাছে উন্নীত হতে পারবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ নিরাকার ব্রহ্ম। কেউ যদি ভগবান নিরাকার—এইভাবে নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করতেই থাকে তাহলে সে ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করবে। শাস্ত্রে বিভিন্ন দেবদেবীর কথা আছে। কেউ যদি কোনও দেব-দেবীকে একান্ত আরাধ্য জ্ঞান করে পূজা করতে থাকে তবে সেই দেব-দেবী যে স্থানে থাকেন সেইখানে তার গতি হবে। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

"দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবে, ভূত-প্রেতের উপাসকেরা ভূতলোক লাভ করবে, পিতৃপুরুষের উপাসকেরা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করবে। আর যারা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করে।" (গীতা ৯/২৫)

দেবলোক এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই অবস্থিত, কিন্তু কৃষ্ণলোক বৈকুণ্ঠের সর্বোচ্চ লোক। ব্রহ্মলোক অবধি গিয়েও দুঃখময় এই ব্রহ্মাণ্ডে বার বার আবর্তিত হতে হবে। *আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।* কিন্তু কৃষ্ণলোকে যে ফিরে যায় তাকে আর জন্মমৃত্যুর জগতে ঘুরপাক খেতে হয় না। *যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।* অতএব সবার পরিণতি এক নয়।

শাস্ত্র তিন ধরনের। সমগ্র মানব-সমাজের জন্য মহর্ষি শ্রীল ব্যাসদেব ১৮খানা পুরাণ রচনা করে তিনভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। সাত্ত্বিক পুরাণ, রাজসিক পুরাণ ও তামসিক পুরাণ। মানুষের মধ্যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ মায়ার তিন গুণের মধ্যে প্রকাশ পায়—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ভক্তিশ্রদ্ধাও তিন প্রকার। গীতা 'শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগে' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, শিবপুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র তামসিক লোকদের জন্য রচিত। বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ সাত্ত্বিক লোকদের জন্য এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ রাজসিক ব্যক্তিদের জন্য রচিত। সকলের স্থিতি গতি এক নয়।

প্রশ্ন ১৩২। জীবন মানে কি?

উত্তর ঃ জীবন মানে হল ভগবানের দেওয়া জীবনী শক্তি। *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত সনাতনঃ।* শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সচ্চিদানন্দময় পুরুষ। তাঁর চৈতন্যকণা বা চিৎস্ফুলিঙ্গ হচ্ছে সমস্ত জীব। জীবন বলতে বোঝায় জীবের ভগবানের সঙ্গে নিত্য চিরন্তন সম্বন্ধে স্থিত হওয়া। এছাড়া জীবনের কোনও অর্থ হয় না।

প্রশ্ন ১৩৩। যে যেভাবে ভগবানকে অনুভব করে সে সেইভাবে তার আরাধনা করে, তা হলে শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে কি কোনও মৌলিক পার্থক্য আছে? উভয়ই তো ভগবানকে লাভ করতে চায়?

উত্তর ঃ ভগবানের তিনশক্তি। বহিরঙ্গা শক্তি যেমন—জড় জগতের দুর্গা, অন্তরঙ্গা শক্তি যেমন—গোলোকের রাধারাণী এবং জীবশক্তি যা হয় বহিরঙ্গা নয়তো অন্তরঙ্গার আশ্রিত শক্তি।

বহিরঙ্গার কাজ ভগবৎভক্তিহীন ব্যক্তিকে এই জগতে বদ্ধ করে রাখা। শাক্তরা যখন জড়জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়া দুর্গার পূজা করেন তখন তারা *রূপং দেহি যশো দেহি ধনং দেহি*—অর্থাৎ, জড় সুখভোগ কামনা করে। আর যারা অন্তরঙ্গায় আশ্রিত তারা কৃষ্ণভক্তি বিনা কিছুই চায় না। গোপীরা কাত্যায়নীর পূজা করেছিল শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার উদ্দেশ্যে। রুক্মিণীদেবী দুর্গাপূজা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার উদ্দেশ্যে। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তাদের নিজেদের জাগতিক সুখের এক বিন্দুও প্রার্থনা ছিল না। বৈষ্ণবরা দুর্গাদেবীর কাছে কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণভক্তি মাত্র প্রার্থনা করেন। এই হলো উদ্দেশ্যের বিশাল পার্থক্য।

বিষ্ণু বা কৃষ্ণ একতত্ত্ব। তাই তাঁদের উপাসকদের বৈষ্ণব বলা হয়। বৈষ্ণব দুর্গাদেবীকে বিষ্ণুশক্তি পরমবৈষ্ণবী এবং শিবকে পরম বৈষ্ণব (বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু) জ্ঞান করেন। শিবদুর্গা কৃষ্ণপ্রসাদ লাভের আশা করে থাকেন। এই ঘটনার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।

এমনকি কৃষ্ণ বা বিষ্ণুপূজা ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর পূজা চলে না, সেই প্রথাও আমরা দেখেছি। পূজারী ব্রাহ্মণ সর্বপ্রথমে বিষ্ণুশিলা পূজা করে ভোগ নিবেদন করে

সেই বিষ্ণুর প্রসাদ দুর্গাদেবীকে নিবেদন করতেন। এটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার। বিষ্ণুর কখনও আমিষ আহার করার নিদর্শন নেই। কিন্তু শাক্তরা আমিষাশী হওয়ার জন্যই দুর্গা-কালীর কাছে অপ্রসাদ মাছ-মাংস নিবেদন করে থাকে। তামসিক ব্যক্তিরা রক্তমাংস ভক্ষণ করে। সেই জন্য তারা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকে রক্তমাংস নিবেদন করে। এটিই কৃষ্ণভক্তি-বিরুদ্ধ ব্যাপার। কৃষ্ণনাম করতে হলেই রক্তমাংসজাতীয় অখাদ্য বর্জন করে ফলফুল শস্য জাতীয় পুষ্টিকর খাদ্য ভগবানকে নিবেদন করে গ্রহণ করতে হয়। তাতে আমাদের তমো রজো গুণগুলি কমবে, ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হবে, ক্রমশঃ ভজনসাধন করে শুদ্ধসত্ত্বে উন্নীত হয়ে ভগবদ্ধামে যাওয়া সম্ভব হবে। অন্যথায় এই জড়জগৎ থেকে নিস্তারের কোনও উপায় নেই।

প্রশ্ন ১৩৪। এত মন্দির কি দরকার?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, জড়জাগতিক কার্যকলাপ হ্রাস করে পারমার্থিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করবার জন্য ভগবান এই জড় জগতে অর্চামূর্তি রূপে বিভিন্ন মন্দিরে বিরাজ করেন। (চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০/২১৯ তাৎপর্য)

অর্থাৎ, সারা মানবসমাজ বৈষয়িক ক্রিয়াতে অভ্যস্ত। তারা ভগবদ্ভক্তি বিমুখ সভ্যতা গড়ে তুলছে, তারা অবৈদিক পদ্ধতি ও অসভ্যতা সৃষ্টি করছে। যদি মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, মন্দিরে শ্রীভগবানের অর্চাবিগ্রহ বিরাজিত হন, ভগবৎ নাম সংকীর্তন, আরতি, প্রণতি নিবেদন, ভগবৎ চরণামৃত সেবন, ভগবৎ কথা শ্রবণাদির ব্যবস্থা থাকে, তাহলে মানুষ ভগবদ্ভক্তি উন্মুখ মানসিকতা লাভ করবে, মানুষের অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হবে, মানুষ পারমার্থিক চেতনা লাভের সুযোগ পাবে। মানুষ পরমার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে নিত্য শাশ্বত জীবনের সন্ধান পাবে। সেটিই মানব সভ্যতা।

প্রশ্ন ১৩৫। কৃষ্ণভক্তরা অন্যান্য দেবদেবীকে কিরূপ জ্ঞান করেন?

উত্তর ঃ কৃষ্ণভক্তরা সমস্ত দেব-দেবীকে বিশেষ ক্ষমতাশালী ভক্তরূপে জ্ঞান করেন। ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র প্রমুখ সমস্ত দেবতা কৃষ্ণেরই আরাধনা করেন। কৃষ্ণনাম করলে তাঁরা প্রীত হবেন, কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করলে তাঁরা খুশী হন। কৃষ্ণভক্তরা জড় জাগতিক অনিত্য সুখ প্রার্থনা করেন না। বরং তাঁরা দেবদেবীদের কাছে কৃষ্ণভক্তিতে যাতে সুষ্ঠুভাবে নিযুক্ত থাকতে পারেন সেই প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা সরস্বতী, শিব দুর্গা—উনারা পরম বৈষ্ণব বৈষ্ণবী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের আরাধ্য প্রভু। সেই কথা এখনও অনেক মানুষই জানে। তবুও তারা দেবদেবীর পূজা করে কৃষ্ণভক্তিহীন হয়ে, তামসিক উপকরণ নৈবেদ্য, তামসিক পরিবেশ মাধ্যমে। এই জন্যে কৃষ্ণভক্তরা দেবদেবীর প্রসাদ খেতে চায় না। ভক্তরা জানেন দেবদেবীরা কৃষ্ণপ্রসাদের জন্য লোলুপ হন। তাই ভক্তরা ক্ষেত্রবিশেষে দেবদেবীকে কৃষ্ণপ্রসাদে আপ্যায়ন করে থাকেন।

প্রশ্ন ১৩৬। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পৃথিবীতে কত বছর রাজত্ব করেছিলেন? রামরাজত্বে মানবসমাজ কি রকমের ছিল?

উত্তর ঃ কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে, শ্রীরামচন্দ্র পৃথিবীতে এগারো হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন।

রামরাজত্বে মানবসমাজ আনন্দময় ছিল। শ্রীরামচন্দ্র প্রজাদের নিয়ত পুত্রের মতো পালন করতেন। তাঁর রাজত্ব সময়ে কোনও কামিনীই অনাথ বা বিধবা ছিল না। মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করাতে রাজ্যে প্রচুর শস্য ও শাকসবজী সমুৎপন্ন হত। কখনও দুর্ভিক্ষ ছিল না। অকালমৃত্যু, অগ্নিদাহ, রোগভয়ের কোনও সম্পর্ক ছিল না। প্রজারা পুত্রবন্ত হয়ে হাজার বছর অবধি সুস্থ শরীরে জীবিত থাকত। সকলেই করিতকর্মা বা কর্মপটু ছিল। সকলেই স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও উৎফুল্ল ছিল। পুরুষদের পরস্পরের মধ্যে তো দূরের কথা কামিনীদের মধ্যেও কখনও কলহ হত না। প্রজারা সবাই ধার্মিক ছিল। তারা সন্তুষ্টচিত্ত, নির্ভীক ও স্বচ্ছন্দচারী ছিল। চোর লম্পট বাটপাড়ের ভয় ছিল না। পথঘাট অলিগলি পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র ছিল। বৃক্ষলতাগুলি নিয়মিত ফলফুলে সুশোভিত থাকত। গাভীদের কলসপরিমাণ দুধ থাকত। গোমাংসভোজী ও গোমাংসব্যবসায়ীদের কোনও পাত্তাই ছিল না। প্রজারা রামচন্দ্রের প্রতি এত শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিল যে অনেকেই তাঁকে না দর্শন করে বা তাঁর নাম না স্মরণ করে জলপর্যন্তও পান করত না। শ্রীরামচন্দ্র ছদ্মবেশে সারা রাজ্য পর্যটন করতেন আর লক্ষ্য করতেন প্রজারা সুখী কিনা, তাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা, তারা ধর্মশীল কিনা।

প্রশ্ন ১৩৭। শাস্ত্রে কোথাও পুরুষকারের জয়গান করা হয়েছে, কোথাও বা ভগবানের কৃপার কথা বলা হয়েছে—এই সংঘর্ষ কেন?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে কোথাও সংঘর্ষ নেই। অনর্থক সংঘর্ষ আপনার মনের মধ্যে। জীবনের পথে সফলতার দুটিই অপরিহার্য শর্ত—পুরুষকার ও ভগবৎ কৃপা। 'আমি নিজে কিছুই করব না, কেবলমাত্র ভগবানের কৃপার আশায় অলসের মতো বসে থাকব'; কিংবা 'ভগবানের কৃপার কোনও প্রয়োজন নেই, আমি নিজেই বলবীর্য দেখিয়ে সমস্ত সমস্যা সমাধান করে ফেলব'—এই দুই রকমের মনোভাবই শাস্ত্রবিরোধী পাগলামী মাত্র।

প্রশ্ন ১৩৮। 'গীতা' শব্দটি অর্থ কি? গীতাতে প্রত্যেক অধ্যায়ে 'যোগ' শব্দটির কি অর্থ?

উত্তর ঃ চিন্ময় বৈকুণ্ঠ জগতের কথাগুলি গানের মতো। হাঁটাচলা নাচের মতো। তাই ভগবানের চিন্ময় কথাগুলি গীত হয়েছে যে শাস্ত্রে তাকেই গীতা বলা হয়। প্রতি অধ্যায়ে ভগবানের কথাগুলির তাৎপর্য হচ্ছে বদ্ধ জীবের সঙ্গে ভগবানের যোগ সাধন কিভাবে হবে তার নির্দেশ। কর্মের মাধ্যমে, জ্ঞানের মাধ্যমে, ভক্তির মাধ্যমে অবশ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই। তাই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এভাবে 'যোগ' কথাটি যুক্ত করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিযুক্ত হয়ে কোনও কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির কথা ভগবদ্গীতাতে শিক্ষা দেওয়া হয় নি।

প্রশ্ন ১৩৯। বেদ অভ্রান্ত। 'সতীদাহ' প্রথা বেদে রয়েছে। আপনারা সেই প্রথা অনুমোদন করেন কি না?

উত্তর ঃ বৈদিক সতীদাহ প্রথা আমরা ভ্রান্ত বলে মনে করি না। কিন্তু তার চেয়েও উন্নত পন্থা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিয়েছেন—পতিতা পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকও পরমগতি শ্রীকৃষ্ণধামে উন্নীত হতে পারেন যদি কৃষ্ণভক্তিময় জীবন যাপন করে চলেন। পতির চিতায় সতী নিজ ইচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিলে বড় জোর পতির যে লোকে গতি সেখানে সতীর গতি হবে। ধর্মপ্রাণ পতি না হলে পতির সঙ্গে নরকেও পতিত হতে হবে। কিন্তু পতি নরকে গেলেও পৃথিবীতে পত্নী যদি কৃষ্ণভজনে আত্মোৎসর্গ করেন তবে পতিকেও নরক থেকে উদ্ধার করতে পারেন। অতএব পতির জন্য চিতায় আত্মবিসর্জন অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য কৃষ্ণভক্তিময় জীবন যাপন করা অনন্তকোটি গুণে শ্রেয়।

প্রশ্ন ১৪০। সনাতন হিন্দু ধর্মে নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। অন্য কোন কোন ধর্মে নারীকে পুরুষের ভোগবিলাসের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে বলা হয়। কিন্তু আমাদের হিন্দু নারীরাই বা এত ধর্মহীন কেন?

উত্তর ঃ প্রশ্নটির মধ্যে আপনার মনগড়া কতকগুলি ধারণা রয়েছে বলে মনে করি। সনাতন ধর্মে সমান অধিকার বিষয়টি আমাদের বোঝা উচিত। নারীমাত্রই শৈশবে পিতামাতার অধীনে, বড় বয়সে পতির তত্ত্বাবধানে এবং বৃদ্ধকালে পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকতে বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ রয়েছে। নারীকে সর্বদা সুরক্ষার জন্য তাঁর স্নেহশীল পিতা, নতুবা সৌহার্দপরায়ণ পতির, কিংবা শ্রদ্ধাবান পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। অন্যথায় অন্য বদচরিত্র পুরুষের খেলার সামগ্রী হয়ে যেতে হয়। দেহগত কারণে পুরুষেরা নারীদের থেকে অধিক শক্তিশালী।

কোনও ধর্মেই বলা হয়নি যে, নারীর সৃষ্টি হয়েছে পুরুষের ভোগ বিলাসের জন্য। ভোগবাদীরা হয়তো এরকম কথা বলতে পারে। কিন্তু ধর্ম শাস্ত্রে নানাবিধ কঠোর বিধিনিয়ম রয়েছে।

সনাতন ধর্ম হচ্ছে সমগ্র মনুষ্য প্রজাতির আদি ধর্ম যা পরমেশ্বর থেকে ধরাধামে প্রবর্তিত হয়েছে। সনাতন ধর্ম বলতে হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চান ইত্যাদি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবের জাতিমতকে বোঝায় না। ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই নিজেদের 'আমি হিন্দু' 'আমি ক্রিশ্চান' 'আমি মুসলিম'—এই বলে গর্ব করতে পারে। কিন্তু আমাদের আসল পরিচয় হচ্ছে আমরা চিরন্তন আত্মা। পচনশীল দেহটাই আমাদের স্বরূপ পরিচয় নয়। নারী ও পুরুষ এগুলি এই জড় দেহের পরিচয় মাত্র। এই জন্মে আপনি পুরুষ দেহ, পরবর্তীতে নারী দেহ পেতে পারেন, এই জন্মে আমরা মানুষদেহ, পরজন্মে অন্য কোন দেহ পেতে পারি।

সনাতন ধর্মের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে, আমরা দেহ নই, আমরা আত্মা। কিন্তু ভোগবাদী সমাজে মানুষ দেহমাত্র পরিচয় মনে করে। তাই নারী-পুরুষ ইত্যাদি ভেদ করে। এই রকম দেহাত্মবুদ্ধির ফলে মানুষ কখনই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির দুঃখময় সংসার চক্র অতিক্রম করে পরম ধামে উন্নীত হতে পারে না। তাকে চিরকালই জড় জগতে ক্লেশ ভোগের জন্য পতিত হতে হয়।

ভাবী প্রজন্ম সৃষ্টির জন্য ভগবান জীবদের মধ্যে পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন এবং বিশেষতঃ মনুষ্য জাতির মধ্যে নারী-পুরুষকে ধর্মসঙ্গতভাবে মিলিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রিয়তর্পণ ভোগবিলাস তো কোনও ধর্মই নয়। ওটা উচ্ছৃঙ্খলতা।

আপনার মন্তব্য হচ্ছে, হিন্দু নারীরা ধর্মহীন। কিন্তু না, যে কোনও নারীই ধর্মহীন হয়ে যাবে, যদি শক্তিশালী পুরুষেরা নারীদের প্রতি পবিত্র মনোভাব না রাখে। পরমেশ্বরের ভক্তি সেবায় নারী-পুরুষ সকলেরই নিষ্ঠা ও প্রেরণার প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন ১৪১। ব্রহ্মাণ্ডে সবাই যদি হরিনাম করে ভগবদ্‌ধামে চলে যায় তবে এই ব্রহ্মাণ্ড তো জীবহীন হয়ে খালি পড়ে থাকবে?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কথাচ্ছলে নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে প্রশ্ন করছিলেন। "এই জগতের সমস্ত জীব যদি হরিনাম করে মুক্তিলাভ করে, তা হলে তো ব্রহ্মাণ্ড জীবশূন্য হয়ে যাবে!"

উত্তরে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বললেন—"হে প্রভু, তুমি যতদিন এই মর্তলোকে থাকবে, ততদিন তুমি স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীবদের ভব-বন্ধন মোচন করে বৈকুণ্ঠে পাঠাবে। তারপর সূক্ষ্ম জীবদের পুনরায় কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে। সেই সমস্ত জীবেরা এই জগতে স্থাবর ও জঙ্গমদেহ প্রাপ্ত হয়ে পূর্বের মতো এই ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ করবে।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩/৭৮-৮০)

শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলেছেন, "বহু জীব তমোগুণের আচ্ছন্ন হয়ে অব্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, যারা কালক্রমে রজোগুণের প্রভাবে সক্রিয় হবে। তাদের অধিকাংশই সকাম কর্মের প্রভাবে দণ্ডভোগ করার জন্য এই জড়জগৎরূপী কারাগারকে পূর্ণ করবে।"

প্রশ্ন ১৪২। অনেকেই মনে করেন যে, গীতার চতুর্বর্ণ থেকেই উচ্চ-নীচ জাতিভেদ এসেছে। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা থেকেই রংখেলার নোংরামি এসেছে। বৈদিক শাস্ত্র থেকেই সতীদাহ প্রথা এসেছিল। গোমেধ অশ্বমেধ যজ্ঞ থেকেই পশুহত্যা ও মাংস ভক্ষণ রীতি এসেছে। কালীপূজায় মদ ও শিবপূজায় গাঁজা নিবেদন পদ্ধতি থেকে মদ-গাঁজা খাওয়ার প্রচলন হয়েছে। এখন এই কথাগুলির সমাধান কি?

উত্তর ঃ বৈদিক শাস্ত্রের আদৌ কোন মর্ম না বুঝে কেউ যদি কোনও কলির চেলা সব মানুষের বদমায়েশি ও নোংরামি লক্ষ্য করে এমন মনে করে যে, এই বদমায়েশি ও নোংরামিগুলি বৈদিক শাস্ত্র থেকেই এসেছে, তা হলে তো সেটি অবশ্যই গণ্ডমূর্খের ধারণা হল। অজ্ঞ তথাকথিত পাণ্ডিত্য-অভিমানীরাই মনে করতে পারে যে, সব মন্দগুলোই বেদশাস্ত্র থেকে এসেছে আর বেদবিরোধী আধুনিক মানুষেরাই সব ভালগুলোকে আমদানী করেছে।

কিন্তু বিবেকবান মানুষেরা অবশ্যই জানেন যে, বৈদিক সভ্যতা হল আর্য সভ্যতা। অসভ্য অনার্যরা অবৈদিক। বৈদিক শাস্ত্র কাউকে নোংরামি শেখায় না, বদমায়েশি শেখায়

না, অসভ্যতা বা পশুর মতো আচরণ করতে শেখায় না। বেদবিরোধী মানুষেরা বেদের নামে কতগুলি বুলি আউড়িয়ে তাদের বদ-স্বভাবটাকে ভদ্রতা বলে সমাজে জাহির করছে।

ভগবদ্‌গীতায় যে চতুর্বর্ণের কথা রয়েছে, তাতে প্রত্যেকের গুণ ও কর্ম প্রবণতা অনুসারে কে কোন্ বর্ণের অন্তর্গত এবং তার কিভাবে চলা উচিত, কিভাবে সমাজের প্রতি সে সুষ্ঠু সহযোগিতা করবে সেই নির্দেশ রয়েছে। সেক্ষেত্রে শূদ্রবংশে মহাত্মার জন্ম হতে পারে, ব্রাহ্মণের বংশে দুরাত্মার জন্ম হতে পারে। ঋষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন ব্রাহ্মণ, বেশ কয়েকজন ছিলেন ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন। কিন্তু আধুনিক বেদবিরোধীরা কেবল জন্ম অনুসারে উচ্চনীচ বিচার করে আস্ফালন করে।

শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা যদি নোংরামি হতো তবে বড় বড় মুনি-ঋষিরা এবং পরমার্থ সাধক ও সিদ্ধ পুরুষেরা দোলযাত্রার কথা কীর্তন করতেন না। রং খেলা পবিত্র। ভগবান ও তাঁর লীলাসঙ্গিগণের নিক্ষিপ্ত ফাগ-আবিরের স্পর্শ পেয়ে সমস্ত দেবদেবী এবং ধরিত্রীদেবী নিজেকে ধন্য মনে করেন। কিন্তু বেদবিরোধী আধুনিক লম্পট মনোভাবাপন্ন লোকেরা রং খেলার নামে রংবাজী করে থাকে।

সতীদের স্বয়ং স্বেচ্ছায় ধর্মপ্রাণ মৃত-পতির সহগামিনী হয়ে স্বর্গে গমন করার পদ্ধতি বেদশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সেই সব সতীদের উদ্দেশে মুনি-ঋষিরা প্রণতি জ্ঞাপন করে থাকেন। কিন্তু সেই সতী হওয়ার আদৌ কোন মূল্য না বুঝেই বেদ-বিরোধী বদ-স্বভাব লোকেরা সরল-অসহায় বিধবার সম্পত্তি লুটে নেবার ধান্দায় জোর করে জ্বলন্ত চিতাতে সতীবধ করতে লাগল। বৈদিক শাস্ত্র এরকম বদমায়েশি কখনও শেখায়নি।

গোমেধ-অশ্বমেধ যজ্ঞের বৈদিক পদ্ধতিটি বিশেষজ্ঞ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হতো। তাতে জরদ্গব গো-অশ্বের নবজীবন প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ হতো। আর কলিযুগে সেই সব পদ্ধতি একেবারেই নিষিদ্ধ বলে বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ সেই সব নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কলির কদর্য মনোভাবাপন্ন রাক্ষস-পিশাচসুলভ মানুষেরা মাংস খাওয়ার লালসায় বৈদিক শাস্ত্রের গো-অশ্বমেধের দৃষ্টান্তটি বীরের মতো ফলাও করে তুলে ধরে।

কালী, শিব প্রমুখ দেবদেবীরা উগ্র রাজসিক ও ঘোর তামসিকগুণ সম্পন্ন লোকেদের উৎপাত ক্রিয়াকাণ্ডকে সংযত করে থাকেন এবং সাত্ত্বিক সাধুব্যক্তিদের রক্ষা করে থাকেন। মদ-গাঁজার প্রতি যারা আসক্ত তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাপূর্ণ লোকালয় থেকে দূরে বনে-বাদাড়ে বা শ্মশানের প্রান্তে শিব বা কালীকে আরাধনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থা নিয়েও তারা চুপচাপ সেখানে পড়ে থাকতে পারে। সেটি তান্ত্রিকদের জন্য। লোকালয়ে, হাটে-বাজারে, বাসে-ট্রেনে ও গৃহে তামসিক ব্যক্তিদের নেশাভাঙ ক্রিয়াটি কখনই স্বীকৃত হয়নি। গৃহী জীবন যাপনকারীদের জন্য মদ গাঁজা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মানুষ যদি বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করতো তা হলে পশুহত্যা, মাংস আহার, ভ্রূণ হত্যা, আত্মহত্যা, খুনাখুনি, নেশাভাঙ, জুয়া, অবৈধ যৌনতা সযত্নে এড়িয়ে চলতো, তার ফলে সারা বিশ্বমানব সভ্যতা দিব্য আনন্দময় হতো। কিন্তু এ সমস্ত বেদবিরোধী কদাচারের প্রভাবে মানুষ এ জগতে একরকম অভিশপ্ত হয়েই জীবন কাটাচ্ছে বললেই হয়।

প্রশ্ন ১৪৩। আমরা জানি কর্মই ধর্ম। আমাদের ভগবান হাত-পা দিয়েছেন তাই কর্ম করে চলতে হবে। একথাটি কি ঠিক নয়?

উত্তর ঃ এই জীবনে যাবতীয় কর্মের পাপ ও পুণ্য এই উভয় ফল রয়েছে। যেমন কর্ম তেমন ফল। অর্থাৎ, সেই কর্মফল পেতে হবে। ফলভোগের জন্যই জড় জগতে থাকতে হবে। কর্মফল থেকে মুক্ত হতে হলে কৃষ্ণভক্তিমূলক কর্ম অনুশীলন করতে হবে। কৃষ্ণভক্তিযুক্ত কর্মে সর্বদাই নিযুক্ত থাকতে হবে, সেটিই হল সৎ-চিৎ-আনন্দপূর্ণ জীবনে উন্নীত হওয়ার যথার্থ কর্মকৌশল। এই কথাটি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই উল্লেখ করেছেন—

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥

"যিনি ভগবদ্‌ভক্তির অনুশীলন করেন, তিনি এই জীবনেই পাপ ও পুণ্য উভয় থেকেই মুক্ত হন। অতএব তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর। সেটিই হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ কর্মকৌশল।" (গীতা ২/৫০)

ফলভোগ-আকাঙ্ক্ষী মূর্খেরা এই জড় জগতে কর্মযোগ কথাটির গুরুত্ব না দিয়ে কর্মভোগ পন্থাটি গ্রহণ করে চলে। কৃষ্ণভক্তি-বিমুখ হয়ে যে কর্মই হোক না কেন—পাপ কিংবা পুণ্য—সেই সব কর্মই মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবে।

প্রশ্ন ১৪৪। মানুষ জন্মমাত্রই পিতা-মাতা, ঋষি-দেবতা অনেকের কাছে ঋণী হয়ে থাকে। সেই ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা কি আছে?

উত্তর ঃ ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র রাস্তা। শ্রীমদ্ভাগবতে সর্বঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার পন্থার কথা নির্দিষ্ট রয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄনাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"যিনি সমস্ত জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করেও, সকলের আশ্রয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন আর তিনি দেবতাদের কাছে, ঋষিদের কাছে, অন্য প্রাণীদের কাছে, পিতা-মাতাদি আত্মীয় স্বজনদের কাছে, সাধারণ মানুষদের কাছে এবং পিতৃপুরুষদের কাছে ঋণী থাকেন না।" (ভাঃ ১১/৫/৪১)

প্রশ্ন ১৪৫। 'সর্বদা সত্য কথা বলবে'। এই হিতোপদেশের মূল অর্থ ও তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ প্রত্যেকের স্বরূপ রয়েছে। সেই স্বরূপটিই সত্য আর তার বিকৃতরূপই অসত্য বা মিথ্যা। আমরা জীব। জীবের স্বরূপ হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব গ্রহণ করা। যদি কৃষ্ণের সেবা-ভক্তি না করা হয়, তবে জীবের জীবনটি সত্যে স্থিত নয় বলে বুঝতে হবে।

এই অনিত্য জড় সংসারে লোকেরা আপাত সত্য নিয়ে বহু রকমের কথা বলে, বহু পরিকল্পনা বিচার আচার করে। কিন্তু সেই আপাত সত্যগুলো নিয়ে জড় ভোগবাদী সমাজের মানুষ দিনরাত নাড়াচাড়া করলেও সেগুলি পরিণামে সবই অনর্থক বলেই প্রকটিত হয়ে থাকে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন তিনটি বস্তু সত্য—(১) কৃষ্ণ, (২) কৃষ্ণভক্তি, (৩) কৃষ্ণভক্ত। অতএব সর্বদা এই সব বিষয়ে কথা বলাই সত্য কথা।

শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কণ্ঠে বাক্‌শক্তি দিয়েছেন। তাঁর শক্তি সরস্বতীকে বলা হয় বাক্‌শক্তির অধিষ্ঠাত্রী। বাক্‌দেবী সরস্বতী সর্বদা কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন। *বিদ্যাবধূজীবনম্ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্।* এই হিসাবে আমাদের বাক্‌শক্তি বা কথা বলার শক্তির যথার্থ সদ্ব্যবহার হল কৃষ্ণনাম করা, কৃষ্ণকথা বলা। এই জন্যে বলা হয় সত্য কথা মানেই হল কৃষ্ণকথা। গ্রাম্য কথা হল আজেবাজে কথা বা কৃষ্ণভক্তিবিহীন কথা। সেইজন্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন সর্বদা কৃষ্ণকীর্তন কর। *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।*

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তি এই যে, 'যারা পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে না তারা সৎ বা সতী নয়।' সমস্ত দেবতা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগলেন,—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃত সত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

"হে কৃষ্ণ! তুমি সত্যব্রত, তুমি সত্যপর, তুমি ত্রিকাল সত্য, তুমি সত্যের জন্মস্থান, সত্যেই তোমার স্থিতি, তুমি সত্যের সত্য অর্থাৎ, নিত্যসত্য। ঋত ও সত্য তোমার দুই নেত্র। তুমি সত্যাত্মক। তোমাতে আমরা শরণাপন্ন হলাম।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/২/২৬)

পরম সত্য পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সত্য। আর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অনিত্য। এই জন্যেই বলা হয়, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। আর জীব যদি সেই পরমসত্যের অনুগত না হয়, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ না করে, তা হলে এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের বেশ কতকগুলো হাবিজাবি অনিত্য বিষয় নিয়ে সত্য-মিথ্যা বিচারপর হয়ে দিন অতিবাহিত করলে এই দুর্লভ মানবজীবনটাই বৃথা হয়ে যায়, মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। *শ্রম এব হি কেবলম্।*

সত্য সর্বদা স্থির থাকে। তার বিকৃতি বা বিচ্যুতি হয় না। সেই জন্য কৃষ্ণকে অচ্যুত বলা হয়। যে ব্যক্তি সেই অচ্যুত চরণে আত্মনিবেদন করবে, সে কৃষ্ণকথা বলবে, সত্য কথা বলবে। বাদবাকী সব মিথ্যা।

প্রশ্ন ১৪৬। সনাতনধর্মের বা বৈষ্ণবধর্মের অবলম্বী মানুষের সংখ্যা নিতান্ত কম কেন?

উত্তর ঃ পশ্চিমী ম্লেচ্ছদের দ্বারা উৎখাদিত হয়েছে সনাতন সভ্যতা। ক্রমশ মানুষ কলির কবলগ্রস্ত হয়ে নেশাভাঙ করা, আমিষ আহার করা এবং অবৈধ সঙ্গ করা ইত্যাদি পাপের বশবর্তী হয়েছে।

মোগলেরা শিখিয়েছে পশু মাংস খাওয়া। তাদের অনুবর্তী মানুষেরা কসাইখানা খুলে প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ গোহত্যা থেকে শুরু করে নানারকমের পশু হত্যা করে তাদের মাংসগুলো প্রিয় খাদ্যরূপে গ্রহণ করছে। ওলন্দাজেরা শিখিয়েছে বিড়ি খাওয়া। সনাতন ধর্মের দেশের লোকেরা তাদের সংস্কৃতি হারিয়ে বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি ফুঁকতে শুরু করেছে। বিড়ির দূষিত ধোঁয়া না খেলে মানবজীবন যেন অচল হয়ে যাবে। মার্কিনীরা শিখিয়েছে গাঁজা আফিং ও তামাক খাওয়া। সেগুলিতে বহু মানুষ রুচিসম্পন্ন। বৃটিশরা শিখিয়েছে অখাদ্য চা পান করা। আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সভ্যরা প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই চা পান করতে না পারলে তাদের মেজাজ ঠিক থাকে না। যখন তারা শোনে যে, যুগধর্ম হচ্ছে হরিনাম কীর্তন করা, এবং সনাতন ধর্মে নেশাভাঙ এসব আদৌ চলে না, এগুলি জীবনের ভক্তিচেতনা নষ্ট করে দেয়, তখন তারা 'হরি ছাড়ব তবু বিড়ি ছাড়ব না'র দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। যদিও সনাতন ধর্মের দেশে তাদের এসব পশ্চিমী কুশিক্ষা ছিল না, তা তারা গ্রহণ করেছে মাত্র, কিন্তু তারা কুশিক্ষার অধীন দাস হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় খুব কম লোকই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন পথে আসে।

প্রশ্ন ১৪৭। বলা হয়ে থাকে যে, "ভগবান মঙ্গলময়।" কিন্তু বর্তমান জগতে আমরা এত অমঙ্গল, জীবের এত দুঃখ-কষ্ট, এত অবিচার, এত অসাম্য দেখি, এর পরেও কি আমরা ভগবানের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে আস্থা রাখতে পারি? ভগবান যদি সব কিছুর কারণ হন তাহলে জাগতিক সব অমঙ্গলের জন্যও তিনি কি দায়ী নন?

উত্তর ঃ কোনও শাস্ত্রে বলা হয়নি যে, জগতে অমঙ্গল চলছে তাই ভগবানও অমঙ্গলময়। আবার এও বলা হয়নি যে, এই জগৎটি এবং এই জগতের মানুষেরা মঙ্গলময়। তাছাড়া বিপরীত কথাও বলা হয়নি যে, এই জগতের জীবেরা মঙ্গলময় সেই কারণে ভগবানও মঙ্গলময়। মঙ্গল-অমঙ্গল, ভালো-মন্দ ইত্যাদি দ্বৈত বিষয়গুলি হচ্ছে এই জড় জগতের ব্যাপার। ভগবান সমস্ত দ্বৈত বিষয়ের উর্ধ্বে।

আপনি বলছেন 'বর্তমান জগতে জীবের এত দুঃখ-কষ্ট'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি জগতের হর্তা কর্তা বিধাতা তিনিই আপনার অনেক আগের থেকেই জানিয়ে রেখেছেন যে, এই জড় জগৎটি দুঃখ-কষ্ট দিয়েই তৈরি করা হয়েছে। *দুঃখালয়ম্* (গীতা)। অর্থাৎ, এই জড় জগতে যে বাস করবে, তাকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেই চলতে হবে। একমাত্র ভোগী নাস্তিকরা ছাড়া কেউ কখনও বলেননি যে, এই জগৎটি সুখের জায়গা, কিংবা ভালো ও মঙ্গলময় জায়গা।

এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের জীবনচক্রে নানাবিধ সুখ-দুঃখ ভোগ করা হচ্ছে। এই সম্পর্কে বৈদিক সিদ্ধান্ত বাক্যটি হল, প্রত্যেকে আপন আপন পূর্ব আচরিত কর্মের ফল টুকু ভোগ করছে মাত্র।

আর এখন যে সমস্ত নিজের মানসিকতা অনুসারে কর্ম করা হচ্ছে তার ফলও সঞ্চিত হচ্ছে এবং এক সময় সেই ফলও ভোগ করতে হবে। এটাই কার্য কারণ সূত্র।

আপনি বলছেন, 'বর্তমান জগতে এত অবিচার দেখছি'। 'বর্তমান জগতে' শুধু কেন, অতীত দিনের কলিযুগগুলিতে আরও জঘন্যতম অবিচার ছিল এবং আগামীতেও থাকবে। আজ থেকে দশ হাজার বছরের পর থেকে এই পৃথিবীতে জঘন্যতর মানুষেরা জন্মাবে। খাওয়ার জন্য মানুষ মানুষকে হত্যা করবে। মা-বাবারাই সন্তানকে কেটে ভক্ষণ করবে।

ভগবানের নির্দেশ মতো না চললে বর্তমান মানুষগুলোকেও সেই সময়ে সেই সমস্ত বিভীষিকাপূর্ণ অবিচারভরা অমঙ্গলময় দৃশ্যের সম্মুখীন ও অধীন হওয়ার জন্য জন্মাতে হবে।

মহাত্মারা নির্দেশ দিয়েছেন—

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি-বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে ভক্তিময় জীবন যাপন করতে অরাজি মানসিকতার কারণে জীব ভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার জগতে এসে যাবতীয় দুঃখ লাভ করছে।

অতএব আপনি যদি 'অমঙ্গল, দুঃখ-কষ্ট, অসাম্য' না দেখতে চান তবে আপনাকে দুঃখ দিয়ে তৈরি এই জড় জগতে বাস করলে চলবে না, এই জড় জগতের বাইরে বৈকুণ্ঠ জগতে গিয়ে বাস করতে হবে। আর সেই পন্থাই বৈদিক শাস্ত্রে ঘোষিত হয়েছে—কলিযুগের মানুষের ধর্ম হল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা এবং কৃষ্ণভক্তির অনুকূলে জীবন অতিবাহিত করা। আপনি যদি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন তবে অবশ্যই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করবেন। অন্যথায়, আপন আপন কর্মফল অনুসারে অমঙ্গলময় জড় জগতে পড়ে থাকতে হবে। আর 'দুঃখ-কষ্ট, অবিচার, অসাম্য'-এর মধ্যেই থাকতে হবে। আপনি যদি একটু এই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ভগবানের নির্দেশ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ' পাঠ করতেন তা হলে আপনি—'ভগবানের প্রতি আস্থা' হারানো কিংবা 'ভগবানই সমস্ত অমঙ্গলের জন্য দায়ী' এই রকম ভ্রান্ত উক্তি করতেন না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন,—'মানব সমাজের জন্য সমস্ত কর্তব্য বিষয়ে জ্ঞানটি পরম্পরা সূত্রে এই জগতে প্রচারিত হচ্ছে।' কিন্তু সেই ভগবান সম্বন্ধে যখন কারও জ্ঞানই না থাকে, তখন তার ভগবানের প্রতি আস্থা রাখা কিংবা না রাখা দুটোই অনর্থক।

ভগবান বলছেন, 'আমি জীবকে স্বতন্ত্র স্বাধীনতা দিয়েছি। তারা আমাকে ভালোবেসে বৈকুণ্ঠধামে আমার কাছে চিরকালের মতো ফিরে আসতে পারে, কিংবা আমাকে বাদ দিয়ে আবহমান কাল ধরে দুঃখময় জগতে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে থেকে অসংখ্য জীবন অতিবাহিত করতে পারে।' সুতরাং, আপনি আপনার এই স্বাতন্ত্র্যের সদ্ ব্যবহার করবেন, কি অপব্যবহার করবেন—সে জন্য আপনি নিজেই দায়ী। আপনার জন্য ভগবান দায়ী নন।

প্রশ্ন ১৪৮। জ্ঞান কি?

উত্তর ঃ কোনও বিষয় সম্বন্ধে জানাকেই এই বিষয়ের জ্ঞান বলা হয়। জ্ঞান তিন প্রকার—(১) তৎ পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান, (২) ত্বম্ পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান এবং (৩) উভয়ের সম্বন্ধ জ্ঞান।

প্রথমত ঃ পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞানকেই বলা হয় তৎ বিষয়ক জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণের সৎ-চিদ্-আনন্দময় আকারত্ব বিষয়ক জ্ঞান, তাঁর ভগবত্তা, অখিলরসামৃত মূর্তিত্ব, তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য, তাঁর রূপ-গুণ-লীলা, তাঁর ধাম, পরিকর শক্তি বিষয়ক জ্ঞানই হচ্ছে তৎ পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান।

দ্বিতীয়ত ঃ জীব ভগবানের চিৎকণ স্বরূপ, ভগবানের তটস্থা শক্তি, জীবের স্বরূপ হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্য দাসত্বে অবস্থান করা, জীবের অনুস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞানই হচ্ছে ত্বম্ পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান।

তৃতীয়ত ঃ জীব ও ভগবানের সম্বন্ধ জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ প্রভু এবং জীব তাঁর নিত্য দাস, শ্রীকৃষ্ণ বিভু এবং জীব অণু, শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়ার অধীন বা বশীভূত। শ্রীকৃষ্ণচরণ বিস্মৃতিই জীবের মায়াবন্ধনের কারণ এবং অশেষ দুঃখের হেতু। শ্রীকৃষ্ণ ভজনই মায়ামুক্তি ও পরম আনন্দ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এই সমস্তই হল সম্বন্ধ জ্ঞান।

কেউ কেউ আবার ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য বিষয়ক জ্ঞানের কথা বলে থাকেন। তাঁরা নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী। তারা বলেন, ভগবান নিরাকার। তারা বলেন, জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নেই। তাঁদের মতে জীবের চরম সাধ্য বস্তু হল ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি। তারা মনে করে থাকে পরমব্রহ্মের আকার মানেই মায়া উপাধি যুক্ত। এই ধরনের ব্যক্তিরা অভক্ত ও কৃষ্ণচরণে মহা-অপরাধী। এই সব মায়াবাদী, নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীদের জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বিষয়ক শুষ্ক জ্ঞান কৃষ্ণভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। সেই জন্য এই রকমের জ্ঞান সর্বৈবভাবে পরিত্যাজ্য।

আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে আমাদের দেশে হাজার হাজার বড় বড় মায়াবাদী অভক্ত সন্ন্যাসী কাশী সহ সর্বত্র তাদের নির্বিশেষবাদ চর্চা ও প্রচার করছিলেন। তাঁদেরকে ভক্তি তত্ত্ব শেখাবার জন্য, তাদের মায়াবাদী ভাবকে ধূলিসাৎ করবার জন্য এবং জীবনের সার শিক্ষা কৃষ্ণভক্তি ও এই তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের জন্য অল্প বয়সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

১২

সাধন ভজন

প্রশ্ন ১। শাস্ত্রে রয়েছে 'গৃহস্থ সদ্ ব্রাহ্মণের কাছে দীক্ষা নেওয়া উচিত।' তবে মঠে কিভাবে সন্ন্যাসীরা দীক্ষা দিচ্ছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, যিনি গৃহস্থ, অর্থাৎ গৃহমেধী নন। কৃষ্ণভাবনাময় গৃহস্থ ব্যক্তি এবং সদ্‌ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া উচিত, অবশ্য তিনি যদি তাঁর পূর্বতন গুরুদেবের পরম্পরায় আশ্রিত হন। এতে শাস্ত্রের কথা ভুল নয়। কিন্তু সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নেওয়া ঠিক হবে কিনা সেই সম্বন্ধে শাস্ত্র পাঠ করা অবশ্যই উচিত ছিল।

আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব সর্বশাস্ত্রবিদ্ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন আদর্শ গৃহস্থ এবং ব্রাহ্মণও। তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন—

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, প্রকৃত যে হয়,
সে-ই হৈতে পারে গুরু।
কিবা বিপ্র, শূদ্র, কী গৃহী, সন্ন্যাসী,
গুরু হন কল্পতরু ॥

(হঃ চিঃ গুরু-অবজ্ঞা)

পরমগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ॥
যে-ই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সে-ই গুরু হয় ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮/১২৭)

বর্ণ-বিচার আশ্রম-বিচার পারমার্থিক পথে কোন কাজে লাগে না।

বর্ণের মর্যাদা পাত্রের বিচারে
পরমার্থে লঘু অতি।
সুপাত্র মিলন প্রয়োজন সদা
যদি চাই শুদ্ধা রতি ॥

(হঃ চিঃ গুরু-অবজ্ঞা)

কেউ যদি গৃহী গুরু পান, গ্রহণ করতে পারেন। নতুবা সন্ন্যাসী সদ্‌গুরুই বরণ করবেন।

গৃহিজন মধ্যে গৃহি গুরু সন্ত
যদি শুদ্ধ ভক্ত হন।
নতুবা অগৃহী, সুযোগ্য হইলে
গুরুযোগ্য সর্বক্ষণ ॥

(হঃ চিঃ গুরু-অবজ্ঞা)

আর তা ছাড়া মঠে সন্ন্যাসীরাই তো দীক্ষা দিবেন।

বৈরাগ্য আশ্রম- গ্রহণেতে ত্যাগী-
পুরুষ হইবে গুরু।
তাঁহার চরণে শিখিবে বিরাগ,
গুরু শিক্ষা-কল্পতরু ॥

(হঃ চিঃ গুরু-অবজ্ঞা)

শ্রীপদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে,

বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥

ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কুলোদ্ভব ব্যক্তিদের গুরু হতে পারেন, এটি সাধারণ বিধি। কিন্তু ভগবৎ প্রিয় অর্থাৎ বৈষ্ণব—শূদ্রকুলে অবতীর্ণ হলেও তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলোদ্ভব ব্যক্তিদের গুরুদেব। অতএব যাদের চিন্তা পড়েছে—ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়েছে এমন গুরু গ্রহণ করব, না কি অন্য কোন কুলের? গৃহী গুরু ভাল, না কি সন্ন্যাসী গুরু ভাল? স্বদেশী গুরু নেব, না কি বিদেশী গুরু নেব?—এই সকল বিচার নিতান্তই অমূলক এবং অপরাধমূলক।

সেই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত সাবধান করে দিয়ে বলেছেন—

কিবা বর্ণী, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে-ই, সে-ই আচার্যপ্রবীণ ॥
আসল কথা ছাড়ি' ভাই বর্ণে যে করে আদর।
অসদ্‌গুরু করি তা'র বিনষ্ট পূর্বাপর ॥ (প্রেমবিবর্ত)

প্রশ্ন ২। বৈষ্ণবেরা তিলক পরেন কেন?

উত্তর ঃ শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীনারদ মুনি বলছেন—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণাম্ ঊর্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা কৃতং।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ ॥

"যে মানুষের শরীরে "ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক থাকে না, তাকে দর্শন করা উচিত নয়। সেই শরীর শ্মশানসদৃশ।"

শ্রীনারদ মুনি আরও বলেছেন, ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক ধারণ না করে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদ অধ্যয়ন, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যে কোনও কর্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তা-ই বিফল হয়ে থাকে।" (হঃ ভঃ বিঃ ৪/৭২)

প্রশ্ন ৩। অধিকাংশ মানুষকে দেখা যায়, তারা শুক্রবারটি বাদ দিয়ে বাকি দিনগুলিতে মাছ-মাংস খায়, লুঙ্গির মতো করে গেরুয়া বসন পরে, তিলক অঙ্কন বা শিখা ধারণ করে না, একাদশী পালন করে না, কেবল ব্রহ্মচারী হয়ে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সাধন-ভজন করে। এরূপ পন্থা কি ঠিক নয়?

উত্তর ঃ আমাদের জানতে হবে কৃষ্ণভজনকারী কৃষ্ণপ্রসাদ প্রিয়। তিনি কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করেন। অপ্রসাদ, অমেধ্য, আমিষ-জাতীয় কোন কিছু তিনি ভোজন করেন না। কৃষ্ণকে কখনও মাছ-মাংস-ডিম ইত্যাদি ভোগ নিবেদন করা যায় না। মাছ-মাংস অমেধ্য বস্তু—তামস প্রকৃতির মানুষেরা এই অমেধ্য বস্তুকে প্রিয়খাদ্য রূপে গ্রহণ করে থাকে। *অমেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।* (গীতা ১৭/১০) মাছ-মাংস ভোজীকে মহাপাপী জ্ঞানে যমদূতেরা নারকীয় দণ্ড ভোগ করানোর উদ্দেশ্যে যমলোকে টেনে নিয়ে যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে নরক বর্ণনায় সেই কথা বর্ণিত হয়েছে। মাছ-মাংস ভক্ষণ রূপ পাপকর্মটি কেবল শুক্রবারে করা হবে না—বাকি দিনগুলিতে করা হবে, এরূপ দুর্নীতি বুদ্ধিমান জন অবশ্যই গ্রহণ করবেন না।

তাঁরাই নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভজন করতে পারবেন যাঁরা পাপ কর্ম করেন না। *যেষাং ত্বন্তগতং........ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ* (গীতা ৭/২৮) যাদের পাপ দূরীভূত হয়েছে তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে কৃষ্ণভজনা করেন। মাছ-মাংস ভক্ষণ কলিযুগের মানুষের পক্ষে সাধনভজনের বিঘ্নস্বরূপ জেনে সাবধান থাকা উচিত। তার পরের নিয়মগুলি তো পরের কথা।

প্রশ্ন ৪। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন না করে অন্য রকম মন্ত্র কীর্তন করা যায় না কি?

উত্তর ঃ বৈদিক শাস্ত্রে কলিযুগের মানুষকে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চারি যুগের জন্য ভগবানের দিব্য তারকব্রহ্ম নামের ভিন্নতা রয়েছে। যেমন,

সত্য যুগের মন্ত্র ছিল—

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণ পরা গতিঃ॥

ত্রেতা যুগের মন্ত্র ছিল—

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

দ্বাপর যুগের মন্ত্র ছিল—'

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

কলি যুগের মন্ত্র হল—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

কলিসন্তরণ উপনিষদে বলা হয়েছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে॥

অর্থাৎ, "ষোল নামবিশিষ্ট এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কলির কলুষ নাশকারী, এর থেকে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উপায় সমস্ত বেদশাস্ত্রেও দেখা যায় না।"

অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে—"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে মানুষ কৃতার্থ হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'
প্রভু বলে, 'কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব-সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর॥

(চৈঃ ভাঃ ২৩/৭৬-৭৮)

শ্রীঅনন্ত-সংহিতা শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই মহামন্ত্র বাদ দিয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ, রসাভাসদুষ্ট মনগড়া ছড়াবাঁধানো পদ কখনও অভ্যাস করা উচিত নয়।

বর্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্॥

প্রশ্ন ৫। জীবনে গুরুর প্রয়োজন কি? তেমন গুরু কোথায় পাব যাঁকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কাছে পাব?

উত্তর ঃ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ভবচক্র থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়ের অবশ্যই প্রয়োজন। গুরু ছাড়া পরমার্থ সাধন হয় না।

প্রয়োজন আছে বলেই গুরুদেব, অপ্রয়োজনে গুরু গ্রহণের দরকার নেই। চাল ডাল তেল নুন টাকা পয়সা জমি-জমার প্রয়োজনে গুরু গ্রহণের প্রয়োজন নেই। লোক দেখানো সাধু সাজবার উদ্দেশ্যে গুরুর প্রয়োজন নেই। লাভ পূজা নাম যশ প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আশায় গুরু গ্রহণের প্রয়োজন নেই। আসল প্রয়োজন কৃষ্ণভক্তি। তার জন্য কৃষ্ণভক্ত গুরু প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্ত নয়, এমন গুরুর প্রয়োজন নেই। আমিষভোজী, মাদকসেবী গুরুর কোনও প্রয়োজন নেই।

আমার প্রয়োজনে আমি গুরুকে কাছে পাব, এরূপ চিন্তার চেয়ে গুরুদেবের প্রয়োজনে আমি নিযুক্ত হতে পারব, এরূপ চিন্তা করাটাই সমীচীন।

প্রশ্ন ৬। ভক্ত বড়, না ভগবান বড়?

উত্তর ঃ ভক্তের কাছে তাঁর পরম প্রভু ভগবান বড়, ভগবানের কাছে ঐকান্তিক সেবাপরায়ণ ভক্তই বড়।

প্রশ্ন ৭। ভক্তি বড়, না জ্ঞান বড়?

উত্তর ঃ ভক্তি সব সময়েই বড়। ভক্তিকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান। ভক্তিহীনতাই অ-জ্ঞান। রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি দুর্ধর্ষ রাজাগণ বড় বড় জ্ঞানী, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ্ ছিলেন, কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তিহীনতার জন্য তাঁদের কাছে ভগবান নিষ্ঠুর মহাকালরূপী মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের নিধন করে ছিলেন। কিন্তু ধ্রুব, প্রহ্লাদ ইত্যাদি রাজাগণ শৈশব থেকে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেছিলেন, তাই ভগবান তাঁদের সর্বাবস্থায় রক্ষা করেছিলেন এবং কৃপাশীর্বাদ দান করেছিলেন। ভগবান বলছেন—*ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—ভক্তির দ্বারাই আমাকে জানতে পারবে। *ন মেধয়া ন বিদ্যয়া লভ্যঃ*—বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—"বাচস্পতিগণ বহু তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধি দ্বারা বহু অনুসন্ধান করেও সর্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে জানতে পারেননি।" (ভাঃ ৪/২৯/৪৪) ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—"যোগীই তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী কর্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে অর্জুন! তুমি যোগী হও, যে যোগী আমাতে আসক্ত হয়ে সর্বান্তঃকরণে আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজনা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। ইহাই আমার অভিমত।" (গীঃ ৬/৪৬-৪৭)

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা যাঁরা সর্বদা প্রীতির সঙ্গে আমার ভজনা করেন, তাঁদের আমি শুদ্ধ জ্ঞানজনিত সেই বিমল প্রেমযোগ দান করি, যা দিয়ে তাঁরা আমার পরমানন্দধাম প্রাপ্ত হন।" (গীতা ১০/২০)

প্রশ্ন ৮। রাধাকৃষ্ণ কোথায়? বৃন্দাবনে, না সর্বত্র? না কি আমাদের অন্তরে?

উত্তর ঃ এই অনন্ত কোটি জড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বহু বহু ঊর্ধ্বে শ্রীগোলোক বৃন্দাবন নামে সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্য কাল বিরাজমান। ইহ জগতে পঞ্চভূতের তৈরি আমাদের জড় চক্ষুতে রাধাকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু তিনি কৃপাপূর্বক এই জগতেও শ্রীবিগ্রহরূপে মন্দিরে মন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তগণ কর্তৃক অর্চিত ও বন্দিত হন। শাস্ত্রে রয়েছে ভগবানের নাম, স্বরূপ ও বিগ্রহ—এক ও অভিন্ন (চৈঃ চঃ মঃ ১৭/১৩১)। এই জেনে যদি কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনে আমরা সর্বদা নিযুক্ত হই, তবে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার নিয়মে দেহত্যাগের পর আমরা আমাদের চিন্ময় স্বরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবায় যুক্ত হতে পারব।

আবার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে আপন অন্তরের মাঝেও পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ আছে, যে সকল সাধুগণের ভক্তিময় চক্ষু ভগবৎ প্রেমের অঞ্জনে রঞ্জিত, তাঁরা হৃদয়ে অচিন্ত্য গুণ বিশিষ্ট শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা অবলোকন করেন।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৮)

প্রশ্ন ৯। তিলক না পরলে কি ভক্ত হওয়া যায় না?

উত্তর ঃ তিলক ধারণ করা বৈষ্ণব চিহ্ন। যেমন, পুলিশের ধূসর পোশাক, লাঠি, বন্দুক না থাকলে পুলিশ বলে চিহ্নিত হয় না, তেমনি, কণ্ঠিমালা, শিখা ধারণ না করলে বৈষ্ণব বলে চিহ্নিত হওয়া যায় না।

স্কন্দ পুরাণে ব্রহ্মাকে শ্রীভগবান বলছেন—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্ধ্বপুণ্ড্রং বিনাকৃতম্ ।
তন্মুখং নৈব পশ্যামি শ্মশান সদৃশং হি তৎ ॥

(বিষ্ণুঃ মার্গঃ ৩/২২)

"যে সব মানুষের শরীরে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক নেই, তাদের মুখ শ্মশানসদৃশ, আমি কখনই তাদের মুখ দর্শন করি না।"

প্রশ্ন ১০। লক্ষ জীবের মধ্যে মানব জন্ম শ্রেষ্ঠ, তবে নিকৃষ্ট জন্ম কোনটি?

উত্তর ঃ পশুপাখী, কীটপতঙ্গ—প্রত্যেক জীবের লক্ষ্যই হচ্ছে আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন। কিন্তু মানুষ শ্রেষ্ঠ এই জন্য যে, সে প্রশ্ন করে—কেন জন্ম, কেন দুঃখ আর দুর্দশা? এই জন্ম-জরা-ব্যাধি ও মৃত্যু থেকে মুক্তির উপায় কি? যে প্রশ্ন অন্য প্রাণীরা করে না। তাই মানুষ জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু যার সেই চেতনা নেই, সে জীবই হোক না কেন, সে নিকৃষ্ট।

প্রশ্ন ১১। শিখা-তিলক না রাখলে কি ভক্ত হওয়া যায় না?

উত্তর ঃ শিখা তিলক হচ্ছে ভক্তের চিহ্ন। যেমন, শাঁখা সিঁদুর সধবা সতী নারীর চিহ্ন, উপবীত ব্রাহ্মণের চিহ্ন। চিহ্ন গুলি যদি কেউ না রাখতে চায়, তবে সে তার বিপরীত কোনও কিছু বলে পরিচিত হবে। শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী বৈষ্ণব মাত্রেরই শিখা তিলক ধারণ করতে হবে এবং তার মাহাত্ম্য রয়েছে।

প্রশ্ন ১২। ঈশ্বর এক না বহু? ভগবান কে? তাঁকে চিনবার উপায় কি?

উত্তর ঃ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীব্রহ্মা নির্দেশ দিয়েছেন, '*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।*' (ব্রহ্মসংহিতা) সৎ, চিৎ ও আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণই হলেন পরম ঈশ্বর। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ॥" (চৈতন্যচরিতামৃত আদি ৫/১৪২) শ্রীকৃষ্ণই

সবার ঈশ্বর। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান। "*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*" (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৩/২৮)

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্ ।
সর্ব-অবতারি, সর্বকারণ-প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁ সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দ-তনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।
সর্বৈশ্বর্য, সর্বশক্তি, সর্বরসপূর্ণ ॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ৮/১৩৩-১৩৫)

শাস্ত্রে বলা হয়েছে *'ভক্তিবিলোচনেন'* (ব্রহ্মসংহিতা)। ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে চেনা যায়। জড় গবেষণায় নয়। ভক্ত-শিরোমণি শ্রীবাস পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন, "যারে অনুগ্রহ কর' জানে সে-ই জনে।" (শ্রীচৈতন্য ভাগবত অন্ত্য ৯/২২৩) ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় ভগবানকে জানা যায়। অভক্ত, ইন্দ্রিয় সুখভোগপরায়ণ, জড় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে ভগবান স্বরূপে প্রকাশিত হন না। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন, *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ*। "আমি সবার কাছে প্রকাশিত হই না, যোগমায়া দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রাখি।" (গীতা ৭/২৫) সুতরাং, ভক্তিমূলক সেবাই তাঁকে চিনবার উপায়।

প্রশ্ন ১৩। গুরুগ্রহণ না করে কি হরিভজন হয় না?

উত্তর ঃ বৈষ্ণব-আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের (৬/২/৯-১০ শ্লোকের) সারার্থ-দর্শিনী টীকায় লিখেছেন, যারা জানে যে, শ্রীহরিই একমাত্র ভজনীয় এবং ভজনের দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়, আবার ভজন উপদেষ্টা হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট ভক্তগণই শ্রীহরিই প্রাপ্ত হয়েছেন,—এরূপ জেনেও যদি তারা মনে করে যে, 'গুরু গ্রহণ করার দরকার নেই, একমাত্র নামকীর্তন দ্বারাই ভগবৎ প্রাপ্তি হবে,' তা হলে তাদেরও 'গুরু-অবজ্ঞা' রূপ অপরাধ হয়ে থাকে। সেজন্য তারা শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু, সেই জন্মে বা পরজন্মে সেই অপরাধ ক্ষয় হলে শ্রীগুরুর চরণ আশ্রয় করে ভজনে করলে ভগবৎ প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

করুণাবারি সিঞ্চন করে গুরুদেব ত্রিতাপ দুঃখময় সংসার-দাবানল থেকে বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করেন। *সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-ত্রাণায় কারুণ্য ঘনাঘনত্বম্।* যারা ঐকান্তিক ভাবে কৃষ্ণকৃপা লাভ করতে চায়, তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্গুরুর সান্নিধ্যে আসে। কেবল অত্যন্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই সদ্গুরুর সংস্পর্শে আসে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উল্লেখ করেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৫১)

চিৎ-জগতের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সদ্গুরুর অন্বেষণ করতে হয়। *'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।'* (মুণ্ডক উপনিষদ ১/২/১২) শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—*তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্* (ভাঃ ১১/৩/২১) চিৎ-জগতের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে যিনি অত্যন্ত আগ্রহী, তাঁকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ প্রতিনিধি গুরুদেবের অন্বেষণ করতে হবে। গুরুদেব হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ দিব্যজ্ঞান প্রদাতা—*সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।*

গুরুদেব ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন। *প্রভোর্য প্রিয় এব তস্য।* যাঁকে প্রসন্ন করলে, ভগবান প্রসন্ন হন, যিনি অসন্তুষ্ট হলে জীবের অন্য গতি থাকে না—*যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদ যস্যাপ্রসাদান্ন গতি কুতোহপি*। সেই গুরুদেবের পাদপদ্মে অবশ্যই আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ১৪। সদ্গুরুকে চেনার উপায় কি? বৈষ্ণব না হলে কি গুরু হওয়া যায় না?

উত্তর ঃ সদ্গুরু সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন, শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। তিনি সর্বদা কৃষ্ণকথা বলেন। কৃষ্ণভক্তি বিরুদ্ধ কোনও কথা বলেন না। তিনি জগতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করেন। তিনি পরম কৃষ্ণভক্ত। তিনি দ্বাদশ অঙ্গে তিলক পরিধান করেন। তিনি শিখাধারণ করেন; কণ্ঠে তুলসী কাঠের মালা ধারণ করেন। তিনি কৃষ্ণনাম জপ করেন, কীর্তন করেন। বদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। তিনি ভক্তি প্রতিকূল বিষয় গ্রহণ করেন না। আমিষ আহার, পান বিড়ি তামাক সেবন, তাস পাশা জুয়া খেলা, অবৈধ যৌন সঙ্গাদিতে তিনি কখনও জড়িত থাকেন না। এরূপ ব্যক্তিই সদ্গুরু। তিনি অবশ্যই গুরুপরম্পরার ধারায় আশ্রিত। একজন গুরু হন তাঁর গুরুদেবের অনুমোদনক্রমে।

বৈষ্ণব না হলে কাউকে গুরুদেব হিসাবে গ্রহণ করা কখনই উচিত নয়। আবার, দেখতে বৈষ্ণবের মতো হলেও বিধিনিষেধ যদি পালন না করে, অর্থাৎ যদি কেউ পান বিড়ি সিগারেট তামাক সেবন করে, কিংবা মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি অখাদ্য গ্রহণ করে, কিংবা তাস জুয়া আড্ডাতে যুক্ত হয়, কিংবা অবৈধ যৌনসঙ্গে লিপ্ত হয়, তবে সে কখনই গুরু হিসাবে গণ্য হতে পারে না।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।

"অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করলে নরকে গতি হবে।" (হরিভক্তিবিলাস ৪/১৪৪)

কেউ যদি ভুলক্রমে অবৈষ্ণবের কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে থাকেন, তবে তাঁর পক্ষে অবশ্যই—

পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥

"যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করা উচিত।" (হরিভক্তিবিলাস ৪/১৪৪)

বিষ্ণু বা কৃষ্ণমন্ত্রে যারা দীক্ষিত নয়, তাদের অবৈষ্ণব বলা হয়। শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

মহাকুলো প্রসূতোঽপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

"উচ্চ কুলে জাত, সর্ব যজ্ঞে দীক্ষিত এবং সহ শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ কেউ হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি অবৈষ্ণব হন, তবে তিনি গুরুপদে অভিষিক্ত হতে পারেন না।" (পদ্মপুরাণ)

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ উল্লেখ করেছেন—

পরমার্থগুর্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক গুর্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্তব্য॥

"ব্যবহারিক, লৌকিক এবং কুলগুরু ইত্যাদি গুরুব্রুব পরিত্যাগ করে পারমার্থিক গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

প্রশ্ন ১৫। আমরা কলির গৌরাঙ্গ না বসিয়ে মন্দিরে দ্বাপরের রাধাকৃষ্ণ বসাই কেন?

উত্তর ঃ ভগবানের কোনও বিগ্রহ কোনও কালের অধীন নন। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রূপে ভগবান লীলাবিলাস করতে পারেন। কিন্তু সকল রূপই নিত্য। শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে কোনও পার্থক্য নেই। তা ছাড়া উভয় শ্রীবিগ্রহই মন্দিরে অর্চিত হন। উভয় বিগ্রহই ভগবদ্ভক্তের অত্যন্ত প্রিয়। যারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মানে শ্রীগৌরাঙ্গ মানে না, কিংবা শ্রীগৌরাঙ্গ মানে শ্রীকৃষ্ণ মানে না, তারা অসুর প্রকৃতির লোক।

প্রশ্ন ১৬। কৃষ্ণভক্ত নন এমন কোনও গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে কোনও ভক্ত কি স্বেচ্ছায় ঐ গুরু ছেড়ে পুনরায় কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারেন?

উত্তর ঃ যাঁকে গুরুরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, তিনি যদি সমস্ত কারণের পরম কারণ আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত না হন, বৈষ্ণব না হন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা না হন, মাংসাশী, বিড়ি, সিগারেট কিংবা তামাকসেবী হন, অবৈধ যৌন সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তা হলে সেই রকম ব্যক্তি পারমার্থিক গুরু হিসাবেই গণ্য নয়। যদি কেউ পারমার্থিক কল্যাণের জন্য সেরূপ গুরুর কাছে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করে থাকে তবে সে নরকগামী হবে বলে শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। যদি কেউ ভুলক্রমে সেই রূপ গুরু গ্রহণ করে থাকেন তবে তাঁকে সেই গুরু পরিত্যাগ করতেই পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রবিধি মতে সেরূপ গুরু পরিত্যাগে কোনও দোষ হয় না, বরং মঙ্গল লাভের জন্য পুনরায় পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর্তব্য।

প্রশ্ন ১৭। প্রতিদিন নিয়মিত গীতা পাঠে কি কৃষ্ণ মিলে?

উত্তর ঃ নিয়মিত যাদের গীতা পাঠে রুচি নেই তাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও রুচি নেই বলে বুঝতে হবে। প্রতিদিন নিয়মিত গীতা পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী অভিন্ন। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী প্রত্যহ পাঠ করা ভক্তের

আকাংক্ষিত কর্ম। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন যে কিভাবে তাঁকে লাভ করা যায়। সুতরাং, গীতা পাঠ করে সেই নির্দেশ মতো চললে অবশ্যই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে। যারা গীতা পাঠ করতে বা শ্রবণ করতে অবজ্ঞা করে তারা শ্রীকৃষ্ণকেই অবজ্ঞা করছে।

প্রশ্ন ১৮। ঘরে বসে কি হরিভজন হয় না?

উত্তর ঃ না। ঘরে বসে থাকলে হরিকে ফাঁকি দেওয়া হয়। ভজন হয় না। সর্ব প্রযত্নে হরি সেবাপরায়ণ হয়ে ভক্তিপথে সাবধানে চলতে হয়। ঘরে শ্রীহরিকে বসাতে হয়। নিজে ঘরে বসে থাকলে হবে না। শ্রীহরির সন্তোষ বিধানের জন্য ঘরের প্রত্যেককেই কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের মাধ্যমে ভক্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে হয়।

প্রশ্ন ১৯। আমরা জানি, সাধারণ মানুষেরা প্রায় উদ্ধত প্রকৃতির হয়, কিন্তু মঠের সাধুরা কেন মাঝে মধ্যে উদ্ধত হয়?

উত্তর ঃ উদ্ধত প্রকৃতির সমাজ থেকেই আমি বৈষ্ণবগণের কৃপায় ভাগ্যক্রমে মঠে এসে সাধন ভজন করার সুযোগ পেয়েছি মাত্র। তাই পূর্ব অভ্যাসগুলি মনের মাঝে একটু একটু জেগে ওঠে। সে কথা তো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন।

প্রশ্ন ২০। আমি ইসকনে ভক্ত হবার পর প্রভুপাদের সমস্ত বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করে প্রভুপাদকে মানস-গুরুরূপে ভেবে তাঁর পথ অনুসরণ করি, দীক্ষা না নিয়ে; তাতে কি কোনও অপরাধ আছে? দীক্ষা কি আমাকে নিতেই হবে? যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে হরিনাম মহামন্ত্র জপ করে যাচ্ছি।

উত্তর ঃ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের গ্রন্থ পাঠ করে কিছু কিছু জানতে চেষ্টা করছেন এবং তাঁকে মানসে গুরুরূপে গ্রহণ করেছেন, এবং বৈদিক সাধারণ বিধিনিষেধগুলি পালন করবার চেষ্টা করছেন। অতএব নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসনীয় ব্যক্তি। এতে অপরাধের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। অনেকের ধারণা এই যে, প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করে তারপর সব কিছু পারমার্থিক শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেটি ভুল ধারণা। দীক্ষা নেওয়ার কমপক্ষে মাস ছয়েক আগের থেকেই প্রতিদিন নিষ্ঠাভরে ষোল মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ, অতি ভোরে শয্যাত্যাগ, আরতিতে যোগ দান, গীতা-ভাগবত শ্রবণ, আমিষ-নেশাভাং-জুয়াতাস-অবৈধ সঙ্গ ইত্যাদি বর্জন এবং ভগবৎ সেবা কার্যে সযত্নে যুক্ত হওয়া ইত্যাদি নিয়মকানুন মেনে চলতেই হয়। হঠাৎ কাউকেই দীক্ষা দেওয়া হয় না। ছয় মাস পরে নতুন শিক্ষার্থী ভক্তরা মনে মনে গুরু মনোনয়ন করে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় শিষ্য বর্তমান সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকারী পরম শ্রদ্ধেয় আচার্যবর্গ রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজনের শ্রীচরণ প্রান্তে দীক্ষাপ্রার্থীরূপে আসতে হবে। সেজন্য লিখিত ও বৈদিক পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষায় পাশ করলে মন্দির অধ্যক্ষ দীক্ষা গ্রহণের জন্য অনুমোদন করেন।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/১৯২)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেই একনিষ্ঠভাবে শ্রীগুরুনির্দেশে পারমার্থিক কার্যকলাপে জীবন উৎসর্গে মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর লিখেছেন—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

আমরা জন্ম-মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হয়ে এই ভব সংসারে জন্ম-জন্মান্তর ধরে জড় সুখ-দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করছি। কিন্তু অতি দুর্লভ এই মনুষ্য-জন্মেই একমাত্র সুযোগ পাওয়া যায়; পরমনিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত ভগবদ্ প্রতিনিধি আচার্যের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়ে ভগবদ্ধামে সচ্চিদানন্দময় নিত্য জীবনে উন্নীত হওয়ার সুযোগ। ভগবদ্ প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে আশ্রয় না নিয়ে কেউ ভগবদ্ধামে যেতে পারে না। পারমার্থিক সদ্গুরু বৈষ্ণবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করা জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবশিক্ষা দানের জন্যই ভগবান স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুরুগ্রহণ করে দীক্ষিত হয়েছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

দিব্য জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব-কোবিদৈঃ ॥

"যা থেকে অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং পাপের সর্বতোরূপে ক্ষয় হয়, তত্ত্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা তাকেই 'দীক্ষা' বলে প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন।" (ভক্তি সন্দর্ভ ২৮৩ শ্লোক) আরও বলা হয়েছে যে, "ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও, উপনয়ন না হওয়া পর্যন্ত যেমন বৈদিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করার অধিকার হয় না উপনয়নের পরেই সেই অধিকার লাভ হয়। তেমনই অদীক্ষিত ব্যক্তিরও মন্ত্র-দেবতার পূজা অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে অধিকার হয় না।"

প্রত্যেকের কর্তব্য হল বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্নীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্বং বিধানতঃ ॥

"প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সদ্গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করা। তাকে দেহ, মন ও বুদ্ধি—সব কিছু দান করে তাঁর কাছে থেকে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য।" (হঃ ভঃ বিঃ ২/১০)

যথাযথভাবে দীক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেন। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৯৮ শ্লোক) শ্রীল জীব গোস্বামী লিখেছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃনাম্ ॥

"পারদের সংস্পর্শে রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়, তেমনই যথাযথভাবে দীক্ষা গ্রহণের ফলে মানুষ ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণাবলী অর্জন করেন।"

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে ব্রতী আচার্যগণ সকলেই আমাদের পারমার্থিক শিক্ষাগুরু, কিন্তু পারমার্থিক দীক্ষাগুরুরূপে একজন মহান বৈষ্ণবকে গ্রহণ করতেই হয়। এটিই আধ্যাত্মিক জীবনধারার বিধি।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন—"আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা যদি সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ না করি, তা হলে আমাদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সব রকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে।" (চৈঃ চঃ আদি ১/৩৫ তাৎপর্য)

প্রশ্ন ২১। লোকে বলে "ঈশ্বর সাধনা অত্যন্ত কঠিন।" কেন কঠিন?

উত্তর ঃ যারা নিজেকে ফাঁকি দেয়, তাদের কাছে সব সাধনাই কঠিন। যেমন, ছাত্র যদি পড়াশুনায় ফাঁকি দেয়, সিনেমা দেখে, গল্পগুজব করে, খেলাধুলা করে, ঘুমিয়ে কাটায়, তা হলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তেমনই যারা কলিযুগের ধর্ম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে আগ্রহী নয়, যারা কলির কলুষতায় জীবন কাটায়—যেমন, মাছ-মাংস খায়, বিড়ি-সিগারেট ফোঁকে, তাস-জুয়া খেলে, অবৈধ সঙ্গাদিতে থাকে, তবে তাদের পক্ষে কৃষ্ণভজনা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

যারা মনগড়া মত নিয়ে বলে 'ভগবান নিরাকার নির্বিশেষ', 'সমস্ত জীবই ভগবান', তাদের পক্ষে ঈশ্বর সাধনা অবশ্যই কঠিন হবে। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

"যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের পক্ষে পারমার্থিক লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ অব্যক্তের উপাসনার ফলে কেবল দুঃখই লাভ হয়।" (গীতা ১২/৫)

যারা জানে শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান, জীব হচ্ছে তাঁর নিত্য অংশ নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণের ধাম পরমানন্দময় চিন্ময় লোকে ফিরে যাওয়াই এই জন্মের উদ্দেশ্য, এই উদ্বেগপূর্ণ জগতে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি নিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধরে কীটপতঙ্গ পশু-পাখি গাছপালাদি দেহ ধারণ করে পড়ে থাকা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়—এই ধারণা যাঁদের হয়েছে, তাঁদের কাছে হরিভজনই একমাত্র আনন্দের, এছাড়া সমস্ত কৃষ্ণবহির্মুখ ক্রিয়াকলাপই অত্যন্ত কষ্টের।

তা ছাড়াও, কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা, পাঠ করা, কৃষ্ণনাম কীর্তন করা, শ্রীকৃষ্ণকে একটু ফুল-জল দিয়ে পূজা করা, কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা এই পৃথিবীর যে কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনও কঠিন নয়।

প্রশ্ন ২২। সারা জীবন হরিভজন না করেও দেহত্যাগ কালে কোনক্রমে কেউ যদি ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে পারে, তা হলে তার গতি বা অবস্থান কি? সে কি ভগবদ্ধামে যেতে পারে?

উত্তর ঃ দেহত্যাগ কালে ভগবানের নাম উচ্চারণ করলেই জীবাত্মার সর্বপাপ থেকে মুক্তি হয়ে যায়। শাস্ত্রে সেই কথাই বলা হয়েছে, নামাভাসে মুক্তি। কিন্তু নাম উচ্চারণ করলেই যে, ভগবদ্ধামে গতি হবে এমন কথা কোথাও বলা হয়নি। একমাত্র শুদ্ধ নামে ভগবদ্ধামে গতি হয়। শুদ্ধ নাম তাঁরাই করতে পারেন, যাঁরা ভগবদ্ প্রীতির উদ্দেশ্যেই সদা সেবোন্মুখ। যাঁদের হৃদয়ে জড়-জাগতিক ভোগবাসনা অথবা নিছক দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনা আছে—তাদের মুখে শুদ্ধ নাম হয় না।

হরি ভজন করা হচ্ছে না—মানেই হৃদয় শুদ্ধ নয়। অর্থাৎ, হৃদয় জড় বিষয় চেতনায় আচ্ছন্ন আছে। অশুদ্ধতার কারণে মরণকালে হরি স্মরণ হয় না, বিষয় স্মরণই হয়। জীবিত অবস্থায় আমরা যেমন কর্ম করি, সেই অনুযায়ী আমাদের মৃত্যুকালীন চিন্তার উদয় হয়। এইভাবে কর্মের দ্বারা আমাদের পরবর্তী জীবন নির্ধারিত হয়।

শ্রীহরির পাদপদ্মসেবা লাভ, শ্রীহরির অপ্রাকৃত ধামে উন্নীত হতে হলে এই জীবদ্দশায় তাঁকে স্মরণ করার, সেবা করার, ভক্তি করার অভ্যাস করে নিতে হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারে বারে সেই কথাই প্রতিপন্ন করেছেন—*সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর* (গীতা ৮/৭) "সর্বদাই আমাকে স্মরণ কর।" *সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভব* (গীতা ৮/২৭) "সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত থাকো।" *অভ্যাস যোগ যুক্তেন-অনুচিন্তয়ন্* (গীতা ৮/৮) "অভ্যাস যোগে যুক্ত থেকে তাঁর চিন্তা করতে হবে।" *অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি* (গীতা ৮/১৪) "যে একাগ্রচিত্তে নিরন্তর আমাকে স্মরণ করছে।" এই হচ্ছে ভগবদ্ধামে যাওয়ার শর্ত।

দেহত্যাগ কালে স্বভাবতই চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়, হৃদয়ে পুঞ্জীভূত ভোগবাসনার ফলে। আর তবুও যদি কেউ কোনক্রমে সেই সময়ে ভোগবাসনা নিয়ে ভগবানের কোনও নাম উচ্চারণ করতে পারে, তবে সে সর্ব পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করার সুযোগ পেতে পারে। দেহত্যাগ কালে জীব যদি চিন্তা করতে থাকে এই দুঃখময় জগৎ আমি চাই না। আমি মুক্তিই চাই—এই মনোভাব নিয়ে সে হয়তো 'হে গোবিন্দ' বলে ভগবানের নাম উচ্চারণ করল। দেহত্যাগের পর তার সাযুজ্য মুক্তি লাভ হবে। সে ভগবানের অঙ্গজ্যোতি ব্রহ্মজ্যোতিতে মিশে যাবে। ঘোর নাস্তিকেরাও এই মুক্তি লাভ করতে পারে। দেহত্যাগ কালে জীব যদি চিন্তা করে থাকে—সারা জীবন বৃথা গেল, আর নয় এক্ষুনিই আমি ব্রজে গিয়ে শ্রীশ্রীরাধামাধবের চরণসেবায় যুক্ত হব—এই রকম চিন্তা করেই 'হে কৃষ্ণ' বলে দেহত্যাগ করল। তখন সে কৃষ্ণলোকে উন্নীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে।

তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"দেহত্যাগ কালে কেউ যদি আমাকে স্মরণ করতে পারে, তবে সে অবশ্যই আমার ধামে উন্নীত হতে পারবে।"

কিন্তু এই স্মরণ মরণকালে তাঁদেরই হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, যাঁরা জীবদ্দশায় স্মরণের অভ্যাস করেছেন অর্থাৎ, কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করেছেন। মরণকালে ভগবানের নাম উচ্চারণ করলেই যমলোকে যাওয়ার বিপদ কেটে যায়। যমদূতেরা তার কাছে আসতে সাহস করে না। সেটাই শাস্ত্রে নামাভাসে মুক্তি বা নামের ফলে যমযাতনা থেকে মুক্তি বলা হয়েছে।

কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাযুজ্য মুক্তি বা স্বর্গভুক্তি কামনা করেন না। কারণ তাঁর সেই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের ফলে পুনরায় তাঁকে দুঃখময় অবস্থায় ফিরে আসতেই হয়। তাই ভগবানের ধামে উন্নীত হতে হলে জীবদ্দশায় ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে যত্নবান হতে হয়। ফাঁকি দিয়ে ঝুঁকি নেওয়া বুজরুকি মাত্র। সারাজীবন একদম পড়াশুনা না করে এম-এ পরীক্ষায় কলম চালিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করা কখনই সম্ভব নয়। তেমনই সারাজীবন সাধন ভজন না করে মৃত্যু-পরীক্ষায় পৌঁছে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে উত্তীর্ণ হয়ে বৈকুণ্ঠগতি লাভ করবার আশাও অবশ্যই ব্যর্থ হয়।

মানুষের জানা উচিত যে, মৃত্যুর সময়কাল, মৃত্যুর সময় যমদূতদের দর্শন, মৃত্যুর সময় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ—এই সব কিছু মিলিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, মরণশায়ী ব্যক্তির বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায়। ফলে হরিনাম উচ্চারণ করা তো দূরের কথা—ভয়, আর্তি, হতাশা, দম আটকে যাওয়া, বাক্‌শক্তি অচল হয়ে যাওয়া—কত রকমের নিদারুণ বীভৎস দুর্বিপাকের মধ্যেই দেহত্যাগ ঘটে। মৃত্যুর বিভীষিকাই হরিনাম করতে সুযোগ দেয় না। তাই কেউ যদি মনে করে, সারাজীবন ভজন-সাধনহীন হয়েও মরণকালে হরিনাম উচ্চারণ সম্ভব হয়, তবে তার সেই ধারণা ব্যর্থ হয়ে যায়। সেই নিষ্ঠুর বিভীষিকা এড়াতে হলে জীবন থাকতে থাকতেই সাধনভজন হরিনাম কীর্তনাদি অনুশীলনে ব্রতী হতে হয়।

প্রশ্ন ২৩। মরণ কালে হরিস্মরণ করে হরিধামে কি গতি হয় না?

উত্তর ঃ অবশ্যই হয়। কিন্তু সারাজীবন অধ্যয়নে ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চিন্তা করা যেহেতু কখনই ঠিক নয়, তেমনই সারাজীবন হাবিজাবি চিন্তা ও কর্মে নিয়োজিত থেকে কেবল মরণ কালে একবার হরিস্মরণ করেই অতি সহজে হরিধামে চলে যাব, এই রকম চিন্তা করা কখনই উচিত নয়। কারণ সর্বসাক্ষী পরমাত্মা ফাঁকিবাজকে সহজ সুযোগ দেবেন, এই আশা করা বৃথা। জীবনের প্রথম থেকেই হরিভজন করতে হয়। তা হলেই শ্রীহরির কৃপায় জীবনের শেষদিনে স্মরণ হয়।

প্রশ্ন ২৪। আমরা হরিকথা শ্রবণ করার পরও আমাদের শুদ্ধ চেতনা লাভের জন্য কিছু পাই না কেন? কৃষ্ণভক্তির কথা মনে থাকে না কেন?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥

হরিকথা শ্রবণ কীর্তন হরিপাদপদ্ম স্মরণ ইত্যাদি ভক্তির অঙ্গগুলি অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। কলিবদ্ধ মানুষ স্বভাবতই স্মৃতিহীন, চঞ্চলমতি। পরীক্ষিৎ মহারাজের

মতো কেবল শ্রবণ করে যাওয়ার মানসিকতা তার থাকে না। এমনকি কেউ একটানা কীর্তনও করে যেতে পারে না। আবার কেউ যদি শ্রবণ করে যে, আমরা কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণ প্রভু আমি তাঁর দাস। অথচ সে যদি তাঁর দাসত্ব বা কৃষ্ণকর্ম না করে, তবে সেই শ্রবণের মূল্যমর্যাদা থাকে না। তাই গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে এবং সারাদিন কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্তিলাভের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে শ্রবণ, কীর্তন, বিগ্রহ অর্চন, কৃষ্ণস্মরণ, তাঁর ভক্তের চরণাশ্রয়, তাঁর মন্দির মার্জন, তাঁর জন্য বিবিধ রকমের সেবাকার্য করে চলতেই হয়। সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসলে তিনি অবশ্যই আমাদের কৃপাদৃষ্টি দান করবেন।

প্রশ্ন ২৫। স্মরণ কি?

উত্তর ঃ যে কোনও ভাবে কেউ যদি চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের চিন্তায় নিবদ্ধ করেন, তাকে বলা হয় স্মরণ। পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করার ফলে জীবের সর্ব-অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। "জীবিত অবস্থায় কিংবা মৃত্যুক্ষণে কেউ যদি শ্রীহরিকে স্মরণ করেন, তবে তিনি সমস্ত রকমের পাপ থেকে মুক্ত হন।" (পদ্মপুরাণ)

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের চিন্তাটাই স্মরণ। স্মরণই মনের প্রাণ বা জীবনীশক্তি। স্মরণহীন মন হচ্ছে জীবনশূন্য শব বা মড়ার মতোই। যে দেহে প্রাণ থাকে না, শকুন শেয়াল কুকুরেরা সেই দেহকে ভক্ষণ করতেই সচেষ্ট থাকে, সেইরকমই স্মরণহীন মনকে কাম ক্রোধ লোভ রিপুগুলি সর্বদা দংশন করতে লেগে পড়ে। দেহে জীবন থাকলে শেয়াল কুকুরেরা পালিয়ে যায়, তাকে ভক্ষণ করতে আসে না, অনুরূপভাবে কৃষ্ণস্মরণরূপ প্রাণবন্ত মনকে দেখলে কাম ক্রোধ রিপুরা দূরে পালিয়ে যায়।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ চার প্রকারের স্মরণের কথা বলেছেন—নামস্মরণ, রূপস্মরণ, গুণস্মরণ ও লীলাস্মরণ। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—*স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।* (ভাঃ ১০/৮০/১১) "শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্মরণকারী ব্যক্তির কাছে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে পর্যন্ত দান করে থাকেন।"

প্রশ্ন ২৬। "অন্য অভিলাষ বাদ দিয়ে কৃষ্ণসেবা করাই ভক্তি।" কিন্তু ব্রজধামে বাস করার অভিলাষ নিয়েই তো আমরা কৃষ্ণভজন করছি। এটা কি তবে ঠিক নয়?

উত্তর ঃ অন্য অভিলাষ বলতে কৃষ্ণসেবা ব্যতিরেকে যে অভিলাষ তাইই বোঝায়। ব্রজধামে বাস করার ঐকান্তিক অভিলাষ থাকলে সে উত্তম কথা। তখন কখনও আপন ইন্দ্রিয় তর্পণের উদ্দেশ্যে ধন জন সুন্দরী লাভের অভিলাষ থাকে না। শ্রীল কৃষ্ণদাস শ্রীতুলসী মহারাণীর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে বলছেন "রাধাকৃষ্ণসেবা পাব এই অভিলাষী।" "মোর এই অভিলাষ বৃন্দাবনে দিও বাস" ইত্যাদি। কিন্তু বিষয়ভোগ অভিলাষ থাকলে ব্রজবাস সম্ভবপর হয় না। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লিখেছেন "বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন।" কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিলাষ হওয়া কর্তব্য অন্যথায় সব অন্যাভিলাষ।

প্রশ্ন ২৭। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'—এখানে রাম বলতে কাকে বোঝায়—শ্রীরামচন্দ্রকে, না শ্রীবলরামকে?

উত্তর ঃ 'রাম' বলতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝায়। রাম কথাটির অর্থ হচ্ছে রমণকারী বা আনন্দবর্ধনকারী। তিনি ভক্তকুলের আনন্দ বর্ধন করেন। হে আনন্দ বর্ধনকারী প্রভু! আমার সমস্ত দুঃখ-তাপ হরণ করে আপনার পাদপদ্ম সেবায় দয়া করে আমাকে গ্রহণ করুন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে রাম সম্বোধন করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম হল রাম। যেমন—

গোবিন্দ গোপাল রাম শ্রীনন্দনন্দন।
রাধানাথ হরি যশোমতীপ্রাণধন ॥ (হরিনাম চিন্তামণি)

তবে, যদি কেউ রাম বলতে শ্রীবলরামকে অথবা শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে সম্বোধন করেন, তাতে তেমন দোষ হয় না। কারণ তাঁরা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ।

প্রশ্ন ২৮। যারা অন্য দেব-দেবীর সাধক বা ব্রহ্মবাদী, তারা কি কাউকে কৃষ্ণমন্ত্র দান করতে পারে?

উত্তর ঃ না। মায়াবাদীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য দেব-দেবীকে একই বলে মনে করে। পদ্মপুরাণে তাদেরকে অপরাধী বলা হয়েছে। তারা কাউকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দান করলে তা নিষ্ফলই হয়।

মায়াবাদি মতে থাকে, কৃষ্ণমন্ত্র লয়।
তা'র পরমার্থ লাভ কভু নাহি হয় ॥
(নাম অপরাধ, শ্রীহরিনাম চিন্তামণি)

প্রশ্ন ২৯। তুলসীমালা গলায় না পরলে কি ভক্ত হওয়া যায় না?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ভক্তগণ তুলসীমালা ধারণ করবেন। শ্রীহরির পূজা করলেও মালা ধারণ ব্যতীত তাঁকে ভক্ত বলা যায় না। শ্রীগরুড় পুরাণে বলা হয়েছে,

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥

"যে তার্কিক পাপবুদ্ধি ব্যক্তিরা তুলসীমালা ধারণ করে না, ভগবান শ্রীহরি তাদের প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হন এবং তারা অনন্তকাল নরক ভোগ করে।"

কণ্ঠে তুলসীমালা থাকলে দুঃস্বপ্ন, দুর্ঘটনা ও শস্ত্রভয় থাকে না। যমদূতগণ তুলসীমালা কণ্ঠে ধারণকারী ব্যক্তিকে দর্শন করে দূর থেকে তাঁকে ভক্ত মনে করে পলায়ন করে।

প্রশ্ন ৩০। কখনও কোনও মানুষ ভগবানের স্থানে বসার যোগ্য নন। এটা অনেকেই বলে থাকেন বা মেনে নেন। কিন্তু বাস্তবে কার্যত দেখা যায় যে প্রায় সকল ধর্মীয় ক্ষেত্রেই তাঁরা তাঁদের গুরুদেবের মূর্তি, পোস্টার, পদক

ইত্যাদি তৈরি করে ভগবানের স্থানেই বসিয়ে নিয়মিতভাবে পূজা করেন। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ ভগবানের আসনে মানুষ বসার যোগ্য নয়। কোন ধর্মেও সেভাবে বসেনি। এ কথা সত্য। মন্দিরে যে গুরুদেবের আলেখ্য বা মূর্তি রাখা হয়, তার তাৎপর্যটা আগে জেনে নেওয়া কর্তব্য।

প্রথমত, পূজারী ভগবানের মন্দিরে পূজার্চনা কালে শ্রীগুরুদেবকেই আগে স্মরণ করবেন। কারণ, পূজারী মনে করেন যে, আমি ভগবানের পূজা-সেবার মোটেই যোগ্য নই। তিনি মানসে চিন্তা করেন যে, গুরুদেবই ভগবানের পূজার্চনা আরতি করছেন, আমি কেবল গুরুদেবকে সেই কার্যে একটু সাহায্য করছি মাত্র। তাই সমস্ত নিবেদন যোগ্য দ্রব্যাদি প্রথমেই তিনি শ্রীগুরুদেবের হাতে দেন যাতে গুরুদেবই সেই দ্রব্যাদি নিয়ে ভগবানের সেবা করছেন। এইভাবে গুরুদেবের হয়ে তিনি পূজা-আরতি করছেন। তারপর আরাধ্য বিগ্রহে নিবেদিত হওয়ার পর ভগবদ্ প্রসাদী হিসেবে সেই সমস্ত দ্রব্য গুরুদেবকে পূজারী নিবেদন করেন মাত্র। এই রকম পূজা-পদ্ধতি শাস্ত্রনির্দিষ্ট।

কেউ যেন ভুলক্রমে মনে না করেন যে, পূজারী তাঁর গুরুদেবের মূর্তি বা আলেখ্যটি ভগবানের আসনেই বসিয়ে গুরুদেবকেই ভগবান ভেবে পূজা করছেন। না, সেরকমটি কখনও হচ্ছে না। কখনও আরাধ্য ভগবানের আসনে গুরুদেবের প্রতিমূর্তিও রাখা হয় না। অপেক্ষাকৃত নীচ আসনে কিংবা আলাদা আসনে কিঞ্চিৎ দূরে রাখা হয়। এটা অবশ্যই লক্ষ্যণীয়।

দ্বিতীয়ত, দীক্ষিত শিষ্য ভগবদ্ বিগ্রহ অর্চনাদি কালে গুরুদেবকে স্মরণ না করে কিংবা গুরুদেবের আলেখ্যাদি না রেখে একেবারে সরাসরি ভগবদ্ বিগ্রহের পূজার্চনা কোনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারায় পরিলক্ষিত হয় না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে বলে সে আমার ভক্ত, সে কিন্তু আমার ভক্ত নয়, যে বলে সে আমার ভক্তের ভক্ত, সে-ই আমার ভক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও নিজেকে সরাসরি কৃষ্ণদাস না বলে দাসানুদাসানুদাস রূপে গণ্য করে জীবশিক্ষা দিয়েছিলেন। তাই সরাসরি কৃষ্ণপূজা করতে যাওয়ার আস্পর্ধা থাকা ভাল নয়। গুরুদেব হচ্ছেন কৃষ্ণের প্রিয়জন। আমি গুরুদেবের দাস। এই মনোভাব শিষ্যের পক্ষে ভাল।

তৃতীয়ত, আমি একটা মানুষ, আর গুরুদেবও সেই-ই মানুষ—এই মনোভাব থাকলে ভগবানের পূজার ঘরে আর কখনও না ঢোকাই ভাল। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, ভক্তি ও শ্রীনাম প্রচারকারী ভগবৎ প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবকে মানুষ-বুদ্ধি করলে পাষণ্ডত্ব লাভ হয়। পাষণ্ডী হয়ে গেলে তো আর পূজা অর্চনা করা যায় না।

চতুর্থত, শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের মতোই শ্রদ্ধা করতে হয়। যদিও বা শ্রীগুরুদেব স্বয়ং ভগবান নন। কিন্তু ভগবানের প্রিয়জন বা প্রিয়ভক্ত। তাই পরম গুরুদেব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—

সাক্ষাদ্ হরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ
উক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

সমস্ত শাস্ত্রে এবং সাধুগণ যাঁকে সাক্ষাৎ শ্রীহরিরূপে জ্ঞান করেন, কিন্তু যিনি শ্রীহরির প্রিয়জন সেই গুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

পঞ্চমত, গুরুদেবের প্রথম পরিচয় হচ্ছে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। ভক্তকে যে অবজ্ঞা করবে সে নাস্তিক ও মহাপরাধী। কৃষ্ণভক্ত নয় অথচ গুরুদেব—এই রকম কোন আলেখ্য ভগবানের মন্দিরে রাখা উচিত নয়। বিশেষত সনাতন ধর্মে গুরুপরম্পরা আলেখ্যাদি ছাড়া আর কিছু আলেখ্য না রাখাই ভাল।

ষষ্ঠত, যেখানে ভগবানের অর্চা বিগ্রহাদির পূজা ঠিকমতো হয় না, সেখানে গুরুদেবও সন্তুষ্ট থাকেন না। কারণ, শ্রীগুরুদেব সব সময় চান তাঁর শিষ্য পূজারী যেন ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অর্চনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে। তাই বলা হয়েছে—

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য নানা-
শৃঙ্গার তন্মন্দির-মার্জনাদৌ ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

যিনি ভগবদ্ বিগ্রহের আরাধনা, বেশ রচনা, মন্দির মার্জন প্রভৃতি সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁর অনুগতদেরকেও নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

পরিশেষে, উল্লেখ্য এই যে, প্রশ্নানুসারে ভগবানের সেবা পূজার্চনার প্রাক্কালে নিয়মিতই গুরুবন্দনা কীর্তন কর্তব্য। মন্দিরে অবশ্যই শ্রীগুরুদেবের প্রতিমূর্তি থাকবে। তবে আরাধ্য ভগবদ্ বিগ্রহের আসনে গুরুদেবকে রাখার নিয়ম নেই।

প্রশ্ন ৩১। ক) প্রকৃতির নিয়মে মাসিক অসুস্থতায় মায়েরা কি শ্রীশ্রীরাধামাধবের আলেখ্যে সেবা করতে পারে না? খ) একাসনে রাধামাধব থাকলে দুজনার চরণে কি তুলসী-চন্দন দেওয়া যায় না?

উত্তর ঃ ক) মাসিক অসুস্থতাকে অশৌচ অবস্থা বলা হয়। সেই সময় শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেওয়াই ভাল। এই সময় মায়েরা কাউকে স্পর্শ করা থেকে এড়িয়ে চলবেন। তাতে রাধামাধব মোটেই অখুশি হবেন না।

খ) তুলসী পত্র ও চন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণে অবশ্যই দিবেন। কিন্তু রাধারাণীর চরণে কখনও দিতে নেই। রাধারাণীর চরণে মাত্র পুষ্প-চন্দন দিতে পারেন। সমস্ত ভগবদ্ শক্তিতত্ত্বের চরণে তুলসী দেওয়া নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ৩২। যেখানে অনেক দেব-দেবীর ছবি আছে, সেখানে কি আমরা কেবলমাত্র কৃষ্ণকেই প্রণাম করব, আর কাউকে নয়?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রভু। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভগবান। অন্য সমস্ত দেবদেবী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের সেবক মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে, *শিববিরিঞ্চিনুতম্* অর্থাৎ, শিব ও ব্রহ্মার দ্বারা যিনি আরাধিত হন। ঋক্ বেদে বলা হয়েছে, *কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদিশমুখপ্রভুপূজ্যঃ।* অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মা-শিবাদি ঈশ্বরপ্রমুখ দেবতাগণের আরাধ্য প্রভু। শ্রীব্রহ্মা বলছেন, *গোবিন্দম্ আদিপুরুষম্ তমহং ভজামি।* (ব্রহ্মসংহিতা)— 'আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।' সুতরাং, সমস্ত দেব-দেবীরা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন তাই, তাঁদেরকেও ভক্তজ্ঞানে প্রণাম অবশ্যই জানাতে হবে।

প্রশ্ন ৩৩। গুরুদেবকে তো ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করা কর্তব্য। তাই গোবিন্দ চরণে যেরূপ তুলসীপত্র অর্পণ করা হয় গুরুদেবের চরণে সেরূপ অর্পণ করলে ক্ষতি আছে কি না?

উত্তর ঃ গুরুদেব ভগবানের মতো শ্রদ্ধেয় হলেও তিনি কখনই ভগবান নন। তিনি ভগবানের প্রিয় সেবকমাত্র। তিনি গোবিন্দের ভক্ত। আর তুলসী হচ্ছেন গোবিন্দবল্লভা। গোবিন্দের প্রেয়সী। একমাত্র বিষ্ণুতত্ত্ব ব্যতীত কারও চরণে তুলসীর পত্র অর্পণ করা কখনই উচিত নয়। কারণ তা মহা অপরাধ। শ্রীঅনন্ত সংহিতা শাস্ত্রে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে—

তুলস্যা বিষয়ং তত্ত্বং বিষ্ণুমেব সমর্চয়েৎ ।
সা দেবী কৃষ্ণশক্তিহি শ্রীকৃষ্ণবল্লভা মতা ॥
অতস্তাং বৈষ্ণবীং দেবীং নান্যপদে সমর্পয়েৎ ।
অর্পণে তত্ত্বহানিঃ স্যাৎ সেবাপরাধ এব চ ॥
অতত্ত্বজ্ঞস্তু পাষণ্ডো গুরুব্রুবস্য পাদয়োঃ ।
অর্পয়ন্ তুলসীং দেবীমর্জয়েন্নরকং পদম্ ॥

"তুলসীপত্র দিয়ে শ্রীবিষ্ণু-তত্ত্বের অর্চনা করা কর্তব্য। তুলসীদেবী কৃষ্ণশক্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। তিনি পরম বৈষ্ণবী। অন্য কারও পদে তুলসীপত্রাদি অর্পণ করা উচিত নয়। যদি কেউ অর্পণ করে তবে সে তত্ত্বজ্ঞানহীন হয় এবং তার সেবা-অপরাধ হয়। আর যে তত্ত্বজ্ঞানহীন পাষণ্ড গুরুদেবের চরণে তুলসী অর্পণ করে তার নরকগতিই লাভ হয়।" যে ব্যক্তি চরণে তুলসীপত্র গ্রহণ করে সে কখনই গুরু নয়। সে গুরুব্রুব অর্থাৎ, পরমগুরুরও বিরোধী। ভগবান শ্রীহরি ছাড়া কোনও দেবদেবীকে তুলসীপত্র দিয়ে কখনই অর্চনা করা উচিত নয়। বায়ু পুরাণে মহর্ষি ব্যাসদেব সেই কথা উল্লেখ করেছেন—

তুলসীদল মাত্রায় যোহন্যং দেবং প্রপূজয়েৎ ।
ব্রহ্মহা স হি গোঘ্নশ্চ স এব গুরুতল্পগঃ ॥

"যে ব্যক্তি তুলসীপত্র দ্বারা অন্য দেবদেবীর পূজা করে তার নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা ও গুরুপত্নী গমনের পাপ অর্জিত হয়ে থাকে।"

প্রশ্ন ৩৪। পঞ্চরাত্রবিধি সম্পর্কে বিশদ জানতে চাই?

উত্তর ঃ মহাভারতে বলা হয়েছে সমস্ত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বক্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণ। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে 'দেবর্ষি নারদ সেই পঞ্চরাত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন। যিনি শীঘ্র এই জড়সংসার চক্র উত্তীর্ণ হতে অভিলাষী তিনি এই পঞ্চরাত্রের উক্ত বিধিক্রমে শ্রীহরির আরাধনা করবেন। প্রশ্ন সংহিতা শাস্ত্রে বলা হয়েছে—রাত্র শব্দের অর্থ অজ্ঞান এবং পঞ্চ শব্দের অর্থ নাশক। সুতরাং, পঞ্চরাত্রের অর্থ হচ্ছে অজ্ঞান নাশক শাস্ত্র। আদি পঞ্চরাত্রে দেড় কোটি শ্লোক ছিল।

অন্ধকার রাত্রে প্রদীপ দেখানোর মতো 'পঞ্চরাত্র প্রদীপ" গ্রন্থটি ইসকন বিবিটি প্রকাশিত সহজ সরল ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেইগুলি পাঠ করে পূজা পদ্ধতি সংক্রান্ত কিছু ধারণা জন্মাবে।

প্রশ্ন ৩৫। প্রকৃত সাধু কে?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবানের উক্তি—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ ॥

"ধর্মশাস্ত্রে আমি যা ধর্ম বলে আদেশ করেছি, তার গুণদোষ জেনে সেই সব ধর্ম প্রবৃত্তি ছেড়েও যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট সাধু"। (ভাঃ ১১/১৮/৪৩)

প্রশ্ন ৩৬। রোজ ষোলমালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কি একবারে করতে হয়? দুই বা তিনবারে ষোলমালা পূরণ করলে কি কিছু দোষ হয়?

উত্তর ঃ ভোরবেলা একমনে একবারে ভালভাবে ষোলমালা জপ করতে পারলে অতি উত্তম। প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগবে। যেদিন খুব ব্যস্ততা, জপের সময় অন্য নানাবিধ কর্ম করতেই হয়, সেই ক্ষেত্রে কয়েক মালা জপ শেষ করতে বাকি থেকে গেলে পরক্ষণে সময়মতো শেষ করতে হয়। এতে দোষের কিছু নেই। অনেক সময় 'এখন নয় পরে জপ করব' এই মনোভাব ভাল নয়।

প্রশ্ন ৩৭। শ্রীগোপালের চরণে তুলসীপাতা বা মঞ্জরী কখন দিতে হয়? তুলসীপত্র নিবেদনের পর শেষে সেই পত্র কি রাখতে হয়, না কি ফেলে দিতে হয়?

উত্তর ঃ অর্চা বিগ্রহ শ্রীগোপালের পূজার্চনার সময় ধোয়া তুলসীপত্র বা তুলসী মঞ্জরী তাঁর শ্রীচরণে চন্দনসহ দিতে হয়। রাত্রে শ্রীবিগ্রহ শয়নকালে তুলসীপত্রাদি সরিয়ে বিগ্রহ মুছে দিয়ে শয়ন দিতে হয়। সেই নিবেদিত তুলসীপত্র প্রসাদরূপে ভক্ষণ করতে হয়। ভগবানকে নিবেদিত অনেক ফুল বা তুলসী পবিত্র বস্তু জ্ঞানে যেখানে-সেখানে না ফেলে গঙ্গায় কিংবা পুকুর-জলাশয়ে ফেলে দিতে হয়। অনেকে তুলসীপত্র কৌটায় ভরে রেখে সময় বিশেষে মুখশুদ্ধিরূপে গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ৩৮। আমি যদি শাস্ত্রজ্ঞান না-ও জানি, কিন্তু যদি নিজের মনের মতো করে কৃষ্ণভজন করি, তাতে কোনও ক্ষতি আছে কি?

উত্তর : কৃষ্ণভজন কিভাবে করতে হয় সেই পদ্ধতি বৈদিক শাস্ত্রে নির্ধারিত হয়েছে। আপনার নিজের মনের মতো হলেও যাঁর উদ্দেশ্যে করছেন তাঁর অনুমোদন বা নির্দেশমতোই যে হচ্ছে, কি হচ্ছে না, সেটিতো জানতেই হয়। অন্যথায় সেরূপ 'মনের মতো' করারও কোন মূল্যনেই। যেমন, আপনি আপনার 'মনের মতো করে' খুব যত্নের সঙ্গে আপনার সম্মানীয় অতিথিকে চা-বিস্কুট-সিগারেট খেতে দিলেন। কিন্তু আপনার জানা নেই যে সেই অতিথি কখনও সেগুলি গ্রহণ করেন না। অতিথির পছন্দ নয় এমন জিনিষ জড়ো করাটা আপনার 'মনের মতো' হলেও অতিথির কাছে মোটেই প্রীতিমূলক নয়।

সম্মানীয় অতিথি কিরূপ সেবা গ্রহণ করতে চান সেটি জেনে সেইমতো ব্যবস্থা করলে ঠিক হয়। অনুরূপভাবে কৃষ্ণভজন কিভাবে করতে হয় যাতে কৃষ্ণের প্রীতি সাধিত হবে তা সাধু-গুরু-শাস্ত্র মাধ্যমে জানতে হয়। সেই জন্য বলা হয় *মহাজনো যেন গত স পন্থাঃ*—মহাত্মা ব্যক্তির নির্দেশিত পন্থায় চলতে হবে। নিজের মনগড়া যে কোনও পন্থায় কৃষ্ণভজন করা অনেকক্ষেত্রে ভক্তিজীবনে উৎপাত সৃষ্টি করে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/১০১)

অর্থাৎ, বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থকে উপেক্ষা করে 'মনের মতো' হরিভক্তি সমাজে অনর্থক উৎপাতেরই সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ৩৯। কৃষ্ণভক্ত যদি রোগগ্রস্ত হয় তা হলে তার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ কারও গ্রহণ করা উচিত কি না?

উত্তর : রোগীকে যদি সত্যই কৃষ্ণভক্ত মনে করেন, উচ্ছিষ্ট যদি ভগবানের চিন্ময় অধরামৃত বলে মনে করেন তা হলে গ্রহণ করতে দোষ নেই। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ রয়েছে, "ভগবানের প্রসাদ আহার করতে কোন রূপ খাদ্যাখাদ্য বিচার করা উচিত নয়। কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন বিষয়ে যাঁর বিকার বা ঘৃণা উদয় হয়, তাকে কুষ্ঠ ব্যাধি আক্রমণ করে এবং অবশ্যই নরকে গমন করতে হয়।"

প্রশ্ন ৪০। যে ফুল সদ্য চয়ন হয়নি, আগের দিন বা তার আগের দিন তোলা হয়েছে সেই সব ফুল কি ভগবানকে নিবেদন করা চলে?

উত্তর : জ্ঞানমালা নামক শাস্ত্রের কথা হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বলা হয়েছে—

ন পর্যুষিতদোষোঽস্তি জলজোৎপলচম্পকে ।
তুলস্যগস্ত্যবকুলে বিল্বে গঙ্গাজলে তথা ॥

অর্থাৎ, "পদ্ম, উৎপল, চাঁপা, তুলসী, বকফুল, বকুলফুল, বেল পাতা, ও গঙ্গাজল বাসী হলেও দোষ হয় না।" ভগবানকে নিবেদন করা চলে।

প্রশ্ন ৪১। কোনও ব্যক্তির শরীরের কোনও অংশ হানি ঘটলে অপারেশনের ফলে নাড়ি কেটে গেলে সেই ব্যক্তি সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় কি পেতে পারে না, কৃষ্ণসেবায়—শ্রীবিগ্রহ অর্চন সেবায় অংশগ্রহণ করতে কি পারে না?

উত্তর : অঙ্গহানি যে ভাবেই হোক না কেন, অঙ্গহানি নিয়ে ভক্তি জীবনের সমস্যা নেই। কৃষ্ণভক্তিপ্রদাতা পারমার্থিক গুরুদেবের চরণাশ্রয় করতে হলে অবশ্যই আমিষ, নেশা, জুয়া, অবৈধযৌনতা সম্পূর্ণ এড়িয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার অভ্যাস করতে হবে। এভাবে তার পারমার্থিক পথে—ভক্তিমার্গে আগ্রহ ও সেই মানসিকতা থাকলে সাধু ও কৃষ্ণকৃপায় সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় লাভ করতে পারে। সেই ক্ষেত্রে তার কখন কি কারণে শরীরের ভেতরে নাড়ি কেটে গেছে, চক্ষু নষ্ট হয়েছে, পা ভেঙে গেছে—এই সব বাহ্যিক বিষয় নিয়ে যোগ্যতা বা উপযুক্ততা বিচার হয় না।

মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ অর্চন করতে হলে অবশ্যই সদ্‌গুরুর কাছে পঞ্চরাত্রিকী ব্রাহ্মণদীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, তা হলে মন্দিরে পূজা অর্চনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু অঙ্গহানি রহিত অর্থাৎ, সুস্থ সম্পূর্ণ অঙ্গ সমন্বিত ব্যক্তিও যদি ব্রাহ্মণদীক্ষা গ্রহণ না করে থাকে তা হলে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ অর্চনাদিতে তার অধিকার হয় না।

প্রশ্ন ৪২। জীবনে পরমার্থ সাধনের পথে সব চেয়ে বড় শত্রু আমাদের হৃদয়ে বাসা বাঁধে, সেটি হল মাৎসর্য, যেটা আমাদের ভগবদ্ ভজন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই রকম মাৎসর্য বিষয়ে আলোকপাত করলে উপকৃত হব।

উত্তর : অন্য জনের উন্নতি দেখলে সহ্য করা যায় না, অন্যের উৎকর্ষ দেখলে ভাল লাগে না, অন্যের উদ্বর্তনে আমার মন বিমর্ষ হয়ে যায়, অন্যের সমৃদ্ধি দেখলে হিংসা করতে মন চায়—এই রকমের অতি হীন, সংকীর্ণ বা কদর্য মনোবৃত্তির নামই মাৎসর্য। *পরোৎকর্ষাসহনং মাৎসর্যম্*—পরের উৎকর্ষে অসহ্য মনোবৃত্তিই মাৎসর্য।

কারও চিত্তে মাৎসর্য থাকলে সে ভগবানের ভজনের অধিকারী হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের একেবারে শুরুতেই বলা হয়েছে, *নির্মৎসরাণাং সতাম্* (১/১/২) নির্মৎসর বা মাৎসর্যরহিত ব্যক্তিরাই ভাগবত ধর্মের অধিকারী।

মাৎসর্য পরায়ণ ব্যক্তির স্বভাবটি কিভাবে প্রকাশিত হয় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জনের গুণ থাকলেও সেই গুণেও সে দোষ আরোপ করে। তার সমান ব্যক্তির সঙ্গে স্পর্ধা বা বড়াই করতে থাকে। তার অপেক্ষা কনিষ্ঠ জনের প্রতি সে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করতে থাকে।

তার নির্মৎসর ব্যক্তির স্বভাব তার বিপরীত। নির্মৎসর ব্যক্তি কোনও শ্রেষ্ঠজন দেখলে তার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন, সমান জনের সঙ্গে প্রীতি-মৈত্রীভাব করেন, কনিষ্ঠ জনের প্রতি স্নেহশীল ও কৃপাপরায়ণ হন।

মাৎসর্য পরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে জড় জাগতিক উচ্চ পদমর্যাদার লোভ, প্রতিষ্ঠার আশা বা যশঃ লাভের বাসনা থাকে। যেহেতু সে কারোর ভালো সহ্য করতে পারে না, তাই সে হিংস্র ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়। মাৎসর্য পরায়ণ ব্যক্তি সাধন-ভজনের অনুপযুক্ত।

প্রশ্ন ৪৩। গোলাপ, জবা, অপরাজিতা ফুল গোবিন্দসেবায় লাগে কি না?

উত্তর ঃ সাধারণ গোলাপ ফুল গোবিন্দ সেবায় নিবেদিত হয়। তবে কোন কোন গোলাপের বোঁটায় কাঁটা থাকে, সেই কাঁটা সহ ফুল নিবেদন করতে নেই। সাধারণত গন্ধহীন ফুল ভগবানকে দিতে নেই। কিন্তু ফুলের অভাবে অপরাজিতা, সাদারঙের জবা নিবেদন যোগ্য। লাল জবা অবশ্যই নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ৪৪। পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য কি কি?

উত্তর ঃ দুধ, দই, ঘি, মধু ও চিনি—এই হল পঞ্চামৃত। দুধ, দই, ঘি, গোমূত্র ও গোময়—এই হল পঞ্চগব্য।

প্রশ্ন ৪৫। কৃষ্ণভজন ও কালীভজন এক কিনা?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি দুর্গার একটি উগ্ররূপ হচ্ছেন কালী। দুর্গা এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী। এই জগৎকে বলা হয় দেবীধাম। দেব-দেবী পূজা করে মানুষ জড়-জাগতিক সুখসুবিধা চায়। তারা কখনই বৈকুণ্ঠগতি লাভ করতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণভজন হচ্ছে কৃষ্ণপ্রীতি সেবার্থে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজন। ভজন কথাটি প্রকৃতপক্ষে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনকে বোঝায়। ভগবানের সেবার সঙ্গে ভজ্ ধাতু প্রযোজ্য। অন্য কারও ভজন বোঝায় না। কৃষ্ণলোক হচ্ছে জড় ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে বৈকুণ্ঠের সর্বোচ্চ লোক। কোন কোন লীলাবিলাসে কৃষ্ণও কালীরূপ ধারণ করেন। কিন্তু কোনও দেবদেবী কৃষ্ণরূপ ধারণ করেন না। নকল কৃষ্ণ সাজতে গিয়ে বহুজনা বিপদাপন্ন হয়েছেন। কাশীরাজ পৌণ্ড্রক তার প্রমাণ। ভগবানের সঙ্গে দেবদেবীকে যারা এক বলে মনে করে তাদেরকে শাস্ত্রে 'পাষণ্ডী' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। (হঃ ভঃ বিঃ ১/৭৩)

প্রশ্ন ৪৬। সাধুসঙ্গ বলতে কি বোঝায়? সাধু কাকে বলে? ধর্মগুরুগণ বলেন 'আমি অসাধু আর সবাই সাধু'—এসব কথার অর্থ কি?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ভজতে মাম্ অনন্যভাক্ সাধুরেব স মন্তব্যঃ*—"অনন্যভক্তি সহকারে আমাকে যে ভজনা করে তাকেই সাধু বলে মনে করবে।" কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ ভক্তদের কাছে হরিকথা শ্রবণ, নাম সংকীর্তন, ভক্তের সেবা, ভক্তের দেওয়া নির্দেশ পালন করাকেই সাধুসঙ্গ বলে।

নিজেকে অসাধু এবং অন্যদের সাধু বলে দর্শন করা দীনতার লক্ষণ, ভক্তির এটি একটি বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন ৪৭। কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ। একথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। তা হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিলেন কেন?

উত্তর ঃ কলিতে স্বভাবতই ইন্দ্রিয় তর্পণ পরায়ণ মানুষের সন্ন্যাস নেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করার যে সন্ন্যাস তা অনুমোদিত, কারণ সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করার ফলে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের জন্য সবচাইতে শ্রেষ্ঠ সেবা

করা হয়। তাই দেখা যায়, মা শচীদেবী ও বাবা জগন্নাথ মিশ্র যখন তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের যৌবন দেখে উপযুক্ত কন্যার সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা তুলছিলেন তখন বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে তীর্থপর্যটন করতে লাগলেন। সেই জন্যে মাতাপিতা দুঃখিত হলে মহাপ্রভু মাতা-পিতাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন—

"ভাল হৈল,—বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল, মাতৃকুল,—দুই উদ্ধারিল" ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৫/১৪)

যাঁরা কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিয়ে জগৎ উদ্ধারের মহা দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরা নিজেরা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ সন্ন্যাসী হন। সেটিই বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই শিক্ষা দান করেছেন।

প্রশ্ন ৪৮। হরিনাম করতে করতে নাচতে হবে কেন?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন—

নাচ, গাহ, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলছেন, "মানুষ সাধারণত কীর্তন ও নৃত্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। গোস্বামীদের মহিমা বর্ণনা করে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য বলেছেন, কৃষ্ণোৎকীর্তন-গান-নর্তন-পরৌ—কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদগণই নৃত্য কীর্তন করেননি, পরবর্তী কালে ষড় গোস্বামীরাও সেই পন্থার অনুসরণ করেছেন। আমাদের বুঝতে হবে যে, এই নৃত্যকীর্তন জড় জগতের বস্তু নয়। তা হচ্ছে চিন্ময় ক্রিয়া। যিনি যতই এই নৃত্য কীর্তনে যোগদান করবেন তিনি ততই ভগবৎ প্রেমামৃত আস্বাদন করবেন।" (চৈঃ চঃ আদি ৭/২২ তাৎপর্য)

প্রশ্ন ৪৯। কীর্তনে নৃত্য মাহাত্ম্য কি?

উত্তর ঃ শ্রীশ্রীহরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে—

বহুধোৎসার্যতে হর্ষাৎ বিষ্ণুভক্তস্য নৃত্যতঃ।
পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশোঽক্ষিভ্যাং দোর্ভ্যাং বামঙ্গলং দিবঃ ॥

"ভগবদ্ভক্ত যখন উৎফুল্ল হয়ে নৃত্য করেন তখন তাঁর চরণ দ্বারা ধরণীর অমঙ্গল নষ্ট হয়, নেত্রদ্বারা দিক্‌মণ্ডলের অমঙ্গল দূর হয়, ঊর্ধ্ববাহুর দ্বারা দেবলোকের অমঙ্গল নষ্ট হয়।" (হঃ ভঃ বিঃ ৮/১২৮)

আবার, শ্রীদ্বারকা মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈর্বহুসুভক্তিতঃ।
স নির্দহতি পাপানি জন্মান্তরশতেষ্বপি ॥

"যিনি প্রফুল্ল মনে পরম ভক্তি সহকারে সযত্নে সমধিক নৃত্য করেন, তাঁর শত শত জন্মের পাতক ভস্মীভূত হয়।"

প্রশ্ন ৫০। প্রণামের বিধি নিয়ম কিরূপ এবং তা কোন্ শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে?

উত্তর ঃ দুই ধরনের প্রণাম করার বিধি রয়েছে ঃ সাষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। বাহুযুগল, চরণযুগল, জানুযুগল, বক্ষ, শিরোদেশ, দৃষ্টি, মন ও বুদ্ধি—এই অষ্ট অঙ্গ সমন্বিত দণ্ডবৎ প্রণামকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলা হয়। জানুযুগল, বাহুযুগল, শিরোদেশ, বচন ও বুদ্ধি এই পঞ্চ অঙ্গ সমন্বিত হাঁটু গেড়ে ভূমিতে মাথা লগ্ন করে প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রণামের ভাবধারা এইরকম থাকে যে, ভগবানের পাদপদ্মযুগলে মাথা রেখে, ডান হাতে ভগবানের ডান চরণ ও বামহাতে ভগবানের বামচরণ ধারণ করে প্রার্থনা করতে হবে "হে প্রভু। মৃত্যুরূপ সাগর থেকে ভীত ও শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন।" *প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ।* (ভাগবত ১১/২৭/৪৬)

তৃতীয়তঃ, ভগবদ্ বিগ্রহের সম্মুখে, পেছনে, বিগ্রহের বামদিকে, খুব কাছে, গর্ভমন্দিরে প্রণতি নিবেদন করা উচিত নয়।

অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে সমীপে গর্ভমন্দিরে।
জপ হোম নমস্কারান্ন কুর্যাৎ কেশবালয়ে ॥

জপ বা হোম করতে করতে প্রণাম করা উচিত নয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের দক্ষিণপার্শ্বে, কিঞ্চিৎ দূরে প্রণাম করতে হবে।

মৎপাদয়োর্দক্ষিণপার্শ্বে কিঞ্চিদ্দূরে শিরঃকৃত্বা বন্দেত। (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী)

চতুর্থতঃ, প্রণাম নিবেদন কালে শ্রীভগবানের সম্মুখ দিকে অবস্থিত গরুড়দেবকে প্রণামকারীর দক্ষিণদিকে রেখে বামদিকে প্রণাম করতে হয়। ভগবানের অতি কাছে প্রণাম করতে নেই।

গরুড়ং ভগবদ্ অভিমুখে বর্তমানং দক্ষিণে
কৃত্বেতি ভগবত পুরোভাগে পৃষ্ঠদেশে
বামেঽত্যন্তনিকটে চ প্রণাম নিষেধাৎ ॥ (আগম শাস্ত্র)

পঞ্চমতঃ, কমপক্ষে তিনবার প্রণাম কর্তব্য। বেশী করলে ক্ষতি নেই। এই সমস্ত প্রণামবিধি গৌরপার্ষদ শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী রচিত 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থে অষ্টম বিলাসে ১৬১-১৬৩ শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে।

প্রশ্ন ৫১। চুপি চুপি গিয়ে কোনও বৈষ্ণবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করা উচিত কিনা?

উত্তর ঃ কাউকে বিব্রত করা কিংবা কারও অসন্তুষ্টির কারণ হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন ৫২। আমাদের হরিভক্তি হচ্ছে কিনা তা কি করে বুঝব?

উত্তর ঃ খাদ্যগ্রহণ করলে যেমন পেট ভরছে কিনা তা বোঝা যায় তেমনই হৃদয়ে ভক্তি হচ্ছে কিনা বোঝা যাবে। খাদ্য গ্রহণ কালে তিনটি বিষয় ঘটে থাকে—(১) তুষ্টি, (২) পুষ্টি ও (৩) ক্ষুন্নিবৃত্তি—অর্থাৎ মনে শান্তি হয়, শরীর পুষ্টিলাভ করে ও ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। তেমনই শাস্ত্রে বলা হয়েছে হরিভক্তি পন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তির তিনটি বিষয় একই সঙ্গে হয়ে থাকে—(১) শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি, (২) নিজ স্বরূপ, ভগবৎ স্বরূপ, মায়ার স্বরূপ এবং তাদের পরস্পর সম্বন্ধ উপলব্ধি, এবং (৩) পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি অনাসক্তি। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/২/৪২)

প্রশ্ন ৫৩। ভক্তিপথে বিধিমার্গ আর রাগমার্গ কি?

উত্তর ঃ কিভাবে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে হয় সেই শিক্ষা গ্রহণ করে কৃষ্ণভক্তি অভ্যাস করাকে বিধিমার্গ বলে। কিন্তু যখন সেই অনুশীলন করতে করতে কোনও ব্যক্তির ভগবানের জন্য তীব্র প্রেম-অনুরাগ জাগে তখন স্বাভাবিকভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত কৃষ্ণানুরাগবশে কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করাকে রাগমার্গ বলে।

প্রশ্ন ৫৪। উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত ও কনিষ্ঠ ভক্তের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৪৫-৪৭) বর্ণিত আছে—

যিনি আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল প্রভৃতি পদার্থসমূহকে শ্রীহরির শরীর জ্ঞানে প্রণাম করেন। চেতন-অচেতন সর্বভূতে আত্মাভীষ্ট ভগবদ্ভাব অবলোকন করেন, আত্মমধ্যে ভগবান এবং ভগবানে সর্বভূতকে দর্শন করেন তিনি উত্তম ভাগবত।

যিনি পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, ভক্তদের প্রতি মৈত্রী বন্ধুভাবাপন্ন, অনভিজ্ঞ উদাসীনদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, বিদ্বেষীদের প্রতি উপেক্ষা ভাব রাখেন, কিন্তু উত্তম ভক্তদের মতো সর্বত্র যাঁর প্রেমের স্ফূর্তি হয় না, তিনিই মধ্যম ভক্ত।

যিনি অর্চাবিগ্রহের যত্নসহকারে পূজা করে থাকেন কিন্তু ভক্তকে শ্রদ্ধা করেন না, তিনিই কনিষ্ঠ ভক্ত।

প্রশ্ন ৫৫। নির্মাল্য কাকে বলে?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত প্রসাদী তুলসী, মালা, চন্দন, ফুল ইত্যাদিকে নির্মাল্য বলা হয়।

প্রশ্ন ৫৬। কিভাবে এবং কতটুকু ভজন করলে কর্মফল নিবারিত হয়?

উত্তর ঃ ভক্তের বিচার এটি নয় যে, কোনও এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ভজন করলে কর্মফল থেকে মুক্তিলাভ হবে। পূর্ব কর্মফল স্বরূপ সুখ কিংবা দুঃখ পেয়ে ভক্ত নিজেকে সুখী বা দুঃখী মনে করেন না। তিনি জানেন, তিনি নিত্যকালের জন্য কৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পিত। তাঁর উদ্দেশ্য কৃষ্ণপ্রীতি। তিনি নিত্যকালই কৃষ্ণসেবা করে চলেন।

প্রশ্ন ৫৭। ভজন করতে বাধা বিঘ্ন বিপত্তি কিভাবে নিবারিত হবে?

উত্তর ঃ ভজনশীল ব্যক্তির কাছে বাধাবিঘ্ন বা বিপত্তি একটি পরীক্ষার মতো। তাতে তার পরীক্ষা হয় যে সে ভগবানের প্রতি কিরকম নিষ্ঠাপরায়ণ।

কোনও প্রকার বাধাবিঘ্ন থাকবে না এমন নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে ভজন করব—এরকম আশা করাও উচিত নয়।

যদি কেউ নির্ঝঞ্ঝাট এবং বিপত্তিশূন্য অবস্থানের আশা করেন তবে তাঁকে ঐকান্তিকভাবে ভজন অনুশীলন করতে হবে। এই জগতের কারও জন্য বা কোনও

কিছুর জন্য চিন্তা করা যাবে না। এই ধরনের ভজনানন্দী ভক্ত কেবল নিজের জন্য চিন্তা করেন—শীঘ্রই তাঁকে বৈকুণ্ঠ জগতে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু, গোষ্ঠ্যানন্দী ভক্তগণ আমাদের মতো অধম পতিত বদ্ধ জীবেদের উদ্ধারের জন্য চিন্তা করতে থাকেন, তাই এই জড় জগতের নানা বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তাঁরা কৃষ্ণভক্তি প্রচার করে চলেন।

প্রশ্ন ৫৮। আমাদের সমাজে বলা হয় দীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত দেহশুদ্ধ হয় না। কৃষ্ণভাবনামৃত নিয়ে থাকলে কি দীক্ষার আর প্রয়োজন থাকে? দীক্ষা কিভাবে কার কাছ থেকে নিতে হয়?

উত্তর ঃ দীক্ষা নিলে দেহ শুদ্ধ হয়—এ কথা সত্য, কিন্তু দীক্ষিতজন বিধি-নিষেধগুলি যদি পালন করে না চলে তবে দেহ শুদ্ধ হয় না এবং মন কলুষিতই থাকে। কলিযুগে ভাগবতনির্দিষ্ট চারটি পাপকর্ম—আমিষ আহার, নেশাভাঙ, অবৈধ যৌনতা ও জুয়াখেলা—এগুলি নিষিদ্ধ। আমিষ নেশাদি গ্রহণ করলে দেহ শুদ্ধি বা মনশুদ্ধি হয় না। তাই যাঁরা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করেন তাঁরা এগুলি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলেন। দীক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব রয়েছে। দীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষ্ণের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। হঠাৎ কাউকে দীক্ষা দেওয়া হয় না।

ইসকন মন্দির কিংবা কাছাকাছি কোনও নামহট্ট সংঘের ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। কি করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হয়, কি করে নিয়মপালন করতে হয়, কিভাবে গৃহপরিবারে কৃষ্ণভাবনাময় থাকতে হয়—সেগুলি ভক্তদের কাছে শিখে নিতে হয়।

এভাবে কমপক্ষে ছয়মাস অনুশীলন পর্বে থাকতে হয়। তারপর আপনার দীক্ষা নেওয়ার আগ্রহ দেখে ইসকন মন্দির কিংবা নামহট্টের কোনও ভক্ত আপনাকে দীক্ষার উপযোগী কয়েকটি লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষা করাবেন। সেটি সহজ। তারপর তিনি আপনাকে দীক্ষার উপযুক্ত বলে সমর্থন করবেন এবং দীক্ষাগুরুর সন্নিধানে আনবেন। অবশ্য বহুজন গুরুদেব রয়েছেন, তাঁরা সকলেই একই পরমগুরুদেবের প্রিয়জন। ব্যক্তিগতভাবে গুরু মনোনয়ন করতে হয়। তারপর গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করা হয়। তারপর দীক্ষা অনুষ্ঠানে বসবার জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ৫৯। অষ্টাদশাক্ষরী মহামন্ত্র কি?

উত্তর ঃ ছয় নম্বরে কৃষ্ণগায়ত্রী মন্ত্রই অষ্টদশাক্ষরী মহামন্ত্র।

প্রশ্ন ৬০। গঙ্গার জল পবিত্র কেন?

উত্তর ঃ ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কারণ-সমুদ্রের জল ভগবানের পাদধৌত হয়ে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে গঙ্গা রূপে প্রবাহিত। তাই গঙ্গার জল পবিত্র।

প্রশ্ন ৬১। হরিনাম জপ করতে করতে মন একাগ্রতা প্রাপ্ত হলে সেখান থেকে মনকে তুলে নিয়ে অন্য কাজ না করতে পারলে কি বিপদ হবে না?

উত্তর ঃ সাধারণ ভক্তের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে জপের সময় জপ করা এবং অন্য কাজের সময় অন্য কাজ করা। বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরী অবস্থায় জপ আগে-পিছে হতে পারে।

প্রশ্ন ৬২। 'শ্রদ্ধা' কাকে বলে?

উত্তর ঃ পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতির বলে সাধুদের মুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করার পর শ্রীহরি বিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, তাকেই শ্রদ্ধা বলে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

'শ্রদ্ধা' শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়॥

(চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২/৬২)

কৃষ্ণভক্তি সম্পাদিত হলে অন্য সমস্ত কর্ম আপনা থেকে করা হয়ে যায়, এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় শ্রদ্ধা।

এই জড় জগতের সমস্ত কর্তব্য সম্পাদিত হয়ে যায় যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হয়। কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ হলে পৃথকভাবে অন্য পুণ্যকর্ম করতে হয় না। তখন জীব সেবা, পিতৃপুরুষদের সেবা, দেব-দেবীদের সেবা, ইত্যাদি কর্তব্য কর্মের আবশ্যক হয় না। কারণ সবার ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেরকম সুনিশ্চিতাত্মক বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা জন্মায় বহু জন্মের লব্ধ সুকৃতির ফলে। কৃষ্ণ সবাইকে পালন করেন, দর্শন করেন। আমি সুকৃতিহীন জন চিন্তা করছি আমি পালন না করলে, আমি না দেখলে কেউ বাঁচবে না। কৃষ্ণ সবাইকে পালন করছেন সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস নেই। জীবনীশক্তিটির উৎস তিনি, জগতে হর্তাকর্তাবিধাতা তিনি—সেই শ্রদ্ধা নেই। আর এই জনাই আমি অজ্ঞান। শাস্ত্রে বলে—*শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্*—শ্রদ্ধাবান হলে জ্ঞান লাভ হয়। কৃষ্ণভক্তির জগতে প্রথমেই দরকার শ্রদ্ধা। *আদৌ শ্রদ্ধা।*

পরম বাস্তব বস্তু নিত্য সত্য পরমার্থ শ্রীকৃষ্ণে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস নেই বলে লোকে ভক্ত হয় না। পূর্ব-পূর্ব জীবনের সুকৃতি না থাকলে সেই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাও জন্মাবে না। আবার শ্রদ্ধার তারতম্য অনুসারে ভক্তির তারতম্য—উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ইত্যাদি স্তরে ভক্ত অবস্থান করে।

প্রশ্ন ৬৩। সাধুসঙ্গে হরিনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোনও বস্তু নাই॥
—এই কথার ব্যাখ্যা কি?

উত্তর ঃ শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে থাকলে আমাদের মনের কালিমা মুছে যায়। আচার্যগণ বলেন যে, একা একা হরিনাম করলে নানা রকমের অশুভ চিন্তাও থাকে যদি সাবধানে মন দিয়ে হরিনাম না করা হয়। শুদ্ধভক্তদের সঙ্গে থাকলে, হরিভজন—হরিসেবা করলে হৃদয় শুদ্ধ হয়। ভক্তসঙ্গে থাকতে থাকতে অনেক লোকের স্ত্রী-সঙ্গ রুচি, অর্থ পিপাসা,

ভোগ বাসনা, মুক্তি বাসনা, কর্মের প্রতি আদর, জ্ঞানের প্রতি আদর, মাছ-মাংস ভক্ষণের লালসা, মদ-তামাক-বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস, ইত্যাদি অনর্থ দূর হয়ে যায়। আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা জল্পনা প্রভৃতি অনর্থও অনায়াসে দূর হয়ে যায়। আমাদের পূর্ব সংস্কার ও আসক্তি সাধুসঙ্গের ফলে বিদূরিত হয়। এভাবে কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ হয়ে হরি স্মরণ করতে করতে উৎকণ্ঠাপূর্ণ জগৎ সংসার অতিক্রম করে নিত্য বৈকুণ্ঠ জগতে লোকে উন্নীত হয়।

প্রশ্ন ৬৪। জপ করার সময় বিভিন্ন চিন্তা আসে কেন এবং প্রতিকার কি?

উত্তর ঃ প্রথমে গুরুপ্রণাম মন্ত্র তারপর পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র অর্থাৎ, "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥" এই মন্ত্র বলে সপার্ষদ গৌরহরির পাদপদ্মে প্রণতি জানিয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে চলতে হয়। তুলসীদেবী বা গঙ্গা কিংবা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সোজা হয়ে আসন করে বসে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে জপ করলে হাবিজাবি চিন্তা আসে না।

প্রশ্ন ৬৫। মালাতে হরিনাম জপকালে তর্জনী আঙ্গুলটি জপথলির বাইরে রাখা হয় কেন?

উত্তর ঃ জড় জগতের ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদিকে তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে আমরা নির্দেশ করে থাকি। কিন্তু হরিনাম, তুলসীমালা—এসব চিন্ময় বস্তু।

প্রশ্ন ৬৬। আমরা ভক্তিজীবনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলি কেন?

উত্তর ঃ ভক্তি সাধকের ছয়টি গুণ বাঞ্ছনীয়, ছয়টি দোষ বর্জনীয়। উৎসাহ হচ্ছে প্রথম গুণ। ছয়টি দোষই ভক্তিজীবনে উৎসাহ নষ্ট করে দেয়।

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

অত্যাহার—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু গ্রহণ, প্রয়াস—বেশি জ্ঞান ও কর্মে আসক্তি, প্রজল্প—জড় জাগতিক কথাবার্তা, নিয়মাগ্রহ—বেশি নিয়ম বা অনিয়ম, জনসঙ্গ—নানা জনের সঙ্গ, লৌল্য—জাগতিক ভোগবাসনা থাকলে স্বভাবতই ভক্তি নষ্ট হয়, কৃষ্ণের প্রতি মতি হারিয়ে যায়। ভক্তি জীবনে উৎসাহ হারিয়ে যায়।

ভজনে শ্রদ্ধা থাকবে। উৎসাহ হচ্ছে শ্রদ্ধার জীবন। আলস্য, জড়তা, উদাসীনভাব থাকলে ভক্তিফল লাভ হয় না।

যেমন, আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। কিন্তু ভগবানের সেবা করতে আমার উৎসাহ নেই, প্রীতি নেই। হরিনাম করা ভাল—এটা স্বীকার করি কিন্তু আমি হরিনাম করি না, কেননা আমার উৎসাহ নেই। —এই ধরনের মনোভাবের কারণ হচ্ছে ভক্তিবিঘ্নকর দোষগুলিকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া। ময়লাময় জীবন থেকে মুক্ত হতে হলে অবশ্যই উৎসাহ নিয়ে ময়লা দূর করে শুচিশুদ্ধ হয়ে নিত্যানন্দময় জীবনে উপনীত হতে হবে। অন্যথায় ময়লার মধ্যে জীবন কাটবে।

প্রশ্ন ৬৭। যারা কৃষ্ণপূজা করতে অক্ষম তারা কি সদ্‌গতি পায় না?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিয়েছেন তাঁকে একটু জল, একটি ফুল, পাতা ভক্তি সহকারে নিবেদন করতে। যে কেউই সেটা পারে। যাঁরা ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁরা সাড়ম্বরে বিবিধ উপচারে বিচিত্র ভোগ সম্ভারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করবেন। অন্যথায় বিত্তশাঠ্য দোষ হয়।

ভগবানের পূজা করা সবারই কর্তব্য। তাতে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ হয়। যে ব্যক্তি পূজা করতে অসমর্থ, সে পূজার দ্রব্যাদি ভগবানের পূজার উদ্দেশ্যে এনে দিতে পারে।

যে ব্যক্তি পূজার দ্রব্য আনতেও অক্ষম, সে ভগবানের পূজা কেবল দর্শন করতে পারে। অগস্ত্য সংহিতা শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কৃষ্ণপূজা দর্শন করেই দুঃখময় সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণপূজা দর্শন পর্যন্তও করতে অক্ষম, সে কৃষ্ণনাম জপ করতে পারে।

যে ব্যক্তি কৃষ্ণ নাম জপ উচ্চারণ করতেও অক্ষম, সে কৃষ্ণনাম স্মরণ করতে পারে। এগুলির সবটাতেই যে অক্ষম, তার সদ্‌গতি নেই।

প্রশ্ন ৬৮। কি উপায়ে কৃষ্ণে ভক্তি হয়?

উত্তর ঃ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, অনুক্ষণ যাঁরা কৃষ্ণকথা কীর্তন করেন, সেইরূপ নিষ্কপট ভগবদ্ভজন পরায়ণের কাছে সেবাবুদ্ধির সঙ্গে মনোযোগ সহকারে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করলেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উদিত হয়।

প্রশ্ন ৬৯। অনেক মুক্তিকামী ব্যক্তি চারধাম দর্শনের আশা করেন। চার ধাম কি কি?

উত্তর ঃ ভারতের চারপ্রান্তে প্রাচীন চারটি তীর্থস্থান বিরাজ করছে। যেমন,

(১) হিমালয়ের নর-নারায়ণ পর্বতের পাদদেশে বদ্রীনাথ ধাম। এখানে নারায়ণের মন্দির রয়েছে।

(২) গুজরাটে সাগর সৈকতে দ্বারকাধাম। এখানে কৃষ্ণমন্দির রয়েছে।

(৩) উড়িষ্যায় বঙ্গোপসাগর তীরে পুরীধাম। এখানে প্রাচীন জগন্নাথ মন্দির রয়েছে।

(৪) ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে রামেশ্বর ধাম। এখানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ রয়েছে।

প্রশ্ন ৭০। শিরীষ ফুল ভগবানের সেবায় লাগে কিনা?

উত্তর ঃ না। শিরীষ ফুল ভগবানকে নিবেদন করা উচিত নয়। বিষ্ণুধর্মোত্তর শাস্ত্রে ভগবৎ সেবায় যে ফুলগুলি অর্পণ করতে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলি হল, শ্বেত বা রক্তকরবী, ধুতুরা, আকন্দ, ঝিণ্টী, গিরিকর্ণ, কণ্টকারি, কুড়চি, শিমূল ও শিরীষ। এই ফুলগুলি ভগবানকে নিবেদন করলে মহাভয় উৎপন্ন হয় এবং ধনহীনতা ঘটে।

প্রশ্ন ৭১। আমি ভগবানকে মানি। কিন্তু দীক্ষা বা গুরুগ্রহণ করতে হবে কেন?

উত্তর ঃ ভগবানকে ভক্তি করা উচিত—এটা আপনি মানেন, কিন্তু ভগবদ্ প্রতিনিধি গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করতে চান না। এই ব্যাপারটি ঠিক এরকম যে, পড়াশোনা করা ভালো—এটা আমি মানি, কিন্তু কোনও শিক্ষকের আশ্রয় নেবো না। সবাই জানে যে, যারা পড়াশোনা করছে তাদেরই শিক্ষক আছেন। যারাই ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করছে তাদেরই পারমার্থিক গুরুদেব রয়েছেন। এই সংসারটি সাগরের মতো। এই জীবনটি নৌকার মতো, পারমার্থিক গুরুদেব হচ্ছেন সেই নৌকার মাঝির মতো। মাঝিবিহীন নৌকা যদি সাগরের বুকে ভাসে তা হলে সেই অবস্থাটি বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রশ্ন ৭২। ভগবানকে প্রণাম নিবেদনের সময় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কি রকম?

উত্তর ঃ অষ্ট অঙ্গদ্বারা প্রণাম নিবেদন করাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে। যেমন, (১) দুই বাহু, (২) দুই চরণ, (৩) দুই জানু, (৪) বক্ষ; (৫) মস্তক, (৬) দৃষ্টি, (৭) মন ও (৮) বচন। এই অষ্ট অঙ্গ দ্বারা প্রণতি নিবেদন করা পুরুষদের বিধেয়। বাহু, চরণ, জানু, বক্ষ, শির মাটিতে স্পর্শ করবে এভাবে সোজাভাবে থাকতে হবে। চক্ষু ঈষৎ নিমীলিত থাকবে। প্রভুর চরণতলে মাথা রাখলাম এরূপ মনে মনে চিন্তা করতে হবে। আর বচন হচ্ছে, প্রণাম মন্ত্র বলতে হবে, অথবা 'হে প্রভু আমাকে কৃপা করে আপনার সেবায় যুক্ত রাখো' ইত্যাদি।

মহিলাদের ক্ষেত্রে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করাই বিধি। (১) দুই জানু, (২) দুই বাহু, (৩) মস্তক, (৪) মন ও (৫) বচন—এই পাঁচ অঙ্গ দ্বারা প্রণাম।

অত্যন্ত ভীড়, ঠেলাঠেলি কিংবা চলন্ত গাড়ীর মধ্যে থেকে কোন মতে হাত জোড় করে মাথায় বৃদ্ধাঙ্গুল স্পর্শ করে প্রণাম নিবেদন করলেও মন্দিরে এসে অবশ্যই ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করাই কর্তব্য।

দাঁড়িয়ে থেকে শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি আঙ্গুল কপালে ছুঁয়ে প্রণতি নিবেদনের আধুনিক রীতি ভালো নয়।

প্রশ্ন ৭৩। আপনারা ভাগবত পাঠ করেন মাইক্রোফোনের মাধ্যমে, যাতে উপস্থিত শ্রোতারা শুনতে পান। কিন্তু ষাট হাজার মুনিঋষিরা সমবেত হয়ে নৈমিষারণ্যে ভাগবত কথা শ্রবণ করেছিলেন সূত গোস্বামীর কাছে, সেখানে কি মাইক্রোফোন ছিল?

উত্তর ঃ সেইক্ষেত্রে মাইক্রোফোনের কথা সঠিক উল্লেখ না থাকলেও মুনিঋষিদের শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল তা জানা যায়। তাঁরা ব্রহ্মচর্য ও নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন। সূত গোস্বামীর কণ্ঠস্বরও সুস্পষ্ট ও মধুর ছিল। যার ফলে ভাগবত কথা আলোচনাতে অসুবিধা ছিল না।

প্রশ্ন ৭৪। ঘনতরলা কি জিনিস?

উত্তর ঃ ভজনশীল লোকের ভজন ক্রিয়ার মধ্যে নানারকম মানসিক লক্ষণ দেখা যায়। তার মধ্যে ঘনতরলা একটি। জাগতিক দৃষ্টান্ত এই রকম যে, কোনও বালক

পড়াশুনা করছে। বইতে যে-বিষয়টি পড়ে সে বুঝে উঠতে পারছে, অমনি তার মনের মধ্যে একটা আনন্দ হয়। তখন সে আনন্দেই পড়াশুনা করতে থাকে। কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের যে-বিষয় পড়ে সে বুঝে উঠতে পারছে না, তার কাছে দুর্বোধ্য হওয়ার ফলে সে আনন্দ পায় না, ফলে সেই বিষয়টিতে তার আকর্ষণ থাকে না। তখন পড়াশুনাতে শিথিল মনোভাব আসে।

তেমনই ভক্তকে দেখা যায় হরিকথা শ্রবণ, হরিনাম কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন ইত্যাদিতে তার আগ্রহ রয়েছে, তারপর দেখা যায় কোনও কোনও ভক্তি-অঙ্গে তার আগ্রহ ঠিক নেই, শিথিলতা এসেছে। কখনও আগ্রহ, যত্ন বা ঘনভক্তি, আবার কখনও অনাগ্রহ, শিথিলতা বা তরলাভক্তি। এইভাবে ভজনের অবস্থাটিকে বলে ঘনতরলা।

প্রশ্ন ৭৫। প্রতি যুগের জন্য পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণ পৃথক তারকব্রহ্ম নাম দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও গুরু গ্রহণ করার আবশ্যকতা কী?

উত্তর ঃ তারকব্রহ্ম নামটি গুরুদেবের মাধ্যমে গ্রহণ করার পন্থাটিও পরমপিতা শ্রীকৃষ্ণ নির্ধারিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন সমস্ত পারমার্থিক শিক্ষাটি এই জগতে প্রবাহিত হয়েছে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে। আদিগুরু কৃষ্ণ থেকে শুরু করে ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব, মধ্বাচার্য, পদ্মনাভ, নৃহরি, মাধব, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু প্রমুখ ভগবদ্ প্রতিনিধি গুরুশিষ্য পরম্পরা হয়ে পারমার্থিক শক্তিটি আসছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি গুরুদেবই ভব-সংসার-সমুদ্রে ভাসমান আমাদের জীবন-তরীর কাণ্ডারী। নৌকায় বসে থাকলাম পার হবার আশায়। মাঝি নেই। তা হলে পার হওয়া দুঃসাধ্য কিংবা অসম্ভব।

প্রশ্ন ৭৬। পরম পিতা কৃষ্ণই আমাদের চালনা করবেন। আমরা কৃষ্ণের শরণাগত হব। তা নয় কি?

উত্তর ঃ এই জড়জগতে সরাসরিভাবে কৃষ্ণ আমাদের পরিচালনা করেন না। মায়াশক্তি আমাদের পরিচালিত করেন। মায়াবদ্ধ জীব কিভাবে কৃষ্ণের শরণাগত হবে, সেই বিষয়ে কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তকে গুরুরূপে গ্রহণ করতে হয় যাতে আমরাও কৃষ্ণের ভক্ত হতে পারি।

বিদ্যামন্দিরের পাঠ্যসূচী নির্ধারিত আছে। পাঠ্য পুস্তকও সংগ্রহ করা হল। কিন্তু পাঠ্য বিষয় উপলব্ধির জন্য শিক্ষক বা গুরুদেবের আবশ্যকতা আছে। এমনকি নিজে নিজে পড়ে বুঝতে পারলেও উত্তীর্ণ হবার জন্য কোনও শিক্ষা-প্রতিনিধি বা ভগবানের শুদ্ধভক্তের অনুমোদন আবশ্যক আছে।

প্রশ্ন ৭৭। মঠ-মন্দির ছাড়া গ্রাম-গঞ্জে যে সব তথাকথিত গৃহস্থ বৈষ্ণব আছে যারা শাস্ত্র-জ্ঞানহীন হওয়া সত্ত্বেও অপবাদ অপব্যাখ্যা ও প্রতারণায় পটু, সে ক্ষেত্রে সৎগুরু কোথায় পাব? জীবনের শেষ কটা দিন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকি। মঠ-মন্দিরে সৎগুরুর সঙ্গ করার মতো সঙ্গতি নেই। আর উপায় কী?

উত্তর ঃ এমত অবস্থায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকুন। মহামন্ত্রই আপনাকে যথার্থ সদ্‌গুরুর কাছে টেনে নিয়ে যাবেন।

প্রশ্ন ৭৮। কৃষ্ণকে দর্শন করা যায় না কেন?

উত্তর ঃ বিগ্রহরূপে কৃষ্ণ আমাদের চর্ম চক্ষুতে দর্শন দিচ্ছেন। সেইরূপ দর্শন করেই ভক্তি নিবেদন কর্তব্য। বিগ্রহকে পুতুল জ্ঞান করলে কোনও দিনও দর্শন হবে না।

প্রশ্ন ৭৯। 'তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস'। পঞ্চগ্রাস কি?

উত্তর ঃ ভোজনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক হাতের কোষ ভরে জল গ্রহণ করেন, তারপর শরীরে পঞ্চপ্রাণের (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) নামে অন্ন প্রদান করেন। এভাবে অন্ন গ্রহণ করাকে পঞ্চগ্রাস বলা হয়।

বিষ্ণুপুরাণে (৩/১১/৮৬) সদাচার প্রসঙ্গে ঔর্বমুনি বলেন—

অনিন্দ্যং ভক্ষয়েদিত্থং বাগ্যতোঽন্নমকুৎসয়ন্ ।
পঞ্চগ্রাসান্মহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় চ ॥

"ভগবানের প্রসাদ অন্ন আহার করবে। শরীরে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর তৃপ্তির নিমিত্ত আহার সময়ে বাক্‌সংযত থাকবে এবং ভোজ্য অন্নের নিন্দা করবে না। ভোজন আরম্ভ সময়ে চিৎকার বা গল্প না করে, মৌন হয়ে পঞ্চ গ্রাস ভক্ষণ করবে"।

অন্ন গ্রহণ করলে যেমন শরীরের ক্ষুধা নিবৃত্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হয়, তেমনই আমাদের জীবনে ভবরোগ নিবৃত্তি, আত্মসন্তোষ ও পরমানন্দ লাভ হবে যদি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের পাদপদ্মরজ গ্রহণ করতে পারি।

প্রশ্ন ৮০। একটি অখণ্ড তুলসীপত্র ভগবানের চরণে অর্পণ করলে কিভাবে চরণে রাখতে হবে?

উত্তর ঃ হরিভক্তিবিলাসে বলা হয়েছে,

পুষ্পং বা যদি বা পত্রং ফলং নেষ্টমধোমুখং ।
দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণং ॥

"অধোমুখ পত্র, ফুল কিংবা ফল গোবিন্দের অপ্রীতিকর। বলা হয় যে, অধোমুখ করে অর্পিত হলে সেগুলি দুঃখ প্রদান করে। সুতরাং, বৃক্ষে যেভাবে সেগুলি জন্মায়, সেইভাবেই সেগুলি হরিকে অর্পণ করবে।"

প্রশ্ন ৮১। হরিকথা এক কান দিয়ে শুনি, অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছুই স্মরণে থাকে না। কি করব?

উত্তর ঃ দুই কান দিয়েই কথা শোনা হয়, কান দিয়ে কথা বেরিয়ে যায় না। মনটা হরিকথায় নিবিষ্ট থাকলে বিষয়বস্তু স্মরণে থাকেই। হাবিজাবি কথায় মন না দিয়ে হরিকথায় যুক্ত হলে অবশ্যই শ্রোতব্য বিষয় কম বেশি স্মরণে থাকবে। সাধারণ ক্ষেত্রে শ্লোক বা সুগঠিত কোনও বাক্য স্মরণে না আসতে পারে। কিন্তু ভগবান শ্রীহরি সম্বন্ধীয় কি শিক্ষণীয় বিষয় আলোচিত হল সেটি স্মরণ করতেই হয়। নিজে শুনতে হবে, আবার সেই কথা অন্যকেও বলতে হবে।

প্রশ্ন ৮২। পাপী ব্যক্তিরা কিভাবে ভজনা করবে?

উত্তর ঃ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কলিসন্তরণ উপনিষদে কলির কলুষ বিনাশ করবার এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। আর কলির চারটি অনাচার—নেশা, অবৈধ যৌনাচার, জুয়া, আমিষ আহার এড়িয়ে থাকতে হবে। তাতেই মানুষ কৃষ্ণভক্ত হয়ে উঠতে পারবে।

পাপী তাপী যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই-মাধাই ॥

প্রশ্ন ৮৩। মন্দিরে ভগবানকে দর্শন করতে যাওয়ার মাহাত্ম্য কি?

উত্তর ঃ শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "যাঁরা কৃষ্ণভক্তিতে প্রভাবিত হয়েছেন, যাঁরা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে যান, তাঁদের কখনও মাতৃগর্ভরূপী কারাগারে প্রবেশ করতে হয় না।"

মাতৃগর্ভে অবস্থান করা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু বদ্ধ জীব জন্মের পর সেই বেদনাদায়ক দুরবস্থার কথা ভুলে যান। শাস্ত্রে জড় জগতের দুঃখময় অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রত্যেককে ভক্তি সহকারে ভগবানের মন্দিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার ফলে অনায়াসে এই জড় জগতের দুঃখময় পুনর্জন্ম থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ৮৪। বৈষ্ণবগণ ভগবৎ প্রসাদ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না। কিন্তু মুড়ি, বাজারের ফল, মিষ্টি ইত্যাদি ভগবানকে নিবেদন না করেও গ্রহণ করেন কিভাবে?

উত্তর ঃ ভগবানকে নিবেদন করে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করাই বিধি। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভগবানকে স্মরণ করে বৈষ্ণবগণ কোনও কিছু আহার করেন। তৃষ্ণার্ত হয়ে যখন জল পান করতে কেউ যান, প্রথমে ভগবানকে স্মরণ করতে থাকেন। মন্দিরে সময়মতো ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা হয়। সব সময় সব জিনিসই ভগবানের কাছে নিয়ে গিয়ে নিবেদন করতে হবে, নতুবা গ্রহণ করা যাবে না—এরকম নয়। অনেকে ভগবানের প্রসাদ কিংবা প্রসাদী তুলসী কিংবা চরণামৃত মিশিয়ে বাজারের মিষ্টিও গ্রহণ করে থাকেন। তবুও সাধারণ ক্ষেত্রে যার-তার তৈরি বিশেষতঃ যারা সদাচারী নয় তাদের তৈরি খাবার গ্রহণ না করাই ভাল।

প্রশ্ন ৮৫। 'ধৃতি' কথাটির মানে কি?

উত্তর ঃ ধৈর্য। ধীরতা।

প্রশ্ন ৮৬। জপমালার সঙ্গে ১৬ মালা জপ করতে ১৬টি সাক্ষীগুটি যুক্ত থাকে। কিন্তু আর ৪টি সাক্ষীগুটি আলাদা থাকে কেন?

উত্তর ঃ একদিন ৩২ মালা বা ৪৮ বা ৬৪ মালা জপ করতে চাইলে প্রতি বোলোমালা হিসাবে একটি করে গুটি টানা হয়। এজন্য চারটি সাক্ষীগুটি আলাদা থাকে।

প্রশ্ন ৮৭। আমি কৃষ্ণকে নিবেদন না করে কোনও কিছু ভোজন করি না। কালী বা দুর্গাদেবীর প্রসাদ কিভাবে খাব?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত হয়েছে, সেই মহাপ্রসাদ দুর্গাদেবীকে অর্পিত হলে সেই প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবেন। জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দুর্গাদেবী বিমলাকে নিবেদিত হয়, তারপর সেই প্রসাদ আমরা পাই।

প্রশ্ন ৮৮। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র মহান ভক্ত প্রহ্লাদ, পাণ্ডবেরা, হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিদেরও দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হল কেন? ভগবানের এই যদি বিচার হয়, তবে কলিহত অধম মানুষেরা ভগবানের শরণাগত হয়ে লাভ কি?

উত্তর ঃ অধম মানুষেরাই ভক্তদের উৎপীড়ণ করেছিল। সেই দুঃখদুর্দশা থেকে ভগবানই তাঁর শরণাগত ভক্তদের রক্ষা করেছিলেন। কলিহত অধমেরা শিখতে পারে যে, ভগবানের শরণাগত হলে যত দুঃখ আসুক না কেন, ভক্তের ক্ষতি হয় না, অতএব ভক্ত হওয়াই যথার্থ পন্থা।

প্রশ্ন ৮৯। পঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহের মধ্যে কার চরণে তুলসীপত্র নিবেদন করা উচিত এবং কার চরণে তুলসীপত্র দেওয়া নিষিদ্ধ? গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণে, বক্ষে, মস্তকে কি তুলসী অর্পণ করা চলে?

উত্তর ঃ শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর চরণে তুলসী পত্র নিবেদন করা উচিত। তাঁরা বিষ্ণুতত্ত্ব। শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস ঠাকুরের চরণে তুলসী দেওয়া নিষিদ্ধ, তাঁরা শক্তিতত্ত্ব। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণে চন্দন তুলসী অর্পণ করা হয়, বক্ষে তুলসী মঞ্জরী মাল্য নিবেদন করা চলে, মস্তকেও মন্ত্রপূত তুলসীপত্র অর্পিত হলে অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ৯০। দীক্ষামন্ত্র ও শিক্ষামন্ত্র ভজনক্ষেত্রে কিভাবে পরিপূরক ভূমিকা পালন করে? দীক্ষাগুরু যদি শিক্ষামন্ত্র প্রদান না করেন তবে করণীয় কি? দীক্ষাগুরু যদি স্বয়ং ভজন প্রণালী দিয়ে থাকেন তবে শিক্ষাগুরু গ্রহণের আবশ্যকতা কি?

উত্তর ঃ আমাদের অবশ্যই জানা দরকার যে, এই কলিযুগের যুগধর্ম হচ্ছে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করা। দীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শাস্ত্র নির্ধারিত ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র দান করা হয় এবং ব্রাহ্মণ গুণ সম্পন্ন হলে গায়ত্রী মন্ত্র দান করা হয়। যিনি শিষ্যকে এই মন্ত্র দান করেন তাঁকেই দীক্ষাগুরু বলা হয়। এই দীক্ষা তাকেই দেওয়া হয়ে থাকে যে দীক্ষাপ্রার্থী কলির চারটি পাপকর্ম আমিষ আহার, নেশাভাঙ, জুয়া ও অবৈধ যৌনতা থেকে নিজেকে এড়িয়ে রাখার জন্য যত্নপর হয়েছেন। সবার আগে জানতে হবে আমাদের কিভাবে জীবন যাপন করা উচিত। সেই শিক্ষাই নিতে হবে। যিনি শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। 'শিক্ষামন্ত্র' বলা হয় না। মনটি কিভাবে

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সুরক্ষিত ভাবে থাকতে পারে সেটিই শিক্ষা করা উচিত। শিক্ষাগুরু অনেকজন হতেও পারেন। কিন্তু তাঁরা সবাই কৃষ্ণভক্ত হবেন। দীক্ষাগুরু একজন হন। তিনিই শিষ্যকে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যান। দীক্ষাগুরুও শিক্ষাগুরু হতে পারেন।

অনেকে বলে থাকেন 'আমরা দীক্ষা নিয়েছি, কিন্তু আমরা জপমালায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি না, আমিষ বা নেশা ছাড়তে আমাদের গুরুদেবও বলেননি।' এরকম ক্ষেত্রে বুঝতে হবে সেই দীক্ষার কোনও মূল্যও নেই। সেই তথাকথিত দীক্ষাগুরু 'কুলগুরু' নামে লোক-সমাজে পরিচিত হলেও তিনি আদৌ কোনও পারমার্থিক গুরুদেব নন।

সুতরাং, কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন কিভাবে করতে হয়, সেটিই শিক্ষার প্রয়োজন, তারপর দীক্ষাগ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্ন ৯১। পঁচিশ বছর ধরে তন্ত্রমন্ত্রে আমি আমার ঘরে প্রতিষ্ঠিত আদ্যামায়ের পূজা করছি। লাল তিলক ও রুদ্রাক্ষের মালা আমার সঙ্গী। এই অবস্থাতে তুলসী কাঠের মালা, তিলকমাটি গ্রহণযোগ্য কিনা?

উত্তর ঃ তন্ত্রমন্ত্রে যাই থাক্ না কেন, আদ্যামা হচ্ছেন পরম বৈষ্ণবী। যদি এই জ্ঞান হয়, এবং জীবের সনাতন স্বরূপটাই 'বৈষ্ণব' বলে বুঝতে পারেন, তা হলে অবশ্যই তুলসীকাঠের মালা তিলকমাটি ইত্যাদি ভূষণ গ্রহণ করবেন এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রও গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন ৯২। 'কুটি-নাটি' কথাটির অর্থ কি?

উত্তর ঃ 'কু'-টি অর্থাৎ, মন্দটি এবং 'না'-টি যেটা নিষিদ্ধ সেটিই নিয়ে থাকাই হল কুটি-নাটি। মনের কুটিলতা, কিংবা কৃষ্ণভক্তিমূলক মনোভাব বাদ দিয়ে কু-বিষয়টিতে অভিনিবিষ্ট থাকা। কুটিনাটি শুচিবায়ুগ্রস্ত লোককেও বোঝায়। যদি কোথাও কিছু একটু 'কু' দেখতে পাওয়া গেল তো আর সেই স্থান কৃষ্ণভক্তি বিকাশের অযোগ্য বলেই মনে করে, অর্থাৎ, এ স্থান বাদ বা 'না'।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, কেউ হয়তো একটা জলাশয়ে স্নান করলেন,' কিন্তু কাছাকাছি কোথাও মলক্ষেত্র দেখে জলাশয়ের 'কু'টি মনে করে সমস্ত দিন সেই আলোচনায় ব্যস্ত থাকলেন, কোন ভাল বিষয় আলোচনা করতে পান না। যাদের এই ধরনের বায়ু আছে তারা পৃথিবীর কোন স্থানকেই পবিত্র বলে মনে করতে পারে না, কোন সময়কেই শুভ মনে করতে পারে না, কোন ব্যক্তিকেই শুদ্ধ বৈষ্ণব বলে স্বীকার করেন না। এই কুটিনাটি হচ্ছে একপ্রকার মানসিক রোগ। এই রোগ থাকলে কৃষ্ণভক্তি হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কুটিনাটিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বৈষ্ণবসেবা বা বৈষ্ণবসঙ্গ করা অত্যন্ত কঠিন। কুটিনাটিগ্রস্ত ব্যক্তির বর্ণ অভিমান ও সৌন্দর্য অভিমানে মহামহাপ্রসাদে, ভক্তপদধূলিতে ও ভক্তপদজলে বিশ্বাস জন্মায় না। তিনি সর্বদা বৈষ্ণব-অপরাধ ও নাম-অপরাধে দোষী। অতএব তাঁর মুখে হরিনাম হওয়া কঠিন। কোনও শুদ্ধ বৈষ্ণবের যদি পীড়া বা যন্ত্রণাগ্রস্ত অবস্থা দেখেন তা হলে কুটিনাটিগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁকে পাপফলগ্রস্ত

মনে করে ঘৃণা প্রকাশ করেন। কিন্তু সেটা উচিত নয় বলে আমাদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সনাতন গোস্বামীর দেহে কণ্ডুরসা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন 'তোমার দেহে কণ্ডুরসা দেখে কোন বৈষ্ণবের ঘৃণা হয় না।'

প্রশ্ন ৯৩। 'জীব হিংসন' কি?

উত্তর ঃ বেদে বলা হয়েছে 'মা হিংস্যাৎ সর্বানি ভূতানি'—সমস্ত জীবের প্রতি হিংসা পরিত্যাগ করবে। হিংসা একটি বিশাল পাপকর্ম। নরহিংসা, পশুহিংসা, দেবহিংসা ইত্যাদি। কাউকে কায়-মনো-বাক্যে কোনও প্রকারে পীড়া দেওয়াই হিংসা। মাংস ভক্ষণ জীবহিংসা। যে কার্যে জীবহিংসা আছে তা অবশ্যই ভক্তির প্রতিকূল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, পরহিংসা সর্ব পাপের মূল। যাঁরা ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁদের স্বভাবতঃ পরহিংসা প্রবৃত্তি থাকে না। যাতে পরোপকার আছে, সেই কর্মই ভক্তি-সম্মত এবং যে কর্মে পরহিংসা আছে, তা-ই ভক্তিবিরুদ্ধ। (সজ্জন তোষণী ৯/৮)

প্রশ্ন ৯৪। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করলে ভগবানকে কি পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে—

গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ ।
মিলিতো ন লভ্যতে জীবৈরহমিকাপরৈঃ ॥

"অকপট চিত্তে গুরুসেবা করলে ভগবৎপ্রাপ্তি অবশ্যই হবে। কিন্তু সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করেও যদি কারও ভগবৎপ্রাপ্তি না হয়, তবে গুরুদেবে আনুগত্যের পরিবর্তে অহঙ্কার দম্ভই তার মূল কারণ বলে জানতে হবে।"

প্রশ্ন ৯৫। কিভাবে ভগবানের শরণাগত হব?

উত্তর ঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তৃতীয় যামসাধনে বলা হয়েছে—

ভক্তি অনুকূল যাহা, তাহাই স্বীকার ।
ভক্তি প্রতিকূল সব করি পরিহার ॥
কৃষ্ণ বই রক্ষাকর্তা আর কেহ নাই ।
কৃষ্ণ সে পালন মোরে করিবেন, ভাই ॥
আমি আমার যত কিছু কৃষ্ণে নিবেদন ।
নিষ্কপট দৈন্যে করি জীবন যাপন ॥

এই কথা বৈষ্ণব তন্ত্রবাক্যে রয়েছে—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জনম্ ।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/১৭)

অর্থাৎ, (১) সেই সমস্ত বিষয় গ্রহণ করতে হবে, যেগুলি কৃষ্ণভক্তির পক্ষে সহায়ক।
(২) সেই সমস্ত বিষয় ত্যাগ করতে হবে, যেগুলি কৃষ্ণভক্তির বিঘ্নস্বরূপ।

(৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করবেন—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস।
(৪) শ্রীকৃষ্ণকেই পালনকর্তা রূপে বরণ।
(৫) শ্রীকৃষ্ণের অভয়পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ।
(৬) দৈন্য ও নিষ্কপট সহকারে জীবন যাপন।
—শরণাগতির এই ছয় প্রকার।

প্রশ্ন ৯৬। বৈষ্ণব অপরাধ কি?

উত্তর ঃ শ্রীস্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি ।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

অর্থাৎ, "(১) কোনও বৈষ্ণব জনকে হত্যা করা বা আঘাত করা,
(২) বৈষ্ণবের নিন্দা করা,
(৩) বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষী হওয়া,
(৪) বৈষ্ণবকে আসতে দেখে অভিনন্দন না করা,
(৫) বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা,
(৬) বৈষ্ণবকে দর্শন করে আনন্দ প্রকাশ না করা ।
—এই ছয়টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়।"

প্রশ্ন ৯৭। অদীক্ষিত ব্যক্তি কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করতে পারে কি?

উত্তর ঃ প্রথমাবস্থায়, দীক্ষা না নিলেও হরিনাম জপ করে এবং আমিষ-নেশা-জুয়া-অবৈধ সঙ্গাদি বর্জন করে অনেক গৃহবাসী ভক্ত ভোগ নিবেদন করে থাকেন। তাতে দোষ নেই।

প্রশ্ন ৯৮। আসল গুরু কে?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে আছে—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।" অর্থাৎ, যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অবশ্যই জানেন, তিনিই গুরু। তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিষয় ছাড়া অন্য কথা বা গ্রাম্য কথা বলেন না, তিনি অবশ্যই আদি পরম গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে নারদ—এইভাবে ক্রমশঃ গুরু-শিষ্য পরম্পরার তিনি অন্তর্ভুক্ত। যাদের পরম্পরা আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন, কিংবা যাঁদের কোন পরম্পরা নেই—সেক্ষেত্রে কেউ সদ্‌গুরু হতে পারেন না। শ্রীগুরুদেব অবশ্য শাস্ত্র-অনুমোদিত আচরণ করেন, শাস্ত্র বিরুদ্ধ কোনও আচরণ গুরুদেব করেন না। তিনি সনিষ্ঠ, তাই নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে কাউকে কিছুই বোঝাতে চান না, গুরুদেব তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ সদাসর্বদা লক্ষ্য রেখে চলেন। আবার তিনি তাঁর শিষ্যদের এমন কোনও উপদেশ বা নির্দেশ দেন না যাতে শিষ্যের ভগবদ্-ভক্তি ক্ষুণ্ণ হয়।

শ্রীগুরুদেব একান্তভাবেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাগত। বৈষ্ণবের ছাব্বিশটি গুণের সমস্ত গুণই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। জড়জাগতিক কোন কিছুতেই তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন

না। জড় জগতের সমস্ত সম্পদকে তিনি কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করেন। শ্রীগুরুদেব সমস্ত প্রকার অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে আশ্রিত জনকে উদ্ধার করে তার হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানের আলো দান করতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৩/২১) বলা হয়েছে—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণি উপশমাশ্রয়ম্ ॥

অর্থাৎ, "আমাদের কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে সর্ব-উত্তম ও শ্রেয় বস্তু অবগত হওয়ার জন্য সেই গুরুদেবকে আশ্রয় করতে হবে যিনি, শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ, বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নন। তিনিই আসল অর্থাৎ, সদ্‌গুরু।"

প্রশ্ন ৯৯। আমি যদি কৃষ্ণনাম করি তবে কি করে আমি বুঝব যে, শ্রীকৃষ্ণ আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন?

উত্তর ঃ আমি নিজে যদি কালা বা ন্যাকা হই, আমার ডাকে কেউ সাড়া দিলেও আমি বুঝতে পারব না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অন্তর্যামী। আন্তরিক ঐকান্তিকতা না থাকলে লক্ষবার ডাকলেও কোন সাড়া পাওয়া যাবে না। যেমন, আমি যদি মজা করে পাশের কাউকে ডাকতে থাকি, তখন পাশের কেউ আমার ডাকে সাড়া দেয় না। তেমনি, অন্তরে কপটতা রেখে যদি অন্তর্যামী ভগবানকে ডাকি, তবে কোনও সময়ই তাঁর সাড়া পাওয়া সম্ভব হবে না।

তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে *'ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ'*—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিষ্কপট ভক্তিভাবটাই গ্রহণ করেন মাত্র। তাই অপরাধ শূন্য হয়ে ভগবানের নাম শুদ্ধভাবে কীর্তন করাই বাঞ্ছনীয়। তবে অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ বাইরের বিচারে সাড়া না দিলেও, এমন কি নিষ্ঠুর পাষাণ বলে মনে হলেও, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যদি কেউ প্রার্থনা জানায়, যথা সময়ে তার ফল একদিন সে পায়ই। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে কারও আন্তরিক প্রার্থনা কখনই বৃথা হবার নয়। এমন কি, আমাদের ভৌতিক চর্ম চক্ষুতে ধরা না পড়লেও আপনা-আপনি যেন অনেক অসাধ্য সাধন হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ রয়েছে। তা ছাড়া বহু ভক্ত তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারাও তা বুঝতে পারে।

প্রশ্ন ১০০। কলিযুগে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করলেই কি ভগবানকে দর্শন করা যায়?

উত্তর ঃ 'কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥'

(শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ৭/৭৩)

দশবিধ নাম-অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীনাম কীর্তন করলে অসিদ্ধির কোন কিছুই থাকে না। তবে ভগবানকে দর্শন করাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত

নয়। এমনভাবে ভগবৎ সেবা করতে হবে যাতে ভগবানই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমাদেরকে দর্শন করবেন।

প্রশ্ন ১০১। প্রসাদ, মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ প্রসাদ আর মহাপ্রসাদের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই। তবে ভগবানের প্রসাদকে বিশেষরূপে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাকে মহাপ্রসাদ বলা হয়। আর দেব-দেবীর উচ্ছিষ্ট বস্তুকে সাধারণত প্রসাদ বলা হয়। মহাপ্রসাদ বলতে একমাত্র ভগবানের ভোজনের পর তাঁর ভুক্তাবশেষকে বোঝায়। কৃষ্ণ বা বিষ্ণুতত্ত্বকে ভোগ নিবেদনের পর ভুক্তাবশেষ বা উচ্ছিষ্টকে মহাপ্রসাদ বলে। আর এই মহাপ্রসাদ যখন কোন শুদ্ধ ভক্ত গ্রহণ করেন, তখন তাঁর উচ্ছিষ্ট অংশকে মহামহাপ্রসাদ বলা হয়।

প্রশ্ন ১০২। শ্রীল ভক্তিবিনোদ গীতিতে একটি গানে বলা হয়েছে—

ওহে! বৈষ্ণব ঠাকুর,.....
ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি' ছয় গুণ দেহ দাসে ।
ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে, বসেছি সঙ্গের আশে ॥

ছয় বেগ, ছয় দোষ, ছয় গুণ ও ছয় সৎসঙ্গ কি কি?

উত্তর ঃ ছয় বেগ—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীর
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

(শ্রীউপদেশামৃত)

(১) বাক্যবেগ—কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথা ছাড়া জড়জাগতিক কথা, বৃথা গালগল্প, প্রজল্প, অপরের উদ্বেগ ও দুঃখকর বচন প্রয়োগ।

(২) মনোবেগ—নানা রকমের মনগড়া কার্যকলাপ। সংযমহীন মন যা চায় তাই করা।

(৩) ক্রোধবেগ—ইন্দ্রিয় ভোগে ব্যাঘাত হেতু রূঢ় আচরণ ও বিক্ষুব্ধ হওয়া।

(৪) জিহ্বাবেগ—নানা স্বাদের খাদ্য লালসা।

(৫) উদরবেগ—অতিরিক্ত ভোজন।

(৬) উপস্থবেগ—স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গ লালসা।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, এই ছয় প্রকার বেগ যিনি দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করতে পারেন।

ছয় দোষ—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

(শ্রীউপদেশামৃত)

(১) অত্যাহার—প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যের সংগ্রহ ও সঞ্চয়।
(২) প্রয়াস—পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টা।
(৩) প্রজল্প—বৃথা বাক্যালাপ, অনাবশ্যক গ্রাম্য কথা।
(৪) নিয়মাগ্রহ—নিয়মের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ, কিংবা নিয়মকে অবহেলা।
(৫) জনসঙ্গ—কৃষ্ণভাবনাবিমুখ জড়বিষয়ী লোকের সঙ্গ।
(৬) লৌল্য—চিত্তের চঞ্চলতা; পার্থিব সুখলাভের বাসনায় ব্যাকুলতা।

কোন ব্যক্তি যখন উপরোক্ত ছয়টি দোষের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার পারমার্থিক জীবন বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ছয় গুণ—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাত্তত্তৎকর্মপ্রবর্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥

(শ্রীউপদেশামৃত)

(১) উৎসাহ—ভজন সাধন অর্থাৎ, ভগবৎসেবা অনুশীলনে উৎসাহ।
(২) নিশ্চয়তা—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন এই দৃঢ় বিশ্বাসে কৃষ্ণানুশীলন।
(৩) ধৈর্য—ভগবৎ প্রেম লাভের জন্য ধৈর্য। বিধিনিষেধ পালনে শৈথিল্য না করা।
(৪) তত্তৎকর্ম প্রবর্তন—শ্রবণ-কীর্তন ইত্যাদি ভক্তি-অনুকূল কর্ম সম্পাদন।
(৫) সঙ্গত্যাগ—ভণ্ড, নাস্তিক, মায়াবাদী, স্ত্রৈণ, অভক্ত ও বিষয়ীর সঙ্গত্যাগ।
(৬) সতোবৃত্তি—পূর্বতন মহান বৈষ্ণব আচার্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ।

এই ছয়টি বিধি অনুসারে পারমার্থিক জীবন-যাপন করলে ভক্তিযোগে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করা যাবে।

ছয় সৎসঙ্গ—

প্রীতির সহিত কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ছয় প্রকারে সাধিত হয়। তাই এই সঙ্গকে প্রীতি লক্ষণ বা ভক্তিপোষক সঙ্গ বলা হয়।

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥

(শ্রীউপদেশামৃত)

(১) ভগবদ্ভক্তকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্বক দান।
(২) ভক্তের প্রতিদান সাদরে গ্রহণ।
(৩) নিজের মনের কথা ভক্তের নিকট প্রকাশ।
(৪) ভজন বিষয়ক কথা ভক্তকেই জিজ্ঞাসা।
(৫) ভক্তের দেওয়া ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ।
(৬) ভক্তকে ভগবৎ প্রসাদ নিবেদন।

প্রশ্ন ১০৩। সাধু কাকে বলে?

উত্তর ঃ যিনি শুদ্ধভাবে কৃষ্ণভজনকারী এবং নিঃশর্তভাবে ঐকান্তিক কৃষ্ণানুশীলনে ব্রতী—তিনিই সাধু। শ্রীমদ্ভাগবতে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

অর্থাৎ, "সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তিনি সহনশীল, দয়ালু এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ। তিনি কারও প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন হন না, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন; এবং তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা বিভূষিত।" (ভাঃ ৩/২৫/২১)

সহনশীলতা সাধুর ধর্ম। এই যুগে মানুষেরা আসুরিক মনোভাবাপন্ন হওয়ার ফলে, কেউ ভগবদ্ ভজন করা মাত্রই, বহু মানুষ তার শত্রুতে পরিণত হয়। এমন কি কারও পিতা পর্যন্তও শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে, যেমন প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়েছিল। কিন্তু, শ্রীপ্রহ্লাদ শৈশব থেকেই পিতার অবাধ্য হয়েছিলেন, এবং জীবনে কখনো ভগবদ্‌ভজন থেকে বিচ্যুত হননি। এটাই যথার্থ সাধুর পরিচয়।

সাধু কৃপালু। জড় জগতে বদ্ধ জীবদের তিনি মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায়, যারা কনিষ্ঠ স্তরের ভক্তকে দেখে উপহাস করে—'এ আবার কবে সাধু হল?' কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধুর বৈশিষ্ট্য বুঝিয়েছেন এইভাবে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥

অর্থাৎ, 'সর্বাপেক্ষা দুরাচারী ব্যক্তিও যদি আমার ভজনে একান্তভাবে ব্রতী হয়, তা হলে তাকে সাধু বলে গণ্য করতে হবে, কারণ তার স্বরূপে যে যথাযথভাবে অবস্থান করছে।" (গীতা ৯/৩০)

প্রশ্ন ১০৪। গুরুদেবকে কোন্ অবস্থায় ত্যাগ করা উচিত? এমন কোন্ মহাত্মা আছে যিনি তাঁর গুরুদেবকে ত্যাগ করেছিলেন?

উত্তর ঃ যিনি 'গুরু' হয়েও বৈদিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেন, যেমন মাংস আহার, অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ, মাদকদ্রব্য সেবন, তাস-জুয়ায় জড়িত থাকেন, তবে বুঝতে হবে তিনি ভগবানের প্রতিনিধি নন। তিনি প্রকৃত গুরু নন। গুরুদেব ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন। তাই ভগবৎ বিরোধী আচরণ তিনি করেন না। ভগবৎ বিরোধী গুরু উপাধিযুক্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

মহাভারতে বলা হয়েছে—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগ বিধীয়তে ॥

অর্থাৎ, "জগতে যিনি বিষয় ভোগে লিপ্ত, কর্তব্যে ও অকর্তব্যে বিবেকশূন্য, মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তিকে বাদ দিয়ে যিনি ইতর পন্থার অনুগমন করেন, সেই ব্যক্তি নামে মাত্র গুরু হলেও তাঁকে পরিত্যাগ করাই বিধি।" (মহাভারত উদ্যোগপর্ব ১৭৯/২৫)

যাঁরা পারমার্থিক জগৎ সম্বন্ধে জানেন না, অথচ ব্যবহারিক গুরু, লৌকিক গুরু, কুলগুরু হয়ে বসেছেন, তাঁদেরকে গুরুরূপে গ্রহণ করতে নেই। সেইজন্য শ্রীজীব গোস্বামী নির্দেশ দিয়েছেন—

পরমার্থগুর্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্তব্য ॥

অর্থাৎ, "ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুত্রুব পরিত্যাগ করে পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর্তব্য। (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়জন। তিনি মহান বৈষ্ণব। তিনি বিষ্ণু-বিরুদ্ধ আচরণ করেন না। তাই শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

মহাকুল প্রসূতোঽপি সর্বযজ্ঞেসু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥

অর্থাৎ, "যিনি উচ্চ কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, সমস্ত প্রকার যজ্ঞে যিনি দীক্ষিত, এবং সমস্ত বেদশাস্ত্রে যিনি পণ্ডিত, অথচ তিনি যদি অবৈষ্ণব হন, তা হলে তিনি গুরু হতে পারেন না।" (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১/৪০)

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, মহাত্মা বলি মহারাজ শ্রীবিষ্ণুর অবতার বামনদেবের সন্তুষ্টিবিধান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর গুরু শুক্রাচার্য নিষেধ করলেন। কিন্তু মহাত্মা বলি শুক্রাচার্যের ভগবদ্-বিরোধী নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ভগবান বামনদেবের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করলেন।

প্রশ্ন ১০৫। আমরা তো সদ্‌গুরুর সন্ধান পেলাম না। এখন আমাদের করণীয় কি?

উত্তর ঃ জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ একবার তাঁর এক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—'গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।' কৃষ্ণ আমাদের মধ্যে রয়েছেন। যখন তিনি দেখেন যে, আমরা ঐকান্তিক ভাবে তাঁকে জানতে চাই, তিনি উপযুক্ত গুরুকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন অর্থাৎ, যোগাযোগ করিয়ে দেন। কিন্তু আমরা যদি প্রতারিত হতে চাই, তা হলে কৃষ্ণ আমাদের কাছে একজন প্রতারককে পাঠাবেন। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম বুদ্ধিমান। আমরা যদি প্রতারক হই, তবে কৃষ্ণও আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবেন। কিন্তু আমরা যদি ঐকান্তিক হই, তা হলে কৃষ্ণ আমাদের যথাযথভাবে পরিচালিত করবেন। ভগবদ্‌গীতায় (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।

"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।" অর্থাৎ, আমরা তাঁর প্রতি ঐকান্তিক হলে তিনি আমাদের জ্ঞান ও স্মৃতি দান করবেন আর আমরা যদি প্রতারক, ফাঁকিবাজ হই, তবে কৃষ্ণ আমাদের বিস্মৃতি প্রদান করবেন, যাতে আমরা তাঁকে ভুলে থাকতে পারি।

কৃষ্ণকৃপা করলে গুরুকৃপা লাভ করা যায়। সে কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লেখ রয়েছে—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৪৭)

প্রশ্নানুসারে, এখন কর্তব্য হল, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দিব্য গ্রন্থ বিশেষত 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা, কারণ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের গ্রন্থসমূহ সমগ্র বিশ্বের সর্ব স্তরের মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছে, যেহেতু এই গ্রন্থগুলি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দান করতে সক্ষম।

প্রশ্ন ১০৬। "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অনুকরণ করার কেউ কখনই অধিকারী নয়।" তা হলে যদি কেউ ভগবানের লীলাকথার রস আস্বাদন করে তাতে তার কি কোন দোষ হয়?

উত্তর ঃ আস্বাদন করা আর অনুকরণ করা এক ব্যাপার নয়। দুটো আলাদা জিনিস। ভগবানের ভক্তগণ ভগবানের সেবা, তাঁর লীলাকথা শ্রবণ, তাঁর নাম মহিমা কীর্তন, তাঁর কথা অধ্যয়ন ইত্যাদিতে অবশ্য আনন্দ আস্বাদন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রূপ দর্শনে, তাঁর পূজা-অর্চনায় ভক্ত অবশ্যই আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু অভক্তরা সব রকমের পাপকর্ম করেও নিজেদের আস্তিক বলে মনে করে। এমন কি তারা নিজেদের ভগবানের ঘনিষ্ঠ পার্ষদ বলে মনে করে, কিংবা নিজেদেরও ভগবান বলে মনে করে। ভগবানের লীলাকথামৃত যতই মধুর হোক না কেন, তা অভক্তদের কাছে শ্রবণ করা উচিত নয়। শাস্ত্রে এই সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—

অবৈষ্ণব মুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

দুধ অতি পবিত্র বস্তু, দুধ পান করলে শরীরের তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। কিন্তু, সেই উৎকৃষ্ট দুধে যদি সাপের মুখ লাগে, তবে দুধের গুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং তা বিষে পরিণত হয়। সেই দুধ পান করলে অত্যন্ত মারাত্মক অবস্থায় পড়তে হবে। অনুরূপভাবে, হরিকথামৃত পান করলে জীবের ভক্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখ থেকে হরিকথা যতই ভাল হোক না কেন, তা নামাপরাধ মাত্র, তা হরিকথা-অমৃত নয়। সেই তথাকথিত হরিকথা শ্রবণ করলে জীবের অমঙ্গলই সাধিত হয়।

লীলাপুরুষোত্তম পরমানন্দময় পরমেশ্বর ভগবানের কথা অতীব মধুর। শ্রীকৃষ্ণ রসময় পুরুষ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি ॥* অর্থাৎ, "সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রস-স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়ে জীব আনন্দ লাভ করে।

কে-ই বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা প্রদর্শন করত, যদি সেই পরমতত্ত্ব আনন্দ-স্বরূপ না হতেন? তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৭)

সেই চিন্ময় পরম রসের অনুসন্ধান করার কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। কিন্তু জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়ভোগপরায়ণ মানুষেরা নিজেদেরকেই ভক্তিরসের নায়ক বলে মনে করছে। কামলম্পট মেয়ে-পুরুষেরা নিজেদেরকেই রাধাকৃষ্ণ মনে করে রাসলীলার নামে নানা রকমের মাতলামি করতে শুরু করেছে। সেই মাতালগুলোই আবার নিজেদের ধার্মিক বৈষ্ণব বলে সমাজে পরিচয় দান করছে। এইভাবে ধর্মের নামে যারা ভণ্ডামি করছে, তাদের সঙ্গ নিষিদ্ধ।

মহর্ষি শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহান রাজা পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন, 'কেউ কখনই ভগবানের রাসলীলার অনুকরণ করার অধিকারী নয়।' মানুষ তো দূরের কথা, ব্রহ্মা শিব কিংবা ইন্দ্রও নয়।

প্রশ্ন ১০৭। তুলসী গাছ থেকে পাতা তুলে মুখে দেওয়া অনুচিত। তা হলে তুলসী পাতা খাওয়ার পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ বা কোনও বিষ্ণুতত্ত্বের চরণে নিবেদিত তুলসী পত্র সেবন করার বিধি রয়েছে। তুলসীপত্র এক মহৎ মহৌষধিরূপে ধরাধামে প্রকাশিত। ভগবানের চরণামৃতের সঙ্গে তুলসীপত্র থাকে। ভক্তিমান ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলসীপত্র ও চরণামৃত গ্রহণ করেন। প্রতিদিন ভগবানে অর্পিত তুলসীপত্র সেবন করলে কি শারীরিক কি পারমার্থিক উভয় দিকেই হিতকর। কিন্তু সরাসরি গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরে দেওয়া অপরাধ।

প্রশ্ন ১০৮। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈঃ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য কি? ভগবানের গানের সর্বাগ্রে এই শ্লোক গীত করা যায় কি?

উত্তর ঃ শ্রীমনুস্মৃতিতে এই ধরনের একটি শ্লোক রয়েছে। গুরুদেবকে ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রমুখ পরম বৈষ্ণবগণের মতোই শ্রদ্ধা জানাতে হয়। গুরুদেব ভগবান নন বটে, কিন্তু তিনি যেহেতু আদর্শ ভগবৎ প্রতিনিধি, তাই তাঁকে ভগবানের মতোই পূজা করতে হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর শ্রীগুর্বষ্টকে উল্লেখ করেছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

অর্থাৎ, নিখিল শাস্ত্র যাঁকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহরূপে কীর্তন করেছেন, এবং সাধুগণও যাঁকে সেইরূপেই চিন্তা করে থাকেন; কিন্তু তিনি ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই

শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।" শ্রীগুরুদেব অবশ্যই কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্। "যে-ই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সে-ই গুরু হয়।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৭) কৃষ্ণভক্তিবিরুদ্ধ আচরণকারী ব্যক্তিরা কখনই গুরু হতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত কলির চতুর্বিধ আড্ডাখানায় যারা যুক্ত অর্থাৎ, মাছ মাংস ভক্ষণ, নেশাদ্রব্য সেবন, অবৈধ সঙ্গ, তাসপাশা খেলা ইত্যাদি পাপকর্মে যুক্ত, তারা কখনই গুরু নয়। তাদের মহান গুরু মনে করে তাদের উপদিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করলে নরকে গতি হয়। *অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ* (শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র)।

প্রশ্ন ১০৯। কোটি জন্ম করে যদি নাম সংকীর্তন।
তথাপি না পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

তা হলে প্রত্যেক দিন ১৬ মালা জপ করে কি লাভ হবে?

উত্তর ঃ অপরাধশূন্য হয়ে নামকীর্তন করতে শাস্ত্রে নির্দেশ করা হয়েছে। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মতি হয় না, যদিও তারা কৃষ্ণনাম করে। অপরাধ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। নামকীর্তনকারীর উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

তৃণ-লতার অপেক্ষাও নিজেকে তুচ্ছ মনে করে, তরুর চেয়েও সহিষ্ণু হয়ে, স্বয়ং অমানী হয়ে অপরকে মান দিয়ে সর্বক্ষণ হরিনাম কীর্তন করা উচিত। তা হলে তিনি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করবার যোগ্য হবেন।

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নয়; জীব যখন কৃষ্ণসেবার প্রতি উন্মুখ হয়, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনাম স্বয়ং স্ফূর্তি লাভ করে।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু,পূর্ব ২)

কৃষ্ণনাম যদিও আমাদের মতো অভাগা জীবের অপরাধ বিচার করেন তবুও অত্যন্ত কৃপাময় মহাবদান্য অবতার শ্রীগৌরহরি এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মের শরণ নিয়ে কৃষ্ণনাম কীর্তন করলে অপরাধ মার্জিত হয় এবং নাম প্রবর্তক মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা লাভ হয়।

আমাদের মতো বদ্ধ ও চঞ্চল জীব দশ মিনিটও সুস্থির চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপ করতে পারে না। তাই অতীব কৃপাপূর্বক মহাপ্রভুর প্রিয়জন—যাঁরা আমাদের গুরুরূপে সারা জগতে কৃষ্ণ নাম বিতরণ করছেন, তাঁরা ন্যূনতম পক্ষে ১৬ মালা সংখ্যায় জপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব সন্দেহের কোনও কারণ নেই। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আনুগত্যে চললে ভয়ের কোনও কারণ নেই।

প্রশ্ন ১১০। "নন্দসুত হরি, ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি।"

শ্রীকৃষ্ণ যদি গুরুরূপে প্রকাশিত হন, তবে গুরুদেবকে কেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি বলা হয়?

উত্তর ঃ কখনও কখনও স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেন। তিনিই সর্বপ্রথমে সৃষ্টির আদি জীব ব্রহ্মাকে পরমতত্ত্বজ্ঞান দান করেন। ভগবানই পরম গুরু, আদি গুরু। পরম্পরা সূত্রে সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়। আদিগুরু ভগবান স্বয়ং ভক্তরূপে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে নির্দেশ দেন "যে-ই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সে-ই গুরু হয়।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ যিনি আচরণ করেন এবং শিক্ষা দেন তিনিই গুরু। সেই জন্যই বলা হয় শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ এবং তাঁর প্রিয়জনের নির্দেশ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ, আমাদের প্রতি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ বলতে শ্রীভগবানেরই নির্দেশ বলে মানতে হবে। কারণ শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের কথা বিরূপতা করেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের উক্তি উল্লেখ্য—

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

"গুরুদেবকে আমার স্বরূপ বলে জানবে, কখনও গুরুদেবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়, অথবা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়, কারণ গুরুদেব হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের সম্মিলিত প্রকাশ।" (ভাঃ ১১/১৭/২৭)

এখানে গুরুদেবকে ভগবান নিজেই তাঁর থেকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন।

এ ক্ষেত্রে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর 'গুর্বষ্টকে' বলেছেন, *সাক্ষাদ্ হরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈঃ*—সমস্ত শাস্ত্র মতে গুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীহরিরূপেই পূজনীয়, *কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য*—কিন্তু তিনি পরম প্রভু শ্রীহরির প্রিয়জন। অর্থাৎ, এমনটি নয় যে, গুরুদেবই স্বয়ং ভগবান। ভগবান স্বয়ং গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হন, আবার তাঁর প্রিয়জনও তাঁর প্রতিনিধিরূপে আমাদের মতো বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করতে এই জগতে অবতীর্ণ হন।

প্রশ্ন ১১১। অনেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, জপ করছেন, পাঠ শ্রবণ করছেন, সাধুসঙ্গ করছেন, তথাপি তাঁদের বিষয়াসক্তি কমে না কেন?

উত্তর ঃ একদিকে যেমন ভক্তি অনুশীলন করতে হয় অন্য দিকে তেমনি ভক্তিবহির্মুখ বিষয়গুলি দূর করতে হয়। বিষয় চিন্তা ছেড়ে কৃষ্ণচিন্তা করতে হয়, প্রজল্প ছেড়ে জপ-কীর্তন করতে হয়। দীক্ষা গ্রহণের দিন যেভাবে গুরুদেবের চরণে আত্মসমর্পণ করা হয়েছে—যে শুচিশুদ্ধ ভাব ছিল—বিধিনিষেধ পালনের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি, ঠিকঠিকভাবে কৃষ্ণনাম জপ করার মানসিকতা ছিল, সেই সকল যাতে খেলাপ করা না হয়, সেই

ব্যাপারে সচেতন থাকতে হয়। ভগবানকে নিবেদন না করে কোনও কিছু খাওয়া, সাধু সঙ্গের পাশাপাশি অসাধু সঙ্গের প্রভাব, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাহ্যিক মাত্র আসক্তি, সেবা-অপরাধ, ধাম অপরাধ, নাম অপরাধ জ্ঞানে অজ্ঞানে হয়ে যায়। তাই আমাদের ভগবদ্ভক্তিতে অরুচি আসে। বিষয়ে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য বিষয়াসক্তির মোহ থেকে নিজেকে সরিয়ে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি বিষয়ে মতি রাখার উদ্দেশ্যে গুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাতে হয়।

প্রশ্ন ১১২। 'অবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শুনতে নেই।' অবৈষ্ণবকে চিনবো কেমন করে?

উত্তর ঃ অবৈষ্ণব বলতে সাধারণত তাদেরই বোঝায়, যারা মাছ-মাংস ভক্ষণ, বিড়ি সিগারেট সেবন, তাসজুয়া খেলা, আজে বাজে প্রজল্পাদিতে জীবন কাটায়।

প্রশ্ন ১১৩। মহাপ্রভু যাঁদের সঙ্গে লীলাবিলাস করলেন, তাঁরা সবাই তাঁর নিত্য পার্ষদ, অতএব তাঁরা তো শ্রেষ্ঠ ভক্ত হবেনই, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি পরিণত করাটাই কি সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হত না?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'। অর্থাৎ, ভগবানের সঙ্গে আমাদের সকলের সম্বন্ধই নিত্য। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত সনাতনঃ* (গীতা ১৫/৭) "এই জড় জগতে সমস্ত বদ্ধ জীবকুল আমারই নিত্য সনাতন বিভিন্ন অংশ।" সুতরাং, যে কেউই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশ্বব্যাপী দিব্য হরিনাম সংকীর্তনে সংযুক্ত হতে পারেন। সেই জন্যই পতিতপাবন গৌরহরি প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে গ্রামে নগরে সর্বত্রই হরিনাম সংকীর্তনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মহাপ্রভুকে পতিতপাবন বলা হয়, তাঁর প্রতিনিধিগণকেও পতিতপাবন বলা হয়। যার অর্থ হল পতিত বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করবার জন্যই তাঁরা এই জগতে অবতীর্ণ।

সুতরাং, সাধারণ মানুষের মধ্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত হওয়ার সুযোগ আছে। সাধারণ কৃষ্ণভক্তিবিমুখ মানব সমাজ থেকেও যাঁরাই কৃষ্ণভক্তিময় জীবন গ্রহণ করবেন, তাঁরা আর 'সাধারণ' থাকছেন না, তাঁরা 'অসাধারণ', তাঁদের ভাগ্যের সীমা নেই। তাই পূর্বতন আচার্যগণ কীর্তন করেছেন—'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।' কোনও ভগবদ্ভক্তদের সাধারণ মানুষ হিসাবে দেখা শাস্ত্র মতে বড় অপরাধ।

যে-ই ভক্ত হবে, সে-ই পরম বুদ্ধিমান। *যজন্তি হি সুমেধসঃ।* যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। তার জীবন ধন্য। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

সংকীর্তন প্রবর্তন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সংকীর্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥
সেই ত' সুমেধা, আর—কুবুদ্ধি সংসার ।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, "যে মানুষ হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন আন্দোলনে তার জীবন, সম্পদ, বুদ্ধিমত্তা এবং বাক্য উৎসর্গ করার মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করে, সে-ই ভগবানের কৃপা-আশীর্বাদ লাভ করবে। এ ছাড়া অন্য সকলেই হচ্ছে মূর্খ।"

তা ছাড়া, মহাপ্রভুর দিব্য কার্যকলাপের কোন্‌টা অশ্রেষ্ঠ, কোন্‌টা সর্বশ্রেষ্ঠ—জড় বুদ্ধিতে তার বিচার করাও বিষম মূর্খতা। সেই জন্য ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যে ব্যক্তি আমার এই প্রকার জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানতে পারে, তাকে আর পুনর্জন্ম নিয়ে এই বদ্ধ জড় জগতে আসতে হবে না, সে আমার নিত্য ধাম লাভ করবে।" (গীতা ৪/৯)

প্রশ্ন ১১৪। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি কি ফুল ভালবাসেন?

উত্তর ঃ শুভ্র ও সুগন্ধিযুক্ত ফুল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। অবশ্য সুবাসযুক্ত নানা রঙের ফুলও নিবেদন করা যায়, তবে রক্তবর্ণ, গন্ধহীন, অকালে উৎপন্ন, ভূপতিত—এরূপ ফুল ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত নয়।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

কীটকোষোপবিদ্ধানি শীর্ণ পর্য্যুষিতানি চ।
বর্জয়েদূর্ণনাভেন বাসিতং যদি শোভন ॥
গন্ধবন্ত্যপি চিত্রাণি উগ্রগন্ধীনি বর্জয়েৎ।
গন্ধহীনমপি গ্রাহ্যং পবিত্রং যৎ কুশাদিকং ॥

'পোকায় কাটা বা পোকা-লাগা, দূষিত, জীর্ণশীর্ণ, বাসী, মাকড়সা বাসা করেছে, এই ধরনের ফুল দিয়ে ভগবানের পূজা অর্চনা নিষিদ্ধ। সুগন্ধি হলেও অপবিত্র এবং উগ্র গন্ধযুক্ত ফুল প্রদান করা অকর্তব্য।'

বৈহায়স পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে, শ্রীহরির পূজার জন্য চতুষ্পথ, মহাদেবের বাসস্থান এবং শ্মশান-ভূমি থেকে কোনও ফুল-ফলাদি গ্রহণ করতে নেই। জ্ঞানমালা শাস্ত্রে বলা হয়েছে সাধারণত কুঁড়ি অর্থাৎ, যে ফুল বিকশিত হয়নি, এরূপ ফুল নিবেদন করা উচিত নয়। তবে চাঁপা, যূথী, মল্লিকা, জাতি ইত্যাদি ফুলকলির গন্ধও অতি উত্তম বলে ভগবানকে নিবেদন করা যায়। সাধারণত বাসী ফুল নিবেদনের অযোগ্য হলেও পদ্ম, বক, বকুল ফুল বাসী হলেও দোষ হয় না। তবে মলিন, আঘ্রাণ নেওয়া হয়েছে, এমন ফুল ভগবানকে দিতে নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই যে, শাস্ত্রে কতকগুলি ফুল ভগবানকে নিবেদন করতে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলির কিছু নাম দেওয়া হল—ধুতুরা, অর্ক, করবী, ঝিণ্টি, গিরিকর্ণিকা, কণ্টকারি, শাল্মলী, শিরীষ, কালকূটজ—এই সকল ফুলে কখনও শ্রীহরি প্রীত হন না।

প্রশ্ন ১১৫। 'যত মত তত পথ' কথাটি কি সত্যই বিপজ্জনক?

উত্তর ঃ সাধুর মত বৈকুণ্ঠের পথ, অসাধুর মত নরকের পথ। যদি কেউ বলে যে, 'একই গন্তব্য স্থলে আমরা যে কোনও মতে যে কোনও পথে গিয়ে পৌঁছতে পারি, তবে কথাটি সত্য হলেও কলিবদ্ধ মানব-সমাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ধারণা। উদাহরণ যোগে কথাটি বুঝতে সহজ হবে। কোনও রোগী হাসপাতালে যেতে চায়। সে হেঁটে হেঁটে হাসপাতালে পৌঁছতে পারে, কিংবা গাড়িতে করেও হাসপাতালে পৌঁছতে পারে। সে গরুর গাড়িতে করেও হাসপাতালে পৌঁছতে পারে। সে তার বাড়ির উত্তর দিক দিয়ে সোজা হাসপাতালে পৌঁছতে পারে, নতুবা সব দিক ঘুরে বিরাট দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরে ফিরে হাসপাতালে পৌঁছতে পারে। এত মত-পথ ধরার মধ্যেও একটা ব্যাপারে চিন্তা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে বুদ্ধিমান, সে চত্বর ঘুরতে যাবে না, সে সোজা পথটাই বেছে নেবে। রোগীর পক্ষে চত্বর ঘুরতে ঘুরতে একটু একটু করে হাঁটতে হাঁটতে পরে হাসপাতালে পৌঁছানোর আশা করা অবশ্যই বিপজ্জনক। তেমনই জড় সংসারবদ্ধ সদা উদ্বিগ্ন ভবরোগগ্রস্ত জীবের পক্ষে যে কোনও মত ধরে নিয়ে যে কোনও পথে এসেই ভগবদ্ধামে পৌঁছানোর আশা করা বৃথা।

তাই, আমাদের মহাজন নির্ধারিত পন্থায় যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মহাভারতে, শ্রীমদ্ভাগবতে এবং সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে। ভাগবত নির্দিষ্ট দ্বাদশ মহাজন সকলেই শ্রীকৃষ্ণভক্তিময় জীবনযাপন করতে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, যা একমাত্র পন্থা। শ্রীকৃষ্ণভক্তি ছাড়া অন্য কোনও পথ যথার্থ নয় বলে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥

"ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভ্রাম্যমান জীবদের পক্ষে বাসুদেব শ্রীহরির প্রেমময়ী সেবার পন্থা ব্যতীত ভবসংসার চক্র থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর অন্য কোনও মঙ্গলময় পথ নেই।" (শ্রীমদ্ভাগবত ২/২/৩৩)

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (১২/৫) বলা হয়েছে, "যারা পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, অর্থাৎ যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করে, তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে নানাবিধ ক্লেশ আর দুঃখদুর্দশা ভোগ করে থাকে।" *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্।*

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (৭/১৯) আরও বলা হয়েছে, "যারা জ্ঞানযোগ সাধনা করেন তাঁরা বহু জন্ম-জন্মান্তর অতিবাহিত করার পর শেষে জানতে পারেন যে, বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর পরম কারণ।"

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (৬/৪৭) আরও বলা হয়েছে, "যত রকমের যোগ পন্থা রয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগপন্থা তিনিই গ্রহণ করেছেন, যিনি ভগবানের ভক্তিময় সেবায় যুক্ত হয়েছেন।"

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (৯/২৫) বলা হয়েছে, "বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজকেরা সেই সেই দেব-দেবীর লোকেই গমন করেন, পিতৃপুরুষের পূজকেরা পিতৃলোকে গমন করেন, ঘোর জড়বাদীরা জড় জগতেই অবস্থান করে, কিন্তু ভগবানের ভক্তরা অন্তিমে ভগবদ্ধামে উন্নীত হন।"

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার (১৮/৬৬) চরম উপদেশ হচ্ছে, "সব ধর্ম পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ আত্ম-উপলব্ধির এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া।"

সুতরাং, উন্মত্তের মতো যে কোনও মত-পথ গ্রহণ না করে শাস্ত্রীয় নির্দিষ্ট মহাজন প্রদর্শিত মত-পথে জীবন পরিচালিত করাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন ১১৬। গুরু ছেড়ে যে গোবিন্দ ভজে। সেই পাপী নরকে মজে ॥" এ কথার তাৎপর্য কি? যাদের গুরুদীক্ষা হয়েছে তারা কি গোবিন্দভজনা করতে পারবে না?

উত্তর ঃ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়ে গোবিন্দ ভজনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রে। "আশ্রয় লৈয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ ॥" গুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। তিনি জগতের বদ্ধজীবকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্যই জগতে এসেছেন। তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়জন। তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌জ্ঞানে পূজা করতে হয়। কৃষ্ণের ভক্তের চরণে বদ্ধজীব আশ্রয় গ্রহণ করে কিভাবে কৃষ্ণভজন করতে হয় তা শিক্ষালাভ করেন এবং পরিণামে কৃষ্ণধামে গতি লাভের সুযোগ হয়। কিন্তু সেই ভগবদ্‌প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবকে অবজ্ঞা করলে বা ত্যাগ করলে শ্রীগোবিন্দ আমাদের উপর প্রসন্ন হন না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদো
যস্য প্রসাদান্ ন গতিকুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশাস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

অর্থাৎ, "সেই গুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি, যিনি প্রসন্ন হলে ভগবানও প্রসন্ন হন, যিনি প্রসন্ন না হলে আমাদের আর কোনও গতি থাকে না, সেই গুরুদেবকে ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান ও স্তব করি।" সেই জন্য বলা হয়েছে গোবিন্দের প্রিয়জন গুরুদেবকে বাদ দিয়ে গোবিন্দভজনা করলে গুরু-অপরাধফলে নরকগতি হয়।

প্রশ্ন ১১৭। কৃষ্ণভক্তিতে অপরাধ কিভাবে হয়?

উত্তর ঃ আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট কি না, সেই বিচার-ভাবনা না করে অন্য বিষয়ে মন গেলে ভক্তিতে অপরাধ আসে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'সজ্জন তোষণী' তে (১০/১০) উল্লেখ করেছিলেন যে, পরের দুঃখ-কষ্ট দেখে যার মজা লাগে, অন্যের ক্ষতি করবার যার চেষ্টা রয়েছে, নিজের সম্মান প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস আছে, সেই সমস্ত ভক্তিবিঘ্ন সৃষ্টিকারী প্রবৃত্তিতে যারা পরিচালিত হচ্ছে এবং পরের সমালোচনা করেই চলেছে, তারাই ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধী।

প্রশ্ন ১১৮। বেদান্ত সিদ্ধান্তে বলে যে, নিজের ওপরে পূর্ণ বিশ্বাস রাখা উচিত। এই আত্মবিশ্বাসই সমস্ত উন্নতির মূল। গীতাতে গোবিন্দ বলেন যে, আমার চরণেই পূর্ণ বিশ্বাস করো। তা হলে বেদান্ত মতে আত্মবিশ্বাসের কি ঘাটতি হচ্ছে না?

উত্তর ঃ 'বিশ্বাস' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'শ্রদ্ধা'।

'শ্রদ্ধা' শব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥

আমরা কৃষ্ণে ভক্তি করে চলব, তা হলে কোনও অভাব হবে না। সব কর্মই সম্পাদিত হয়ে যাবে তাঁর কৃপাতে। কৃষ্ণ আমাকে সমস্ত প্রতিকূল প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করবেন—এই বিশ্বাস। *রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো।* এইভাবে গোবিন্দের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস হচ্ছে শরণাগত ভক্তের লক্ষণ।

অসুরেরা গোবিন্দকে বাদ দিয়ে নিজেই সব কিছু—নিজেই হর্তা-কর্তা-বিধাতা, নিজের ক্ষমতার প্রতি এমন প্রচণ্ড আস্থা বা বিশ্বাস রাখে। অসুর হিরণ্যকশিপু বলেছিল 'আমিই একমাত্র হর্তা কর্তা বিধাতা।' অসুর রাবণ বলেছিল 'বলপ্রয়োগ করে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আমিই একচ্ছত্র সম্রাট হব।' কিন্তু তাদের অকালমৃত্যুর সন্ধিক্ষণেই তারা বুঝতে পেরেছিল, হায়! তীব্র আত্মবিশ্বাস আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

'আমার আর যাই হোক, গোবিন্দের অভয় চরণ কিছুতেই ছাড়ব না'—এই 'যথার্থ আত্মবিশ্বাস' সর্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের মতো জড়বদ্ধ পতিত জীবদের। অন্যথায় গোবিন্দ ছাড়া নিছক আত্মবিশ্বাসের কিসের মূল্য?

আপনি যদি তর্ক করেন, 'গোবিন্দ নয়, আত্মবিশ্বাসই বড় কথা। আত্ম অর্থাৎ, আমিই সব কিছু করতে পারি, আমিই সঠিক জ্ঞানী পণ্ডিত। গোবিন্দ কিছুই নয়'—তা হলে তর্কবাদী সেরূপ আত্মবিশ্বাসীর উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্তের কথা হল—বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ, এই কথা সর্ব বেদে বলা হয়েছে। আর আমি কখনও স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি না। অথচ আমি কেবল আমাতেই আস্থা ভরসা শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস রাখছি—এই রকম আত্মবিশ্বাস কখনই যথার্থ বুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

বেদান্তের সিদ্ধান্তে কখনও বলে না যে, গোবিন্দের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা রাখলে কি আত্মবিশ্বাসের নাকি ক্ষতি হয়—এরকম কুসিদ্ধান্ত কোনও শাস্ত্রেই বলে না।

অধিকন্তু, ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিদের কখনও গোবিন্দের প্রতি বিশ্বাস হয় না সেই কথাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে। যেমন পদ্মপুরাণে দেবর্ষি নারদের উক্তি, "হে রাজন্! স্বল্পপুণ্যবান ব্যক্তির কখনও চিন্ময় বিষয়ে—গোবিন্দ, গোবিন্দের মহাপ্রসাদ, গোবিন্দের নাম, গোবিন্দের ভক্ত—এ সবের প্রতি বিশ্বাস জন্মায় না।"

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতান্ রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

প্রশ্ন ১১৯। অনর্থ কাকে বলে? সাধন ভজনে অনর্থ কিভাবে আসে?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণের সেবাকার্যে হৃদয়ের কামনাবাসনা নিযুক্ত না হয়ে ভক্তিবিমুখ হয়ে অন্য বিষয়ে ধাবিত হয়, তাই-ই অনর্থ।

এই অনর্থ চার প্রকারের। যথা—

১) স্বরূপ-ভ্রম—মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন, জীবের স্বরূপ পরিচয় হচ্ছে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক। কিন্তু কৃষ্ণসেবা ভুলে সে অন্য কিছু চিন্তা করতে থাকে। সে মনে করতে থাকে এই জড় দেহ সম্বন্ধীয় পরিচয়টিই সব কিছু।

২) অসৎ-তৃষ্ণা—জড় বস্তুকেই 'আমি ও আমার' এই ভাব করে জড় দেহ মাধ্যমে জড় বিষয় ভোগ বাসনাই অসৎ-তৃষ্ণা। ধনজন, স্বর্গ ও ইন্দ্রিয়তর্পণসুখ সবই অসৎতৃষ্ণা। অসত্যের প্রতি অনিত্যের প্রতি আকর্ষণ থাকার জন্যে পরমসত্যের প্রতি আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়।

৩) অপরাধ—নাম অপরাধ, ধাম অপরাধ, সেবা অপরাধ হেতু সাধন-ভজনে আগ্রহ নষ্ট হয়। ভক্তি নষ্ট হয়।

৪) হৃদয়দৌর্বল্য—গড়িমসি ও আলস্যভাব। ইতর বিষয়ে মনোনিবেশ। দুঃখশোকে চিত্ত বিভ্রম। কুতর্কে যুক্ত হওয়া, জাতি-ধন-বিদ্যা-জন-রূপ-বল ইত্যাদির দর্প, ধর্মহীন ব্যক্তির উপদেশে পরিচালিত হওয়া, বৈষ্ণব অভিমান, কনক-কামিনী ইত্যাদির অভিলাষে অন্যের প্রতি অত্যাচার। কুসংস্কার শোধনে অযত্ন, মাৎসর্য ভাব ইত্যাদি থেকে হৃদয়দৌর্বল্য অনর্থ উদিত হয়। ফলে ভজন প্রতিকূল কার্যে বা অসৎ সঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মায়। তখন সাধনভজন শুদ্ধ হয় না।

প্রশ্ন ১২০। হরিমন্দির ও তুলসীমঞ্চ—এ দুয়ের মধ্যে কেবল পিতৃ ও মাতৃ সম্বন্ধে অথবা আকৃতি ও প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য আছে কি না জানতে চাই।

উত্তর ঃ মন্দির আর মঞ্চের পার্থক্য নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। হরি আর তুলসীর পার্থক্য জানতে চাইছেন। হরি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তুলসী হচ্ছেন ভগবানের প্রিয় সেবিকা। তুলসী হরির আরাধনা করেন। শ্রীহরির পাদপদ্ম ছাড়া তুলসীদেবী অন্য কোথাও প্রীত হন না। লীলা বিলাস ক্ষেত্রে ধরাতলে তুলসীদেবী নদী ও বৃক্ষরূপে প্রকাশিতা এবং শ্রীহরি বিগ্রহ ও শিলা রূপে বিরাজমান। তুলসীদেবী কারও প্রতি প্রীত হলে তাকে অনাবিল হরিভক্তি প্রদান করেন। আবার, হরিভক্ত দেখলে তুলসীদেবী অত্যন্ত প্রীত হন। শ্রীহরি কারও প্রতি প্রীত হলে তাকে আত্মসম জ্ঞান করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই যে, কলিযুগের মানুষ বৃক্ষরূপা তুলসীতে জল প্রদান করে, প্রণাম করে, পূজা করে। কিন্তু হরিভক্তি বিমুখতার ফলে তুলসী তাদের প্রতি প্রসন্না হন না। কারণ লোকে তুলসীসেবা করলেও হরিপ্রসাদ গ্রহণ করার পরিবর্তে মাছ-মাংস-ডিম ইত্যাদি অমেধ্য দ্রব্য ভক্ষণে আকৃষ্ট থাকে।

অনেকেই দেখে থাকবেন, আগেকার ঐতিহ্য অনুসারে নিয়ম-নিষ্ঠা পরায়ণা মাতাজীরা তুলসী পূজা করতেন এবং শুষ্ক তুলসী কাষ্ঠের মালা নিয়ে হরিনাম জপ করতেন। এমনকি কোনও ব্যক্তির কণ্ঠে তুলসী কাষ্ঠের মালা দেখে তাঁকে হরিভক্তি পরায়ণা বলে মনে করা হত। অন্য সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত। শ্রীমদ্ভাগবতেও উল্লেখ রয়েছে তুলসী মালা পরিহিত ব্যক্তির প্রতি হরিভক্ত জ্ঞানে যমদূতেরা প্রণতি নিবেদন করে থাকেন।

প্রেমভক্তি প্রদায়িনী শ্রীতুলসীমহারাণীর সেবাপূজার তাৎপর্যই হল হরিভক্তি লাভ করা। যদি আমরা হরিনাম জপকীর্তন না করি, আমিষ-নেশা-জুয়া-অবৈধসঙ্গাদি পাপস্তম্ভ এড়িয়ে না চলি তবে তুলসী আরাধনার ফলটি কোথায়—সেটিই বিবেচ্য।

প্রশ্ন ১২১। মন্দির পরিক্রমার ফল কি?

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে পুরাণে একটি সুন্দর কাহিনী রয়েছে।

গাছের উপরে একটি পাখি বসেছিল। দূর থেকে এক শিকারী সেই পাখিটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। পাখির ডানার কিছু অংশ তীরের ফলায় কেটে যায়। আহত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে পাখিটি নীচে পড়ে যায়। পাশেই ছিল এক কুকুর। সে আক্রমণে উদ্যত হয়ে পাখিটার দিকে দৌড়ে যায়। ভয়ে ও যন্ত্রণায় আকুল হয়ে পাখিটি প্রাণপণে উড়ে পালাবার চেষ্টা করে। কাছেই ছিল শ্রীবিষ্ণুমন্দির। কি করে কোন্ দিকে পালাবে বুঝতে না পেরে পাখিটি এক পাক মন্দির পরিক্রমা করেই মাটিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বৃহৎ নারদীয় পুরাণে এই কাহিনী বলা হয়েছে। সেই পাখি ভগবানের মন্দির পরিক্রমার ফলে ইহ জন্মে পাখি-শরীর ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠ জগতে ফিরে যায়।

প্রশ্ন ১২২। জন্ম ও মরণ-অশৌচকালে গৃহদেবতার পূজার্চনা-আরতি, জপ বন্ধ করে দেওয়া উচিত কি?

উত্তর ঃ স্মার্তমতে যে পন্থা থাক না কেন, বৈষ্ণবীয় ধারায় গৃহদেবতার পূজা বন্ধ করে দিয়ে অশৌচ পালিত হয় না। বৈষ্ণবেরা হরিনামে দীক্ষিত। তাঁরা বিষ্ণুপূজা পরায়ণ। শ্রীবিষ্ণুর পূজার্চনা, নাম কীর্তন চললে সেই গৃহের বা সেই বংশের যারই জন্ম হোক কিংবা মৃত্যু হোক তাতে মঙ্গলই হয়।

জন্মকালে কিংবা মরণকালে অশৌচ প্রভাব দূর করবার উদ্দেশ্যেই পবিত্র শঙ্খধ্বনি কিংবা হরিধ্বনি করবার প্রথা এখনও জনসমাজে প্রবর্তিত হয়ে আসছে। মানুষ তার অশুচি মানসিকতার জন্যই অশৌচ-কালে পূজার্চনা বন্ধ করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরির পূজার্চনাতে, নাম কীর্তনে কখনই কোনও বাধা নেই। বৃহন্নারদীয় পুরাণে অদিতিমাহাত্ম্যে শ্রীল সূত গোস্বামী বলেছেন—

যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে।
রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি॥
প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহ বালগ্রহাস্তথা।
ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চকং॥

"যেখানে বিষ্ণুপূজা পরায়ণ লোকেরা বাস করে থাকেন, সেখানে কোনও বিঘ্নবাধা থাকে না, সেখানে রাজা, চোর, ব্যাধির কোনও উপদ্রবই থাকে না। প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, গ্রহ, ডাকিনী, রাক্ষস ইত্যাদি কেউই বিষ্ণু-অর্চনাকারীর অনিষ্ট করতে পারে না।" *সম্পূজয়েন্নিত্যং*—সর্বদাই পূজার্চনা করতে হবে।

কোনও কারণে শ্রীহরির আরাধনা বন্ধ করে দেওয়া দরকার—কোনও শাস্ত্রেই এই ধরনের বাজে কথার উল্লেখ নেই। শ্রীকূর্মপুরাণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

ন বিষ্ণ্বারাধনাৎ পুণ্যং বিদ্যতে কর্ম বৈদিকং।
তস্মাদনাদিমধ্যান্তং নিত্যমারাধয়েদ্ধরিং ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১/৭৪)

"ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা কোনও প্রকার পুণ্যজনক বৈদিক অনুষ্ঠান নেই। সেইজন্য আদি-মধ্য-অন্তবিহীন নিত্য শ্রীহরির আরাধনা করা কর্তব্য।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীবাস ঠাকুর এবং শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের পুত্রের মৃত্যুর পর কি হরিনাম জপকীর্তন বাদ দেওয়া হয়েছিল, নাকি বিগ্রহ পূজার্চনা বন্ধ করা হয়েছিল? বরং গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর পুত্রশোকে পূজার্চনাদি সব ক্রিয়াকর্ম করতে ভুলে গিয়েছিলেন বলেই তাঁর অর্চা বিগ্রহ গোপীনাথ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'একটি পুত্র মারা যেতে তুমি শোকাচ্ছন্ন হয়ে আমাকেও না খাইয়ে মেরে ফেলতে চাইছ।' এ থেকে বোঝা যায়, শ্রীহরি আরাধনার প্রভাবে বৈষ্ণবের জন্ম-মরণ-অশৌচ বলে কিছু নেই।

প্রশ্ন ১২৩। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তি যদি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করে, পুনরায় তাঁকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ কোনও সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় করে তবে কী তার রৌরব গতি হবে?

উত্তর ঃ দীক্ষাগুরু একজন হন। শিক্ষাগুরু বহুজন হতে পারেন। একজন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁকে ত্যাগ করে অন্য আর এক কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনের কাছে দীক্ষিত হওয়া কোনও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কর্তব্য নয়। এমনকি দ্বিতীয় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জনও তাঁকে পুনরায় দীক্ষা দিতে কখনই রাজী হবেন না। গৌড়ীয় ভাবধারায় হরিনামে দীক্ষিত হওয়ার পর কোনও ব্যক্তির গুরুদেবের প্রকট অবস্থায় অন্য কারও কাছে ব্রাহ্মণদীক্ষা গ্রহণ করা কখনই মঙ্গলময় নয়। গুরু-অপরাধ ফলে সদ্‌গতির সম্ভাবনা থাকে না।

প্রশ্ন ১২৪। প্রতিদিন হরিমন্দিরে চরণামৃত পানের ফল কি?

উত্তর ঃ শ্রীহরির চরণামৃত গ্রহণে সর্বপ্রকার ভয় ও উদ্বেগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীহরিচরণামৃত গ্রহণেই সর্বতীর্থফল লাভ হয়।

প্রশ্ন ১২৫। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির ও অর্জুন দুর্গাস্তব করে যুদ্ধজয়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হলেন। ভগবান যাঁদের সহায় তাঁদের এমন স্তব করার তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত আসুরিক প্রকৃতির লোকদের দমন করতে স্বয়ং ভগবতী দুর্গাই যথেষ্ট। অসুর দমন করতে ভগবানকে ধরাতলে অবতরণ করার প্রয়োজন নেই। তবুও ভক্তদের আহ্বানে তিনি এসেছেন অসুরদমন লীলা করতে। তাতে দুর্গাদেবী আরও বেশী প্রসন্না হয়েছেন—সাক্ষাৎ সেই প্রমাণ প্রদর্শন করবার জন্যই ভগবতী স্তবাদি ব্যাপার।

প্রশ্ন ১২৬। পাপফল কি পুণ্যকর্মের মাধ্যমে খণ্ডণ করা যায়? না কি পাপ ও পুণ্যের হিসাব আলাদা থাকে?

উত্তর ঃ পাপ ও পুণ্য—দুটি ফল ভোগের জন্যই এই জড়জাগতিক জীবনপ্রবাহ। দুই ফলই ভোগ করতে হয়। কিন্তু *কর্মাণি নির্দহতি ভক্তিভাজান্* (ব্রহ্মসংহিতা)—কৃষ্ণভক্তিময় জীবন যাপন করলে অচিরেই পাপ-পুণ্যের হিসাব নষ্ট হয়ে যায়। তখন ভক্তিফল লাভ হেতু পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে চিৎজগতে উন্নীত হওয়া যায়।

প্রশ্ন ১২৭। অব্রাহ্মণরা কৃষ্ণপূজা গীতাপাঠ করতে পারে কি?

উত্তর ঃ যাঁরা নিয়মিত কৃষ্ণনাম জপ করছেন এবং আমিষ-জুয়া-নেশাদ্রব্য-অবৈধ মেলামেশা বর্জন করে চলেছেন তাঁরা কৃষ্ণপূজা গীতাপাঠ করতে পারবেন। কলিযুগে স্বভাবত সবাই শূদ্র হলেও কৃষ্ণনামগ্রহণ ও চারটি কলিকর্ম বর্জনকারীর যে-কুলে জন্ম হোক না কেন ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্য।

প্রশ্ন ১২৮। অদীক্ষিত ব্যক্তি গীতাপাঠ কৃষ্ণপূজা করলেও স্বর্গ বা মোক্ষ কোনই লাভ হয় না। তার অধোগতি হয়। এটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ দীক্ষিত হওয়া পারমার্থিক বিষয়ে উচ্চতর পর্যায় বটে। কিন্তু দীক্ষা না নিয়ে গীতাপাঠাদি করলে অধোগতি হবে—এরকমটি বাজে কথা। নিত্য কৃষ্ণসেবাই জীবের ধর্ম। কৃষ্ণসেবাই মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। এছাড়া সবই তো বিকৃতবৃত্তি। কৃষ্ণসেবা-মনোভাবই ভক্তি। ভক্তের কাছে স্বর্গ ও মোক্ষ অতি তুচ্ছ। ভক্তি তার বহু বহু ঊর্ধ্বের বিষয়।

প্রশ্ন ১২৯। সারাদিন ঝিমুনি বা নিদ্রালুতা থেকে কিভাবে মুক্ত থাকা যায়?

উত্তর ঃ অনেকে বলেন, সকালে খালি পেটে ঈষৎ উষ্ণ এক গ্লাস জলে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খেলে সারাদিন আলস্য ও ঝিমুনিভাব থাকে না। পেট ভর্তি করে অন্ন আহার করা উচিত নয়। মানসিক ও কায়িক পরিশ্রম করারও প্রয়োজন আছে। রাত্রে ঘুম হালকা হলেই দিনের বেলায় ঘুম পাবে। বিশেষ বিশেষ কর্ম সমাধা করার সংকল্প এবং অনুশীলন চলতে থাকলে ঘুম আসে না।

প্রশ্ন ১৩০। হরিনাম জপ কীর্তন, নিরামিষ আহার, সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদিতে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয় কেন? কিভাবে এসব বাধা অতিক্রম করে ভক্তজীবন গ্রহণ করা যায়?

উত্তর ঃ বাধাগুলিকে এক রকমের পরীক্ষারূপে গ্রহণ করতে হয়। ভক্তিপন্থা গ্রহণের ঐকান্তিক মানসিক আগ্রহ রয়েছে কিনা তা ভগবানের মায়াশক্তি নানা বাধাবিঘ্ন দিয়েই ভক্তকে বারে বারে পরীক্ষা করেন। আগ্রহই সব বাধাকে পরাজিত করে।

প্রশ্ন ১৩১। ভক্তিরাজ্যে কি গুরুগ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন?

উত্তর ঃ ভক্তির ৬৪টি অঙ্গের কথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ ব্যাখ্যা করেছেন। সর্বপ্রথম পরপর তিনটি অঙ্গ হল—(১) কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্বজ্ঞ গুরুদেবের

পাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে, (২) শ্রীগুরুদেবের নিকট থেকে কৃষ্ণভক্তিশিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে ও (৩) শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রীগুরুদেবের সেবা করতে হবে।

ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের জন্য অবশ্যই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরুদেবের আশ্রয়ে থাকতে হবে। পূর্বতন সমস্ত ভক্তদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁরা পারমার্থিক গুরুদেবের নির্দেশমতো জীবন অতিবাহিত করে পরম গতি লাভ করেছেন।

প্রশ্ন ১৩২। শ্রীল রূপগোস্বামী বলেছেন ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ অঙ্গ হল মথুরায় বাস করা। তা হলে সবাইকে কি মথুরায় বাস করতে হবে?

উত্তর ঃ সাধারণ স্থান অপেক্ষা ভগবান শ্রীহরির জন্মস্থানে বাস করার বিশেষ মাহাত্ম্য তো আছেই। যেমন মায়াপুর সাক্ষাৎ মথুরা—ভগবান শ্রীহরির গৌররূপে জন্মগ্রহণ লীলার স্থান। অপ্রাকৃত ধাম। সশরীরে ধামবাসের সুযোগ না পেলেও মানসে ধামবাস করার মাহাত্ম্যও কম নয়। ধাম দর্শন, ধামের কথা শ্রবণ, ধামকথা কীর্তন, ধামের কথা স্মরণ, ধামসেবা, ধামবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে যেখানেই থাকা হোক না কেন ধামবাসেরও ফল লাভ করা যাবে। ধামে বসবাস করতে না পারলে আপাতত ধাম দর্শন, ধাম স্মরণ করা কর্তব্য।

প্রশ্ন ১৩৩। প্রকৃত সাধু কে চিনব কিভাবে?

উত্তর ঃ কার্যকলাপ দেখে চেনা যাবে। অনেক সময় কে চোর চেনা যায় না, গোয়েন্দাগিরি করে চোর চিনতে হয়। তেমনই সাধুকে চিনতে হয় বিভিন্ন সময়ে তাঁকে লক্ষ্য রেখে—তিনি কি করছেন, তিনি কৃষ্ণভক্তি বিরুদ্ধ কোনও আচরণ করছেন কিনা, পরীক্ষা করা যেতে পারে। অবশ্য সাধুত্বের মান কম বেশী উন্নত হতে পারে। প্রকৃত সাধু তিনি, যিনি ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভক্তি আচার এবং প্রচারে নিযুক্ত।

প্রশ্ন ১৩৪। বৈষ্ণব কে?

উত্তর ঃ *বিষ্ণুর্পিতাখিলাচারঃ স হি বৈষ্ণব উচ্যতে ॥*

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণকমলে যিনি নিখিল কর্ম সমর্পণ করেছেন, তিনিই বৈষ্ণব। (স্কন্দ পুরাণ)

প্রশ্ন ১৩৫। আমাদের সাধনভজনে বহু অনর্থ এসে উপস্থিত হয়। অনর্থের কারণগুলি বলুন।

উত্তর ঃ জীবের কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃতি এবং সংসার-বন্ধনের কারণকেই অনর্থ বলে। এই অনর্থ চার রকমের।

১) দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ ঃ কুকর্ম জনিত সাংসারিক দুঃখ প্রভৃতিকে দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ বলে। এর ফলে ভজনের বহু বিঘ্ন উৎপন্ন হয়।

২) সুকৃতোত্থ অনর্থ ঃ পুণ্য কর্মের ফলে সংসারে ধন, ঐশ্বর্য, আত্মীয়স্বজন, লাভ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি হয়। এর ফলে মন সেই সব বিষয়ে আবিষ্ট থাকার দরুণ ভজন সাধন বিঘ্নিত হয়।

৩) অপরাধোত্থ অনর্থ ঃ নাম-অপরাধ, ধাম-অপরাধ, সেবা-অপরাধ থেকে ভজনে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

৪) ভক্ত্যুত্থ অনর্থ ঃ ভজন-সাধন করার ফলে ভক্তিদেবী সাধককে পরীক্ষার জন্য লাভ, পূজা, মান, প্রতিষ্ঠা দান করেন। লোকেরা সাধককে প্রণতি নিবেদন করতে থাকে, পূজা করতে থাকে, বহু প্রণামী দান করে। তখন যদি সাধক মনে করে 'আমি ভক্তির উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছি।' তা হলে তার ভজন সাধন বিঘ্নিত হবে।

প্রশ্ন ১৩৬। আমরা এত শাস্ত্রবিধি বুঝি না, মনে মনে ভগবানকে ডাকি। কত মালা জপ করতে হবে, কত বিধিনিষেধ পালন করতে হবে, এসব চিন্তা করি না। জীবনে যা প্রয়োজন তা করে চলব, সময় বিশেষে একান্তভাবে শ্রীহরিকে স্মরণ করলেই হল। —এ ধরনের কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের জানিয়েছেন কে ভগবান, ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক, কেমনভাবে জীবন যাপন করতে হয়, কেমনভাবে ভগবানকে ডাকতে হয়, সেই সমস্ত শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরাই শাস্ত্রবিধি অনুসরণের পন্থা দিয়েছেন। আর আমরা যদি সেইসব বরবাদ করে দিয়ে কেবলমাত্র ঐকান্তিক মনে আমাদের মনগড়া ভগবদ্‌ভক্তি করতে থাকি তাহলে সেই পন্থাকে ভক্তি বলে না, তাকে বলে উৎপাত।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

অর্থাৎ, "উপনিষদ, পুরাণ, নারদপঞ্চরাত্র ইত্যাদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র-বিধির অনুগামী না হয়ে যে ভাবপ্রেম দেখিয়ে ঐকান্তিক হরিভক্তি, তা কেবল সমাজে উৎপাতেরই সৃষ্টি করে।" (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব ২/১০১)

প্রশ্ন ১৩৭। কে গুরু হতে পারেন?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

গুরুর্ন স স্যাৎ...ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ।

"যিনি তাঁর আশ্রিত জনকে জন্ম-মৃত্যুর সংসার আবর্ত থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাঁর গুরু হওয়া উচিত নয়।" (ভাঃ ৫/৫/১৮) জগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতা পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে তত্ত্বগতভাবে যিনি জানেন তিনিই গুরু। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—

যে-ই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সে-ই গুরু হয় ॥

"যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বগতভাবে জানেন তিনি গুরু হওয়ার যোগ্য।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৭)

বহু পাণ্ডিত্য থাকলেও ভগবদ্‌ভক্তিহীন ব্যক্তি কখনও গুরু হতে পারে না। শ্রীপদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

ষট্‌কর্ম-নিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

"যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম নিপুণ এবং মন্ত্র-তন্ত্র বিশারদ ব্রাহ্মণ হলেও তিনি যদি বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ না হন, তবে গুরু হওয়ার যোগ্য নন। কেউ যদি চণ্ডালকুলে প্রকটিত হয়েও বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণব হন, তবে তিনি গুরু হওয়ার যোগ্য।" (পদ্মপুরাণ) কে বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে তত্ত্বগতভাবে জানতে পারে? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—"ভক্তির দ্বারাই কেউ আমাকে জানতে পারে।" এই জন্যে বলা হয়, যে কৃষ্ণভক্ত নয় সে গুরু-ই নয়।

শ্রীগুরুদেবের প্রথম পরিচয় হল তিনি ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণভক্ত। তিনি কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়। তাঁর কৃপাতে তাঁর আশ্রিত জন এই জন্ম-মৃত্যু ভবসংসার অতিক্রম করে ভগবৎ পাদপদ্মে উপনীত হতে পারে। সেইজন্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—

"শ্রীগুরুচরণ পদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে ।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥

কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক রকমের গুরু দেখা যায়, লেখা পড়ার গুরু, গানবাজনা শেখানোর গুরু। আবার পারমার্থিক গুরুও আছেন, যাঁরা কৃষ্ণভক্তই নন। তাঁরা প্রায়ই নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী, নতুবা তান্ত্রিক যোগী, কেউবা কিছু কিছু যোগ সিদ্ধি আয়ত্ত করে গুরুগিরি করে থাকেন।

যাদের কৃষ্ণপ্রসাদে মতি নেই, আমিষ আহারে বিরক্তি নেই, নেশাভাঙেও রুচি আছে, যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তনে রুচি নেই, নিরাকারের ধ্যান করতে পটু, পূজার্চনার বালাই নেই, যোগ ব্যায়ামাদিতে নিষ্ঠা, বৈদিক শাস্ত্রের অপব্যাখ্যাতে অভ্যাস আছে, কখনও কখনও নিজেকেই ভগবান কৃষ্ণ বলে জনসমক্ষে জাহির করতেও সাহস করে। জগতে এই ধরনের অনেক তথাকথিত গুরু প্রকাশিত হয়েছেন, তাদেরকে চিরকালের জন্য এড়িয়ে থাকাই শ্রেয়ঃ।

প্রশ্ন ১৩৮। কৃষ্ণ রুষ্ট হৈলে গুরু রাখিবারে পারে ।
গুরু রুষ্ট হৈলে কৃষ্ণ রাখিতে না পারে ॥
—এর মানে কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি কৃষ্ণচরণে অপরাধ করে ফেলে, তবে কৃষ্ণভক্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলে সে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে, তারপর আবার সুন্দরভাবে কৃষ্ণসেবা করতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত শ্রীগুরুদেবের চরণে কেউ যদি মহা অপরাধী হয় তবে শ্রীকৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন ১৩৯। ভগবানের পূজার্চনা করার আগে কোন কিছু ভোজন করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ বিষ্ণুধর্মোত্তর শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দিনের মধ্যে আগে পূজার্চনা করতে হবে তারপর ভোজন করাই বিধি।

প্রশ্ন ১৪০। কৃষ্ণভক্ত হইবার জন্য মন্দিরে আসিয়া অনেকেই গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ ও প্রতিকার সমূহ কি কি?

উত্তর ঃ গৃহ ছাড়িয়া কৃষ্ণভক্ত হইবার বাসনা লইয়া মন্দিরে আসিয়া পুনরায় যাঁহারা তাঁহাদের গৃহগুলিও কৃষ্ণভক্তিময় করিবার উদ্দেশ্যে গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং সপরিবার পরিকরে কৃষ্ণভাবনাময় সংসার গঠন করিতে যত্নপর হইয়াছেন তাঁহারা ধন্য। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণচিন্তা ছাড়িয়া পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা লইয়া কাল অতিবাহিত করিতেছেন তাঁহারা দুর্ভাগা। মন্দিরে আসিয়া সুখ-সুবিধা এবং বিষয়চিন্তা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার মনোবৃত্তি হারাইয়া যায়, যাহার ফলে মন্দির ছাড়িয়া কিংবা কাহারও আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে চলিবার মনোভাব পোষণ করিলে এই রকম মনোবৃত্তি আসিয়া পড়ে।

মন্দিরে কোনও একটি নির্দিষ্ট সেবাযত্ন করিবার মানসিকতা অপহৃত হইয়া থাকে সেইকালে, যেইকালে মনে করা হয় যে, আমি এক যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি, তথাপি আমাকে যথোচিত সম্মান না দিয়া হেয় করা হইতেছে,—এই প্রকার মনোভাবই সেবা করিবার স্পৃহা নষ্ট করিয়া ফেলে।

অতএব প্রতিকার সমূহ হইতেছে, আপনার মনগড়া চিন্তা না করিয়া কোনও কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার ব্যাপারে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নির্ভর করিতে হইবে। তাহা হইলে মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদিগকে হতাশ করিবেন না।

প্রশ্ন ১৪১। মেয়েরা কি শালগ্রাম বা গোবর্ধন শিলার পূজা করতে পারে?

উত্তর ঃ কলিকালে বৈষ্ণব দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে যে কেউ ভক্তি নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে, শালগ্রাম বা গোবর্ধন শিলার পূজা করতে পারে। আমিষ আহার, নেশাভাঙ ইত্যাদি যারা করে তারা আদৌ পূজা করার অধিকারী নয়। বহু উপচারে, গীতবাদ্য সহকারে, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রান্না করা নৈবেদ্য যোগে শালগ্রাম সেবা স্বীকার্য। নিষ্ঠাবতী মায়েরাও প্রতিদিন আপন আশ্রমে শালগ্রাম সেবা অবশ্যই করতে পারবেন। তবে বড় বড় মন্দিরে যেখানে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীরা নিয়মিত পূজা করেন, সেখানে সৌজন্য বশে মহিলারা 'আমরাও যোগ্য' বলে দাবী না করা কর্তব্য। এটি আচার্যদের শিক্ষা।

প্রশ্ন ১৪২। তিলক ও মালার বৈশিষ্ট্য কি? দীক্ষা নেওয়ার সময় তিলক ও মালা পরলাম কিন্তু তারপরে খুলে ফেললাম। তাতে কিছু ক্ষতি হবে কিনা? দীক্ষা ছাড়া কি তুলসী মালা গলায় পরা যায়?

উত্তর ঃ কণ্ঠে তুলসীকাঠের মালা এবং কপালে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক হচ্ছে বৈষ্ণবচিহ্ন। শাঁখা সিঁদুর দেখে বোঝা যায় যে সেই সতীর একজন পতি রয়েছেন। তেমনি তুলসীকাঠের মালা দেখে বোঝা যায় যে সেই মালাধারী ভক্তের একজন আরাধ্য প্রভু

রয়েছেন। মালাহীন গলা মানেই প্রভুছাড়া ব্যক্তি, তিলকহীন কপাল শ্মশান সদৃশ। যমদূতেরা তিলক মালা দেখলে ভয় পায় কারণ তারা মনে করে এই ব্যক্তি বিষ্ণুদূতের এখতিয়ারে বা অধিকারে। সুতরাং, তিলক মুছে গেলে পরতেই হয়। মালা ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেলে আবার নতুন মালা তৈরি করে ভগবানের চরণে নিবেদন পূর্বক পরিধান করতে হয়। দীক্ষার আগে ও পরেও তুলসী মালা ভগবদ্‌চরণে নিবেদন করে গ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্ন ১৪৩। পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হতে হলে কি ধরনের গুণ বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার?

উত্তর ঃ 'শ্রীউপদেশামৃত' গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাৎ তত্তৎকর্মপ্রবর্তনাৎ ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥

(১) উৎসাহ—ভজন সাধন অর্থাৎ, ভগবৎসেবা অনুশীলনে আগ্রহ, উৎসাহ।

(২) নিশ্চয়তা—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন এই দৃঢ় বিশ্বাসে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন।

(৩) ধৈর্য—ভগবৎ প্রেম লাভের জন্য ধৈর্য। ভক্তিজীবনে বিধিনিষেধ পালনে শিথিলতা না করা।

(৪) তত্তৎ কর্ম প্রবর্তন—ভগবানের নাম গুণ মহিমা শ্রবণ কীর্তন ইত্যাদি ভক্তি অনুকূল কর্ম সম্পাদন।

(৫) সঙ্গত্যাগ—নাস্তিক, মায়াবাদী, সহজিয়া, স্ত্রৈণ, অভক্ত, বিষয়ীর সঙ্গ ত্যাগ।

(৬) সতোবৃত্তি—পূর্বতন মহান বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ।

এই ছয়টি বিধি অনুসারে পারমার্থিক জীবন-যাপন করলে ভক্তিযোগে অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করা যাবে।

১৩

জগতের সঙ্গে সম্পর্ক

প্রশ্ন ১। কেউ কি পিতামাতার বিনা অনুমতিতে দীক্ষা নিতে পারে?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে পিতা-মাতা হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দান করবার জন্য তাঁদের সন্তানকে শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান যাতে এই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি পূর্ণ জড় জগৎ থেকে উদ্ধারের পন্থা শিখতে পারে। সেই রকম পিতা-মাতাই হচ্ছেন আদর্শ পিতা-মাতা। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে—

সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা ॥

মহান্ পিতা শ্রীঋষভদেব তাঁর শত পুত্রদের উপদেশ প্রদান করেছেন—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ ।
দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্ ॥

(ভাগবত ৫/৫/১৮)

"অনিবার্য মৃত্যুরূপ সংসার মার্গ থেকে যিনি তাঁর আশ্রিত জনকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাঁর পক্ষে গুরু, কিংবা স্বজন, কিংবা পিতা, কিংবা মাতা, কিংবা পূজনীয় দেবতা, কিংবা পতি হওয়া উচিত নয়।"

অর্থাৎ, প্রকৃত গুরুদেব, কিংবা প্রকৃত পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, কিংবা প্রকৃত আরাধ্য দেব কিংবা প্রকৃত সে-ই ব্যক্তি-ই হতে পারেন, যিনি তাঁর আশ্রিত জনকে শ্রীকৃষ্ণভক্তি শিক্ষাদানের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর দুঃখময় ভবচক্র থেকে উদ্ধার করতে পারেন। অন্যথায়, শাস্ত্রানুসারে তাঁরা কারও গুরু, পিতা, মাতা, বন্ধু, পতি হওয়ার অযোগ্য বলেই বিবেচিত হন।

দীক্ষার মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রতিনিধি গুরুদেব শিষ্যের হৃদয়মধ্যে ভক্তিলতাবীজ স্থাপন করেন। ভাগ্যবান না হলে কোনও জীব এই ভক্তিলতাবীজ প্রাপ্ত হন না। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৯/১৫১)

তবে, কোন্ পিতা-মাতা আছেন যে, তাঁর সন্তান ভাগ্যবান হোক—এটা চান্ না? আর, পিতামাতার অজ্ঞতা কারণে কোন্ সন্তান আছে, যে দুর্ভাগাই থাকতে চায়?

প্রশ্ন ২। অর্থই অনর্থ। কেন?

উত্তর ঃ অর্থের সার্থকতা হচ্ছে অর্থকে ভগবৎসেবায় নিয়োগ করে ভগবানের কৃপা হিসাবে তার ব্যবহার করা। কিন্তু বর্তমান জগতে অর্থের অসদ্ব্যবহারই নিছক নশ্বর তুচ্ছ ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের নিমিত্ত অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। ধর্মসম্পন্ন ব্যক্তি পিতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, বান্ধব সবার কাছে প্রিয় হয়। কিন্তু টাকা পয়সা শূন্য হয়ে থাকলে সকল প্রীতির আত্মীয়তা বিনষ্ট হয়। ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য অর্থ রোজগার করলে মানুষের যে দশা হয়, তা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে—"চুরি, হিংসা, মিথ্যাবাক্য, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, বিভেদ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্ত্রীবিষয়ক বিলাসব্যসন, তাস পাশা খেলার সামগ্রী ও মাদক দ্রব্য সংগ্রহ—এই পনেরো প্রকারের অনর্থ উপস্থিত হয়।" (ভাঃ ১১/২৩/১৮-১৯) আবার অনেক মূর্খ ব্যক্তি বহু কষ্টে অর্থ সঞ্চিত রেখেও ভোগ করতে পারে না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, পিতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি অতি প্রিয় ব্যক্তিরা অর্থশূন্য ব্যক্তিকে অবজ্ঞা ও হেয় করে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৩/২১) উল্লেখ আছে—

অর্থেনাল্পীয়সা হ্যেতে সংরব্ধা দীপ্তমন্যবঃ ।
ত্যজন্ত্যাশু স্পৃধো ঘ্নতি সহসোৎসৃজ্য সৌহৃদম্ ॥

অর্থাৎ, 'তারা সামান্য অর্থের জন্য ক্ষুভিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে শীঘ্রই তাদের সম্বন্ধ ছিন্ন করে এবং স্পর্ধাযুক্ত চিত্তে বন্ধুত্ব-আত্মীয়তা পরিত্যাগ করে ভাইয়ে ভাইয়ে বিনাশমূলক কাজে এগিয়ে আসে।' এটাই ভগবৎ-সেবাবিমুখ ইন্দ্রিয় তর্পণকারীদের অর্থের অনর্থকতা।

প্রশ্ন ৩। মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে আমি বাস করছি। তাদের সাথে, এমনকি আপনার সাথে আমার প্রকৃত সম্পর্ক কিরূপ?

উত্তর ঃ যতদিন আমাদের এই দেহ আছে, ততদিন দৈহিক সম্বন্ধে মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি সম্পর্ক থাকে মাত্র। কিন্তু যখন এই দেহ নষ্ট হয়ে যাবে, তখন জগতের সমস্ত রকমের সম্বন্ধ বিনষ্ট হয়। আবার নতুন কোনও অপরিচিত দেহ গ্রহণ করে নতুন সম্পর্ক এসে জুটবে। আমাদের প্রকৃত পরিচয় হল আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'। এইটি চিরসত্য, শাশ্বত সম্পর্ক। বাদবাকি জাগতিক দৈহিক সম্পর্ক স্বপ্নবৎ মাত্র। এই আছে এই নেই। দেহে আত্মীয়তা হয় না। আত্মা আছে বলেই আত্মীয়তা। তাই আমাদের পরম গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন—

আত্মীয় সবাই ভাই, আত্মার সম্বন্ধে ।
আত্মীয়তা নাহি হয় মায়াময় গন্ধে ॥
সকলের আত্মা যিনি স্বয়ং ভগবান ।
তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্বে সবাই সমান ॥
আত্মীয় তোমার ভাই, যত জীবকোটি ।
কৃষ্ণের সম্বন্ধে তাঁরা হয় পরিপাটি ॥ (বৃন্দাবন ভজন)

সুতরাং, প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হল নিত্য সম্বন্ধে ভগবদ্ ভজনায় জীবন যাপন করা, যাতে নিত্য জীবনে উন্নীত হওয়া যায়।

প্রশ্ন ৪। সবাই যদি ভক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে চলে যায়, তবে এই জগতে কি হবে?

উত্তর ঃ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এক স্থানে উল্লেখ করেছিলেন, "কেউ কেউ তর্ক তোলে, সকলেই যদি শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, তা হলে এই ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হয়ে যাবে, কারণ সকলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, তা সম্ভব নয়, কারণ জীব অসংখ্য। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ফলে যদি এক প্রস্থ জীব সত্যি সত্যিই ভগবদ্ধামে ফিরে যায়, তা হলে আর এক প্রস্থ জীব এসে এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করবে।" (ভাগবত ৫/১৮/৯ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য) জেলখানাতে যেমন একদল আসামী মুক্তি পেলে অন্য আর একদল আসামী এসে সে স্থান পূর্ণ করে, ঠিক তেমনি এই জগৎটাও জেলখানার মতো। জেলখানা যদি আসামীশূন্য হয়ে যায়, তা হলে তো ভালই। তবে তা হবার নয়। কৃষ্ণবহির্মুখ জীব চিরকালই এই জড় জগতে শাস্তি ভোগ করবে।

প্রশ্ন ৫। জগতের অধিকাংশ মানুষই মন্দ, তবে আমি কেন ভাল হতে যাব? ভাল হয়ে আমার লাভ কি?

উত্তর ঃ জগতের অধিকাংশ মানুষ মন্দ—অর্থাৎ, মন্দ ব্যক্তির অভাব নেই, চাহিদাও নেই। ভাল ব্যক্তির অভাব রয়েছে, ভাল ব্যক্তিরই প্রয়োজন। অতএব আপনাকে ভাল হতে হবে। মন্দ ব্যক্তিরা জগতে বাস করে মাত্র, তারা জগন্নাথের ভক্ত হতে চায় না। জগন্নাথ অর্থাৎ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উল্লেখ করেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

অর্থাৎ, "মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনো আমার শরণাগত হয় না।" (গীতা ৭/১৫)

মানুষের জড়জাগতিক স্থিতি যাই হোক না কেন, সে যদি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত না হতে চায়, তবে সে পাপকর্ম করতেই থাকবে, যার ফল ভয়াবহ। জড়জাগতিক কামনা-বাসনা, লোভ, মোহ বা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে মানুষ যে সমস্ত কর্ম করে সেই সবই মন্দ কর্ম। মন্দ কর্মের ফলও মন্দ। তাই আপনি যদি ভাল হন, সমস্ত ভাল ফল আপনি লাভ করবেন। এই দুঃখময় জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্র থেকে চিরতরে উদ্ধার পেয়ে ভগবানের চিন্ময় ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করতে পারবেন। তার ভাল পন্থাও রয়েছে। এই সমস্ত বৈদিক শিক্ষার আলোক মানুষ পাচ্ছে না বলেই তো মন্দ হয়ে যাচ্ছে। এই জড় জগৎ দুঃখময়, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। কিন্তু চিন্ময় জগৎ কুণ্ঠাহীন অর্থাৎ, বৈকুণ্ঠ। সেই সব জানতে হবে। জ্ঞানের আলোক রয়েছে। সবাই অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে আছে, অতএব আমাকেও পড়ে থাকতে হবে—এটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

এই জড় জগৎ জেলখানার মতো। জেলখানার মধ্যে মন্দ লোকের সংখ্যা বেশী থাকে। কিন্তু জেলখানার বাইরের জনসংখ্যা তুলনায় অনেক গুণ বেশি। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, সমগ্র জীব জগতের মধ্যে অধিকাংশই সেই চিন্ময় জগতে অর্থাৎ, ভগবদ্ধামে রয়েছেন এবং তাঁরা নিত্য মুক্ত। তুলনায় মাত্র অল্প সংখ্যক জীব অর্থাৎ, সমগ্র জীবদের চারভাগের একভাগ মাত্র এই জড় জগতে রয়েছে।

সেই একভাগ জীবের মধ্যে ৮৪,০০,০০০ প্রকার প্রজাতি রয়েছে। সেই প্রজাতির মধ্যে ৮০,০০,০০০ প্রকার জীবই হচ্ছে মনুষ্যেতর অর্থাৎ গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি। অবশিষ্ট ৪০,০০,০০০ প্রকার মনুষ্য-প্রজাতি রয়েছে—যাদের কর্মের ভাল-মন্দ বিচার করা হয়। তার মধ্যে আবার, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, চারণ, বিদ্যাধর, দেবতা, উপদেবতা ইত্যাদি রয়েছেন যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য গ্রহলোকে বাস করছেন। তাঁদের বাদ দিয়ে দেখা যাবে যে, পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা অতি নগণ্য। সেই সমস্ত মানুষদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক রয়েছেন যাঁরা উন্নত চেতনাসম্পন্ন। ভাগ্যবান মানুষেরা তাঁদের সঙ্গ করে জানতে পারে কিভাবে এই জড়জাগতিক সমস্ত প্রকার তথাকথিত ভাল ও মন্দের ঊর্ধ্বে থেকে চিন্ময় জগতে উত্তীর্ণ হতে চায়। পরমেশ্বর ভগবান সেই পন্থাই পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—*অবজানন্তি মাং মূঢা* (গীতা ৯/১১) 'মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে।' কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ মূর্খ হচ্ছে বলে আমাকেও কি মূর্খ হতে হবে? আমাদের প্রত্যেকের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের উপরই নির্ভর করছে আমরা কে কি লাভ করব। ভাল হলে ভাল ফল, মন্দ হলে মন্দ ফল। সুতরাং, "সবাই মন্দ হচ্ছে, তবে আমাকে কেন মন্দ হওয়ার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না?"—এই দাবি যদি আমি করে বসি, তা হলে নেহাত পাগল ছাড়া আমাকে কেউ সমর্থন করবে না।

প্রশ্ন ৬। পিতামাতাকে খাওয়া-পরা না দিয়ে মঠে গিয়ে সাধু হয়ে গেলে কোনও পাপ হবে কি না?

উত্তর ঃ সুদুর্লভ কিন্তু ক্ষণিক এই মনুষ্য জীবন। এই জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম পিতামাতা পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাধন ভজন করে আমাদের নিত্য শাশ্বত জীবনে ফিরে যাওয়া। এই ভবসংসারে বারে বারে নানা যোনি ভ্রমণ করে জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধির চক্রে পড়ে থাকা এই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, তা সর্বশাস্ত্রে নির্দেশিত।

আমাদের পূর্ব পূর্ব বহু জন্মে কত পিতামাতা ছিল। তারাও আমাদের জন্য কতই যত্ন নিয়েছিল। তাদের কথা আমাদের চিন্তার আওতায় আসে না। আবার এই দেহ ত্যাগ করার পর যখন কোনও একটা নতুন দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করব, তখনও নতুন কোনও পিতামাতা পাওয়া যাবে। প্রায় সমস্ত পিতামাতাই সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। যদিও বা অনেকে জানেন না মঙ্গল কিসে হয়। মাতাপিতা তাঁদের সন্তানের কাছে অনেক কিছু আশা করতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সন্তানগুলি সংসারের বিরাট বোঝা—বিরাট বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, তাঁরাই প্রকৃত পিতামাতা যাঁরা সন্তানকে জন্মমৃত্যুর সংসারচক্র থেকে উদ্ধারের পথ—শ্রীকৃষ্ণভক্তি শিক্ষাদান করেন। নইলে তাঁরা প্রকৃত পিতামাতা নন।

সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেম-ভক্তিদাতা ॥
সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায় ।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায় ॥ (শ্রীচৈতন্য মঙ্গল)

যদি পিতামাতা সহজ সরল হন, তা হলে বুদ্ধিমান সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে সেইরূপ পিতামাতাকে দুর্লভ মনুষ্য জীবনের পরম ধর্ম হরিনাম কীর্তনে উদ্বুদ্ধ করা। হরিভজন, ভগবানের পূজা অর্চনা, গীতা-ভাগবত-চৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ কীর্তন, ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদি ভগবদ্ভক্তির অনুকূলে গৃহটাকেই মন্দির করে গড়ে তোলা। তখন গৃহ আনন্দময় স্থান হবে। "যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায় ॥" সেই ক্ষেত্রে পিতামাতাকে ত্যাগ করে মঠে চলে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সেরূপ কৃষ্ণভাবনাময় গৃহে পিতামাতার জীবনও সার্থক হবে, সন্তানও ধন্য হবে। তবে কৃষ্ণভাবনামৃতের বৃহত্তর প্রচারের স্বার্থে সেই ধরনের গৃহও ত্যাগ করা যায়।

কিন্তু, যদি পিতামাতা ভজন সাধনের প্রতিকূল হন, যেমন, তাঁরা চা, পান, বিড়ি, সিগারেট, মাছ, মাংস, তাস, জুয়া, অবৈধ সঙ্গ ইত্যাদি নিষিদ্ধ বিষয়ে আকৃষ্ট থাকেন, যদি ভগবানের নাম মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে বিমুখ হন, ঔদ্ধত্যবশত শ্রীকৃষ্ণভজনে অসুবিধার কারণ হয়ে ওঠেন, তবে সেই ক্ষেত্রে সযত্নে পিতামাতাকে ত্যাগ করাই সমীচীন। এতে কোনও পাপের ভয় নেই, বরং পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণ খুশি হবেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"কি মাতৃধর্ম, কি পিতৃধর্ম সমস্ত রকমের তথাকথিত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাপন্ন হও। তা হলে তোমার কর্তব্য-অকর্তব্য জনিত সমস্ত পাপ থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোনও দুশ্চিন্তা করো না।" (গীতা ১৮/৬৬)

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে, "কেবল সেই সমস্ত ধর্মের আচরণ করা উচিত যা পরিণামে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি প্রদান করবে। কেউ তাঁর বর্ণ অনুসারে তাঁর কর্তব্য-কর্ম করে যেতে পারেন, কিন্তু এই কর্তব্য-কর্ম করার ফলে তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি লাভ না করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত কর্মই অর্থহীন। যা শ্রীকৃষ্ণভক্তির অনুকূল নয়, তা পরিত্যাজ্য। *আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রতিকূল্যস্য বিবর্জনম্*—কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয়সমূহ গ্রহণ করতে হবে, প্রতিকূল বিষয়সমূহ ত্যাগ করতে হবে। তবেই পরম মঙ্গল।"

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"হে রাজন্! যিনি সংসারের সমস্ত কর্তব্য করে পরমেশ্বর মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু—এই জ্ঞানে সেই অখিললোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দপাদপদ্মে সর্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করেছেন, তিনি কি দেবতা, কি মুনি-ঋষি, কি মাতা-পিতা, কি আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কারও কাছে দাসত্বে বা ঋণে বদ্ধ নন।" (ভাঃ ১১/৫/৪১)

প্রশ্ন ৭। স্বামীর ইচ্ছা কৃষ্ণভক্ত হবেন, কিন্তু স্ত্রী কৃষ্ণভক্ত হতে চান না। তিনি অন্য মন্ত্রে দীক্ষিতা কিংবা দীক্ষা নিতে চান। এমতাবস্থায় কি করা কর্তব্য?

উত্তর ঃ "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস"। স্বরূপে কৃষ্ণের দাসত্বই জীবের স্বরূপ পরিচয়। স্বামীকে অবশ্যই কৃষ্ণভক্ত হতে হবে। সহধর্মিণী পত্নীকে কৃষ্ণভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্বও স্বামীর। পতি যদি কৃষ্ণভক্ত হন, আর পত্নী যদি কৃষ্ণভক্তির অনুকূলে আসতে না চান তবে সেরূপ পত্নী বর্জনে কোনও দোষ হয় না। *প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জনম্।* তবে শুভ বুদ্ধির উদয় হলে যে কেউ সহজেই পরমসুন্দর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

প্রশ্ন ৮। সবাই যদি কৃষ্ণভক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে চলে যায়, তবে এই জগৎ খালি পড়ে থাকবে। তাই কি?

উত্তর ঃ না, জগৎ খালি পড়ে থাকবে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (অন্ত্যলীলা ৩/৭৮-৮০) শ্লোকের প্রাসঙ্গিক তাৎপর্যে বলেছেন "কারাগারে বহু কয়েদী রয়েছে, কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে সমস্ত কয়েদীরা যদি সৎ আচরণ করতে শুরু করে তাহলে কারাগার খালি হয়ে যাবে; সেই ধারণাটি ভুল। কারাগারের সমস্ত কয়েদী মুক্ত হয়ে গেলেও, অন্য কয়েদীরা এসে কারাগার ভর্তি করবে। কারাগার কখনই খালি থাকবে না, কেননা বহু কয়েদী দণ্ডভোগ করার জন্য কারাগার পূর্ণ করবে, যদিও সরকার উপস্থিত সমস্ত কয়েদীদের মুক্ত করে দেয়। ভগবদ্গীতায় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু* 'জড়া-প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবে জীব সৎ এবং অসৎ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।' (গীঃ ১৩/২২) বহু জীব তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে অব্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, যারা কালক্রমে রজোগুণের প্রভাবে সক্রিয় হবে। তাদের অধিকাংশই সকাম কর্মের প্রভাবে দণ্ড ভোগ করার জন্য এই জড় জগৎরূপী কারাগারকে পূর্ণ করবে।"

প্রশ্ন ৯। "পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতা পরম দেবতা" এই কথা কি ঠিক নয়?

উত্তর ঃ পুণ্যবান সর্বগুণে গুণান্বিত পিতা সম্পর্কে এই কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। স্বর্গ হচ্ছে পুণ্যবান ব্যক্তির আশ্রয়স্থল। অতএব পুণ্যবান পিতার আশ্রয় সন্তানের কাছে স্বর্গ তুল্য বৈকি। পিতা যদি ধর্মপরায়ণ হন—*ধর্মন্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রণীতম্*—ভগবানের দেওয়া নিয়মকানুন যদি পিতা মেনে চলেন, তবে সেই পিতা মহান ধার্মিক বলে খ্যাত হবেন। পিতা সন্তানের কাছে প্রিয় দেবতাও, কারণ অন্যান্য দেবতারা ঝড় বৃষ্টি খরা বন্যা ইত্যাদি দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে আমাদের জর্জরিত করতে পারেন, কিন্তু জন্মদাতা পিতা স্নেহবশত সেই সব দুর্যোগ থেকে আমাদের রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

কিন্তু কলিযুগের অধিকাংশ পিতাই অত্যন্ত বিপজ্জনক। কলিগ্রস্ত পিতা পাপপুণ্য বিচারশূন্য, পাপ প্রবণ, ধর্মবিধি মানেন না, নাস্তিক প্রকৃতির। কলির আড্ডাগুলির মধ্যে যে কোনও বিষয়ে যুক্ত থাকেন। মাংসাহার, বিড়ি সিগারেট সেবন, তাস জুয়া খেলা, অবৈধ সঙ্গাদির মধ্যে জড়িত থাকেন। তারা কলিকালের যুগধর্ম হরিনাম কীর্তন করেন না। অর্থাৎ, তারা স্বর্গতুল্য নয়, নরকতুল্য। তারা ধর্ম পরায়ণ নয়, অধার্মিক।

আর, তারা কখনও পরম দেবতা রূপে পরিগণিত হতে পারে না। বরং তারা রাক্ষসভাবাপন্ন হয়ে যে কোনও সময় সন্তানের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়। যেমন, সন্তান মাতৃজঠরে অসহায় অবস্থায় অবস্থান কালীন কলিযুগের পিতা-মাতা সন্তানকে তথাকথিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে ঘাতককে নির্দেশ দেয় মেরে ফেলতে।

শ্রীমদ্ভাগবতের (১০/৮/১০) শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন—"মানব-জীবন লাভ হয় বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এবং এই জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশুদ্ধ হওয়া বা সুসংস্কার সম্পন্ন হওয়া। পূর্বে পিতা তাঁর পুত্রের জন্য তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে আগ্রহী থাকতেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষেরা বিপথগামী হওয়ার ফলে, সন্তানসন্ততির পালনপোষণ করার দায়িত্ব এড়াবার জন্য তাদের হত্যা পর্যন্ত করতে প্রস্তুত।"

অনেক সময় ছন্নমতি পিতার জন্য সন্তানের জীবনে মারাত্মক পরিণতি নেমে আসে। দেখা যায়, পুরাকালে পরম বৈষ্ণব শিব তাঁর পত্নী সতীকে দক্ষ আয়োজিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যাত্রা করতে নিষেধ করে বলছেন, "তোমার পিতা যদিও তোমার দেহের জন্মদাতা, তবুও তিনি অযথা মাৎসর্যবশে আমার প্রতি বিনা দোষেই অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ হয়েছেন। তাই তাঁকে দর্শন করতে যাওয়া তোমার পক্ষে ঠিক হবে না। তুমি তাঁর স্নেহের কনিষ্ঠা কন্যা হলেও যে কোনও সময় তিনি তোমার শরীরটি নিয়ে যেতে পারেন। আমার এই উপদেশ সত্ত্বেও যদি তুমি আমার কথা উপেক্ষা করে তোমার পিতার গৃহে যাও, তবে সত্যিই তোমার ভবিষ্যৎ ভাল হবে না।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৪/৩/২৪-২৫) হয়েছিলও তাই।

দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্মে মন প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর নাস্তিক পিতা হিরণ্যকশিপু সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন যাতে প্রহ্লাদ

হরিবিমুখ হয়ে পিতার কথামতো পিতার আনুগত্যে জীবন যাপন করেন। কিন্তু শিশুপুত্র প্রহ্লাদ সেই মহাক্ষমতাশালী পিতার নির্দেশ স্বীকার করেননি। তিনি তাঁর শ্রীগুরুদেব নারদ মুনি এবং ভগবান শ্রীহরি ছাড়া অন্য কারও চিন্তা করতেই পারেননি। হরিকথা কীর্তন, হরিকথা স্মরণ, হরিকথা প্রচার করাই ছিল তাঁর কাজ। তাই অসুর পিতার নির্দেশ লঙ্ঘন করার জন্য প্রহ্লাদকে মেরে ফেলবার প্রচণ্ড চেষ্টা চলছিল। কিন্তু শ্রীহরি তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেছিলেন।

আদর্শ পিতা শ্রীঋষভদেব তাঁর একশত পুত্রকে শিক্ষা দিচ্ছেন, "ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা সন্তানকে জন্ম-মৃত্যুর এই সংসার-চক্র থেকে চিরতরে উদ্ধার করতে যিনি পারেন না, তিনি কখনও সন্তানের পিতা হওয়ার যোগ্য নন। অর্থাৎ, তাঁর পক্ষে কারও পিতা হওয়া উচিত নয়।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/১৮)

প্রশ্ন ১০। এই জগতে পরম বন্ধু কে?

উত্তর ঃ যিনি এই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিতে পূর্ণ দুঃখময় ভবচক্র থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নিত্য সচ্চিদানন্দময় জীবনে উন্নীত হওয়ার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন শিক্ষা দান করেন, তিনিই পরম বন্ধু। শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করেছেন—

সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা ॥

শ্রীকৃষ্ণের অভয় পাদপদ্মে যিনি প্রেমভক্তি দান করেন, সে-ই পরম বন্ধু।

প্রশ্ন ১১। জন্মদাতা পিতা-মাতাকে ছেড়ে মঠে যাওয়া কি ভাল কাজ?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই ভাল কাজ নয়। জন্মদাতা পিতা-মাতা যদি সন্তানকে নিয়ে চিরস্থায়ী থাকতেন, তা হলে খুবই ভাল কাজ হত। কিন্তু পিতা-মাতার বর্তমানেই সন্তানকে অকাল মৃত্যু ছিনিয়ে নেয়। পিতা-মাতাও অকালে সন্তানদের ছেড়ে দিয়ে পরলোকে গমন করেন। এইগুলি নিশ্চয়ই ভাল কাজ নয়। পিতা-মাতার বর্তমানে ছেলেরা মঠে না গেলেও পিতা-মাতাকে বাদ দিয়ে নিজেরা নতুন পরিবার গঠন করে। এই সব ভাল কাজ নয়। পিতা-মাতার সঙ্গে থেকেও পিতা-মাতাকে মান্য করে না। এটিও ভাল কাজ নয়।

কেউ যদি পরমনিয়ন্তা পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হয় অর্থাৎ, কৃষ্ণভজনের জন্য আত্ম সমর্পণ করে, তবে শাস্ত্র অনুসারে সে বহু জন্মের পিতা-মাতার ঋণ মুক্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যুর পরপারে সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে পারবে। কিন্তু, কেউ যদি ভক্ত না হয়ে, বিধিনিষেধজ্ঞান-শূন্য হয়ে পিতা-মাতার সঙ্গে থেকে তাঁদের দৈহিক চাহিদা পূরণের চিন্তায় জীবন যাপন করে, তবে সে ঋণমুক্ত হবে না। বরং, *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।*—এই দুঃখময় ভবচক্রে কীট-পতঙ্গ পশু-পাখি ইত্যাদি শরীর ধারণ করে জন্ম-জন্মান্তর ধরে ঘুরপাক খেতে হবে। ঐ সব মোটেই ভাল কাজ নয়।

প্রশ্ন ১২। হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচারে প্রকাশিত 'আদর্শ গৃহস্থ জীবন' বিভাগে উল্লিখিত "পত্নীও গুরু হতে পারেন" কথাটি আমাদের বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ঃ যেখানে পত্নী একজন গুরুর ভূমিকা নিতে পারেন সেখানে বুঝতে হবে যে তাঁর পতিও গুরু। পতির মহান গুরুত্ব আছে বলেই পত্নীও গুরু হতে পারেন। আদর্শ কৃষ্ণভাবনাময় পতিকে কৃষ্ণভক্তি প্রচারকার্যে সহযোগিতা করবার জন্য সহধর্মিণী পত্নীও পাড়ার অন্যান্য মহিলাদেরকে কৃষ্ণনাম কীর্তন, জপ, কৃষ্ণপূজার্চনা, কৃষ্ণের জন্য ভোগরন্ধন প্রণালী, কৃষ্ণকথা পাঠ, গীতা ভাগবত অধ্যয়ন ইত্যাদি ভক্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করতেও পারেন। ভক্তিমতী পত্নী গৃহস্থালীর কাজকর্ম, সন্তান পালন, পতি পরিচর্যা ইত্যাদি করা ছাড়াও নিয়মিত সময় বুঝে পাড়ার অন্যান্য মহিলাদের আদর্শ ভক্তজীবন গঠনের প্রেরণা দিবেন, তাঁদের শিক্ষাগুরু হিসাবেই তিনি নিশ্চয়ই সম্মানিত হবেন। এই ব্যাপারে ভক্তপতি তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন, যেহেতু কৃষ্ণমহিমা প্রচারে পত্নীও নিযুক্ত হয়েছেন।

অভক্ত পতির পত্নী কখনও গুরু হতে পারেন না, কারণ একজন সহধর্মিণী হিসাবে পত্নীর জীবনের কোনও পারমার্থিক কল্যাণের জন্য অভক্ত পতি কোনও মানমর্যাদা বা গুরুত্বই দেয় না।

গুরু বলতে কেবল দীক্ষাগুরুকেই বোঝায় তা নয়, শিক্ষাগুরুকেও বোঝায় এবং বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুকেও বোঝায়।

প্রশ্ন ১৩। আমি আজ পর্যন্তও শুনিনি বা পড়িনি যে, জগতের মধ্যে নারীমহলের কেউ গুরু হয়ে কোনও ভক্তের কর্ণমূলে দীক্ষা-মন্ত্র দান করেছেন। কোনও নিদর্শন আছে কি?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রচারকবর শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী, মহান বৈষ্ণবগণ যাঁর পাদপদ্ম বন্দনা করতেন, সেই জাহ্নবা মাতা শ্রীবসুধা-পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুকে এবং তাঁর সহধর্মিণী পত্নীদ্বয় শ্রীমতীদেবী ও নারায়ণীদেবীকে দীক্ষামন্ত্র দান করেছিলেন। *শ্রীপ্রেমবিলাস* গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীনিত্যানন্দ দাস ছিলেন শ্রীজাহ্নবা মাতার দীক্ষিত শিষ্য।

শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামীর শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য, তাঁর শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী, তাঁর শিষ্যা পরম নিষ্ঠাবতী শ্রীশচীদেবী দাসী ছিলেন শ্রীশ্রীজগন্নাথের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। তিনি তৎকালীন পুরীর রাজা শ্রীমুকুন্দদেবকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। শ্রীশচীদেবী দাসী শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী নামেই পরিচিতা। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অদূরেই গঙ্গামাতা মঠ অবস্থিত।

পরমগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

"যে-ই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সে-ই গুরু হয়।"

প্রশ্ন ১৪। মানব-জীবনে অধ্যাত্মবিদ্যার কি প্রয়োজন আছে?

উত্তর ঃ অন্যান্য পশুপাখী কীটপতঙ্গের জীবনের চেয়ে মানব-জীবনই শ্রেষ্ঠ বা উন্নত, যেহেতু মানুষ জানতে চেষ্টা করে, "আমি কে? কেন আমি জন্মেছি? কেন আমাকে মরতে হবে? কেন চিরকাল এই শরীরে সুখী হয়ে থাকতে পারব না? জগৎ কি? কে বানিয়েছে? জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? জগতের সৃষ্টিকর্তার পরিচয় কি? তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি আমি চাই না, তবুও এগুলি কেন আমাকে গ্রহণ করতে হচ্ছে?" এইগুলি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিষয়। বেদে বলা হয়েছে *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।* আসল বিষয় জানবার চেষ্টা করা। এইগুলি যদি জানবার কারও প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে নিছক পশু মাত্র বলেই শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

প্রশ্ন ১৫। কেউ যদি বিষয়-আশয় আত্মীয়-কুটুম্বাদির প্রতি আসক্ত থাকে, তাতে তার বিপদ কোথায়?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি যে বিষয়ে আসক্ত, সেই সেই বিষয়-চিন্তা সে করতে থাকে বলে দেহ-ত্যাগের পর সেই আসক্তি বা বাসনা থাকার কারণে এই দুঃখময় জড় জগতে তাকে আবার জন্ম নিতে হবে, কিন্তু তার কর্ম ও চেতনা অনুসারে তাকে নিম্নতর একটি জড় দেহ পেতে হয়, অর্থাৎ যাতে মনুষ্যজন্ম না হয়ে কীটপতঙ্গ পশুপাখি জীবজন্তু ইত্যাদি ইতর বংশে জন্ম নিতে হবে। অর্থাৎ, আর মনুষ্যজন্ম পাওয়ার সুযোগ সহজে লাভ হয় না।

প্রশ্ন ১৬। আমরা এই অনিত্য জগতে কাউকে কি ভালবাসব না?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তখনই ভালবাসার যথার্থ মূল্য মর্যাদা থাকে, যখন আমরা কাউকে কৃষ্ণভক্তিময় জীবনে উন্নীত হওয়ার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করব, যার ফলে জন্ম-মৃত্যুর ভবসংসারে বদ্ধ জীব উদ্ধার পেয়ে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের সুদুর্লভ সুযোগ লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন ১৭। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই বন্ধুবান্ধব কুটুম্বদের যাতায়াত হয়। তাদের সঙ্গে সৌজন্য রক্ষার্থে আমাদের বয়স্ক আত্মীয়দের দ্বারা বাধ্য হয়ে আমাদের চা পান বিড়ি দিতে হবে। যেটি আমরা একদমই পছন্দ করি না। অথচ এমতাবস্থায় কি করা প্রয়োজন?

উত্তর ঃ চা পান বিড়ির মাধ্যমে সৌজন্য রক্ষা হয়—এটি গ্রাম্য বিশ্রীকর ব্যবস্থা। যদি সৌজন্য রক্ষা করতেই হয়, তবে চা এর বদলে আয়ুর্বেদিক চা, পানের বদলে পানমৌরি, বিড়ির বদলে বহেড়া দিলে ঠিক উপযুক্ত হবে। এ সব জিনিস চা, পানসুপারি ও বিড়ির মতো ক্ষতিকর নয়। সবচেয়ে ভাল পন্থা হল শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ নিবেদন করা।

প্রশ্ন ১৮। "মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর।" এই কথাটি কি সত্য?

উত্তর ঃ যদিওবা স্বর্গ এবং নরক নামক পৃথক পৃথক গ্রহলোক রয়েছে এবং সুর বা দেবতা এবং অসুর বা দৈত্যরা বিশেষ বিশেষ গ্রহলোকের অধিবাসী, তবুও পৃথিবীতে

মানব-সমাজে স্বর্গ ও নরকের দৃশ্য সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় এবং সুর ও অসুর প্রকৃতির মানুষও দেখা যায়। সুতরাং, কথাটি মিথ্যা নয়।

এখানকার মানুষের সর্বজীবের প্রতি ভালবাসা, সহানুভূতি ও স্নেহযত্ন, এখানকার ভোরের আলো, উদার আকাশ, মুক্ত বাতাস, সুনীল সমুদ্র, সবুজ ক্ষেত, পাখীর কূজন, ফুলের সৌরভ, ফলের বাগান ইত্যাদি স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার, জীবহিংসা, কসাইখানা, কলকারখানার দূষিত ধোঁয়া, মাতালের উত্তেজনা, কলহ বিবাদ, জোর জুলুম, খুনখারাবি, অবৈধ যৌনতা, অঙ্গহানি, রোগ-ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, লুটপাট, প্রচণ্ড রুক্ষ পরিবেশ ইত্যাদি নারকীয় পরিবেশ দৃষ্ট হয়।

সুর-প্রকৃতির লোকেরা হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িত হন না। আমিষ ভক্ষণ করে না। কিন্তু অসুর প্রকৃতির লোকেরা সর্বদা নাস্তিক এবং আমিষভোজী, ভ্রূণহত্যা, গো হত্যা, নেশাভাঙ ইত্যাদি করে চলে।

প্রশ্ন ১৯। আমরা কিভাবে বুঝতে পারব যে, পৃথিবীতে কোন্ মানুষ কোন্ গ্রহলোক থেকে এসে এখানে জন্ম নিয়েছে? সেরকম কোনও প্রমাণ আছে কি?

উত্তর ঃ মানুষকে দেখে তার আচার-ব্যবহার বুঝে সামান্য ধারণা করতে পারা যায়। তবে শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে এ সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। যখন কাউকে দেখা যায় যে, সে পরের নিন্দা করে চলেছে, কিংবা কাউকে পীড়া দিচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতা করছে, পরস্ত্রী কিংবা পরের সম্পত্তি হরণ করছে, নিষ্ঠুর এবং নির্লজ্জ প্রকৃতির, দেবতাদের নিন্দা করছে, কারও প্রাপ্য বস্তু থেকে তাকে বঞ্চনা করছে, উপযুক্ত ব্যক্তিকে কিছু দিতে কৃপণতা করছে, মানুষকে হত্যা করছে, নিষিদ্ধ কার্যেই এগিয়ে চলেছে, তখন বুঝতে হবে এই ধরনের ব্যক্তি নরক যন্ত্রণা ভোগ করবার পর কোনক্রমে মানুষরূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেছে।

আর যখন কাউকে দেখা যায় যে, সে বেদ শাস্ত্রাদিতে আকৃষ্ট, সকলের মধ্যে মৈত্রীভাব, সাধুসঙ্গ, সাধুনির্দেশে ধর্মপরায়ণ হচ্ছে, গুরু-দেব ও ঋষিগণের পূজা করছে, সকলের প্রতি দয়াভাব, সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করছে, তখন বুঝতে হবে যে, এই ধরনের ব্যক্তিরা স্বর্গসুখ ভোগের পর কোনক্রমে মানুষরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ২০। আমরা আমাদের দেহ নই। তাহলে মৃত্যুর পর দেহকে নিয়ে এত ব্যস্ত হই কেন? হরিদাস ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মহাপ্রভু তাঁর দেহ নিয়ে অত ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন?

উত্তর ঃ মৃত্যুর পর দেহের সঙ্গে জীবের কোন সম্বন্ধ না থাকলেও সেই দেহটাই নানা সমস্যার কারণ রূপে দেখা দেয়। যে মানুষ জোর করে দেহত্যাগ করে অর্থাৎ আত্মঘাতী হয়, তখন সে অশরীরী অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে থাকে। সে দেহ চায়। কিন্তু পরিত্যক্ত দেহটা তার পক্ষে আশ্রয় যোগ্য হয়ে ওঠে না। তাই সে কেবল দেহটার

আকর্ষণে সেইখানে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তাই দেহের সৎকার করে অশরীরী আত্মার সদ্ গতির জন্য পিণ্ড দানাদি ক্রিয়া করে তাকে শান্ত করতে হয়।

মৃতদেহ দেখে দেহ সম্বন্ধীয় আত্মীয় স্বজনেরা দেহাত্মবুদ্ধি বশত দেহটাকেই আঁকড়ে ধরে। তারা বুঝতে পারে না যে, এই মৃত দেহটার কোন মূল্য নেই। দেহটা আঁকড়ে ধরে চোখের জলে কেবল ভাসতে থাকলে কোন লাভ হয় না। পচনশীল দেহকে যথা সম্ভব শীঘ্র দাহ সৎকার কিংবা মৃৎ সমাধিস্থ করতে হয়। নতুবা দেহকে ফেলে রাখলে কয়েক ঘণ্টার পর তা পরিবেশটিকে অশুচি, দূষিত এবং রোগাকীর্ণ করে তোলে। এমন কি, শ্রুত হয় যে, কোনও ব্যক্তির মৃতদেহ অন্যের এইভাবে উদ্বেগ ও ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়ালে সেই জীবাত্মারও সদ্‌গতি হয় না।

তাছাড়া মানসিক চাপ বশত মৃতদেহটিকে দেখতে দেখতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হতে পারে। তাদের যে নতুন করে জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে হবে সেই মানসিকতাও নষ্ট হয়ে যায়। তাই জড় পঞ্চভূতের দেহ যাতে শীঘ্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ, পঞ্চপদার্থে মিশে যেতে পারে, সেই জন্যই ব্যস্ততার দরকার আছে।

শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে মৃত ব্যক্তির দেহ শ্মশানে তার পুত্র-পৌত্রাদি দাহ করতে নিয়ে যায়। যাদের কেউ নেই তাদের মৃতদেহ সমাজের লোকেরা দাহ করে। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সেই রকম কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না। তিনি সর্বতোভাবে মহাপ্রভুকে চিন্তা করতেন। অন্তিম কালে তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখে মহাপ্রভুর নাম স্মরণ করে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে হাত রেখে দেহত্যাগ করেছিলেন। মহাপ্রভুই তাঁর একমাত্র শরণ্য, তাই তাঁর দেহের সৎকার মহাপ্রভু স্বয়ং করেছিলেন।

প্রশ্ন ২১। বৈষ্ণব-অপরাধ কি? তার ফল কি?

উত্তর ঃ স্কন্দ পুরাণে ছয় প্রকার অপরাধ বৈষ্ণব-চরণে হতে পারে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি ।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

অর্থাৎ, "যে সকল মূর্খ ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে থাকে, তারা পিতৃবর্গের সঙ্গে মহারৌরব নামক নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি (১) বৈষ্ণবকে হত্যা করে, (২) বৈষ্ণবের নিন্দা করে, (৩) বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়, (৪) যে বৈষ্ণব-দর্শন করে প্রণতি জানায় না, (৫) বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়, (৬) বৈষ্ণবকে দেখে আনন্দিত না হয়, এই ছয় জনই অধঃপতিত হয়।

প্রশ্ন ২২। সাধারণত বৈষ্ণব-নিন্দা কিভাবে হয়?

উত্তর ঃ সাধারণত দুষ্ট লোকেরা বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে বৈষ্ণবের তিন প্রকার কথা নিয়ে আলোচনা করে। (১) শুদ্ধ ভক্তি উদয় হওয়ার আগে সেই ব্যক্তির যে সমস্ত

দোষ ছিল, সেইগুলি আলোচনা করা। (২) শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন করতে করতেও কিছু দোষ থেকে যায় সেগুলি আলোচনা করা, এবং (৩) শুদ্ধ ভক্তি স্তরে থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দৈবাৎ কোনও নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হলে সেই দোষ নিয়ে আলোচনা করা।

সৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত দোষ সমালোচনা করলে বৈষ্ণব-নিন্দার অপরাধ হয়। তার ফলে হরিনামেও অপরাধ হয়, যাতে নাম জপ-কীর্তনে স্ফূর্তি জাগে না। নাম স্ফূর্তি না হলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি কারও দোষ আলোচনা করা যায়, তা শুভকার্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। সাধু-বৈষ্ণব-পদ আশ্রয় করবার অভিপ্রায়ে অসৎ ধর্মধ্বজী লোককে পরিত্যাগ করতে সাধুনিন্দা বা বৈষ্ণব-অপরাধ হয় না।

সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা থেকে সর্বদা নিজেকে এড়িয়ে থাকতে হবে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (অন্ত্য ৪/৩৬০-৩৬২) সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—

বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার ।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার ॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন—

চৌরাশী সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে ।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে ॥

(চৈঃ ভাঃ ৪/৩৭৫-৩৭৭)

প্রশ্ন ২৩। বৈষ্ণব-অপরাধ হয়ে গেলে কিভাবে খণ্ডন করা যায়?

উত্তর ঃ যাঁর চরণে অপরাধ হল তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার ।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য-২২/৩২)

সেই বৈষ্ণব ক্ষমা করলে তবে অপরাধ খণ্ডিত হয়।

প্রশ্ন ২৪। আমরা শুনেছি কেউ যদি ভগবদ্‌ধামে উন্নীত হয় তাকে আর কখনও এই দুঃখময় জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। কিন্তু সেখানে আবার যদি ভোগবাসনা থাকে তখন?

উত্তর ঃ যেখানে গিয়ে লোক দুঃখ-যন্ত্রণা পায়, মার খায়, সেখানে কি আবার কারও যেতে মন চাইবে? নিশ্চয়ই নয়। এই জড়জগতের যাতনা যে ভোগ করেছে, সে ভাগ্যক্রমে ভগবদ্ উন্মুখ হয়ে ভগবদ্‌ধামে উন্নীত হলে তার সেরূপ জড় ভোগ স্পৃহা হয় না। নিত্যানন্দময় ভগবদ্‌সেবা ভাবই তখন হৃদয়ে কার্যকরী হয়।

প্রশ্ন ২৫। দীক্ষিত ভজনানুকূল নব দম্পতি বাৎসল্যরসে ভগবানকে ভাল বাসলে তাদের কোনও সন্তান কামনা উচিত কিনা, যদিও বা সহধর্মিনী সন্তানকামী হয়ে থাকে?

উত্তর ঃ বাৎসল্য ভক্তিতে ভগবানকে পুত্ররূপে ভালবাসলেও অন্য কোনও পুত্র থাকলে গৃহস্থ ব্যক্তির কোনও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যে সমস্ত দম্পতির সন্তানকামনা আছে অথচ কর্মবিপাকে সন্তান নেই তাঁরা বাৎসল্য ভক্তিতে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন গঠন করবেন, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করেই আমরা সন্তান চাই না—এই মনোভাব পোষণ করাটা নব দম্পতির পক্ষে শোভনীয় নয়। সুসন্তান প্রজন্মহেতু কামশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ। কিন্তু সন্তান চাইনা অথচ সঙ্গ চাই, সেটি ভক্তিবিরোধী হয়ে ওঠে। গৃহস্থ ভক্তদের সুসন্তান সবাই কামনা করেন, গৃহমেধীদের সন্তান সমাজে অবাঞ্ছনীয়। যে কোন গৃহস্থ ব্যক্তির নিজেদের ও সমাজের মঙ্গলবিধানার্থে দৈব আশীর্বাদযুক্ত কৃষ্ণভক্ত সুসন্তান কাম্য। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ৭৫ সর্গে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা মহাত্মা ভরতের উক্তি—"স্বাধ্বী সহধর্মিণী ঋতুস্নানের পর সন্তান বাসনাহেতু সন্নিহিত হলে অধর্মপরায়ণ ব্যক্তি তাকে উপেক্ষা করে।"

প্রশ্ন ২৬। স্বামী কৃষ্ণভক্ত কিন্তু স্ত্রী কৃষ্ণভজনের প্রতিবন্ধক। তা হলে সেই স্বামীর কি কর্তব্য?

উত্তর ঃ স্ত্রীকে কৃষ্ণভজনের অনুকূলে নেওয়ার দায়িত্ব স্বামীর উপরই বর্তায়।

প্রশ্ন ২৭। বয়স্কা শূদ্রা মহিলা যদি পুত্রস্নেহে কোনও অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণকে আশীর্বাদ করে, তা হলে সেই ব্রাহ্মণের কি করা উচিত? প্রণাম করবে—না নমস্কার জানাবে?

উত্তর ঃ পুত্রস্নেহময়ী আশীর্বাদকারিণীকে মাতৃশ্রদ্ধায় প্রণাম করা উচিত। পারমার্থিক মঙ্গলকামী ব্যক্তি মাত্রই সবার আশীর্বাদ কামনা করবেন। সেক্ষেত্রে তাই প্রণাম নিবেদনই করতে হবে। জন্মগত সূত্রে ব্রাহ্মণ বা শূদ্র বিচার ভক্তি-অনুশীলনকারীদের কাছে অনর্থক। যখন কেউ হাত জোড় করে বলেন 'নমস্কার' তখন প্রত্যুত্তরে হাত জোড় করে বলতে হয় 'নমস্কার'।

প্রশ্ন ২৮। সাধুজনেরা অন্য লোকের রান্না, পরিবেশন ও একসারিতে বসে প্রসাদ ভোজন করেন না কেন? তাতে কি দোষ হয়?

উত্তর ঃ ভোজনের সময় কেবল প্রসাদই ভোজন করা হয় না, রান্নাকারী, পরিবেশনকারী পারিপার্শ্বিক ব্যক্তির মনোভাবও আহার করা হয়ে থাকে। এ জন্য রান্না, ভগবানকে ভোগ নিবেদন, ভক্তদের সেই প্রসাদ পরিবেশন যাঁরা করবেন এবং যাঁরা প্রসাদ গ্রহণ করবেন তাঁদের পবিত্র শুদ্ধ মনোভাব থাকার আবশ্যকতা রয়েছে। অন্যথায়, কৃষ্ণচেতনার বিরুদ্ধভাব অন্তরে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। তাই আমাদের সকলকে হরিনাম পরায়ণ হওয়ার মাধ্যমে শুদ্ধ হতে হয়। 'সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও, প্রেমে ডাকো শ্রীচৈতন্য-নিতাই।'

প্রশ্ন ২৯। রক্তচোষা মশা, ছারপোকা, উকুনকে মারলে অপরাধ হয় কি?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/২/১৭) বলা হয়েছে, "ভগবানের আয়োজনে মশা ছারপোকা ইত্যাদি নিম্ন স্তরের প্রাণীরা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের রক্ত পান করে। এই প্রকার নগণ্য প্রাণীদের কোন ধারণা নেই যে, তাদের দংশনের ফলে মানুষের কষ্ট হয়। কিন্তু মানুষের চেতনা উন্নত। সে জানে মৃত্যু কত বেদনাদায়ক। বিবেক সম্পন্ন মানুষ যদি বিবেকহীন তুচ্ছ প্রাণীদের হত্যা করে বা যন্ত্রণা দেয়, তবে নিশ্চয় তার পাপ হয়। সে সেই পাপের জন্য অন্ধকূপ নামক নরককুণ্ডে যমদূতদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। সেখানে অন্ধকার কূপের ভেতরেই ভয়ংকর মশা ছারপোকা উকুনের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সে অস্থির হয়ে ছটফট করতে করতে নিরন্তর ছুটাছুটি করতে থাকে।"

প্রশ্ন ৩০। ডিডিটি দিয়ে মশা প্রজন্ম নষ্ট করে দিলে মানুষ নিরাপদে বাঁচতে পারবে বলে মনে করি। কারণ মশার উৎপাত আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে।

উত্তর ঃ মশারি ব্যবহার করতে হবে এমনভাবে যাতে আপনাকে একটাও মশা না কামড়ায়। বিশেষ সময়ে মশার জন্ম হয়, উৎপাদন বৃদ্ধি হয় আবার কিছুদিন পরেই মশা আপনা আপনি মরে যায়। ডিডিটি দিয়ে মশা মারার প্রয়োজন পড়ে না। মশার উৎপাত আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে, তেমনই মশামারা ডিডিটিও আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে। মশার কামড় সরাসরি বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ডিডিটির কুপ্রভাব সরাসরি বোঝা যাচ্ছে না। এই হল পার্থক্য। মাটি জল বাতাস ডিডিটিতে দূষিত হয়, পরিণামে আমাদের শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হয়। তাছাড়া কীটনাশক ব্যবহার করে কীটপ্রজন্ম রোধ করা গেছে—এরকম তথ্য পাওয়া দায়।

প্রশ্ন ৩১। কোন মৃত ব্যক্তির নামে পিণ্ডদান করলে কি সে বৈকুণ্ঠবাসী হতে পারে?

উত্তর ঃ পরলোকে দৈব দুর্বিপাকগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপদী গঙ্গা বা পবিত্র তীর্থে শ্রীহরির মহাপ্রসাদ পিণ্ড দান করলে সেই ব্যক্তি দুরবস্থামুক্ত হয় এবং হরিভক্তি অনুশীলনের সুযোগ লাভ করে বৈকুণ্ঠবাসী হওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

প্রশ্ন ৩২। এই পৃথিবীতে আমাদের প্রকৃত আত্মীয় কারা?

উত্তর ঃ *স এব বন্ধুঃ স পিতা স মন্ত্রী জননী চ সা।*
স চ ভ্রাতা পতি পুত্রো যঃ কৃষ্ণবর্ত্ম দর্শয়েৎ ॥

"সে-ই বন্ধু, সে-ই পিতা, সে-ই মন্ত্রদানকারী, সে-ই জননী, সে-ই ভ্রাতা, সে-ই পতি, সে-ই পুত্র যথার্থই আত্মীয় হয়, যে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করবার পন্থা প্রদর্শন করে।" (নাঃ পঃ ২/৮/২৪) যে ব্যক্তি পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবাত্মার নিত্য সম্বন্ধের কথা জানতে বা জানাতে পারে না, তার সঙ্গে আত্মীয়তা অত্যন্ত ক্ষণিক বুদ্বুদের মতো। জলবুদ্বুদবৎ সর্বং বিশ্বঞ্চ সচরাচরম্।

প্রশ্ন ৩৩। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে অন্যায়ভাবে যে যবনেরা বাইশ বাজারে প্রচণ্ড প্রহার করেছিল তাদের কি গতি হল?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (আদি ১৬/১৭১) বলা হয়েছে—

তাহানেও দুঃখ দিল যে-সব যবনে ।
সবংশে উচ্ছন্ন তারা হৈল কতদিনে ॥

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গৌড়ীয় ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন, হরিদাস ঠাকুরের প্রতি অত্যাচার করার ফলে যবনেরা বসন্ত ও বিসূচিকাদি মহা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে অচিরেই সবংশে নিধন প্রাপ্ত হল।

স্কন্দ পুরাণে সাবধান বাণী রয়েছে—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি ।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

বৈষ্ণবকে আঘাত বা হত্যা করা, নিন্দা করা, হিংসা করা, অভিনন্দন না করা, ক্রোধপ্রকাশ করা, দর্শন করে হর্ষ প্রকাশ না করা—এই ছয় রকম আচরণ অধঃপতনের কারণ হয়।

প্রশ্ন ৩৪। আমাদের জীবনে পিতা, মাতা, শিক্ষক, পতি, সন্তান, গুরুদেব—কে বড়?

উত্তর ঃ পরম তত্ত্বজ্ঞ শ্রীনারদমুনির উক্তি এই যে, পৃথিবীতে সমস্ত পূজনীয় ব্যক্তির মধ্যে পিতা-মাতা হচ্ছেন পরমগুরু। পিতা জ্ঞানদাতা অপেক্ষাও বন্দনীয়। পিতা জন্মদাতা, অন্নদাতা ও সতত স্নেহকর্তা। আর মাতা সতত স্তন্যদাত্রী, গর্ভধাত্রী ও স্নেহকর্ত্রী। কিন্তু সেই পিতা-মাতা সন্তানের কর্মমূল ছেদন করতে পারেন না। সন্তান পূর্ব জন্মের কুকর্মের ফল স্বরূপ যাতনা যদি ভোগ করতে থাকে তবে পিতা-মাতা তার কর্মফল খণ্ডন করতে পারেন না। একমাত্র পারমার্থিক গুরুদেবই শিষ্যের কর্মমূল ছেদন করেন।

'পারমার্থিক গুরুদেবই মন্ত্র প্রদান করেন। যা থেকে কৃষ্ণভক্তি হয়, তা-ই মন্ত্র। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তি বাদ দিয়ে অন্য কিছুতে আসক্ত সে নিতান্ত মূঢ়, নরাধম রূপে পরিগণিত হয়।

স গুরুঃ স পিতা বন্দ্যঃ সা মাতা স পতিঃ সুতঃ ।
যো দদাতি হরের্ভক্তিং কর্মমূলনিকৃন্তনীম্ ॥

"তিনিই পূজনীয় গুরুদেব, তিনিই বন্দনীয় পিতা, তিনিই প্রকৃত মাতা, তিনিই যথার্থ পতি, তিনিই সুন্দর সন্তান—যিনি আমাদের কর্মমূল ছেদনকারী শ্রীকৃষ্ণভক্তি দান করেন।" (পঞ্চরাত্র ১/১০/১২)

প্রশ্ন ৩৫। প্রতিটি জীবকে কিভাবে ভালবাসব?

উত্তর ঃ প্রতিটি জীবকে ভালবাসা সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেক জীবের স্বভাব বিভিন্ন রকমের এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কও বিভিন্ন রকমের। সবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও বিপজ্জনক। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে জীবের চিরন্তন সম্পর্ক রয়েছে। *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*—জগতের প্রত্যেক জীবের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সনাতন সম্পর্ক রয়েছে, এবং প্রতি জীবই তাঁর চিৎকণা তুল্য অংশমাত্র। অংশের সার্থকতা

তখন, যখন পূর্ণের সেবায় যুক্ত থাকে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই ভালবাসার রস বিগ্রহ। *স বৈ রসঃ*। ভগবানকে ভালবাসতে বৈদিক শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছে। গাছের মূলে জল দিলে তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ফল-ফুল-পাতায় আপনা আপনি জল দেওয়া হয়ে যায়। তেমনই পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসলে তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশস্বরূপ সমস্ত জীবকেও আপনা-আপনি ভালবাসা হয়ে যায়। গাছের মূল বাদ দিয়ে ফুল-ফল-পাতায় জল দিলে সেই কাজের কোনও মূল্য থাকে না, তেমনই ভগবানকে বাদ দিয়ে ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে হাজার হাজার কর্মফলবদ্ধ জীবকে সেবা করলে বা ভালবাসা অর্পণ করলে সেই ভালবাসারও মূল্য থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথা বলা হয়েছে। তাই প্রেমের প্রকাশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন দুঃখময় জন্ম-মৃত্যুর সংসার চক্র থেকে জীবকে যদি চিরতরে উদ্ধার করতে চাও তবে তাদের কৃষ্ণনাম কীর্তন, কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন ও কৃষ্ণসেবা অনুশীলন শিখিয়ে দিতে হবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"জড়জগতের বিচিত্র রকমের কর্তব্য বা ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত যদি হও তবে সমস্ত রকমের পাপ থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করব, সেই জন্য তোমার কোনও দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।"

ভগবানের তুষ্টিবিধান করলে জগতের সমস্ত কাজ সিদ্ধ হয়ে যায়। সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্।

প্রশ্ন ৩৬। বিয়ের পর মেয়েদের স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে নেই। কারও স্বামীর নাম যদি 'কৃষ্ণ' হয়ে থাকে তা হলে সে কি কৃষ্ণনাম করতে পারবে না?

উত্তর ঃ অবশ্যই কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে কীর্তন করতে পারবে।

প্রশ্ন ৩৭। হরিনাম জপ, একাদশী পালন, নিরামিষ আহার, গীতা-ভাগবত পাঠ আমি করি। কিন্তু এসব আমার আত্মীয়-স্বজনেরা মোটেই পছন্দ করে না। বরং তারা উপহাস ও ব্যঙ্গ করে। এ অবস্থায় তাদের সঙ্গে আমার কিভাবে সম্পর্ক থাকা উচিত?

উত্তর ঃ সবার পছন্দ একই রকম নয়। যার যেমনটি উপলব্ধি তেমনই তার আচার ব্যবহার। সাধারণত আমাদের সমাজে কেউ একজন কৃষ্ণভক্তিমূলক যথার্থ পন্থার অনুগামী হলেই অভক্তিমূলক আচরণে অভ্যস্ত গতানুগতিক সমাজের মানুষেরা এমনকি আত্মীয় পরিবারের লোকেরাও উপহাস করে চলেন। বর্তমানে এটা নতুন কিছু ঘটনা নয়। এভাবে চলে আসছে।

তবে, অনেক সময় দেখা যায়, কেউ গীতা-ভাগবত কেবলই পাঠ করে চলেছে, অথচ তার পারিবারিক অন্যান্য কর্তব্য-কর্মে অবহেলা হচ্ছে বা তার পারিবারিক অন্যান্যদের সাথে সহযোগী মনোভাবটা নেই। তখনই শুরু হয় গোলমাল।

তাই, যারা ভক্তি অনুশীলন করে, বিশেষত তাদের সহনশীলতা অভ্যাস করতে হয়। প্রথম অবস্থাতে, ভক্তি অনুশীলন সবারই করা উচিত বলে শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখাতে গেলে অন্যান্যরা স্বভাবতই উপহাস করতে থাকবে। সেই জন্য ভক্তি বস্তুটিকে অন্তরে গোপন রাখাই ভালো। প্রথম হরিনাম, একাদশী ব্রত, গীতা-ভাগবত পাঠ এমনভাবে করতে হবে যাতে কাউকেও বিব্রত করা হবে না, কেউ উপহাসের সুযোগও পাবে না।

তাছাড়া গৃহ-সংসার তথা এই জড় জগতে কেউই আমাকে কিছু বলবে না, আঘাত দেবে না, উপহাস করবে না, কেবল আমাকে সবাই ভালো বলতে থাকবে—এরকমটি আশা করা কখনই উচিত নয়।

প্রশ্ন ৩৮। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন দাম্ভিক নাস্তিকদের তত্ত্ব উপদেশ দিতে নেই। দাম্ভিক নাস্তিক কারা?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাং ॥

"হে উদ্ধব, তোমাকে আমি যেসব ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করলাম, তা তুমি দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, অশ্রদ্ধবান, অভক্ত ও দুর্বিনীত ব্যক্তিদের কখনই বলবে না।" যাদের সব সময় অভিমান—তারা দাম্ভিক। যারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না—তারা নাস্তিক। যারা ভক্তের কাছে ভক্তবেশ ধারণ করে অন্য কাজ উদ্ধার করে—তারা শঠ। ভক্তিবিষয়ক কথা শুনতে যাদের শ্রদ্ধা নেই—অশুশ্রূষু। যারা ভগবৎবিমুখ কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও বিষয়ী—তারা অভক্ত। যাদের মনে দৈন্য বা বিনয়ভাব নেই—দুর্বিনীত।

প্রশ্ন ৩৯। সবাই যদি ভগবদ্ধামে চলে যায় তবে তো সেখানে খুব ভীড় হবে এবং এই জগৎটি ফাঁকা হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ না। কখনই চিন্ময় জগতে ভীড় হবে না এবং কখনই জড় জগৎ ফাঁকা থাকবে না। কেননা চিন্ময় জগৎ হচ্ছে বিশাল রাজ্য আর জড় জগৎ হচ্ছে সেই রাজ্যের ক্ষুদ্র জেলখানার মতো। সুতরাং, জেলবদ্ধ ব্যক্তিরা যদি সবাই জেলমুক্ত হয়ে যায় তাহলে রাজ্যে অত্যন্ত ভীড় হবে—এমন ধারণা কোনও পাগল ছাড়া অন্য কেউ করে না। আর, রাজ্যের অপরাধপ্রবণ জীবেরা নতুন করে জেলবদ্ধ হতে থাকবে। কেননা জীবের স্বাতন্ত্র্য মনোভাব রয়েছে। যার ফলে সাধু মনোভাব থাকলেও কিছু কিছু অসাধু মনোভাবও কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়ে থাকে। অসাধুতার ফলেই অবশ্য জেলখানাগুলিতে লোক আসবে।

অতএব, ভগবৎধামে ভীড় হবে আর এই জগৎ ফাঁকা পড়ে থাকবে এরকম মনে করাটা আদৌ উচিত নয়।

প্রশ্ন ৪০। অষ্টসিদ্ধি কি?

উত্তর ঃ ব্রহ্মালোক, ধ্রুবলোক ইত্যাদি উচ্চতর গ্রহের অধিবাসীরা সকলে অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁরা ইচ্ছা অনুসারে অণুর মতো ক্ষুদ্র আকার ধারণ করতে পারেন—

এরকম সিদ্ধিকে বলে অণিমা। ইচ্ছামতো হালকা জলের উপর হেঁটে যেতে বা শূন্যে ঘুরে বেড়াতে পারেন—এরকম সিদ্ধিকে বলে লঘিমা। যে কোনও স্থান থেকে যা ইচ্ছা তাই প্রাপ্ত হতে পারেন—এরকম সিদ্ধিকে বলে প্রাপ্তি। অত্যন্ত ভারী হতে পারেন, এই সিদ্ধিকে বলে গরিমা। কোনও স্থানে কিছু অদ্ভুত জিনিষ সৃষ্টি করতে পারেন বা ইচ্ছানুসারে কোন জিনিস ধ্বংস করতে পারেন। এরকম সিদ্ধিকে বলে ঈশিতা। জড় উপাদান গুলোকে কেবল ইচ্ছা অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। একে বলে বশিতা। কোনও বাসনা চরিতার্থ করতে এবং কখনও নিরাশ না হওয়ার যে সিদ্ধি তাকে বলে প্রাকাম্য। ইচ্ছামতো বা খামখেয়ালীভাবে যে কোনও জড়রূপ ধারণ করতে পারেন। এই সিদ্ধিকে বলে কামাবসায়িতা।

উচ্চতর গ্রহের অধিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই এ সমস্ত সিদ্ধির অধিকারী। এজন্য তাদের কোনও অনুশীলন বা কোনরকম অলৌকিক পদ্ধতি শিখতে হয় না। তারা ইচ্ছা করলে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে কোনরকম আকাশযান ছাড়াই নিমেষের মধ্যেও ভ্রমণ করতে পারেন।

পৃথিবীতে দৈবক্রমে এই সিদ্ধিগুলির মাত্র একটিও কিংবা একটু-আধটুও যদি কেউ লাভ করতে পারে তবে সেই ব্যক্তিকে মূর্খেরা ভগবান বলেই মনে করে। যেহেতু পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে এই সিদ্ধিগুলি স্বাভাবিক নয়। তাই কেউ সিদ্ধি প্রদর্শন করলেই অত্যন্ত মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বলে লোকে তাকে মনে করে থাকে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াপুরে শ্রীধর ঠাকুরকে অষ্টসিদ্ধি প্রদান করতে চাইছিলেন। কিন্তু শ্রীধর ঠাকুর মনে করেছিলেন, এই সমস্ত সিদ্ধি জড় ব্রহ্মাণ্ডে লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা আনবে আর ভোগসুখ ইন্দ্রিয় তর্পণের পক্ষে ভালো হবে সেই জন্যে ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা প্রীতি ও সেবার জন্য মানসিকতাও থাকবে না। তাই তিনি সিদ্ধি নিতে চাইলেন না। তিনি মহাপ্রভুর নিত্য সেবায় যুক্ত থাকতে চাইলেন। বালেশ্বরের রেমুণাতে একজন লোক অন্যদের ভেলকি দেখানোর জন্য একটা ভাঙ্গা গাছের ডাল সহ শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছিল। লোকেরা হৈহৈ করছিল, বিস্ময়ের চক্ষুতে তাকিয়ে ছিল। মহাপ্রভুর ভক্ত রসিকানন্দকে লোকে সেই দৃশ্য দেখাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। রসিকানন্দ মুখের দাঁতনটিতে দাঁড়িয়ে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দিরের চারদিকে পরিক্রমা করলেন, মাটি থেকে এক হাত উঁচু হয়ে। তারপর বললেন, ওই সব সিদ্ধি নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই। শূন্যে ঘুরে বেড়ানোটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। একমাত্র কৃষ্ণনাম করাটাই জীবনের উদ্দেশ্য। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত ।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি লাভ করা।

প্রশ্ন ৪১। নিত্যবদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত জীব কাদের বলে?

উত্তর ঃ যে সমস্ত জীব কৃষ্ণভক্তি বাদ দিয়ে অনন্ত কাল ধরে অনন্ত জড় ব্রহ্মাণ্ডে জড় সুখ-দুঃখ ভোগ করে চলেছে। তাদের নিত্যবদ্ধ জীব বলে। কৃষ্ণভক্তি বিষয়ে তারা উদাসীন।

আর যে সমস্ত জীব চিন্ময় জগতে কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে প্রেমের সম্পদ আস্বাদন করে চলেছেন তাদের নিত্যমুক্ত বলা হয়। যে জীব বদ্ধ অবস্থায় থেকেও কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে যত্নশীল হচ্ছেন তাঁরাও মুক্তস্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকেন। কখনও কখনও বদ্ধ জীবের দুঃখময় বদ্ধ দশা মোচনের জন্য মুক্ত জীবেরা ভগবদ্ নির্দেশে এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে আসেন। কিন্তু নিত্যবদ্ধ জীব কিছুতেই কৃষ্ণভক্তি পন্থায় আগ্রহী হয় না।

প্রশ্ন ৪২। পরিবারের মধ্যে মা বাবা ভাই বোন স্বামী স্ত্রী-এসব আপনজনদের মধ্যে এত কলহ দুঃখ জ্বালা ও অশান্তি কেন? প্রতিকার কি?

উত্তর ঃ কৃষ্ণকেন্দ্রিক পরিবারে অশান্তি নেই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।

কৃষ্ণ পরমাত্মা। পরম আত্মাই জীবাত্মার আত্মীয় বা আপনজন। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যান্য আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা ক্ষণস্থায়ী। কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যখন সংসার পরিবার গঠিত হয় তখন সেই পরিবারের লোকেরা কৃষ্ণভক্তি বিরুদ্ধ আচরণেই অভ্যস্ত থাকে। তারা নেশাভাঙ করতে চায়, মাছ মাংস খেতে অভ্যস্ত হয়, নোংরা আজেবাজে সিনেমা দর্শন করে, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হয়। তাদের চেতনা ঘোর বৈষয়িক হয়ে যায়। ফলে তারা কথায় কথায় পরস্পরের অশান্তি সৃষ্টি করে।

সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন, কৃষ্ণনাম জপ কীর্তন, ব্রতাদি পালন, কৃষ্ণকথা শ্রবণ করলে ক্রমশঃ চেতনা শুদ্ধ হবে। তখন পরিবার কৃষ্ণকেন্দ্রিক হবে। পবিত্রতা ও শান্তি আসবে।

প্রশ্ন ৪৩। আমি কোনও ভালো কথা বললেও লোকে আমাকে উপহাস করে। কেন?

উত্তর ঃ ভালো কথায়ও যদি লোকে উপহাস করে, তবে বুঝতে হবে লোকের সেটা রোগ। রোগীলোকের ওপর বিক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়।

এক সময় শ্রীপরাশর মুনি জনকরাজাকে বলেছিলেন, সমাজে কোন্ ধরনের লোকেরা উপহাসাস্পদ হয়—(১) অন্যকে যে কাজ করতে দেখে আমি নিজে তাকে নিন্দা করি, স্বয়ং সেই কাজ কখনও করা উচিত হবে না, যদি স্বয়ং আমিও সেই কাজ করি, তবে নিশ্চয়ই আমি উপহাসের পাত্র হব। (২) রাজা বা নেতা যদি ভীরু হয়, (৩) ব্রাহ্মণ ব্যক্তি যদি সর্বভোজী হয়, মিথ্যাবাদী হয়, (৪) বৈশ্য যদি বেকার বা কর্মহীন হয়, (৫) শূদ্র যদি অলস হয়, (৬) বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি চরিত্রহীন হয়, (৭) কুলীন ব্যক্তি যদি অসদ্ ব্যবহার করে, (৮) স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয়, (৯) যোগী যদি কাম-ক্রোধ যুক্ত হয়, (১০) বক্তা যদি মূর্খ হয়, (১১) নরপতি যদি রাজ্যহীন বা প্রজার প্রতি স্নেহশূন্য হয়, তা হলে এই ধরনের ব্যক্তি সকলেরই উপহাসাস্পদ হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ৪৪। সংসারে সত্যবাদী হওয়া ভাল, না মন্দ?

উত্তর ঃ সত্য কথা বলা ভাল। কিন্তু সেই সত্য কথাটি সবার প্রিয় হওয়া চাই। এমন সত্যবাদী হওয়া উচিত নয় যেখানে সত্য কথা বললে সংসারে অন্য কারও মর্মে মর্মে যন্ত্রণাদায়ক হয়। আবার তোষামোদ করার মতো, কিংবা অন্য সবারই প্রীতিকর হবে এমন মিথ্যা কথাও বলা উচিত নয়।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ। সত্য কথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে। *ন ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্ ।* সেই সত্য বলবে না যা অপ্রিয়। *প্রিয়ং চ ন অনৃতং ব্রূয়াৎ।* প্রিয় হলেও মিথ্যা কথা বলবে না। *এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।* এটিই সনাতন ধর্ম। (মনুসংহিতা)

প্রশ্ন ৪৫। অনেক ব্রাহ্মণ আছেন যাঁরা আহার বিহার বসন—কত কিছুই চান। আবার অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁরা কারও কাছে কিছুই চান না। এই দুই ভাবের ব্রাহ্মণের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ?

উত্তর ঃ সদাচারী ব্রাহ্মণকে দান করাই ধর্ম। তাতে ব্রাহ্মণের কৃপাশীর্বাদ লাভ হয়। যেমন ক্ষত্রিয়ের ধৈর্য থাকলে তিনি দেশরক্ষা করেন, তেমনই ব্রাহ্মণের ধৈর্য থাকলে তিনি অযাচক হন। ব্রাহ্মণেরা ধৈর্যশালী ও বিদ্বান হলে দেবতারা প্রীত হন। ধৈর্যহীন সংযমহীন ব্রাহ্মণেরা 'এটা চাই, ওটা চাই' করে নিজের ভোগ সুখ কামনা করে থাকে। অবশ্য যাচক ব্রাহ্মণদের কিছু দান করলে দানশীল ব্যক্তির কোনও ক্ষতি হয় না, তবুও অযাচক ব্রাহ্মণদের—যাঁরা নিতান্ত দুঃখী হয়েও কারও কাছে কিছুই প্রার্থনা করেন না—তাঁদেরকে দান করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। কেননা তাঁরা জিতেন্দ্রিয় ও তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা। তাঁরাই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। (মহাভারত অনুশাসন পর্ব)

প্রশ্ন ৪৬। পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গ পিতা হি পরমং তপঃ ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা ॥

এই যদি শাস্ত্রের বাণী হয়, তবে পিতামাতাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করলে কি সর্বদেবতা সন্তুষ্ট হন? লোকমুখে শুনেছি উপস্থিত পিতামাতা তাঁদের পুত্রকন্যার পাপের অংশীদার হন। তাই ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখি, পুত্রার্থী মাতাপিতা বহু তপস্যা ও সাধনা করেন। ভগবৎ কৃপায় তাঁরা সুপুত্র লাভ করেন। পিতা মহান ভগবৎ-ভক্ত, মহান যোগী ও ধর্ম পরায়ণ। মাতা ভক্তিমতী, পতিসেবা পরায়ণ ও সদাচারিণী। তাঁদের সন্তানরাও মহান ভক্ত হয়। মাতাপিতার আদর্শ অনুসারে তারা দিনযাপন করে। সেই সব সন্তান মা-বাবার আশীর্বাদপুষ্ট ও আদরের ধন। সদ্গুণসম্পন্ন মাতাপিতা সেই সন্তানদের কাছে স্বর্গতুল্য। পরম তপস্যার ফলে মাতাপিতা ভক্তসন্তান লাভ করেন, আবার বহু ভাগ্যের ফলে কোনও ভক্তিমান সন্তান এরূপ পিতামাতা লাভ করেন। তাঁদের দর্শন করেই সমস্ত দেবদেবী সুখী হন। কারণ, তাঁরা ভগবানের নিষ্ঠাপরায়ণ সেবক।

কিন্তু যেখানে পিতামাতা ভগবদ্‌ভক্তির আদৌ অনুকূল নয়, সেই ক্ষেত্রে সন্তানদের কর্তব্য মাতাপিতার আদেশ-নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা।

যেমন, ব্রহ্মার উপাসক দৈত্যরাজ মহাপ্রতাপশালী হিরণ্যকশিপু তাঁর পুত্র প্রহ্লাদকে বারে বারে শিখিয়েছেন যে, "আমি তোমার পিতা, আমাকে ভগবদ্‌জ্ঞানে পূজা কর। আমার মতো ক্ষমতাশালী এই ব্রহ্মাণ্ডে কেউই নেই। আমাকে মারবার মতো জগতে কেউ জন্মায়নি।' কিন্তু শ্রীহরিভক্ত প্রহ্লাদ তাঁর বাবার বিপক্ষেই অনবরত শ্রীহরির নাম, শ্রীহরির গুণকীর্তন করতে লাগলেন।

রামায়ণে দেখা যায়, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বনে নির্বাসিত করে মা কৈকেয়ী নিজপুত্র ভরতকে অযোধ্যার রাজ সিংহাসনে বসাবার জন্য পাকা বন্দোবস্ত করলেন। এই ব্যবস্থার কথা যখন পুত্র ভরত শুনতে পেলেন, তখন কৈকেয়ীকে তিনি আর একবিন্দুও মাতৃমর্যাদা দিতে রাজী হলেন না।

এমন কি প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা তাঁর চার পুত্র—সনক, সনাতন, সনৎকুমার ও সনন্দনকে যখন প্রজা উৎপাদনের জন্য এই জড় জগতে দাম্পত্য জীবন গঠনের প্রেরণা দিলেন, তখন তাঁরা পূজনীয় পিতার সেই নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে শীঘ্রই ভগবানের চিন্ময় ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রয়াস করলেন। কারণ, পারিবারিক জীবন অনর্থক সময় নষ্ট করে।

সুতরাং, মাতাপিতা জড়জাগতিক হিসাবে যতই বিচক্ষণ ও মহান হন না কেন, তাঁদের সন্তানকে জড় জগতের জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুময় সংসারে আবদ্ধ করে রাখবার পন্থা যদি তাঁরা প্রদর্শন করেন, সেই ক্ষেত্রে সন্তানদের পক্ষে ভগবদ্‌বিমুখ হওয়ার ভয়ে পিতামাতার ইচ্ছা কিংবা নির্দেশ গ্রহণ না করাই বিধি।

শাস্ত্রে নির্দেশ রয়েছে, কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ করতে হবে, প্রতিকূল বিষয় বর্জন করতে হবে। *আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জনম্।* (চৈ.চ.মধ্য ২২/১০০)

প্রকৃত পিতামাতা তাঁদের সন্তানকে অবশ্যই কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত করেন। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥ (চৈ.ম.মধ্য)

মনুষ্য জন্ম অতীব দুর্লভ। এই জন্মে কৃষ্ণভজনা না করলে জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুময় সংসারে চিরবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। এই দুঃখময় জড় সংসার থেকে মনুষ্য জন্মে যে মুক্তির সন্ধান না করে তবে সেই ব্যক্তি 'আত্মহা' অর্থাৎ, আত্মঘাতী। এই কথাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—

ময়ানুকূলেন নবস্বতেরিতং।
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ (ভা. ১১/২০/২৭)

পিতামাতা এই মনুষ্য জন্মেই শুধু কেন, পশুপাখী, কীট-পতঙ্গ যেই দেহ নিয়েই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই জন্মেই পিতামাতা পাওয়া যায়। কিন্তু সহজে পরম পিতাকে পাওয়া যায় না। তাই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

সকল জন্মে পিতা মাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ, গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায়॥ (চৈঃ মঃ মধ্য)

যে পিতামাতা তাঁদের সন্তানদের কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত করেন, সেই পিতামাতাই পূজনীয় ও ধন্য।

কিন্তু বর্তমান কালে, অধিকাংশ মাতাপিতা ও তাদের সন্তানসন্ততি নরকের যাত্রী বললেই চলে। মাতাপিতা ভগবৎ বিমুখ জীবনে কেবল চিন্তা করতে থাকে, সন্তানকে কি করে খাওয়াবে আর পরাবে। উচ্ছৃংখলতার মধ্যে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। মাছ-মাংস খাওয়া, বিড়ি-সিগারেট ফোঁকা, নোংরা সিনেমা উপভোগ করা, তাস-পাশা খেলা, আজেবাজে প্রজল্প করা, রাজনীতি-দুর্নীতি নিয়ে মশগুল থাকা, স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গ লালসা চরিতার্থ করা—এইভাবে দিনরাত যাবতীয় ভগবদ্‌বিরোধী আচরণ করে চলে। গাধার মতো পরিশ্রম করা আর শূকরের মতো সুখভোগ করাই মানব জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেক্ষেত্রে উপস্থিত পিতামাতা সন্তানদের পাপের ভাগী হবে—এই ধারণারও কোনও মূল্য নেই। কারণ, যে মাতা-পিতা শ্রীহরির ভক্ত নয়, তারা কোনদিনই তাদের সন্তানকে দুঃখময় ভবচক্র থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে দৃঢ়ভাবে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে যিনি জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুময় জড় সংসার থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তবে তাঁর পক্ষে কখনও পিতা বা মাতা হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ, সেই পিতার সন্তান উৎপাদনে যত্ন করার প্রয়োজন নেই, এবং সেই মাতার গর্ভধারণ করাও উচিত নয়। কৃষ্ণভক্তি যিনি দিতে পারেন না, তাঁর পক্ষে কারও পতি হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ, তাঁর বিবাহ করা উচিত নয়। এমন কি যে দেবতা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারেন না, তাঁরও কারও পরমারাধ্য দেবতা হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ, কারও কাছে পূজা গ্রহণ করা উচিত নয়। (ভাঃ ৫/৫/১৮)

প্রশ্নানুসারে, মাতাপিতা সন্তানের পাপের ভাগী হবেন। কিন্তু মাতাপিতাকে পাপের ভাগী করিয়ে লাভ কি হল? বরং পাপের ভাগী করিয়ে নরককুণ্ডের নির্মম যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য মাতাপিতাকে ঠেলে দেওয়াই হল। অর্থাৎ, মাতাপিতার সঙ্গে জঘন্য রকমের শত্রুতা করা হল।

বেদের বর্ণনা অনুসারে 'পুৎ' নামক একটি নরক রয়েছে এবং সেই নরক থেকে যে 'ত্রাণ' করে তাকে বলা হয় 'পুত্র'। তাই লোকে পুত্র উৎপাদনে যত্ন নেয়। উপযুক্ত পুত্রলাভের উদ্দেশ্যেই লোকে পত্নীর পাণিগ্রহণ করে। নিছক কুকুর-বিড়ালের মতো যৌনতৃপ্তির জন্য বিবাহ নয়। নরক থেকে পিতাকে উদ্ধার করতে পারে বলেই সে পুত্র। যদি সেই সব যোগ্যতা অর্জনের কোন চেষ্টা তার না থাকে, তবে সে আবর্জনা স্বরূপ—তখন সে মূত্রের সমান। আসুরিক ও অভক্ত যে পুত্র তার পিতাকে নরকের অন্ধতম প্রদেশ থেকে উদ্ধার করতে না পারে, সেই পুত্রের কি মূল্য?

"তাই পিতার কর্তব্য হচ্ছে, নিজে বৈষ্ণব হয়ে পুত্রদেরও বৈষ্ণব হওয়ার শিক্ষা দেওয়া; তা হলে পিতা যদি ঘটনাক্রমে কোনও কারণে পরবর্তী জীবনে নরকে পতিতও হয়, তার সুযোগ্য পুত্র তাকে উদ্ধার করতে পারবে, ঠিক যেমন পৃথু মহারাজ তাঁর পিতাকে উদ্ধার করেছিলেন।" (ভাঃ ৪/২১/৪৬ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

যিনি আমাদের সমস্ত রকমের পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারেন সেই মুকুন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) শরণাপন্ন হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

অর্থাৎ, "জগতে সমস্ত রকমের ধর্মের ব্যবস্থাপনা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আমাতেই শরণাপন্ন হও, তা হলে আমিই তোমাকে সমস্ত রকমের কর্তব্য-অকর্তব্য জনিত পাপ থেকে উদ্ধার করব। এই বিষয়ে কোনও সংশয় করো না।" (গীতা ১৮/৬৬)

এই রকম দৃঢ় প্রতিশ্রুতি একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কেউ কোথাও প্রদান করেননি। অতএব সর্বপ্রযত্নে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করাই শ্রেয়। শ্রীকৃষ্ণই হলেন সমস্ত জীবের বীজপ্রদ পিতা।

নীচ বংশেও যদি কেউ কৃষ্ণভক্ত হয়, তবে সেই বংশের পাপ সব নষ্ট হয়ে যায়। যেমন, অসুর বংশে জন্মগ্রহণ করেও প্রহ্লাদ কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিকে পরম আরাধ্যরূপে গ্রহণ করলেন। ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে বলছেন, "তোমার মতো ভক্তপুত্র লাভ করে তোমার দুরাচারী পিতা সহ একুশ পুরুষ পর্যন্ত পাপমুক্ত হয়ে নরকগতি থেকে উদ্ধার পেল।"

যার বংশে বৈষ্ণবের হয় উতপতি ।
হীন বা পামর কিংবা দুষ্ট জাতি ॥
পবিত্র সকল কুল, বংশের উদ্ধার ।
সাধুসঙ্গে তরে সব পাপী দুরাচার ॥

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ৭/৩/২৯৬-২৯৭)

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও উল্লেখ করেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপিমাম্ ॥

অর্থাৎ, "যারা দেবতার উপাসক তারা দেবলোক প্রাপ্ত হবে; যারা ভূত-প্রেতের উপাসক, তারা ভূতলোকই লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষের উপাসক, তারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে; এবং যারা আমার উপাসনা করে, তারা আমাকেই লাভ করে।" (গীতা ৯/২৫)

প্রশ্ন ৪৭। মাতা গুরু, পিতা গুরু ও দীক্ষা গুরু—এই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে?

উত্তর ঃ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—

যে-ই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সে-ই 'গুরু' হয় ।

(চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮/১২৭)

কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ ছাড়া যে কেউ 'গুরু' হতে পারেন না। শ্রীগুরুদেবই জড়-সংসারবদ্ধ জীবকে দিব্যজ্ঞান দান করে ভগবদ্ধামের সন্ধান দেন।

চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই।
দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

প্রতি জন্মে মাতা পিতা সহজেই লাভ হয়। কিন্তু সব জন্মে পারমার্থিক গুরুকে পাওয়া যায় না।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায় ।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায় ॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

বদ্ধ জীব নানা যোনি ভ্রমণ করতে করতে নানাপ্রকার পশুপাখি, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, মানুষ ইত্যাদি দেহ লাভ করে এবং নানা কর্মফল ভোগ করতে করতে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে। তখন তার কত মাতাপিতার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু অত্যন্ত ভাগ্যবান না হলে পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৯/১৫১)

যে কেউই গুরু হতে পারেন না। গুরুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। তিনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে পরম্পরা সূত্রে আগত প্রতিনিধি। পরম্পরার নির্দেশ অনুসারে তিনি গুরুরূপে জগজ্জীবকে উদ্ধার করবার জন্য আসেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাই নির্দেশ দিয়েছেন—

আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ ।

জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় সংসারচক্রে আবদ্ধ জীবের তাঁরাই প্রকৃত পিতামাতা যাঁরা সন্তানকে এই জড়বদ্ধ জীবনধারা থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ গুরুর সমীপে প্রেরণ করেন।

সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা ॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

শ্রীগুরুদেব দীক্ষাদান করে শিষ্যকে কলুষমুক্ত করে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন। যারা পারমার্থিক দীক্ষাগুরুকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তাদের বৈষ্ণব অপরাধ হেতু নরকে গতি হয়।

গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ ॥

"যে গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধি করে, সে নারকী।" (পদ্মপুরাণ)

শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন পারমার্থিক পিতা। সবার পূজনীয়। জড়জাগতিক সমস্ত মাতাপিতার কর্তব্য হল পারমার্থিক পিতাকে সম্যক্‌ভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা। অতএব দীক্ষা গুরুই সর্বশ্রেষ্ঠ, সব চেয়ে বড়।

প্রশ্ন ৪৮। লোকে বলে বিবাহ না করলে ধর্ম হয় না। কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ বিবাহ করেও মানুষের ধর্ম হয় না। ধর্ম হল ভগবানের দেওয়া নিয়মকানুন। *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রণীতম্।* অধিকাংশ মানুষ সেই নিয়ম ভঙ্গ করছে। ধর্ম পালন করছে না। বিবাহ সংস্কার বিধি সম্পর্কে অধিকাংশ ব্যক্তিই অজ্ঞ। ইন্দ্রিয়পর ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য পরিবার, সমাজ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হচ্ছে, তার ভূরি ভূরি নজির হামেশাই পাওয়া যাচ্ছে।

বিবাহ বিচ্ছেদ, বধূ নির্যাতন, বধূহত্যা, পতিহত্যা, আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, নাবালক শিশুহত্যা, ভ্রাতৃবিরোধ, সম্পত্তি দখল, কুটুম্ব বিরোধ ইত্যাদি অঘটন প্রতিদিন দেশের কোথাও না কোথাও যেভাবে ঘটে চলেছে, তা থেকে কারও বুঝতে আর বাকি নেই যে, বহু মানুষের বিবাহিত জীবনের আনন্দ নারকীয় বিষণ্ণ জীবনে পরিণত হয়েছে। তাদের বিবাহ করার ফ্যাশনটাই শেষে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও তারা প্রথমে জেনেছিল সেটি তাদের কতই না সাধের 'শুভ পরিণয়'।

বিবাহ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল বিশেষরূপে বহন করা। অর্থাৎ, পারিবারিক দায়িত্ব এমনভাবে বহন করতে হয় যাতে বিবাহিত জীবন নারকীয় জীবনে পর্যবসিত না হয়।

আবার দেখা যায়, অনেকে বিবাহ করছে না, অথচ বিবাহ বহির্ভূত উচ্ছৃঙ্খল সঙ্গে লিপ্ত হচ্ছে। কেউ বা বিয়েপাগলা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিবাহিত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে। তবে বদ্চরিত্র ব্যক্তিরা বিবাহিত হয়েও উত্তরোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িয়ে চলে।

যারা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করে না, তাদের সব দিকই পরিণামে গণ্ডগোল। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীহরির সন্তোষ বিধান করা। বিবাহ অনুষ্ঠানও একটি যজ্ঞ। বিবাহযজ্ঞ। বর-বধূ যদি ভক্ত না হয়, তবে তারা কখনই ভগবানের সন্তোষবিধান করতে পারবে না। অভক্তের বিবাহ অনুষ্ঠান কখনই শুভ নয়।

অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, ভক্তি পথের উপদেশ দ্বারা যে ব্যক্তি তার পত্নীকে মৃত্যুরূপ সংসার চক্র থেকে মোচন করতে পারবে না, সেই ব্যক্তির বিবাহ করা উচিত নয়, সে কারও পতি হওয়ার উপযুক্ত নয়। আবার বিবাহের পূর্ণতা লাভ হয় সন্তানের পিতা-মাতা হওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু পিতা-মাতা যদি সন্তানকে জন্ম-মৃত্যুর ভবদশা থেকে উদ্ধার পাওয়ার পন্থা না শেখাতে পারে, তবে তারা পিতা-মাতা হওয়ার যোগ্য নয়। তাদের সন্তান উৎপাদনে যত্নশীল হওয়াই উচিত নয়।

এই ধরনের উপদেশ শ্রীঋষভদেব তাঁর পুত্রদের প্রদান করেছিলেন। এই সমস্ত শিক্ষা মানুষ যদি না পায়, তবে তার জীবন কুকুর বিড়ালের সমতুল্য। *ধর্মেণ হীনা পশুভিঃ*

সমানা। তাই মানুষকে ধর্মপরায়ণ হতে হবে, ভক্তিময় জীবন গ্রহণ করতে হবে, তারপর সে বিবাহ করুক আর নাই করুক, তাতে কিছু যায় আসে না। গৃহে থাকো, বনে থাকো, সদা 'হরি' বলে ডাকো। হরিভজন ছাড়া সবই অধর্ম। হরিভজনের অনুকূল হলে সমস্ত অনুষ্ঠান ভাল, হরিভজনের প্রতিকূল বিষয় গ্রহণ করে যে সমস্ত অনুষ্ঠান তা পরিণামে মন্দ।

প্রশ্ন ৪৯। পিতামাতার সেবা করলে ভগবানের সেবার প্রয়োজন নেই। কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—"আমিই সবার পিতা-মাতা" (গীতা ৯/১৭)। এই জড় জগতের অন্যান্য মাতা-পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষণিক এবং অনিত্য। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তা নিত্য এবং শাশ্বত। যেহেতু পরমেশ্বর ছাড়া জগতের সমস্ত সম্বন্ধই ভিত্তিহীন, সেই হেতু যাদের সঙ্গে আমরা মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়েছি, সেই সম্পর্কের কোনও প্রকার মূল্য থাকবে না, যদি আমরা ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ ভুলে যাই।

এই মানব-শরীরে বর্তমান যাদের পিতা-মাতা বলা হচ্ছে, দেহ বিনাশের পর সেই সম্পর্ক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর পুত্র কোথায়, পিতা কোথায়, মাতা কোথায়, তার কোনও হদিশই থাকে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকলের জন্ম-জন্মান্তরের তথা চিরন্তনের সাক্ষী ও নিত্য পিতা। *অহং বীজপ্রদঃ পিতা।* (গীতা ১৪/৪)

এই জগতে অভক্ত হয়ে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। এবং কখনও তা উচিত নয়। পরমেশ্বর ভগবান সবাইকে আহ্বান করছেন, "আমার ভক্ত হও" (মদ্ভক্ত)। কৃষ্ণভক্তি যার আছে সে-ই ভক্ত। ভক্তি, অর্থাৎ আমাদের সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানেরই সেবা—*হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।* (শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র) অভক্ত যারা, তারা অসুর প্রকৃতির। অসুরেরা কৃষ্ণভক্তিবিরোধী। শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়েই তারা অন্য সবার সেবা করতে চায়। তাদের কর্মফল পরিণামে মন্দ।

অভক্তরা শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে ধর্ম করতে চায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "সব ধর্ম বাদ দিয়ে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তা হলে এই জড় জগতের কার প্রতি কি কর্তব্য না কর্তব্য—সেই বিষয়ে কোনও দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই।"

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

তারপর তিনি বার বার বলছেন, *মন্মনা ভব*—"আমাতেই তোমার মন রাখো।"

যেহেতু কৃষ্ণভক্তিই দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের একমাত্র পন্থা যার মাধ্যমে এই ত্রিতাপ দুঃখপূর্ণ জড় জগৎ থেকে উদ্ধার পেয়ে নিত্যানন্দময় চিন্ময় ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়া যায়, সেই হেতু পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রত্যেক মানুষের অবশ্যই নিত্য কর্তব্য। তাঁরাই প্রকৃত পিতা-মাতা, যাঁরা সন্তান-সন্ততিকে ভগবানের সেবা করতে নির্দেশ দেন।

সেই সে পরমবন্ধু সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥
প্রতি জন্মে জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণগুরু নাহি মেলে ভজহ হিয়ায়॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

জন্ম-জন্মান্তরের লক্ষ কোটি পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে আসা হয়েছে। তাদের কথা কেউই চিন্তা পর্যন্ত করছে না। সেই সমস্ত স্নেহশীল পিতা-মাতারা কোথায় কালের অতলতলে হারিয়ে গেছে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। অথচ, কেবলমাত্র এই জন্মে কৃষ্ণভক্তি সেবায় যুক্ত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মূর্খেরা এই জন্মের পিতা-মাতার সেবা করতে হবে বলে একটি অনর্থক হুলস্থুলা শুরু করে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত হলে যে কত শত পিতা-মাতার সন্তুষ্টি বিধান করা যায়, সেই সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি মূর্খেরা আদৌ বুঝতে চায় না।

তারা এ-ও জানতে চাইছে না যে, প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণসেবা ও পিতা-মাতার সেবা কোনও বিপরীত সেবা নয়। পিতা-মাতাকে নিয়ে স্বয়ং কেবল কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত থাকতে হবে। একজন পুত্র হিসাবে পিতা-মাতাকে সেবা করতে হলে তাঁদের কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত করাতে হবে। কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ, কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কৃষ্ণনাম কীর্তন, কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ, কৃষ্ণভাবনাময় সমস্ত কার্যে তাঁদের সংযুক্ত করতে হবে।

কৃষ্ণভক্ত পুত্রই একমাত্র তার পিতা-মাতাকে নরক থেকে উদ্ধার করতে পারে। অভক্তরা নিজেরাই নিজেকে উদ্ধার করতে পারে না, তারা আবার কাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে পারে? বৈদিক স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে—*পুন্নাম্নো নরকাৎ ত্রায়তে ইতি পুত্রঃ।* পুৎ নামক নরক থেকে বিপথগামী পিতাকে যে ত্রাণ করতে পারে, সে-ই পুত্র পদবাচ্য। নরক থেকে উদ্ধার করতে অযোগ্য পুত্র পুত্রপদবাচ্য নয়, সে মূত্র-সদৃশ বলে কথিত।

বুদ্ধি বিপর্যয়ক্রমে কিংবা অজ্ঞতাবশত কৃষ্ণভক্তিসেবায় যারা সময় দেয়নি, তাদের সন্তান যদি কোন ভাগ্যক্রমে ভগবদ্ভক্ত হয়, সেই ভক্তই সেই কলুষিত বংশকে পাপমুক্ত করবে। শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজকে বলছেন—

যে বংশে জন্মিলে তুমি ভকতপ্রধান।
সবংশে তাহার কুল পাইল পরিত্রাণ॥
যাঁর বংশে বৈষ্ণবের হয় উতপতি।
হীন বা পামর কিংবা দুষ্ট জাতি॥
পবিত্র সকল কুল, বংশের উদ্ধার।
সাধুসঙ্গে তরে সব পাপী দুরাচার॥

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ৭/৩/২৯৫-২৯৭)

শাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তের সেবা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতা যদি কৃষ্ণভক্ত হন, তবে মঙ্গল। কিন্তু পিতা-মাতা অভক্ত হয়ে থাকবে, কলির আড্ডায় যুক্ত থাকবে

অর্থাৎ, মাছমাংস খাবে, বিড়ি, সিগারেট, চা, তামাক, পান, জর্দা ইত্যাদি নেশা করবে, তাস, পাশা, জুয়া খেলা এবং আজেবাজে জড়জাগতিক গল্প গুজব করবে, অশ্লীল সিনেমা, ভিডিও, টিভি চিত্র ইত্যাদি দর্শন করবে, অবৈধ সঙ্গে যুক্ত হবে—অথচ নামকীর্তন করবে না, হরিকথা শুনবে না, এই রকম ব্যক্তিরা যত বড় পিতা-মাতা হোক না কেন, তারা নারকী জীব মাত্র। ভক্তিপ্রতিকূল সেই সব ব্যক্তিদের পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ তাদের কাছে সন্তান-সন্ততির শিক্ষণীয় কিছুই নেই।

বদমেজাজী মানুষেরা কত রকমের যুক্তি খাড়া করেই চলে। তারা নির্বিচারে নির্দ্বিধায় সারাদিন ধরে কত রকমের কু-বিষয় অবাধে স্বীকার করে চলে। অথচ যখনই ভগবানের কথা বলা হয়, যখনই কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করতে বলা হয়, তখনই তারা হঠাৎ তথাকথিত যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে। হঠাৎ জড় বৈজ্ঞানিক সেজে বসে। যদিও বা তাদের সেই সমস্ত যুক্তি এবং ব্যাখ্যা একেবারেই ভিত্তিহীন।

সর্ব প্রযত্নে আমাদের জানতে হবে যে, আমাদের চেতনা ও জীবনীশক্তির উৎস হলেন পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান। তিনিই সমস্ত কিছুর উৎস। *অহং সর্বস্য প্রভবঃ* (গীতা ১০/৮) অন্য কেউ নয়। আমাদের জীবন তাঁর সেবাতেই যুক্ত হওয়া যথার্থ। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই তার কর্তব্য। তার সেই নিত্য শাশ্বত সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন প্রকার অনুসন্ধান না করে অনিত্য জড় সম্পর্ক নিয়েই মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

যদিও বা বর্তমান সমাজে পিতা-মাতার কাছ থেকে সম্পত্তি আদায় করে নিয়ে পুত্ররা তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে তাদেরই সুখস্বাচ্ছন্দ্যে যেভাবে নজর দেয়, ততটা পিতা-মাতার প্রতি দরদ নেই, তবুও তাদের সেই বিষয়ে কেউ তেমন প্রশ্ন করে না। অথচ, যখনই কেউ গৃহস্থ জীবন গ্রহণ না করে মঠ মন্দিরে এসে কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত হতে চায়, তখন 'পিতামাতার সেবা কে করবে?' সেটিই লোকে প্রশ্ন করতে শুরু করে। এটি এক বিচিত্র মানসিকতা।

মঠ মন্দিরে পালিয়ে আসতে কাউকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, পিতা হোক, মাতা হোক, পুত্র কন্যা যেই হোক না কেন, সবাইকেই সর্বপ্রযত্নে কৃষ্ণসেবায় যুক্ত থেকে এই সুদুর্লভ মানব-জন্ম সার্থক করতে হবে।

তাই ইসকন হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘ কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দানের জন্যই প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

................নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥
প্রভুর আজ্ঞায়, ভাই; মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার ।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম—সর্বধর্মসার ॥

প্রশ্ন ৫০। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। এই কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ আমাদের জানা উচিত যে, স্বর্গ হল সুখ ভোগের স্থান। সেখানে পুণ্যবান ব্যক্তি গমন করতে পারেন। সেখানকার অধিবাসীদের দৈহিক বল ও সৌন্দর্য, রূপ ও গুণ, ঐশ্বর্য, তাঁদের আয়ুষ্কাল এই পৃথিবীর যে কোনও মানুষের তুলনায় বহু বহু গুণে অধিক। জরা-ব্যাধি যেমনটি পৃথিবীর মানুষকে ভুগতে হয়, স্বর্গের দেবতাদের তেমনটি ভুগতে হয় না। ঝড়-ঝঞ্জা, ঘুর্ণি-বাত্যা, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী, মড়ক, কলেরা, বসন্ত, ক্যানসার ইত্যাদির উপদ্রব ও উৎপাত স্বর্গে নেই। ধনে মানে ঐশ্বর্যে স্বর্গের বাসিন্দারা পৃথিবীর মানুষদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ উন্নত।

তার তুলনায় আমরা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি, সেই স্থান মোটেই উন্নত নয়। প্রতিদিন অশান্তি উৎপাত উপদ্রবের মধ্যে জীবন যাপন করা অসহনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অস্বস্তিকর পরিবেশ, অভাব অনটন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানুষের কদর্য আচরণ, রাজনৈতিক দাঙ্গা, প্রতারণা ইত্যাদি আমাদের জীবনকে বিষিয়ে তুলছে। অতএব এই আমাদের জন্মভূমি নিশ্চয়ই স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী কখনই নয়।

আবার, জননীও স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী—এই কথাও আপেক্ষিক। জননী যদি সন্তানকে এই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় সংসারচক্র থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের অভয়চরণ-কমলে আত্মসমর্পণের শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রেরণা না দেন, তবে সেই জননী উপযুক্তা নন। শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশিত হয়েছে—

.........*জননী ন সা স্যাৎ ।*
.........*ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥*

অর্থাৎ, "ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যে জননী তাঁর সন্তানকে সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার থেকে মোচন করতে না পারেন, সেই জননী 'জননী' হওয়ার উপযুক্তা নন।" (ভাঃ ৫/৫/১৮)

যে কোনও সন্তানই প্রথম চোখ মেলেই তার জননীকে চিনতে শেখে। জননীই তার প্রথম শিক্ষার গুরু। সন্তানের গুণগুলি প্রায়ই জননীর গুণের অনুরূপ হয়। জননী যদি পুণ্যবতী, ভক্তিমতী নিষ্ঠাপরায়ণা হন, তবে সন্তানও জন্ম সূত্রে শুদ্ধ চরিত্র লাভ করে। কিন্তু জননী যদি অভক্ত হন, তবে তিনি সন্তানেরা মঙ্গলবিধান করতে পারবেন না।

আমাদের জানা উচিত যে, এই জন্মের জননী এবং জন্মভূমির সঙ্গে পূর্বজন্মে কোনও সম্বন্ধই হয়ত ছিল না, আবার, আমাদের মৃত্যুর পরও অবধারিতভাবে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যায়। এই জন্মে যাঁকে জননী এবং যে-স্থানকে জন্মভূমি বলে লম্ফঝম্প করছি, পূর্ব জন্মে তিনি আমার জননী ছিলেন না, এই স্থান আমার জন্মভূমিই ছিল না। আবার,

দেহত্যাগের পর যখন পুনর্জন্ম গ্রহণ করব, তখন অন্য কাউকে জননীরূপে, অন্য কোনও স্থানকে জন্মভূমিরূপে গ্রহণ করতে হবে। অতএব, সে সম্বন্ধ পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী, যে সম্বন্ধ চিরন্তন নয়, সেই সম্বন্ধ নিয়ে কিসেরই বা এত গরিমা থাকতে পারে?

তবে, সেই জননীর কোলে বা সেই জন্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করে যদি মানুষ নিত্য শাশ্বত সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হওয়ার জন্য পরম নিয়ন্তা সর্বান্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হয়, তবে তার জাগতিক সম্বন্ধও সার্থক হয়। যে কুলে ভগবদ্ভক্তের আবির্ভাব হয়, সেই কুল ধন্য, সেই দেশ ধন্য। ভগবান বলছেন—

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ ॥

অর্থাৎ, "যেখানে যেখানে প্রশান্ত, সমদর্শী, সদাচারযুক্ত এবং সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত আমার ভক্তেরা বাস করে, অত্যন্ত অধঃপতিত হলেও সেই স্থানের এবং সেই বংশের মানুষেরা পবিত্র হয়ে যায়।" (ভাঃ ৭/১০/১৯)

এই কথাটি *শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী* শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যা'র বংশে বৈষ্ণবের হয় উৎপতি ।
হীন বা পামর কিংবা দুষ্ট পাপজাতি ॥
পবিত্র সকল কুল, বংশের উদ্ধার ।
সাধুসঙ্গে তরে সব পাপী দুরাচার ॥

(কৃঃ প্রেঃ ৭/৩/২৯৬-২৯৭)

কিন্তু, যারা ভক্তিমূলক আচরণ করে না, ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ গ্রাহ্য করে না, অথচ তারা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছে যে-স্থানে, সেই স্থানটিকে পরম পূজনীয় জন্মভূমি বলে গর্ববোধ করে; তাদের অনিত্য দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যদেরকে আত্মীয়-স্বজন বলে মনে করে, এই ধরনের মানুষদেরকে বৈদিক শাস্ত্রে গরু এবং গাধার সমতুল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি 'কফপিত্ত বায়ু বিশিষ্ট তার জড় দেহটাকে আত্মবুদ্ধি করে, দৈহিক সম্পর্কে গঠিত স্ত্রীপুত্র জনক-জননীকে আত্মীয় স্বজন বলে মনে করে, জন্মভূমিকে পূজনীয় বলে মনে করে,......কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করেন না, সেই ব্যক্তি একটি গরু বা গাধার মতোই নির্বোধ।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৮৪/১৩)

জন্মভূমির প্রতি আসক্ত ব্যক্তিরা—এমন কি বিখ্যাত কোন কোন কবিও গাহিতে পারেন "এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।" কিন্তু এই রকম জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হতে কোনও বুদ্ধিমান মানুষ কামনা করেন না। কারণ 'জন্ম-মৃত্যুর

পরপারে' *তদ্ধাম পরমং মম*—ভগবানের সচ্চিদানন্দময় পরম ধামে উন্নীত হওয়ার জন্য ভারতীয় সনাতন ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেয়।

এই জগৎ দুঃখময় *(দুঃখালয়ম্)* কারণ এখানে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি রয়েছে। কেউই এখানে সুস্থিরভাবে থাকতে পারে না। কারণ এই জগৎ পরিবর্তনশীল *(অশাশ্বতম্)*। এই ক্ষণিক জন্মে মনুষ্যরূপে আমি অবস্থান করছি, পরজন্মে হয়ত কীটপতঙ্গ হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হব।

শাস্ত্রে বলেছে, চুরাশি লক্ষ প্রকার জীবযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, তারপর মৃত্যু বরণ করে আমরা কত কোটি কোটি জন্ম ধরে ভ্রমণ করেছি। বিধির বিধানে সেই জন্ম-মৃত্যুর চক্রের শেষ পর্যায়ে আজ সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করেছি।

আবার এই জড়জগতে *'পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী-জঠরে শয়নম্'*—এই বাসনা পোষণ করা মোটেই শুভবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। ভাগবত-শিক্ষা অনুসারে কৃষ্ণভক্তি চর্চা না করে, জন্ম-মৃত্যুর সমাধান না করে এই জন্মভূমিকে নিয়ে আর এই জড় দেহকে নিয়ে গর্ব বোধ করার কোন কিছুই নেই।

প্রশ্ন ৫১। বিশেষ করে সহধর্মিণী পত্নী যদি কৃষ্ণবহির্মুখ হয়, বহু চেষ্টা করেও যদি কৃষ্ণোন্মুখী করা না যায়, সেই ক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য?

উত্তর ঃ সহধর্মিণী পত্নীর কর্তব্য কৃষ্ণভক্ত পতির সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করা। নতুবা 'সহধর্মিণী' হওয়ার কোনও মূল্যমর্যাদা থাকে না। দুর্ভাগ্যবশত পত্নী যদি কৃষ্ণভক্ত না হন, তবে কৃষ্ণভক্ত পতির কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণপাদপদ্মে পত্নীর মঙ্গল ভিক্ষা করা, পত্নীকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে কৃষ্ণভক্তির উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেওয়া, তাঁর সঙ্গে শান্ত শিষ্ট আচরণ করা। তাতেও যদি পত্নী ভক্তিবিমুখ হন, তা হলে *প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জনম্* সূত্রে সেই গৃহ ত্যাগ করে বনবাসী হওয়া কর্তব্য। অন্যথায় পত্নীর যাবতীয় পাপের ভাগী হতে হয়। পতি, পত্নী, পুত্র, কন্যা যে-ই হোক না কেন, এই কলিযুগে তাঁরাই ধন্য হবেন যাঁরা কৃষ্ণভাবনাময় জীবনযাপন করবেন।

প্রশ্ন ৫২। আমি কৃষ্ণভজন না করে যদি দেশ সেবায় ব্রতী হই, তবে আমার মৃত্যুর পর বহু কোটি লোক আমার আত্মার সদ্‌গতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করবে, তাতে আমার আত্মোন্নতি কি হবে না?

উত্তর ঃ প্রশ্নটিতে 'আত্মা', 'আত্মার সদ্‌গতি', 'আত্মোন্নতি' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি আসলে কি? তা যদি আমরা না বুঝি তবে নিছক 'আমার আত্মার সদ্‌গতির জন্য বহু কোটি লোক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করবে, এই কথাটি পাগলের প্রলাপের মতো হয়ে দাঁড়ায়।

'আত্মা' হল পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য অংশস্বরূপ, *মমৈবাংশো জীবলোকে* (গীঃ ১৫/৭)। ভগবদ্ বিমুখ হওয়ার দোষে অর্থাৎ, ভগবদ্ সেবার কথা ভুলে সে মায়ারূপী জড় আনন্দভোগ করতে এই দুঃখময় জগতে অধঃপতিত হয়েছে—

কৃষ্ণ ভুলি সে-ই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

(চৈঃ চঃ ম ২০/১১৭)

'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে ॥ (প্রেমবিবর্ত)

কৃষ্ণ নিত্য, কৃষ্ণের সেবাও নিত্য, কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্পর্কও নিত্য। অংশকণা জীবের যথার্থ তাৎপর্য হচ্ছে পূর্ণ-পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা।

'আত্মার সদ্‌গতি' বলতে বোঝায় ভগবানের পাদপদ্ম সেবায় উন্নীত হওয়া, নিত্য ভগবদ্ধামে ভগবদ্ সেবায় যুক্ত হয়ে নিত্যানন্দময় জীবন লাভ করা, *তদ্ধাম পরমং মম* (গীঃ ১৫/৬)। ভগবানের পাদপদ্মে ফিরে যাওয়াই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মের একমাত্র সার্থকতা। কিন্তু 'কৃষ্ণভজন' ছাড়া 'আত্মার উন্নতি' অসম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর পরমনিয়ন্তা, তিনিই বলছেন এই জগৎ দুঃখময় *দুঃখালয়ম্* (গীঃ ১৫/৬)। কৃষ্ণসেবা বিমুখ অর্থাৎ, কৃষ্ণবহির্মুখ জীবদের জন্য এই জেলখানা রূপী জড় জগৎ তৈরি হয়েছে, অথচ আমরা এখানে বদ্ধ জীব হয়েও বাহাদুরী দেখিয়ে এই জগতের অন্য সমস্ত বদ্ধ জীবের চাল-ডাল-তেল-ওষুধপাতি কাপড়-চোপড় বাসা-আশা দিয়ে তাদের সমস্যা সমাধান করতে চাইছি। যদিও বা আমি নিজেই সমস্যা-জর্জরিত। আমি নিজেই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অসুখ-বিসুখ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়ে কাতর হই, অথচ আমি অপরের ক্ষুধা-তৃষ্ণার সব সমাধান করে দেব বলে অনর্থক সংকল্প করি।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা কারও সমস্যার সমাধান করতে পারি না। যাকে ওষুধ দিচ্ছি সে পুনরায় অসুস্থ হচ্ছে; যাকে বাঁচিয়ে দিলাম বলে মনে করছি সে আমার সম্মুখেই মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে; যাকে অন্ন দিলাম সে পুনরায় ক্ষুধার্ত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করছে; যার ঘরবাড়ি ব্যবস্থা করে দিলাম, তার ঘর পুনরায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য বিচিত্র অভাব। অর্থাৎ, স্থায়ী সমাধান বলে এই জড় জগতে কিছুই নেই।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যে উল্লেখ রয়েছে—"মানুষ যখনই তার কৃষ্ণচেতনা হারিয়ে ফেলে এবং আত্ম-উপলব্ধির প্রতি তার আর আগ্রহ থাকে না, তখন পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া তার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণভাবনাবিহীন সমস্ত কার্যকলাপই জীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।"

যখন আমার আত্মোন্নতির জন্য আমি কিছুই বুঝি না তখন কি করে আমি আশা করতে পারি যে, আমার মতো সমস্ত বদ্ধ জীব আমার নিজের আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে? প্রকৃতপক্ষে 'বহুকোটি লোক' তো দূরের কথা একজনও আমার মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করবে কি না সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছেই।

কারণ আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় তার প্রিয় স্ত্রী পুত্র—যাদের জন্য সে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেছে, তারা তার মৃত্যুর দিনে

তার কাছে বহু কান্নাকাটি করে বলতে শুরু করে—"আমার জন্য কি রেখে গেলে, হায়! তুমি তো চলে গেলে, আমরা অত্যন্ত অসহায়, আমরা অত্যন্ত দুঃখী, আমরা তোমাকে ছাড়া কি করে থাকব?"

এইভাবে তারা বুঝিয়ে দেয় সেই মৃত ব্যক্তির কাছে তাদের আরও দাবী রয়েছে। কিন্তু কোনও দাবী না মিটিয়ে সে কেন অসময়ে মারা গেল? তাই তারা কাঁদছে। অথচ, দেহত্যাগের পর সেই ব্যক্তি কোথায় কোন্ নরকে গিয়ে কত বছর ধরে যমদূতদের লাথি খাচ্ছে সেই ব্যাপারে সেই সব অত্যন্ত প্রিয় আত্মীয়-স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধবরা তার পরিণতির কথা কখনই চিন্তা করে না এবং কখনই তাকে দেখতেও পর্যন্ত যাবে না।

অতএব কি করেই বা একজন ব্যক্তি সারা দেশের জনগণের কাছে নিজের আত্ম-উন্নতির আশা করতে পারে? কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(গীতা ১৮/৬৬)

"তোমার সব রকমের মনগড়া ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তা হলে আমিই তোমাকে তোমার সমস্ত কর্তব্য-অকর্তব্য জনিত পাপ থেকে উদ্ধার করব। এই সম্বন্ধে কোনও দুশ্চিন্তা করো না।"

পরিশেষে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য এই যে, যদি আমরা অপরের মঙ্গল চাই, তবে তাদের হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত দিয়ে তাদের জীবন গঠনের অনুপ্রেরণা দিতে হবে যাতে তারা এই অবশ্যম্ভাবী জড় দেহ ত্যাগের পর জন্ম-মৃত্যুর পরপারে নিত্য আনন্দময় ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে পারে। এটিই বৈদিক তাৎপর্য। সর্বতোভাবে কৃষ্ণভজন করাই এই জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ৫৩। পতি ও পত্নী কি জন্ম-জন্মান্তরে একই সম্বন্ধ থাকে?

উত্তর ঃ না। মানুষদেহ ধরে যে পতি-পত্নী এই জীবনে আছে, পরজন্মে তারা অন্য কোনও দেহ, অন্য কাউকে পতি বা পত্নীরূপে গ্রহণ করে। এমন কি পুরুষও স্ত্রী দেহ, স্ত্রীও পুরুষ দেহ পেতে পারে। কর্ম অনুসারে পশুপাখি কীটপতঙ্গ গাছপালা অথবা মানুষ দেহ ধারণ করতে পারে। জন্ম জন্মান্তরে একই সম্বন্ধ থাকবে এরকম কোনও গ্যারান্টি নেই।

প্রশ্ন ৫৪। জন্মদাতা মাতা-পিতাকে ছেড়ে, মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব বা কর্তব্য এড়িয়ে সন্তানের ত্যাগী হওয়াটা কি ধর্মের কাজ?

উত্তর ঃ দায়িত্ব বা কর্তব্য এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই কখনও ত্যাগী হওয়ার প্রয়োজন নেই। যাদের ক্ষমতা আছে, বুদ্ধি আছে তারা অবশ্যই মাতা-পিতাকে নিয়ে কৃষ্ণভাবনাময় গৃহ পরিবেশ গঠন করে সুখে শান্তিতে থাকতে পারেন। কাউকে উপদেশও দেওয়া হয় না যে, পিতা-মাতা ছেড়ে তুমি ত্যাগী হয়ে যাও। না, এই রকম উপদেশ-নির্দেশ দেওয়া হয় না।

যাদের পক্ষে গৃহে থাকাটাই মানসিক বিকৃতির এমন কি মৃত্যুর কারণ, সর্বদা কৃষ্ণভাবনার প্রতিকূলতাই যেখানে সোচ্চার, সেখানে অবশ্যই মাথা না ঘামিয়ে ধর্মপথে এগিয়ে আসাই যথার্থ। আসলে ধর্মের কাজ হচ্ছে কৃষ্ণভক্তিতে থাকা। কৃষ্ণ নাম করা, কৃষ্ণ পূজাদি কর্মে যুক্ত থাকা। কিন্তু কৃষ্ণভক্তির পরিবেশ যেখানে নেই, যেখানে নিজের ক্ষমতা ও বুদ্ধি খাটে না, সেখানে অবশ্যই প্রতিকূলতাকে আপাতত পরিত্যাগ করে অন্যান্য শত-সহস্র ছেলেদের মতো মঠবাসী হওয়াই শ্রেয়। আবার, বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে অনেকে গৃহ পরিত্যাগ করতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে তা প্রত্যক্ষ হয়।

কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় জীবন ব্যতিরেকে পিতা-মাতার প্রতি নিছক কর্তব্য বোধের খাতিরে যাদের জীবন অতিবাহিত হয় তারা যে খুব একটা বুদ্ধিমান বা ধার্মিক ব্যক্তি এইরকম মনে করাটা ঠিক নয়। সেই কর্তব্যেরও কোন মূল্য থাকে না। যেমনটি অন্ধের প্রতি অন্ধের সহানুভূতি বশত হাত ধরাধরি করে পথে চললে অবশ্যই খাদে পড়তে হয়, ঠিক তেমনই একজন অভক্ত যদি কর্তব্য বোধ বা সহানুভূতি বশত অন্য অভক্তের সঙ্গে থেকেই জীবন কাটায় তবে অবশ্যই প্রকৃতির নিয়মে তাদের তথাকথিত সুরক্ষার পরিকল্পনা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। বিষম বা প্রতিকূল ছাড়া কাউকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়, সবাইকে কৃষ্ণভজনের পন্থায় নিয়ে আসাই ধর্মের কাজ।

প্রশ্ন ৫৫। সংসারী বৈষ্ণব তার মা-বাবার কোন সেবা করার দরকার আছে কি? না কি শুধু গুরুসেবা করলে চলবে? আচারি বৈষ্ণব মা-বাবার ছোঁয়া জিনিষ সেবা করতে পারে কি? মা বাবা যদি বৈষ্ণবধর্ম না গ্রহণ করে?

উত্তর ঃ মা-বাবার সেবা করা সকলেরই কর্তব্য। বৈষ্ণব হোন আর অবৈষ্ণব থাকুন না কেন। সংসারী বৈষ্ণব বলতে বোঝায়, যে-বিষ্ণুভক্ত গৃহধর্ম পালন করছেন। গৃহধর্ম বলতে মা-বাবা স্ত্রী-পুত্র ভাই-বোন প্রতিবেশী-অতিথি সকলেরই যিনি সেবা করছেন। যারা গৃহত্যাগী তারা গুরু-কৃষ্ণ সেবায় থাকলে চলবে। কিন্তু যারা গৃহস্থ তাদের তো অবশ্যই পরিবারের সকলের সেবাভার গ্রহণ করতেই হয়।

বৈষ্ণবের যে নিয়মকানুন—ভগবানের অর্চা-বিগ্রহ সেবা, ভগবানের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সেবন, ভগবানের কথা আলোচনা, ভগবানের নাম কীর্তন, পরিবারের সকলে যাতে ভক্তিভাব নিয়ে থাকে সেজন্য লক্ষ্য রাখাই কর্তব্য।

হয় তো কোন পরিবারের পিতামাতা কেবল ভগবদ্‌প্রসাদে প্রীত নয়, তারা রক্তমাংসে মাছ ডিমে ও নেশাতে আসক্ত। তাদেরকেও যত্ন করে বোঝানোর চেষ্টা নিতে হয়। যাতে তাঁদের ভগবৎ প্রসাদান্নে রুচি জন্মায় সেজন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। যদি কোন বাবা-মা জোর দিয়ে বলে, আমরা মাছ-মাংস খাবই, তোমরা অন্যত্র চলে যাও। তখন আলাদা কথা।

আপনি আচারি-বৈষ্ণব হতে পারেন। আপনার মা-বাবা আচারি সদাচারী না হতে পারেন। তাতে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। তাঁদের দেওয়া কোন জিনিস গ্রহণযোগ্য কিনা তা নিজেই বুঝতে পারবেন। বাজারে আমরা অনেক কিছু জিনিষ কিনে আনি,

সেই সব দোকানদাররা সদাচারী না হতে পারে। তা-ই বলে কি আমাদের সেগুলি কেনাকাটা বাদ দিতে হবে? শুদ্ধ করে ভগবানকে সেই দ্রব্য নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করা যায়। তবে কতগুলি জিনিষ গ্রহণ করা উচিত হয় না। যেমন আমিষ মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যাদি। কারণ সেগুলি ভগবানকে নিবেদন করা যায় না।

একই ঘরে ভগবানের ভোগ রান্না আর পাশের উনান থেকে আমিষ রান্নার গন্ধ বিরক্তিকর। একই সারিতে বসে প্রসাদ ভোজনে এবং কোথাওবা অপ্রসাদ ভোজন দৃষ্টি কটুকর। একই জায়গায় হরিকথা এবং আজেবাজে গ্রাম্যকথা ভক্তিবিঘ্নকর। সেইজন্য আলাদা দূরে থাকা সবচেয়ে ভাল, কিন্তু মনোমালিন্য করে দিনযাপন করা ভাল নয়। সাধারণত সমস্যা বাধে এক-দুজনকে নিয়ে। ভগবানের কৃপা হলে তারাও সৎপথে আসবে।

প্রশ্ন ৫৬। বিবাহিত জীবনে এসে অশান্তিময় ভক্তিপ্রতিকূল সংসারে কি করব?

উত্তর ঃ বেশি করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হবে। সদ্‌গৃহস্থ-কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ ও পরামর্শ মতো চলতে হবে।

প্রশ্ন ৫৭। আমি কারও কোনও ক্ষতি করতে চাই না, কাউকে কোনও কষ্ট দিতে চাই না, এবং আমিও কারও কাছে বিব্রত হতে চাই না। এভাবে সুখী থাকার যে স্বাধীন ইচ্ছা—সেটি কি কৃষ্ণভক্তি বিরুদ্ধ?

উত্তর ঃ আপনার এই কথাগুলি খুব সুন্দর বলে মনে হলেও ধারণাটা অভ্রান্ত নয়, বিভ্রান্তিকর। আপনি কাউকে কষ্ট দেবেন না—এ খুব ভাল কথা, কিন্তু কেউ আপনাকে কষ্ট দেবে না—এরকম চিন্তা করা ঠিক নয়। আপনাকে চিন্তা করতে হবে, আমি কাউকে কষ্ট না দিলেও কেউ না কেউ আমাকে কষ্ট দেবেই। কেন না এই জগতে আমাদের বেঁচে থাকার অর্থই হল কষ্ট পাওয়া। আবার, আমি কাউকে কোন প্রকারে কষ্ট দেব না, এই কথাটিও নিখুঁত নয়, কারণ আমার জীবনের অস্তিত্ব হচ্ছে অপরের প্রাণহানির কারণ। শ্বাসপ্রশ্বাস জলপান পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কার্যকলাপের ফলে আমাকে প্রতিনিয়ত কত শত প্রকার ক্ষুদ্রক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণহানির কারণ হতে হচ্ছে। অর্থাৎ, কত শতবার অপরকে কষ্টই দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যদি প্রকৃতই সকলের এবং নিজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন তবে সর্বজীবের পরম বিধাতা সৎ-চিৎ-আনন্দময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে। এই জড় জগতে থাকা মানেই হল কারও না কারও দ্বারা আমাকে কষ্ট পেতে হবে এবং আমার দ্বারা কেউ কেউ কষ্টও প্রাপ্ত হবে—যদিও বা আমি তা কখনও চাই না। যেহেতু এই রকম দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি আমরা চাই না, তাই আত্মকল্যাণ এবং অন্যদের সবার কল্যাণ হেতু জড় জগৎ অতিক্রম করে আনন্দময় বৈকুণ্ঠ জগতে উন্নীত হওয়া এবং অন্যকেও উন্নীত করবার উদ্দেশ্যে কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন, কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন, কৃষ্ণমহিমা শ্রবণ, কৃষ্ণভক্তি সেবায় যুক্ত হতে হবে। অন্যথা, নিছক "আমি কারও ক্ষতি করব না এবং কেউ আমাকে দুঃখ দেবে না" এটি

এমন কোন মূল্যবান ধারণা নয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে, কৃষ্ণভক্তি বিমুখ হওয়ার ফলেই আমরা এই দুঃখময় জগতে পতিত হয়েছি। অথচ এখানে এসে আমরা যদি চিন্তা করি কেউ আমাকে দুঃখ দেবে না—এরূপ ধারণা করাটা বোকামি। এটি কৃষ্ণভক্তিবিরুদ্ধ ধারণা।

প্রশ্ন ৫৮। আমি পরিবারের একমাত্র ছেলে। ভক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চাই। অথচ বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছেন। এই অবস্থায় আমার কি করা উচিত?

উত্তর ঃ বাড়িতে থেকে শ্রীকৃষ্ণের নাম জপকীর্তন করা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ বাবা-মাকে নিবেদন করা উচিত।

প্রশ্ন ৫৯। বিশ্বসমস্যা সমাধানে সকলকেই কি কৃষ্ণভক্ত হতে হবে?

উত্তর ঃ না, জড় বিশ্বটা সমস্যা দিয়েই তো তৈরি করা হয়েছে। সমস্যা থেকে চিরতরে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রত্যেককেই অচিরে কৃষ্ণভক্ত হতে হবে। সবাই কৃষ্ণভক্ত হয়ে কৃষ্ণধামে চলে গেলেও অন্যান্য সূক্ষ্মজীবেরা স্থূল শরীর ধারণ করে এসে বিশ্বের মধ্যে ভীড় পাতাবে, আর সমস্যাও এই রকম থাকবে।

প্রশ্ন ৬০। বিশ্ব প্রেমানন্দপূর্ণ মহামিলন কি কখনও সম্ভব হবে?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

> পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
> সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

তা হলে পৃথিবীর সর্বত্র কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণনাম প্রচারিত হবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দশসহস্র বর্ষ পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তি প্রচার আন্দোলন চলবে। মাত্র এখন পাঁচশ বছর সবে আন্দোলনটি চলছে। বর্তমানে এটা সবেমাত্র সূত্রপাত বলা যায়। সুতরাং, বাদবাকী কয়েক সহস্রবর্ষে কৃষ্ণভক্তিই লোকে অনুশীলন করবে। তার পর কলিযুগের নতুন বিভীষিকাপূর্ণ অধ্যায় শুরু হবে। কেউই আর কৃষ্ণনাম শুনতেই পাবে না, কীর্তনও করবে না। ঘোর কলির প্রভাবে লোকেরা পাপাচারী জঘন্য পিশাচতুল্য হয়ে যাবে। সে কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। অতএব কলির বর্তমান প্রথম সন্ধ্যাটিই মঙ্গলপ্রদ।

প্রশ্ন ৬১। কেউ যদি কৃষ্ণভক্ত হয়, আর তার মা-বাবা যদি বিক্ষুব্ধ চিত্তে তাকে অভিশাপ দিতে থাকে, তবে তার গতি কি হবে? সে কি ভক্তিপথে থাকতে পারবে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তিতে নিযুক্ত আছে, কৃষ্ণের চরণে শরণাগত, তার সমস্ত দায়িত্ব কৃষ্ণের হাতে। কারণ কৃষ্ণই চিরজীবনের পিতা-মাতা। বিশ্বের ইতিহাসে একটাও দৃষ্টান্ত নেই যে, কেউ কৃষ্ণভক্ত হলে তার মা-বাবার ক্ষতি হয়েছে। বরং মা-বাবার আনন্দিত হওয়া দরকার যে, তাদের বংশধারায় বহু সৌভাগ্যে আপাতত একজন কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত হতে পেরেছে।

ভক্তের প্রতি অভিশাপ নিন্দা আক্রোশ করলে নিজেদেরই বিপদ ও যাতনা আহ্বান করা হয়, ভক্তের কিছুই হয় না।

প্রশ্ন ৬২। পিতা-মাতার অভিশাপ সন্তানের প্রতি কার্যকরী হয় কি না?

উত্তর ঃ ভক্তিবিরোধী সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অভিশাপ কার্যকরী হয়ে থাকে। যেমন দুর্যোধনকে তার পিতা ধৃতরাষ্ট্র বুঝিয়ে ছিলেন, 'দেখো দুর্যোধন, আমাদের হিতকারী সঞ্জয়ের কথামতো তুমি কৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁর শরণাগত হও, তাঁর কথামতো চলো।' কিন্তু দুর্যোধন বলল, 'বাবা, কৃষ্ণ যদি অর্জুনের সঙ্গে সখ্য রেখে সারা জগৎটাকে সংহার করতে উদ্যত হয়, তবুও আমি তার শরণাগত হব না।' তখন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বললেন, 'শোনো প্রিয়ে, তোমার পুত্র দুর্যোধন ঈর্ষাপরায়ণ, অভিমানী ও সদ্ উপদেশ গ্রহণে বিমুখ। সেজন্যে ওকে অকালে মরতে হবে।'

তখন গান্ধারী ক্রোধভরে বললেন, 'রে দুরাশয় দুর্যোধন, সমস্ত ঐশ্বর্যময় জীবন এবং পিতামাতাকে ছেড়ে শত্রুদের সঙ্গে প্রীতি করো আর আমাকে শোকসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে ভীমের হাতে দেহত্যাগ করো। সেই সময়ে তোমার পিতার কথাটি স্মরণ করো।'

পরিণামে যা-ই হোক, ভীমের হাতেই দুর্যোধনকে মরতে হয়েছিল।

প্রশ্ন ৬৩। জগতে সুখী কে?

উত্তর ঃ দুই ধরনের ব্যক্তি সুখী ঃ—(১) গণ্ডমূর্খ এবং (২) পরমহংস। গণ্ডমূর্খদের ভগবৎ নির্দিষ্ট এই দুঃখপূর্ণ জগৎটিকেও সুখের স্থান বলে মনে হয়। তাদের চেতনাটি শূকরের মতো। সারাদিন একটি শূকরকে নোংরার মধ্যে ঘোরাঘুরি করে বহু কষ্ট স্বীকার করে আহার সংগ্রহ করতে হয়, তারপর সে সুযোগ পেলেই মৈথুন কার্যে লিপ্ত হয়। তারা দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যৌনজীবন ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সুখে থাকে। এই মহা মূর্খদের জাগতিক দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধে কোন রকম চেতনা নেই। তাই তারা তথাকথিত সুখ উপভোগ নিয়েই থাকে।

অন্য শ্রেণীর মানুষেরা, পরমহংস। তাঁরা এই দুঃখময় জগতে অবস্থান করেও সর্বদা ভগবানের চিন্ময় মগ্ন থাকেন। যার ফলে তাঁরা অন্তরে অন্তরে চিন্ময় আনন্দ লাভ করেন।

এই দুই স্তরের মধ্যবর্তী ব্যক্তিরা জগতে সুখী নয়। তারা কুকুর-শূকরের স্তরেও নেই, আবার পরমহংস স্তরেও নেই। তারা জড় জাগতিক দুঃখ দুর্দশা অনুভব করতে থাকে।

মহাত্মা বিদুরের উক্তি এই যে—

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥

"এই জগতে যারা সবচাইতে মূর্খ এবং যাঁরা জড়াপ্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা উভয়েই সুখী। আর যারা এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে, তারা সব জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। (ভাঃ ৩/৭/১৭)

প্রশ্ন ৬৪। শত চেষ্টা করেও যে-পুত্রকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব চরণে-ভক্তিমুখী করা যায় না, বরং দিনদিন তার আসুরিক প্রবৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয়—এমন পুত্রের প্রতি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ-চরণাশ্রিত মা-বাবার কর্তব্য কি? পিতামাতার ইহলৌকিক, পারলৌকিক কোনও ক্রিয়ায় এমন পুত্রের কি অধিকার থাকা উচিত? এমন পুত্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি?—শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা চাই।

উত্তর ঃ চানক্য পণ্ডিত বলেছিলেন, পুত্রের প্রতি পিতামাতার আচরণ হবে—

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥

"পিতামাতা পাঁচবছর পর্যন্ত সন্তানকে স্নেহে প্রতি পালন করবেন। তারপর দশ বছর সন্তানকে যথাযোগ্য শাসন করবেন। সন্তানের বয়স ষোল বছর হলে তার সঙ্গে পিতামাতা বন্ধুর মতো আচরণ করবেন।"

পাঁচ থেকে পনেরো বছর সময়টিতে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। সেই সময়ে পড়াশোনা, কৃষ্ণভক্তি-আচরণ, বিনয় নম্রতা, সদাচার প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির গুণগুলি শিক্ষা দিতে হয়। উপদেশ ও শাসনের মাধ্যমে সন্তানকে সৎগুণের অধিকারী করে তুলতে হয়। কিন্তু তারপর যোলো বছর বয়সে সন্তানের নিজস্ব বিচার বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। তখন থেকে পিতামাতা তার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করবেন। ফলে সন্তানও পিতামাতার সঙ্গে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

বিভিন্ন সঙ্গ প্রভাবে মানুষ প্রভাবিত হয়ে কিছুটা তার সঙ্গী লোকেদের মতো গুণসম্পন্ন হয়। আপনারা ভক্ত। অতএব আপনাদের সঙ্গ প্রভাবে কেউ না কেউ ভক্ত হবার কথা। কিন্তু 'ভক্তি' জিনিসটা এমন রুচিকর নয় যে, ভবরোগীরা আপনাদের নির্দেশমাত্রই সাদরে ভক্তিমুখী হয়ে পড়বে।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

"যাঁরা অন্য চিন্তা না করে কেবল আমার চিন্তা করতে থাকে। এভাবে পূর্ণ ভক্তি সহকারে সর্বদা আমার উপাসনা করেন, তাঁদের সমস্ত অভাব আমি বহন করি, তাঁদের আমিই রক্ষা করি।" (গীতা ৯/২২)

কিন্তু আপনি কৃষ্ণচিন্তা যতটুকু করছেন তার চেয়ে বেশী চিন্তা করছেন আপনার পুত্র সম্পর্কে। আপনি শতচেষ্টা করে চলেছেন পুত্রকে ভক্ত বানাবার জন্য। শত চেষ্টা করেও আপনি দেখছেন, পুত্রটির ভক্তিবিরোধী আসুরিক প্রবৃত্তি বেড়েই চলেছে। তা হলে আপনি অনর্থক চেষ্টা করছেন। সেটি আপনার অস্থিরতার প্রকাশ মাত্র। আপনি কি করে আশা করেন যে, অন্যেরাও আপনার মতোই হবে?

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

"মহাত্মা বা ভক্তরা আমাকে লাভ করবেন। আর এই দুঃখপূর্ণ অনিত্য সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করবেন না। কেননা আমার কাছে আসাই হচ্ছে তাদের পরম সিদ্ধি।" (গীতা ৮/১৫)

কিন্তু কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা করার চিন্তা না করে আপনি চিন্তা করছেন, এই দুঃখপূর্ণ অনিত্য সংসারে 'আমার ইহলৌকিক পারলৌকিক ক্রিয়া আমার পুত্র সম্পাদন করতে পারবে কিনা, পুত্রের সেই অধিকার থাকা উচিত কিনা, পুত্র আমার সর্বনাশ করবে কি না, আমি নিষ্কৃতি পাব কি করে?'—এ সমস্ত অভক্তিময় মায়াচিন্তা। এটি কৃষ্ণচিন্তা নয়।

প্রশ্ন ৬৫। কোনও পরিবারের মধ্যে একজন যদি ভক্ত হয়, তবে পরিবারের অন্যান্যরা কিংবা ঐ স্থানের লোকেরা স্বাভাবিকভাবে ভক্তি অনুশীলনের অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকে। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ না। একজন ভক্ত হলেই পরিবারের অন্য সবাই ভক্ত হয়ে যাবে এরকম কোনও নিশ্চয়তা নেই। কেননা একই পরিবারভুক্ত হলেও প্রত্যেকের চেতনা, সঙ্গ প্রভাব, শিক্ষা মনোভাব একই রকমের হয় না। কখনও কখনও একমুখী মানসিকতা যেমন হতে পারে, আবার বিপরীতমুখী মানসিকতাও হতে পারে।

পুত্র প্রহ্লাদ মহান ভক্ত। কিন্তু তার পিতা হিরণ্যকশিপু প্রচণ্ড ভক্তিবিরোধী। যখন কোনও পরিবারের কোন কোন সদস্য মনস্থ করেন যে, আমরা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে শুদ্ধ জীবনযাপন করব, তাতে আমাদের ঐহিক এবং পারমার্থিক নিত্য কল্যাণ সাধিত হবে। কিন্তু পরিবারের অন্যান্যরা, পাড়া প্রতিবেশীরাও যখন দেখে যে, কেউ ভক্ত হয়ে যাচ্ছে, সে কোনও নেশাভাঙ করছে না, রক্ত মাংস আমিষ খাচ্ছে না, জুয়া তাস লুডু খেলছে না, গল্প গুজবে মন দিচ্ছে না, সিনেমা দেখছে না, তখন তারা অনর্থক উন্মাদের মতো তাকে উপহাস করতে থাকে। যখন তারা দেখে যে, কেউ মালায় হরিনাম করে, গলায় তুলসী মালা পরে, কপালে তিলক আঁকে, গীতা ভাগবত পাঠ করে, তখন তারা অতীতের কোনও ছোট খাটো তুচ্ছ ভুল ত্রুটি নিয়ে এমনকি জন্ম জাতি পেশা ইত্যাদির নাম উল্লেখ করে ভক্তের নিন্দা মন্দ করতে থাকে। আর বর্তমানে যদি সে কোনও কর্মে কিছু একটু ভুল করেই ফেলে তা হলে তো থুৎকারের কোনও অভাব নেই।

অতএব একজন ভক্ত হলে অন্যান্যরা যে ভক্তি অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হবে, তা ঠিক নয়। তবুও ভক্ত সবকিছু সহ্য করে অন্যদের ভক্তিপন্থায় আনার চেষ্টা করেন। কারণ তিনি বোঝেন জড় জাগতিক লোকেরা যতই উন্নত ধনী হোক না কেন, তার জীবন বৃথা। জড় জগৎ অনিত্য, জীবন ক্ষণিক, জাগতিক বৈভবও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি নিত্য শাশ্বত।

প্রশ্ন ৬৬। লোকে বলে, ঋণ শোধ না করলে বহু জন্ম কষ্ট পাবে। এ কথার মানে কি?

উত্তর ঃ কেউ যখন এই জগতে জন্ম গ্রহণ করে, তখন তার বহু ঋণ থাকে। সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ, পবন ইত্যাদি দেবতাদের কাছে ঋণ থাকে। কারণ তাঁরা আমাদের তাপ, আলোক, জল, বাতাস ও অন্যান্য আবশ্যক বস্তু দিয়ে থাকেন। পিতৃগণের কাছেও ঋণী থাকতে হয়। কারণ তাঁরা আমাদের শরীর, বুদ্ধি, সমাজ, বন্ধুত্ব ও প্রীতি প্রদান করেছেন। জনসাধারণের কাছেও ঋণী। কারণ সমাজ ব্যবস্থায় তাঁরা আমাদের বিভিন্ন সহযোগিতা করেন। গরু, ঘোড়া, গাধা, কুকুর ইত্যাদি নিম্নস্তরের পশুদের কাছেও ঋণ থাকে। কারণ তারাও কায়িক মানসিক শ্রম আমাদের জন্য দিয়ে থাকে।

এভাবে মানুষরূপে এই জগতে জন্ম নেওয়া মাত্রই অসংখ্য ঋণ থাকে। আর সেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ করবার দায়িত্বও থাকে। যদি সেই ঋণগুলি শোধ না করা হয় তা হলে পুনরায় এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতেই হয়। আর, জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়া মানেই যাতনা ভোগ করা ও উদ্বেগ গ্রস্ত হওয়া।

উদ্বেগ মুক্ত হতে হলে ঋণ শোধ করতে হবে। কিন্তু অসংখ্য ঋণ শোধ করাও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবে এই মনুষ্যজীবনে জানা-অজানা সেই সমস্ত ঋণ শোধ করবার পন্থা রয়েছে। সমস্ত জীবের অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে। তাঁর পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে ভক্তিযোগ অনুশীলন করলে সমস্ত ঋণ থেকে মুক্তি লাভ হয়।

সেই জন্যে ঘরে ঘরে প্রত্যেকেরই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করা একটি অপরিহার্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

কিন্তু কলি প্রভাবিত মানুষদের দেখা যায়, তারা কৃষ্ণভক্তিটি সম্পূর্ণ বাদ করে দিয়ে কিম্বা অত্যন্ত গৌণ করে দিয়ে ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করবার জন্য দিনরাত বহুল কর্মচক্রে নিযুক্ত রয়েছে। ঘরে ঘরে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন বাদ দিয়ে তাদের মন যা চায়, সেই রকম মনগড়া ক্রিয়াকাণ্ড নিয়েই রয়েছে।

আর, অভক্তদের কথা তো কোন্ ছার, এমনকি ভক্তরা, যারা অন্যের কাছে অর্থসম্পদ সাহায্য স্বরূপ গ্রহণ করেন, সেই সম্পদ যদি কৃষ্ণসেবায় সংযুক্ত না হয়ে দুর্ভাগ্যবশত আপন ইন্দ্রিয়সুখের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে ফেলেন, তা হলে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দেশ অনুসারে তাঁদেরকে দান সাহায্যকারীদের ঘরের কুকুর-বিড়াল রূপে জন্ম নিয়ে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিতে হবে।

ভক্তের কাজ হচ্ছে সমগ্র মানব-সমাজে ভক্তি প্রচার করে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে মানুষকে উদ্ধারের পন্থা শিক্ষা দেওয়া। আর তিনি ব্যক্তিগতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সর্বদা সংযুক্ত থাকবেন, কৃষ্ণসেবায় থাকবেন, কৃষ্ণচেতনায় থাকবেন। যদি কিছু অসুবিধা হয়, কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাবেন, অন্তর্যামী কৃষ্ণ তাঁর দায়িত্ব নেবেন। যাঁরা ভক্তি প্রচার কার্যে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, নিজেকে তাঁদের দাস বলে মনে করতে হবে।

এভাবে কৃষ্ণসেবায় সংযুক্ত হলে ঋণমুক্ত হয়ে পরমধামে গতি লাভ করতে পারা যাবে। কৃষ্ণভক্ত না হয়ে নিজেও ঋণমুক্ত হওয়া যায় না, অপরকেও ঋণমুক্ত করা যায় না।

প্রশ্ন ৬৭। কাকে দান করা উচিত?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে বলা হয়ে থাকে যে, দানের ফল পরকালে বর্তায়। সাধুকে কিছু দান করলে আত্মকল্যাণ হয়, অসাধুকে কিছু দান করলে নিষ্ফল হয় এবং অপাত্রে দান করলে অমঙ্গলই লাভ হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যদি কিছু প্রীতিপূর্ণভাবে দান করতে চাও, তবে আমাকেই দান কর। *দদাসি যৎ.....তৎ মদর্পণম্*—তোমার দানের বস্তু আমার প্রতি অর্পণ কর। সপ্তদশ অধ্যায়ের ২০, ২১ ও ২২ শ্লোকে দান সম্পর্কে ভগবানের উক্তি লক্ষ্যণীয়। সেখানে তিন রকমের দানের কথা বলা হয়েছে।

(১) দান করা কর্তব্য বলে মনে করে, প্রত্যুপকারের আশা না করে উপযুক্ত স্থানে (মন্দিরে, তীর্থে), উপযুক্ত সময়ে (পর্ব বা পবিত্র তিথিতে), উপযুক্ত পাত্রে (বৈষ্ণবজনকে) যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলে।

(২) প্রত্যুপকারের আশা করে, ফল লাভের উদ্দেশ্যে, অনুতাপ সহকারে যে দান করা হয়, সেই দান রাজসিক।

(৩) ইন্দ্রিয় তোষণের জন্য, অশুভ স্থানে, অশুভ কালে, অযোগ্য পাত্রে যে দান করা হয়, তাকে তামসিক দান বলে।

মহাভারতে উদ্যোগ পর্বে ৩৬ অধ্যায়ে মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, ছয় রকম ব্যক্তিকে কিছুই দান করা উচিত নয়, তাদের সেবা করা কর্তব্য নয়। যেমন—

(১) আততায়ী (গৃহদাহকারী, বিষপ্রয়োগকারী, ভূমি-দার-অর্থাদি অপহরণকারী, প্রাণনাশাদি অনিষ্ট সাধনে যে তৎপর), (২) অতি প্রমাদী, (৩) স্নেহশূন্য, (৪) নিয়ত মিথ্যাবাদী, (৫) ভগবদ্ভক্তি শূন্য, (৬) নিপুণমন্য বা আত্মগড়িমাকারী।

শ্রীবিদুর আরও বলেছেন, নয় ধরনের ব্যক্তির কাছে কিছু ভিক্ষা করা উচিত নয়। যারা (১) কৃপণ (কাউকে কিছুই দান করতে চায় না), (২) শাপপ্রদ (কথায় কথায় অভিশাপ দিয়ে থাকে), (৩) মুর্খ (দান করে অনুশোচনা করে), (৪) ধূর্ত (দানের ছলে অসৎ অভিসন্ধি পোষণ করে), (৫) কৈবর্ত (জীবহত্যাকারী তথা নিম্নশ্রেণীর লোক), (৬) মানী ব্যক্তির অবমন্তা (সম্মানীয় ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করে), (৭) নিষ্ঠুর, (৮) শত্রুভাবাপন্ন, এবং (৯) কৃতঘ্ন (বিশ্বাসঘাতক)—এই নয় ধরনের ব্যক্তির কাছে কিছু ভিক্ষা করা উচিত নয়।

মহাভারতে উদ্যোগপর্বে ৩৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যার ক্রোধ নেই, পাথর ও সোনাতে যাঁর সমজ্ঞান, যাঁর শোক নেই, সন্ধি ও বিগ্রহ (কলহ) নেই, নিন্দা-প্রশংসায় যিনি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, উদাসীনের মতো যিনি প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় পরিত্যাগ করেন—সেই ভিক্ষুককে দান করা গৃহস্থের একান্ত কর্ম।

১৪
আমিষ আহার মহাপাপ

প্রশ্ন ১। আমরা জানি বৈষ্ণবগণ মাছ-মাংস, বিড়ি-সিগারেট খান না। কিন্তু যাঁরা মাছ খাচ্ছেন, চা-জর্দা পান-দোক্তা খাচ্ছেন, বিড়ি খাচ্ছেন—অথচ তাঁরা বৈষ্ণব বলে সমাজে পরিচিত হয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত কি?

উত্তর ঃ আমিষ আহার, মাদক দ্রব্য সেবন, তাসজুয়া এবং অবৈধ যৌনতা হল *শ্রীমদ্ভাগবত* নির্দেশিত কলির আড্ডা। এগুলি ভক্তিপথের প্রতিবন্ধক। তাই এইগুলি অবশ্যই বর্জনীয়। যারা নিজেদের বৈষ্ণব বা মহাপ্রভুর ভক্তরূপে পরিচয় দেয় তারা যদি কলির চেলা হওয়ার প্রয়াস করে, তবে তারা অসৎ। তাদের সঙ্গ অসৎসঙ্গ। বৈষ্ণবরূপে পরিচয়দানকারী এই রকম অপসম্প্রদায়ের নামও আমাদের পূর্ববর্তী আচার্যগণের গ্রন্থাবলীতে দেখা যায়। সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মোট তেরো প্রকারের অপসম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সঙ্গ এড়িয়ে যেতে শুভাকাঙ্ক্ষী জনদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন—

আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাত-গোসাঞি॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
তোতা কহে, এ তেরর সঙ্গ নাহি করি॥ (গৌঃ কঃ ১১১)

এ ছাড়াও চরণপালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতি অসৎ সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ২। যে সমস্ত অপসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব মাছ-মাংস খাচ্ছেন, তাঁরা তো বলে থাকেন, আত্মাকে কষ্ট না দিয়ে আত্মা যা চায় তা-ই খাওয়া ভাল। সেটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ মাছ-মাংস খেয়ে আত্মাকে বেশি কষ্ট দেওয়া হয়। আত্মা হচ্ছে পরমাত্মা শ্রীহরির অংশকণা, শ্রীহরির নির্দেশমতো পরিচালিত হয়ে আত্মা সন্তুষ্ট হয়। অন্যথায় সে জড়জাগতিক সংস্পর্শে থেকে কষ্টভোগ করে। মাছ-মাংসভোজী মানুষেরা নরকগতি লাভ করে। স্থূল দেহ ত্যাগের সময় সূক্ষ্ম-শরীর বিশিষ্ট জীবাত্মাকে যমদূতেরা নরকলোকে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড শাস্তি প্রদান করে। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই কথা বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং মাছ-মাংস খাওয়ার ফলে আত্মার কষ্টই লাভ হয়।

এই সব কথা অনুধাবন করে বহু মানুষ অপসম্প্রদায়ী ভাবধারা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং আমিষ-আহার বর্জনপূর্বক তাঁরা নতুন করে শুচিশুদ্ধ জীবন যাপন করছেন।

প্রশ্ন ৩। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিরামিষ আহার্য গ্রহণ করতে বলেছেন। তা হলে চা-পাতা তো নিরামিষ এবং চা তৈরি করার উপকরণ দুধ, চিনি সবই নিরামিষ। তা হলে চা খাওয়া বর্জনীয় কেন?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চা নৈবেদ্য হয় না। কারণ চায়ে মাদক উপাদান আছে, তাই ওটা খেলে সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা বোধ হয়। শুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবন গঠনে ঐসব মাদক দ্রব্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। চা পাতা, দোক্তা পাতা, তামাক পাতা, গাঁজা পাতা নিরামিষ হলেও মাদক দ্রব্য। মাদক ভক্ষণে শুচিতা নষ্ট হয়। মনের তামসিকতা বৃদ্ধি পায়। কেবল নিরামিষ হলেই যে, খাদ্যরূপে গ্রহণীয় হবে এমন নয়। ধুতুরা পাতা, আকন্দ পাতা, বিচুটি পাতা, বেড়াকলমী পাতা নিরামিষ হলেও বিষাক্ত। কেয়া পাতা, নারকেল পাতা, খেজুর পাতা, তালপাতা নিরামিষ হলেও অখাদ্য। সেই জন্যই এসব পাতা খাওয়া বর্জনীয়।

প্রশ্ন ৪। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করেছেন যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে। তা হলে শাকসবজি আহার করলে কি নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করা হয়? এ বিষয়ে আপনারা কি বলেন?

উত্তর ঃ আমরা জগদীশ্বর পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশটাই প্রত্যক্ষ করতে চাই। লক্ষকোটি বছর আগে ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিরা কোনরকম যন্ত্রপাতি ছাড়াই নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে। শুধু তাই নয়, চুরাশি লক্ষ প্রকার জীবের মধ্যে উদ্ভিদ কুড়ি লক্ষ রকমের তাও শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশিত। অতএব তা শুধু সেদিনের একজন বিজ্ঞানীর কোন নতুন কিছু আবিষ্কার নয়।

এই জগৎ পাপপূর্ণ। আমরা খাওয়াদাওয়ায়, চলাফেরায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে অসংখ্য জীব হত্যা করছি। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে প্রচুর প্রাণী-বধ হচ্ছে। এতে অবশ্যই পাপ হচ্ছে এবং সেজন্য মানুষকে দুঃখভোগ করতেই হবে। ভগবানের আইনে কর্ম এবং কর্মফল পরস্পর অনুগামী। অন্যান্য জীবেরা অপর জীবদের বধ করলেও তাদের পাপ-পুণ্যের বিচার হয় না। ভগবদ্ নির্দেশিত বিধি একমাত্র মানুষের জন্য। এবার দেখা যাক্ কোন্ খাদ্য আমাদের গ্রহণ করা উচিত, কোন খাদ্য গ্রহণ করলে আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার হবে না—সে সম্বন্ধে পরমনিয়ন্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কি বলেন—"আমাতে অর্পিত সমস্ত কর্মের শুভ-অশুভ প্রভাবযুক্ত সমস্ত বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত হতে পারবে এবং কর্মফলের প্রভাব তোমার উপর বর্তাবে না"—*'শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ'* (গীতা ৯/২৭)। আমাদের খাওয়াদাওয়ার বিষয়বস্তু ভগবানকে নিবেদন করে তারপর গ্রহণ করতে হবে। ভগবান বলেছেন—"তুমি যা কিছু আহার কর সে সমস্তই আমাকে অর্পণ করে গ্রহণ কর।" *'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্'* (গীতা ৯/২৭)। অর্থাৎ, বোঝা উচিত যে ভগবানের প্রসাদই কেবল গ্রহণ করতে হবে।

তবে কলির প্রভাবে আজকের মানুষ মাছমাংসকে প্রিয় খাদ্য বলে মনে করছে। কিন্তু তা ভগবানকে নিবেদন করার নির্দেশ কোথাও দেওয়া হয়নি। বরং তার ভয়ংকর ফলভোগ কি করে জন্মজন্মান্তরে বর্তায় তা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

যারা পরম বিধাতাকে ভালবাসে তারা জানে কি কি বস্তু ভগবান পছন্দ করেন। তাই ভগবান উল্লেখ করেছেন—"আমার ভক্ত ফল, ফুল, শাকসবজি, জল আমাকে প্রীতিভরে যা দেয় তা আমি সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করি।"

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ (গীতা ৯/২৬)

পরম আরাধ্যদেবকে যে নিবেদন না করে ভোজন করে তার সম্পর্কে ভগবান নিজেই উল্লেখ করেছেন—"*ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ*" অর্থাৎ, "তারা পাপই ভোজন করে যারা কেবল নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য খাদ্য তৈরী করে।" (গীতা ৩/১৩)

সুতরাং, যে দ্রব্য পরম ভোক্তাকে নিবেদিত হয়নি এবং যা তাঁকে অর্পণ করতে বারণ আছে—সে সবই নিষিদ্ধ খাদ্য। অতএব ভগবৎ প্রসাদ ছাড়া সবই অখাদ্য। ভগবানকে ভোগনিবেদন করাটাই অপ্রাকৃত এবং শুদ্ধ কর্ম। গৃহে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে এবং বাইরে অসুবিধাবশত মানসে ভোগ নিবেদন করে শুদ্ধ চিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করাই বিধি।

একটি জাগতিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। রাজা বা সরকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যদি কোন সৈনিক বহুসংখ্যক মানুষকে মেরে ফেলে তবে তাকে কোন দণ্ডভোগ করতে হয় না, বরং রাজা বা কর্তৃপক্ষ তাকে পদক পুরস্কৃত করতে পারেন। কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি কেউ নিজের সন্তানকেও খুন করে তবে তাকে আইনতঃ যাবজ্জীবন জেল অথবা ফাঁসি বরণ করতে হবে। ঠিক সেইরূপ ভগবদ্ নির্দেশিত আচরণে কোন দণ্ডভোগ করতে হয় না, বরং ভগবান তাঁর ভক্তকে আশীর্বাদ করেন যাতে এই দুঃখময় জগৎ থেকে চিরতরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

প্রশ্ন ৫। বৈষ্ণবগণ নিরামিষ আহার করেন। কালী ও দুর্গা বৈষ্ণবী। সেক্ষেত্রে পশুবলি দিয়ে কালী বা দুর্গার প্রসাদরূপে আমিষ খাওয়া হয় কী করে?

উত্তর ঃ বহু শাস্ত্রে উল্লেখ আছে দুর্গা কালী আদি সকল দেবদেবী ভগবানের দাস অর্থাৎ, প্রত্যেকেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মা বলছেন—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ, "প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনকারিণী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা; তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।"—(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৪) দেবীদুর্গাকে মহাদেব শিব বলেছেন, *আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোঃ*—অর্থাৎ, সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। (পদ্মপুরাণ) শিব *শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র* গ্রন্থে প্রতিদিন কিভাবে শ্রীগোবিন্দের অর্চনা করতে হয়, তা দুর্গাদেবীকে নির্দেশ

দিয়েছেন। শিব আমিষ ভক্ষণ করেন না। পতিপরায়ণা সতী দুর্গা শিবের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করেন। কালীও দুর্গারই প্রকাশ মাত্র। তাঁরা মাংসভুক্ বা রক্তপিশাচী নন।

কলিযুগের ধর্মভ্রষ্ট, উগ্র ও পিশাচগুণসম্পন্ন মানুষেরা তাদের নিজেদের তামসিকতার অনুকূলে উগ্র ও উলঙ্গ কালী-মূর্তির আরাধনা করে এবং মাংসলোলুপতা চরিতার্থ করতে পশুবলি দেয়। তারা কালী-দুর্গাকে বৈষ্ণবীরূপে দেখে না, তারা রক্তপায়ী মাংস-পিশাচীরূপেই দেখে।

এই হল কলির জীবের ভয়ংকর বৈষ্ণব-অপরাধ। কলিযুগে পশুবলি নিষিদ্ধ। অন্যান্য যুগে বৈদিক আচারসম্পন্ন শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে বৃদ্ধ পশু আহুতি দিয়ে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রযোগে পশুর উন্নত নবজীবন দান করবার যথেষ্ট ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু কলিযুগে বৈদিক আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদের সে ক্ষমতা নেই। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেব জগতে পশুবলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সেই ইতিহাস সবার জানা।

মনুসংহিতায় 'মাংস' কথাটির অর্থ ব্যাখ্যাত হয়েছে 'মাম্ স খাদতি ইতি মাংস' অর্থাৎ "সেও আমাকে এইভাবে খাবে যেরূপ আমি তাকে খাচ্ছি।" "বলি দিয়ে মাংস খাওয়া ধর্মানুমোদিত মনে করে যদি কেউ মাংসাশী হয়, তবে সে স্বধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মকেই স্বধর্ম মনে করে।" (ভাঃ ১১/৫/১৩ বিবৃতি)

"ধর্মজ্ঞানহীন সাধুত্ব-অভিমানী দুর্জন ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করলে পরলোকে সেই পশুরাই ঘাতকদের অনুরূপভাবে ভক্ষণ করে থাকে।" (ভাঃ ১১/৫/১৪)

"আর যে সব দাম্ভিক ব্যক্তি ইহলোকে দম্ভ প্রকাশ করবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং সেই যজ্ঞে পশু বধ করে, পরলোকে তারা 'বৈশস' নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যমদূতগণ তাদেরকে অশেষ যাতনা দিয়ে বধ করে।" (ভাঃ ১১/৫/২৫)

ছাগল-মহিষ-আদি বলি দিয়া পূজে ॥
বৈশস-নরকে যাথে বধস্থান বলি ।
নরক ভুঞ্জায়ে তারে তথা লৈঞা পেলি ॥
ছাগ-মহিষের রূপ ধরি ভয়ঙ্কর ।
খণ্ড খণ্ড করি তার কাটে কলেবর ॥
আর্তনাদ করি কান্দে হইয়া ফাপর ।
মহাশূলে তার অঙ্গ বিন্ধে নিরন্তর ॥

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী ৫/৮/৪১-৪৪)

শ্রীমদ্ভাগবত (৫/২৬/৩১) শ্লোকে বলা হয়েছে—"যারা পশুবলি দিয়ে ভৈরব বা ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করে, হিংসা-কবলিত সেই পশু যমালয়ে রাক্ষস হয়ে ঘাতকের মতো সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে তাদের বধ করে। ইহলোকে যারা পশুর রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্যগীত করে, সেই সব হিংস্রাশ্রিত পশু সেইরূপেই পরলোকে হিংসাকারীর রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্যগীত করতে থাকে।"

প্রশ্ন ৬। পৃথিবীর গাছপালা পশুপাখি সব কিছুই পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি। শাক-সবজি ও মাছ-মাংস পঞ্চভূতের বাইরের কিছু নয়। অতএব কোন্‌টি আমিষ আর কোন্‌টি নিরামিষ হিসাবে গ্রহণ করব?

উত্তর ঃ অনেক সময় ডাক্তার তাঁর রোগীকে নির্দেশ দেন, "দই খাওয়া নিষিদ্ধ। রোজ যতটা সম্ভব ছানা খাবেন।" তখন রোগী যদি চিন্তা করেন, "ওঃ ডাক্তার ঠিক বলছে না, দই আর ছানা—দুইই দুধ থেকে তৈরি। তাই দই খাওয়া আর ছানা খাওয়া একই ব্যাপার।" এইরকম মনগড়া বুদ্ধিতে চললে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

অনুরূপভাবে, শাক-সবজি এবং মাছ-মাংস সবই পঞ্চভূত অর্থাৎ, মাটি, জল, বায়ু, আগুন ও আকাশ দ্বারা গঠিত হলেও পরম নিয়ন্তা ভগবানের নির্দেশে মাছ-মাংস সম্পূর্ণ বর্জন করে শাক-সবজি খাদ্যরূপে গ্রহণীয়। পঞ্চভূত বিশিষ্ট মল-মূত্র-বিষ্ঠা শূকর বা কুকুরের প্রিয় খাদ্য হতে পারে, তাই বলে মানুষ তা কখনই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করবে না।

আমিষ বলতে সাধারণত পশু-পাখি, মাছ-সাপ, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবের দেহজাতীয় খাদ্যকে বোঝায়। নিরামিষ বলতে গাছপালা, ফল-ফুল-পাতা, শস্যজাতীয় খাদ্যকে বোঝায়। মাছ-মাংস হচ্ছে উগ্র রাজসিক ও ঘোর তামসিক খাদ্য, যা মানব মনের পশুবৃত্তি বাড়িয়ে তোলে, ধীরতা ও পবিত্রতা নষ্ট করে। উদ্ভিজ্জ খাদ্য সাধারণত দেহ ও মনে সত্ত্বগুণের সঞ্চার করে।

রক্ত-মাংস-হাড়-পিত্ত দিয়ে তৈরি খাদ্য হল ঘোর তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তির খাদ্য। তাই মাছ-মাংস অমেধ্য অর্থাৎ, অস্পৃশ্য খাদ্যরূপে চিহ্নিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৭/১০) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন এই অস্পৃশ্য খাদ্য তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয়। *চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্*।

প্রশ্ন ৭। পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে অশান্তি রুখতে মাঝে মাঝে মাছ মাংস ডিম গ্রহণ করতে হয়। বিশেষতঃ একটি মেয়ের পক্ষে কি করণীয়?

উত্তর ঃ পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে চ্যাপ্টা হওয়া কোনও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন অনুন্নত অঞ্চলের বর্বর মানুষেরা তাদের বৃদ্ধ পিতামহকে কেটে ফেলে, তারপর 'ভোজ-উৎসব' পালন করে। আমেরিকার শিকাগোয় কসাইখানাতে রোজ রোজ পাইকারী হারে পশুকে মেশিনে বেঁধে হত্যা করা হচ্ছে, আর স্কুল-কলেজের ছাত্ররা বাস রিজার্ভ করে সেই রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড দেখে আনন্দ বিনোদন করার জন্য দলে দলে গিয়ে ভিড় করছে। অতএব তাদের সঙ্গে পড়ে আমাকেও তাদের সামিল হয়ে চলতে হবে, এমন কোন যুক্তি হয় না। পিশাচ রাক্ষস ডাইনী ইত্যাদি ধরনের জাতি কিংবা হিংস্র প্রাণীরা রক্ত মাংস ভোগ করতে চায়। কিন্তু সভ্যতাগর্বী মানুষগুলি কেন পিশাচ-রাক্ষস ধর্ম গ্রহণ করবে? শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/১৮/২১) বলা হয়েছে—*যক্ষ-রক্ষাংসি ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ*। অর্থাৎ, 'যক্ষ, রাক্ষস, ভূত ও পিশাচেরা মাংস আহারে অভ্যস্ত।'

তিন প্রকারের খাদ্যের বিভাগ রয়েছে। নিরামিষ, শাকসবজী, ফলমূল, শস্যাদি এবং দুধ ও দুধ-জাতীয় খাদ্য হচ্ছে সাত্ত্বিক। মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন হচ্ছে উগ্র রাজসিক এবং পচা বাসী দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য হচ্ছে তামসিক। তার মধ্যে রাজসিক ও তামসিক খাদ্যকে অস্পৃশ্য খাদ্যরূপে বিবেচিত হয়েছে। তা কেবল উগ্র ও ঘোর তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয়। এই ধরনের ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিকৃত।

আমাদের রক্ত, মাংস, অস্থি ও মজ্জা খাদ্যরস থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে। অতএব আমরা কে কোন্ গুণের অধিকারী তা আমাদের খাদ্যগুণের দ্বারা বিচার করতে পারি। সেই জন্য শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী বলেছিলেন, "তোমার পরিচয় হল তুমি কি ধরনের খাবার খাচ্ছ।" আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে "মৃতদেহ খাওয়া ছাড়তে হবে।" জীবজন্তুকে হত্যা করে তার দেহ, তার মাংস, তার রক্ত, তার ডিম রান্না করে খাওয়াটা মানব সভ্যতার অভিশাপ। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, নিজের জিহ্বার লালসার তৃপ্তি ও উদর পূর্তি করার জন্য অন্য জীবের হত্যাকাণ্ড ঘটানো নিছক পশুবৃত্তি মাত্র।

পরিবেশ যদি শান্তি, পবিত্র ও শুচিপূর্ণ রাখতে হয়, তবে রাজসিক অর্থাৎ রক্ত মাংস খেয়ে শান্তি আসবে না, অধিকন্তু ঘোর অশান্তির বীজ ছড়িয়ে যাবে, আর কলি প্রবেশ করবে, কাউকে হিংসা করে সুখী হওয়া যায় না। অতএব প্রশ্নানুসারে, অশান্তি রুখতে জীবজন্তুর মাংস খেতে হচ্ছে—এটা নির্বুদ্ধিতা বলে মানতে হবে। মাংসভক্ষণস্থলী কলির আশ্রয় বলে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ রয়েছে। তারপর মাংসভুকদের পরলোক নরকে গিয়ে আগুনের মধ্যে পড়ে যমদূত দ্বারা বাধ্য হয়ে নিজ মাংস দাঁতে কামড়িয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে হবে। তাও নরক শাস্তি বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।

আধুনিক যুগের অধিকাংশ দুরারোগ্য ব্যাধি মাছ-মাংস থেকেই আসছে, ইদানীং বিজ্ঞানীরা তা স্বীকার করেছেন। আমাদের হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন আন্দোলন সমগ্র পৃথিবীতে নিরামিষ আহার গ্রহণের জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বহু বহু মানুষ, জনসাধারণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আমিষ বর্জন করে চলেছেন। যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে ভক্তিময় জীবন গঠন করতে বাসনা করেন, তাঁরা তো কৃষ্ণপ্রসাদ ছাড়া অন্য কোন অখাদ্য বস্তুকে খাদ্য রূপে গ্রহণই করেন না।

সুতরাং, নিজের নিরামিষ আহারের প্রতি আকর্ষণ থাকলে এবং আমিষের প্রতি আকর্ষণ না থাকলে জেনেশুনে কারও কাছে মাছ মাংস খাওয়ার জন্য সামিল হবেন কেন?

প্রশ্ন ৮। শ্রাদ্ধবাসরে মাছ-মাংস খাওয়ার যে প্রচলিত প্রথা সমাজে দেখা যায়, তার যৌক্তিকতা কি?

উত্তর ঃ শ্রাদ্ধবাসরে মাছ-মাংস খাওয়া গর্হিত কর্ম বলে শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। শ্রীপদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

যো ন দদ্যাদ্ হরের্ভুক্তং পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্মণি।
অশ্নন্তি পিতরস্তস্য বিন্মূত্রং সততং দ্বিজাঃ ॥

"হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্যে ভগবান শ্রীহরির মহাপ্রসাদ প্রদান করে না, তার পিতৃপুরুষেরা সর্বদা মলমূত্র ভোগ করে থাকে।"

যেখানে এরকম অবস্থা, সেই ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধে মাছ-মাংসের রান্না চড়িয়ে নিবেদন এবং মাছ-মাংসময় ভোজ উৎসব কী পরিমাণে ভয়ঙ্কর পরিণতি আনতে পারে—তা শ্রাদ্ধ কর্মানুষ্ঠানকারীগণ নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা করতে পারেন।

প্রশ্ন ৯। আমিষভোজীরা বলে আমিষ না খেলে শরীর ভাল থাকে না। কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ শরীর ভাল না থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে মাছ-মাংস ভক্ষণ। বরং আমিষ ত্যাগ করলে নিরামিষ দ্বারা শরীর ও মন ভাল থাকে। অর্থাৎ, আমিষের বিপরীত কথাটি ঠিক। পুষ্টিমূল্যের বিচারে দেখা গেছে নিরামিষ খাবারের পুষ্টিমূল্য আমিষ থেকে অনেক গুণ বেশি (হায়ার টেস্ট্, বিবিটি, ১৮পৃঃ) মাংসাহারী দেশগুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, শাকাহারীরা যতটুকু শাকসবজি গ্রহণ করে, মাংসাহারীরা তার পাঁচগুণ মূল্যের খাবার পশুদের আহার করিয়ে সেই একই পরিমাণ মাংস উৎপাদন করে (দি ভেজিটেরিয়ান অলটারনেটিভ ১৯৭৮, পৃঃ ২৩৪,—লেস্টার ব্রাউন)।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেন, খাদ্যরসের মধ্যে কোলেস্টেরল নামে এক প্রকার পদার্থ এসে উপস্থিত হলে সেই পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় শরীরে ক্ষয়রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। রক্তদূষণ, হৃদরোগ, অস্থিক্ষয়, ক্যানসার, খোস পাঁচড়া, চর্মরোগ ইত্যাদি ব্যাধির কারণ সেই 'কোলেস্টেরল'। এই পদার্থটির উৎস হল মাছ মাংস। তাই প্রিয় রোগীদের বর্তমানে কোলেস্টেরল-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ মাছ মাংস খেতে নিষেধ করেন। ১৯৬১ সালে, *'জার্নাল অব দ্য আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েসন'* ঘোষণা করে—"নব্বই থেকে সাতানব্বই শতাংশ হৃদরোগ নিরামিষ আহারের দ্বারা নিরাময় করা যেতে পারে।" ১৯৭৭ সালে, *ইন্টার সোসাইটি কমিশন ফর হার্ট ডিজিজ*-এর সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, তামাক এবং মদের পরে মাংসই হল পশ্চিম ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর বহু ধনী দেশে অধিকাংশ অকাল মৃত্যুর কারণ।

অনেক সময় পত্রিকায় দেখা যায়, রুগ্ন মাছ খেয়ে বহু লোক মৃত্যু বরণ করছে। অবশ্য মৎস্য ব্যবসায়ীগণ ঐসব খবর আদৌ পছন্দ করেন না। দেখা যায়, মৎস্যভোজী বাঙালীর চেয়ে নিরামিষভোজী মাড়োয়ারীরা অনেক বেশি ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী।

শরীরতত্ত্ববিদ্গণ মানুষের শরীরে অন্ত্র ও দাঁতের গঠন পরীক্ষা করে দেখেছেন, মানুষ আমিষভোজী শ্রেণীর জীব নয়। মানুষ নিরামিষ [illegible]রি অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত মাংসাশী প্রাণীর দাঁতগুলি ছুঁচালো ও ধারালো এবং তাদের থাকে শক্ত ও তীক্ষ্ণ নখ। যেমন বাঘ, সিংহ, কুকুর। সাধারণতঃ নিরামিষ ভোজীদের দাঁত হয় চেপ্টা। যেমন গরু, ছাগল।

মাছ-মাংস রজ ও তমোগুণের সঞ্চারক অখাদ্য। তা মানুষের মনের উগ্রতা, বদ মেজাজ, আক্রমণমুখী ভাব ইত্যাদি পশুসুলভ মানসিক ব্যাধি বৃদ্ধি করে। মানুষ আজ

উগ্র প্রকৃতির হয়েছে; বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে চাইছে, সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা চলছে। এর মূলেও আমিষ বস্তুর প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য।

পশু-পাখি মাছ-ব্যাঙ ও কীট-পতঙ্গের রক্ত মাংস হাড়—এগুলি শাস্ত্রে অমেধ্য বা অপবিত্র বলা হয়েছে। সেই অমেধ্য দ্রব্য ভক্ষণ করা সভ্য মানুষের লক্ষণ নয়, তা পশু মানসিকতারই লক্ষণ।

শ্রীমনুসংহিতার নির্দেশ অনুসারে, যদি কেউ এই জন্মে মাছ মাংস খেতে চায়, তবে জন্মান্তর চক্রে যখন সে অনুরূপ একটি দেহ লাভ করবে, তখন অনুরূপভাবেই নিজের রক্ত মাংস হাড় হৃৎপিণ্ডটাকে অপরকে খাদ্যরূপে নিবেদন করতে বাধ্য হতে হবে। মাংস কথাটির অর্থ—*মাম্* মানে আমাকে, *স* মানে সে। *মাম্ স খাদতি ইতি মাংসঃ* (মনুসংহিতা) অর্থাৎ, আমাকেও সে পরজন্মে এইভাবেই খাবে—তারই একটি প্রতিশ্রুতি।

জগতে প্রত্যেক জীব প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে চলে। কিন্তু মানুষকে ভগবান অনেক স্বাধীনতা দিয়েছেন। '*যথেচ্ছসি তথা কুরু*'—তোমার ইচ্ছায় তুমি কর্ম কর। মনুষ্য জীবন হল কর্মক্ষেত্র। সে ইচ্ছা করলে দেবতা হতে পারে—ইচ্ছা করলে শূকর হতে পারে। বহু তান্ত্রিক এমনকি বিষ্ঠাও ভক্ষণ করে।

রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে দেখা যায় রাম লক্ষ্মণ, কিংবা পাণ্ডবেরা—তাঁরা সবাই মহা বলশালী যোদ্ধা ছিলেন। বহু অসুরের সঙ্গে তাঁদের লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা মাছ মাংস খেতেন না। ইতিহাসের কোনও মহীয়সী সতী সাধ্বী নারীদের কখনও আমিষ রান্না করতেও দেখা যায়নি, যা বর্তমানেই যত দেখা যাচ্ছে। মাছ-মাংস মানুষের ভক্ষ্যদ্রব্য নয়। তামসিক নিকৃষ্টস্তরের মানুষেরাই মাছ-মাংসকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশিত হয়েছে—*যক্ষরক্ষাংসি ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ* (৪/১৮/২১) অর্থাৎ, যক্ষরাক্ষস ভূতপ্রেত এবং পিশাচেরাই আমিষ আহারে অভ্যস্ত।

অনেকে বলে যে, 'আমরা অন্যান্য পোকামাকড়, সাপব্যাঙ, পশুপাখি খাই না, কেবল মাছ খেলে দোষ কি?' কিন্তু মানবজাতির পিতা মহর্ষি মনু আমাদের মৎস্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন—

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে ।
মৎস্যাদঃ সর্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ ॥

(মনুসংহিতা ৫/১৫)

অর্থাৎ, যে যার মাংস খায়, সেই ব্যক্তি তন্মাংসখাদক বলে কথিত। কিন্তু মাছ যাবতীয় প্রাণীর মাংস খায়। সবরকমের মরা প্রাণীর পচা দেহ মলমূত্রাদি খেতে অভ্যস্ত। সুতরাং একটি মাছ খাওয়া যা সব রকমের মাংস খাওয়াও তাই। অতএব মাছ খাওয়া সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

মাছ মাংস ইত্যাদি অমেধ্য দ্রব্য পিশাচতুল্য তামসী লোকেদের প্রিয় হতে পারে। অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন—*অমেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্* (গীতা ১৭/১০)—অমেধ্য ভোজন করা তামসিক লোকের প্রিয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/১৪) বলা হয়েছে, "ধর্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, দুর্বিনীত, সাধুত্ব-অভিমানী, দুর্জন অসাধু ব্যক্তিরাই নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করে, পরলোকে নিহত পশুরা তাদের ভক্ষণ করে থাকে।" অতএব নরদেহ লাভ করে যারা বুদ্ধি বিপর্যয়ক্রমে মাংস খাচ্ছে, তাদের অনুরূপভাবে ঋণচক্র পরিশোধ করতেই হবে।

প্রশ্ন ১০। গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূজা মহোৎসবে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সাধারণত যারা ঐ ভোগ রান্না করে, তারা খুব নিষ্ঠাবান নয়। তাদের হাতের রান্না কি ভগবান গ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ নিয়ম নিষ্ঠাপরায়ণ হতে হবে। ভগবানের ভোগ রান্নার জন্য শুচিতা রক্ষা করে চলা উচিত। দেহ, মন, বসন ও আসবাবপত্র অবশ্যই শুচি শুদ্ধ থাকতে হবে। তা ছাড়া নিয়ম নিষ্ঠাপরায়ণ বলতে তাঁদেরই বোঝায় যাঁরা ১। আমিষ আহার করেন না, ২। বিড়ি, সিগারেট, তামাক, চা, দোক্তা ইত্যাদি নেশা দ্রব্য ব্যবহার করেন না, ৩। তাস, পাশা, দাবা, জুয়া, লটারী খেলেন না এবং ৪। অবৈধভাবে যৌন সঙ্গ করেন না।

যারা মাছ-মাংস আহার করে অর্থাৎ, জীবহিংসা করে, তারা ভগবদ্‌বিদ্বেষীরূপে পরিগণিত বলে শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। তাদের হাতের রান্না ভগবান গ্রহণ করেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ রয়েছে—

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্ ।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

অর্থাৎ, "স্ত্রী-পুত্রাদিযুক্ত শবতুল্য নিজদেহের প্রতি আসক্ত মানুষেরা পরদেহে স্থিত জীবাত্মার প্রতি হিংসাবশত পরমাত্মা জগদীশ্বর শ্রীহরির প্রতিই বিদ্বেষ করে থাকে এবং তার ফলে তারা নরকগামী হয়।" (ভাঃ ১১/৫/১৫)

কেবল ঈশ্বরদ্রোহী প্রাণি-বধ করে ॥

(কৃঃ প্রেঃ তঃ ১১/৫/৪১)

সুতরাং, নারকী ভগবদ্‌বিদ্বেষীরা ভগবদ্-উপাসনা করার অনুপযুক্ত—এরূপ মানুষেরা যদি ভগবানের শ্রীবিগ্রহ পূজা করেও, তবুও ভগবান প্রীতি হন না। এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ রয়েছে—

ততোঽর্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধায় সপর্যয়া ।
উপাসত উপস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্ ॥

অর্থাৎ, "তদনন্তর কেউ কেউ শ্রীহরির অর্চামূর্তি শ্রদ্ধাসহকারে নানাবিধ উপকরণ দ্বারা পূজা করেন, কিন্তু জীববিদ্বেষী ব্যক্তিরা পূজা করলেও শ্রীমূর্তি পরমার্থপ্রদ হন না।" (ভাঃ ৭/১৪/৪৩) তাই যারা ডিম মাছ মাংস ভক্ষণ করে, তাদের দ্বারা ভগবানের বিগ্রহ পূজা একেবারেই নিষিদ্ধ। এই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী গ্রন্থে নির্দেশিত হয়েছে—

সেই মূর্তি করি যেবা ভজে নারায়ণ ।
জীবহিংসা করে যদি, নাহি প্রয়োজন ॥

শ্রীহরির পূজা-অর্চনা করতে হলে মানুষকে সহজ সরল ব্রহ্মণ্য গুণসম্পন্ন হতে হবে। পিশাচগুণসম্পন্ন হলে শ্রীহরির প্রীতি সাধন করা যায় না। আমিষভোজীদের দ্বারা পূজা-অর্চনা হয় না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—যক্ষ, রাক্ষস, ভূত পিশাচেরাই আমিষ খেতে অভ্যস্ত। *যক্ষরক্ষাংসি ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ।* (ভাঃ ৪/১৮/২১)

অথচ, কলিযুগে আমিষভোজী হয়েও অনেকে ব্রাহ্মণের সন্তান বলে গর্ববোধ করেন; কিন্তু শ্রীবরাহপুরাণে বহুপূর্ব থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে—*রাক্ষসাং কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।* অর্থাৎ, "কলিযুগে রাক্ষসরাই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করবে।" অবশ্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় কোন কোন শুদ্ধ ভক্তও ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন—

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।

"আমি আমার ভক্তের ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতিসহকারে গ্রহণ করি।" (গীতা ৯/২৬) কোনও অভক্তের হাতে ভগবান কিছুই গ্রহণ করেন না।

তাই, শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, রাজা দুর্যোধন তাঁর গৃহে ভোজনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের রাজপুরীতে বহুবিধ ভোজ্যসামগ্রী গ্রহণ করতে যাননি। বরং দরিদ্র বিদুরের কুটিরে আপ্যায়িত হয়ে খুদভাজা ও কয়েকটি পাকা কলা ভোজন করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। যদিও দুইজনেই শ্রীকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ জানালেন, দুইজনেই ভোজ্যসামগ্রী শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। তবুও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত বিদুরের গৃহে ভোজন করলেন, অভক্ত দুর্যোধনের প্রাসাদে বহু রকমের ব্যঞ্জন, পিঠে, পায়েস, পুরি সাজানো হলেও শ্রীকৃষ্ণ সেই সব ভোজন করতে গেলেন না।

সুতরাং, নিয়ম নিষ্ঠাপরায়ণ হতে হবে এবং পরমেশ্বর ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তও হতে হবে। তবে তার দ্রব্য ভগবান প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন ১১। মা কালী কি মাংস খান? যদি না হয়, তবে পাঁঠা বলি দেওয়া হয় কেন?

উত্তর ঃ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (৪/১৯/৩৬) শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—"মা কালী হচ্ছেন শিবের সাধ্বী স্ত্রী। তিনি শিবের উচ্ছিষ্ট মাত্র গ্রহণ করেন। শিব নিরামিষাশী, প্রসাদভোজী। তাই মা কালী কখনও আমিষাশী নন।"

শিব পরম বৈষ্ণব। তিনি বিশেষ কৃপা করে ভূত প্রেত পিশাচদেরও আশ্রয় দিয়েছেন। তেমনই মা কালীও যক্ষিনী, ডাইনী ইত্যাদিকে আশ্রয় দিয়েছেন। এই শ্রেণীর প্রাণীরা যাতে জগতে খুব উৎপাত না করে, সেই জন্য রক্তমাংস হাড় ভক্ষণের প্রবল প্রবণতাকে সংযত করার উদ্দেশ্যে মা কালী তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। পিশাচগুণসম্পন্ন অর্থাৎ, তামস প্রকৃতির মানুষদের জন্য—যার বিধান হচ্ছে, অমাবস্যার গভীর রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে মহামায়ার উগ্ররূপা কালীমূর্তির সামনে কোনও একটি পাঁঠাকে বলি দিয়ে তার মাংস ভক্ষণ করা যায়। শাস্ত্রের এই বিধান মাংসাহার নিয়ন্ত্রণের জন্যই।

কালক্রমে বিভিন্নভাবে লোকে বলিপ্রথার দোহাই দিয়ে অসংখ্য প্রাণী হত্যা করতে থাকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণু বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হয়ে বলি প্রথা নিষিদ্ধ করেন।

কলিবদ্ধ মানুষ সমস্ত বিধিনিষেধ এড়িয়ে উন্মত্ত পিশাচের মতো অসংখ্য কসাইখানা খুলে বসেছে। আর দিন দিন অগণিত পশুহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে, যদিও বা অনুরূপভাবে তাদেরও কর্মফল চক্রে নিহত হতে হবে।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (৫/৯/১৮) শ্লোক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, "আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষেরা কিছু জাগতিক লাভের জন্য কালীর পূজা করে। কিন্তু তাদের সেই পূজার নামে তারা যে পাপ করে, তা থেকে তারা অব্যাহতি পায় না। প্রতিমার সম্মুখে বলি দেওয়া নিষিদ্ধ।"

প্রশ্ন ১২। আমরা গৃহস্থ মানুষ। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। মাছ-মাংস না খেলে চলবে কি করে?

উত্তর ঃ গৃহস্থ ব্যক্তিদের যেহেতু আপন ছেলেপিলেদের প্রতি দয়া সহানুভূতি মায়া-মমতা রয়েছে, সেই হেতু তাঁদের সর্বাগ্রেই অন্য প্রাণীদের প্রতিও মায়া-মমতা থাকা প্রয়োজন। যথার্থ ভক্ত-গৃহস্থ কখনই অন্যপ্রাণীর রক্ত-মাংস-হাড় ভক্ষণের প্রতি রুচিশীল হন না।

শ্রীব্রহ্মাপুত্র কর্দমমুনিকে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশের প্রাক্কালেই পরমেশ্বর ভগবান গৃহস্থ জীবনের ধর্মাচরণ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, *কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্ত্বা চাভয়মাত্মবান্* (শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২১/৩১)—"সকল জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর এবং সকলকে অভয় প্রদান করে আত্ম-উপলব্ধি কর।" সুতরাং, জগতে অন্য সকল জীবের প্রতি অনুকম্পা না থাকলে, অন্যের বেঁচে থাকার মতো নিরাপত্তার আশা না দিতে পারলে এই জগতে গৃহ বানিয়ে গৃহস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ বৈদিক আইনে তার জীবনেও কোনও অনুকম্পা বা নিরাপত্তা লাভের সুযোগ থাকে না।

একজন আদর্শ গৃহস্থ পিতা-মাতার কাছে কেবল নিজেদের জাত সন্তানই নয়, অন্যের গর্ভজাত জীবও সন্তানের মতো। সেই কথা গঙ্গাপুত্র শ্রীভীষ্মদেব শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলেছেন (মহাভারত ১১৪-১১৫ অঃ) "যে ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হয়ে পুত্রমাংস-তুল্য অন্য প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, সে অত্যন্ত নিম্নজাত বলে পরিগণিত হয়। তাকে বহুবিধ পাপযোনিতে জন্ম নিতে হবে। পরের শরীরের মাংস ভক্ষণ করে আপন শরীরের মাংস পুষ্টি করতে যে ইচ্ছা করে, তাকে প্রত্যেক জন্মেই উদ্বিগ্ন চিত্তে কালযাপন করতে হয়। তাই আত্মকল্যাণকারীর পক্ষে অবশ্যই মাছ-মাংসাদি ভক্ষণে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ।"

প্রশ্নানুসারে, মাছ-মাংস না খেয়েই অনেক গুণ ভালভাবেই চলবে। মাছ-মাংস খাওয়ার জন্য যে পরিমাণ মশলাপাতি ও তেল খরচ হয় তার চেয়ে অনেক কম খরচেই বেদবিহিত শাকসবজি গ্রহণ করে একই শক্তি অর্জন করে সুস্থ সবলভাবে বাঁচা যায় এবং তাই-ই মঙ্গলকর।

প্রশ্ন ১৩। আমাদের শরীরে পুষ্টির জন্য স্নেহজাতীয় বা ফ্যাট খাদ্যবস্তুর অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। এইজন্য আমিষজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে ডাক্তারেরা বলেন। এই বিষয়ে যথার্থ খাদ্য বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

উত্তর ঃ সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সব চেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য হচ্ছে দুধ। তাতে যথেষ্ট পরিমাণে স্নেহ পদার্থ বিদ্যমান। মানুষ যদি পাশবিক জঘন্য মনোবৃত্তির বসে গরু কেটে তার রক্তমাংস না খেয়ে স্বাভাবিকভাবে গোমাতার দুগ্ধে প্রতিপালিত হয়, তবে সেটাই হচ্ছে সভ্য জগতের আদর্শ চিত্র। দুধ, মাখন, ছানা এবং এই জাতীয় সুস্বাদু খাদ্যে যে পরিমাণ স্নেহপদার্থ থাকে, তাতে আর নিরীহ পশু হত্যা করার কোনও প্রয়োজন থাকে না। আমিষজাতীয় অর্থাৎ, পশুপাখি মাছ ব্যাঙ ইত্যাদির রক্তমাংস হাড় পিত্ত খাওয়ার ফলে মানুষের শরীরে পুষ্টির পরিবর্তে জটিল পচন রোগ বা ক্ষয়রোগ হচ্ছে বলে আধুনিক বিখ্যাত স্বাস্থ্যবিদ্‌গণ আমিষ খেতে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন ১৪। যিনি মাছ মাংস চা পান বিড়ি খান, তিনি গুরু হতে পারেন কি না?

উত্তর ঃ না, কখনও আমিষভোজী ও নেশাসেবী ব্যক্তিকে পারমার্থিক গুরুদেব রূপে গ্রহণ করা উচিত নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ব্যক্তি কলিগ্রস্ত ধর্মহীন বলে বিবেচিত। তিনি কারও গুরু হতে পারেন না।

প্রশ্ন ১৫। ডাক্তারেরা বলেন, ভিটামিন-ডি থাকে আমিষে। কিন্তু আপনারা আমিষ খেতে নিষেধ করেন। শরীরে ভিটামিন ডি-এর অভাবে নানাবিধ রোগ হয়। তাহলে এই সমস্যায় কি খাওয়া দরকার?

উত্তর ঃ ডাব, নারকেল, পাকা কলা, বড়ি, আচার ইত্যাদিতে বেশ পরিমাণে ভিটামিন-ডি আছে। মায়েরা বাচ্চাদের গায়ে সরষের তেল কিংবা জলপাইয়ের তেল (অলিভ অয়েল) মাখিয়ে সকালের রোদে শুইয়ে রাখেন। আর তাতেই বাচ্চাদের শরীরে ভিটামিন-ডি এর অভাব পূরণ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ১৬। ব্যাঙের ছাতা কিরূপ খাদ্য?

উত্তর ঃ ব্যাঙের ছাতা নিকৃষ্ট স্তরের খাদ্য। দেহমনে তামসিকতা বৃদ্ধি পায়। খাওয়া কখনও উচিত নয়।

প্রশ্ন ১৭। মা কালীর প্রসাদরূপে মাছ-মাংস খাওয়া যায় কি না?

উত্তর ঃ যারা শাক্ত এবং তান্ত্রিক তারা মা কালীর প্রসাদ গ্রহণ করলেও সমস্ত বৈষ্ণব কৃষ্ণভক্ত সযত্নে সেইসব এড়িয়ে চলবেন। দৈত্যদের মাতা দিতিকে তাঁর পতি মহর্ষি কশ্যপ বৈষ্ণবী হতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'কখনও উচ্ছিষ্ট অন্ন, কালীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন, মাছ-মাংসযুক্ত অপবিত্র অন্ন ভোজন করবে না।' (ভাগবত ৬/১৮/৪৯)

প্রশ্ন ১৮। দুধ আমিষ না নিরামিষ?

উত্তর ঃ দুধ ভগবানের প্রিয় খাদ্য। সমস্ত দেবতা ও মুনি-ঋষিদের প্রিয় দ্রব্য। দুধই একমাত্র খাদ্য, সুস্থভাবে বাঁচবার পক্ষে। সেই জন্যই শিশু জন্মাবার কালে ভগবান মাতৃস্তনে দুধ দিয়ে রেখেছেন। দুধ সাত্ত্বিক আহার্য। শরীর ও মন সুস্থ রাখার জন্য সর্ব প্রকার খাদ্যবস্তু দুধের মধ্যেই সংরক্ষিত। অতএব দুধ আমিষ হোক আর নিরামিষ হোক অবশ্যই সেব্য।

প্রশ্ন ১৯। উড়িষ্যার নিরামিশাষী ব্যক্তিরাও পিঁয়াজ রসুন ব্যবহার করে। পেঁয়াজ রসুনকে ওষুধ রূপে, মশলারূপে ব্যবহার হয়। অথচ এই উদ্ভিজ্জ বস্তুকে খেতে নিষেধ কেন? অন্যান্য ডাল জাতীয় খাবারের মধ্যে মসুর ডালকে আমিষ বলা হয় কেন? মাছ-মাংস-ডিম খেলে জীবহত্যা হয়। কিন্তু ফল-ফুল-পাতা গাছ থেকে ছিঁড়লে গাছেরও কষ্ট হয়। সেইভাবে কি ফল-ফুল-পাতা ভগবানকে নিবেদন করলে পাপ হয় না? শাস্ত্রে তো স্বতঃপতিত ফল খাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

উত্তর ঃ পেঁয়াজ রসুন একটি উত্তেজক পদার্থ। পুরাণে উক্ত হয়েছে সমুদ্র মন্থনকালে উত্থিত অমৃত ভগবান মোহিনী অবতার দ্বারা পরিবেশন কালে দেব-ছদ্মবেশী রাহু নামক এক অসুর অমৃত গ্রহণ করছিল। এমন সময় চন্দ্র ও সূর্যদেবের ইঙ্গিতে মোহিনী অবতার সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুর গলা কেটে দেন। রাহু অসুরের রক্ত মাটিতে পতিত হলে সেখান থেকে পিঁয়াজ রসুনের জন্ম হল। তাই পিঁয়াজ রসুন গ্রহণ করলে শরীরে আসুরিক ভাব ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সেই হেতু এই উত্তেজক পদার্থ সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ করেন না। মনুসংহিতায় পিঁয়াজ রসুন খেতে নিষেধ রয়েছে।

মসুর ডালও এই রকমই ডাল যা অন্যান্য আমিষ খাদ্যের মতোই মানুষের শরীরে সাত্ত্বিক ভাব নষ্ট করে।

মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি উগ্র হিংস্র প্রাণীর খাদ্য মানুষকে খেতে নিষেধ করা হয়েছে। ফল ফুল পাতা ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ খাদ্য মানুষকে গ্রহণ করতে ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন। গাছ থেকে ফল ফুল পাতা মাটিতে ঝরে পড়লে তবে সেই ফল ফুল পাতা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। নতুবা গ্রহণ করা পাপ হবে। এরকম কথা আমরা শুনিনি। লাউ, পুঁই, বেগুন, কুমড়ো, শশা, লংকা, ঢেঁড়স ইত্যাদি গাছ থেকে পাতা কিংবা ফল ঝরে পড়লে সেই পাতা বা ফল খাওয়া যাবে নতুবা যাবে না—এই রকম কথা কোথাও লেখা নেই। ভগবানকে পূজা করতে হলে গাছ থেকে ফুল টুকতেই হয়। অতএব ভগবানকে নিবেদন করে উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণ করলে কোন পাপ হওয়ার কথা নয়।

প্রশ্ন ২০। মুসলীম সম্প্রদায়ের মানুষেরা কখনও কি নিরামিষাশী ছিল? না কি নতুন করে সমাজ গড়তে হবে?

উত্তর ঃ সম্রাট আকবর শুক্র, শনি ও রবি এই তিনদিন নিরামিষ ব্রত পালন করতেন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে তা বলা হয়েছে। মহৎ জীবন-যাপনের জন্য করুণাময় জীবন-

আদর্শের জন্য, সাদাসিধে আহার্য গ্রহণ ও মাংস আহার থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে ইসলামের সাধু-সন্তগণও গভীর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শেখ ইসমাইল, খাজা মৈনুদ্দীন, হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া, বু আলি ক্যলন্দস, শাহ্ ইলায়ৎ, মীর দদ, শাহ আব্দুল করিম প্রমুখ মুসলমান সাধুসন্তগণ আত্মসংযম পূর্বক সর্বজীবে আদর ও প্রীতিসহকারে এবং নিরামিষ আহারের মাধ্যমে পবিত্রভাবে ধর্ম আচরণের পন্থা অনুসরণ করে চলতেন। তাঁরা বলতেন—

"ত বয়াবিন দর্ বহিস্তে আদেন জ,
শফ্কতে বনুময়ে ব খলকে খুদা"—

অর্থাৎ, "যদি তোমরা ভবিষ্যতের আগামী দিনগুলিতে চিরকালই স্বর্গে বসবাস করতে চাও, তা হলে ভগবানের সমগ্র সৃষ্টির সাথে করুণা ও সহমর্মিতার হৃদয়বৃত্তি নিয়ে সদাচরণে অভ্যস্ত হও।"

ভক্ত কবীর বলেছেন—"এমন কি রোজা (উপবাস) পালনকারীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় যদি তার জিহ্বার লালসা চরিতার্থ করার জন্য জীব-হত্যায় সে প্ররোচিত হয়। কারণ জীব-হত্যায় আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন না।"

প্রখ্যাত মুসলীম পীর মীর দদ্ বলেছেন—"কোনও জীবের মাংস যে আহার করে তাকে তার নিজের মাংস দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। অন্য জীবের হাড় যে ভেঙ্গে দেয়, তার নিজের হাড়ও ভেঙ্গে যাবেই। প্রতিবিন্দু রক্তপাতের হিসাব নিজের রক্ত দিয়ে মেটাতে হবে। যেহেতু সেটাই সনাতন রীতি।"

মনুস্মৃতির সঙ্গে এই উক্তির সাদৃশ্য রয়েছে—*মাম্ স খাদতি ইতি মাংসঃ।* মাংস খাচ্ছি মানে আমাকেও সে খাচ্ছে। অর্থাৎ, এই জীবনে আমি যেভাবে প্রাণী হত্যা করে খাচ্ছি সেও আমাকে অনুরূপভাবে পরবর্তী জীবনে খাবে। কিন্তু আমরা যদি ভাবী জীবনে সুখী হতে চাই তবে রক্তমাংস খাওয়া রূপ গর্হিত কর্ম বন্ধ করতেই হবে।

প্রশ্ন ২১। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের গবেষণানুযায়ী, গাছেরও প্রাণ রয়েছে অন্যান্য প্রাণীর মতন। কিন্তু তবুও কেন গাছকে নিরামিষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়? কেন অন্যান্য প্রাণীর মতন গাছের প্রতিও ন্যায় বিচার করা হয় না?

উত্তর ঃ গাছের প্রাণ আছে—একথাটি মাত্র কিছু বছর আগে জগদীশচন্দ্র বসুর কথা নয়, লক্ষ লক্ষ বছর আগে মহর্ষি ব্যাসদেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন যে, গাছের প্রাণ আছে। শ্রীব্যাসদেব সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কত রকমের প্রাণী রয়েছে তাও সুন্দরভাবে বহু আগের থেকেই উল্লেখ করেছেন। মোট চুরাশি লক্ষ রকমের জীবের মধ্যে কেবল গাছপালা হচ্ছে মোট কুড়ি লক্ষ রকমের।

সাধারণত গাছপালা থেকে জাত খাদ্যকে নিরামিষ খাদ্য বলা হয় এবং সাধারণত গাছপালা ছাড়া অন্যান্য প্রাণী থেকে জাত খাদ্যকে আমিষ বলা হয়।

আপনার প্রশ্নটি হচ্ছে, অন্যান্য প্রাণীকে হত্যা করে ভক্ষণ করাটা অন্যায়, হত্যা না করাটা ন্যায়, তেমনি গাছপালাকেও ন্যায় সঙ্গত বিচারে হত্যা করা বা ভক্ষণ করা উচিত নয়। অথচ ভক্ষণ করা হচ্ছে কেন?

উত্তরটি হচ্ছে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলাটাই ন্যায়, নিয়ম বিরুদ্ধ আচরণ করাটাই অন্যায়। এই জগতে এক জীব অন্য জীবকে খেয়েই বেঁচে থাকে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*জীবো জীবস্য জীবনম্*—এক জীব অন্য জীবের জীবন ধারণের উপায়। আপনি যদি ন্যায় বলতে মনে করেন যে, কেউ কাউকেই খাবে না—কিন্তু তা কখনই সম্ভব নয়। যদি আপনি কোনও প্রাণী, কোনও গাছপালা—কিছুই না খেয়ে কেবলমাত্র জল খেয়ে থাকেন, তবে সেখানেও আপনি জীবহত্যা করছেন। কারণ জলে অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সূক্ষ্ম জীব রয়েছে, জলপানের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে হত্যা করা হয়ে যাচ্ছে। তারপর আপনি যদি জলও না খান, কেবল বাতাস খেয়ে থাকেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রেও আপনি জীবহত্যা করছেন। কারণ বাতাসে অসংখ্য জীবাণু আপনার কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলেই নিহত হচ্ছে। অতএব প্রতিনিয়ত আপনি জীবহত্যা রূপ অন্যায় কাজটি করেই চলেছেন, অথচ এখন কেবলমাত্র গাছপালা হত্যার ক্ষেত্রে অন্যায় হচ্ছে কিনা সেই চিন্তা করছেন এবং সেই প্রশ্নটি নিয়ে বিচার করতে চাইছেন।

কিন্তু সেই বিচারটি করতে হয় মানব-সমাজের জন্য ভগবানের দেওয়া নিয়মকানুনের ভিত্তিতে। যেহেতু খাওয়া দাওয়া শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে দিয়ে জীবহত্যারূপ অন্যায় কর্ম এড়িয়ে গিয়ে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না—এবং সেইভাবে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার কথাও কোন শাস্ত্রে নেই—সেইহেতু আমাদের কিছু না কিছু খাদ্য গ্রহণ করতেই হবে। আর সেই খাদ্যটি অবশ্যই গাছপালা থেকেই সংগ্রহ করতে হবে বলে বৈদিক শাস্ত্রে এমনকি সকল ধর্মশাস্ত্রেই নির্ধারিত রয়েছে।

সাধারণ ক্ষেত্রে হত্যা করাটিই অন্যায় বা পাপকর্মই বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে হত্যা করাটা অন্যায় হয় না। কেউ যদি তার সন্তানকে হত্যা করে তবে আইনত সে দণ্ডনীয়ই হয়, কিন্তু সেই ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে একটি সেনা হিসাবে সেনাধ্যক্ষের নির্দেশে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করলেও সে দণ্ডনীয় বলে পরিগণিত হয় না। তেমনি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে যা করা হয় তা অন্যায় নয়। বরং নির্দেশ পালন করাটাই ধর্মসঙ্গত।

জগতের গাছপালা ফুলফল লতাপাতা শাকসবজী শস্যদানা মানুষের খাদ্য। অন্য প্রাণীর রক্ত-মাংস-ডিম-হাড়-পিত্তরূপ যে খাদ্য তা অন্য শ্রেণীর জীবজন্তুর খাদ্য বলে বিবেচিত হলেও মানুষের জন্য নয়। গরুর খাদ্য ঘাস, তাকে যদি মাছ বা মাংস খেতে দেওয়া হয় তবে সেটি প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ আচারণ। বৈদিক শাস্ত্রে মানুষকে আমিষভোজী হতে নিষেধ করা রয়েছে।

অবশ্য বৈষ্ণব-দর্শনে মানুষকে শেয়াল-কুকুরের মতো আমিষভোজী কিংবা বাঁদর-ভেড়ার মতো নিরামিশাষী হতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। মানুষকে প্রসাদভোজী ভক্ত হতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবানের অর্চা বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত উদ্ভিজ্জ

খাদ্যসামগ্রী নিবেদন করে সেই ভগবদ্-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করলে মানুষ শুদ্ধ সাত্ত্বিক গুণ অর্জন করতে পারে। তখন সে ন্যায়-অন্যায়ের উর্ধ্বে অবস্থান করতে পারে। যখন ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে কোনকিছু ব্যবহৃত তখন সেই সবের যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে বলেই বুঝতে হবে। গাছের ফুল ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলে সেটিই ফুলের সার্থকতা। গাছের ফল ভগবানকে নিবেদিত হওয়ার পর সেগুলি প্রসাদরূপে গ্রহণ করলে তাতে কোন দোষ নেই। বরং নিবেদিত না করে গ্রহণ করলে পাপই গ্রহণ করা হচ্ছে বলে শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন।

এই জগতে সমস্ত ন্যায়-অন্যায় সুখদুঃখ তথা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় চক্র অতিক্রম করে দিব্য আনন্দময় জীবনে উন্নীত হতে হলে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

"প্রসাদসেবা করিতে হয়
সকল প্রপঞ্চ জয় ॥"

প্রশ্ন ২২। আমরা জানি শাস্ত্রে বলে যে, এক প্রাণীর খাদ্য অন্য এক প্রাণী। তাই মাছ এক প্রকার খাদ্য, তা খেলে দোষ কোথায়?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে মাছ সভ্য মানুষের খাদ্য নয় বলেই নির্দেশ করা হয়েছে। মানবজাতির পিতা মহর্ষি মনু নির্দেশ দিয়েছেন—*মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ*—মাছ খাওয়া বর্জন কর। বিড়াল, চিল, বক, শেয়াল, সাপ প্রভৃতি প্রাণীর খাদ্য মাছ। মানুষের খাদ্য নয়। মানুষ যদি মাছ খায় তা হলে তার মনোভাবও সাপ ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীর মতোই হবে। কারণ খাদ্যগুণ থেকে দেহ এবং মনও গঠিত হয়।

প্রশ্ন ২৩। মাংস খাওয়া কি ভক্তির প্রতিকূল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। কলির চারটি পাপকর্ম থেকে সযত্নে মানুষকে এড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছে—মাংসাহার, নেশাভাঙ, অবৈধ যৌনতা ও জুয়াখেলা।

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরে এক সাংবাদিককে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছিলেন, "আপনি মাংস আহার যদি পরিত্যাগ না করেন, তবে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে পারমার্থিক জীবনটি কী। যে ব্যক্তি পাপময় পঙ্কে নিমজ্জিত হয়, সে জানতেই পারে না ভগবান কী, অথবা ভগবদ্‌ভক্তি কী।"

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যার মাংস এই জন্মে ভক্ষণ করা হচ্ছে পরবর্তী জন্মে সেই নিহত প্রাণীদের মাংস ভক্ষণের জন্য নিজেকেও তৈরি হতে বাধ্য থাকতে হবে। ভগবদ্‌ভক্তি জন্মমৃত্যুর সংসার চক্র থেকে জীবকে উদ্ধার করে, আর মাংসভক্ষণ কর্মটি জন্মমৃত্যুর চক্রের মধ্যেই ফেলে রাখে এবং নরক যাতনা ভোগ করায়।

প্রশ্ন ২৪। বেদে কি মাছ মাংস খেতে নিষেধ করেছে? পশু যজ্ঞের কথা বেদে তো অনুমোদিত?

উত্তর ঃ ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি শ্রীব্যাসদেব মহাভারতের শান্তিপর্বে ২৬৫ অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীভীষ্মদেবের বিচখ্নুনূপ সংবাদ কথনে পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন,

"অহিংসাই সমস্ত ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে সমস্ত মানুষ যজ্ঞ উদ্দেশ্যে পশু হত্যা করে মাংস ভোজন করে, তাদের সেই কর্ম সর্বদাই নিন্দনীয়। মদ, মাংস, মাছ খাওয়ার প্রতি নষ্ট ধূর্ত মানুষ আসক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু বেদশাস্ত্রে এই সব ভক্ষণের বিধি নাই। বস্তুত কাম, লোভ ও মোহের বশে লোকদের এই সব অমেধ্য দ্রব্যে প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সমস্ত যজ্ঞেই শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব হয় একথা জেনে যজ্ঞের উপযোগী বৃক্ষ, পুষ্প ও সুস্বাদু পায়স দ্বারা তাঁর আরাধনা করে থাকেন।"

শ্রীযুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে প্রশ্ন করলেন, "হে পিতামহ, নিতান্ত হিংসাশূন্য হয়ে কিভাবে মানুষ জীবন যাপন করবে?"

উত্তরে ভীষ্মদেব বললেন, "বৎস, মানুষ যাতে শরীর বিনষ্ট না হয় এবং অহিংসা ধর্ম পালিত হয়, এরূপ কর্ম করবে।"

প্রশ্ন ২৫। চাঁদকাজীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, একটি গোহত্যা করলে সেই গরুর শরীরে যত লোম আছে তত বছর ধরে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এই ভয়ংকর কথাটি মহাপ্রভু কি নতুন করে বললেন, না কি এই কথা কোনও শাস্ত্রে আছে?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদাই শাস্ত্রসম্মত কথা বলেছেন। চাঁদ কাজীকে যে কথা তিনি বলেছিলেন সেটি তাঁর নতুন কোনও কথা ছিল না। এই কথাটি বহু পূর্বকালে শ্রীব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেছিলেন। "যে ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে ব্যক্তি ঘাতককে গোহত্যার অনুমতি দেয়, তাদের সকলকেই সেই নিহত গরুর লোম পরিমিত বৎসরকাল নরকে নিমগ্ন থাকতে হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞে বিঘ্ন করলে যে দোষ ও যে পাপ জন্মায়, গরু বিক্রি ও গরু চুরি করলে সেই দোষ ও সেই পাপ হয়ে থাকে।"

কোনও প্রাচীন যুগে শ্রীব্রহ্মা যে কথা ইন্দ্রকে বলেছিলেন, সেই কথা স্বর্গরাজ ইন্দ্র রাজা দশরথকে বলেন, দশরথ তাঁর পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে, রামচন্দ্র প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণকে, এবং লক্ষ্মণ বনবাসী ঋষিদের কাছে এই গোহত্যা জনিত পরিণামের কথা কীর্তন করেন। ঋষিরা দেশের রাজাদের কাছে বলেন। এইভাবে ত্রেতাযুগ হয়ে দ্বাপরযুগে এই কথাগুলি শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে গঙ্গাপুত্র শ্রীভীষ্মদেব বলেছিলেন। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি শ্রীব্যাসদেব মহাভারত রচনা কালে অনুশাসন পর্বে ৭৪ অধ্যায়ে এ সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

কলিযুগে নদীয়ার শাসনকর্তা চাঁদকাজীর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সবাইকে শিক্ষা দিচ্ছেন গোহত্যার পরিণাম কত ভয়ংকর। সেই কথা মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ করেছেন মাত্র।

অতএব মহাপ্রভু নতুন কথা কিংবা নতুন ধর্ম কখনই রচনা করছেন না। যা শাস্ত্রে বহু পূর্বে উল্লিখিত রয়েছে সেই সবই প্রকাশিত করা হয়েছে। মহাপণ্ডিত মহাপ্রভুর কথার প্রামাণিকতা আছে বলেই চাঁদকাজীর মতো নাম করা ব্যক্তিও তাঁকে সমর্থন করেছিলেন।

প্রশ্ন ২৬। পূর্বকালে গোমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ কি হয় নি?

উত্তর ঃ পূর্বকালে মুনি-ঋষিরা অতিবৃদ্ধ জরাগ্রস্ত পশুদেরকে কখনও কখনও যজ্ঞে বধ করে বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ তাদের নব সুন্দর জীবন দান করতেন। এই ধরনের বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত পশুদেরকে যখন যজ্ঞানুষ্ঠানে মন্ত্রের মাধ্যমে নবজীবন দান করা হত, তাতে তাদেরকে হত্যা করা হত না, বরঞ্চ তাদের মহা উপকার সাধন করা হত। কিন্তু কলিযুগে তা সম্ভব নয়। কারণ কলিযুগে সে রকম শক্তিশালী কোন ব্রাহ্মণ নেই। তাই শাস্ত্রে গো, অশ্বদের নবজীবন দান করার যজ্ঞও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেই নিষেধ বাণী ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লেখ রয়েছে।

কলিযুগের মানুষ সেই বৈদিক পশুযজ্ঞ অনুষ্ঠান করছে না, তা ঠিক আছে। কিন্তু নিদারুণ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, প্রতিটি দিন বিশাল বিশাল অনেক কসাইখানা বানিয়ে মানুষ ব্যাপক হারে গোহত্যা তথা পশুহত্যা করেই চলেছে। এটি নিঃসন্দেহে মনুষ্য জাতির উপর ভয়ংকর অভিশাপ বর্তাচ্ছে।

প্রশ্ন ২৭। গরু-শূকর-ভেড়া-মাছগুলোকে যদি মানুষ না খায়, তবে সেগুলি মরলে পচতে থাকবে। আর জল-বাতাস-মাটি-আকাশ দূষিত হয়ে আমাদের রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি করবে। ভগবান এই সমস্যার সমাধান কি দিয়েছেন?

উত্তর ঃ গরু-শূকর-ভেড়া-মাছগুলি মরে গেলে টাটকা থাকতে থাকতে মানুষেরা এসে খেয়ে ফেলুক কিংবা ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখুক এরকম কথা শাস্ত্রে বলা হয়নি। ভগবান সেক্ষেত্রে নেকড়ে, শেয়াল, কুকুর, বেড়াল, গোসাপ, বাজ, চিল, কাক, শকুনদের পাঠিয়েছেন সেগুলি খাওয়ার জন্য। কিন্তু মানুষ যদি সেই ধরনের খাবার খাওয়ার চেষ্টা করে তবে উক্ত মাংসাশী শ্রেণীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করা আবশ্যক। এটাই সমস্যার সমাধান। এই সমস্ত মাংসখাদক প্রাণীগুলি জল-বাতাস-মাটি-আকাশ দূষিত হওয়ার আগেই মরা গরু-শূকর-ভেড়া-মাছগুলোকে সময়মতো খেয়ে ফেলবে।

তা ছাড়া আপনার সমস্যাটি হচ্ছে মানুষেরা ওই সব মাংস না খেলে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হবে। কিন্তু এগুলো খেয়ে ফেললে কি রোগের প্রাদুর্ভাব থাকবে না? আপনি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষকদের কাছে জানতে পারবেন যে, অপেক্ষাকৃতভাবে নিরামিষভোজীদের তুলনায় আমিষভোজী দেশের মানুষের মধ্যে রোগের প্রকোপ বেশী।

প্রশ্ন ২৮। আপনারা নিরামিষ খাবার খেতে সৎ উপদেশ যদি দেন তবে ছাগল, গরু, মাছ এদের গতি কি হবে? এসব জীবকে ধ্বংস না করলে তারা সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। প্রকৃতির ভারসাম্য থাকবে না।

উত্তর ঃ ছাগল, গরু, মাছগুলোকে ধ্বংস না করলে তারা সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে আর মানুষের থাকায় জায়গার সংকুলান হবে না—এই ধরনের উদ্ভট মন্তব্য অমূলক। আপনার অবশ্যই জানা উচিত যে গরু, ছাগল, মাছ যথাক্রমে পনেরো-কুড়ি, পাঁচ-ছয়, দু-তিন বছর বাঁচে। গরু-ছাগলের প্রজননও ঘন ঘন নয়। আর মাছের কথা কি বলা যাবে, মাছের সংখ্যা খুব বেড়ে গেলে জগতে তিনভাগ জলেই থাকবে, মাছ এমন হবে না যে পুকুর থেকে জল তোলার অসুবিধা হবে। কিংবা মাছগুলি জল থেকে উঠে এসে আপনার ঘর-দুয়ারে বাসা বাঁধবে। এরকম চিন্তা করা উচিত নয়। আর গরু, ছাগলগুলি কখনও এমন ভীড় পাতাবে না যে, আপনার যাতায়াতের পথ-ঘাট, বাস করার ঘর কিংবা চাকুরী করার অফিসে ঝামেলা করবে। না, তাদের জন্য বিশাল মাঠ তো রয়েছে।

গরু ছাগল মাছগুলোকে মানুষ খেয়ে ফেললেই প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকবে এরকম নয়। প্রকৃতির গঠিত দেহ প্রকৃতিতে মিশে যায়, এটা জানতে হবে। আর ভগবান বলেছেন—*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্*—"আমারই অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি জগৎ পরিচালিত হয়।" অতএব আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। কারণ সেটি ভগবান বুঝবেন।

প্রশ্ন ২৯। ভগবান জগতে জীবদের মধ্যেই খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ করেছেন। অতএব আমিষ খেলে দোষ কোথায়?

উত্তর ঃ বৈদিক শাস্ত্র থেকে জেনে নিতে হবে আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমিষ খাওয়ার নির্দেশ দেননি। যে কোনও খাদক যে কোনও খাদ্যই গ্রহণ করে বসবে—এরকম নয়। বাঘ, ভালুক, শেয়াল, কুকুর, কাক, শকুন, গোসাপ, কুমীর—এদের খাদ্য আর মানুষের খাদ্য এক নয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বৈজ্ঞানিকেরাও পরীক্ষা করে বলেছেন, মানুষের শরীর নিরামিষভোজী প্রাণীর সমতুল্য, কখনও আমিষভোজী প্রাণীদের মতো নয়। মাংসাশী পশুর সূঁচলো নখ, ধারালো ও সূঁচলো দাঁত রয়েছে, কিন্তু মানুষের নখ দাঁত নিরামিষভোজীদের মতো চ্যাপ্টা। দেহের গঠনশৈলী, স্বভাব অনুসারেও মানুষ মাংসাশী প্রাণীদের বিপরীত। অবশ্য শান্তিপ্রিয় মানুষ মাংসাশী প্রাণীদের অনুসরণ করে যুদ্ধপ্রিয়, হিংস্রপ্রকৃতির হয়। রজোতমো গুণসম্পন্ন হওয়াই মাংস খাওয়ার ফল।

প্রশ্ন ৩০। মাছ-মাংস খেলে শরীর পুষ্ট ও সবল হয়। এটা কি ভুল?

উত্তর ঃ মাছ-মাংসভোজী বাঙ্গালীদের তুলনায় নিরামিষভোজী মারাঠী, গুজরাটী, রাজস্থানীরা অনেক অনেক বেশী সবল ও স্বাস্থ্যবান। অতএব শরীরের পুষ্টি ও সবলতা মাছ-মাংস খাওয়ার উপর নির্ভর করে না।

প্রশ্ন ৩১। 'মাংস' শব্দটির অর্থ 'এজন্মে আমি যাকে খাচ্ছি পরজন্মে সেও আমাকে খেতে থাকবে'—এইরকম কথা কোন্ শাস্ত্রে রয়েছে?

উত্তর ঃ 'মনুসংহিতা' শাস্ত্রে পঞ্চম অধ্যায়ে ৫৫নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে—

মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্মহম্ ।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

অর্থাৎ, "ইহলোকে আমি যার মাংস ভক্ষণ করছি, পরলোকে আমাকে সে ভক্ষণ করবে। মনীষিগণ 'মাংস'-শব্দের এইরকম নিরুক্তি বলে থাকেন।" 'মাং' অর্থাৎ, আমাকে 'সঃ' অর্থাৎ, সে। আমাকেও সে এভাবে ভক্ষণ করবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/১৪) বলা হয়েছে—

যে ত্বনেবং বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদাভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥

অর্থাৎ, ধর্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্বিত, সদা অভিমানী যে সব অসাধু নিঃশঙ্ক চিত্তে পশুদের হত্যা করে, সেই সব পশু পরকালে তাদেরকেও ভক্ষণ করে থাকে।

প্রশ্ন ৩২। আমরা যদি মাছ-মাংস না ছাড়তে পারি তা হলে কি কৃষ্ণমন্ত্র নাম নিতে পারব না? কিভাবে ঘরে থেকে কৃষ্ণসেবা করা যাবে?

উত্তর ঃ ঘরে কৃষ্ণসেবা করলেই তো আর মাছ-মাংস কৃষ্ণকে দিতে পারেন না। কৃষ্ণভক্তরা তো কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করেন। মাছ-মাংস খাওয়াটা তো কলির যে চারটি পাপকর্ম রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম। তা হলে পাপও করব, নামও করব—এতে কি লাভ হবে?

প্রশ্ন ৩৩। যারা মাছ রান্না করে তাদের কোন্ নরকে গতি হয়?

উত্তর ঃ কুম্ভীপাক নরকে।

প্রশ্ন ৩৪। যে সব বৈষ্ণব মাছ খায়, তামাক খায়, বিড়ি খায়, তারা কোন্ শ্রেণীর?

উত্তর ঃ তারা অবৈষ্ণব বা অপসম্প্রদায়ী।

প্রশ্ন ৩৫। আমি গৃহে হরিনাম জপ করি, হরি-অর্চনা করি, নিরামিষ ভোজন করি। কিন্তু না চাইলেও ঘরের লোকজনের জন্য আমাকে আমিষ রান্না করতে হয়। এই পরিস্থিতির সমাধান কিভাবে হয়?

উত্তর ঃ এরকম পরিস্থিতির কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। আমিষ ভোজনে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে নিরামিষভোজী অপেক্ষা বেশী তীক্ষ্ণ নয়। আমিষ জিনিষটাই অপবিত্র বলে পরিগণিত। একটা ব্যাগের ভেতরে চাল ডাল ফল, চিনি এক সঙ্গে রাখা যায় কিন্তু তার মধ্যে একটা মাছ রাখা যায় না। মাছটিকে অবশ্যই আলাদা রাখতে হয়। কারণ সেটা নিরামিষের সমপর্যায়ের নয়। শাস্ত্রানুসারে আমিষ ভোজনের বহুবিধ কুফল পেতেই হবে। তবে শুভাকাঙ্ক্ষীজন কৃষ্ণপ্রসাদভোজী হন এবং কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজীদের পরিবেশে ঘরের লোকজনকে নিয়ে আসতে যত্ন করেন। তখন তারা ভক্তদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যথোচিত আগ্রহ ও আনন্দ লাভ করতে পারেন। এজন্য কারও নিজেদের মধ্যে খুব তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ৩৬। মাছ খাওয়া কি পাপ?

উত্তর ঃ স্মৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

মৎস্যাদঃ সর্বমাংসাদঃ তস্মান্ মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ ॥

মাছ খাওয়ার ফলে সমস্ত জীবজন্তু ভক্ষণের পাপ স্পর্শ হয়। তাই মাছ সবচেয়ে অপবিত্র বলে কখনও ভোজ্য বিষয় হয় না। অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা

কোনও কোনও নির্দিষ্ট জিনিষ খেয়ে থাকে। কিন্তু একটি মাছ সবরকমের নোংরা থেকে শুরু করে সর্ব প্রাণীর পচামাংস খেয়ে থাকে। সেই জন্য সর্বমাংসাশী মাছ ভক্ষণে সর্বমাংস ভোজনের ফল লাভ হয়।

প্রশ্ন ৩৭। যদি কেউ মাংস বা মদের ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে, সে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের স্তরে আসতে চাইলে কি তার সেই ব্যবসা ছেড়ে দিতে হবে?

উত্তর ঃ এক ব্যাধ পশু-পাখি শিকার করেই জীবিকা নির্বাহ করত। শ্রীনারদমুনির সংস্পর্শে এসে সেই ব্যাধ তার শিকারবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে পত্নীসহ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করে পরম সুখে জীবন যাপন করেছিল। সেই ঘটনার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে রয়েছে। এমনকি এখনও কৃষ্ণভক্তদের সংস্পর্শে এসে কোনও কোনও সাঁওতাল শ্রেণীর লোকও শুদ্ধ জীবনধারা অনুশীলন করছে। মদ-মাংস খাওয়া আর অপরকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা-এতে একই দোষের অধিকারী হতে হয়। পরমার্থ অর্জনের পথে শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে হলে মদ-মাংসের ব্যবসা করা যাবে না। কারণ তা ভক্তিবিরুদ্ধ। মদ্যপ ও আমিষাশীদের কাছে অর্থ রোজগারই সার হবে। কিন্তু তাতে ভবরোগের উপশম হবে না। কৃষ্ণ বলেছেন, যাঁরা তাঁর প্রতি সতত প্রীতিভাবাপন্ন তাঁদের তিনি সদ্‌বুদ্ধি দান করেন। মদ-মাংস ব্যবসার প্রতি যদি প্রীতি থাকে তবে জীবনের গতিবিধি দুঃখজনকই হবে।

প্রশ্ন ৩৮। স্ত্রী দীক্ষিতা কিন্তু স্বামী অদীক্ষিত ও আমিশাষী। নিরামিশাষী স্ত্রীর পক্ষে আমিষ রান্না করা উচিত কিনা? লোকে বলে স্বামী হচ্ছেন দেবতা, তাই স্ত্রীর পক্ষে আমিষভোজী স্বামীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করা উচিত কিনা?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/১৮) শ্রীঋষভদেব তাঁর একশত পুত্রের প্রতি উপদেশ দিচ্ছেন—

দৈবং ন তৎস্যান্ ন পতিশ্চ স স্যান্।
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্ ॥

অর্থাৎ, "জন্মমৃত্যুময় ভবসংসার চক্র থেকে যে দেবতা যে পতি তাঁর আশ্রিত জনকে উদ্ধার করতে পারেন না, সেই ব্যক্তির কারও পূজ্য দেবতা হওয়া উচিত নয় এবং কারও স্বামী হওয়া উচিত নয়।"

ভগবদ্ভক্তির মার্গ বাদ দিয়ে নিজের সদ্‌গতি হয় না, এই মৃত্যুময় সংসার চক্র থেকে রক্ষা হয় না, অপরকে রক্ষা করা তো দূরের কথা। দীক্ষিতা স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীকে নিরামিষ প্রসাদ ভোজন করানো। আমিষ রান্নায় অনীহা প্রকাশ করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ভক্ত সংস্থা কিংবা দীক্ষাগুরুর সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কর্তব্য বোধ থাকা উচিত এবং ভক্তিবিঘ্নকর ব্যাপার সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার। কোনও বুদ্ধিমান মানুষ ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়ে মনগড়া আপোষ করেন না।

প্রশ্ন ৩৯। অনেকে বলছেন পতিব্রতা পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে পতি নরকে গেলেও তাঁর সঙ্গে নরকে যাওয়া উচিত। এটা কি ঠিক কথা?

উত্তর ঃ পতিব্রতা পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পতিকে কৃষ্ণভক্তিতে সংযুক্ত থাকার জন্য অবশ্যই যত্ন করা। পতির সঙ্গে নরকে যাওয়া তো মূর্খতা মাত্র। বরং নরক যাওয়ার পরিবর্তে নরকে গমন থেকে পতিকে রক্ষা করাই হচ্ছে আদর্শ পতিব্রতার কর্তব্য।

প্রশ্ন ৪০। আমিষ আহার নিষিদ্ধ কেন?

উত্তর ঃ বেদে বলা হয়েছে—

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থিনাং বিপ্রমোক্ষঃ ॥

আহার্যদ্রব্য যদি শুদ্ধ হয়, তা হলে সেই আহার্য গ্রহণের ফলে জীবের সত্তা শুদ্ধ হয়। সত্তা শুদ্ধ হওয়ার ফলে ভগবৎস্মৃতি শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধস্মৃতির ফলে সে জড়জাগতিক সমস্ত দুঃখময় বন্ধন দশা থেকে প্রকৃত মুক্তি লাভ করে।

আহার্য বস্তু শুদ্ধ হয় যজ্ঞ অনুশীলনের দ্বারা অর্থাৎ, ভগবানকে নিবেদন করার মাধ্যমে। ভগবান বলেছেন—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

অর্থাৎ, "ভগবানকে ভোগ নিবেদন করার পর মহাপ্রসাদ ভক্তরা গ্রহণ করে বলে সর্বপাপমুক্ত হন। কিন্তু যারা নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অন্ন পাক করে তারা পাপী, তারা পাপই ভোগ করে।" (গীতা ৩/১৩)

আমিষ বস্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন যোগ্য নয়। আমিষ অপবিত্র বা অমেধ্য বস্তু। যারা ভগবদ্ভক্তির প্রতি আগ্রহী নয়, সেই তামসিক শ্রেণীর মানুষদের কাছে আমিষ বস্তু প্রিয় হয়। *অমেধ্যং তামস প্রিয়ং।*

প্রশ্ন ৪১। জাতি গোস্বামীরা গুরুসেবায় ভাতের সঙ্গে মাছ খেতে দিতে বিধান দিয়েছেন এবং মাংস ডিম পেঁয়াজ রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। এ সম্বন্ধে আপনারা কি বলেন?

উত্তর ঃ মাছ খাওয়া মানেই সব রকমের মাংস খাওয়ার পর্যায়ে যুক্ত। সহজিয়া দলভুক্ত লোকেরা এরকম করে থাকে।

প্রশ্ন ৪২। পিঁয়াজ রসুন মসুর ডাল প্রভৃতি হচ্ছে গাছের ফল। তবুও কেন সেগুলিকে আমিষ খাদ্য বলা হচ্ছে? এটা কি কুসংস্কার?

উত্তর ঃ পিঁয়াজ রসুন—এগুলি গাছের ফলও নয়, আমিষ খাদ্যও নয়। সাত্ত্বিক খাদ্যই সাত্ত্বিক মন ও শরীর গঠনের পক্ষে অনুকূল। ডিম মাছ কচ্ছপ চিংড়ি কাঁকড়া হাঁস কাক ছাগল কুকুর শূকর গরু বাদুড় মানুষ ইত্যাদির রক্তমাংস-যুক্ত অমেধ্য বস্তুকে আহার করাই হচ্ছে সমাজের কুসংস্কার। পিঁয়াজ রসুন মসুর ডাল প্রভৃতি খাদ্য অধিক উত্তেজক বস্তু জ্ঞানে সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা এগুলি গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন মাত্র।

প্রশ্ন ৪৩। আমরা সংসারী মানুষ, মাছ-মাংস না খেয়ে থাকতে পারি না। সকাল সন্ধ্যায় ভগবানের নাম নিই। তাতে কি আমাদের উদ্ধার হবে না?

উত্তর ঃ মাছ-মাংস খাওয়াটা যথার্থ সংসারী লোকের কাজ নয়। মাছ-মাংস খাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই মানুষ সংসারী হয় না। মাছ-মাংস খাওয়ার প্রতি আগ্রহ থাকলে হিংস্র শিকারী পশুপাখীর প্রজাতিতে জন্মাতে হবে। মানব প্রজাতির পিতা মহর্ষি মনু নির্দেশ দিয়েছেন, *মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ।* মাছ খাওয়া চলবে না। কলিগ্রস্ত হিংস্র স্বার্থপর মানুষেরা মাছ-মাংস খাবে বলে ব্যাসপিতা পরাশর মুনি কলিযুগ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, *পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ।* পিশাচ শ্রেণীর লোকেরাই আমিষাশী হয়। পিশিতাশন মানসিকতা বর্জন করে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে হবে। কৃষ্ণপ্রসাদ সেবা করে ভগবান কৃষ্ণকে স্মরণ করে অন্তিমে ভগবদ্ ধামে উপনীত হওয়া যাবে। মাছ-মাংসে প্রীতি থাকলে অন্তিমে এই দুঃখময় জগতের মধ্যেই মাছ-মাংস ভক্ষণের উপযুক্ত শরীর লাভ হবে সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন ৪৪। আমরা নেশা, আমিষ, দ্যূতক্রীড়া, অবৈধসঙ্গ বর্জন করছি, হরিনাম করছি। কিন্তু চা খেলে কি অসুবিধা হবে?

উত্তর ঃ নেশা বর্জন মানেই চা, তামাক, বিড়ি, সিগারেট, খৈনী, দোক্তা, গাঁজা, চরস, এলএসডি, হিরোইন ইত্যাদি মাদক দ্রব্য বর্জন করতে হবে। ক্যানিন নামক বিষাক্ত পদার্থটি চায়ের মধ্যে থাকে, যা আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

প্রশ্ন ৪৫। অন্যান্য ধর্মে জীবহিংসা চলছেই। বৈষ্ণবধর্মে আমিষ আহার বর্জনীয় এবং জীবহিংসা নিষিদ্ধ। কিন্তু আমরা জানি শাকসবজিতে প্রাণ আছে। তা হলে খাদ্য রূপে কি গ্রহণ করা যাবে?

উত্তর ঃ বৈষ্ণব ধর্মের বিধি হল ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করা। শাক-সবজি ফল-মূল ভগবানকে অর্পণের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। তাই শাক-সব্জি ভগবদ্ প্রসাদরূপে গ্রহণে কোনও দোষ নেই। ভগবানের নির্দেশ অমান্য করাটাই দোষ। ভগবানের নির্দেশ হচ্ছে মানুষের খাদ্য শাকসব্জি ফলমূল শস্যাদি। সেগুলি আবার ভগবানকে অর্পণ করে তারপর ভগবানের প্রসাদরূপে গ্রহণ করতে হবে।

যেমন, রাষ্ট্রে সেনাপতির নির্দেশে বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তখন হত্যাকারীকে দণ্ডভোগের জন্য সরকারের আইনের দ্বারস্থ হতে হয় না। কিন্তু যখনই কেউ নিজের ঘরে কোনও আত্মীয়-স্বজনকেও খুন করে বসে, তখন তাকে দণ্ডভোগ করার জন্য আদালতে আটক থাকতে হয়।

ঠিক সেইরকম, কেউ নিজের মনগড়া বুদ্ধিতে যদি এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, শাক-সবজি শস্য খাদ্য না গ্রহণ করে কেবলমাত্র জল কিংবা বাতাস খেয়ে জীবন ধারণ করা উচিত, তা হলেও তার জীবহিংসা হচ্ছে। কারণ, জলে কিংবা বাতাসে অসংখ্য জীব রয়েছে। আমাদের খাদ্যগ্রহণ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে সেই সমস্ত জীবের প্রাণহানি হচ্ছে। অতএব

কেবল বাতাস খেয়ে থাকলেও জীবহিংসা হচ্ছে। সুতরাং, নিজ নিজ মনগড়া মতে না গিয়ে ভগবৎ-নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রবিধি গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

প্রশ্ন ৪৬। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মাছ-মাংস নিষিদ্ধ। এই কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদ মুনির উক্তিতে বলা হয়েছে—

ন দদ্যাদামিষং শ্রাদ্ধে ন চাদ্যাদ্ ধর্মতত্ত্ববিৎ ।
মুন্যন্নৈঃ স্যাৎ পরা প্রীতির্যথা ন পশুহিংসয়া ॥

"ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে কখনও মাছ, মাংস, ডিম নিবেদন করবেন না এবং তিনি যদি ক্ষত্রিয়ও হন, তা হলে স্বয়ং আমিষ আহার করবেন না। যখন ঘি দিয়ে তৈরি উপযুক্ত খাদ্য সাধুদের নিবেদন করা হয়, তখন পিতৃপুরুষ এবং ভগবান শ্রীহরি অত্যন্ত প্রীত হন। যজ্ঞের নামে প্রাণীহিংসা করা হলে ভগবান, কিংবা পিতৃপুরুষের কখনও সন্তোষ সাধিত হয় না।" শ্রীপদ্মপুরাণে উল্লেখ রয়েছে—শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মাছ মাংস নিবেদিত হলে পিতৃপুরুষেরা মলমূত্রভোগী হয়।

প্রশ্ন ৪৭। আমি নিরামিষ আহার করি। মনে মনে তা কৃষ্ণকে নিবেদন করে গ্রহণ করি। বাড়িতে সবাই আমিষ খায়। আমি আমিষের বাসনেই নিরামিষ খাই। আমিষ দোষ কাটাবার জন্য খাবার মধ্যে তুলসীপাতা দিয়ে মনে মনে কৃষ্ণকে নিবেদন করতে পারি কিনা?

উত্তর ঃ নিরামিষ খাদ্য ভোজন কালে কৃষ্ণনাম স্মরণ করবেন সেটি ভাল কথা। কিন্তু, আমিষ খাওয়ার পাত্রে তুলসী পাতা দিয়ে কৃষ্ণকে মনে মনে নিবেদন করা—পন্থাটি মোটেই ঠিক নয়। প্রাথমিক অবস্থায় হয়তো বা কেউ নিজ নিজ পারিবারিক পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে স্বতন্ত্র করতে পারে না—তাই আমিষ খাওয়া এড়িয়ে গিয়েও আমিষ ভোজীদের সঙ্গে খেতে বসতে হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই পরিস্থিতি কাটাতে হয়। যদি ইচ্ছা থাকে তবে উপায় হয়। সম্পূর্ণ আলাদা পাত্রে সরল খাবার—ভগবানকে নিবেদন করে সেই প্রসাদ পেলে ভক্তি জীবনের শুভ চেতনা জাগ্রত হয়। নিজের নিরামিষ পাত্রেও কখনও ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা যায় না।

প্রশ্ন ৪৮। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার শ্রেণীর মানুষের মধ্যে মাছ-মাংস যদি কারও খাদ্য রূপে বিবেচ্য না হয়, তা হলে মাছ-মাংস আহার প্রথমে কারা শুরু করেছিল?

উত্তর ঃ বৈদিক চারি বর্ণের মানুষ মাছ-মাংস আহার করেনি। ধর্মসংজ্ঞাহীন বর্ণসঙ্কর শ্রেণীর মানুষেরা মাছ-মাংস তাদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করেছিল। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠির মহারাজকে বর্ণসঙ্কর শ্রেণীর মানুষের পরিচয় দিয়েছিলেন। শূদ্র ব্যক্তির ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের জন্ম হয়, শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে নিষাদের জন্ম হয়, শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে সূত্রধরের জন্ম হয়। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদেহকের জন্ম হয়। এরা বিজাতি বা বর্ণ বহির্ভূত বা বর্ণসঙ্কর জাত। এই সব বর্ণসঙ্করের সঙ্গে অন্য বর্ণের

মিলনের ফলে অনেক রকমের নিম্নতর জাতির সৃষ্টি হল। সেগুলি সৈরিন্ধ্র (মগধ দেশীয়), আয়োগব (সূত্রধর+সৈরিন্ধ্রী)—এরা ফাঁদ পেতে পশুপাখি শিকার করে; মৈরেয়ক (বৈদেহক+সৈরিন্ধ্রী)—এরা মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান করে। মদ্গুর (নিষাদ+সৈরিন্ধ্রী)—এরা নৌকা চালিয়ে মাছ ধরে; শ্বপাক (চণ্ডাল+সৈরিন্ধ্রী)—এরা কুকুর মাংসও খায়; মাংস (আয়োগব+সৈরিন্ধ্রী)—এরা মাংস বিক্রি করে; স্বাদুকর (মৈরেয়ক+সৈরিন্ধ্রী), ক্ষৌদ্র (মদ্গুর+সৈরিন্ধ্রী)—এরা মাংস রান্না করে; সৌগন্ধ (শ্বপাক+সৈরিন্ধ্রী), মায়াজীবী (বৈদেহক+আয়োগবী)—এরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও ক্রূর স্বভাব, কাঁচা মাংস রক্ত খায়; মদ্রনাভ (নিষাদ+আয়োগবী), পুক্কশ (চণ্ডাল+আয়োগবী)—পশুদের খাটায়, পশুমাংস ভক্ষণ করে; ক্ষুদ্র (বৈদেহক+নিষাদী), কারাবর (চর্মকার+নিষাদী), সৌপাক (চণ্ডাল+বৈদেহী), আহিতুণ্ডিক (নিষাদ+বৈদেহী)—এরা বন্য পশু হত্যা করে তাদের মাংস খায়। অন্তেবসায়ী (সৌপাক+নিষাদী)—এরা এমন নিম্নতম জাতি যে, চণ্ডালেরাও এদের পরিত্যাগ করে।

এভাবে চণ্ডাল ও নিষাদ শ্রেণী থেকে শুরু করে অসংখ্য বর্ণবহির্ভূত শ্রেণীর মানুষেরা মাছ-মাংস ভক্ষণ করতে লাগল। কিন্তু বৈদিক আচার যুক্ত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—এই চার বর্ণের মধ্যে কেউ মাছ মাংস খায় না। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন "অসুর হিরণ্যকশিপু, রাক্ষস রাবণ ও কংস প্রভৃতি ব্যক্তিরা (আপাত বিচারে) ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু তারা নির্বিচারে মাংস আহার করত। আমাদের দেশে এই বদ অভ্যাসের প্রচলন রয়েছে। যারা মাংসাহারী, তাদের সাধারণত অসুর বা রাক্ষস বলা হয়।" অনার্য শ্রেণীর মানুষেরাই মাছ-মাংস ভক্ষণ করত। শ্রীমদ্ভাগবত থেকেও জানা যায়—

যক্ষ-রক্ষ-ভূতানি পিশাচা পিশিতাশনাঃ—যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ শ্রেণীর লোকেরা আমিষাশী হয়।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলছেন—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

"কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস ইত্যাদি ও অন্য সমস্ত জাতির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের শরণ গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" (ভাঃ ২/৪/১৮)

শ্রীল প্রভুপাদ নির্দেশ করেছেন, বর্তমানের বিহার ও ছোটনাগপুরের সাঁওতালপরগণা প্রাচীন কিরাত অঞ্চল, জার্মানী ও রাশিয়ার কিছু অংশ হূণ প্রদেশ, দক্ষিণ ভারতের এক অঞ্চল আন্ধ্র, গ্রীসদেশ পুলিন্দ। আলেকজাণ্ডার ছিল পুলিন্দ শ্রেণীর নেতা। সিন্ধু প্রদেশে সরস্বতী নদীর তীরে আভীর অঞ্চল। মহম্মদ ঘোরী ছিল আভীর জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন ভারতের কঙ্ক অঞ্চলের লোকদের শুম্ভ বলা হয়। তুরস্ক দেশের অধিবাসীরা যবন। মঙ্গোলীয়, চীন প্রভৃতি দেশের মানুষেরা খস জাতি বলে অভিহিত। এই সমস্ত বৈদিক সংস্কৃতিবিহীন অনার্যরা মাছ-মাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত।

প্রশ্ন ৪৯। নিরামিষভোজীরা পিঁয়াজ, রসুন এবং মসুর ডাল খায় না কেন?

উত্তর ঃ মাছ-মাংস ইত্যাদি যেমন রজ ও তমোগুণের খাদ্য, সেগুলি সাত্ত্বিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রহণ করেন না, তেমনই পিঁয়াজ, রসুন, মসুর ডাল ইত্যাদিতে এক এক ধরনের উত্তেজক পদার্থ রয়েছে যা শরীরের ইন্দ্রিয়গুলির উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। সেগুলি খেলে কাম ক্রোধ মোহ মাৎসর্য ইত্যাদি রিপুগুলি সতেজ হয়ে পড়ে। ফলে ইন্দ্রিয় সংযমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ৫০। মাছ ছাগল মোরগ—এগুলি প্রাণী, গাছপালার প্রাণ আছে। তাই মাছ-মাংস খাওয়া যদি অনুচিত হয়, তবে আমরা শাক-সবজী ফলমূল খাব কেন?

উত্তর ঃ যুক্তিটা বেশ এই রকমের যে, দেওয়াল, পুতুল—এগুলি মাটি, হাঁড়িকলসীও মাটি। তাই দেওয়াল কিংবা পুতুল তুলে নিয়ে তাতে করে জল আনতে যাওয়া যদি অনুচিত হয়, তবে হাঁড়ি-কলসী তুলে নিয়ে তাতে করে জল আনব কেন? এই রকম যুক্তি অনর্থক। কলসী যেমন জল আনার বা রাখার জন্য নির্ধারিত কিন্তু দেওয়ালটি সেজন্য নির্ধারিত নয়, তেমনই শাকসবজি ফলমূল মানুষের খাদ্যরূপেই সর্বশাস্ত্রে নির্ধারিত হয়েছে, কিন্তু মাছ-মাংস কখনই সভ্য মানুষের খাদ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়নি, বরং নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সাধারণত চণ্ডাল ম্লেচ্ছ যবন খস কিরাত ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষেরা মাছ-মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। যক্ষ রাক্ষস পিশাচ ইত্যাদি শ্রেণীর প্রাণীদের জন্য নানা জীবজন্তুর রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা তাদের খাদ্যরূপে নির্দেশিত হয়েছে। সভ্য মানুষদের জন্য কখনই মাছ-মাংস স্বীকার করা হয়নি। মানব জাতির পিতা মহর্ষি মনু মাছ-মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। *মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ,*

প্রশ্ন ৫১। মাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য বলে ডাক্তারেরা মাছ খেতে নির্দেশ দেন। তাতে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ মাছ অত্যন্ত অনিষ্টকর খাদ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। 'দি আমেরিকান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ' ঘোষণা করেন যে, নিরামিষাশীদের ক্যানসার রোগের সম্ভাবনা আমিষ রোগীদের তুলনায় অনেক কম। লিভারে নানা উৎপাত সৃষ্টি করতে মাছ-মাংসের ভূমিকা কম নয়। নিরামিষভোজী বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বলেন যে, মানুষের শরীরে হৃৎপিণ্ডের নানা গোলমাল, চর্মরোগ, ক্ষয় রোগ, নানাবিধ জটিল ব্যাধি মাছ-মাংস থেকে আসে। মাছ-মাংস থেকে অতিরিক্ত 'কোলেস্টেরল' শুদ্ধ রক্তকে দূষিত করে, ফলে শরীরে 'আর্টেরিও স্ক্লেরোসিস্' নামক একটি ক্ষতিকারক বিক্রিয়া ঘটে। এর ফলে রক্তকেন্দ্র হৃৎপিণ্ডে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদেশের কোনও অসভ্য অঞ্চলের মানুষ নরমাংসকে অত্যন্ত পুষ্টিকর জ্ঞানে কোনও এক হাসপাতাল থেকে অবৈধ মাতৃ জঠর থেকে পরিত্যক্ত ভ্রূণকে রান্না করে আহার করবার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। এটি যদিও বর্বর সভ্যতার অত্যন্ত জঘন্য দৃষ্টান্ত বলে প্রতীয়মান হয়, তবুও কলির প্রভাবে এ যুগের শেষ পর্যায়ে মানুষ নরমাংসকে প্রিয় পুষ্টিকর খাদ্যরূপে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হবে—ঠিক যেভাবে পুষ্টিকর জ্ঞানে মাছ-মাংসের মতো রাক্ষস-পিশাচদের প্রিয় খাদ্য গ্রহণ করতে মানুষ অভ্যস্ত হয়েছে। অতএব কেবলমাত্র 'অত্যন্ত পুষ্টিকর' কথাটির দোহাই দিয়ে মছলি বুভুক্ষু ডাক্তারদের পরামর্শে কখনই রাক্ষস-পিশাচ সুলভ স্বভাব অর্জন করা কোনও হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির উচিত হবে না।

প্রশ্ন ৫২। আপনারা মাংস আহারের বিরোধিতা করেন, কিন্তু শাস্ত্রে পশুযজ্ঞের কথা বহু স্থানে রয়েছে। সেক্ষেত্রে পশুহত্যা, মাংসাহার পাপ নয় কি?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে মাংস আহার, মদ্যপান, যোষিৎ সঙ্গ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রবৃত্তি মার্গীয় লোকদের জন্য শাস্ত্রে এসব ব্যবহারের বিশেষ প্রকার অনুমোদন রয়েছে। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/১৩) বলা হয়েছে—

যদ্ঘ্রাণভক্ষ্যোঃ বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথাপশোরালভনং ন হিংসা ।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্মম্ ॥

"শাস্ত্রে মদ্যপান করার পরিবর্তে মদ্যের ঘ্রাণরূপ ভক্ষণ বিহিত হয়েছে। যথেচ্ছ পশুহিংসার পরিবর্তে যজ্ঞে পশু ব্যবহার বিহিত হয়েছে। ইন্দ্রিয় তোষণের পরিবর্তে কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্যই মৈথুনকর্ম বিহিত হয়েছে। কিন্তু স্বৈরাচারীরা এরকম বিশুদ্ধ স্বধর্ম অবগত হয় না।"

কালক্রমে মানুষ অনাচারী ও অযোগ্য হওয়ার ফলে বিশেষত কলিযুগে পশুযজ্ঞ, পশুবলি প্রথা বিবর্জিত হয়েছে। আর কসাইখানা খুলে পশুহত্যা, গোহত্যা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নরশিশু হত্যা, হাটবাজারে ছাগল মুরগী হত্যা—এই সবই নারকীয় বিষয় বলে জ্ঞাতব্য। বিদেশীয় কোন কোন বর্বর অঞ্চলে নরমাংস খাওয়ার প্রথাও শুরু হয়ে গেছে বলে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন।

অন্যান্য যুগে পশুযজ্ঞ পাপ কর্ম বলে স্বীকৃত হয়নি। কারণ সেই পশুযজ্ঞের পদ্ধতি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবৃত্তি মার্গীয় ব্যক্তিদের পক্ষে বেদ-অনুমোদিত। কিন্তু কলিযুগে পশুযজ্ঞ নিষিদ্ধ কর্ম, সেই পশুহত্যার ফলে পশুহত্যায় সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তিই নারকীয় দণ্ড ভোগের উপযুক্ত হয়।

প্রশ্ন ৫৩। মায়ের পূজায় পাঁঠা বলি না দিলে ভরণ ওঠে। তার প্রমাণ আছে। বলিকর্ম যদি অপরাধ হয়, তবে মা নিষেধ করার পরিবর্তে বলি চান কেন?

উত্তর ঃ তামসিক পূজায় বলি দিলেই মা উগ্ররূপা হন। সেই উগ্ররূপ চলতেই থাকে। যেদিন কৃষ্ণপ্রসাদ এবং কৃষ্ণের প্রসাদী মালা মাকে নিবেদিত হবে সেদিন থেকেই

মা শান্তরূপা হন। সেই প্রমাণ আছে। তামসিক আচারে বলির রক্তমাংস খাওয়াটাই সার, বলি দিয়ে কেউ কোনও দিন শান্তি পায় না। তারও প্রমাণ আছে।

প্রশ্ন ৫৪। হিন্দুধর্মে জীবহত্যা নিষিদ্ধ, কিন্তু মুসলমান ধর্মে জীবহত্যাই ধর্ম। অথচ 'আল্লাহ্' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শান্তি'। কিন্তু জীবহিংসা তো শান্তির দ্যোতক নয়?

উত্তর ঃ না, কোনও ধর্মে জীবহত্যা ধর্মই নয়। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরানে বলা হয়েছে—

"এদের মাংস আর রক্ত আল্লাহের কাছে পৌঁছায় না, কিন্তু তোমার ভক্তিই তাঁর কাছে পৌঁছায়....." (সুরা ২১, শ্লোক ৩৭)

কিন্তু মুসলমানেরা তাদের ধর্মীয় উৎসব পর্বে মাংস আর রক্তের কাণ্ডকারখানা ছাড়া কিছুই বোঝে না।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মহাভারতে বলা হয়েছে—

"যে ব্যক্তি মোহ প্রভাবে পুত্রমাংসতুল্য অন্য জীবের মাংস ভক্ষণ করে, সে অতি জঘন্য প্রকৃতির, এবং তার সেই জীবহিংসা কর্মই বহুবিধ পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করবার একমাত্র কারণ বলে নির্দিষ্ট হয়।" (অনুশাসনপর্ব, ১১৪ অধ্যায়, ভীষ্মদেবের উক্তি)

কিন্তু হিন্দুরা পিশাচতুল্য আমিষপ্রিয় হয়ে পড়েছে, তা-ই তারা সহজে মাছ-মাংস ছাড়তে পারে না। ভাতের সঙ্গে রক্তমাংস হাড়পিণ্ডের একটু কোনও পদ না থাকলে যেন ভুরিভোজে কোনও শান্তি হয় না। তারা প্রচার করে বেড়াচ্ছে মাছ বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই মাংসভক্ষণরূপ পাপকর্ম বা জীবহত্যারূপ পাপকর্মের ফলে তাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে অশান্তি উদ্বেগ আর মারাত্মক যন্ত্রণায় কবলিত হতে হবে, এটিই বিধির অমোঘ বিধান—যে কথা বেদশাস্ত্রে নির্দিষ্ট রয়েছে।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ১১৩ অধ্যায়ে দেবগুরু বৃহস্পতির বাক্য এই যে, "যে ব্যক্তি অহিংসক প্রাণীগণকে নিজের সুখোদ্দেশ্যে নিহত করে, সে দেহান্তে কখনই সুখশান্তি লাভে সমর্থ হয় না।"

১৫
অবৈধ যৌনতা মহাপাপ

প্রশ্ন ১। ভ্রূণহত্যা কি পাপ?

উত্তর ঃ ভগবানের আইন লঙ্ঘনকারী সমস্ত কর্মই পাপ। মানুষ আজকে ভ্রূণহত্যা ও বন্ধ্যাত্বকরণে লেগে পড়েছে। এইভাবে শাস্ত্রবিরোধী আচরণ করে সে শুধু পাপই সঞ্চয় করছে। মানুষের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তির সদ্ব্যবহার হল সুসন্তান উৎপাদন করা। তাই ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমিই সেই সুসন্তান-প্রজন্ম হেতু কাম।' *প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ* (গীঃ ১০/২৮)।

কিন্তু আধুনিক সমাজে কতকগুলি আসুরিকভাবাপন্ন স্বয়ং পিতামাতা মাতৃগর্ভ থেকে সন্তানকে যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হতে না দিয়ে তাকে কোনও ঘাতকের মাধ্যমে মেরে ফেলে। কেননা, তারা মৈথুনসুখকামী মাত্র, তারা সন্তানকামী নয়। এই ভ্রূণহত্যা ভগবদ্‌বিরোধী অনাচার।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলছেন, কিভাবে নিদারুণ অসহায় অবস্থায় মাতৃগর্ভে শিশু ভ্রূণরূপে অবস্থান করে।

সেই অবস্থায় তাকে মেরে ফেলার চিন্তা করছে যে-সব মাতাপিতা তারা অসুর ও পিশাচগুণসম্পন্ন। অবাঞ্ছিত যৌনসুখভোগী এবং ভ্রূণহত্যাকারীদের দেহত্যাগের পর কিরূপ মহা যন্ত্রণাময় শাস্তি ভোগ করতে হবে, তা শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে ষড়বিংশতি অধ্যায়ে নরকের বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।

মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল দিব্যগুণসম্পন্ন হওয়া। অসুর হওয়া নয়। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন, (ভাঃ ৩/২০/২৩ তাৎপর্য) "মানুষ যতই যৌন বাসনা থেকে মুক্ত হয়, ততই সে দেবত্বের স্তরে উন্নীত হয়, আর যৌন সুখ উপভোগের প্রতি যারা যত বেশি আসক্ত, ততই তারা আসুরিক স্তরে অধঃপতিত হয়।"

প্রশ্ন ২। মাতৃজঠরে সন্তান থাকতে থাকতে তাকে হত্যা করা হচ্ছে, এতে হত্যাকারীর মহাপাপ হচ্ছে এবং নরকের শাস্তি ভোগের জন্য তাকে প্রস্তুতি নিতে হয়। কিন্তু যাকে হত্যা করা হল, সে-তো নিষ্পাপ, তবে সে কেন এইরকম নিষ্ঠুরভাবে নিহত হল?

উত্তর ঃ মাতৃজঠরে অবস্থিত শিশু নিষ্পাপ—এই কথা বলাও যথার্থ নয়। পূর্ববর্তী জন্মে সেই জীব হয় তো অনুরূপ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে এসেছিল কিনা সেটাই বা কে জানে? পুণ্যবান বা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে মাতৃজঠরে থাকাকালীন পিতা-মাতার দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে হত হওয়ার কারণ হয় না। এইগুলি আকস্মিক কোনও ঘটনা নয়। এইগুলির পিছনে অবশ্যই কারণ সম্বন্ধ রয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে ৩২৩ অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শ্রীভীষ্মদেব বলছেন—"মানুষ গর্ভবাস কালেও প্রাক্তন সুখ-দুঃখ পেয়ে থাকে। কি বাল্য,

কি যৌবন, কি বার্ধক্য, লোকে যে অবস্থায় যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাকে পরজন্মে সেই অবস্থায় তার অনুরূপ ফল ভোগ করতেই হয়।"

প্রশ্ন ৩। আপনারা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করতে বলেন। তবে, বিবাহিত সঙ্গ কি ভজনের অনুকূল?

উত্তর ঃ মানুষের বোঝা উচিত যে, মৈথুনের প্রবণতা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য নয়, নরকে অধঃপতিত হওয়ার জন্য। ব্রহ্মচর্য জীবনে বা শিক্ষার্থী অবস্থায় ভাগবত-ধর্ম শিক্ষা লাভ করা উচিত। তারপর যখন গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করা হয়, তখন পত্নী যদি পতিকে অনুসরণ করেন, তা হলে পতি-পত্নীর সেই সম্পর্ক বাঞ্ছনীয় হয়। কিন্তু পারমার্থিক চেতনা ব্যতীত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যে পতি-পত্নী সম্পর্ক, তা মোটেই মঙ্গলজনক নয়। জড় জগতে পতি-পত্নীর সম্পর্ক সাধারণত মৈথুন ক্ষমতার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেই পতি-পত্নী যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করে, তা হলে সেই গার্হস্থ্য-জীবন অত্যন্ত ভয়ংকর।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৪/২৫/৬২ শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, "যৌন জীবন, তা সে বৈধই হোক বা অবৈধই হোক্, পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে মানুষ জড়-জাগতিক বন্ধনে আরও বেশি করে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যৌন জীবন নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে, কামবাসনা অথবা স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করার একটি সুযোগ পাওয়া যায়। তা যদি করা যায়, তা হলে অনায়াসে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধন করা যায়। প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গ প্রভাবে মানুষ যে কিভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তা ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধ পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে শ্রীনারদ মুনি বিশ্লেষণ করেছেন। পত্নীর প্রতি আকর্ষণের অর্থ হচ্ছে জড়-জাগতিক গুণের প্রতি আকর্ষণ।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন—"গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গ কোন ভজনের অঙ্গই নয়। কেবল সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য তাহা নিষ্পাপ বলেই স্বীকৃত হয়।" (সজ্জনতোষণী ৪/৬)

পরমেশ্বর ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—

ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ, ধর্মের অবিরোধী কামরূপে আমি প্রাণীগণের মধ্যে বিরাজমান।" (গীতা ৭/১১) বিবাহিত জীবনে স্ত্রীসঙ্গের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মপরায়ণ কৃষ্ণভাবনাময় সন্তান উৎপাদন করা। তা না করে যদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি চরিতার্থ করার জন্য যৌনজীবন যাপন করা হয়, তা অন্যায়। তা ধর্মবিরুদ্ধ। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যে কাম, তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ নয়। *প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ* (গীতা ১০/২৮) "সুসন্তান প্রজনন শক্তি আমি কামদেব।" *গতাগতং কামকামা লভন্তে* (গীতা ৯/২১) "ইন্দ্রিয় সুখভোগী মানুষেরা সংসারে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবর্তিত হয়।"

প্রশ্ন ৪। যারা অবৈধ সঙ্গ করে তাদের কোথায় গতি হয়?

উত্তর ঃ তপ্তশূর্মি নরকে।

প্রশ্ন ৫। আপনারা বলে থাকেন অবৈধ যৌনতা নিষিদ্ধ। তবে বৈধ যৌনতা কোন্‌টি?

উত্তর ঃ শাস্ত্রীয় বিধি যুক্ত বিবাহিতদের যৌনতা বৈধ। সুসন্তান লাভই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।

প্রশ্ন ৬। অনেকে সমালোচনা করেন যে, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ সংহিতাদি গ্রন্থে মুনিঋষি ও দেবতাগণ অবৈধ যৌনসঙ্গে লিপ্ত হতেন। এর কারণ ও তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ সমালোচকরা যদি দৃষ্টান্ত দিতেন এবং সংশ্লিষ্ট চরিত্রের অর্থাৎ অবৈধ যৌনসঙ্গীদের পরিণতি বিচার করতেন, তা হলে বৈদিক শাস্ত্রের নিন্দামূলক অপরাধ থেকে রেহাই পেতেন। বড় বড় মুনিঋষি দেবতাদের পর্যন্ত পতন হয় এই দৃষ্টান্ত দিয়ে কোনও কোনও শাস্ত্রে আরও বেশি করে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে এই জড়জগতে যে যতই ক্ষমতাশীল বা জ্ঞানবান ব্যক্তি হোক না কেন—সে-ও স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গ কামনার দাসত্ব করে এই মায়ামোহময় সংসারে বদ্ধ থেকে যায়।

অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে—

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি (৯/১৯/১৭)—বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ মোক্ষবিদ্ বিদ্বান ব্যক্তির চিত্তকেও বিপন্ন করে থাকে। যাঁদের দেহ, মন, প্রাণ পরমানন্দময় মদনমোহনের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত, তাঁদের ক্ষেত্রে যদি কোন সময় যৌনসঙ্গের স্মরণমাত্রও হয়, তবে তাঁরা ঘৃণায় থুথু ফেলেন। *তদবধি বত নারী সঙ্গমে স্মর্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ।* (ভঃ রঃ দঃ ৫/৩৯)

কতকগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় যেমন, শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর একদিন এক ব্যবসায়ী-পত্নীর প্রতি আসক্ত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি মহিলাটির কাছ থেকে তার খোঁপার দুটি কাঁটা ভিক্ষা করেন এবং আপন দুটি চক্ষুতে সেই কাঁটা ফুটিয়ে অন্ধ হয়ে যান। সেই অবস্থায় 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলতে বলতে এক আশ্চর্য রকমে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

শ্রীঅর্জুনের সঙ্গ উদ্দেশ্যে স্বর্গের অপ্সরা এসে উপস্থিত হলে অর্জুন তাঁকে মাতৃ সম্মান পূর্বক বিদায় দিলেন। এতে অপ্সরা লজ্জিত হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভোগ রান্নার জন্য বৃদ্ধা মাধবীদেবীর কাছে চাল আনতে গিয়েছিলেন ছোট হরিদাস। সেই নির্দোষ ছোট হরিদাসের এই আচরণও মহাপ্রভু সমর্থন করেননি এবং রুষ্টভাবে বলেছিলেন ছোট হরিদাসের মুখ দর্শন করবেন না। পার্ষদদের নিয়ে লোকশিক্ষা হেতু মহাপ্রভু এরূপ লীলা করলেন। ছোট হরিদাস ব্যথিত হৃদয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম স্মরণ করতে করতে গঙ্গায় আত্ম বিসর্জন করলেন।

নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বেনাপোল গ্রামে নির্জনে তিন লক্ষ হরিনাম করতেন। এক সুন্দরী বেশ্যা তিন রাত ধরে তাঁকে ভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করে তাঁকে একটুও টলাতে পারেনি, বরং নামের প্রভাবে সে নিজেই মস্তক মুণ্ডন করে পরম বৈষ্ণবী হয়ে ওঠে।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মোহিনীরূপ ধারণ করে অমৃত কলসী নিয়ে অসুর ও দেবতাদের মাঝখানে দাঁড়ালেন। দেবতারা কৃষ্ণের হাতে অমৃত পেয়ে ধন্য হলেন। কিন্তু অসুরেরা কৃষ্ণের মায়ারূপী সুন্দরীর লাবণ্য দেখে অমৃত খাওয়ার ব্যাপারটাই গোলমাল করে ফেলল।

আবার দেখা যায় শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী গভীরভাবে মন্তব্য করেছেন, এই জগতে মেয়েরা প্রচণ্ড মূর্খ। কারণ তারা সমগ্র সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মধুর পাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। তারা কেবল মল-মূত্র যুক্ত গোঁফ-দাড়ি, লোম-নখ বিশিষ্ট পচনশীল দেহসর্বস্ব কতকগুলি পুরুষরূপী মায়াকে 'এই আমার স্বামী, এই আমার পতি' এই মনে করে তাদের পায়ের তলায় আত্ম নিবেদন করে।"

অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত হল এই যে, কৃষ্ণভক্তিযুক্ত ব্যক্তি—যাঁরা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট, তাঁরা এই জগতে যৌনসঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট নন। যত বড় জ্ঞানী হোক না কেন, যাদের মধ্যে যৌনসঙ্গ আকাঙ্ক্ষা যত বেশি, তারা ততই মৃত্যুময় জগতে অধঃপতিত। জড়া প্রকৃতির মূলত রজ ও তমোগুণের বশে তাদের দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হয় এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতাই প্রকাশ পায়।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, উপযুক্ত ব্যক্তি-ভাগবতের কাছে শাস্ত্র শ্রবণ করা উচিত। নতুবা হিতে বিপরীত ঘটতে পারে। যারা শাস্ত্রজ্ঞ নয়, যারা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে, তাদের সঙ্গ করা উচিত নয়। যেমন, দুধ অমৃততুল্য। কিন্তু, সেই দুধে যখন সাপ মুখ দেয়, তখন সেই দুধ বিষে পরিণত হয়। তখন তা একেবারেই পরিত্যাজ্য। সেইরকম, যার-তার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ৭। অবৈধ যোষিৎ সঙ্গ নিষিদ্ধ। এই সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ এই সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রে নানা আলোচনা করা হয়েছে। এখন, অবৈধতার ক্ষেত্রে আমাদের সাবধান থাকা প্রত্যেকের কর্তব্য।

(১) স্ত্রী বা পুরুষ যখন সাধন ভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তখন কোন পুরুষ বা স্ত্রী সঙ্গ করলে অকল্যাণ হয়।

(২) যে স্ত্রী ও পুরুষের ধর্ম সম্বন্ধ দ্বারা বিবাহ হয়নি, তাঁদের পরস্পর সংস্পর্শ ও দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত সম্ভাষণে পাপ হয়।

(৩) বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ পরস্পর কর্তব্যের অতিরিক্ত মোহিত হয়ে অভিনিবেশ করলে তা অনিষ্টেরই মূল হয়ে দাঁড়ায়।

(৪) পত্নী যদি ভক্তিসাধনের বিরুদ্ধা হন, তবে বহু যত্নের সহিত তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত।

(৫) ভোগাকাঙ্ক্ষা বশতঃ স্ত্রী সম্ভাষণ গৃহত্যাগী ব্যক্তিকে ভক্তিপথ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট করে।

(৬) সেইরূপ ভ্রষ্টাচারী ব্যক্তির সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

(৭) যোষিৎ সঙ্গ-জল্পনা ও সঙ্গ চিন্তা ভক্তিক্ষয় করে।

অতএব শ্রীকৃষ্ণভক্তিসাধনে যুক্ত কি স্ত্রী কি পুরুষ, এই সকল ব্যাপারে সাবধান থাকবেন।

১৬

আপনার ইচ্ছা ও কর্মই আপনার ভাগ্য বা নিয়তি

প্রশ্ন ১। সংক্ষেপে সরল ভাষায় জানতে চাই, ভাগ্য কি?

উত্তর ঃ অতীত দিনে যে সব কর্ম করে এসেছেন, সেই সমস্ত কর্মের ফল সঞ্চিত রয়েছে—সেগুলি আপনি ভোগ করছেন বা করবেন। সেটিই ভাগ্য।

প্রশ্ন ২। নিয়তি কখন আসে? নিয়তির কাজ কি?

উত্তর ঃ নিয়তি মানে বিধির বিধান। নিয়তি নিয়তই রয়েছে। জন্মজন্মান্তর ধরে নিয়তির অধীনেই আমরা রয়েছি। আমাদের কর্মকীর্তি ও বাসনা অনুসারে আমরা অনুরূপ জীবন লাভ করি এবং ভালমন্দ কর্মের ফলস্বরূপ অবশ্যম্ভাবী সুখদুঃখ আমরা ভোগ করি। সেটাই আমাদের ভাগ্য। নিয়তির অপর নাম ভাগ্য।

প্রশ্ন ৩। শাস্ত্রানুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ছাড়া একটি তৃণও নড়ে না। তবে আমাদের সমস্ত কর্ম তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। তা হলে কর্মফল আমাদের ভুগতে হবে কেন?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতির দ্বারা সমগ্র ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হলেও, আমাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং সেই ইচ্ছা অনুসারে আমরা জীবন গঠন করতে পারি। আমাদের কিভাবে জীবন গঠন করতে হবে সেই পথ নির্দেশও দিয়েছেন। অর্থাৎ, এমন নয় যে, আমি পাগলের মতো যা ইচ্ছা তাই-ই করে চলব, আর মনে করতে থাকব যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই আমি সব কিছু করছি। না, এরূপ মনে করা কখনই ঠিক নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, "হে অর্জুন! আমি তোমাকে ভালমন্দ সব কিছুই বললাম, এখন তোমার যা ইচ্ছা হয় তা-ই কর। তুমি আমার কথামতো যুদ্ধ করতে পার, কিংবা আমার কথা এড়িয়ে নিজের মতে চলতে পার। সেটি তোমার ইচ্ছা।"

আমরা যদি কৃষ্ণানুগামী হই তবে আমরা জোর দিয়েই বলতে পারব—যা কিছু হচ্ছে সবই কৃষ্ণকৃপা। কিন্তু যদি কৃষ্ণবিমুখ-স্বভাব হই, তবে আমাদের সব কর্মের ফল ভোগ করতে আমরা বাধ্য হব এবং এই জন্ম-মৃত্যুর সংসার চক্রে ঘুরপাক খাব।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (২/২০-২১) শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

স্বাতন্ত্র্যে বর্তমানেঽপি জীবানাং ভদ্রকাঙ্ক্ষিণাম্ ।
শক্তয়োঽনুগতাঃ শশ্বৎ কৃষ্ণেচ্ছায়াঃ স্বভাবতঃ ॥
যে তু ভোগরতা মূঢ়াস্তে স্বশক্তিপরায়ণাঃ ।
ভ্রমন্তি কর্মমার্গেষু প্রপঞ্চে দুর্নিবারিতে ॥

অর্থাৎ, "প্রত্যেক জীবকে ভগবান স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছেন। তারা নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হওয়ার সীমিত স্বাধীনতা লাভ করেছে। যারা মঙ্গল আকাঙ্ক্ষী, তাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি স্বভাবতই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার অনুগত থাকে। আর, যারা কেবল ভোগ আকাঙ্ক্ষী,

হিতাহিত-জ্ঞানহীন তাদের ইচ্ছাশক্তি ভগবানের ইচ্ছাশক্তির অনুগত হয় না; তারা চিৎশক্তি-বিরোধী হয়ে জগতে বিচরণ করে থাকে। তারা এই প্রপঞ্চকে (জড় জগৎকে) আশ্রয় করে দুর্নিবারভাবে কর্মমার্গে ভ্রমণ করতে থাকে।"

আমরা কৃষ্ণবহির্মুখ মানসিকতার ফলেই এই জড় জগতে পতিত হয়ে নানাবিধ কর্মফলে সুখ দুঃখ ভোগ করছি। আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে যদি কৃষ্ণ-উন্মুক্ত করি তবে কৃষ্ণকৃপায় আমরা জড়জাগতিক সমগ্র সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্যের উর্ধ্বে গিয়ে নিত্য আনন্দময় জীবনে পৌঁছতে পারব। সেটাই করে চলতে হবে। তাই বলা হয়েছে—

যেন তেন প্রকারেণ কৃষ্ণে মনঃ নিবেশয়ঃ।

যে কোনওভাবেই হোক আমাদের মনটাকে কৃষ্ণপাদপদ্মে নিয়োজিত করতে হবে। এই কর্তব্যটুকু এড়িয়ে গিয়ে অন্যান্য উদ্ভট কারণ দেখিয়ে—"আমি যা করছি ভগবানই করাচ্ছেন", কিংবা "আমি সেদিনই ভগবানকে ডাকব যেদিন ভগবান আমাকে কৃপা করবেন, আমি নতুবা ডাকতেই পারি না।" এই রকমের কথার অর্থই হচ্ছে আপন দোষ বাদ দিয়ে ভগবানকে দোষারোপ করা। "ভগবান নিজে এসে আমাকে তোষামোদ করুক, তা হলে আমি সাড়া দিতে পারি।" এটি হচ্ছে অভক্তের প্রলাপ। আমরা যদি আমাদের জীবনের মঙ্গল চাই, তবে আমাদের ইচ্ছা শক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার অনুগামী করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ চান, *মন্মনা ভব মদ্ভক্ত*—"আমাতে মন রাখ, আমার ভক্ত হও।" অতএব আমাদের তাঁর প্রতি মন রেখে ভক্তি-নিষ্ঠায় যুক্ত হতে হবে। তা হলে ভক্তের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তাবে।

প্রশ্ন ৪। সূর্যপুত্র কর্ণ দাতা-কর্ণ নামে পরিচিত। বলী মহারাজও মহান দাতা ছিলেন। অথচ শাস্ত্রে দেখা যায় এঁরা ভগবান কর্তৃক বিভিন্নভাবে শাস্তি প্রাপ্ত। এতে করে আমরা কি শিক্ষা পাই?

উত্তর ঃ আর্তপীড়িত দরিদ্রকে দান করা পুণ্যকর্ম। ভক্ত বা ভগবানের উদ্দেশ্যে দান করা মহাপুণ্যকর্ম। এই কর্মফলে দাতা স্বর্গগতি লাভ করেন। কর্ণ নিশ্চয়ই স্বর্গে গিয়েছেন, নরকে কিংবা দুঃখ যাতনায় পড়েননি। বলী মহারাজও বর্তমানে সূতললোকে অবস্থান করলেও স্বর্গলোকের চেয়ে আরও অধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বিরাজ করছেন বলে শাস্ত্রে বর্ণনা রয়েছে।

পৃথিবীতে যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণকে নিদারুণভাবে বধ হতে হয়েছিল। কারণ তিনি ভগবৎ-ভক্তের বিরুদ্ধে আর দুরাচারীদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন।

বলী মহারাজ ভগবান বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁর ঈর্ষা মনোভাব দূর হয়ে গিয়েছিল। ভগবান তাঁকে পাশবন্দী করেছিলেন তাঁর ধৈর্য ও নম্রতা পরীক্ষা করবার জন্য। শেষে ভগবান বামনদেব বলী মহারাজকে সর্বতোভাবে নিরাপদ সুতল লোকের রাজা করে নিজেই সেখানে তাঁকে রক্ষা করছেন। পরবর্তীকালে বলী মহারাজকে ভগবান স্বর্গের ইন্দ্রপদ দান করবেন। বলী মহারাজকে লোকে পূজাও করছে।

আমাদের কখনও চিন্তা করা উচিত নয় এই দুই দাতা যখন কিছু শাস্তি পেয়েছেন, অতএব দাতা হওয়া বা কাউকে কিছু দান না করাই ভাল। না, এরূপ কখনও চিন্তা করা ঠিক নয়। তাঁরা যে কত মহান, আর সেজন্যই তো পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের সঙ্গে লীলা করছেন। উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করেই আনন্দ পাওয়া যায়। কাউকে না দিয়ে নিজের আয়ত্তে নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ উদ্দেশ্যে সব কিছু রাখা হলে প্রকৃতির বিধি অনুসারে পরবর্তী জন্মে কিছুই পাওয়া হবে না। ইহ জন্মেও মানসিক স্বস্তি লাভ হয় না।

মহান দাতা বলী মহারাজ ভগবান বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি দানের প্রয়াস করেছিলেন বলেই তো স্বর্গের চেয়েও অধিক নিরাপদ সুখ-সম্পদের অধিকারী হয়ে রয়েছেন। সেই সঙ্গে স্বয়ং ভগবান তাঁকে সর্বতোভাবে সুরক্ষা প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন ৫। যখন কেউ ভগবদ্ ধামে উন্নীত হয়, তখন কি তার এই জীবনের এই জগতের কথা মনে থাকে?

উত্তর ঃ প্রায় মনে থাকবে না। কেবল ক্ষণিক স্বপ্নের মতোই মনে হবে।

প্রশ্ন ৬। গর্ভধারিণী মাতা বড়, না কি শ্রীকৃষ্ণই বড়?

উত্তর ঃ গর্ভধারিণী মা যদি ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত হন, তবেই তিনি বড় হতে পারেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে কৃষ্ণভক্ত বড় বলেই পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বান্তর্যামী এবং হর্তাকর্তা বিধাতা। তিনিই রক্ষা না করলে কারও কোনও সাধ্য নেই যে, গর্ভকে বা গর্ভধারিণীকে রক্ষা করতে পারে। সেই জন্যই বলা হয়—"রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?" শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করলে মরণাপন্ন ব্যক্তিও বেঁচে যায়। প্রতি জন্মে আমরা গর্ভধারিণী মা সহজে লাভ করতে পারি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। তাই চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর লিখেছেন—

প্রতি জন্মে জন্মে পিতা-মাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে, বুঝিহ হিয়ায়॥

শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি "অসমোর্ধ্ব"। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের সমান কেউই নেই এবং শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে বড় কেউই হতে পারে না।

প্রশ্ন ৭। যুগে যুগে ধর্ম সংস্থাপনা করতে এবং ধর্ম শিক্ষা দিতে সৃষ্টিকর্তা ভগবান নিজে আসছেন অথবা তাঁর দূতদের পাঠাচ্ছেন। তা হলে আমরা যে সমস্ত কর্ম করছি তা ভগবানই করাচ্ছেন?

উত্তর ঃ বারে বারে মানুষ ধর্ম নীতি লংঘন করছে বলেই ভগবান তাঁর ভক্তের আহ্বানে এই জগতে ধর্ম রক্ষা করতে, ধর্ম শিক্ষা দিতে বারে বারে আসছেন। আমরা যদি ধর্ম অনুসারে সমস্ত কর্ম করতাম, তা হলে ভগবানকে এসে ধর্মকে আবার নতুন করে স্থাপনা করবার কোনও প্রশ্নই উঠত না। যেহেতু আমরা ধর্ম হীন হয়ে ধর্ম বিরোধী হয়ে চলেছি, তাই ভগবান বা তাঁর দূতেরা ধর্ম শিক্ষা দিতে আসছেন।

প্রশ্ন ৮। জীবের ইচ্ছাশক্তির পেছনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রভাব আছে?

উত্তর ঃ জীবকে ভগবান স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, যার ফলে জীব ভগবানকে নিজের মনের মতো করে ভালবাসতে পারে বা নাও বাসতে পারে। জীবের সেই ঐকান্তিক ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবকে সাহায্য করেন। যেমন কেউ যদি ভগবানকে ঐকান্তিকভাবে সেবা করতে চায় তবে তাকে ভগবান সাহায্য করবেন যাতে করে সে তাঁকে সেবা করতে পারে। আবার কেউ যদি ভগবানকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু চায় তবে ভগবান তাতেও তাকে সাহায্য করবেন যাতে সে ভগবানকে ভুলে গিয়েও জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

প্রশ্ন ৯। আমরা যা কিছু করছি, তা ভগবান করাচ্ছেন কি না? আমাদের পাপ আচরণ থেকে তিনি নিবৃত্ত করেন কিনা?

উত্তর ঃ আমাদের মনে রাখতে হবে মঙ্গলময় ভগবান অমঙ্গলসূচক কিছু করতে অনুমোদন করেন না। পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে তিনি বিরাজমান। তিনি মন্দবৃত্তি থেকে জীবাত্মাকে নিবৃত্ত করেন। তাই দেখা যায় সবচেয়ে মন্দ লোকও বুঝতে পারে তার কর্মটা মন্দ, তবুও সে অহংকারবশত এমন সব কর্ম করে যা পরমাত্মার অনুমোদন সাপেক্ষ নয়। যেমন, একজন পাকা বিড়িখোরও জানে বিড়ি খাওয়া জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর, আয়ুহানিকর, তবুও সে তা ছাড়তে চায় না। সে দিব্যি বিড়ি খেয়েই চলেছে। এর জন্য সমস্ত দুর্ভোগ জীবকেই ভুগতে হয়, পরমাত্মাকে নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি ।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥

"আমার প্রতি যদি মন সমর্পণ করে থাকো, তবে আমার প্রসাদে তুমি সমস্ত দুর্গতি থেকে রক্ষা পাবে। অন্যথায়, অহংকারবশে যদি আমার নির্দেশ না শোনো, তবে তুমি বিনষ্ট হবে।" (গীতা ১৮/৫৮)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমস্ত গুঢ় কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করবার পর অর্জুনকে শেষে বললেন—

বিমৃশ্যৈতদশেষেণ, যথা ইচ্ছসি তথা কুরু ।

"আমি তো তোমাকে ভাল-মন্দ সব কিছুই বলেছি, তুমি তা ভালভাবে বিচার কর, তারপর তোমার যা ইচ্ছা হয় তা-ই কর।" (গীতা ১৮/৬৩) সুতরাং, আমার ইচ্ছা যা তাই করব আর বলতে থাকব—ভগবানই এ সব আমাকে করাচ্ছেন—এই রকমের উদ্ভট-বুদ্ধি স্বীকার্য নয়।

ভগবান জীবকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন যাতে সে ভগবানকে নিজের মনের মতো করে ভালবাসতে পারে। জীবকে বাধ্য করে ভগবান ভালবাসা আদায় করেন না। সেই জন্য প্রেমময় ভগবান জীবকে স্বতন্ত্র ইচ্ছা দান করেছেন। জীব যদি ভগবানকে ভালবাসতে না চায়ও, তাতে আত্মারাম ভগবানের কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-

বুদ্ধিসম্পন্ন জীব পরমনিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের অনুকূলে কিংবা প্রতিকূলে যেভাবে চলুক না কেন সমস্ত লাভ অথবা ক্ষতি সেই জীবেরই, ভগবানের নয়।

শ্রীঅর্জুন যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, "আমরা তো ভাল হতে চাই, কোন পাপ কর্ম করতে কেউই চাই না, তবুও কেন পাপকর্ম করে বসি, কেন আমরা খারাপ হয়ে যাই?"

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "এই জড়জগতে বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির গুণ দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে কর্ম করে। আর জড় কর্মই দুঃখপ্রদ। যদি এই জড় গুণের ঊর্ধ্বে কেউ যেতে পারে, তবে সে নির্মল আনন্দময় জীবনে আসীন হতে পারে। সেই জন্য—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একম্ শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"জাগতিক তথাকথিত বহু রকমের ধর্ম আগে পরিত্যাগ কর। একান্তভাবে আমার শরণাগত হও। তা হলে অবশ্যই তোমার কোনও পাপ থাকবে না।" এই থেকে বোঝা যায় যে, ভগবান একমাত্র "কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম" করতেই নির্দেশ দিচ্ছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

"আমাতে মন নিযুক্ত কর, আমাকে প্রণতি নিবেদন কর, আমার পূজা কর, আমাকে সম্যকভাবে আশ্রয় করে আমাকে লাভ কর।" (গীতা ৯/৩৪) অর্থাৎ, আমাদের সকল কর্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুকূলেই গৃহীত হওয়া কর্তব্য। তা হলেই ভগবৎ কৃপায় আমরা আনন্দময় জীবনে উন্নীত হতে পারব। অন্যথায়, শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে আমরা যেকোনও ভাল কর্মও করি না কেন, তা-ই পরিণামে অশেষ যাতনা দান করবে। আর পাপ কর্মের কি কথা! কারণ, কৃষ্ণপ্রীতিবিধানার্থ ব্যতিরেকে সমস্ত কর্মই এই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি পূর্ণ জড়সংসারে দুঃখময় বন্ধনের কারণ।

প্রশ্ন ১০। মানুষ কি নিজেই নিজের ভাগ্য তৈরি করে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। কৃষ্ণভক্তি উন্মুখতাই সৌভাগ্য, আর কৃষ্ণভক্তি বিমুখতাই দুর্ভাগ্য। মানুষ তার নিজ ইচ্ছা অনুসারে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তৈরি করতে পারে। প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে জীবনের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে পৃথিবীর মানুষের উপর একটু আলোকপাত করেছেন। শ্রীব্রহ্মা বলছেন—"মানুষেরা কী দুর্ভাগা! তারা ভগবানের ধাম সম্বন্ধে আলোচনা করে না। তারা ভগবানের কথা শুনতে চায় না। তারা এত হতভাগা যে, যে সমস্ত বিষয় শোনা উচিত নয়, যে সমস্ত বিষয় শুনলে তাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়, তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সেই সমস্ত অনর্থক বিষয় সম্বন্ধেই তারা শ্রবণ করে। এরূপ দুঃখজনক ব্যাপার আর কাকে বলব? যারা বৈকুণ্ঠ বিষয়ের বর্ণনা ত্যাগ করে জড় জগৎ সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যস্ত, তারা যে তাদের অস্তিত্বের গভীরতম অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।" (ভাঃ ৩/১৫/২৩ দ্রঃ)

"হে প্রিয় দেবতাগণ! তোমরা শোনো, পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম লাভ করা কতই না মহত্ত্বপূর্ণ ব্যাপার। সেখানে অতি অল্পকালের মধ্যেই কৃষ্ণভক্তি চর্চা করে মানুষ অতি দুস্তর জন্ম-মৃত্যুর ভবসমুদ্র অতিক্রম করে ভগবৎ লোকে পৌঁছতে পারে। আহা! মনুষ্য জন্ম কতই না সৌভাগ্যের! তাই আমারও বাসনা হয়েছে পৃথিবীতে গিয়ে মানবলোকে জন্মগ্রহণ করে শ্রীহরির আরাধনা করব। কিন্তু সেই ধরাধামে যে মানুষ কৃষ্ণভজন করছে না সে-তো একটা মায়াগ্রস্ত গণ্ডমূর্খ।" (ভাঃ ৩/১৫/২৪ দ্রঃ)

যখন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে দুই সেনাদলের মধ্যে কার ভাগ্যে জয় আর কার ভাগ্যে পরাজয় হবে, এই প্রশ্ন নিয়ে উদ্বিগ্ন অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরে বসে দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন সঞ্জয়ের মুখ থেকে জানতে চাইলেন, তখন সঞ্জয় বলতে লাগলেন, "হে রাজন্! যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণের কথা মতোই অর্জুন যুদ্ধ করছেন, সেই দলেই যশ, ধর্ম, জয় ও সৌভাগ্য লক্ষ্মী বিরাজ করছেন।"

প্রশ্ন ১১। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা—একথা কি সত্য? ভাগ্য কি? ভাগ্য কোথায় থাকে?

উত্তর ঃ সত্য। মানুষের কার্যকলাপ চিন্তাভাবনাই তার ফল উৎপন্ন করে। যেমন কোন ছাত্র যদি নিয়মিত যত্ন সহকারে পড়াশুনা করে, তবে পরীক্ষায় বসে সে পরীক্ষা-খাতায় লিখতে পারবে। তখন সে নিজেকে দুর্ভাগা বলবে না। কিন্তু যে ছাত্র যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেনি সে পরীক্ষা-খাতায় লিখতে বসে নিজেকে দুর্ভাগা মনে করে, কারণ তার লেখার মতো কিছুই নেই।

নিজেদের সচেতনতাই নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করে। যেমন, আগুন থেকে সাবধান। কারণ, আগুনের কাজকারবার যেখানে, সেখানে অগ্নিকাণ্ডরূপ বিপদ ঘটতেই পারে। তাই অগ্নি নির্বাপক জাতীয় কোন বস্তু কি জল ইত্যাদি কাছাকাছি আগের থেকেই রাখা উচিত, তখন বিপদ সামলানো যায়। কিন্তু অসচেতন হলে অগ্নিকাণ্ড ঘটলেও নিরুপায় হতে হয়। দেখা যাবে সব পুড়ে গেল। তখন 'হায় দুর্ভাগ্য' বলে মাথা ঠুকতে হল। দেখা যায়, রাস্তা খারাপ। গাড়ি আস্তে চালালেই হয়। কিন্তু বাহাদুরী দেখিয়ে দ্রুত বেগে গাড়ি চালিয়ে গেলে দুর্ঘটনাকেই ডেকে আনা হয়।

আমাদের বৈদিক শাস্ত্রীয় বিধি অবজ্ঞা করার বদ্ অভ্যাস আছে। তাই ভাবী দিনের জন্য নিদারুণ ক্লেশগুলি আমাদের প্রাপ্য রূপে বিহিত হয়। যেমন, মাছ-মাংস-ডিম আমরা বদ্ অভ্যাস বশত খেয়ে চলেছি। পরবর্তী জন্মে আমরা অবশ্যই নিম্নতর ইতর হিংস্র প্রাণীর কুলে জন্মগ্রহণ করব, কারণ আমরা ইতর হিংস্র প্রাণীর মতোই চেতনা সম্পন্ন।

আমাদের এই জন্মের যে দেহ, পিতামাতা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, রাষ্ট্র সমাজ, পরিবেশ পরিস্থিতি, সুখ দুঃখ লাভ করেছি—এ সবই আমাদের পূর্ববর্তী জন্মের কর্মফলস্বরূপ। আবার, এই জন্মের কর্মকীর্তির উপর নির্ভর করছে পরজন্মে আমরা কি লাভ করব?

অতীতের কোন্ জন্মে সতী গান্ধারী অজ্ঞাতে জলভর্তি স্বর্ণ কলসীর চাপে একটা কচ্ছপের একশটি ডিম্ নষ্ট করে ফেলেছিলেন বলে সেই মা-কচ্ছপের সন্তান-বিরহ-যাতনাও পরবর্তী জন্মে গান্ধারীদেবী ভোগ করেছিলেন, যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর একশটি পুত্র নষ্ট হল।

রাজা দশরথ অন্ধমুনির পুত্রকে শব্দভেদী বাণ দ্বারা ভ্রান্তিবশত বধ করার ফলে পুত্রশোকে অন্ধমুনি দেহত্যাগ করেন এবং তার ফলস্বরূপ রাজা দশরথকেও পুত্রশোকে দেহত্যাগ করতে হল, রামচন্দ্র যখন বনে চলে গেলেন।

ভাগ্য বলতে বুঝায় কর্মফল বিধি। ভাগ্য মানুষ নিজেই তৈরি করে। এই জন্মে কাউকে অন্যায়ভাবে নিপীড়ন, হত্যা, কাণা, খোঁড়া করে দিলে পরবর্তীকালে অন্যায়কারীকেও নিপীড়িত, হত, কাণা, খোঁড়া হতে হবে। নির্বিচারে পায়ের তলায় পিঁপড়েগুলোকে পিষ্ট করে ফেললে পিষ্টকারীকেও গাড়ি ঘোড়া বা অন্য কোনও ভাবেই পিষ্ট হতে হবে।

এই সমস্ত কর্ম ও কর্মফলের হিসাব যাকে সাধারণ লোক 'অদৃষ্ট লিখন' বা 'ভাগ্য লিপি' বলেন, তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে নরক নামক গ্রহের সংযমনী নামক যমপুরীতে জীবের যাবতীয় পাপপুণ্যের হিসাব রক্ষক শ্রীচিত্রগুপ্ত মহাশয়ের খাতায়।

পরিশেষে উল্লেখ্য এই যে, ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় দুর্ভাগ্য বিনষ্ট হয়। সৌভাগ্য লক্ষ্মী হচ্ছেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। ভগবৎ-সেবিকা। তাঁর কৃপা পেতে হলে আমাদের ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকতে হবে। ভগবদ্ নির্দেশমতো জীবন পরিচালিত করতে হবে। তাঁর শরণাপন্ন হলে ভক্তিযোগ প্রভাবে আমাদের দুর্ভাগ্য নষ্ট হয়ে যায়, সেই কথাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন ১২। জীবের ইচ্ছাশক্তি কি? এই ইচ্ছাশক্তির অন্তরালে কি প্রভু কৃষ্ণের কোনও প্রভাব আছে?

উত্তর ঃ জীবকে ভগবানের দেওয়া স্বাতন্ত্র্য বোধই জীবের ইচ্ছাশক্তি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হচ্ছে, সকলে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে সচ্চিদানন্দময় দিব্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করুক। কিন্তু তিনি যে, জীবকে স্বতন্ত্র ইচ্ছা দান করেছেন, সাধারণ ক্ষেত্রেই সেই ইচ্ছার উপর বাধ্যতা প্রদর্শন করেন না। কারণ জীব ইচ্ছা করলে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে পারে, না-ও বাসতে পারে। জোর করে বলপ্রয়োগ করে ভালবাসা হয় না। তাই প্রেমস্বভাব শ্রীকৃষ্ণও সরাসরি কাউকে বাধ্য করেন না।

কিন্তু পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মায়াধীন নন, মায়া তাঁর অধীন। তাই তিনি সর্বদা আনন্দময় ও আত্মারাম। তিনি নির্বিকার থাকেন। কিন্তু মায়াধীন জীব বিকারগ্রস্ত হয়ে সুখ দুঃখ ভোগ করে। মায়া বদ্ধ জীব তার স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিতে কৃষ্ণ-বহির্মুখ হয়ে জগদ্যন্ত্রণা ভোগ করে।

কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিপরীত যে করে বাসনা।
তার ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা ॥

কৃষ্ণ যাহা ইচ্ছা করে তাহা জেনো ভাল।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল ॥

প্রশ্ন ১৩। সুকর্ম যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে কুকর্ম কি তাঁরই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়?

উত্তর ঃ সুকর্ম বা কুকর্ম কোন কর্মই সরাসরি ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। নিজের ইচ্ছায় জীব সুকর্ম অথবা কুকর্ম করছে এবং তার ফল ভোগ করছে। জীবের সীমিত স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি ভগবানের দেওয়া হলেও ভাল বা মন্দ—কোন্ কর্ম করা হবে সেটি জীবের নিজের নির্বাচন।

প্রশ্ন ১৪। পূর্ব জন্মের সংস্কার ও কর্মফলেই মানুষ বর্তমান জীবন-যাপন করে থাকে। কিন্তু পূর্বের কথা তার স্মৃতিপথে আসে না কেন?

উত্তর ঃ পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলে জীব বর্তমান পরিবেশ, বর্তমান দেহ, বর্তমান সম্বন্ধ আদি লাভ করছে। কোন কোন জাতিস্মর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারলেও অধিকাংশ মানুষই স্মৃতিহীন। ঘণ্টাখানেক পূর্বের কথা যা শুনেছিল তা-ই তার স্মৃতিতে থাকে না। বিচিত্র কাল, ঋতু, পরিবেশ, সংসর্গের প্রভাবে আমাদের স্মৃতিও পরিবর্তন হয়ে যায়। অনেক স্মৃতি মনের অবচেতন স্তরেই থাকে। হঠাৎ কোন মুহূর্তে কোন এক স্মৃতি ভেসে উঠে আবার কোথায় হারিয়ে যায়। অনেক ছোট শিশুকে যখন সে বেশ কিছু কথা বলতে চেষ্টা করে তখন কখনও কখনও তার পূর্বজন্মের কথা বলতে পারে। সেই শিশু আর একটু বড় হলে আর সেই সব পারে না। মুক্ত পুরুষেরা তাদের পূর্ব জন্মের কথা বলতে পারেন। কিন্তু বদ্ধ ব্যক্তিরা বিস্মৃতি প্রবণ থাকে।

প্রশ্ন ১৫। ক) শ্রীমদ্ভাগবত কথার মানে কি? খ) সংসারে বহু কাজকর্ম থাকা সত্ত্বেও ষোল মালা হরিনাম জপ কিভাবে করব?

উত্তর ঃ ক) ভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদের কথাকে বলা হয় ভাগবত, অর্থাৎ ভক্তদের কথা। ভাগবত গ্রন্থ বিশেষ শ্রদ্ধাসূচক শ্রীমদ্ শব্দদ্বারা ভূষিত হয়েছে, তাই শ্রীমদ্ভাগবত।

খ) ষোল মালা জপ করতে দেড় থেকে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। সারাদিন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাংসারিক যতই কাজে ব্যস্ত থাকা হোক না কেন সুবিধা মতো দেড় থেকে দুই ঘণ্টা সময় বেছে নেওয়া যায়, ইচ্ছা থাকলে।

প্রশ্ন ১৬। ক) জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? খ) পুরুষকার ও দৈবশক্তি বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ ক) যার কোন জ্ঞান বা জানবার মতো ক্ষমতা নেই সে কর্ম ও ভক্তি করতে পারে না। যার জ্ঞান আছে কিন্তু কিছু করে না—কর্মহীন, সেই রকম অকর্মাও মূল্যহীন। সাধারণ পশুপাখী কীটপতঙ্গের, পিঁপড়েরও জ্ঞান আছে—কিভাবে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, বাস করতে হয়, ঘর বাঁধতে হয়। তারাও কর্ম করে চলে। তাই মানুষেরও সেই রকম জ্ঞান কর্ম থাকলে সেও পশুপাখী কীটপতঙ্গের সমতুল্য মাত্র। কিন্তু তার

জ্ঞান আছে যে, সে একজন চিরন্তন সত্তা। সমগ্র সৃষ্টির হর্তা-কর্তা-বিধাতার সঙ্গে তার নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। তাই সে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির অবধারিত সংসার চক্র অতিক্রম করে নিত্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করে। সেই চেষ্টাই ভক্তি। অন্যথায় সেও অন্য জড়বদ্ধ জীবধারায় এক ধরনেরই পশু।

খ) নিজের ইচ্ছা প্রচেষ্টা হল পুরুষকার এবং ভগবানের কৃপা আশীর্বাদই হল দৈবশক্তি। ভগবদ্ কৃপা বিনা আমাদের বহু প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। আবার ভগবদ্ কৃপা-আশীর্বাদকে যথাযথ ব্যবহার করার মতো প্রচেষ্টা যদি নেওয়া হয়, তবে তাই-ই সুফল দায়ক।

প্রশ্ন ১৭। ভাগ্য কি?

উত্তর ঃ অতীত দিনগুলিতে এই জীবনে কিংবা পূর্ববর্তী জীবনে যে যে কর্ম আমরা করে এসেছি সেই সব কর্মের ফল বর্তমানে বা ভবিষ্যৎ দিনে আমরা পাব। ভাল কর্মের ফল ভাল বা সুখদায়ক এবং মন্দ কর্মের ফল দুঃখদায়ক হয়ে আমাদের জীবনে বর্তায়। সেটিই হল আমাদের ভাগ্য। তা সৌভাগ্য হতে কিংবা দুর্ভাগ্য হতে পারে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ ভজনের ফলে মানুষ পরম সৌভাগ্যবান হতে পারবে। ভক্ত জীবনের কর্ম ফল পরম ভাগ্যবিধাতা শ্রীকৃষ্ণের হাতেই থাকে।

প্রশ্ন ১৮। প্রতিটি জীব পূর্ব জন্মার্জিত কর্ম অনুযায়ী দেহ ধারণ করে থাকে। তা হলে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে কি করে? একটি বীজের দ্বারা অসংখ্য বীজের সৃষ্টি হচ্ছে কি করে?

উত্তর ঃ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে অন্যান্য জীব মানুষ দেহ পাচ্ছে। অন্যান্য যুগের তুলনায় বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা অতি অল্প।

একটি বীজ থেকে গাছ হল। এটি একটি জীবাত্মা। সেই গাছের অসংখ্য ফল হল। ফলগুলি পুষ্ট হল। ফল থেকে বীজ এল। এবার কোন সূক্ষ্ম জীবাত্মা সেই বীজ রূপ শরীর শিশুকে আশ্রয় করল। বীজটি যদি জীবাত্মার আশ্রয়ের অনুকূল না হয়, তা হলে সেই বীজ থেকে গাছ হবে না। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে যে কোনও জীবাত্মা তার পূর্ব শরীর ত্যাগ করেও এই বীজগুলিকে আশ্রয় করে থাকতে পারে।

প্রশ্ন ১৯। বৈষ্ণব দেখে তাদের প্রতি উপহাস টিটকারী করলে তার ফল কি হয়?

উত্তর ঃ স্কন্দপুরাণে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় শ্রীভগীরথকে বলছেন—

যো হি ভাগবতং লোকম্ উপহাসং নৃপোত্তম।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্মযশঃ সুতাঃ ॥

"হে রাজন্, কেউ যদি উত্তম বৈষ্ণবকে উপহাস করে, তা হলে তার সমস্ত পুণ্য, ধন-সম্পদ, যশ এবং সন্তান বিনষ্ট হয়।"

নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥

"বৈষ্ণব মহাত্মাদের যে নিন্দা করে সে তার পিতৃপুরুষ সহ মহারৌরবে পতিত হয়।"

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি ।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

"বৈষ্ণবকে আঘাত বা হত্যা করা নিন্দা করা কিংবা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া, কিংবা ক্রুদ্ধ হওয়া বা বৈষ্ণবকে দেখে অভিনন্দন না করা অথবা তাঁকে দেখে হর্ষ অনুভব না করা—এই ছয় রকমের আচরণগুলি নরকে পতিত করায়।

প্রশ্ন ২০। পাপাচারী মানুষের মৃত্যুর পর নরকগতি হয়, তারপর নরকশাস্তি ভোগের পর কোথায় যায়?

উত্তর ঃ পাপকর্মের ফলে নরক গতি হয়। নরক যাতনা ভোগ করার পর আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়। এমন কখনই মনে করা উচিত নয় যে, পাপকর্মের সম্পূর্ণ শাস্তি ভোগ হয়ে যাওয়ার পর জীব মুক্ত অবস্থা লাভ করে। না, বরং সম্পূর্ণ শাস্তি না ভোগ করিয়ে অবশিষ্ট শাস্তি লাভের জন্য নরকে যাতনা-শরীর ত্যাগ করে জীবকে আবার মর্ত্যলোকে যে-কোন শরীর লাভ করে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কোন্ ধরনের পাপকর্মীর কি জন্ম লাভ হয় সেই কথাও মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিবৃত হয়েছে।

যারা পতিত ব্যক্তির যাজন করে তারা নরকমুক্তির পর কৃমি হয়। আচার্যের প্রতি কপট ব্যবহারকারীরা কুকুর জন্ম লাভ করে। আচার্যের দ্রব্যে ভোগবাঞ্ছা, পিতামাতার অবমাননা যারা করে, তাদের গর্দভ যোনি লাভ হয়। যে ভ্রাতৃভার্যাকে অপমানিত করে সেই পাপী পুংস্কোকিল জন্ম পায়। পরস্ত্রী হরণকারীর কুকুর, শেয়াল, শকুন জন্ম হয়। যারা ধান, সরিষা, ছোলা ইত্যাদি শস্য হরণ করে তাদের ইঁদুর জন্ম পেতে হয়। যারা বন্ধুপত্নী, গুরুপত্নী বা রাজপত্নীকে কামার্ত হয়ে ধর্ষণ করে তারা শূকর হয়ে জন্মায়। দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণকে নিবেদন না করে যারা ভোজন করে তারা কাক জন্ম পায়। দান ও বিবাহে যারা বিঘ্ন করে তাদের কৃমি জন্ম পেতে হয়। যারা অন্যায় ভাবে জমি দখল করে তাদের বৃক্ষ জন্ম পেতে হয়।

এইভাবে বিভিন্ন পাপকর্মের ফল স্বরূপ বিভিন্ন রকমের যোনি ভ্রমণ করার পর ক্রমে ক্রমে আবার মানুষ জন্ম লাভ হয়।

প্রশ্ন ২১। পুণ্যকর্মকারীরা দেহত্যাগের পর স্বর্গসুখ ভোগ করে। সঞ্চিত পুণ্য শেষ হয়ে গেলে পৃথিবীতে এসে কি জন্ম পায়? নরক যাতনা ভোগের পরও কি মানুষ জন্ম হয় না?

উত্তর ঃ স্বর্গভোগ করার পর সাধারণত মানুষ জন্মই লাভ হয়। আবার নরকযাতনা ভোগ করার পরও কোনও কোনও ক্ষেত্রে পৃথিবীতে মানুষ জন্ম হতেই পারে।

প্রশ্ন ২২। আমরা কিভাবে বুঝব কোন্ মানুষ স্বর্গ থেকে, কোন্ মানুষ নরক থেকে এসে এই পৃথিবীতে মানুষ জন্ম লাভ করেছে?

উত্তর ঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে যদি কোন মানুষকে দেখা যায় যে, সে পরনিন্দা করে বেড়াচ্ছে, পর-উৎপীড়ন করে চলেছে যে কৃতঘ্ন, পরস্ত্রী

হরণ, পরদ্রব্য হরণ, নিষ্ঠুর প্রকৃতির, বৈদিক আচার মানে না, দেব-দেবতাদের অবজ্ঞা করে, লোকের সঙ্গে প্রতারণা, মানুষকে খুন করতেও যার কুণ্ঠা নেই, যে কাউকে কিছু দান করতেও চায় না, লোকের সঙ্গে প্রতারণায় উন্মুখ, এইভাবে যে বিভিন্ন নিষিদ্ধ কর্ম করছে কিংবা এই সব কাজেই যার প্রবৃত্তি, তখন বুঝতে হবে নরক ভোগের পরই সে এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে।

আর যদি কাউকে দেখা যায়, সে সর্ব জীবের প্রতি দয়া, সৎবাক্য কথন, পুণ্যকর্মে আগ্রহী, সকলের মঙ্গলের জন্য সৎবাক্য প্রয়োগ, বেদশিক্ষায় অনুগামী, গুরু, দেব-ঋষিগণের পূজা, সাধুসঙ্গ, সকলের প্রতি মৈত্রী, এইভাবে বিভিন্ন মঙ্গলকর্মে প্রবৃত্ত, তখন বুঝতে হবে স্বর্গভোগের পরই সে এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে।

প্রশ্ন ২৩। আমরা জানি প্রত্যেকেই তার কর্মফল ভোগ করে। কেউ কারও পাপপুণ্যের ভাগী হয় না। কিন্তু অনেকে বলেন, বংশের একজন ভক্ত হলে অন্যেরাও উদ্ধার পেয়ে যায়। এটা কি সম্ভব?

উত্তর ঃ প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ পাপ-পুণ্য কর্মের ফল ভোগ করে। আবার, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রজাদের পাপের ভাগী রাজাকে হতে হয়, স্ত্রীর পাপের ভাগী স্বামীকে হতে হয়। পাপাচারীদের আচরণে দণ্ড দেওয়া থেকে যদি বিরত থাকা হয়, তবে আশ্রিতের পাপের ভাগী আশ্রয়দাতাকে হতেই হয়। সেই জন্যেই দেখা যায় অনেক সময় ছেলে পাপাচার করলে তার পিতাকে জরিমানা দিতে হয়। যা হোক সেটি অন্য কথা। অবশ্য আমাদের নিজ কর্মফলেই আমরা সেই রকম প্রজাদি লোকজনের সংস্পর্শে জড়িত হই।

নানাবিধ পাপ ও পুণ্য কর্মফলে জীব বহু জন্ম ধরে এই জড় সংসারে আবদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই গুরু-কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার ফলে কেউ ভক্তিপূর্ণ জীবন গঠন করে, তখন তার বিগত দিনগুলির জাগতিক পাপপুণ্য প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। *নির্দহতি চ ভক্তিভাজাং* (ব্রহ্মসংহিতা)।

আবার, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমার ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তের সমস্ত পাপ আমিই স্খালন করি। *সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি* (গীতা ১৮/৬৫)। আমার ভক্তের সমস্ত অভাব অভিযোগ আমিই পূরণ করি। *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্* (গীতা ৯/২২) ভক্ত যখন তাঁর পিতামাতাদি স্নেহশীল জনদের দুঃখের কথা চিন্তা করেন তখন ভক্তের সেই অভাবও পূরণ করেন। ধ্রুব মহারাজ যখন বিষ্ণুদূতদের কাছে, তার মা সুনীতির জন্য চিন্তা করছিলেন, তখন বিষ্ণুদূতেরা দেখিয়ে ছিলেন, 'ওই দেখ, তোমার মা তোমার সামনেই পুষ্পবিমানে বৈকুণ্ঠযাত্রী হয়েছেন।'

আর ভগবান নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদকে বলেন 'তোমার একুশ কুল উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে।' অর্থাৎ, ভক্তের জন্মকুলাদি তাদের কর্মচক্রে আবহমান কাল ধরে আর ভবসংসারে পড়ে থাকবে না। তারাও শুদ্ধ ভক্তের দৌলতে যতদূর সম্ভব শুদ্ধজীবনে—ভক্তিময় জীবনে ফিরে আসবার সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করে শুদ্ধভক্তের গতি প্রাপ্ত হবে।

এমন নয় যে, একজন শুদ্ধ ভক্ত হল, আর তার বংশের সবাই অনাচারী থেকেও বৈকুণ্ঠে চলে যাবে,—না এমন নয়। তবে শুদ্ধভক্তের সেই বংশের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা থাকে যাতে তারাও শীঘ্রই অনাচারী জীবন থেকে মতিগতি পরিবর্তন করে শুদ্ধ ভক্তিচেতনায় উন্নীত হবে।

আর সেই জন্যই ভগবান বলছেন—

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ॥

'যেখানে যেখানে প্রশান্ত সমদর্শী সদাচারযুক্ত ও সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত আমার ভক্ত আছে, অত্যন্ত অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও সেই স্থানের এবং সেই বংশের মানুষেরা পবিত্র হয়ে যায়।' (ভাঃ ৭/১০/১৯)

প্রশ্ন ২৪। আপনারা তিলক পরেন কেন?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন তিলকহীন কপাল শ্মশান সদৃশ। শ্রীমদ্ভাগবতে যমরাজ তাঁর দূতদের বলেছেন ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক দেখলে তাঁদের কাছে যেও না।

প্রশ্ন ২৫। এই জগতে কি আধ্যাত্মিক, কি আধিদৈবিক, কি আধিভৌতিক সমস্ত দুঃখের মধ্যে আমরা জর্জরিত। আমাদের কর্মদোষে দুঃখলাভ করছি। সেই দুঃখ নিবৃত্তি কিভাবে সম্ভব হবে?

উত্তর ঃ আমরা আমাদের কর্মদোষে দুঃখ লাভ করছি। তাই কর্মদোষ এড়িয়ে চললে দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব হবে। শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে বলছেন—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মন্ তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥

"হে ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞদের দ্বারা নিরূপিত হয়েছে যে, ত্রিতাপ দুঃখ নিরাময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করা।" মানুষের সাংসারিক সমস্ত কর্ম যখন পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয় তখন সেই সমস্ত কর্ম ত্রিতাপযুক্ত সংসার বন্ধনের কারণ সমূলে বিনাশ করে থাকে।

প্রশ্ন ২৬। আত্মহত্যা করা কি পূর্বের কর্মফল ভোগ? না কি নতুন কর্ম?

উত্তর ঃ যখন কেউ পূর্বকালে অন্যকে বেশী উদ্বিগ্ন করে থাকে, অন্যের জীবনের মর্যাদা নষ্ট করে থাকে, তখন কালান্তরে সে উদ্বেগ পেয়ে মতিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে পরিণামে জীবনের মর্যাদামূল্য নষ্ট করে দেয় আত্মহত্যার মাধ্যমে। এটি যদিও দেখতে নতুন কর্ম, কিন্তু এটা কর্মফলভোগ।

প্রশ্ন ২৭। আত্মহত্যার পরিণতি কি?

উত্তর ঃ আত্মাকে হত্যা করা যায় না। কেবল অকালে নিজের দেহটাকে নষ্ট করা হল। তাই নতুন দেহ পেতে বিলম্ব হয়। বিদেহী আত্মাকে দেহধারী আত্মার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট ভুগতে হয়।

প্রশ্ন ২৮। ধনী ব্যক্তির ঘরে একটি বোবা সন্তান জন্মগ্রহণ করল। এটি সন্তানের কর্মফলে, না ধনীব্যক্তির কর্মফলে ঘটল?

উত্তর ঃ ধনী ব্যক্তি নিজ কর্ম ফলে বোবা সন্তান লাভ করল এবং সন্তান নিজ কর্মফলে ধনীর ঘরে বোবা হয়ে জন্মালো।

প্রশ্ন ২৯। কেউ যখন একজনকে খুন করে, তবে খুনী ব্যক্তি কি সবক্ষেত্রে দোষী হয়? যে খুন হচ্ছে, সেটি তো তার পূর্বজন্মের কর্মফল হেতু, তা হলে খুনকারী দোষী হবে কেন?

উত্তর ঃ যে খুন হচ্ছে, সে তার কর্মফল ভোগ করল, যে খুন করেছে সেও তার কর্মফল ভোগ করবে।

প্রশ্ন ৩০। কেউ যদি মৃত্যু কালে তাঁর পরিবারের লোকদের বলতে থাকে যে, 'আমি আবার তোমাদের এই ঘরেই জন্ম নেবো'। তার সেই বাসনা পূরণ হয় কি?

উত্তর ঃ বাসনা পূরণ হয় বৈ কি। ভগবান অন্তর্যামী, কারও মনোবাসনা অপূর্ণ তিনি রাখেন না। কিন্তু সেই বাসনা পূরণ হয়েই বা কতটুকু লাভ হবে—সেই বিষয়ে বুদ্ধিমান মানুষের বিচার করা একান্ত কর্তব্য। মানুষ হয়ে জন্ম হবে কি না, গাছ বা ওই ঘরের মধ্যে পোকামাকড় হয়েও জন্মাতে পারে। কিংবা মানুষ হয়ে জন্মালেও অতি অল্পায়ু কিংবা অপেক্ষাকৃত মন্দ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে জন্মাতে পারে। কিরূপে কি পরিস্থিতির মধ্যে কোন্ সময়ে তার জন্ম-বাসনা পূর্ণ হবে সেই বিষয়ে বাসনাকারী অবশ্য অদৃশ্য নিয়ন্তার বিচারাধীন। এমনকি এমন সময়ে জন্মালো যে সেই ঘরের মধ্যে সারাজীবন হা-হুতাশ করে তার দিন যাপন করতে হবে। এমনটি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেই জন্য মনোবাসনাটা জড় জাগতিক না হয়ে কৃষ্ণকেন্দ্রিক থাকা কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিচ্ছেন মনটি অন্য কোথাও না দিয়ে আমাতে রাখো। *মন্মনা ভব।* জড়বদ্ধ জগতের দুঃখময় আবর্তে জন্মবাসনার পরিবর্তে মানুষের কর্তব্য শাশ্বত চিৎজগতের সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবায় যুক্ত হওয়ার বাসনা করা।

প্রশ্ন ৩১। মৃত্যুর পর মানুষ নরক বা স্বর্গ ভোগ করল। মৃত্যুর সময়ের মনোভাব অনুযায়ী পুনরায় নতুন জন্ম লাভ করল। তা হলে সেই আত্মা কেন জন্মমুহূর্তে পঙ্গু বা অন্ধ হয়ে জন্মায় কিংবা ধনী বা দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়ে সুখ-দুঃখ ভোগ করে?

উত্তর ঃ মৃত্যুকালীন মনোভাব বা বাসনা এবং জীবনের কর্মফল অনুসারে উপযুক্ত জন্ম লাভ হয়। মৃত্যুর পর জীব যমলোকে আনীত হয়। সেখানে বিচারের পর মন্দ কর্মজনিত ফল ভোগের জন্য যতদিন যতটুকু শাস্তির মেয়াদ থাকে ততদিন সেখানে থাকে। সেখানে তাকে সম্পূর্ণ দণ্ড ভোগ করানো হয় না। কিছুটা দণ্ড পরজন্মে ভোগের জন্য রাখা হয়। যার ফলে পঙ্গুত্ব বা অন্ধত্ব ইত্যাদি দণ্ড পৃথিবীতে ভোগ করতে হয়।

কেউ স্বর্গে গেলে, সম্পূর্ণ স্বর্গসুখ ভোগ করে না। ভগবান বলছেন, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।* পুণ্য ক্ষীণ হয়ে গেলে পৃথিবীতে আসতে হয়। অর্থাৎ, কিছু পুণ্যফল পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে ভোগ করতে হয়।

প্রশ্ন ৩২। ভগবানই জীবকে ভাল বা মন্দ কর্ম করান। তাহলে ভাল বা মন্দ কর্মের জন্য জীব দায়ী বা ফলভাগী হবে কেন?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান জীবকে কর্ম করবার শক্তি প্রদান করেন। কারণ ভগবানের শক্তি ব্যতীত জীব কোনও কর্মই করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু জীব সেই শক্তি নিয়ে তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম সম্পাদন করে। নিজের ইচ্ছানুসারে ভাল বা মন্দ কর্ম সম্পাদন করে। তাই কর্মফলের জন্য ভগবান দায়ী হন না। জীবই দায়ী হন। জীবই ফলভাগী হয়।

প্রশ্ন ৩৩। জীবাত্মা একদিন না একদিন ভগবদ্ধামে উন্নীত হবে কি না?

উত্তর ঃ যদি ইচ্ছা থাকে 'এই জন্মেই হরিভজন করে ভগবদ্ধামে উন্নীত হব', তা সম্ভব। নইলে যদি মনে করেন 'অনন্ত কোটি জন্ম ধরে ঘুরপাক খেয়ে তার পরে হরিভজন করে ভগবদ্ধামে উপনীত হব'—তাও সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ৩৪। মানুষ তার নিজের ভাল-মন্দের কর্তা অর্থাৎ সে ইচ্ছা করলে নিজের ভাল বা সর্বনাশ করতে পারে। তা হলে গোবিন্দ ভজনার প্রয়োজন কি? যেহেতু সে নিজের কর্মের নিজেই কর্তা।

উত্তর ঃ যেহেতু মানুষ নিজের সর্বনাশ করতে চায় না অর্থাৎ, সে ভাল হতে চায়, সেই হেতু তার একান্তভাবে গোবিন্দ ভজনের প্রয়োজন। গোবিন্দ ভজনার মাধ্যমেই সে মনুষ্য জীবন ধন্য করতে পারে, অন্যথায় এই জন্মমৃত্যু পূর্ণ দুঃখময় জড় সংসার থেকে উদ্ধার পাওয়ার পক্ষে নতুন কোনও পন্থা আর নেই। আমাদের সুখ-দুঃখের সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তিদান করেন বলে তাঁর একটি নাম মুকুন্দ। তাই মানুষের এমন কর্ম করা উচিত যাতে তাকে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ভবচক্রে জন্ম-জন্মান্তর ধরে ঘুরপাক খেতে না হয় অর্থাৎ, কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার প্রয়াস করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/২২/৩৭) ব্রহ্মাপুত্র সনৎকুমার বলছেন, যদি মানুষ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হয়ে কেবল বিভিন্ন রকমের কর্ম করতে থাকে কিংবা যোগী হওয়ার চেষ্টা করে, তবে তারা কখনই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই কৃষ্ণভক্তিযুক্ত কর্মেই নিযুক্ত থাকা উচিত।

প্রশ্ন ৩৫। আমাদের কর্মকীর্তি যদি মন্দই হয়, তার ফল তো পেতেই হবে। কিন্তু কিভাবে কর্মফলচক্র বিনষ্ট হবে?

উত্তর ঃ যখন নিজের স্বার্থ অভিসন্ধির জন্য কর্ম করা হয়, তখন সেই কর্মের ফল ভুগতে হয়, পরের সুখের জন্য যে কর্ম করা হয় সেই কর্মের ফলেও নিজের সুখ প্রাপ্তি অর্থে জড় জগতেই থাকতে হয়। কিন্তু কোন কর্ম ও কর্মফল যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

প্রীতিবিধানের জন্য করা হয় সেই ভক্তিকর্মের ফলে জড় কর্মসংস্কার চক্র থেকে মুক্তি লাভ হয়। যাঁরা কৃষ্ণভক্তি সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁদের সর্বপ্রকার কর্মফল চক্র বিনষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা জাগতিক সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন। তাঁদের কর্মফলের বিচার যমের হাতে থাকে না।

কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং (ব্রঃ সঃ ৫/৫৪) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের সমস্ত কর্ম বিনাশ করেন। অতএব আমাদের কেবল ভক্তিময় কর্মেই নিযুক্ত হতে হবে।

প্রশ্ন ৩৬। লোকে বলে 'বিধির লিখন'—এর মানে কি?

উত্তর ঃ আমাদের মনোভাব বা বাসনা এবং আমাদের ক্রিয়া কলাপ কিরকম—তার উপর নির্ভর করছে আমরা কি পাচ্ছি বা কি আমাদের প্রাপ্য আছে। সুখদুঃখ যে আমরা পাচ্ছি সেগুলি আমাদের দৃষ্টি সীমিত বলে বুঝতে না পারলেও সর্বসাক্ষী ভগবানের দৃষ্টিতে সব প্রাপ্যই আমরা পাচ্ছি। একেই বলে 'বিধির লিখন' বা আমাদের 'ভাগ্যলিপি'।

প্রশ্ন ৩৭। গীতায় বলা হয়েছে, কেউ শূদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েও নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করলে সে এই জন্মে ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে পারে কিংবা অসম্পূর্ণ ভক্তি পূরণের জন্য পরবর্তী জন্মে সদ্ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেওয়ার সুযোগ পাবে। কিন্তু সেই ব্যক্তি কি পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে করতে পারবে?

উত্তর ঃ জ্যোতিষ গণনা করে অনেকে হয়তো পূর্ব জন্মের কথা জানতে পারে। কিন্তু তার পূর্বজীবনের স্মৃতি থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। তবে আমাদের বুঝতে হবে, কৃষ্ণভজন হঠাৎ করে কেউ শুরু করে না। নিশ্চয়ই পূর্বকালে বা পূর্বজন্মের কোনও সুকৃতি অথবা কোনও মহান বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপার ফলেই মানুষ কৃষ্ণভজন করবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন ৩৮। অদৃষ্ট কাকে বলে?

উত্তর ঃ সব জীবই পূর্ব সংস্কার অনুসারে স্বভাব লাভ করে থাকে। সেই স্বভাব অনুসারেই জীবের নানা প্রচেষ্টার উদয় হয় এবং সেই প্রচেষ্টার ফল লাভ করে। একেই বলে অদৃষ্ট বা কর্মফল।

প্রশ্ন ৩৯। মানুষ তার অদৃষ্ট পরিবর্তন করতে পারে কি না?

উত্তর ঃ মানুষ যদি কর্মফলের অধীন না হতে চায় তবে তাকে শ্রীকৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে হবে। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের ফলে জড়জাগতিক সুখ-দুঃখ ফল ভোগচক্র নষ্ট হবে। *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং।* ভগবান ভক্তকে উদ্ধার করেন।

প্রশ্ন ৪০। বলা হয় যে, ভগবদ্ ভক্তি সাধনের ফলে জীবের চার রকমের পাপরাশির বিনাশ হয়। সেগুলি কি?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে চার রকমের পাপের কথা বলা হয়েছে—প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, কূট ও বীজ।

যা আমাদের কর্মফল দিতে শুরু করে দিয়েছে, অর্থাৎ বর্তমানে যে ক্লেশ ভোগ করছি—এটাই প্রারব্ধ পাপ।

পূর্বকৃত যে পাপের ফল ভোগ আরম্ভ হয়নি, তা অপ্রারব্ধ পাপ।

কতগুলি কর্ম যেগুলি পাপ বলে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু কালক্রমে সেই সূক্ষ্ম পাপরাশি ফলদান করবে। সেগুলি কূট।

যে পাপাচারগুলি করা হয়নি কিন্তু বাসনা রয়েছে। বাসনা আকারে চিত্তে গাঁথা থাকে। সেগুলি বীজ। বাসনা ভোগের জন্যই জীব বহু রকমের দেহ ধারণ করে জন্মান্তর চক্রে আবর্তিত হচ্ছে।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

অপ্রারব্ধং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্ ।
ক্রমেণৈব প্রলীয়তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥

"যাদের দেহ-মন-প্রাণ ভগবদ্ ভক্তিতে নিযুক্ত রয়েছে তাদের অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ এবং ফলোন্মুখ বা প্রারব্ধ পাপ রাশিও ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।"

প্রশ্ন ৪১। আপনাদের মধ্যে কেউ ভগবৎধামে ফিরে গিয়েছেন—তার প্রমাণ কি?

উত্তর ঃ শব্দ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই তিনটি হচ্ছে প্রমাণ। স্বতঃসিদ্ধ অখিল বেদশাস্ত্র—শব্দ প্রমাণ। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান—প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষীভূত কোন বিষয়ে কোন প্রকার ব্যাপ্তি বোধকে বলে অনুমান প্রমাণ। উদাহরণ যোগে বুঝতে চেষ্টা করুন। অংক শাস্ত্রে ১+১=২, ১-১=০ ইত্যাদি সূত্র নির্দিষ্ট রয়েছে। এটি শব্দ প্রমাণ। আপনাকে প্রথমে সূত্রটি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। তারপর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখবেন একটি ঘরে একজন মানুষ ছিল, সে বিবাহিত হয়ে সেখানে বাস করল। অতএব ঘরে দুইজন হল। এটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তারপর একটি মারাত্মক খুনী এসে তাদের দুইজনকে হত্যা করেছে। এই খবরটা আপনি শুনতে পেয়েছেন। তখন আপনি অনুমান করলেন এই ঘরটাতে দুইজন ছিল এখন তারা নেই। ঘর নির্জন।

তেমনই শব্দ প্রমাণ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি দেহত্যাগ কালে কৃষ্ণলোকে গমন করেন। এটি বেদবাক্য। শব্দ প্রমাণ। কৃষ্ণ স্মরণ করতে করতে কেউ দেহত্যাগ করলে তার শারীরিক অবস্থাটি গভীর প্রশান্তিময় রূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়। এটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সাধারণত অভক্তরা মরবার কালে উগ্রভাব বা আতঙ্কভাব প্রকাশ করে থাকে। আরও যদি স্পষ্টভাবে চাক্ষুষ প্রমাণ পেতে চান তা হলে আপনাকে অবশ্যই দেহত্যাগ পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করেই চলতে হবে। তা হলেই কৃষ্ণলোকে গিয়ে কতজন ফিরে গিয়েছে দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন ৪২। সততার সঙ্গে জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চা করলে এবং এটা পেশা হিসেবে গ্রহণ করলে তবে কি তা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পরিপন্থী হবে? স্থানীয় বৈষ্ণবগণ বলছেন কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করলে জ্যোতিষশাস্ত্রকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ কারও অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানিয়ে দিতে পারবেন সে তো উত্তম কথা। জ্যোতিষী-বিশেষজ্ঞ জটায়ু পক্ষী তার অন্তিম সময়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'যে মুহূর্তে রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করে সেই মুহূর্তের অধিপতি ছিলেন বিন্দ। তাঁর প্রভাবে অপহৃত বস্তু মালিকের কাছেই ফিরে আসে, অপহর্তার কোনও লাভ হয় না।' এক জ্যোতিষী নিমাইসুন্দরকে সামনে বসিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি কৃষ্ণ। শ্রীগৌরমোহন দের শিশুপুত্র অভয়ের (প্রভুপাদের) জন্মকোষ্ঠী বিচার করে এক জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'ঐ শিশু সন্ন্যাসী হয়ে সত্তর বছর বয়সে সাত সমুদ্র পার হয়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করবেন।' আমার কেন সাধনভজনে অগ্রগতি হচ্ছে না, আগামি দিনে কোথায় গিয়ে বিপদাপন্ন হব, তা যদি জ্যোতিষবিজ্ঞানের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারেন তবে মন্দ কোথায়?

তবে কৃষ্ণভক্তরা জানেন জীব কালের অধীন হলেও কাল কৃষ্ণের অধীন। তাই সর্বকালই কৃষ্ণচেতনায় থাকার জন্য তাঁরা প্রয়াসী হন। সর্বকালেই প্রতিনিয়ত কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে অতিবাহিত করলে ভাগ্যে ভালো-মন্দ সমস্ত কর্মফল পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, হাতে কর্মকাণ্ডীয় রেখা পরিমার্জিত হয়ে যায়, অনেক ভয়ানক দুর্গতি লাঘব হয়ে যায়। তাই জ্যোতিষবিজ্ঞানের মাধ্যমে যদি আপনি সংসারবদ্ধ জীবকে কৃষ্ণভক্ত তৈরি করতে পারেন তা হলে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুশীলনে দোষ নেই।

ভক্তরা জ্যোতিষবিদ্যাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে বাধা দিয়ে থাকেন এই জন্য যে, দিন দিন আপনি অধিকাংশ ভক্তিবিমুখ লোকের কর্মকাণ্ডীয় বিষয় বিচার করতে থাকবেন কিন্তু তার ফলে কারও কর্মবন্ধন মুক্তি হয় না। একমাত্র কৃষ্ণভক্তি বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে লোকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করে। তবে ভক্তরা কারও ব্যক্তিগত বিশেষ আগ্রহে বাধা প্রদান করেন না। যাই হোক, পরম বৈষ্ণব চূড়ামণি সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

ধর্মপথে থাকি কর জীবনযাপন ভাই ॥
যে কোন ব্যবসা ধরি', জীবন-নির্বাহ করি',
মুখে বল হরি হরি, এই মাত্র ভিক্ষা চাই ॥
গৌরাঙ্গচরণে মজ, অন্য অভিলাষ-ত্যজ,
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ভজ, তবে বড় সুখ পাই ॥

১৭

বার, ব্রত ও তিথি

প্রশ্ন ১। জগৎ সংসারে হাজার রকমের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এ সমস্ত উৎসবের যথার্থ তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ সাধারণত সমস্ত মঙ্গলময় উৎসব অনুষ্ঠানের তাৎপর্য হচ্ছে শ্রীহরির সন্তোষ বিধান করা। সাধারণত উৎসব বলতে ব্রত-পূজা, আরাধনা, নৃত্যগীত, বাদ্য ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে বোঝায়। কিন্তু অবৈদিক সভ্যতায় উৎসব অনুষ্ঠান তামসিক আচারে পরিণত হচ্ছে বলে হরিতোষণ বরবাদ করে লোকে ইন্দ্রিয়তর্পণ ও ভক্তিবিরুদ্ধ গীতবাদ্য উল্লাসে মত্ত হয়ে থাকে। কিভাবে উৎসবে মানুষের নিমগ্ন হওয়া উচিত সেই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন—

উপগায়ন্ গৃণন্ নৃত্যন্ কর্মাণ্যভিনয়ন্ মম।
মৎকথাঃ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ মুহূর্তং ক্ষণিকো ভবেৎ ॥

"আমার চরিতকথা বিষয়ক গান, আমার নাম কীর্তন, আমার কথা অন্যের কাছে বর্ণন, আমার মহিমা শ্রবণ, আমার ক্রিয়াকলাপ অভিনয় এবং নৃত্য করে উৎসব-মগ্ন হবে।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/২৭/৪৪)

সনাতন বৈদিক ধারায় প্রতিটি উৎসবের কেন্দ্রে শ্রীহরিই আরাধিত হয়ে থাকেন। কি দুর্গাপূজা, কি বিবাহ অনুষ্ঠান, কি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান—সব উৎসবেই শ্রীহরির শিলা-বিগ্রহ (নারায়ণ শিলা) সর্বাগ্রে পূজিত হন। আর সেই শ্রীহরির স্তব-স্তুতি, প্রণতি নিবেদন, প্রার্থনা নিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের মনুষ্যজন্মের সার্বিক মঙ্গল সাধন বিশেষত পারমার্থিক মঙ্গল সাধনই উৎসবের লক্ষ্য।

কিন্তু বর্তমান অবৈদিক মানব সমাজে ঢাক ঢোল বাজিয়ে, অশ্লীল গানের রেকর্ড চালিয়ে, হৈ হৈ করে অপ্রসাদ ভক্ষণ করে, কোথাও বা নেশাভাঙ করে সমগ্র উৎসব অনুষ্ঠান নিদারুণভাবে বিকৃত করা হচ্ছে। যার ফলে মানুষের মঙ্গলও সুদূরপরাহত।

প্রশ্ন ২। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধারাণী ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন্ কোন্ বারে জন্মলীলা প্রকাশ করেছিলেন?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ বুধবারে, শ্রীমতী রাধারাণী সোমবারে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শনিবারে জন্মলীলা প্রকটিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ৩। জীবনে যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠের মালা ব্যবহার করতে চায়নি, তুলসীর পূজার্চনা করেনি, তার মৃত্যুর পর প্রথাগত ভিত্তিতে একটি জীবন্ত তুলসীবৃক্ষ উপড়ে এনে শ্মশানে চিতার সঙ্গে দাহ করা হয়। এতে কিসের মঙ্গল হয়?

উত্তর ঃ এতে কোনও মঙ্গল হয় না। আমিষভোজী, নেশাসেবী ও ভজনহীন মানুষদের গলায় পবিত্র তুলসী কাষ্ঠের মালা থাকলেও তার মাহাত্ম্য কার্যকরী হয় না। ঠিক যেমন ওষুধ সেবন এবং তার সঙ্গে ওষুধের প্রতিকূল বস্তুর সেবন করা হলে রোগের

কোনও প্রতিকার হয় না। চিতার মধ্যে অপ্রকটিত বা শুষ্ক তুলসী কাষ্ঠ দেওয়ার কথা শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রকটিত বা জীবন্ত তুলসীবৃক্ষ উপড়ে নিয়ে চিতায় দাহ করা কখনও বিধেয় নয়।

প্রশ্ন ৪। কখন কে দোল (রং) খেলেছিল?

উত্তর ঃ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপসখা ও গোপিকারা পবিত্র সুগন্ধি আবির খেলা খেলেছিলেন। ভগবান ও ভক্তের মধ্যে এরূপ আনন্দময় খেলা হয়। কিন্তু বর্তমান সমাজে এই খেলা বিকৃত রূপ নিয়েছে। আলকাতরা ও অন্য বাজে পদার্থ নিয়ে যুবক যুবতীদের মধ্যে একটা মজা করবার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বদ্ধ জীবের পক্ষে রং খেলা একটি নীতি বিগর্হিত খেলা। রাধাকৃষ্ণের মাধুর্যরসময় লীলাকে বদ্ধ জীবের কখনো অনুকরণ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ৫। অক্ষয় তৃতীয়া কি? চন্দন যাত্রা কি? এই উৎসবের তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ মৎস্য পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে, "ভগবান শ্রীহরি বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে যবের সৃষ্টি করেন এবং সত্য যুগের বিধান করেন। এই দিনে ভগবান পবিত্র-সলিলা সুরধনী গঙ্গাকে ব্রহ্মলোক থেকে এই ধরাধামে অবতরণ করিয়েছিলেন।" এই তিথি অক্ষয় তৃতীয়া নামে আখ্যাত। আরও বলা হয়েছে, "এই তিথিতে যব-হোম ও যব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ ব্যক্তিকে ঐ দিনে যব দান পূর্বক ভোজন করাতে হয়।"

পদ্ম পুরাণের বরাহ-পৃথিবী সংবাদে লিখিত আছে, "বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে সত্যযুগের উদয় হয় এবং সেই দিন থেকেই ত্রিবেদের প্রতিপাদ্য ধর্মের প্রবর্তন হয়েছে। এই তৃতীয়াতে গঙ্গাস্নান, বৈষ্ণবকে দান, ভগবানের পূজা, জপ, শ্রাদ্ধ ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি করলে অক্ষয় হয়। এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথি শ্রীহরির পরম প্রীতিকরী। যাঁরা এই তিথিতে সযত্নে যব দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করেন এবং যব-শ্রাদ্ধ ও যব দান করেন, তাঁরা ধন্যবাদার্হ ও বৈষ্ণব বলে পরিগণিত হন।"

উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে, শ্রীজগন্নাথদেব মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বৈশাখী শুক্লা অক্ষয় তৃতীয়াতে সুগন্ধি চন্দন দ্বারা জগন্নাথের অঙ্গে লেপন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেদিন থেকে চন্দন যাত্রা উৎসব শুরু হল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, বৃন্দাবনে পরম বৈষ্ণব শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে স্বপ্নে তাঁর আরাধ্য শ্রীগোপাল বলছেন, "আমার শরীরের তাপ জুড়াচ্ছে না। মলয় প্রদেশ থেকে চন্দন নিয়ে এসো এবং তা ঘষে আমার অঙ্গে লেপন কর, তা হলে তাপ জুড়াবে।" তার পর পূর্বভারতে বৃদ্ধ মাধবেন্দ্র পুরী নীলাচলে জগন্নাথ পুরীতে এসে সেবকদের কাছে মলয়জ চন্দন ও কর্পূর নিয়ে বৃন্দাবনে ফিরছিলেন। পথে রেমুণাতে শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে আসেন। সেই রাত্রে সেখানে শয়ন কালে স্বপ্ন দেখেন, গোপাল এসে বলছেন, "হে মাধবেন্দ্র পুরী, আমি ইতিমধ্যেই সমস্ত চন্দন ও কর্পূর গ্রহণ করেছি। এখন কর্পূর সহ

ঐ চন্দন ঘষে ঘষে শ্রীগোপীনাথের অঙ্গে লেপন কর। গোপীনাথ ও আমি অভিন্ন। গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লাগালেই আমার অঙ্গ শীতল হবে।"

গ্রীষ্ম ঋতুতে শ্রীহরির অঙ্গে কর্পূর চন্দন লেপন করলে ভগবান শ্রীহরি প্রীত হন।

প্রশ্ন ৬। শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত-উপবাসের মাহাত্ম্য কি?

উত্তর ঃ শ্রীবৃহৎ নারদীয় পুরাণে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব তাঁর পরম ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব জীবনের কথা বর্ণনা করছেন। "পুরাকালে অবন্তী নগরে সর্বজন প্রথিত বসুশর্মা নামে এক বেদবিচক্ষণ সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুশীলা নামে তাঁর নিরন্তর সদাচারিণী ও পতি-পরায়ণা পত্নী ছিলেন। সেই দম্পতির পাঁচ পুত্র ছিল। চারজন পুত্র বিদ্যায় বিচক্ষণ, সদাচারী ও ভক্তিমান ছিল। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রটি নিরন্তর বেশ্যাসঙ্গে, মদ নেশায় ও নানা পাপকর্মে লিপ্ত ছিল।

একদিন বনমধ্যে সেই কনিষ্ঠটির সঙ্গে তার এক বান্ধবীর তুমুল কলহ বাধে। সেইজন্য দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। মনোমালিন্যের জন্য তারা সারাদিন কিছু আহার করেনি। জল পানও হয়নি। উপবাস ও মনোমালিন্যে সারা রাত ঘুমও হয়নি। জীবনের বহু দিন নষ্ট হয়ে গেছে পাপ কর্মের মধ্যে, এই চিন্তায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন তারা মনে মনে ভগবানের স্মরণ করতে লাগল। ভাগ্যক্রমে সেই দিনটি ছিল আমার আবির্ভাবের দিন (শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী)। তাদের অজ্ঞাত সুকৃতি লাভ হল উপবাস ও রাত্রি জাগরণের জন্য।

হে প্রহ্লাদ, পূর্ব জন্মে তুমিই ছিলে সেই কনিষ্ঠ ব্যক্তি। তোমার সেই উচ্ছৃঙ্খলপূর্ণ জীবনে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে এই একটি মাত্র বহু পুণ্যপ্রদ ব্রত সম্পাদন করেছিলে। আর কোনও পুণ্য তোমার ছিল না।

হে প্রহ্লাদ, ব্রহ্মাও আমার ব্রত সাধন করে আমার প্রসাদে চরাচর বিশ্বের স্রষ্টা হয়েছেন। শিব, বহু দেবতা, ঋষি এবং মহামতি রাজারা এই বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশী ব্রত পালন করে তাঁদের সিদ্ধিলাভ করেছেন। আমার কৃপায় তুমি এই ভক্তজন্ম লাভ করেছ। হে প্রহ্লাদ, এই চতুর্দশীব্রত ত্রিভুবনে বিদিত। এই পাপহরণকারী ব্রত অনুষ্ঠান করলে শতকোটি কল্পে আর এই মৃত্যুময় সংসারে ফিরে আসতে হয় না। যারা ভবভয়ে ভীরু, তারা আমার প্রীতির উদ্দেশ্যে প্রতি বছর এই বৈশাখী চতুর্দশী ব্রতের অনুষ্ঠান করবে। আমার এই দিনটি জেনেও যদি কেউ অবজ্ঞায় লঙ্ঘন করে, তা হলে চন্দ্রসূর্যের স্থিতিকাল পর্যন্ত তাকে নরকবাস করতে হয়।"

প্রশ্ন ৭। অনেক সময় দেখা যায়, যেদিন একাদশী তিথি তার পরদিন অনেকে উপবাস ব্রত পালন করেন। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ বিশুদ্ধ একাদশী তিথিতে উপবাস কর্তব্য, তবে উপবাসের কতকগুলি বিধি রয়েছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বলা হয়েছে—একাদশী তিথির পরের দিন যদি মহাদ্বাদশীর উদয় হয়, তবে উপবাস দ্বাদশীর দিন করতে হবে। আটটি মহাদ্বাদশী রয়েছে। তার মধ্যে উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা ও পক্ষবর্ধিনী—এই চারটি মহাদ্বাদশী তিথি-ঘটিত

এবং জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী—এই চারটি মহাদ্বাদশী নক্ষত্র-ঘটিত। একাদশীর উপবাস ব্রত উক্ত মহাদ্বাদশীতে পালন করা উচিত এবং ত্রয়োদশীতে সময়মতো পারণ বা উপবাস-ভঙ্গ করা উচিত। মহাদ্বাদশীর উদয়হেতু উপবাস ব্রত একাদশী তিথির পরদিনই করতে হয়।

আবার, সাধারণত বিষ্ণুতত্ত্বের আবির্ভাবের দিন উপবাস ব্রত পালনীয়। কিন্তু, ব্যতিক্রম হচ্ছে এই যে, কোনও বিষ্ণু-তত্ত্বের—যেমন বামনদেব, বরাহদেব ইত্যাদি বিষ্ণুতত্ত্বের আবির্ভাব দ্বাদশী তিথিতে হয় এবং সেই দ্বাদশী যদি মহাদ্বাদশী না হয়, তবে পূর্বদিন একাদশী তিথিতেই বিষ্ণু-আবির্ভাবজনিত উপবাস ব্রত পালন করা উচিত; এবং আবির্ভাবের দিন পারণ, বিগ্রহ অর্চনাদি পালন, প্রসাদ গ্রহণ বিধেয়।

পুরাণাদি শাস্ত্রে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, কখনই দশমীযুক্তা একাদশীতে উপবাস করা উচিত নয়, একাদশীযুক্তা দ্বাদশীতে উপবাস করা কল্যাণকর। ভুলবশত দশমীযুক্তা একাদশীতে উপবাসী থাকার জন্য জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে বহু দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। এই কথা মহর্ষি বাল্মীকি উল্লেখ করেছেন।

কূর্ম পুরাণে লিখিত আছে, কখনই দশমী বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করবে না। একাদশীর বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটলে অথবা ত্র্যহস্পর্শ হলে কিংবা নানা বাক্যবিরোধে সংশয় উপস্থিত হলে দ্বাদশীতে উপবাস করে পরদিন পারণ কর্তব্য।

প্রশ্ন ৮। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয় কেন?

উত্তর ঃ "একটি দেহ ত্যাগ করার পর অন্য একটি দেহ লাভ হয়, কিন্তু কখনও কখনও কেউ যদি অত্যন্ত পাপী হয়, তা হলে সে অন্য আর একটি দেহে দেহান্তরিত হয় না—সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। মৃত ব্যক্তিকে প্রেত যোনি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।" (ভাঃ ৯/০/২৯ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

প্রশ্ন ৯। যে ব্যক্তি জীবনে কোনও ভাল কর্ম করেনি, তার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে গীতাপাঠ বা কীর্তন করা হলে সে কিভাবে পাপমুক্ত হবে?

উত্তর ঃ এই মনুষ্য দেহ ত্যাগকারী আত্মার শান্তিবিধানের উদ্দেশ্যেই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয়। বাস্তবিকই আমাদের জানতে হবে যে, ভগবদ্ভক্তের মুখে হরিনাম কীর্তন, হরিকথা শ্রবণ হচ্ছে অত্যন্ত মঙ্গলকর অনুষ্ঠান। শ্রবণ কীর্তনাদি পবিত্র মঙ্গল অনুষ্ঠান না করলে এই পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম-অনুষ্ঠান আছে—সবই বৃথা বলে জানতে হবে। মহাজন শ্রীভীষ্মদেব বলেছেন—'হরিকথা শ্রবণ ও হরিলীলা কীর্তন সমগ্র বেদের সারাতিসার।' তাই ভগবদ্ কথা , গীতা-ভাগবত পাঠ বা কীর্তন করা হলে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গলের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। যে ব্যক্তি মারা গেল, সে নিজে যদিও জীবনে কোন ভাল কর্ম করেনি, তবুও তার শান্তির উদ্দেশ্যে মঙ্গল অনুষ্ঠান করাই তাঁর বংশধরদের কর্তব্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই যে, যারা শ্রাদ্ধবাসরে মাছ, কচ্ছপ, সাপ, ছাগল কিংবা ভেড়াকে বধ করে হাড়-মাংসের ঝোল খাচ্ছে এবং প্রেতাত্মাকে নিবেদন করছে, তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাতে অমঙ্গল ছাড়া কোনও মঙ্গল নেই।

প্রশ্ন ১০। শ্রাবণ মাসে শাক খেতে নেই কেন?

উত্তর ঃ পুরাণের কথা—শ্রাবণ মাসে শ্রীব্রহ্মা শাকের মধ্যে অবস্থান করেন। শাক খেলে ব্রহ্মার চরণে অপরাধ হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রেও বলা হয়েছে, এই সময় শাক আমাদের শরীরে রোগ বৃদ্ধিকারক।

প্রশ্ন ১১। চাতুর্মাস্যের কোন্ মাসে কি দ্রব্য ভক্ষণ করতে নেই এবং কেন, জানাবেন।

উত্তর ঃ *শ্রাবণে বর্জয়েৎ শাকং, দধি ভাদ্রপদে তথা।*
দুগ্ধম্ আশ্বযুজে মাসি, কার্তিকে চামিষং ত্যজেৎ ॥

এই কথা স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে—শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দই, আশ্বিন মাসে দুধ এবং কার্তিক মাসে আমিষ বা অড়হর আদি ডাল বর্জন করতে হয়। কোনও শাস্ত্রে বলা হয়েছে, সেই সেই মাসে শাকের মধ্যে ব্রহ্মা, দইতে শিব, দুধে বিষ্ণু অধিষ্ঠান করেন। সেই সব ভোজন করলে তাঁদের চরণে অপরাধ ফলে ভক্তি নষ্ট হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ওই সময়ে রোগজীবাণু বেশি ছড়ায়, ফলে শ্রাবণে শাকভক্ষণে বেশি বদহজম হয়, কার্তিকে কলাই, খেসারী ডাল শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। অবৈষ্ণবদের প্রিয় খাদ্য মাছ আদিতে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েডের জীবাণু সঞ্চারিত হয়।

প্রশ্ন ১২। বাড়িতে অশৌচ হলে (মৃত্যু কারণে) জপমালাতে জপ করা যাবে কি? সেই সময়ে স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য বাড়িতে না থাকলে গৃহদেবতার ভোগ-আরতি সেবা কিভাবে চলবে? ঐ সময়ে কি করা হবে?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবের অশৌচ অবস্থা বিচার্য নয়। জপমালায় অবশ্যই রোজ হরিনাম করতেই হবে। কৃষ্ণভক্তগণ জানেন যে, সংসারটি শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণ গৃহে অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীকৃষ্ণকে আপনি কখনও বলতে পারেন না যে, হে গোপাল, আমার দাদু মারা গেছে বা অন্য কেউ মারা গেছে অতএব আজ থেকে কিছুদিনের জন্য তুমি নিরম্বু অনাহারে থাকো, এবং তোমার সেবা বন্ধ থাক্। কোনও গৃহস্থ তাঁর কোনও পুত্র বা স্বামী বা অন্য কাউকেও এরূপ বলতে পারেন না।

কেউ মারা গেলে মৃতদেহের সৎকার করে ফেলতে হবে। প্রতিদিনের মতোই সেবা পূজা করে চলতেও হবে। যারা কর্মকাণ্ডীয় তারা নানাবিধ তামসিক শাস্ত্রবিধির ছলছুতো দেখাতেই পারে। কিন্তু কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ সেই ছলছুতোর অধীনে আসেন না। মহাপ্রভুর গণ শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের পত্নী মারা গেল, তারপর শিশুপুত্রও মারা গেল। সেই শোকে তিনি তাঁর গৃহে অধিষ্ঠিত গোপীনাথের সেবাপূজাও বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু গোপীনাথ তাঁকে বলেন, 'তোমার একটি পুত্র মারা গেল, আর সেই

জন্য তোমার অন্য এক জীবন্ত পুত্রকেও না খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও কি? তবে কেন তুমি আমাকে দেখছ না?' সেই রাধাগোপীনাথ বিগ্রহ বর্ধমানের অগ্রদ্বীপে এখনও বিদ্যমান।

প্রশ্ন ১৩। মলমাস কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে মাসে দুইটি অমাবস্যা হয় এবং রবিসংক্রান্তি ঘটে না, সেই মাসকে মলমাস বলে। ব্রজধামে এই মাসকে পুরুষোত্তম মাস বলা হয়।

প্রশ্ন ১৪। দেশের নানা জায়গায় চব্বিশ প্রহর নামযজ্ঞ হচ্ছে। ইসকন ভক্তরা সেরকম অনুষ্ঠান করেন না কেন?

উত্তর ঃ ক্ষেত্র বিশেষে নামযজ্ঞ হয়ে থাকে। শ্রীমায়াপুরে অখণ্ড হরিনাম যজ্ঞ বহু বছর ধরে চলে আসছে। কেবল ২৪ প্রহর কেন, অনবরত এটি চলতেই থাকবে যতদিন এখানে ভক্তরা থাকবে।

প্রশ্ন ১৫। আমরা সর্ব কর্মতেই চন্দন ব্যবহার করি। ঠাকুরের চরণে চন্দন অর্পণ করি। সর্বক্ষেত্রেই চন্দন কেন ব্যবহার করি?

উত্তর ঃ সর্ব কর্মতেই কিংবা সর্বক্ষেত্রেই নিশ্চয়ই চন্দন ব্যবহার করা হয় না। স্কন্দ পুরাণে শ্রীব্রহ্মা নারদমুনিকে বলছেন, "শঙ্খে চন্দন নিয়ে শ্রীহরির অঙ্গে লেপন করলে শ্রীহরি পরম সন্তোষ অনুভব করে থাকেন।" গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রত্যহ শ্রীহরিচরণে তুলসীপত্র সঙ্গে চন্দন লেপন করলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন ১৬। একাদশীতে উপবাস থেকে যদি কেউ ঘুমায়, তবে তার কি একাদশী ফল নষ্ট হয়?

উত্তর ঃ হরিভক্তিবিলাসে উল্লেখ আছে, ব্রত উপবাস দিনে কেউ যদি বারে বারে জলপান করে, তাম্বুল (পান) খায়, দিবাভাগে ঘুমায়, মৈথুন কর্মে যুক্ত থাকে তা হলে এই কর্মগুলি ব্রত দূষিত করে। ফলে ব্রত-উপবাস করার ফল নষ্ট হয়ে যায়।

একাদশীর উপবাস সার্থক হয় তখনই যখন শ্রীহরির নাম জপ, শ্রীহরি-কথা চিন্তন, হরিকথা শ্রবণ ও কীর্তনাদিতে দিন অতিবাহিত হয়।

প্রশ্ন ১৭। কার্তিক ব্রত না করলে কি ক্ষতি হয়?

উত্তর ঃ *বিষ্ণোঃ পূজা কথা বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ-দর্শনে।*
ন ভবেৎ কার্তিকে যস্য হন্তি পুণ্যং দশাব্দিকম্ ॥

'যার পক্ষে কার্তিক মাসে বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুকথা ও বৈষ্ণবদের দর্শন না ঘটে, তার দশ বছরের অর্জিত পুণ্য বিনষ্ট হয়।'

প্রশ্ন ১৮। একাদশী ব্রত-উপবাসের দিন অন্ন ভোজন করলে কি দোষ হয়?

উত্তর ঃ স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে—

মাতৃহাঃ পিতৃহাশ্চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহাস্তথা।
একাদশ্যান্ত যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ ॥

"একাদশী ব্রতে অন্ন ভোজন করলে মাতা পিতা ভ্রাতা ও গুরু হত্যা পাপ হয়। তাই অন্নভোজনকারী ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করতে সক্ষম হয় না।"

প্রশ্ন ১৯। মাঘী পূর্ণিমাতে প্রয়াগ তীর্থে স্নান করবার জন্য প্রচুর লোকের ভীড় হয় কেন?

উত্তর ঃ পুরাকালে মহর্ষি গৌতমকে অঙ্গিরা ঋষি বলেছিলেন, প্রয়াগ তীর্থে মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে ৩ কোটি ১০ সহস্র তীর্থের সমাবেশ ঘটে। যে ব্যক্তি পবিত্র চিত্তে এই দিনে এখানে স্নান করবেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গগতি লাভ করবেন। (মহাভারত অনুশাসন ২৫) তাই সর্বপাপ মুক্ত হওয়ার সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রচুর লোকের ভীড় হয়।

প্রশ্ন ২০। রাম-রাবণের যুদ্ধ বছরের কোন্ সময়ে সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ শোনা যায় মাঘ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া থেকে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী পর্যন্ত রাম-রাবণের যুদ্ধ চলেছিল।

প্রশ্ন ২১। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা কেন অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর ঃ প্রথম মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্র শ্রীস্বায়ম্ভুব মনু এক সময় পৃথিবীতে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করবার অভিলাষে একটি মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেই যজ্ঞ প্রভাবে শ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাব। সেই দিনটি ছিল জৈষ্ঠ্যমাসের পূর্ণিমা তিথি। এইজন্য এইদিনকে বলা হয় শ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাব তিথি। শ্রীজগন্নাথদেব স্বায়ম্ভুব মনুকে বলেছিলেন, "হে বৎস, তোমার কল্যাণ হোক, তোমরা সবাই মিলে পবিত্র জলে আমাকে স্নান করাও। তাতে তোমাদের মন-প্রাণ শুদ্ধ হবে, তোমাদের সদ্ অভিলাষ পূর্ণ হবে।"

ভগবানের নির্দেশমতো ঐ দিবসে সুসজ্জিত স্নানবেদিতে শ্রীজগন্নাথকে আনয়ন করে মহাসমারোহে স্নান অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। মহান ভক্ত শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ এই বিধানে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব করতেন। ভক্তিকামী জনগণ নিজহাতে প্রভুকে পবিত্র জলে স্নান করিয়ে সুকৃতি সঞ্চয় করে থাকেন।

প্রশ্ন ২২। রাখী পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীরাধামাধবকে রাখী পরানো হয় কেন?

উত্তর ঃ শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীভাগুরী ঋষি নন্দভবনে বালক কৃষ্ণের মঙ্গল কামনা করে তাঁর সুরক্ষার উদ্দেশ্যে হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। ভাগুরী ঋষির পত্নী আবার রাধারাণীর হাতেও রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি হিসাবে শ্রীশ্রীরাধামাধবের হাতে এই দিনে রাখী পরানো হয়।

প্রশ্ন ২৩। ঊর্জাব্রত বিধি কি কি?

উত্তর ঃ দামোদর মাসে বা কার্তিক মাসে কায়িক, মানসিক ও পারমার্থিক কল্যাণ সাধনের জন্য ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা ঊর্জাব্রত বা কার্তিকব্রত পালন করেন।

মাষকলাই ডাল, বরবটী, সিম, বেগুন গ্রহণ করা উচিত নয়। হরিনাম গ্রহণ এবং ভক্তির যে সব ক্রিয়া পালন করবার সঙ্কল্প থাকে, সেই নিয়ম পালনে ব্যতিক্রম যেন

না হয়। সাধারণতঃ নিয়মটি হল, হবিষ্য-অন্ন শ্রীভগবানকে নিবেদন করে সেই প্রসাদ গ্রহণ করা। অধিক নিদ্রা, আলস্য ও অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহারগুলি পরিহার করতে হবে। ক্ষৌরকর্ম বর্জন। নিত্যস্নান প্রভৃতি সংযমীর ধর্ম সর্বতোভাবে পালন করা।

প্রশ্ন ২৪। অষ্টপ্রহর বা চব্বিশ প্রহর নামকীর্তনের পর দধিমঙ্গল করা হয়। এই দধিমঙ্গল নিয়মটি কখন থেকে এবং কেন করা হয়?

উত্তর ঃ শিশুপুত্র কৃষ্ণের জন্মের পরদিন পিতা শ্রীনন্দমহারাজ আনন্দ উৎসব আয়োজন করেছিলেন। সমস্ত অতিথিবর্গকে যথোচিত দান-দক্ষিণা প্রদান, ভোজন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, কীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। জয়ধ্বনি, মঙ্গলধ্বনি, হরি ধ্বনি উঠতে লাগল। শিশুপুত্রের মঙ্গল কামনা করেই পিতা এ সমস্ত বিশাল অনুষ্ঠান করেছিলেন। অনেকে মহোল্লাসে চাকাচাকা দধিতে ভরা অনেক দধিপাত্র এনে সেই ভীড়ের মাঝে দধি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সমগ্র উৎসব প্রাঙ্গণ, আনন্দময় লোকদের চেহারা নতুনরূপ ধারণ করে উৎসবটিকে আরও বেশি আনন্দময় করে তুলেছিল। গোকুলবাসীরা শিশু কৃষ্ণের মঙ্গল অনুষ্ঠানে এসে দধি নিক্ষেপ করে আনন্দ পেয়েছিলেন বলে এই অনুষ্ঠানকে দধিমঙ্গল বলা হয়।

বর্তমান মানুষ গোজাতির মর্যাদা রাখতেই ঠিক পারে না। তাই সর্বত্র ছড়াবার মতো চাকা চাকা দই পাবে কোথায়? হরিকীর্তন অনুষ্ঠানে কোথাও কোথাও দেখা যায় একটি হাঁড়িতে কিছু দুধ বা দইজল নিয়ে আমপাতা চুবিয়ে সেই ভেজা পাতাটি ধরে উপস্থিত জনগণের মাতায় জল ছড়িয়ে দেয় মাত্র।

প্রশ্ন ২৫। নীলাচলপুরীধামে শারদ উৎসবের এক নির্দিষ্ট দিনে মাঝরাতে গোপনে বিমলাদেবীর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে মেষ বলি দেওয়া হয় কেন?

উত্তর ঃ বিমলাদেবী শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ সেবন করেন। তিনি হচ্ছেন দুর্গা। জগন্নাথের ভক্তের কাছে তিনি যোগমায়ারূপে এবং অভক্তের কাছে মহামায়া রূপে প্রকাশিতা। তামসিক উপাসকেরা সেই বিমলাদেবীকে উগ্ররূপা জ্ঞানে সারা বছরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দিনে সবার অলক্ষ্যে দেবীকে উগ্রতারা রূপে সাজিয়ে পাঁঠা বলি দিয়ে থাকে। চক্রবেড়ের কোনও দ্বার দিয়েও তারা প্রবেশ করতে পারে না। কেবলমাত্র পশ্চিম প্রাচীরের একটি সুড়ঙ্গ পথে গোপনে আমিষ প্রবেশ করিয়েই সেই পথে বের হয়ে যায়। তারপর মন্দিরের সবকিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়। পিশাচ সুলভ তামসিক তান্ত্রিক রক্ত-মাংসখেকো অভক্ত বামুনেরা এভাবে মহামায়া উগ্রতারার উপাসনা করে নিজেদের তামসিক প্রথাটিকে বজায় রাখার অনুমোদন পেয়ে এসেছে। বিমলাদেবী ও মহাদেব শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদে প্রীত হলেও তাঁদের পিশাচ ও রাক্ষস শ্রেণীর অনুচর অনুচরীরা রক্তমাংসে ভক্ষণের বিশেষ প্রথা ভিত্তিক কৌশল ছাড়তে পারে না। এই শ্রেণীর মানুষদের জন্য বিশাল বিশাল কসাইখানা খুলে গ্রাহকারী হারে মাংস সংগ্রহ করার পরিবর্তে এভাবে নির্দিষ্ট দিনে বলি পদ্ধতিতে মাংস খাওয়ার প্রথা তান্ত্রিক শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ২৬। দুর্গাপূজা সারা দেশে এত বড় উৎসব কেন?

উত্তর ঃ ভগবতী দুর্গার প্রতি সেটি ছিল ভগবানের আশীর্বাদ। যশোদার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করা, দেবকীর গর্ভস্থ অনন্তদেবকে আকর্ষণ করে রোহিণীতে স্থাপন করা, কংসকে বিভ্রান্ত করা, এ সমস্তই ভগবানের নির্দেশে তিনি সম্পাদন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, জগতের ভোগাকাঙ্ক্ষী মানুষদের জড়বাসনা পূর্ণ করতে তোমার ক্ষমতা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানুষেরা পশুবলি দিয়ে এবং বিভিন্ন রকমের উপকরণ দিয়ে মহা সমারোহে তোমার পূজা করবে। পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে লোকেরা তোমার দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈসানী, শারদা, অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করবে। (ভাগবত ১০/২/১০-১২) যারা পারমার্থিক উন্নতিতে আগ্রহী নয়, কেবল এই জগতে জড় সুখভোগের প্রতি আগ্রহশীল, তারা মায়াদেবীর পূজা করে। সেই মায়াদেবী বারাণসীতে দুর্গা, অবন্তীতে ভদ্রকালী, উৎকলে বিজয়া, কোলাপুরে বৈষ্ণবী, মুম্বাইতে অম্বিকা, কামরূপে চণ্ডিকা, উত্তরভারতে শারদা, কন্যাকুমারিকায় কন্যকা—এভাবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পূজিতা হচ্ছেন।

প্রশ্ন ২৭। ভগবান রামচন্দ্র কেন দুর্গাপূজা করেছিলেন?

উত্তর ঃ মূল রামায়ণে কোথাও শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কথার উল্লেখই নেই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজশাহী জেলার তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের সভাকবি ছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। তিনিই বাংলা পয়ারে রামায়ণের অল্পকিছু বর্ণনা দিয়েই তাতে দুর্গাপূজা বিষয়টিও যুক্ত করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন ২৮। মলমাসে আমাদের কি করা উচিত?

উত্তর ঃ বেশী করে হরিনাম জপ ও কীর্তন করা উচিত।

প্রশ্ন ২৯। আত্মীয় স্বজনদের কাছে গয়াধামে যেতে বাধা আসছে, তারা বলছেন, যাদের পূর্বপুরুষেরা গয়াধাম দর্শন করেনি, তাঁদের বংশের কেউ গয়া যাওয়া ঠিক নয়। এই রকম কথা কি যুক্তিযুক্ত?

উত্তর ঃ এ কথার কোনও যুক্তি নেই। গয়াধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃপিণ্ড দানস্থলী শ্রীবিষ্ণুপাদ চিহ্ন, সীতাদেবীর শ্বশুর দশরথের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানস্থলী ইত্যাদি দর্শন করলে পিতৃপুরুষেরা সুখী বৈ অসুখী হন না।

প্রশ্ন ৩০। গাভী প্রসবের পর একুশ দিন না পার হলে সেই গাভীর দুধ এনে পূজাকর্মে ব্যবহার করা বা সেই দুধ গ্রহণ করা যেতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ প্রসবের পর গাভীর থেকে যে দুধ ক্ষরিত হয়, সেই গাঢ় দুধকে শালদুধ বলা হয়। সেই দুধে কোলস্ট্রাম নামক হলুদ বর্ণের পদার্থ থাকে। প্রকৃতিগত কারণে সেই দুধ কেবল বাছুরের পক্ষে উপযুক্ত। মানুষের পক্ষে নয়, এবং কেবল বাছুরের পুষ্টি সাধনের জন্য ঐ দুধ নির্ধারিত। সাধারণত চৌদ্দদিন এই নিয়ম পালন করা ভাল। তারপর গাভী পূজা করে দুধ দোহন করে ভগবৎ উদ্দেশ্যে অর্পণ করাই বিহিত হয়।

প্রশ্ন ৩১। যমরাজকে তার বোন যমুনা কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়াতে ভাইফোঁটা দিয়েছিলেন। কৃষ্ণলীলায় এরকম কোনও ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান আছে কি?

উত্তর ঃ যমুনার একটি স্থান কালীয়দহ নামে পরিচিত। সেখানে কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়ায় সকালবেলায় শ্রীমতী রাধারাণী সহ অন্যান্য গোপীরা স্নান করছিলেন। রাধারাণী শুনলেন সেদিন ভাইফোঁটা উৎসব। কৃষ্ণের জ্যাঠামশাই উপানন্দের কন্যা সুনন্দা সেদিন কৃষ্ণ ও বলরামকে সুন্দর করে সাজিয়ে তাদের ললাটে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে নানাবিধ মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়েছেন। কৃষ্ণ-বলরামও বোন সুনন্দাকে নতুন বস্ত্র ও অলংকার দান করেছেন। একথা শুনে রাধারাণীও তাঁর দাদা শ্রীদামকে চন্দন ফোঁটা দিয়ে, মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়ে প্রণাম করলেন এবং শ্রীদাম বোন রাধাকে বস্ত্র অলংকার নিবেদন করলেন। এভাবে ব্রজের সমস্ত বোনেরা ভাইদের কপালে ফোঁটা দিতে লাগল।

প্রশ্ন ৩২। একাদশী কিভাবে পালন করতে হবে?

উত্তর ঃ একাদশী ব্রত দিনে ভোরে উঠে শুচি শুদ্ধ হয়ে শ্রীহরির কাছে প্রার্থনা করতে হবে, 'হে কৃষ্ণ, আজ এই একাদশী ব্রত যাতে শুদ্ধভাবে পালন করতে পারি, তুমি কৃপা করো।'

মঙ্গল আরতি, বন্দনা, পূজা, ভোগ নিবেদন, গীতা-ভাগবত পাঠ আলোচনা, বেশী করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ, আরতি, কীর্তন করতে হবে। নির্জলা উপবাস থাকলে ভাল। না পারলে কেবল জল পান, তাও না পারলে ফল, দুধ প্রসাদ গ্রহণ করা যাবে, কিংবা পেঁপে আলু কাঁচকলা, ঘি দিয়ে রান্না, বাদাম সেদ্ধ ভাজা, ভোজন করা যাবে। কিন্তু কোনও শস্য দানা আহার করা চলবে না। চাল, আটা, ছোলা, বা ডাল জাতীয়, সরষে তেল ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাত্রি জাগরণ করে হরিবাসরে হরিকথা আলোচনা গান কীর্তন করে অতিবাহিত করা কর্তব্য। গায়ে তেল মাখা উচিত নয়, সাবান দেওয়াও নয়। ইন্দ্রিয় সংযম ও আত্মসমীক্ষা, আত্মসংশোধন ও কৃষ্ণভক্তি বর্ধনের জন্য ভগবানের একাদশী তিথিরূপে প্রকাশিত দিনটি নির্ধারিত হয়। পরদিন একটি নির্দিষ্ট পারণ সময় থাকে সেই সময়ের মধ্যে শ্রীহরির পূজার পর শস্যজাতীয় কোন প্রসাদ সবাই মিলে গ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্ন ৩৩। দীক্ষা নেওয়ার পর বৈষ্ণবমতে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করতে এবং আত্মীয়দের বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে নিরামিষ আহার করতে পারব কি?

উত্তর ঃ দেবদেবীকে পরম বৈষ্ণব-রূপে দর্শন করে কৃষ্ণপ্রসাদ নিবেদন করবেন, এবং পূজা অনুষ্ঠানের পর আপনি সেই কৃষ্ণপ্রসাদই আহার করবেন।

প্রশ্ন ৩৪। আমিষভোজী পুরোহিত কি সার্বজনীন মহোৎসবে রাধাকৃষ্ণ বা গৌরনিতাই বিগ্রহ স্থাপনাদি করতে পারে?

উত্তর ঃ না, আমিষভোজীরা ভগবদ্ বিগ্রহ স্থাপনের আদৌ অধিকারী নয়।

প্রশ্ন ৩৫। প্রসাদভোজী বৈষ্ণবের দেহত্যাগের পর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান কতদিনে করতে হয়?

উত্তর ঃ সাধারণত এগারো দিনের দিন মহাপ্রসাদ দ্বারা পরলোকগত বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করতে হয়। বিশেষত বৈষ্ণবগণ হরিনাম গ্রহণ ফলে নিত্য শুচি হয়ে যে কোনও দিন মহাপ্রসাদ দিয়ে শ্রাদ্ধ করতে পারেন। তা-ই বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ।

প্রশ্ন ৩৬। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে যে প্রেত-অন্ন দেওয়া হয় তা কি সেই বিদেহী আত্মা গ্রহণ করে?

উত্তর ঃ আমাদের সমাজে যে ভাবে মানুষ 'প্রেত-অন্ন' দেয়, ওটা অত্যন্ত বিপজ্জনক বললেই চলে। বিদেহী আত্মার শান্তি লাভ বা মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয়। শ্রীহরির মহাপ্রসাদ নিয়ে গঙ্গায় অথবা নিজের গ্রামের পুকুরে কিংবা জল্য জায়গায় গঙ্গাকে আগে নিবেদন করা হয়, তারপর বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হয়। তাতে বিদেহী আত্মার অবশ্যই মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু লোকে শ্রাদ্ধের দিন নানাবিধ মাছমাংসাদি অপ্রসাদ সাজিয়ে জঙ্গলে বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে তাতে বিদেহী আত্মার মঙ্গল তো দূরের কথা, বরং মলমূত্র ভোগ করবার জন্য তার নরকগতি হয়। তাই বিগত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের মঙ্গলের জন্য সনিষ্ঠ হরিভজনের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন ৩৭। গীতা অধ্যয়ন করে জানতে পারলাম আমি আমার দেহ নই। আমি আত্মা। আত্মার দেহান্তর হয়। তাহলে আমরা পারলৌকিক ক্রিয়া কেন করি, কার জন্য করি?

উত্তর ঃ পরলোকগত জীবাত্মার মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করা হয়। কর্মদোষে যে ব্যক্তি পরজন্মে দুর্গতি দুর্দশা ভোগ করতে থাকে সেই ব্যক্তির বংশধর তার মঙ্গল বিধানের জন্য শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেন, যাতে পরলোক গত জীবাত্মার সদ্‌গতি হয়। যে ব্যক্তির বংশধর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে না তাদের পরলোকগত ব্যক্তির শান্তি লাভ হয় না। কর্ম বিপাকে পরলোকে সেই ব্যক্তি অগত্যা দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে—

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্ ।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসীবিমিশ্রাণা-
কল্পকোটিং পিতর সুতৃপ্তাঃ ॥

"শ্রাদ্ধদিনে ভক্তিসহকারে শ্রীহরির মহাপ্রসাদ এবং তুলসী মিশ্রিত পিণ্ড পিতৃ বা দেবগণকে অর্পণ করলে পিতৃগণ কোটিকল্প পর্যন্ত সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করেন।"

পরলোকগত ব্যক্তির পরজীবনে যাতে সদ্‌গতি হয়, মঙ্গল হয় সেই উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা হয়। আর তাঁর শ্রাদ্ধ করলে ইহ লোকের বংশধর পবিত্র হয়। রামায়ণে ৭৬ সর্গে বলা হয়েছে, "ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত হয়ে রাজা দশরথকে চিতা মধ্যে স্থাপন করে

জলন্ত আগুনে আহুতি দিয়ে তাঁর পারলৌকিক শুদ্ধির উদ্দেশ্যে মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। ...দশাহ অতীত হলে ভরত শ্রাদ্ধ করে পবিত্র হলেন এবং দ্বাদশাহে দ্বিতীয় মাসিক প্রভৃতি সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান করে পিতার পারলৌকিক ফল আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণদেরকে ধনরত্ন, ভোজ্য, গো, বসন দান করলেন।"

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন বনবাসী হয়ে চিত্রকূটে ছিলেন তখন পিতার পরলোক গমনের সংবাদ শুনলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র পিতৃদেবের মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্যে দক্ষিণমুখ হয়ে মন্দাকিনী নদীতে নেমে অঞ্জলিতে জল নিয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলেছিলেন, "হে পিতা! আপনি পিতৃলোকে গিয়েছেন। এখন আমার দেওয়া এই নির্মল জল আপনাকে তৃপ্ত করুক।" অর্থাৎ, পরলোকগত পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে কেউ যদি ইহলোক থেকে কিছু অর্পণ করে তাতে পিতৃদেবের তৃপ্তি হয়। সেইজন্য 'শ্রাদ্ধশান্তি' কথাটি বেশি প্রচলিত। শ্রাদ্ধ করলে পরলোকে জীবাত্মার শান্তি হয়। তারপর শ্রীরামচন্দ্র ভাইদের সঙ্গে নদীতীরে উঠে এসে কুশঘাসের আসন পাতিয়ে বনের ফল বদরী ও ইঙ্গুদি কুলের পিণ্ড রেখে দুঃখিত মনে রোদন করতে করতে বললেন, "পিতা! আপনি প্রীত হয়ে এই পিণ্ড ভোজন করুন। আমরা এখন বনবাসী হয়ে এই বস্তুই ভোজন করি।" এই কথা রামায়ণে ১০৩ সর্গে বলা হয়েছে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বলা হয়েছে শ্রাদ্ধদিনে শ্রীহরির মহাপ্রসাদ অর্পণ করে অনুষ্ঠান করবেন। শ্রীহরির উচ্ছিষ্ট অন্ন অর্পণ করলে পিতৃগণ কোটি কল্প যাবৎ তৃপ্তি লাভ করেন।

স্কন্দপুরাণের পুরুষোত্তম খণ্ডে বলা হয়েছে, যে সকল ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ভক্তি সহকারে শ্রীহরির অর্চনা করেন, তাঁদের পক্ষে গয়া শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বহু বহু পিণ্ড দান করারও প্রয়োজন নেই।

ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করেন, শ্রীহরি স্বয়ং এবং পিতৃগণেরও সেই গৃহে অন্নসেবন হয়ে যায়।

অতএব, জীবাত্মা কর্মফলে যে দেহ লাভ করুক না কেন, এমন কি নরক যাতনা ভোগ করুক না কেন তাঁর সদ্‌গতির উদ্দেশ্যেই পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান কর্তব্য।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

যো ন দদ্যাদ্ হরেভুক্তং পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্মণি ।
অশ্নন্তি পিতরস্তস্য বিন্মূত্রং সততং দ্বিজাঃ ॥

অর্থাৎ, "হে দ্বিজগণ, যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্যে শ্রীহরির উচ্ছিষ্ট প্রদান করে না, তার পিতৃপুরুষেরা সর্বদা বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করে থাকে।"

কিন্তু বর্তমান সমাজে মানুষ শ্রাদ্ধকর্মে শ্রীহরির মহাপ্রসাদ নিবেদন করা তো দূরের কথা, মাছ-মাংসাদি সহ অপবিত্র অন্ন শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে নিবেদন করে থাকে। এতে পিতৃপুরুষের এবং বংশধরদের অমঙ্গলই সাধিত হয়।

প্রশ্ন ৩৮। বসন্তকালে হোলি উৎসব কি? হোলির তাৎপর্য কি? কেন আবীর অন্যের গায়ে ছিটানো হয়? শ্রীকৃষ্ণ কেন এইরূপ উৎসব করলেন?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিবর্গের সঙ্গে আনন্দ কৌতুক করবার জন্য হোলাহুলি বা হোলি উৎসব করেছিলেন। ভগবান এবং তাঁর পার্ষদগণ সর্বদা আনন্দময় লীলাবিলাসে রয়েছেন। এইরূপ কথা স্মরণ করে যে-কোন মানুষ ভগবানের সেই অপ্রাকৃত জগতের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, তাঁর লীলাবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। যেহেতু আমরা সকলে আনন্দ চাই, প্রমোদ চাই, কিন্তু আমাদের মতো বদ্ধজীবের আমোদ-প্রমোদ কৃষ্ণ-বহির্মুখ বা কৃষ্ণসেবানন্দ-বিমুখ হওয়ার ফলে সেই আমোদ প্রমোদ হারিয়ে যায় কালের স্রোতে। ভগবানের সঙ্গে যে আমোদ প্রমোদ, তা নিত্যধামে নিত্যই চলছে। কেবলমাত্র ভৌম বৃন্দাবন বিলাসে বসন্তকালে হোলি উৎসব প্রকাশমান হয়েছিল বলে লোকে সেই দিনক্ষণ স্মরণে হোলি বা রং খেলার দিন হিসেবে ধার্য করেছে।

তাই এইসব উৎসবের তাৎপর্য হচ্ছে, যেন তেন প্রকারেন কৃষ্ণভজনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, কৃষ্ণসেবা তথা কৃষ্ণভাবনামৃতে আকৃষ্ট হওয়ার শিক্ষা লাভ করা।

আমাদের পরিবারটি কৃষ্ণের সংসার। কৃষ্ণচরণে আবীর দিয়ে আমরা তাঁর প্রসাদী পবিত্র আবীর মস্তকে ধারণ করি। ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের গায়ে আবীর নিক্ষেপ করতেন। সেই খেলাটি ভগবানের সঙ্গে ভক্তের। কিন্তু আমরা যেভাবে যার তার গায়ে রং নিক্ষেপ করে যে মজা করে চলি ওটা কারও আনন্দের উদ্রেক করে না, কেবল ভয়ের উদ্রেক করে। রঙের ভয়ে লোকে বাইরে বেরোতে চায় না। যদি বেরোতে হয় তখন আজেবাজে ময়লা কাপড় পরে বেরোয়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে লোকের বিরক্তিজনক রং খেলা হয় না। যদি কারও শখ থাকে তবে শুদ্ধ আবীর শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে ভক্তিভরে নিবেদন করতে পারে মাত্র।

প্রশ্ন ৩৯। একাদশী ব্রত পালনের মাহাত্ম্য কি? বিধি নিষেধ কি? ব্রত পালন না করলে কি দোষ? নির্জলা উপবাসে ফল কি?

উত্তর ঃ একাদশী ব্রত পালনে ভগবান শ্রীহরি ব্রতকারীর প্রতি প্রীত হন। বহু জন্মের পুঞ্জীভূত পাপরাশি ভস্মীভূত হয়। জীবের অন্তিমকালে বৈকুণ্ঠধামে গতি লাভ হয়।

একাদশী বিধি হল ভোরে উঠে শুচিশুদ্ধ হয়ে শ্রীহরির পূজা বন্দনা, হরিনাম পরায়ণ হয়ে হরিকথা কীর্তন, আরতি ইত্যাদিতে যুক্ত থেকে, আহারাদি ক্রিয়াকর্ম সংকুচিত করে রাত্রে হরিবাসর করে হরিকথা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ গীত জপ মাধ্যমে অতিবাহিত করে পরদিন হরিপূজার পর ভগবানের প্রসাদ পারণ সময়ে গ্রহণ করতে হয়। একাদশী তিথিতে নিষিদ্ধ হল,—শস্যজাতীয় কোনও প্রকার খাদ্য গ্রহণ, সরিষাদি তেল মর্দন, সাবান মাখা, ইত্যাদি কর্ম বর্জন করতে হবে। বেশি কথা, ঘুমানো ইত্যাদি চলবে না। অতিরিক্ত পরিশ্রম বাদ দিতে হবে।

একাদশী ব্রত পালন না করলে, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, গো হত্যা, ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি নানা বিধ পাপরাশি লাভ হয়। নরক গতি হয়। নিজে শুধু নয় পিতৃগণসহ নরকগামী হতে হয়। এ সব কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। হরিপ্রিয়া একাদশী

তিথি লঙ্ঘন করলে হরিকৃপা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। একাদশীর কৃপায় বহুজন্মের পাপফলচক্র থেকে উদ্ধার পাওয়ার সুযোগ থাকে, একাদশী ব্রতহীনতার ফলে সেই সুযোগ হারিয়ে যায়। একাদশীকে ভক্তিজননী বলা হয়। এই তিথি পালনে কৃষ্ণভক্তি হয়।

যাঁরা নিরম্বু উপবাস থেকে একাদশী ব্রত পালন হরিবাসর করেন তাঁদের ইহলোক পরলোক ধন্য। তাঁদের অপ্রাপ্য কিছুই নেই। তাঁরা অনায়াসে বৈকুণ্ঠ ধাম লাভ করেন।

প্রশ্ন ৪০। এক প্রকার গোষ্ঠী একাদশীর দিনে নির্জলা ব্রত আর রাতে আমিষ ভোজনাদি করে, কেউবা পিঠেপুলি ভোজন করে। তার কি ফল?

উত্তর ঃ একাদশী লঙ্ঘনে বিরুদ্ধ ফল লাভ হয়। একাদশী ব্রতের বিরুদ্ধাচরণ হেতু নানাবিধ দুর্ভাগ্যজনক নারকীয় ফল সঞ্চিত হয়। সুযোগ বুঝে সেই গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের সাবধান করে দেওয়া আপনার কর্তব্য।

প্রশ্ন ৪১। একাদশীর দিনে শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন ভোগ দেওয়া হয় কেন? কেবল অনুকল্প ভোগ দিলে ক্ষতি কি? শ্রীকৃষ্ণ পাপপুণ্যের উর্ধ্বে হলেও মা যশোদা অনেক নিয়ম, মন্ত্রাদি করে কৃষ্ণকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতেন।

উত্তর ঃ ভগবানকে একাদশী কিংবা অন্য সব দিনেই অন্ন-ব্যঞ্জন ফলমূল ভোগ নিবেদন করার বিধি রয়েছে। সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তিরা একাদশীতে কেবল একাদশী ভোগ নিবেদন করে থাকেন। তাতেও ক্ষতি বা অসুবিধা নেই।

বালক নিমাই একাদশীর দিন জগদীশ পণ্ডিতের বাড়ীতে বিষ্ণুযজ্ঞে অন্নভোজনের জন্যে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করেন। তখন বিষ্ণুযজ্ঞ সম্পাদনের পূর্বেই বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রান্না করা অন্নব্যঞ্জন জগদীশ পণ্ডিত নিমাইকে প্রীতিভরে ভোজন করাতে লাগলেন। কারণ তিনি জেনেছিলেন যে, নিমাই স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু। এভাবে ভগবান একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ৪২। পুরুষোত্তম মাসে মৌনব্রত পালনের কোনও নিয়ম আছে কিনা?

উত্তর ঃ মৌনব্রত বলতে কারও সঙ্গে কোন কথা না বলে চুপচাপ বোবার মতো থাকাকে বোঝায় না। অন্যান্য গ্রাম্য বিষয় বার্তা বর্জন করে বেশি সংখ্যক হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে বলা হয়েছে। তাতে ভগবান পুরুষোত্তম প্রসন্ন হন।

প্রশ্ন ৪৩। বহুলাষ্টমী কি?

উত্তর ঃ কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি 'বহুলাষ্টমী' নামে পরিচিত। এই তিথিতে ব্রজে উৎপাত-সৃষ্টিকারী বৃষরূপী অরিষ্টাসুরকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেন। শ্রীরাধারাণী বৃষবধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সর্বতীর্থে স্নান করা উচিত বলে জ্ঞাপন করে শ্রীকৃষ্ণ বামচরণের গোড়ালীর আঘাতে এক কুণ্ড প্রকাশ করেন। তা শ্যামকুণ্ড নামে বিদিত। মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ নিজ নিজ রূপ ধারণ করে এই স্থানে আগমন করেন। ক্ষীরসমুদ্র, লবণ সমুদ্র, পুষ্কর, প্রয়াগ ইত্যাদি বহু তীর্থ এসে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাই এই তিথিকে বহুলাষ্টমী বলা হয়।

প্রশ্ন ৪৪। একাদশী করতে করতে মাঝে মাঝে যদি কোন কোনও একাদশী ব্রত না করা হয় তবে তার ফল কি হবে?

উত্তর ঃ একাদশী ব্রত ফলে পর্বতপ্রমাণ পাপরাশি নষ্ট হয়। যে যে একাদশীব্রত পালন করা হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে নতুন করে অসংখ্য পাপরাশি যুক্ত হয়।

প্রশ্ন ৪৫। একাদশী ব্রত পালন করলে কি লাভ হয়? না করলে কি অপরাধ হয়?

উত্তর ঃ নারদীয় পুরাণে বলা হয়েছে—

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা সমানি চ ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে ॥

"হরিবাসর বা একাদশী সমাগত হলে ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ অন্ন শস্য মধ্যে অবস্থান করে, সেই জন্যে ঐ দিন অন্ন শস্যাদি আহার করলে যাবতীয় পাপও গ্রহণ করা হয়ে থাকে।"

তাই একাদশীতে মঙ্গলাকাঙক্ষী ব্যক্তিরা শস্য জাতীয় খাবার গ্রহণ করেন না।

স্কন্দ পুরাণে পার্বতীদেবীকে মহাদেব বলছেন, 'একাদশীতে যে মানুষ অন্ন ভক্ষণ করে যমদূতেরা তার মুখে তপ্ত লোহার অস্ত্র নিক্ষেপের ব্যবস্থা করে রাখে।'

একাদশী ব্রত পালন করলে জীবন প্রবাহের মধ্যে সংঘটিত অসংখ্য জানা-অজানা পাপকর্মের ফল ক্ষয় হয়ে যায় এবং ভগবান শ্রীহরি যিনি স্বয়ং একাদশী তিথি রূপে প্রকাশিত হয়েছেন তিনি ব্রতকারীর প্রতি প্রীত হন।

প্রশ্ন ৪৬। শ্রীশ্রীরাধামাধব কোন্ দিন কি রঙের পোশাক পরিধান করেন?

উত্তর ঃ সাধারণত রবিবারে লাল, সোনালী কিংবা চুনী রঙের। সোমবারে সাদা, রূপালী বা মুক্তা রঙের। মঙ্গলবারে লাল, গোলাপী বা প্রবাল রঙের। বুধবারে সবুজ বা পান্না রঙের। বৃহস্পতিবারে হলুদ, কমলা কিংবা পীতাভ নীলা রঙের। শুক্রবারে সাদা, রূপালী, যে কোনও রঙের কিংবা বহুবর্ণ, কিংবা হীরার রঙের। শনিবারে নীল, বেগুনী, কালো কিংবা নীলাভ নীলা রঙের পোশাক পরানো হয়। একাদশীতে লাল কিংবা গোলাপী রঙের। পূর্ণিমাতে সাদা কিংবা রূপালী রঙের। অমাবস্যাতে কালো কিংবা নীল রঙের পোশাক শ্রীশ্রীরাধামাধবকে পরানো হয়।

প্রশ্ন ৪৭। ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব চর্তুদশী ব্রত পালন করলে সর্ববিঘ্ন নাশ হয় এবং দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়। আমি ও আমার স্বামী সারাদিন নিরম্বু উপবাস, রাত্রি জাগরণ করেছিলাম। গভীর রাতে কোনও রকম সাড়া না দিয়েই আমার স্বামী দেহ রাখেন। ব্রত ফলে যদি বিঘ্ন নাশ ও আয়ু বৃদ্ধি হয়, তবে আমার স্বামীর আয়ু কোথায় গেল এবং আমার মঙ্গল কিসে হল?

উত্তর ঃ এই জড় জগতে জন্ম নিলে অবশ্যই মৃত্যু আসবে। অনেকে রোগে কষ্ট পেয়ে, অপঘাতে, শোকে প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থায় দেহ ত্যাগ করে। কিন্তু ভগবানের

ব্রত সাধন করতে করতে দেহ ত্যাগ করেন কারা, যাঁরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমাদের জীবনে কখন কি বিঘ্ন আছে—তা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না, বা বুঝতে পারছি না। বিঘ্ন গ্রস্ত হলে তবেই তো আমরা বুঝতে পারি—"হায়, আমার কি দশা হল।" তার আগে তো বিঘ্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা হয় না। চলন্ত ট্রেনের যাত্রীরূপে দুর্ভাগ্য বশত ট্রেন দুর্ঘটনায় কারও হাত পা কেটে গেল। তখন সে দেখতে পায় তার বিঘ্নটার রূপ। এও তো হয়, অনেক দুর্ঘটনা ছিল, অনেকবার ট্রেনে চড়া হয়েছে, কিন্তু সেই অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনাগুলি ঘটেনি। তখন তো আমরা ভুলেও চিন্তা করব না যে, আমরা আজ দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়েছি। কেননা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালেই আমরা দুর্দৈব থেকে রক্ষা পেয়েছি। হরিনাম জপ, ভগবৎ কথা শ্রবণ, সাধু সেবা, শ্রীবিগ্রহ পূজা, আরতি দর্শন, বার ব্রত উদ্‌যাপনের ফলে আমরা দুর্দৈব থেকে রক্ষা পাই। এটি মিথ্যা নয়।

আপনার স্বামী নৃসিংহ-চতুর্দশী ব্রত পালন করেই দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর সমস্ত বিঘ্ন দূর হয়েছে এবং তাঁর দীর্ঘ আয়ু কেন, তিনি অনন্ত আয়ু গ্রহণ করে বৈকুণ্ঠে পরমানন্দে বিরাজ করছেন। এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে নানাবিধ উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে থেকে আয়ুবৃদ্ধিতে কাজ কি, বৈকুণ্ঠ জগতে নিত্য জীবনে ফিরে যাওয়াই তো কর্তব্য।

যে কোনও ভক্তই কামনা করেন, ভগবৎ চিন্তা করতে করতে, ভগবৎ ব্রত সাধন করতে করতে এই জড় জাগতিক অন্য সমস্ত চিন্তা বাদ দিয়ে সরাসরি বৈকুণ্ঠ জগতে চলে যেতে। অনেকে কামনা করলেও সেই ভাগ্য হয় না, অথচ আপনার স্বামীর সেই ভাগ্য অনায়াসে লাভ হয়েছে। অতএব তাঁর সহধর্মিণী রূপে আপনারও কর্তব্য এই কুণ্ঠাময় জগতে বেশি চিন্তা না করে ভগবৎ পাদপদ্মে মতি স্থির রাখা।

প্রশ্ন ৪৮। 'বৈষ্ণবেরা ভূত-প্রেত-পিশাচের শ্রাদ্ধ করেন না'—এ কথার তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ বৈষ্ণবেরা পিতৃপুরুষদের জন্য যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের দিন শ্রীহরির মহাপ্রসাদ পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। মহাপ্রসাদ-নির্মাল্য দ্বারা পিতৃপুরুষদের আত্মার পরিতৃপ্তি সাধিত হয়।

অবৈষ্ণব বা অভক্তরা ভূত-প্রেত-পিশাচদের উপভোগ্য আমিষ দ্রব্য তাদের পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে থাকে। সেক্ষেত্রে পিতৃদের ভূত-প্রেত রূপে জ্ঞান করা হয়, যার জন্য বনজঙ্গলের মধ্যে রাত্রিবেলায় মাছ-মাংসাদি অপবিত্র বস্তু সাজিয়ে রেখে পালিয়ে আসা হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যো ন দদ্যাদ্ হরের্ভুক্তং পিতৃনাং শ্রাদ্ধকর্মানি ।
অশ্নন্তি পিতৃরস্তস্য বিণ্মূত্রং সততং দ্বিজাঃ ॥

"হে দ্বিজগণ, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্যে ভগবান শ্রীহরির মহাপ্রসাদ যে ব্যক্তি নিবেদন করে না, তার পিতৃপুরুষেরা সর্বদা মলমূত্র ভোগ করে থাকে।" (পদ্মপুরাণ)

শ্রীমদ্ভাগবতেও (৭/১৫/৭) বলা হয়েছে—*ন দদ্যাদ্ আমিষং শ্রাদ্ধে*, "শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে কখনও মাছ-মাংসাদি নিবেদন করবেন না।"

বৈষ্ণবেরা নিত্যকৃষ্ণদাস জ্ঞানে জীবাত্মার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে গঙ্গাতে মহাপ্রসাদ পিণ্ড নিবেদন পূর্বক শ্রাদ্ধ করেন। নরক প্রাপক অমেধ্য মাছ-মাংসাদি দিয়ে প্রেতশ্রাদ্ধ করেন না।

প্রশ্ন ৪৯। বাড়িতে আত্মীয়দের মধ্যে কেউ মারা গেলে কমপক্ষে তেরোদিন শ্রীবিগ্রহের পূজা বন্ধ করে রাখতে হবে। কেন?

উত্তর ঃ বৈষ্ণবীয় মতে কেউ গৃহস্থ হোক কিংবা গৃহত্যাগী হোক, তার অশৌচ বা শোক নেই। নিত্য শ্রীহরির সেবা-পূজা করলেই পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি সমাধা হয়ে যায়, আলাদা শ্রাদ্ধ তর্পণ করতে হয় না। তবে লোক ব্যবহারের জন্য গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা হরিনাম গ্রহণের জন্য নিত্য শুচি হয়ে যে কোনও দিন শ্রাদ্ধ করতে পারেন। হরিনামাশ্রিত ভক্তরা প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবেন। স্মার্তদের মতো তাদের শোকচিহ্ন ধারণ বা কাঁচা হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করতে হবে না। গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীভগবৎ বিগ্রহের নিত্য পূজা বিধেয়। যেইদিন কোনও অজুহাতে পূজা বন্ধ থাকে, সেইদিনই অশুভ ও অশুচি বলে পরিগণিত হয়।

প্রশ্ন ৫০। পুষ্যাভিষেক উৎসব কি?

উত্তর ঃ বিশেষত নীলাচলপুরী ধামে পৌষমাসের পূর্ণিমা তিথিতে একশো আটটি তামার কলসীভর্তি গব্য ঘৃত দিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে স্নান করানো হয়। এই অনুষ্ঠানকে পুষ্যাভিষেক বলা হয়। অভিষেক অনুষ্ঠানের পর জগন্নাথকে রাজবেশে সজ্জিত করানো হয়। এইদিন জগন্নাথকে ঘি-ভাত, মুগডাল, ননী মিশ্রি সরবৎ, পিঠা ও পায়সান্নাদি ভোগ নিবেদন করা হয়।

১৮
চরিত্র পরিচিতি

প্রশ্ন ১। শ্রীরামচন্দ্র কি পাপ করেছিলেন যার জন্য তাঁর ১৪ বছর বনবাস করতে হল? আর এই ১৪ বছরের বদলে ১২ বা ১৫/১৬ বছর হল না কেন? এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন ভগবান। তাঁর কার্যকলাপ দিব্য। *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং* (গীঃ ৪/৯)। দিব্যকর্ম পাপ ও পুণ্যের অতীত। অতএব বনে বাস করাটা তাঁর কোনও পাপকর্মের ফলই নয়। চৌদ্দ বছর কিংবা কোটি কোটি কল্প ভগবানের কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কারণ ভগবান কালাতীত। কাল ভগবানেরই অধীন। কালবদ্ধ জড় জগতের জীবের পক্ষে চৌদ্দ বছর কিংবা ষোল সতের বছর বনে বাস করাটা দুঃসহ ব্যাপার, কিন্তু ভগবানের কাছে তা অতি নগণ্য ব্যাপার মাত্র। আসলে চৌদ্দ বছরে ভগবান রামচন্দ্র বনের মধ্যে প্রতিদিন নিত্য নতুন লীলা করে চলেছিলেন। মুনি-ঋষিদের দর্শন ও কৃপাদৃষ্টি দান, যে সমস্ত রাক্ষসরা মুনি-ঋষিদের যজ্ঞাদি কর্মে বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল এবং ভক্তদের উপর অত্যাচার করছিল তাদের নিধন, যে সকল দেশের রাজা-রাজড়ারা অন্যায় ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে রাজ্য পরিচালনা করছিল তাদের উচ্ছেদ ও ধর্ম প্রতিষ্ঠা, ভয়ংকর পরাক্রমশালী অত্যাচারী রাবণকে সবংশে নাশ করা ইত্যাদি লীলা করতে জড় জাগতিক হিসাবে প্রায় চৌদ্দ বছর সময় লেগে গিয়েছিল।

প্রশ্ন ২। গীতায় (১৪/৪) শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বীজপ্রদানকারী পিতা বলেছেন, আবার অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে (১১/৩৯) প্রপিতামহ বলছেন। এর সমাধান কি?

উত্তর ঃ সমস্ত জীবের জীবত্ব বা প্রাণসত্তা বা মূল বীজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দান করেছেন, তাই তিনি সর্বজীবের বীজ প্রদানকারী পিতা।

আবার জীবদেহ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে পরমেশ্বর ভগবানের পুত্ররূপে গণনা করা হয়। ভগবানের নাভিপদ্ম থেকেই ব্রহ্মার জন্ম। ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীস্বায়ম্ভুব মনু। সেই মনু থেকে মানবজাতির সৃষ্টি। মনুকে মানবজাতির পিতা বলা হয়। সেই হিসাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রপিতামহ বলা যায়।

প্রশ্ন ৩। কালী ও কৃষ্ণ যদি এক না হন, তবে কালীসাধক হয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কি করে হলেন?

উত্তর ঃ সাধক সর্বদা সাধকই থাকেন। কালীসাধক তো দূরের কথা, কোনও সাধক কখনও সাধ্য বা ভগবান হয়ে যান না। সাধনা করে জড় ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হওয়া যায়, কিন্তু কখনও ভগবান হওয়া যায় না। অনেকে মনে করে, সাধনা করতে করতে ভগবান হয়ে যাব। যেমন, অসুর হিরণ্যকশিপু নিজেকে ভগবান বলে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের সকলের কাছেই জাহির করেছিল। অনেকে ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হতে চায়, যেটা ভগবানের ভক্তরা কখনই তা চায় না। বকাসুর, অঘাসুর, ধেনুকাসুর,

কংস, শিশুপাল, নরকাসুর, কেশীদৈত্য এরা সবাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করেই সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয়েছিল। অতএব সেই গতিলাভের জন্য সাধনা করার কোনও অর্থই হয় না। বৈদিক প্রামাণ্য সূত্র ব্যতিরেকে কাউকে ভগবান বলা অত্যন্ত মূর্খামি।

প্রশ্ন ৪। শিবকে মহেশ্বর বলা হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে সর্বলোক মহেশ্বর বলা হয়েছে। তবে শিব আর কৃষ্ণ এক হবেন না কেন?

উত্তর ঃ ভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মহাজন বলা হয়; সুদের মাধ্যমে টাকা ঋণ যে দেয়, তাকেও মহাজন বলা হয়। আবার অনেক লোক যেখানে একত্রিত হয়েছে এরূপ বোঝাতেও মহাজন কথাটি ব্যবহার করা হয়। তাই বলে সবই এক, এরকম মনে করা জ্ঞানী ব্যক্তির কখনই উচিত নয়। মহেশ্বর শিব হচ্ছেন সর্বলোক-মহেশ্বর পরমেশ্বর ভগবানের উপাসক বা সেবক এবং পরম বৈষ্ণব। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩৩) সর্বারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *শিব-বিরিঞ্চি-নুতম্* অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা ব্রহ্মা ও শিবের দ্বারা পূজিত হন।

প্রশ্ন ৫। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কোন্ তারিখে ও তিথিতে এবং কিবারে জন্ম গ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ তিনি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা নবমী মঙ্গলবার, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর পরের দিন শ্রীনন্দোৎসবের দিনে কলকাতায় পরম বৈষ্ণব শ্রীগৌরমোহন দে ও নিষ্ঠাপরায়ণা শ্রীমতী রজনীদেবীর গৃহে আবির্ভূত হন।

প্রশ্ন ৬। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্পাঘাতে মারা গেলেন কেন?

উত্তর ঃ ভুল কথা। কখনই শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী সর্পাঘাতে দেহত্যাগ করেননি। যখন শ্রীনিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা লীলার খাতিরে পূর্ববঙ্গের লোকদের হরিনাম দান করে ভগবদ্ভক্তির প্রচার করছিলেন, সেই সময় বহুদিন নবদ্বীপে গৃহে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী পতিবিরহে অত্যন্ত কাতর হন। তিনি শচীমাতার নিরন্তর সেবা করতেন ও পতিবিরহ-বেদনায় মৌন থাকতেন এবং আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করেছিলেন। ভগবদ্‌পাদপদ্ম-সেবাপরায়ণা লক্ষ্মীদেবী সেই বিরহ সহ্য করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণনা রয়েছে—

> ঈশ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারে সহিতে।
> ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে॥
> নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থুই পৃথিবীতে।
> চলিলেন প্রভুপাশে অতি অলক্ষিতে॥

(চৈ. ভা. আ. ১৪/১০৩-১০৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বলা হয়েছে—

> প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
> বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল॥

(চৈ. চ. আ. ১৬/২১)

সর্পদংশনে যেরূপ বিষের যন্ত্রণা হয়, সেইরূপ প্রভুর বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণপদ্ম ধ্যান করতে করতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী জগতের লীলা সাঙ্গ করে নিত্য বৈকুণ্ঠে নিত্যপতির সেবায় নিযুক্ত হলেন।

প্রশ্ন ৭। উপনিষদে নচিকেতা যমরাজের বাড়িতে গিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করলেন। তারপর নচিকেতা পিতৃ আবাসে ফিরে এসে সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান সবাইকে দান করলেন। তাঁর পক্ষে আত্মতত্ত্বজ্ঞান দান করা কিভাবে সম্ভব?

উত্তর ঃ নচিকেতার পক্ষে যদি যমের বাড়িতে গিয়ে পুনরায় পিতৃগৃহে ফিরে আসা সম্ভব হয়, তা হলে তাঁর পক্ষে আত্মজ্ঞান দান করা কেনই-বা সম্ভব হবে না? যমরাজ মহা ভাগবত। তাঁর কাছে শিষ্য নচিকেতা যে জ্ঞান লাভ করলেন সেই জ্ঞান অবশ্যই অন্যকে তিনি দিতে পারেন। *এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং*—'পরম্পরা ধারায় এই জ্ঞান লাভ করা যায়' (গীতা)।

প্রশ্ন ৮। শ্রীমদ্ভাগবতে রাধারাণীর নাম নেই কেন?

উত্তর ঃ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের দেহত্যাগ অবধি তাঁকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অনর্গলভাবে সাতদিন ধরে মধুর ভাগবত-অমৃত দানের সংকল্প করেছিলেন। ভক্তচূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখে যদি অতি উচ্চ ও গুহ্য সেই রাধাতত্ত্ব প্রকাশিত হত, তবে তিনি আর শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করতে সম্পূর্ণ বিকল হতেন। কারণ, রাধা নাম ও রাধাভাবের কথাতে তাঁর মধ্যে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে তিনি সযত্নে সেই রাধাতত্ত্বকথা এড়িয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ৯। দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হওয়ার তাৎপর্য কি? পঞ্চস্বামীর প্রতি দ্রৌপদীর ভাব-ভাবনার স্বরূপই বা কেমন ছিল?

উত্তর ঃ মহা সতী দ্রৌপদী এক অসাধারণ কন্যা। তিনি রাজা দ্রুপদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অগ্নি থেকে আবির্ভূতা হয়ে, দ্রুপদ রাজার কন্যারূপে পরিচিতা হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মহর্ষিগণের আশীর্বাদধন্যা। শ্রীব্রহ্মার ইচ্ছায় এবং শ্রীশিবের বরে তিনি সৎ-আচরণশীল ও ধর্মনিষ্ঠাপরায়ণ পঞ্চস্বামী লাভ করেছিলেন। তিনি অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্না এবং পতিদের প্রতি সমভাবাপন্ন ছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিনি ছিলেন পরম ভক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও দেখা যায়, রাজা প্রাচীন বর্হিষতের দশজন পুত্র, যাঁরা প্রচেতা নামে পরিচিত, তাঁরা সমুদ্রের তলদেশে দশহাজার বছর ধরে ভগবানের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁদের সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, শ্রীকণ্ডু মুনির

মারিশা নামে অত্যন্ত গুণবতী কমলনয়না অপূর্ব সুন্দরী কন্যাটিকে বিবাহ করতে। ভগবান সেই রাজপুত্রদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তোমরা সকল সক্ষশীল, ও আমার অত্যন্ত অনুগত ভক্ত, আর সেই কন্যাটিও তোমাদের সকলের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করার ফলে, ধর্মে ও চরিত্রে তোমাদেরই অনুরূপ।'

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, "বৈদিক নিয়ম অনুসারে, একজন পুরুষ যদিও বহু স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে কিন্তু স্ত্রীর একাধিক পতি থাকতে পারে না। কিন্তু কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে একাধিক পতি গ্রহণ করতে দেখা গেছে। দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবকে বিবাহ করেছিলেন। কোনও কোনও বিশেষ কন্যাকে সেরূপ অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যদি তিনি সমস্ত পতিদের সমানভাবে সেবা করতে পারেন। সাধারণ স্ত্রীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। যাঁরা বিশেষভাবে গুণান্বিতা, তাঁদেরই কেবল একাধিক পতিকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদ ও নির্দেশে সবই সম্ভব। এই কলিযুগে এই প্রকার সমদর্শী কন্যা বিরল। তাই শাস্ত্রের মতে *কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ।* এই যুগে দেবরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।" (ভাঃ ৪/৩০/১৬ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

প্রশ্ন ১০। মহাত্মা ভীষ্মদেব কেন অধর্মাচারী দুর্যোধনের পক্ষ হয়ে ধর্মাচারী পাণ্ডবদের বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ যার অন্নে পালিত হতে হয়, যার কাছে অর্থ নিতে হয়, তার পক্ষেই থাকতে হয়। এটি হল স্বাভাবিক রীতি। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে তথা তার পুত্র দুর্যোধনের পক্ষে সেই অনুসারে ভীষ্মদেব ছিলেন। ভীষ্মদেব ছিলেন সত্য প্রতিজ্ঞ। যখন দুর্যোধন ভীষ্মদেবের পদপ্রান্তে প্রার্থনা করলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মদেবকে তার পক্ষে থেকে যুদ্ধ করতে হবে, তখন তিনি বলেছিলেন, 'বৎস দুর্যোধন, আমি তোমার পক্ষেই যুদ্ধ করব। কিন্তু পাণ্ডুর পাঁচপুত্রকে আমি বধ করব না।'

যখন যুধিষ্ঠির একসময় ভীষ্মদেবের কাছে প্রণতি নিবেদন করে নিজের যুদ্ধ জয় প্রার্থনা করলেন, তখন ভীষ্মদেব প্রীতমনে আশীর্বাদ করলেন, 'হে যুধিষ্ঠির, তোমারই জয় হবে। আমি এই আশীর্বাদ করি। দুর্যোধনেরা অর্থ দিয়ে আমাকে বশীভূত করেছে, তাই তাদের পক্ষ হয়ে আমি যুদ্ধ করব। কিন্তু অন্য কিছু তোমার অভীষ্ট কি আছে আমার কাছে চাও।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'পিতামহ আপনি অপরাজেয়, আপনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে আমার বিরুদ্ধ পক্ষে থেকে যুদ্ধ করলে আমি আপনাকে কিভাবে পরাজয় করব, তা বলুন।'

ভীষ্মদেব বলেছিলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ উদ্যত কোন নারী বা নপুংসককে দেখলেই আমি অস্ত্রধারণ করব না, একমাত্র সেই কালে আমাকে শরজালে বিদ্ধ করে পরাস্ত করতে পারবে।' এভাবে মহাত্মা ভীষ্মদেব সর্বদা পাণ্ডবদের আশীর্বাদ দান করেছেন।

প্রশ্ন ১১। তুলসী দেবী বলতে তুলসী গাছকে বোঝানো হচ্ছে, না অন্য কেউ আছেন?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীমতী তুলসী মহারানী এই জগতে লীলাবিলাসকালে বৃক্ষরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। যেমন শ্রীনারায়ণ শালগ্রাম শিলারূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। গঙ্গাদেবী নদীরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা এই জগতে এইভাবে বিরাজিত থাকলেও নিত্য বৈকুণ্ঠে নিত্য স্বরূপে নিত্য বিরাজমান। যেমন, পরমেশ্বর ভগবান সেই সচ্চিদানন্দময় পরম ধাম শ্রীগোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিদ্যমান। কিন্তু এই জগতেও তিনি বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, "কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।" শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে—

> 'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
> তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ'॥
> দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
> জীবের ধর্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'॥

অর্থাৎ, "ভগবানের দিব্য নাম, তাঁর শ্রীবিগ্রহ এবং তাঁর স্বরূপ এক এবং অভিন্ন। এই তিনে কোন ভেদ নেই। এই তিনই চিদানন্দরূপ। জীবের যেমন নাম, তার দেহ এবং স্বরূপে পার্থক্য রয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে দেহ এবং দেহীর মধ্যে, অথবা নাম এবং নামীর মধ্যে সেই রকম পার্থক্য নেই।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭/১৩১-১৩২)

শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দুই ভাই শুভাগমন করেছিলেন। দুই ভাইকে পরম আদরে ভক্ত গৌরীদাস সেবাযত্ন করলেন এবং প্রার্থনা করলেন, তাঁরা দুইজনে যেন তাঁর গৃহে সর্বদা বাস করেন। 'আমার এই গৃহ ছেড়ে তোমরা কোনদিন কোথাও যেও না।' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, 'ঠিক আছে আমরা থাকলাম। তবে আমাদের এই যে দুই বিগ্রহ তুমি রেখেছ, তাদের সর্বদাই পূজা কর'। এই বলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু চলে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু গৌরীদাস পণ্ডিত তাঁদের পায়ে ধরে মিনতি করলেন 'না না, বিগ্রহ নয়, তোমরা দুজনে থাকো।' এই বলে কাঁদতে লাগলেন।

তখন গৌর-নিতাই বললেন, 'তবে আমরাই থাকলাম, তখন তাঁরাই বিগ্রহরূপ ধারণ করলেন, আর দুই বিগ্রহ গৌর নিতাইরূপে চলে যাচ্ছেন। এরূপ দৃশ্য দেখে গৌরীদাস পণ্ডিত বুঝতেই পারছেন না যে, কে গৌর-নিতাই, আর কে বিগ্রহ? এখন কাকে রাখবেন আর কাকে ছাড়বেন?

এইভাবে কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রমাণ করেছিলেন যে, স্বরূপ আর বিগ্রহ অর্থাৎ, তিনি স্বয়ং এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহের মধ্যে পার্থক্য নেই। শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের সেবিত শ্রীশ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহ এখনও বর্ধমানের অম্বিকা কালনায় রয়েছেন। শ্রীবৃন্দাবন থেকে হেঁটে আসা শ্রীবিগ্রহ সাক্ষীগোপাল তাঁর ভক্তের সঙ্গে লীলাবিলাস

করেছিলেন। সুতরাং, যদি এইভাবে প্রশ্ন করা হয় যে, কৃষ্ণ কেউ আছেন, না কি বিগ্রহই কৃষ্ণ? উত্তর হল কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণবিগ্রহ অভেদ।

তেমনই, চিন্ময় বৃক্ষরূপে তুলসীকে, নদীরূপে গঙ্গাকে স্বরূপ জ্ঞানে পূজা করা, শ্রদ্ধা ও প্রণাম করা উচিত। যুগপৎ তাঁরা চিৎবৈকুণ্ঠ ধামে নিত্য বিরাজিতা আছেন এবং ভগবানের নানাবিধ সেবাযত্ন করে চলেছেন। আমাদের জড় ইন্দ্রিয় দিয়ে জড় বুদ্ধির মাধ্যমে এই ভেদাভেদতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। *'ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ'।* (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/২৩৪)

প্রশ্ন ১২। শ্রীমতী রাধারাণীর যে সমস্ত মঞ্জরী ছিলেন, তাঁদের ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর ঃ তাঁরা সর্বান্তঃকরণে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করতেন। কুঞ্জ সাজানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণকে মনের মতো করে সাজানো, দিনরাত প্রতিনিয়ত তাঁরা চিন্তা করতেন কিভাবে শ্রীরাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করা যায়। প্রত্যেকেই তাঁদের প্রধানা সখীর নির্দেশ অনুসারে সুনিপুণভাবে পরিচালিত হতেন। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণগান কৃষ্ণমহিমা কীর্তন ছাড়া তাঁরা আজেবাজে গ্রাম্যকথা, আধুনিক গান এবং মরণশীল কোনও ব্যক্তির মহিমা কীর্তন করতেন না। শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবানিষ্ঠায় তাঁরা এমন মগ্ন থাকতেন যে, বাইরের জগতের কোনও কিছুর প্রতি তাঁদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

প্রশ্ন ১৩। শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রং কালো না শ্যামবর্ণ?

উত্তর ঃ জড়জাগতিক কোনও বস্তুকে সহজে সাদা বা কালো বলে যেরূপ তার বর্ণের বর্ণনা করা যায়, সেরূপ চিন্ময় বস্তুকে সহজে বর্ণনা করা যায় না। অপ্রাকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে সাদা এবং কালো অভিন্ন, কোন ভেদ নেই। যদিও বা প্রাকৃত বস্তুতে সাদা এবং কালো দুটোই পৃথক বর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের বর্ণ কালো বললেও ঠিক হবে না, শ্যামল বললেও ঠিক হবে না। তবে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ কৃপা করে তাঁর অঙ্গের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের দেওয়া বর্ণনা থেকে আমরা লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গমাধুরী চিন্তা করতে পারি। যেমন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের বর্ণ প্রসঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—*ইন্দ্রনীলমণিমঞ্জুলবর্ণ* অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির মতো অতি মনোহর তাঁর বর্ণ। ইন্দ্রনীল বলতে সবুজ রঙের উজ্জ্বল একপ্রকার মূল্যবান পাথর বিশেষ বা মরকত বোঝায়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—*অম্বুদাঞ্জনেন্দ্রনীলনিন্দি-কান্তি*-ডম্বরঃ অর্থাৎ, তাঁর শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্যের বাহার কাজল কালো মেঘ এবং ইন্দ্রনীলমণিকেও নিন্দা করে।

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী লিখেছেন—অভিনব জলধর সুন্দর অর্থাৎ, অভিনব জলপূর্ণ মেঘের মতো সুন্দর। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর লিখেছেন—শ্রীমুখসুন্দরবর, হেমনীলকান্তিধর, ভাবভূষণ, করু শোভা। তাঁর অঙ্গকান্তি হেমনীল। আবার কখনও

লিখেছেন—জলদ-সুন্দর-কান্তি, মধুর মধুর ভাতি, বৈদগধি-অবধি সুবেশ। মনোহর দীপ্তিময়, জলভরা মেঘের মতো সুন্দর কান্তি।

প্রশ্ন ১৪। শ্রীমতী তুলসীদেবী একজন মহান ভক্ত; তাঁর বৃক্ষরূপধারণ করার কাহিনীটির পেছনে অভিশাপের তাৎপর্যের কি ব্যাখ্যা?

উত্তর ঃ বদ্ধ জীবেরা যেরূপ অপরাধের ফলে প্রভাবশালী মহান ব্যক্তিদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে অধঃপতিত হয় বা নরকগতি লাভ করে, চিন্ময় লীলাবিলাসের ক্ষেত্রে অভিশাপ সেরূপ শোচনীয় কিছু নয়। তা একটি মধুর লীলা মাত্র। চিন্ময় রাজ্যে অভিশাপ এবং আশীর্বাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। দ্বন্দ্বভাব বা বৈপরীত্য কেবল জড়জাগতিক বিষয়েই আরোপ করা হয়।

বদ্ধ জীবকে জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্র থেকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে অহৈতুকী কৃপাবশত ভগবান এবং তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁদের এই অদ্ভুত লীলা আমাদের মতো বদ্ধ জীবদের কৃপা করবার জন্যই। নদীরূপে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি, বিগ্রহরূপে, শালগ্রামরূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণু, বৃক্ষরূপে তুলসীদেবী এই মর্ত্যে প্রকটিত হয়েছেন যাতে আমরা তাঁদের অতি সহজ সরল পদ্ধতিতে পূজা, আরাধনা, প্রণতি নিবেদন, স্পর্শ, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারি এবং ভক্তি অনুশীলনের ফলে তাঁদের কৃপায় আমরা এই জন্ম-মৃত্যুর ভবসংসার অতিক্রম করে দিব্য পরমানন্দময় ভগবদ্ ধামে উন্নীত হতে পারি।

প্রশ্ন ১৫। ভগবানের মা বাবা কে?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবানের মা বাবার প্রয়োজন নেই। কারণ ভগবান থেকেই সবাই উৎপত্তি। *অহং সর্বস্য প্রভবঃ।* ভগবানই স্বয়ং সবার মা-বাবা। তিনি জগতে লীলাবিলাসের ছলে তাঁর প্রিয় ভক্তদের অনেক সময় মাতা-পিতা রূপে গ্রহণ করেন মাত্র।

প্রশ্ন ১৬। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কাহিনী অনুসারে রাধারাণীকে মা বলা হয় না। তা কি ঠিক?

উত্তর ঃ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শিক্ষা অনুসারে রাধারাণীকে ব্রহ্মাণ্ডজননী বা ব্রহ্মাণ্ডের মাতা বলা হয়।

প্রশ্ন ৭৬। 'ইসকন' মানে কি?

উত্তর ঃ ইসকন কথাটি একটি সংক্ষিপ্ত নাম। ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর্ কৃষ্ণ কনসাসনেস [International Society for Krishna Consciousness] বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ। কনসাসনেস কথাটিকে সংক্ষেপে কন [Con] এবং আগের কথাগুলির প্রথম অক্ষর [ISK] এভাবে 'ইসকন' ISKCON নামটি শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন ১৭। ইসকন কোনও ষড়যন্ত্র নয় তো?

উত্তর ঃ 'নয় তো', 'হয় তো' করে সন্দিগ্ধ চিত্তে থাকার দরকার নেই। গোয়েন্দাগিরি করুন। দেখতেই পাবেন, আমাদের অন্তর্নিহিত ষড়রিপু রয়েছে, যেগুলি আমাদের অনর্থক

জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্রে ঘুরপাক করায়, সেই ষড়রিপুকে দমন করবার জন্য ইসকন আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন নামক বৈদিক পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। অতি ভয়ঙ্কর দুস্তর কলির রাজ্যে বদ্ধ জীবের ভবচক্র খণ্ডন করতে ইসকন প্রকৃতই একটি 'যন্ত্র' বা ষড়যন্ত্র বিশেষ।

প্রশ্ন ১৮। কেউ কেউ বলে যে, ইসকন হল সাম্রাজ্যবাদী। কেন বলে?

উত্তর ঃ কারণ তারা দেখেছে যে, ইসকন ভক্তরা সারা পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছে। গ্রাম গঞ্জ শহর নগর স্কুল কলেজে সর্বত্র যাচ্ছে। মানুষদের বলছে কৃষ্ণভক্ত হও। মহাপ্রভুর নির্দেশ এই যে—

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা ।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥

কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করতে অনুপ্রেরণা দিতে ইসকন প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে—আপনারা সবাই আসুন, ভক্ত হন, অন্যদেরও ভক্তিপথে আনুন। তাই, দেশ-বিদেশের বহু মানুষ এসে বিরাট হরিনামের মেলা বসিয়ে দিচ্ছে। যেহেতু তারা যথার্থ বুদ্ধিমান। কৃষ্ণভক্তির এরূপ সাম্রাজ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই যুক্ত হন। *সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥* (ভাগবত ১১/৫/৩২)

সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই কলিযুগে সংকীর্তন যজ্ঞে যুক্ত হন। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া দুর্মতিগ্রস্ত জীবের সাম্রাজ্য অত্যন্ত কলুষিত।

সংকীর্তন যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন ।
সেই ত' সুমেধা, আর—কলিহত জন ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১১/৯৯)

সেই ত' সুমেধা, আর—কুবুদ্ধি সংসার ।
সর্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম যজ্ঞ সার ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৩/৭৭)

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব ।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥

অতএব হে ভাগ্যবান জীব! হে বুদ্ধিমান সর্বশ্রেষ্ঠ জীব! আসুন, এগিয়ে আসুন, কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশ্বব্যাপী হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে সামিল হোন! সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করুন।

প্রশ্ন ১৯। ইসকনকে লোকে 'সাহেব মঠ' বলে কেন?

উত্তর ঃ গ্রাম্য লোকেরা কেউ কেউ সাহেব মঠ বললেও, ওই নামটির কোনও মূল্য নেই। কারণ ভারতেরই মহান ব্যক্তিত্ব শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন (International Society for Krishna Consciousness) কোনও সাহেবের প্রতিষ্ঠিত নয়। কোন সাহেবও নেই। কারণ সাহেব বলতে আমরা বুঝি, যারা আফিং, কফি, চুরুট, সিগারেট, ডিম, মাংস, চিকেনস্যুপ ইত্যাদি অখাদ্য খেতে অভ্যস্ত। কিন্তু ইসকন মন্দিরের ভক্তরা সেই সব গ্রহণ করেন না।

সাহেবরা সাধারণত চেয়ারে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই মেজাজপূর্ণ ভঙ্গিতে জড়জাগতিক হযবরল সংবাদ সমন্বিত খবরের কাগজ নিয়ে বসে পড়ে। কিন্তু ভক্তরা ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি দিব্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। সাহেবদের পোশাক পরিচ্ছদে হ্যাট, কোট, বুট, স্যুট, বেলবোট্‌স ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু ইসকন মন্দিরের ভক্তরা ধুতি, উত্তরীয় পরিধান করেন।

সাহেবরা সাধারণত চুলে কলপ করে, কিন্তু ভক্তরা শিখা ধারণ করেন, তিলক ধারণ করেন। সাহেবদের গলায় টাই থাকে। ভক্তদের গলায় তুলসীকাষ্ঠের মালা থাকে। সাহেবদের হাতটি প্রায় তাদের প্যান্টের পকেটে থাকে। কিন্তু ভক্তদের হাতটি জপ ব্যাগের মধ্যে থাকে। সাহেবরা সাধারণত ভগবানকে প্রণাম জানায় কপালে একটু আঙুল ঠুকিয়ে, অনেকটা স্যালুট করার ভঙ্গিতে। কিন্তু কৃষ্ণভক্তগণ সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ প্রণতি নিবেদন করেন। অতএব বিভিন্ন কারণে ইসকনকে সাহেব মঠ বলার ব্যাপারে কোনও সঙ্গতি নেই।

আমাদের এই ভারতের বহু মানুষ ইসকন মন্দিরে আসে দর্শনার্থী হিসাবে। তাদের অনেকের মধ্যে সাহেবিয়ানার প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের বোঝাতে হয় বিড়ি-সিগারেট খাবেন না, ফেলুন। শ্রীশ্রীরাধামাধবকে দয়া করে প্রণাম করুন। কারণ, তারা সাহেব হতে চায়। হয়ত সেই ধরনের সাহেবরাই ইসকনকে সাহেব মঠ বলে মনগড়া নাম দিতে পারে।

প্রশ্ন ২০। কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যদি রাধা ও কৃষ্ণের সম্মিলিত দেহ হন, তা হলে গৌরাঙ্গ ঘরণী লক্ষ্মীপ্রিয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়া কে ছিলেন? দ্বাপরে তাঁদের কি রূপ বা কি নাম ছিল?

উত্তর ঃ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর একনিষ্ঠ ভক্তিভাব এবং অঙ্গকান্তি ধারণ করে এই ধরাতলে কলিবদ্ধ জীবকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেবার জন্য ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়ে লীলাবিলাস করে। স্বয়ং রাধারাণীও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীগদাধর দাস গোস্বামী রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্রী, ভূ এবং লীলা নামে ভগবানের তিন শক্তির মধ্যে 'শ্রী' শক্তি হচ্ছেন লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। তিনি মিথিলাপতি জনকের কন্যা সীতা দেবী এবং দ্বাপরে তিনি রুক্মিণী দেবী ছিলেন। দ্বাপরে সত্রাজিত রাজার কন্যা সত্যভামা দেবীর অবতার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। তিনি ভগবানের 'ভূ' শক্তি প্রেমভক্তিস্বরূপিণী। কবি কর্ণপুর তাঁর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় ৪৩নং শ্লোকে এই কথা বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন ২১। রাধা কথার অর্থ কি? রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক কি? রাধাকে কৃষ্ণের মামী বলা হয়, এর অর্থই বা কি?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তি হেতু করে আরাধনে ।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥

পুরাণে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্ব থেকে আবির্ভূত হয়ে সহসা তাঁর শ্রীপাদপদ্ম সেবার জন্য যিনি ধাবিতা হয়ে পুষ্পচয়ন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম আরাধনার বিধান করলেন, তিনি হচ্ছেন রাধা।

শ্রীমতী রাধারাণী সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

মহাভাবস্বরূপ শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি ॥

অর্থাৎ, "মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন সমস্ত গুণের আধার এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণের শিরোমণি।"

গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা নিত্য কান্ত ও কান্তারূপে বিরাজমান। সেই কথা শ্রীব্রহ্মা ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭ শ্লোকে) বর্ণনা করেছেন—"পরম আনন্দদায়িনী শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে যিনি স্বীয় ধাম গোলোকে অবস্থান করেন এবং শ্রীমতী রাধারাণীর অংশ-প্রকাশ চিন্ময় রসের আনন্দে পরিপূর্ণ ব্রজগোপীরা যাঁর নিত্য লীলাসঙ্গিনী, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

ভগবানের ভক্ত পার্ষদগণ কত সুন্দরভাবেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সেই সব সুন্দর সরল কথাগুলি জেনেও 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মাসী' বলে চিন্তা করতে থাকেন। জটিল আর কুটিল মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরাই রাধারাণীকে কৃষ্ণের মামী বলে ব্যাখ্যা করতেই পারেন। কারণ আপন লাম্পট্য ভাবধারা দিয়ে ভগবানের চরিত্র ব্যাখ্যা করে তাঁরা আমোদ পেতে খুবই আগ্রহী। বড় গোস্বামীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে তাঁরা কখনও অনর্থক কথাগুলি বলতে পারেন না। শ্রীরাধারাণী হচ্ছেন কৃষ্ণপ্রিয়া আর শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন রাধানাথ।

প্রশ্ন ২২। ভগবানের কাছে যদি ভক্ত বড়, তবে ভগবান অট্টালিকায় থাকেন, রাজভোগ খান, ভক্তরা কুঁড়ে ঘরে থাকেন আর খুদভাত খায় কেন?

উত্তর ঃ আপনি ভগবানকে শুধু রাজভোগ খেতে দেখেছেন, সেটিই আপনার দর্শনের অপূর্ণতা। সুদামা বিপ্রের গামছার আঁচল থেকে ভগবানকে চিড়া খেতে, গোকুলের মাঠে মাটি খেতে, ব্রজবাসী বালকদের উচ্ছিষ্ট, বিদুরের বাড়িতে কলার খোসা, দ্রৌপদীর রান্নার কড়াইতে লেগে থাকা এক কণা শাক, সনাতন গোস্বামীর কাছে লবণ ছাড়া রুটি, গদাধর পণ্ডিতের তেঁতুল পাতার সেদ্ধ খেতে আপনি দেখেন নি।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী জগন্নাথ মন্দিরের নালা থেকে পরিত্যক্ত পচা অন্ন কুড়িয়ে ধুয়ে লবণ মাখিয়ে খেতেন, আর ভগবান সেই অন্ন কাড়াকাড়ি করে খেতে লাগলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভিক্ষার ঝুলি থেকে নুড়ি-পাথর যুক্ত কাঁচা খুদ চাল কেড়ে মুঠো মুঠো খাওয়া, গৌরকিশোর দাস বাবাজীর কাছে নিছক আধা সেদ্ধ জলভাত খাওয়া—এসব আপনার জানা উচিত ছিল।

বিদুরের স্ত্রী যখন ভাবের আনন্দে আত্মহারা হয়ে কলা ছাড়িয়ে কলার খোসা কৃষ্ণকে খেতে দিলেন, তখন বিদুর এসে সেই দৃশ্য দেখে 'হায় হায়' করে উঠলেন। বিদুরের স্ত্রী চমকে গেলেন। তিনি খেয়ালই করেননি কৃষ্ণকে কি খেতে দিচ্ছেন। আর কৃষ্ণ আনন্দে খোসা খেয়ে চলেছেন। তারপর কৃষ্ণ বললেন—"আমি কলাও খাই না, কলার খোসাও খাই না। আমার ভক্ত প্রীতি করে যা আমাকে দেয়, তাই আমি আদরের সঙ্গে গ্রহণ করি।" অতএব কেবল রাজভোগ দিয়ে দিলেই ভগবান খাবেন, এমন নয়।

মন্দার পর্বতে বহু দিন ভগবানকে উপবাসী থাকতে; বহুদিন যাবৎ বনে বনে জল বা ফল বা লোকালয়ে একটু দুধ ইত্যাদি যা পাওয়া যায় তা-ই পেয়ে থাকতে হয়—এসব ভগবানের লীলা আপনার জানা দরকার ছিল।

ভগবান অট্টালিকায় থাকেন, এরূপ মন্তব্যও ঠিক নয়। ভগবানকে পর্বত গুহায়, মাটির নীচে, পুকুরের মধ্যে, সমুদ্রের জলের উপরে, চৌদ্দ বর্ষ বনবাসে কাটাতে, গাছের তলায় থাকতে, কুটিরের মধ্যে দিন যাপন করতে, গোশালায় শুয়ে থাকতে আপনি দেখেননি। গোপালভট্ট গোস্বামীর ঝুড়ির মধ্যে, গঙ্গামাতা গোস্বামিনীর তুলসীবনে ভগবানকে রাত কাটাতেও দেখা যায়।

আর, রাজভোগ ও অট্টালিকা দেখেই ছোট-বড়র হিসাব হয় না। ভক্ত ভগবানের কাছে বড়। কিন্তু ভক্তের কাছে ভগবানই বড়। আর অভক্তরা ভক্ত ও ভগবানকে বাদ দিয়ে নিজেরা অথবা অন্য কাউকে বড় বলে মনে করে। আর ভগবানের শুদ্ধভক্ত নিজেকে সবার চেয়ে ছোট বলে মনে করে।

প্রশ্ন ২৩। রাধারাণী তো বিবাহিতা ছিলেন। তাহলে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি আবার কিভাবে বিবাহ করলেন?

উত্তর ঃ লক্ষ্মীদেবী যেমন নারায়ণের নিত্যশক্তি। কখনও লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করে নারায়ণ পত্নীত্বে বরণ করেছিলেন—এমন নয়। তাঁরা চিরকাল নিত্য পতি-পত্নী রূপেই বিরাজমান। তেমনই গোলোকে শ্রীরাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ নিত্য দম্পতিরূপে বিরাজমান।

কিন্তু ভৌম ব্রজলীলায় রাধারাণীর সঙ্গে অভিমন্যু বা আয়ান ঘোষের যে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল তা বিশেষ লীলারস আস্বাদন করার জন্য ভগবানের যোগমায়া শক্তির অঘটন-ঘটন পটীয়সী ব্যবস্থাপনা মাত্র।

ভগবান শ্রীহরিকে দর্শনের জন্য অভিমন্যু পূর্ব জীবনে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শ্রীহরি তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন এবং প্রশ্ন করেছিলেন, "তুমি কি বর চাও?" তখন তপস্বী বলেছিলেন, "হে ভগবান! আপনি আমাকে কি দিতে পারেন?" শ্রীহরি বলেছিলেন, "তুমি যা চাইবে তা-ই দেবো।" শ্রীহরির এই বাক্যের সততাকে পরীক্ষা করবার জন্য তপস্বী বলেছিলেন, "আমি চাই লক্ষ্মীদেবীকে পত্নীরূপে লাভ করতে।"

তপস্বীর এই রকম অদ্ভুত বর শুনে পরমেশ্বর শ্রীহরি বলেছিলেন, "হে তপস্বী! তুমি যখন দ্বাপরে জটিলার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবে তখন তোমার বাসনা পূর্ণ হবে, কিন্তু কখনও তুমি লক্ষ্মীকে স্পর্শ করতে পারবে না।" এই বলে শ্রীহরি অদৃশ্য হলেন।

পরবর্তীকালে সেই তপস্বী জটিলাদেবীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বিবাহ লগ্নে তাঁর বুদ্ধিভ্রম হয়। তিনি দর্শকের মতোই বসে থাকেন। রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের কাছে বহু মিনতি করেছিলেন যাতে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তাঁর বরণ মালা কেউ যেন গ্রহণ না করে। ঘটনা ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণই বিবাহ বেদীতে রাধারাণীর মালা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উপস্থিত জনতার কাছে শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যু রূপেই প্রতিভাত হন। যেভাবে মথুরায় কংসযুদ্ধে তিনি বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কাউকেই বিরক্ত করতে চাননি। কিন্তু লীলার খাতিরে পূর্বে রাধারাণী অভিশপ্ত হয়েছিলেন যে, শতবর্ষ তাঁকে কৃষ্ণবিরহে থাকতে হবে। তাই অভিমন্যুর ঘরেই শ্রীরাধারাণী গৃহিণীমাত্র হয়ে দিন অতিবাহিত করে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। এটিই ছিল অভিমন্যুর পূর্বজীবনের তপস্যার ফল স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধারাণীর বিবাহ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই হয়েছিল, অভিমন্যুর সঙ্গে কদাপি নয়।

প্রশ্ন ২৪। রাধা বড়, না কৃষ্ণ বড়। কৃষ্ণ ছাড়া কি রাধার ভজনা করা যায়?

উত্তর ঃ যাঁরা বড় আর ছোট নিয়ে চিন্তা করছেন, তাঁদের পক্ষে কারও ভজনা করার মধ্যে বিপদের ঝুঁকিই বজায় থাকছে। প্রকৃতপক্ষে আমার মতো মূর্খেরা এক-একটা বড় ভক্ত হতে চায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু যখন ভক্তরূপে অবতীর্ণ হলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে তখন তিনি সব চেয়ে ছোট ভক্ত হওয়ার আকুলতা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন—*প্রদ্যোন্নিখিলপরানন্দাপূর্ণমৃতাব্ধের্গোপীভর্তুঃ পদকমলোর্দাসানুদাসঃ*—'আমি হচ্ছি সেই নিত্য স্বতঃ প্রকাশমান নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্ররূপ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস-দাসানুদাস।' অর্থাৎ, আমার পরিচয়টি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দাস নয়, কৃষ্ণের যাঁরা দাস তাঁদের দাসের দাসের অনুদাস। অতএব যে বড় তাঁরই আমি ভজনা করব—এরূপ বড় ভক্ত হওয়ার চেয়ে ভগবদ্ হ্লাদিনী শক্তি এবং পরমেশ্বর ভগবান উভয়ের ভজনা করব, তাঁদের দাসানুদাসের আনুগত্যে থাকব—এই মনোভাব থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ২৫। শ্রীকৃষ্ণের মুখে যে বাঁশি থাকে তার নাকি নানা প্রকার ভেদ আছে। বংশী, বেণু ইত্যাদি। কথাটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে ভগবানের বাঁশির বিভিন্ন রকমের বৈচিত্র্য বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সাধারণত তিন রকমের বাঁশি বাদন করতেন। মুরলী, বংশী ও বেণু।

মুরলী লম্বায় দুইহাত। মুখরন্ধ্র ছাড়া আরও চারটি স্বরছিদ্র আছে। বংশী সতেরো আঙ্গুল পরিমিত লম্বা। মুখরন্ধ্রসহ নয়টি স্বরছিদ্র আছে। আর বেণু বারো আঙ্গুল পরিমিত লম্বা। মুখরন্ধ্র ছাড়া আরও ছয়টি স্বরছিদ্র আছে।

বংশীর তিন রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। মহানন্দা বা সম্মোহিনী, আকর্ষণী এবং আনন্দিনী। মহানন্দা বা সম্মোহিনীর মুখছিদ্র ও স্বরছিদ্রের ব্যবধান দশ আঙ্গুল পরিমিত।

আকর্ষণীর উক্ত ব্যবধান বারো আঙ্গুল পরিমিত। আর আনন্দিনীর ঐ ব্যবধান চৌদ্দ আঙ্গুল পরিমিত। সম্মোহিনী মণিমুক্তা দিয়ে তৈরি, আকর্ষণী স্বর্ণ দিয়ে তৈরি এবং আনন্দিনী বাঁশের তৈরি। এই তিন বংশী সতেরো আঙ্গুলেরও বেশি লম্বা। মুরলী এবং বেণু বাঁশের তৈরি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি অসাধারণ। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ রচিত বিদগ্ধ-মাধব নাটকে (১/২৭) কৃষ্ণসখা মধুমঙ্গলের উক্তি থেকে জানা যায়—চলমান মেঘও শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে স্তব্ধ হয়ে যায়। তুম্বুরু নামে গন্ধর্বরাজ যিনি সমস্ত রকমের মধুর স্বরলহরীর সঙ্গে পরিচিত, তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনতে পান তখন তিনি সেই স্বরমাধুর্যে এতই বিস্ময়ান্বিত ও চমৎকৃত হন যে, তিনি ভাবতে থাকেন এই রকম সুন্দর মূর্ছনা তো কখনও শুনিনি, কখনও কল্পনায়ও আসেনি। সনক সনাতন আদি ঋষিগণ যাঁরা সব সময় ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হয়ে থাকেন, তাঁদের কানেও যখন বংশীধ্বনি প্রবেশ করে তখন তাঁরা ধ্যান ভঙ্গ পূর্বক বিচলিত হয়ে অন্য কোন আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন। শ্রীব্রহ্মা যিনি জড়জগৎ সৃষ্টি রচনা কার্যে নিযুক্ত তিনিও কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে সৃষ্টিকার্য ভুলে গিয়ে বিস্মিত হন। সমুদ্রের মতো গম্ভীর প্রকৃতি বলী মহারাজ, তিনিও বংশীধ্বনি শুনে চঞ্চল হয়ে পড়েন। অনন্তদেব যিনি মস্তকে পৃথিবী ধারণ করে অবিচলিতভাবে অবস্থান করছেন তিনিও বিচলিত হয়ে পড়েন। এই বংশীধ্বনি কেবল এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রকট লীলায় ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করেন সেই ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদ করে বিরজা ও পরব্যোম অতিক্রম করে চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে থাকে।

প্রশ্ন ২৬। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে অবধূত বলা হয়? এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ অবধূত কথাটির অর্থ হলো বর্ণাশ্রম আচারের অতীত। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সামাজিক নিয়মবিধি তথা চার বর্ণ ও চার আশ্রমের সকল নিয়ম-আচারের ঊর্ধ্বে। এই অর্থে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবধূত। তিনি ভগবানের অবতার। তিনি আমাদের মতো বদ্ধ জীবদের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-বিধির ঊর্ধ্বে। মাঝে মাঝে তাঁর আচরণ দেখে লোকে তাঁকে ভুল বুঝতে পারে। তাঁর আচরণ অত্যন্ত বালক সুলভ।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করতে করতে এমন লুটোপুটি করতেন যে, তাঁর অঙ্গে কাপড়-চোপড় প্রায়ই ঠিক থাকত না। তিনি শিবানন্দ সেনকে হঠাৎ পদাঘাত করলেন। অদ্বৈত ভবনে খেতে বসে ভাত ছুঁড়ে ফেললেন। জগাই মাধাই তাঁকে মারতে এলেও তিনি তাদেরকে কৃষ্ণনাম করতে বলেন। কিন্তু সেই ঘটনাগুলি আপাত দৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর হলেও পরিণামে উপস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে দিব্য কৃষ্ণভক্তির পরম উল্লাস সঞ্চার করে।

কিন্তু সেই রকমের বিভ্রান্তিকর আচরণ যদি কোন সংসারবদ্ধ মানুষ করে বসে তবে তাকে অবশ্যই দণ্ড-শাস্তি পেতে হয়, কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে পাগলা গারদেও ভর্তি করানো হয়।

অবধূতের আর একটি অর্থ হল পাগল বা উন্মাদ। এই ধরনের মানুষ কোন নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে না। কি যে বলে, কি যে ভাবে, তা লোকে সহজে বুঝতেও পারে না। সে কেবল লোকদের উদ্বেগ ও ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু ভগবান শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যাঁর উপর যেরূপ আচরণ করুন না কেন তাঁরই কৃষ্ণপ্রেম জাগ্রত হত এবং ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে তিনি উদ্বেল হয়ে পড়তেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা কাহিনী অত্যন্ত চমৎকার ও মধুর। তাঁর কৃপাতে সমাজের সমস্ত অধর্মাচারী ব্যক্তিও তাদের মতি-গতি পরিবর্তন করে কৃষ্ণভক্ত হতে পারে।

প্রশ্ন ২৭। সরস্বতীদেবীর স্বামীর নাম কি? লক্ষ্মীপূজায় সিঁদুর ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সরস্বতীপূজার সময় আবীর ব্যবহার করা হয় কেন? দেবী সরস্বতীর হাতে বীণা থাকে কেন?

উত্তর ঃ দেবী সরস্বতীর স্বামী হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু। তিনি বিষ্ণুভক্তি স্বরূপিনী। সকলেই জানেন যে, লক্ষ্মীদেবীর স্বামী শ্রীবিষ্ণু। আর সরস্বতী হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবীর অন্য প্রকাশ মূর্তি। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি খণ্ডে বলা হয়েছে—

বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিনী, বিষ্ণু-বক্ষঃস্থিতা ।
মূর্তিভেদে রমা, সরস্বতী জগন্মাতা ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩/২১)

লক্ষ্মীপূজার মতো সরস্বতীপূজাতে সিঁদুর ব্যবহার করা যায় না এরকম নয়। তবে সরস্বতীদেবীর পূজার দিনে আবীর ব্যবহারের তাৎপর্য আছে। কারণ, সেই দিনটি হল বসন্ত পঞ্চমী। উক্ত দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীসহ অন্যান্য শক্তিবর্গকে আবীর নিক্ষেপ মাধ্যমে রঞ্জিত করেছিলেন। সেই বসন্ত পঞ্চমীতেই সরস্বতী দেবীর আর্বিভাব হয়। সরস্বতীদেবী গোলোকে কৃষ্ণশক্তিরূপে বিরাজমান। অতএব বসন্ত পঞ্চমীর আবীরে তিনিও বিভূষিতা হন।

চিন্ময়ী পরাবিদ্যা স্বরূপিনী শ্রীসরস্বতী হচ্ছেন অংশিনী শ্রীমতী রাধারাণীর অংশ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে বিদ্যালীলা বিলাস করছিলেন তখন এক সময় কেশব কাশ্মীরী নামে সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত চিন্তা করেছিলেন যে, নবদ্বীপের পণ্ডিত-মহলকে পাণ্ডিত্য দিয়ে জয় করতে পারলেই তিনি বিশ্ববিজয়ী হয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু নবদ্বীপের মায়াপুরে এসেই নিমাই পণ্ডিতের কাছে তিনি ভালো মতোই পরাস্ত হন। সেদিন সারারাত সরস্বতীদেবীর স্তুতি করার পর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জানতে পারলেন যে, দেবী সরস্বতীর পতি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, অর্থাৎ এই নিমাই পণ্ডিত। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তখন সকালবেলায় এসে মহাপ্রভুর পদতলে আত্মসমর্পণ করে কৃষ্ণভক্তি লাভ করলেন।

দেবী সরস্বতী বীণা বাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ মহিমা কীর্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উল্লেখ করেছেন তাঁর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই—

বিদ্যাবধূজীবনম্...শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম্—শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনই পরাবিদ্যা স্বরূপিনী সরস্বতীর জীবন স্বরূপ। অবশ্যই তিনি বীণা বাজিয়ে ভগবদ্ভক্তিশূন্য আধুনিক কোনও ছায়াছবির গান কীর্তন করছেন না। ভক্তিবিদ্যাস্বরূপিনী জগন্মাতা সরস্বতীর সামনে অভক্তিমূলক লাড়েলাপ্পা গানের রেকর্ড বাজিয়ে মেলা জমানো অপরাধমূলক কর্ম। গোলোক বৃন্দাবনে বীণার অসংখ্য তানে দেবী সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তনে তৎপরা।

প্রশ্ন ২৮। রাধাতত্ত্ব কি? উন্নত মধুরভাবের দ্বারা কেন কৃষ্ণ আকৃষ্ট হন? শুদ্ধ গোপীভাবের তত্ত্ব কি?

উত্তর ঃ পরম আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী আরাধিকা শক্তিই রাধা। রাধারাণী সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন। এই তত্ত্বের তাৎপর্য হচ্ছে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণসেবা সর্বতোভাবে করবেন তাঁরা রাধারাণীর কৃপা প্রার্থনা করবেন।

উন্নত মধুর ভাবের দ্বারা কৃষ্ণ আকৃষ্ট হন। অর্থাৎ, অনুন্নত তিক্ত ভাবের দ্বারা কৃষ্ণ আকৃষ্ট হন না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই আকৃষ্ট হন না। কৃষ্ণতে সবাই আকৃষ্ট হয়। নাস্তিকেরা শ্রীকৃষ্ণের মধুর ভাব দেখে ঈর্ষাপর হয়। শ্রীকৃষ্ণের মতো তারা যদি হতে পারতো তাহলে কতই না সুন্দর হতো বলে মনে করে। অর্থাৎ, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সবাই কৃষ্ণতেই আকৃষ্ট হয়। লোহা চুম্বকের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই আকৃষ্ট হয়। জীব স্বাভাবিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু জড় জাগতিক কামনা-বাসনা জর্জরিত মানসিকতা সম্পন্ন জীব মরিচা পড়া লোহার মতো স্বভাবতই চুম্বকরূপ কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না। খাঁটি লোহা যেমন সহজেই চুম্বকের সংস্পর্শে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনই পরম মধুর ভাবের আনন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট তাঁর শক্তিও কৃষ্ণভাবময়ী হন।

বৃন্দাবনের গোপকন্যাগণ সর্বদাই কৃষ্ণভাবনামৃত নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন। সর্বদা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত নিয়ে দিন যাপন করাটাই গোপীভাব।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সারা বিশ্বের মানুষকে কৃষ্ণভাবনামৃত নিয়ে জীবন যাপন করার উদ্দীপনা দান করছেন। শ্রীরাধাভাব তথা গোপীভাবের প্রতিমূর্তি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর প্রবর্তিত হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে কায় মনো বাক্যে আত্মসমর্পণ করে মহাপ্রভুর কৃপায় গোলোক ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেখানে মানুষ গোপীভাব মধুর ভাব নিয়ে চিরকালের মতো বাস করতেও পারবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থা ব্যতিরেকে সমস্ত ভাবই কটু তিক্ত বিকৃত রস হয়ে হৃদয়ে বাসা বাঁধবে। আর সেই অবস্থায় বদ্ধ জীবন কাটাতে হবে।

প্রশ্ন ২৯। "শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল চন্দ্রের মতো সুন্দর। তাঁর শ্রীঅঙ্গের রূপ মাধুরী এতই সুন্দর যে সেই শরীরে অলঙ্কার ধারণ করার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত হওয়ার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য সমস্ত অলঙ্কারকেই বিভূষিত করে।" —এহেন ভুবনমোহন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি কালো কেন? আবার কখনও বা সাদা মূর্তিও দেখা যায়। তারই বা তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ কালো রঙটির নামে অনেকেই দোষ দেখে। আমরা দেখি "লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ" গ্রন্থে, অসুরপ্রকৃতি শিশুপাল শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের সুবিশাল রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রিত সমস্ত রাজন্যবর্গের সভাতে উচ্চস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গায়ের কালো রঙ দেখে দোষ দিয়ে ছিল। তার স্বভাবটাই ছিল কৃষ্ণের নিন্দা করা। তাই সে বলেছিল, 'কৃষ্ণ' দেখতে একটা কাকের মতো, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।' অবশ্য পরিণামে সেই সভার মাঝেই তার জীবন অবসান ঘটেছিল। সৎ-চিৎ-আনন্দময় ভগবদ্‌বিগ্রহকে সাদা-কালো নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় না। তিনি যে রূপেই আমাদের চর্মচক্ষুতে কৃপা করে দর্শন দান করেছেন তাতেই আমাদের পরম লাভ বলে বুঝতে হবে।

ব্রজধামে দ্বাপরে শ্রীবজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ, ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ, কিংবা কলিযুগে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী সেবিত শালগ্রাম থেকে স্বয়ং প্রস্ফুটিত বিগ্রহ, মহাপ্রভু কর্তৃক গোবিন্দ ঘোষকে দেওয়া গোপীনাথ বিগ্রহ—আমাদের চর্ম চক্ষুতে কালো রূপেই প্রতিভাত হয়েছেন। তাতে কোনও প্রকার খুঁত বা অসম্পূর্ণতা আছে বলে মনে করা উচিত নয়।

বৈষ্ণবপদাবলীতে দেখা যায়, শ্রীমতী রাধারাণী 'কালো' রঙ দেখে এতই বিমোহিত হয়েছিলেন যে, তিনি কখনও কখনও কালো তমালবৃক্ষ, তালবৃক্ষ, আকাশের কালো মেঘ, নিজের মাথায় কালো বিনুনী দর্শন করেই কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

যদিও বা আমাদের জড়বুদ্ধির বোধগম্য করার ক্ষেত্রে কোথাও বা কৃষ্ণের মুখমণ্ডল চাঁদের মতো, কৃষ্ণের অঙ্গের রূপ কন্দর্পের মতো, কৃষ্ণের নয়ন পদ্মের মতো—এইভাবে নানারকমের উপমা বা তুলনা দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের মুখ চাঁদের মতো নয়, বরঞ্চ কোটি কোটি চন্দ্রের চেয়েও শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল আরও বহুগুণে সুন্দর। "বহু কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজ্জ্বল।" কোটি কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও ভগবানের মুখমণ্ডল আরও অধিকতর উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পদেবতার মতোও সুন্দর নয়, অধিকন্তু কোটি কোটি কন্দর্পের অপেক্ষাও অনেক অনেকগুণ অধিক সুন্দর। সেই কথাই শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

কন্দর্পকোটিকমনীয় বিশেষশোভং।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীব্রহ্মা বলছেন—"কোটি কন্দর্পমোহন বিশেষরূপে শোভাবিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩০)

জড় জগতে সেই অতি মোহনীয় কন্দর্পরূপ, তার কোটি কোটি গুণ একত্র দেখলে বা কল্পনা করলেও শ্রীকৃষ্ণের রূপ তার অপেক্ষাও অধিক মোহনরূপ হয়। আবার সেই পরমমোহন রূপ শ্রীকৃষ্ণ যে রূপেই যে বর্ণেই বিগ্রহরূপে আমাদের চক্ষুতে ধরা দিয়েছেন তাতেই আমাদের প্রতি তাঁর অশেষ কৃপা বলে বুঝতে হবে।

প্রশ্ন ৩০। 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পিতা-মাতার পরিচয় কি?

উত্তর ঃ শ্রীব্যাসদেবের অবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পিতার নাম শ্রীবৈকুণ্ঠ দাস। তিনি কুমারহট্টের (বর্তমান হালিশহর) বাসিন্দা ছিলেন। পরম ব্রাহ্মণ। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাতার নাম শ্রীনারায়ণী দেবী। কৃষ্ণনাম পরায়ণা পরম ভক্তিমতী নারায়ণী দেবী ছিলেন শ্রীনলিন পণ্ডিতের কন্যা। নলিন পণ্ডিত হচ্ছেন শ্রীবাস ঠাকুরের বড় ভাই।

প্রশ্ন ৩১। শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের দুই পাশে অষ্টসখী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় কারা ছিলেন?

উত্তর ঃ শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের পূর্বদিকে চারজন সখী ললিতাদেবী হচ্ছেন শ্রীল স্বরূপ দামোদর পণ্ডিত, চম্পকলতা দেবী—শ্রীল রাঘব গোস্বামী, চিত্রাদেবী—শ্রীল বনমালী কবিরাজ, তুঙ্গবিদ্যাদেবী—শ্রীল ত্রিবিক্রম ঠাকুর এবং পশ্চিমদিকে চারজন সখী বিশাখাদেবী—শ্রীল রামানন্দ রায়, ইন্দুলেখাদেবী—শ্রীল কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, রঙ্গদেবী—শ্রীল গদাধর ভট্ট, সুদেবী—শ্রীল অনন্তাচার্য গোস্বামী।

প্রশ্ন ৩২। দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা রাণীর নাম কি কি?

উত্তর ঃ রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্য ও মাদ্রী।

প্রশ্ন ৩৩। মহাভারতের সকলের চরিত্রেই দোষ দেখা যায়। সুতরাং মহাভারত পড়ব কেন?

উত্তর ঃ মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র থেকেই শিক্ষনীয় বহু জিনিষ রয়েছে। প্রায় সমস্ত চরিত্রই মহান। একমাত্র কৃষ্ণবিরুদ্ধ হওয়ার ফলে সেই সমস্ত চরিত্রে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। অতএব মহাভারত পড়ার প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন ৩৪। সূর্য কি ভগবান?

উত্তর ঃ সূর্য কেন ভগবান হবেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহনাং
রাজা সমস্ত সুরমূর্তিরশেষতেজা।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃত কালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

সবিতা বা সূর্য হচ্ছে সমস্ত গ্রহের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট জগতের চক্ষুস্বরূপ। সূর্য না হলে দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হত। সেই সূর্য কালচক্রে আরূঢ় হয়ে ভ্রমণ করছেন। যাঁর নির্দেশে সূর্য এভাবে ভ্রমণ করছেন সেই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁকেই ভজনা করি। অতএব সূর্যদেব হচ্ছেন ভগবানের ভৃত্য।

প্রশ্ন ৩৫। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তো মা যশোদার কাছে প্রতিপালিত হলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যশোদার পুত্ররূপে কখন জন্ম গ্রহণ করলেন?

উত্তর ঃ আমাদের মতো ভগবানের জন্ম হয় না। শাস্ত্রে বর্ণনা রয়েছে একই সময়ে কংসের কারাগারে ও নন্দালয়ে যথাক্রমে দেবকী ও যশোদার পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন। অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"যদি কেউ আমার দিব্য জন্ম এবং কর্মবিষয়ে তত্ত্বত জানতে পারে, তবে সে তার দেহ ত্যাগের পর আমার কাছেই ফিরে আসবে, আর তাকে এই দুঃখময় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হবে না।"

'দিব্য জন্ম' কথাটিতে বোঝায় যে তার অসাধারণ জন্মলীলা আমাদের জড়বুদ্ধির অতীত। যদিওবা লীলাবিলাস ক্ষেত্রে তিনি দেবকীর গর্ভজাত এবং যশোদার প্রতিপালিত রূপে সাধারণের কাছে প্রতিভাত হয়েছেন।

প্রশ্ন ৩৬। শিবের মেয়ে লক্ষ্মী আর নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মী কি এক, না ভিন্ন?

উত্তর ঃ নারায়ণের নিত্যশক্তি লক্ষ্মীদেবী চিরকাল বৈকুণ্ঠে রয়েছেন। নারায়ণের যেমন অসংখ্য অবতার রয়েছে, লক্ষ্মীদেবীরও অসংখ্য প্রকাশ রয়েছে। জড় ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন কল্পে ভগবানের বিভিন্ন লীলাবিলাসে শিব ঠাকুরের কন্যারূপে কখনও কখনও লক্ষ্মীদেবী আবির্ভূতা হন।

প্রশ্ন ৩৭। চিরকাল জেনে এসেছি স্বর্গে তেত্রিশ কোটি দেবতা রয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা মানুষের মতো কি কমে বা বাড়ে না?

উত্তর ঃ 'তেত্রিশ কোটি' বলতে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝাচ্ছে না। এটি কোনও প্রাচীন আমল থেকে প্রচলিত কথা মাত্র। স্বর্গের দেবতাদেরও সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। কোন মানুষ স্বর্গে গিয়ে দেবজন্ম লাভ করতে পারে। স্বর্গের দেবতারা পৃথিবীতে মানুষকুলে জন্ম নিতে পারে।

প্রশ্ন ৩৮। কুন্তীপুত্র অর্জুন পূর্বজীবনে কে ছিলেন?

উত্তর ঃ পূর্বকালে অর্জুন নর নামক এক মহান ঋষি ছিলেন। দম্ভোদ্ভব নামে এক পরাক্রমশালী সদা যুদ্ধোদ্যত রাজা অহংকারবশত এই নর ঋষির সঙ্গে যুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হলে ঋষিবর কতগুলো শরঘাস নিক্ষেপ করেন। আর ঋষিকে সংহার করবার নিমিত্ত রাজসৈন্যদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত ভীষণ অস্ত্রই তৃণঘাসের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হল। মায়াপ্রভাবে নর ঋষি দম্ভোদ্ভবের সৈন্যদের চোখ কান নাক বিকৃত করে দেন। সারা আকাশমণ্ডল শরঘাসে ছেয়ে গেল। সেই দৃশ্য দেখে রাজা দম্ভোদ্ভব 'আমার মঙ্গল করুন' বলে ঋষিচরণে পতিত হন।

তখন ক্ষমাশীল নর ঋষি বললেন, 'হে রাজন্, ধর্মাত্মা হও। তোমার মতো পুরুষের পক্ষে ক্ষত্রিয় ধর্ম স্মরণ করে কখনও মনে মনেও যার-তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কর্তব্য নয়। তুমি ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে কি দুর্বল কি বলবান কাউকে কখনও আক্রমণ করবে না।'

প্রশ্ন ৩৯। সভামধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাকালে মহাপ্রাজ্ঞ মহাবীর ভীষ্মদেব মৌন ছিলেন কেন?

উত্তর ঃ লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী যখন ভীষ্মদেবের সামনে বলেন, 'আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সবর্ণা ভার্যা, আমাকে দাসী বল আর নাই বল, উভয়পক্ষে সম্মত আছি। এই নীচ বুদ্ধি কৌরব বংশের কুলকলঙ্ক দূত দুঃশাসন বলপূর্বক আমাকে এখানে ক্লেশ দিচ্ছে, আমি সহ্য করতে পারি না। হে ভূপালগণ, আমি একবার মাত্র স্বয়ংবরকালে সভামধ্যে ভূপালগণের নেত্রপথে এসেছিলাম। তারপর কেউ আমাকে দেখেননি। কিন্তু এখন আমাকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত হয়ে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে। সভামধ্যে সতী স্ত্রীলোককে এনে লাঞ্ছনা করা কোন্ ক্ষত্রিয় রাজার ধর্ম? আপনাদের সনাতন ধর্ম আজ কোথায়? কৌরবদের পূর্বপুরুষ পরম্পরার নিত্যধর্ম আজ কোথায়? আমার প্রশ্নের আপনারা উত্তর দিন। তারপর যা বলবেন তাই করব।'

তখন ভীষ্মদেব বললেন, "হে কল্যাণি, ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। এখন তোমার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বিষয়ে কিছুই নির্ণয় হচ্ছে না। এই কৌরবেরা লোভ ও মোহের বশীভূত হয়েছে। অতএব বোঝা যাচ্ছে, অচিরেই কৌরববংশ ধ্বংস হবে। হে পাঞ্চালি, তুমি দুরবস্থাগ্রস্ত হয়েও যে ধর্মপথ নিরীক্ষণ করছ, সেটি যথার্থ। তুমি যে কুলের পরিগ্রহ সেই কুলজাত লোকেরা অত্যন্ত দুঃখে অভিহত হলেও কখনও ধর্ম থেকে বিচলিত হন না। এখন তোমার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দান করুন। তিনি কোন্ যুক্তিতে তোমাকে পণ রাখলেন?" পূর্বক্ষণে ভীষ্মদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পাশা খেলতে দিতে নিষেধ করলেও রাজা পাশাখেলা সমর্থন করেছিলেন এবং পুত্রদের খেলা বন্ধ করারও নির্দেশ দেননি। পরক্ষণেই রাজা বুঝতে পেরেছিলেন যে তার পুত্রদের গতি-প্রকৃতি ধ্বংসের দিকে।

প্রশ্ন ৪০। পরশুরাম কেন তাঁর মায়ের শিরশ্ছেদন করলেন?

উত্তর ঃ মহাতপস্বী জমদগ্নির সহধর্মিনী রেণুকা একসময় নদীতে জল আনতে গিয়ে চিত্ররথ নামক এক রূপবান গন্ধর্বকে তার পত্নীর সঙ্গে জলবিহার করতে দেখলেন। রেণুকা পদ্মমালাধারী রূপবান চিত্ররথকে দেখে মোহিত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবং সময় মতো গৃহে ফিরবার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এদিকে হোমাদি কর্ম অতিবাহিত হল। জমদগ্নি ধ্যানে জানতে পারলেন রেণুকা অন্য পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। রেণুকার যখন গৃহের কথা মনে পড়ল তখন হতচকিত হয়ে দ্রুত গতিতে গৃহে এসে ক্রুদ্ধ পতির সম্মুখে অধোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

জমদগ্নি তখন তার চার পুত্র রুমন্বান, সুষেণ, বসু ও বিশ্বাবসুকে ফল সংগ্রহ করে গৃহে ফিরে আসতে দেখে তাদের তীব্র ভাবে নির্দেশ দিলেন তাদের মাতার মস্তক ছেদন করতে। কিন্তু তারা সবাই পিতৃ নির্দেশ পালনে পরাঙ্মুখ হলেন। তখন জমদগ্নি সেই পুত্রদের অভিশাপ দিলেন, 'তোমরা জ্ঞানহীন জড়ের মতো হয়ে যাও।'

সেই সময় কনিষ্ঠপুত্র পরশুরাম সেখানে এসে পৌঁছালে জমদগ্নি তাকে নির্দেশ দিলেন 'বৎস, কোন প্রশ্ন না করে অক্ষুব্ধ চিত্তে তোমার পাপাচারিণী জননীকে এক্ষুণি সংহার কর।'

পিতার প্রভাব পরশুরাম জানতেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ মাতার শির ছেদন করলেন। তখন জমদগ্নির ক্রোধ-শান্তি হল। তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'বৎস, আমার নির্দেশে তুমি অতি দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করেছ। এখন তোমার অভিলাষ অনুসারে বর প্রার্থনা কর।'

পরশুরাম বললেন, 'হে পিতা, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে আমার এই ইচ্ছা এক্ষুনি পূর্ণ করুন—আমার জননীর পুনর্জীবন লাভ হোক, আমি যে তাঁকে বধ করেছি সেকথা যেন তাঁর স্মৃতিতে উদিত না হয়, তাঁর বধ জনিত পাপ যেন আমাকে স্পর্শ না করে, আমার ভাইয়েরা পুনর্চৈতন্য লাভ করুক।'

জমদগ্নি 'তথাস্তু' বলে পরশুরামকে তৎক্ষণাৎ সেই বর দান করলে মাতা রেণুকা এবং ভাইয়েরা জেগে উঠলেন, যেন নিদ্রা থেকে আনন্দে জেগে উঠলেন।

পরশুরাম যদি মহাতপা পিতার আজ্ঞা না মানতেন তবে তিনিও অভিশপ্ত হতেন। কিন্তু সমস্যা হল জমদগ্নিকে নারীহত্যা পাপ স্পর্শ করল। যার ফলে তার গলা ছিন্ন হল কার্তবীর্যার্জুন নামে এক যুদ্ধ মদমত্ত রাজার হাতে।

প্রশ্ন ৪১। নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জন্ম স্থান কোথায়?

উত্তর ঃ বাংলাদেশের যশোহর জেলার বুঢ়ন গ্রামে।

প্রশ্ন ৪২। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছাড়া শ্রীমায়াপুরে তাঁর আর কোনও পার্ষদের জন্ম হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ শ্রীধর ঠাকুর (তাঁর দোকান থেকে মহাপ্রভু প্রায় দিনই থোড়কলা মোচা আনতেন), শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী (তাঁর ঝোলা থেকে মহাপ্রভু ভিক্ষালব্ধ কাঁচা চাল কেড়ে নিয়ে খেয়েছিলেন), মাধব মিশ্র (গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পিতা)—এই সকল চৈতন্যপার্ষদদের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর।

প্রশ্ন ৪৩। শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে পড়লাম যে, কৃষ্ণ অপেক্ষা বলরাম ১৫ দিনের বড়। দেবকীর ৭ মাসের গর্ভশিশু বলরামকে রোহিণীগর্ভে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তা হলে ১৫ দিনের বড় কিভাবে হয়?

উত্তর ঃ রোহিণীর কোলে বলরামের জন্মের ১৫দিন পর দেবকীর পুত্ররূপে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন। সাধারণ জাগতিক নিয়ম অনুসারে দশমাস দশদিন মাতৃজঠরে অবস্থানের পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু ভগবানের জন্মলীলায় সেই সমস্ত নিয়মের বহু ব্যতিক্রম ঘটেছিল। যার ফলে দুরাত্মা কংস অষ্টম গর্ভের হিসাব নিকাশ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্* (গীতা) তাঁর জন্ম ও ক্রিয়াকলাপ এই জাগতিক হিসাবের মধ্যে সীমিত নয়। তাঁর জন্মাদি লীলা দিব্য বা অপ্রাকৃত।

আমরা দিনকালের হিসাব করে থাকি। যদি প্রতি বছরই একজন করে সন্তানের জন্ম হয় তা হলে অষ্টম গর্ভের সন্তান (যে সন্তান কংসকে বধ করবে বলে দৈববাণী

হয়েছিল) অষ্টম বছরে হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা কালের অধীন বলে এভাবে কালের হিসাব করে চলি। কিন্তু ভগবান কালের নিয়ন্ত্রণকর্তা। তিনি কাল সংকুচিত করে দিয়েছিলেন। এমন কি নারদ মুনিও কংসকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যে-কোন সন্তানই অষ্টমগর্ভের হতে পারে। সুতরাং, কালের হিসাব, দিন-মাস-বছরের হিসাবের এক্ষেত্রে কোনও প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ৪৪। মহাপুরুষের অঙ্গে ৩২টি বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলি কি কি? যদি জানান খুব ভাল হয়।

উত্তর ঃ জ্যোতিষ তত্ত্ব সামুদ্রিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্ম সপ্তরক্ত ষডুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥

শরীরের পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ—নাসিকা, বাহু, চিবুক, চক্ষু এবং হাঁটু। পাঁচটি অঙ্গ সূক্ষ্ম—ত্বক, অঙ্গুলিপর্ব, দাঁত, লোম এবং চুল। সাতটি অঙ্গ রক্তিম—চক্ষু, পায়ের তালু, হাতের তালু, মুখের তালু, জিহ্বা, নখ, অধর ও ওষ্ঠ। ছয়টি অঙ্গ উন্নত—বুক, কাঁধ, নখ, নাক, কোমর এবং মুখ। তিনটি অঙ্গ হ্রস্ব—গলা, জানু, উপস্থ। তিনটি অঙ্গ প্রশস্ত—কোমর, ললাট এবং বক্ষ। তিনটি অঙ্গ গম্ভীর—নাভি, কণ্ঠস্বর ও স্বত্ত্ব।

মহান জ্যোতিষতত্ত্ববিদ্ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী যখন শিশু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গে এই সমস্ত লক্ষণই দেখলেন তখন অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন। তিনি তাঁর কন্যা শচীদেবী ও জামাতা জগন্নাথ মিশ্রকে বললেন সাধারণ শিশু এ নয়।

প্রশ্ন ৪৫। যারা দেখতে সুন্দর তারা সাধারণত চরিত্রে সুন্দর—এই কথা অনেকে বলেন। এর সত্যতা কতখানি?

উত্তর ঃ পূর্বজীবনে সদাচারী থাকার ফলেও এই জন্মে সুন্দররূপ নিয়ে কেউ জন্মায়। শিব ঠাকুর পার্বতীদেবীকে বলেছিলেন, কাম-ক্রোধ-লোভ বশত পূর্ব জন্মে অন্যের প্রতি যাদের পবিত্রভাব ছিল না তারা বর্তমান জীবনে কুদর্শন হয়। শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করছেন, চরিত্র দূষিত হলে ক্রমশ সৌন্দর্যও নষ্ট হয়। কৃতাদ্যুতির সতীনেরা শিশুকে হত্যা করার ফলে 'হতপ্রভা' হয়েছিল। তাদের সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছিল।

আবার সুন্দর দেখালেই যে কারও সুন্দর চরিত্র হয়—এমন মনে করা ঠিক নয়। এক সময় ব্রজনারীরা মনে করেছিলেন 'বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর মতো' এক সুন্দরী তাঁদের গ্রামে এসেছে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁরা টের পেয়েছিলেন যে, সেটি ভয়ঙ্করী শিশুঘাতিনী কুচরিত্রা রাক্ষসী পূতনা।

আবার সুন্দর দেখতে না হলেও চরিত্র সুন্দর হতে পারে। রাক্ষসী ত্রিজটা তেমন দেখতে সুন্দর ছিল না, কিন্তু সীতাদেবীকে সে সর্বদা সান্ত্বনা ও সৎপরামর্শ দিত।

প্রশ্ন ৪৬। পূতনা আগের জন্মে কে ছিল?

উত্তর ঃ দৈত্যরাজ বলীর কন্যা রত্নাবলী। সে বালকরূপী ভগবান বামনদেবকে দেখে মনে মনে আশা করে, 'এই বালক কতই না সুন্দর। এ যদি আমার পুত্র হত,

তাহলে বক্ষে ধারণ করে স্তন পান করাতাম।' আবার পরক্ষণে তার মনোভাব অন্যরকম হল। সে মনে মনে বলতে লাগল, "এই বামন আমার পিতার কাছে ত্রিপাদভূমি ভিক্ষার ছলে সর্বস্ব হরণ করেছে। এরকম বালক যদি আমার হত তবে তাকে বিষ খাইয়ে প্রাণনাশ করতাম।" তখন অন্তর্যামী ভগবানও মনে মনে আশীর্বাদ করেছিলেন, "তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।" পরবর্তী কালে রত্নাবলী পূতনা রাক্ষসী রূপে স্তনে বিষ মাখিয়ে বালকরূপী ভগবানকে স্তনপান করাতে গিয়েছিল।

প্রশ্ন ৪৭। সরস্বতী নদী কোথায় প্রকাশমান? হিমালয়-মাহাত্ম্য কি?

উত্তর ঃ শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যের বর্ণনা অনুসারে ইসকন মন্দিরের দক্ষিণদিকে পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত যে নদী গঙ্গায় মিলিত হয়েছে, এই স্রোতস্বিনী প্রকাশমানা স্বয়ং সরস্বতী। এই সরস্বতীকে কেউ বলেন জলঙ্গী, আবার আঞ্চলিক ভাষায় কেউ বলেন খড়ুই।

হিমালয় পর্বতের উত্তরসীমান্তে বদরিকা আশ্রমের সন্নিকটে পবিত্র সলিলা সরস্বতী প্রকাশমান রয়েছে। জড়জগতের সমস্ত সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে আমাদের পূর্ব পুরুষ রাজা মুচুকুন্দ হিমালয়ে এসে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন এই বদরিকা আশ্রমে। এখানে ভগবান নরনারায়ণ ঋষির আবাস। আমাদের বহু পূর্বপুরুষগণ হিমালয়ের বিভিন্নাংশে তপস্যারত ছিলেন। ব্রহ্মার নির্দেশে রাজা ককুদ্মী নিজকন্যা রেবতীকে শ্রীবলরামের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন করার পর বদরিকা আশ্রমে এসে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তায় একাগ্র হয়ে তপস্যা করতে থাকেন।

প্রশ্ন ৪৮। সীতাদেবীর জন্ম বৃত্তান্ত কি?

উত্তর ঃ রাজর্ষি জনক ভূমিতে হল চালনা করতে গিয়ে মাটির ভেতরে শিশুকন্যা সীতাকে লাভ করে নিজ কন্যাবৎ পালন করলেন।

প্রশ্ন ৪৯। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী হাতে ত্রিভঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজিয়ে নৃত্যভঙ্গী করে বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলাবিলাস প্রদর্শন করেন, যাতে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চিন্ময় জগতে ফিরে যেতে পারে।

প্রশ্ন ৫০। পরমেশ্বর ভগবানের জন্ম-মৃত্যু নেই। তা হলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মৃত্যু লীলার তাৎপর্য কি? ব্যাধের শরাঘাতে তাঁর মৃত্যু হল কেন?

উত্তর ঃ ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতিশ্রুতি, ভক্তের মর্যাদা রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে বিচিত্র অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করে থাকেন। বহু জন্ম কঠোর তপস্যা করে ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করার বাসনা পূরণ করতে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জন্মলীলা প্রকাশ করলেন।

শাম্ব ইত্যাদি কৃষ্ণের বংশধরদের মুনিঋষিগণ একবার অভিশাপ দিয়েছিলেন লৌহমুসল দ্বারা যদুবংশ ধ্বংস হবে। সেই অভিশাপ সত্য করার জন্য কৃষ্ণ যেহেতু মহাত্মা যদুর বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাই তিনিও সেই লৌহ অংশ দ্বারা নির্মিত বাণের আঘাতে মৃত্যু স্বীকার করেছিলেন। আর ব্যাধটি ছিল পূর্বকালে বালীপুত্র অঙ্গদ। রামের বাণের

আঘাতে বালী বধ হলেও অঙ্গদ রামের ভক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র বলেছিলেন পরবর্তীতে অঙ্গদের বাণের আঘাতে তিনি মৃত্যু বরণ করবেন। কৃষ্ণলীলায় তাই ব্যাধের বাণের আঘাতে কৃষ্ণ অপ্রকটলীলা করলেন।

প্রশ্ন ৫১। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের উদ্দেশ্যে কেন শিবপূজা করেছিলেন, তাঁরা তো তাঁর অধীন?

উত্তর ঃ এই জগতে লীলাবিলাস কালে ভগবান অনেক সময় নিজেকে সাধারণ অসহায় ব্যক্তি এবং তাঁর ভক্তকে মহান সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে ভক্তের সম্মাননা করে থাকেন।

প্রশ্ন ৫২। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অর্জুনের যুদ্ধরথকে কয়েকবার বিপক্ষ দলের বাণাঘাত থেকে রক্ষা করতে কৃষ্ণ বহু দূরে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন?

উত্তর ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে বিচক্ষণ সারথির পক্ষে রথকে কখনও সামনে নেওয়া, কখন পিছিয়ে নেওয়া—এগুলি নিয়ম। বিপক্ষ দলের কাছে কৃষ্ণ নিজেকে সাধারণ শক্তি সম্পন্ন মানুষরূপে প্রকাশমান হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৫৩। কৃষ্ণের পিতা ও পিতামহের নাম কি?

উত্তর ঃ কৃষ্ণের পিতার নাম শ্রীনন্দ ঘোষ, পিতামহের নাম শ্রীপর্জন্য ঘোষ।

প্রশ্ন ৫৪। কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরের পালক থাকে কেন?

উত্তর ঃ ময়ূরের পালক পবিত্র। কৃষ্ণ ওটা মাথায় গুঁজতে ভালবাসেন।

প্রশ্ন ৫৫। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের নাম কি?

উত্তর ঃ প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসেন, শ্রুতকীর্তি, শতানীক ও শ্রুতকর্মা।

প্রশ্ন ৫৬। কুরুক্ষেত্রে অর্জুন যে রথে চড়ে যুদ্ধ করছিলেন, সেই রথের নাম কি?

উত্তর ঃ কপিধ্বজ।

প্রশ্ন ৫৭। কলির বাবা মা কে?

উত্তর ঃ কলির বাবা—ক্রোধ; মা—হিংসা।

প্রশ্ন ৫৮। কলিযুগে কোন্ সতী নারীর মাতৃজঠরে জন্ম হয় নি?

উত্তর ঃ শ্রীল অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবীর।

প্রশ্ন ৫৯। সতী গান্ধারীর শতপুত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হয়। পাণ্ডবেরাই তাঁর পুত্রদের হত্যা করেছিল। পাণ্ডবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে গান্ধারী কিরূপে দেখতেন?

উত্তর ঃ সতী গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে কখনও শত্রু বলে মনে করেননি, বরং তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করেছিলেন এভাবে—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব!

"হে দেবতাদেরও আরাধ্য ভগবান! তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমি বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই অর্থ, তুমিই আমার সর্বস্ব।"

প্রশ্ন ৬০। যমরাজের পরিচয় কি?

উত্তর ঃ সূর্যদেবের পুত্র যম। তিনি নরক গ্রহের রাজা। পৃথিবীতে পাপাচারী মানুষদের দেহত্যাগ কালে যমরাজের দূতেরা পাপাত্মাকে যমসদনে নিয়ে যায়। সেখানে পাপীদের উপযুক্ত দণ্ডদান করা হয়। যদিও পাপাচারীদের কাছে যমরাজ মহা ভয়ংকর, কিন্তু তিনি একজন মহাজন। ভক্তদের কাছে তিনি মহান বৈষ্ণব বলে পরিচিত। কৃষ্ণপ্রাণা যমুনাদেবীর ভ্রাতা যম ঠাকুর সংসারবদ্ধ জীবকে কৃষ্ণনাম করতে দেখলে আনন্দিত হন, কিন্তু ভক্তিবিমুখ জনগণের প্রতি তিনি অত্যন্ত কঠোর দণ্ড পরায়ণ।

প্রশ্ন ৬১। শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষামৃত থেকে পাই যে, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের উচিত ভগবানের আরাধনা করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। তা হলে ত্রেতাযুগে শূদ্রপুত্র শম্বু ভগবানের কঠোর তপস্যা করলে রামচন্দ্র তাঁকে হত্যা করলেন কেন?

উত্তর ঃ ভগবদ্‌ভক্তের নির্দেশ অনুসারে চললে বিপত্তির সমাধান হয়। শম্বুর মতো নিজের মনগড়া পন্থায় তপস্যা করলে নতুন বিপত্তি এসে হাজির হয়।

প্রশ্ন ৬২। কৃষ্ণ—সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার।
যাহা কৃষ্ণ, তাহা নাহি মায়ার অধিকার॥

তাহলে ভগবান রামচন্দ্র কেন মায়ামৃগের প্রতি ধাবিত হলেন? মহিরাবণ কিরূপে মায়াদ্বারা রাম-লক্ষ্মণকে পাতালে নিয়ে গেলেন?

উত্তর ঃ মৃগরূপী মারীচ রাক্ষস ও মহিরাবণের বধ হওয়ার উদ্দেশ্যেই ভগবানের যোগমায়া শক্তিদ্বারা এসব লীলা সংঘটিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৬৩। পাণ্ডবরা ভগবানের ভক্ত ছিলেন, ধর্মপরায়ণ ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পক্ষেই ছিলেন। অথচ শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষীয় কৌরবদের চেয়ে পাণ্ডবদেরই বেশী কষ্ট পেতে হল কেন?

উত্তর ঃ যদিও পাণ্ডবদের দুর্দশা বেশী দেখা যাচ্ছিল, তবুও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়ার জন্য তাঁরা সমস্ত দুর্দশা সহজে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। আর বিপক্ষীয় কৌরবদের আপাতভাবে সুখপ্রাপ্তি হল বলে মনে হলেও তাঁরা কিন্তু প্রকৃত সুখী ছিলেন না।

প্রশ্ন ৬৪। বৃন্দাবনে বংশীবদন ময়ূরপুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজবাসীরা দেখার জন্য অস্থির হতেন, অথচ একসময় গোপীরা রাজবেশধারী কৃষ্ণকে দেখে তেমন আকৃষ্ট হননি। তা হলে দ্বারকারাজ কৃষ্ণ কি কম আকর্ষণীয়?

উত্তর ঃ গোপীদের ক্ষেত্রে ব্রজরাখাল কৃষ্ণই অধিকতর আকর্ষণীয়। দ্বারকারাজ কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীল সূত গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, দ্বারকার অধিবাসীরা প্রতিদিন কৃষ্ণকে দর্শন করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা রোজই বারবার কৃষ্ণকে দেখার জন্য আকুল হয়ে থাকতেন। এ থেকে বোঝা যায়, লোকে শ্রীকৃষ্ণকে রোজ রোজ দর্শন করেও তৃপ্ত হত না। তারা অনবরতই দর্শন করতে চাইত। কৃষ্ণ চিরকালই অধিক আকর্ষণীয়।

প্রশ্ন ৬৫। মাতৃজঠরে অবস্থান কালে কোন্ ব্যক্তি ভগবদ্‌তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেন?

উত্তর ঃ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ।

প্রশ্ন ৬৬। দশজন পতির সঙ্গে কোন্ মহা সতীর বিবাহ হয়েছিল?

উত্তর ঃ কণ্ডুমুনির কন্যা মারিষাদেবী ব্রহ্মার নির্দেশে দশজন প্রচেতাকে বিবাহ করেন।

প্রশ্ন ৬৭। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নীদের নাম-পরিচয় কি?

উত্তর ঃ মিথিলার রাজা সীরধ্বজ জনকের দুই কন্যা হচ্ছেন সীতা ও ঊর্মিলা। জনকের ছোট ভাই কুশধ্বজের দুই কন্যা—মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি। সেই কন্যাদের সঙ্গে অযোধ্যারাজ দশরথের চারপুত্রের বিবাহ হয়। সীতা, ঊর্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি যথাক্রমে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের ধর্মপ্রাণা পত্নী। লব ও কুশের জননী সীতাদেবী এবং অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুর মাতা ঊর্মিলা।

প্রশ্ন ৬৮। জাতগোসাঁই কাদের বলে?

উত্তর ঃ 'গোস্বামী' কথাটি থেকে চলিত ভাষায় 'গোসাঁই' হয়েছে। গো-মানে ইন্দ্রিয়, মন সহ চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক—এই ছয় ইন্দ্রিয়। স্বামী মানে প্রভু। ইন্দ্রিয়গুলির প্রভু। সাধারণ মানুষ গোদাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির অধীন। তাদের স্বভাব হচ্ছে—মন যা চায় তাই খাও, মন যা চায় তাই করো। তারা গো-দাস। কিন্তু গোস্বামীদের চরিত্র সাত্ত্বিক। তাঁরা আমিষ আহার, জুয়া লটারী, অবৈধ সঙ্গ, নেশা ভাং ইত্যাদি পাপাচার সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলেন। কিন্তু সেই রকম গোস্বামীদের পরিবারে যাঁরা জন্ম নিয়েছেন বর্তমানে তাঁরা তেমন কোন বিধিনিয়ম না পালন করলেও যেহেতু সেই পরিবারে জাত হয়েছেন, সেই জন্যে তাঁরা জাতগোসাঁই বলে নিজেদেরকে আখ্যাত করেন।

প্রশ্ন ৬৯। পৃথিবীতে ভূত বলে কোন বস্তু যদি থাকে, তবে একটু ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ঃ জড়জগতের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি অপঘাতে মরলে, স্থূল শরীরহীন জীবাত্মা সহজে অন্য শরীর পায় না, এবং তার সূক্ষ্মশরীরে কামনাবাসনা সবই থাকে। তখন যে কোন মানুষকে দেখলেই সেই জীবাত্মাও তাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে। তখন যে ব্যক্তিতে বিদেহী আত্মাটি আশ্রয় নেয়, সেই ব্যক্তির মস্তিষ্ক বা চেতনা বিকৃত হয়ে যায়। সে উন্মত্তের মতো আচরণ করে ও প্রগল্‌ভ কথাবার্তা বলতে থাকে। সেই বিদেহী আত্মা অর্থাৎ ভূতটিকে তাড়ানোর জন্য ওঝাকে এনে মন্ত্র মাধ্যমে তাড়াতে হয়। এই

ঘটনা অনেকে দেখে থাকেন। যারা সর্বদা হরিনাম করেন, পবিত্র থাকেন তাদের ঘাড়ে ভূত ভর করতে সাহস পায় না। বরং হরিনামের প্রভাবে ভূত উদ্ধার পেয়ে যায়।

প্রশ্ন ৭০। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে অবলম্বন করলেন, কৌরবপক্ষে থাকলেন না কেন?

উত্তর ঃ দুই পক্ষের দুইজন—অর্জুন ও দুর্যোধন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের দলে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু কৃষ্ণ বললেন—তোমরা একপক্ষ আমাকে নিতে পারো আর অন্য পক্ষ আমার নারায়ণী সেনাদল নিতে পারো। দুর্যোধন কৃষ্ণকে চায়নি, কৃষ্ণের নারায়ণী সৈন্যদের চেয়েছিল। অর্জুন একমাত্র কৃষ্ণকে চেয়েছিলেন, যদিও তিনি জানতেন কৃষ্ণ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না।

জগতে ভগবান আবির্ভূত হন দুষ্ট অসাধুদের দমন করবার জন্য এবং শিষ্ট বা সাধুদের ত্রাণ করবার জন্য। পাণ্ডবরা ধর্মপ্রাণ সাধুপ্রকৃতির। কিন্তু কৌরব বা দুর্যোধনের পক্ষের অধিকাংশই অধার্মিক। অতএব স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করলেন।

প্রশ্ন ৭১। দেবকীর পিতার নাম কি?

উত্তর ঃ দেবকীর পিতার নাম দেবক। ইনি উগ্রসেনের ভ্রাতা।

প্রশ্ন ৭২। বসুদেব ও দেবকীর পূর্বজন্মের ইতিহাস কি?

উত্তর ঃ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বসুদেব ছিলেন সুতপা নামে প্রজাপতি এবং দেবকী ছিলেন তাঁর পত্নী পৃশ্নি। ব্রহ্মা পৃশ্নি-সুতপাকে প্রজা সৃষ্টি করতে নির্দেশ দিলে তাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করলেন যে, তাঁদের সন্তান যেন ভগবান শ্রীহরির মতোই যাতে হয়। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা দুইজনে বনের মধ্যে কঠোরভাবে তপস্যা শুরু করলেন। এভাবে বারো হাজার বছর অতিবাহিত হল। তারপর একদিন শ্রীহরি তাঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করতে চাইলে, পৃশ্নিদেবী বললেন, 'হে প্রভু, আপনার মতো সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র যেন আমার উদরে জন্ম গ্রহণ করে, সেই বর দান করুন।' শ্রীহরি বললেন, 'আমার সমান তো কেউই নেই। তাই আমি তিন সত্য করে বলছি, আমিই তোমাদের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করব।'

তারপর ভগবান শ্রীহরি তিনবার তাঁদের পুত্ররূপে জন্মলীলা প্রকাশ করেন। প্রথমবারে সুতপা ও পৃশ্নির পুত্ররূপে পৃশ্নিগর্ভ, দ্বিতীয়বারে কশ্যপ ও অদিতির পুত্ররূপে বামনদেব এবং তৃতীয়বারে বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন।

প্রশ্ন ৭৩। চতুর্দশীর দিন যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন। তারপর রাত্রি দুপুরে বিরোচন যখন ঘুমাচ্ছিল তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে বিরোচনের দরজার কাছে অগ্নিসংযোগ করতে আদেশ দেন। জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করা হল। জতুগৃহে এক ব্রাহ্মণী ও পাঁচ ব্রাহ্মণ ছিল। প্রশ্ন হল তাঁরা কে?

উত্তর ঃ আমার প্রশ্ন হল, আপনি এই কথাগুলি কোথা থেকে পেলেন? বিরোচন, এক ব্রাহ্মণী, পাঁচ ব্রাহ্মণ—এই সব ব্যক্তিরা সেখানে ছিল না। যখনই কোনও ঘটনা পড়ে থাকেন, তা হলে অবশ্যই গ্রন্থের নাম ও অধ্যায় উল্লেখ করবেন।

আমরা মোটামুটি আদিপর্ব মহাভারত থেকে জেনেছি যে, গোপন সূত্রে যুধিষ্ঠির অবগত হয়েছিলেন দুরাত্মা পুরোচন চতুর্দশীর রাতে পাণ্ডববংশ বিনাশ করবার উদ্দেশ্যে জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করবে। যুধিষ্ঠির আরও বুঝতে পেরেছিলেন যে, জতুগৃহ ছেড়ে আগেভাগে পাণ্ডবরা যদি হস্তিনাপুরে চলে আসে তবে বলপূর্বক বদ্‌বুদ্ধি দুর্যোধন তাদের বিনাশ সাধন করবে। ইতিমধ্যে দিবারাত্র আতঙ্কিতভাবে কুন্তীদেবী সহ পঞ্চপাণ্ডব কালাতিপাত করছিলেন। চতুর্দশীর রাতেই আগত বহু ব্রাহ্মণকে কুন্তীদেবী অন্নপানাদি ভোজন করালেন। বহু স্ত্রীলোকেরাও ভোজন করেছিলেন। ভোজনের পর তাঁরা নিজ নিজ স্থানে গমন করেন। তারপর এক নিষাদজাতির মহিলা তার পাঁচপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আহারের জন্য অন্ন প্রার্থনা করলে কুন্তীদেবী তাদেরও অন্নপানাদি দান করেন। সেই নিষাদী ও তার পুত্ররা ভোজনের পরে প্রচুর মদ্য পান করে নেশায় বুঁদ হয়ে মড়ার মতো জতুগৃহের কাছে পড়ে থাকল।

ধর্মাত্মা বিদুর সঙ্কেতে বুঝতে পেরেছিলেন বদ্‌বুদ্ধি দুর্যোধন পাণ্ডব নিধনের উদ্দেশ্যে পুরোচনকেই নিয়োগ করেছে। সেই চতুর্দশীর রাতটি ছিল অত্যন্ত বিভীষিকা পূর্ণ। কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ভীমসেন তাঁর মা ও ভাইদের নিয়ে অন্যত্র সরে পড়বার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। আতঙ্কিত মনে বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি পুরোচনের দরজার কাছে এবং জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করেছিলেন।

প্রশ্ন ৭৪। পৃথিবীতে শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কত বছরের কনিষ্ঠা ছিলেন?

উত্তর ঃ এক বছরের কনিষ্ঠা।

প্রশ্ন ৭৫। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গাভীদের নামগুলি কি কি?

উত্তর ঃ শ্যামলী, ধবলী, মঙ্গলা, পিঙ্গলা, হংসী, বংশীপ্রিয়া, গঙ্গা, পিশঙ্গা ইত্যাদি অসংখ্য নামের ধেনু রয়েছে। শ্রীমায়াপুর ইসকন গোশালায় বহু গাভীর নাম উল্লেখ করা রয়েছে।

প্রশ্ন ৭৭। শিব ঠাকুর গাঁজা খান, নেশাভাঙ করেন, শ্মশানে বাস করেন, একথা কি সত্য?

উত্তর ঃ পরম বৈষ্ণব শিব ঠাকুর গাঁজা খান না, নেশাভাঙ করেন না, শ্মশানে বাস করেন না। তিনি শ্রীহরির ধ্যানে বসে থাকেন, শ্রীহরির প্রসাদ গ্রহণ করেন, তাঁর বাস কৈলাসে। তিনি শ্রীহরির নাম জপ ও কীর্তন করেন। শ্রীহরির লীলাবিলাস দর্শনের নিমিত্ত তিনি তৎপর হন।

ভূত-প্রেত-পিশাচশ্রেণীর লোকেরা যাতে সাধু-সমাজে, এমনকি লোকালয়গুলিতে যাতে অনর্থক উৎপাত সৃষ্টি না করে সেজন্য এই জড় সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবী কালীরূপে

এবং দুর্গাপতি শিবঠাকুর ভূতনাথ রূপে সেই তামসিক লোকদের দূরে সরিয়ে নিয়ে নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখার ব্যবস্থা করেন। সেই জন্যে জঙ্গলে কিংবা শ্মশানের কাছে তাদের সরিয়ে নেন। ভদ্র মানব-সমাজে যে সমস্ত অখাদ্যগুলি কেউ পছন্দ করে না, সেই অখাদ্যগুলিকে প্রিয় খাদ্যরূপে তামসিক লোকেরা সাদরে গ্রহণ করে থাকে। অমেধ্যং তামসপ্রিয়ম্। বিড়ি, চুরুট, গাঁজা, খৈনী, দোক্তা, তামাক, মদ, চরস, হাঁড়িয়া, রক্ত, মাংস, হাড় ইত্যাদি নোংরা বিষাক্ত জিনিষগুলি তারা গ্রহণ করে থাকে। কর্মদোষে এগুলিতে যাদের ঐকান্তিক প্রীতি জন্মেছে তারা দেবী ও মহাদেবকে মাংসভুক ও নেশাভাঙকারী রূপে দর্শন পূর্বক মনগড়া শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে।

প্রশ্ন ৭৮। জগন্নাথদেবের মাসীর বাড়ীর নাম গুণ্ডিচা, তবে মাসীর নাম কি?

উত্তর ঃ গুণ্ডিচা হচ্ছেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাণীর নাম। তিনি জগন্নাথের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী। তিনি জগন্নাথের মাসী নন। জগন্নাথের মাসীর নাম অর্ধাশনী দেবী। তাঁর বাড়ী বড় দাণ্ডের পূর্বপাশে জগন্নাথ মন্দির ও গুণ্ডিচা মন্দিরের মাঝামাঝি স্থানে।

প্রশ্ন ৭৯। দ্বাপর যুগে কোন রাজার এক হাজার বাহু ছিল?

উত্তর ঃ প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র অর্থাৎ, বলি মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণ। বাণ রাজা তপস্যা করে শিবের বরে এক হাজার বাহু যুক্ত এবং মহাশক্তিশালী হয়েছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রায় বাহুগুলি কেটে গিয়েছিল।

প্রশ্ন ৮০। শ্রীমতী রাধারাণীকে কেন 'মা' বলা হয় না?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণকে পরম পিতা বলা হয়। অতএব রাধারাণীকে পরম মাতা বলে মনে করা উচিত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধারাণীকে 'ব্রহ্মাণ্ড জননী' বলা হয়েছে, পদ্ম পুরাণে স্বয়ং শিবের উক্তি হল, *কৃষ্ণঃ জগতাং তাতঃ জগন্মাতা চ রাধিকা।* জগৎপিতা কৃষ্ণ এবং রাধারাণী হচ্ছেন 'জগন্মাতা।' শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে, 'সর্ব পালিকা, সর্ব জগতের মাতা।'

বেদশাস্ত্রে বলা হয়েছে, রাধারাণী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মা। পার্বতীর কাছে মহাদেব রাধারাণীর সহস্র নাম বলতে গিয়ে বললেন, 'জননী জন্মশূন্যা চ জন্মমৃত্যুজরাপহা।' অর্থাৎ, রাধারাণী সবার মাতা, প্রকৃত পক্ষে তাঁর কোনও মা নেই। তিনি 'জন্মশূন্যা'। আমাদের জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির দুঃখক্লেশময় চক্র থেকে তিনি মুক্ত করেন। 'জন্মমৃত্যুজরাপহা'। মহাদেব বলেছেন, শ্রীরাধা 'নীতির্গতির্মতিরভীষ্টদা।' তিনি নীতি, আমাদের পরমগতি, আমাদের পরম অভীষ্ট প্রদান করেন। কিন্তু যে পাগলদের মস্তিষ্কে রাধারাণীতে মাতৃভক্তি থাকলো না, যারা 'মা' বলে ভাবতে পারল না, সেই মূঢ়দের নীতি, গতি ও অভীষ্ট কি ধরনের?

প্রশ্ন ৮১। তেত্রিশ কোটি দেবতা বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ কোটি কোটি দেবতা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তেত্রিশ জন দেবতা প্রধান। সেই জন্যে কথায় লোকে তেত্রিশ কোটি দেবতা বলে থাকে। তেত্রিশ দেবতা হলেন বারো আদিত্য, এগারো রুদ্র, আট বসু, দুই অশ্বিনীকুমার।

প্রশ্ন ৮২। বসুদেব ও নন্দমহারাজের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধটি কি রূপ?

উত্তর ঃ যদুবংশে দেবমীঢ় নামে এক রাজা দুই বিবাহ করেন। তাঁর এক পত্নী ছিলেন বৈশ্য কুলের কন্যা এবং অন্য পত্নী ছিলেন ক্ষত্রিয় কুলের কন্যা। বৈশ্যার গর্ভে পর্জন্য এবং ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূরসেন নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। পর্জন্যের পুত্র হচ্ছেন নন্দ মহারাজ এবং শূরসেনের পুত্র বসুদেব। এই জন্য নন্দ মহারাজ হচ্ছেন বসুদেবের ভাই ও পরম সুহৃদ।

প্রশ্ন ৮৩। কলিযুগ কি? কলির কাজ কি?

উত্তর ঃ চারযুগের মধ্যে কলি একটি যুগের নাম। কলি একজন ব্যক্তি। তাঁর রাজত্বকালের মেয়াদ চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর ব্যাপী।

কলির কাজ হল জনসমাজে কলহ ও হিংসা বাধিয়ে দেওয়া। মাছ-মাংস আহার, নেশা দ্রব্য, জুয়া লটারি ও অবৈধ যৌনতার দ্বারা মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখা।

প্রশ্ন ৮৪। দুর্গা দেবীর মা-বাবার নাম কি?

উত্তর ঃ দুর্গা দেবীর বাবার নাম দক্ষ এবং মায়ের নাম প্রসূতি।

প্রশ্ন ৮৫। মা দুর্গা আমাদের প্রতি কি নির্দেশ দান করেছেন?

উত্তর ঃ মা দুর্গা নির্দেশ দিয়েছেন—

হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ।

"নিত্য হরিনাম কীর্তন কর।" (স্কন্দ পুরাণ)

প্রশ্ন ৮৬। শিবের বাহন বৃষ, ব্রহ্মার বাহন হংস, যমের বাহন কে?

উত্তর ঃ মহিষ।

প্রশ্ন ৮৭। দুমাথা, তিনমাথা, চারমাথা, পাঁচমাথা, ছয়মাথা দেবতা কে?

উত্তর ঃ অগ্নিদেব দুইমাথা, কুবেরদেব তিনমাথা, ব্রহ্মা চারমাথা, শিব পাঁচমাথা, কার্তিক ছয় মাথা। তাঁরা সবাই একমাথা বিষ্ণুর ভক্ত।

প্রশ্ন ৮৮। যম ও যমুনা—ভাইবোন। তাঁদের পিতা কে?

উত্তর ঃ সূর্যদেব।

প্রশ্ন ৮৯। সত্য যুগের যুগাবতার ভগবান নারায়ণ কি লীলা করেছিলেন এবং কার ঘরে জন্মলীলা প্রকাশ করেছিলেন?

উত্তর ঃ ধর্ম এবং তাঁর পত্নী মূর্তিদেবীর পুত্ররূপে ভগবানের অবতার দুই যমজ সন্তান নর ও নারায়ণ নামে জন্মলীলা প্রকাশ করেন। তাঁরা মানব সমাজকে সত্যযুগের যুগধর্ম ধ্যান-তপস্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য অল্প বয়সেই হিমালয়ের বদ্রিকাশ্রমে গিয়ে ধ্যান শুরু করেন। স্বর্গরাজ ইন্দ্র নর-নারায়ণকে ধ্যানরত দেখে মনে করেছিলেন এই ঋষি তাঁর স্বর্গরাজ্য দখল করে নিতে পারেন। সেই জন্যে বুঝি তপস্যা করছেন। এই ভয়ে ইন্দ্রদেব নর-নারায়ণের তপস্যা ভঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে স্বর্গের সুন্দরী অপ্সরাদের প্রেরণ করেন। অপ্সরাগণ এসে নৃত্য গীত শুরু করলে ভগবান নারায়ণ আপন অঙ্গ থেকে

অসংখ্য সুন্দরী লক্ষ্মীদের প্রকাশ করতে লাগলেন। লক্ষ্মীগণ নৃত্যগীত আরম্ভ করলে অপ্সরাগণ নিজেদেরকে ময়ূরের দলের মধ্যে পেঁচা তুল্য জ্ঞান করে লজ্জায় ভয়ে সংকুচিত হয়ে লুকিয়ে পড়লেন। নারায়ণের অঙ্গ থেকে প্রকাশিত উর্বশীর রূপে মোহিত হয়ে স্বর্গরাজ ইন্দ্র বসেই থাকলেন। নারায়ণ তাঁকে উর্বশীকে প্রদান করলে, তিনি উর্বশী সঙ্গে স্বর্গে ফিরে গেলেন। অন্যান্য লক্ষ্মীরা নারায়ণের অঙ্গে প্রবিষ্ট হলেন। তখন লুক্কায়িত অপ্সরাগণ নারায়ণের পদতলে আত্মনিবেদন করে বলতে লাগলেন—হে প্রভু, আমরা আপনার দাসী, আমাদের আপনিই একমাত্র গতি। স্বর্গরাজ্য থেকেও আমরা বঞ্চিত। আপনি আমাদের দাসীরূপে গ্রহণ করুন। নারায়ণ বললেন—এখন সত্যযুগ। এখন তোমরা ধ্যান তপস্যা কর, দ্বাপর যুগে আমি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হলে তোমরা ব্রজে গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করবে এবং তখন তোমাদের পত্নীরূপে গ্রহণ করব।

প্রশ্ন ৯০। কারাগারে দেবকীর গর্ভে প্রথম থেকে ষষ্ঠ সন্তানগুলি কারা? তাদের কি অপরাধ ছিল যাতে জন্মের পরেই কংসের হাতে মরতে হল?

উত্তর ঃ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার পুত্র মরীচি ঋষির ছয় পুত্র ছিল। অপ্সরা তিলোত্তমাকে দেখে কাম মোহিত হয়ে ব্রহ্মা তার পিছনে ধাবিত হলে মরীচি পুত্ররা পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখে পরিহাস করেছিল। তাতে ব্রহ্মা হতচকিত হয়ে তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'তোমরা অসুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর।' অভিশাপ মুক্তির উদ্দেশ্যে মরীচি পুত্ররা ব্রহ্মার চরণে মিনতি করলে ব্রহ্মা বললেন, 'পৃথিবীতে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে ভগবান অবতীর্ণ হবেন, তাঁরই উচ্ছিষ্ট ভোজন করলে তোমরা শাপমুক্ত হবে।'

এই ঘটনার পর মরীচির সেই ছয় পুত্র—অসুর হিরণ্যাক্ষের পুত্র কালনেমি—তারই পুত্ররূপে জন্ম লাভ করে। অসুরের পুত্ররূপে জন্ম নিলেও পূর্বসংস্কার বশে তারা ভগবানের উপাসনা করতে লাগল। সেইজন্যে হিরণ্যাক্ষের ভাই ভগবদ্‌ বিরোধী হিরণ্যকশিপু সেই ছেলেদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেয়—'তোমরা পিতৃকুলের মর্যাদা নষ্ট করে পিতৃশত্রু শ্রীহরির উপাসনা করছ, অতএব তোমাদের পিতৃহস্তে মৃত্যু হবে।'

কিন্তু তাদের পিতা কালনেমি দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভগবানের সুদর্শন চক্রে নিহত হয়।

অসুরের বংশধর হলেও হিরণ্যকশিপুর প্রপৌত্র ভগবদ্ভক্ত বলী ভগবান শ্রীবামনদেবের আদেশে সুতল লোকে গমন করেন এবং কালনেমির সেই ছয় পুত্রও সুতললোকে বাস করে। কিন্তু তারা শাপমুক্ত হতে পারেনি। শাপমুক্তি হতে হলে—পিতার হাতে মরতে হবে এবং ভগবানের উচ্ছিষ্ট খেতে হবে। অসুর কালনেমি জন্ম নিল কংসরূপে। যোগমায়া তখন মরীচিপুত্রদের শাপমোচন করার উদ্দেশ্যে দেবকীগর্ভে তাদের একে একে আনিয়ে কংসের হাতে বধ করালেন। তারা তখন হিরণ্যকশিপুর অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে আবার সুতললোকে গমন করে। কিন্তু ভগবানের উচ্ছিষ্ট ভোজন করার বিষয়টি তখনও ঘটেনি।

ভগবান কৃষ্ণ দেবকীর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তারপর ব্রজলীলা ও মথুরালীলা শেষ করে দ্বারকালীলার সময় মা দেবকী একসময় কৃষ্ণকে বলেন, 'হে কৃষ্ণ, তুমি সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে পরলোক থেকে ফিরিয়ে এনেছ, সেই কথা জেনেছি। তোমার অগ্রজ ভাইদের—যারা কংসের হাতে নিহত—তাদেরকে কি তুমি ফিরিয়ে আনতে পারো?'

তখন কৃষ্ণ সুতললোক থেকে তাদের নিয়ে দ্বারকায় এলে শিশুরূপ সেই পুত্ররা দেবকীর স্তন পান করতে লাগল। দেবকীর স্তন প্রথমে শ্রীকৃষ্ণই পান করেছিলেন। অতএব সেই কৃষ্ণ-উচ্ছিষ্ট পান করেই তারা শ্রীব্রহ্মার শাপমুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

এভাবে মরীচির ছয় পুত্র—কীর্তিমান, সুষেন, ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দন ও ভদ্র—একটুখানি উপহাস করার ফলে কত কিছু দুঃখ আঘাত ব্যাঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল।

প্রশ্ন ৯২। হরিদাস ঠাকুর দৈনিক তিন লক্ষ নাম জপ করতেন। কিভাবে? সাধারণ মানুষ সেভাবে জপ করতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ হরিদাস ঠাকুর দৈনিক এক লক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে, এক লক্ষ নিজের শোনার মতো, বাকি এক লক্ষ মনে মনে জপ করতেন। সময় লাগতো বাইশঘন্টা মতো। আহার নিদ্রাদি নাই বললেই চলে। সারাদিনে দুঘণ্টা সেজন্যে। তিনি দিব্য কৃষ্ণনামে আবিষ্ট ছিলেন।

জড় বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সেভাবে দিব্য নামে আবিষ্ট থাকতে পারে না। কেননা তারা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে। একরাত জাগলেই সাতদিন ঝিমুনিভাব থাকে। এক মুহূর্ত জপ করতে গিয়ে অসংখ্যবার হাই তোলে। সেজন্যেই শ্রীল প্রভুপাদ ন্যূনতমপক্ষে ষোলমালা নিষ্ঠা সহকারে জপ করতে এবং কৃষ্ণভক্তিমূলক সংসারের যাবতীয় কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন ৯৩। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের রথের উপরে পতাকাতে কেন হনুমানের ছবি রাখা হয়েছিল?

উত্তর ঃ পবনপুত্র ভীমসেন একসময় এক পার্বত্য অঞ্চলে হনুমানকে দর্শন করে জানলেন, তিনি ত্রেতাযুগ থেকেই রয়েছেন, তিনি প্রবল শক্তিশালী। তিনি সম্পর্কে ভীমের বড় ভাই। উভয়েই পবনপুত্র। ভীম হনুমানের লেজটি ধরে সরাতে না পেরে, মহাশক্তিধর হনুমানকে ভীমসেন বলেছিলেন, 'আমরা এখন জ্ঞাতিদ্বন্দ্বস্বরূপ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েছি, আপনি ধর্মের পক্ষে থেকে অধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমাদের সহায়তা করুন।' হনুমান বললেন, 'আমার আদৌ যুদ্ধ করতে ইচ্ছা নেই। আমার যুদ্ধ করারও প্রয়োজন নেই। তোমার অনুরোধ রক্ষার্থে একটি নির্দেশ দিচ্ছি। কেবল তোমাদের সেনাপতির রথের পতাকাতে আমার একটা ছবি রাখলেই তোমরা যুদ্ধজয়ী হতে পারবে।'

প্রশ্ন ৯৪। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটকালে তাঁর দিব্য দেহখানি কিভাবে সৎকার হয়েছিল?

উত্তর ঃ যোগীরা আগ্নেয়ী যোগ ধারণা দ্বারা স্বচ্ছন্দে নিজ শরীর দগ্ধ করে লোকান্তরে গমন করেন। কিন্তু প্রভাসক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই আগ্নেয়ীযোগ প্রকাশ করলেও তাতে দিব্য দেহ দগ্ধ না করেই নিজ নিত্যধামে গমন করলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলছেন—

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্ ।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্ ॥

"ধ্যানধারণার বিশুদ্ধ মঙ্গলময় সর্বলোকের তৃপ্তিবিধায়ক সর্বলোকের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ নিজ দিব্য দেহ আগ্নেয়ী যোগধারণা দ্বারা দগ্ধ না করেই নিজ নিত্য ধামে প্রবিষ্ট হলেন।" এভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৩১/৬) বর্ণিত হয়েছে সশরীরেই শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে প্রবিষ্ট হলেন। আমাদের মতো তিনি দেহত্যাগ করছেন না। আমরা দেহত্যাগ করলে তো দেহটিকে কেউ না কেউ সৎকার করবে, অন্যথায় শেয়াল শকুন কিংবা অন্য কেউ ভক্ষণ করবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দিব্যদেহ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনীতে বলা হল—

ধারণা আগুনি জ্বালি, দেখাইল গাত্র হরি,
নিজরূপে গেলা নিজ-ধাম ।
লোকের আশ্রয়গতি, ধ্যান-ধারণা স্থিতি,
অশেষ মঙ্গল অভিরাম ॥
না দহিল নিত্যদেহ, তে কারণে তনুসহ,
অচ্যুত অচ্যুতপুরে গেলা ।
দুন্দুভি-বাজনা বাজে, সুরবধূগণ নাচে,
পুষ্পবরিষণ, দিব্যমালা ॥

অতএব দেহ সৎকারের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন ৯৫। সীতাদেবীর বাবা জনকঋষি রাজা হয়েও কেন লাঙ্গল দিয়ে ভূমি কর্ষণ করতে গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভায় দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণদের চরণ ধৌত করতে। তিনি লক্ষ্মীপতি, তিনি দ্বারকার রাজা, তিনি পরমেশ্বর ভগবান। তিনি কিনা যজ্ঞ উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত সকল ব্রাহ্মণদের পদ প্রক্ষালন সবায় নিযুক্ত ছিলেন। রাজপুত্র হয়েও কৃষ্ণকে ছোটবেলা থেকে গরু চরানোর কাজ করতে হত। ভগবানের মা-বাবা হয়েও দেবকী-বসুদেবকে কংসের কারাগারে বহুদিন যাবৎ বন্দী থাকতে হয়েছিল। রাজা হয়েও রন্তিদেব প্রজাদের খাদ্য দেবার অভিলাষে নিজে বহুদিন যাবৎ উপবাসী ছিলেন। রাজপুত্র হয়েও শ্রীরামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছর ধরে বনবাদাড়ে দিন যাপন করতে হয়েছিল। এই কলিযুগেও দেখা যায় রাজপুত্র হয়েও রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নালা দিয়ে পরিত্যক্ত অন্ন কুড়িয়ে ধুয়ে ভোজন

করতেন। রাজকন্যা হয়েও শচীদেবী বৃন্দাবনে গিয়ে প্রায় অনাহারে হরিভজন করতে লাগলেন। সুতরাং, রাজর্ষি জনকের ভূমি কর্ষণের কর্ম দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই সবই ভগবানের কিংবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ।

দুর্বুদ্ধি অত্যাচারী রাক্ষস রাবণ মুনি-ঋষিদের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে এক বিশাল পাত্রে রেখেছিল। তারপর রাবণের অনুচরেরা সেই রক্ত মিথিলা রাজ্যের প্রান্তে ফেলে দিয়েছিল। তাই মিথিলার ভূমিতে কোন শস্য উৎপাদিত হত না। বৃষ্টিপাত হত না। ভূমি ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। কৃষকেরা মিথিলার রাজা জনকের কাছে তাদের দুরবস্থার কথা জানাতে লাগল। জনকরাজা তার কুলপুরোহিত ও অন্যান্য মহাত্মাদের সঙ্গে সেই সমস্যার কথা আলোচনা করলেন। তখন তত্ত্ববিদ্ পুরোহিতগণ ধর্মপ্রাণ রাজা জনককে বলেছিলেন, 'মহারাজ, আপনি স্বয়ং হল ধারণ করুন, তাতে লক্ষ্মীদেবী আপনার কাছে ধরা দেবেন।' তাঁদের নির্দেশ মতো জনকরাজা লাঙ্গল ধারণ করেছিলেন। লক্ষ্মীদেবী—সীতাদেবী সেই ভূমি থেকে উত্থিত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৯৬। বৈষ্ণবদের নেশাদ্রব্য খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে, মাছ মাংস খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু পরম বৈষ্ণব শিব কেন নেশাদ্রব্য খেতেন বা ধূমপান করতেন, বৈষ্ণবী কালী কেন মাছ-মাংস খান?

উত্তর ঃ নেশাদ্রব্য, মাছ-মাংস কেবল বৈষ্ণবদেরই কেন, কারও পক্ষেই খাওয়া উচিত নয়। নেশা বা মাদকদ্রব্য এবং মাছ-মাংস বা আমিষ দ্রব্য সবই কোনও সভ্য মানুষের খাদ্য নয়। এসব অসভ্য শ্রেণীর মানুষের খাদ্য। *যক্ষ রক্ষাংসি ভূতানি পিশাচা পিশিতাসনাঃ*। মাদক এবং রক্ত মাংস হাড় পিত্ত এগুলি অমেধ্য দ্রব্য। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*অমেধ্যং তামস প্রিয়ম্* (গীতা ১৭/১০) তামসিক লোকেরাই অমেধ্য দ্রব্য খেতে পছন্দ করে। সেই সমস্ত তামসিক লোকেরা সাধারণত উগ্র, তামসিক ক্রিয়াকলাপেই রত হয়। তারা সমাজে কাম ক্রোধের বশীভূত হয়ে নানাবিধ উৎপাত করতে চেষ্টা করে। তারা সাধারণত ভূত প্রেত পিশাচ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

পরম বৈষ্ণব শিব সেই সব উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোকদের নিজ আয়ত্তাধীন করে তাদের শান্ত করে রাখতে সচেষ্ট হন। সেই জন্য শিবের অন্য নাম ভূতনাথ। শিবের কৃপায় সমাজে তারা খুব বেশি একটা উৎপাত করে না। জড়জগতের অধিষ্ঠাত্রী শিবানী বা কালীরও সেইরকম ভূমিকা রয়েছে। যক্ষিণী, পিশাচী, ডাইনীদের নিজ আয়ত্তে নিয়ে তাদের শান্ত করে রাখবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু এই উগ্র ও তামসিক শ্রেণীর লোকেরা আপন স্বভাবের অনুরূপে তাদের আশ্রয় শিব বা কালীকে তারা দর্শন করতে চায়। সেই জন্য শিবের হাতে গাঁজা কলকে, কালীর মুখে রক্তমাংস—এইভাবে তারা আরাধনা করে। গাঁজাপ্রিয় উন্মত্ত তামসিক মানুষেরা তাই অনেক সময় পরম বৈষ্ণব শিবকে গাঁজাবাবা, পাগ্‌লাবাবা ইত্যাদি নামেও অভিহিত করতে পছন্দ করে। তাদেরই চোখে হয় তো শিব বা শিবানী সেই ভাবেই দৃষ্ট হন।

প্রশ্ন ৯৭। জগাই ও মাধাইয়ের বাবা-মায়ের নাম কি? অতি অবশ্যই জানাবেন।

উত্তর ঃ নবদ্বীপের তৎকালীন জমিদার শুভানন্দ রায়ের দুই পুত্র ছিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ রায় এবং কনিষ্ঠ পুত্র জনার্দন রায়। জগাই বা জগন্নাথ রায়ের পিতা ছিলেন রঘুনাথ রায় এবং মাধাই বা মাধব রায়ের পিতা ছিলেন জনার্দন রায়। মায়ের নাম জানা যায় নি।

প্রশ্ন ৯৮। ধ্রুব মহারাজের পবিত্র বংশধর মহারাজ অঙ্গ অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত ছিলেন। অথচ তাঁর পুত্র বেণ কিভাবে ভয়ংকর দুশ্চরিত্র হলেন?

উত্তর ঃ মহারাজ অঙ্গের পত্নী ছিলেন মৃত্যুর কন্যা সুনীথা। তাঁর সঙ্গপ্রভাবে অঙ্গের বীর্য দূষিত হয়েছিল। ফলে বেণের মতো ভয়ংকর ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, বংশের পবিত্র পরম্পরা ধারা শুদ্ধ রাখার জন্য গর্ভাধান থেকে শুরু করে যতগুলি সংস্কার রয়েছে, সেইসবগুলি সন্তান ধারণের পূর্বে পালন করা উচিত। উপযুক্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা সংস্কার বিধিগুলি কঠোরভাবে পালন করা না হলে বংশধরেরা অশুদ্ধ হয়ে যায়, এবং ধীরে ধীরে পরিবারে পাপকর্ম হতে দেখা যায়।

প্রশ্ন ৯৯। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে জগন্নাথরূপে প্রকাশিত হলেন?

উত্তর ঃ ভগবানের নিত্যলীলায় একবার শ্রীকুরুক্ষেত্রে যুদ্ধোত্তর সূর্যগ্রহণ কালে ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও দ্বারকাবাসীদের সঙ্গে মিলিত হন। ব্রজবাসীরা কৃষ্ণ ও বলরামকে বহুদিন পরে দেখতে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। প্রত্যেকের মধ্যে গভীর প্রীতি ও ভালবাসার নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রকাশিত হল। শ্রীরাধারাণী ও অন্যান্য গোপিকারা এবং বাল্যসাথীদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের অধিকতর স্নেহ ও প্রীতি লক্ষ্য করা গেল।

তখন শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ উৎসুকচিত্তে রোহিণী দেবীর কাছে জানতে চাইলেন, সর্বপ্রকার সেবাপ্রযত্ন ও সর্ব সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানে কোথাও কিছু অভাব রয়েছে বলে বোধ হয়। সমস্ত বৈভব বিলাসের মধ্যেও তিনি বুঝি সর্বদা বৃন্দাবনের কথাই স্মরণ করেন। এর কারণ কি? তখন মা রোহিণী দেবী কৃষ্ণ ও বলরামের অগোচরে একটি শিবিকামধ্যে সন্তানদ্বয়ের শ্রীবৃন্দাবনলীলার বর্ণনা শুরু করলেন। বলদেবভগ্নী সুভদ্রাকে দ্বারী হিসাবে রাখা হল যাতে কৃষ্ণ-বলরাম এসে পৌঁছলে আগের থেকে সুভদ্রা দেবীর সংকেতে মা রোহিণী দেবী অন্য প্রসঙ্গ তুলতে পারবেন।

শ্রীবৃন্দাবনে সকলের সঙ্গে কৃষ্ণের সুনিবিড় সম্বন্ধ, শ্রীনন্দ-যশোদার পরম স্নেহ, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখাদের মধুর আচরণ, সখীদের গভীর প্রীতিভাব ও পরম ভক্তির পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধারাণীর ভাব এবং তাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ—এই সব কথা শুনতে শুনতে মহিষীগণের সর্বাঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার শুরু হল। দ্বারী সুভদ্রা দেবীও এমন ভাববিহ্বলতা হলেন যে, তাঁর হস্তপাদ সংকুচিত হয়ে গেল, নয়ন বিস্ফারিত হল।

এমন সময়ে বলরাম ও কৃষ্ণ সুভদ্রা দেবীর পাশে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি আপন লীলাকথা শ্রবণ করতে করতে উভয়েই কূর্মদশা প্রাপ্ত হলেন। তাঁদের হস্তপাদ শরীরের ভেতরে যেন প্রবিষ্ট হয়ে গেল, ডাগর শ্রীলোচনযুগল উন্মীলিত করে তাকিয়ে থাকলেন তাঁরা।

তখন শ্রীনারদ মুনি বীণা বাদন করতে করতে সেই স্থানে উপস্থিত হলে তাঁরা সকলেই সম্বিৎ ফিরে স্বাভাবিক অবস্থায় আসীন হন। ভগবানের এরূপ হস্তপাদ-সংকোচনের দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদেও মহাপ্রভুর বিরহ-ব্যাকুল অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

যখন শ্রীনারদ মুনি কৌতূহলী হয়ে বলতে লাগলেন—'হে প্রভু! আজকে আপনার যে নতুন রূপমাধুরী দেখলাম, তা কখনও ভুলতে পারি না।'

তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে মহর্ষি নারদ! ভারতবর্ষে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আমি এই রূপ ধারণ করে দারুবিগ্রহরূপে আবির্ভূত হব।'

শ্রীস্কন্দপুরাণে (উৎকল খণ্ড) বলা হয়েছে, সত্যযুগের শুরুতে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন নামে সূর্যবংশীয় এক পরম বৈষ্ণব রাজা মালবদেশের অবন্তীনগরীতে রাজত্ব করতেন। তিনি এই চর্মচক্ষুতে পৃথিবীতেই ভগবানকে দর্শন করার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হন। ভগবৎ প্রেরিত কোনও তৈর্থিক ব্রাহ্মণ তাঁকে শ্রীক্ষেত্রের শ্রীনীলমাধব বিগ্রহের কথা বলেন।

বহু সন্ধানের পর রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি নীলগিরির পশ্চাতে শবর নামক অনার্যজাতির অঞ্চলে বিশ্ববসু নামক এক শবর ভক্তের কাছ থেকে নীলমাধবের সন্ধান পেয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জানান। শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে ইন্দ্রদ্যুম্ন যাত্রা করে সংবাদ পান যে, নীলমাধব অদৃশ্য হয়ে গেছেন। নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সর্ববিঘ্নবিনাশক আদি নৃসিংহদেবকে বিশ্বকর্মানির্মিত পশ্চিমমুখী মন্দিরে স্থাপন করেন। শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ উদ্‌যাপিত হলে মহাসাগরের তীরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চিহ্নিত এক অলৌকিক কাষ্ঠখণ্ডের আবির্ভাব শোনা গেল। শ্বেতদ্বীপস্থ শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গ স্খলিত রোম দারুরূপ ধারণ করেছেন এবং সেই দারু বা কাষ্ঠতেই ভগবানের শ্রীমূর্তি প্রকটিত হবে। এই সকল ঘটনা মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নযোগে জানতে পেরেছিলেন। শ্রীনারদের আদেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন সংকীর্তন-উৎসবমুখে দারুরূপী বিষ্ণুকে মহাবেদীতে স্থাপন করে পূজা করলেন।

উৎকল ভাষায় রচিত 'দেউল তোলা' নামক পুস্তকে বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবানের শ্রীমূর্তি নির্মাণের জন্য বহু শিল্পীকে আহ্বান করা হলেও সকলেই ব্যর্থ হয়। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ভেঙে যায়, তবুও কেউ দিব্যকাষ্ঠে একটুও দাগ বসাতে পারে না। ভগবৎ-প্রেরিত অনন্ত মহারাণা নামে এক বৃদ্ধ শিল্পী এসে একুশ দিনের মধ্যে একাকী আবদ্ধ মন্দিরের ভেতর শ্রীমূর্তি নির্মাণের শর্ত রাখলেন। দু-চারদিন মিস্ত্রির কাজের ঠুকঠাক শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তারপর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

এই অবস্থায় উদ্বিগ্ন রাজা দু'সপ্তাহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে মন্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও রাণীর পরামর্শে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। দেখলেন, মিস্ত্রী সম্পূর্ণ

অদৃশ্য হয়ে গেছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রার শ্রীবিগ্রহত্রয়ের হস্তপদযুগল নির্মিত হয়নি।

নির্দিষ্ট কালের আগে অসময়ে দ্বার উদঘাটন করে সত্যভঙ্গ করার জন্য এই বিগ্রহত্রয়ের অসম্পূর্ণ রূপ হল এবং বৃদ্ধ শিল্পীর অদর্শন ঘটল—এই চিন্তায় নিজেকে অতি অপরাধী মনে করে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কুশশয্যায় প্রাণ ত্যাগ করার সংকল্প করলেন।

তখন অর্ধরাত্রে জগন্নাথ স্বপ্নে তাঁকে বললেন, 'আমি নীলাচলে এই রূপেই নিত্যকাল অধিষ্ঠিত। আমার নাম পুরুষোত্তম। আমার হাত পা লোককে না দেখতে পেলেও আমার হাত পা নেই বলে মনে কর না। আমার অপ্রাকৃত হাতে ভক্তের দেওয়া সমস্ত সেবার উপকরণ আমি আনন্দে গ্রহণ করি। লীলামাধুরী প্রকট করার জন্য এই মূর্তিতে আমি প্রকটিত। মাধুর্যরসলুব্ধ ভক্তের কাছে আমিই সেই মুরলীধারী শ্যামসুন্দর। যদি আমার ঐশ্বর্যময় তোমার অভিলাষ থাকে, তবে স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত হস্তপদ দ্বারা আমাকে কখনও কখনও ভূষিত করতে পার। কিন্তু জেনে রাখো—আমার শ্রীঅঙ্গ যাবতীয় ভূষণের ভূষণস্বরূপ।'

শ্রীনারদ পুরাণে (উঃ খণ্ডে ৫৪/২২/৬৫) বলা হয়েছে, স্বয়ং ভগবানের অভীষ্ট অনুসারে শ্রীবিশ্বকর্মা সেই দারু থেকে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা—এই ত্রিমূর্তি নির্মাণ করেন। হরি সংকীর্তন মহোৎসবের সহিত সেই ত্রিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হন।'

প্রশ্ন ১০০। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দেবকী, না যশোদার কোলে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর গর্ভজাত সন্তান। এই কথা আমরা জেনেছি। কিন্তু তিনি যশোদা মায়েরও গর্ভজাত সন্তান। সেই দিব্য জন্মরহস্য আমাদের অনেকের জানা নেই। শ্রীহরিবংশ শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

গর্ভকালেত্বসংপূর্ণে অষ্টমে মাসি তেস্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥

অর্থাৎ, 'গর্ভকালের অসম্পূর্ণ অষ্টম মাসে শ্রীযশোদা ও দেবকীদেবীর উভয়ের কোলে একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়।'

শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত শ্রীলঘুভাগবতম্ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহেযানুকদুন্দুভেঃ।
গোষ্ঠে তু মায়য়া সার্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ ॥ (পূ. খ. ৪৫৪)

বসুদেবগৃহে আদ্যব্যূহ শ্রীবাসুদেব এবং গোকুলে যোগমায়ার সঙ্গে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন।' আরও বলা হয়েছে যে, বসুদেব যখন শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুলে যশোদার আলয়ে এলেন, তখন একটি কন্যাকেই দেখতে পেলেন। আর সেই কন্যাকে নিয়ে মথুরায় তিনি ফিরে গেলেন। এদিকে—

প্রাবিশদ্ বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্ ॥ (পূ. খ. ৪৫৫)

অর্থাৎ, 'বাসুদেব কৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হলেন।' এই রহস্যজনক ঘটনা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ না থাকলেও প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীশুকদেব গোস্বামী কোন কোন স্থানে তার সূচনা করেছেন। যেমন—

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ ॥ (ভাঃ ১০/৫/১)

'নন্দমহারাজ আত্মজ অর্থাৎ, নিজ থেকে জাত কৃষ্ণকে দেখে অতিশয় আহ্লাদিত হন।'

নন্দঃ স্বপুত্রায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ ॥ (ভাঃ ১০/৬/৪৩)

অর্থাৎ, 'উদারবুদ্ধি নন্দমহারাজ প্রবাস থেকে এসে স্বপুত্রকে (নিজের পুত্রকে) কোলে নিলেন।'

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ॥ (ভাঃ ১০/৯/২১)

অর্থাৎ, 'গোপিকা-সুত ভগবান কৃষ্ণ দেহাভিমানীদের সহজলভ্য নন।' গোপিকা বলতে শ্রীদেবকীকে বোঝায় না, যশোদা মাতাকেই বোঝায়।

শ্রীব্রহ্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে বলছেন—

বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদু পশুপাঙ্গজায় ॥ (ভাঃ ১০/১৪/১)

অর্থাৎ, 'যাঁর কণ্ঠে বনমালা, হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, বামকক্ষে বেত্র, বিষাণ ও বাঁশি, যিনি পশুপাঙ্গজ অর্থাৎ, পশুপালনকারী নন্দমহারাজের অঙ্গ থেকে সম্ভূত সেই শ্রীকৃষ্ণ.....।' এইভাবে বহু কথায় শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীনন্দ-যশোমতীর নিজস্ব সন্তান, কেবল পালিত পুত্র নয়—তা সুস্পষ্ট।

এমন কি স্বয়ং ভগবান ভক্তরূপে অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে *শ্রীশিক্ষাষ্টকমে* উল্লেখ করেছেন—

'অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।'

'ওহে নন্দতনুজ কৃষ্ণ, আমি তোমার দাস হয়েও স্বকর্ম বিপাকে বিষম ভব-সমুদ্রে পতিত হয়েছি।' এখানে নন্দতনুজ কথাটির অর্থ হল নন্দের তনু বা শরীর থেকে জাত। এর থেকে বোঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যশোদার কোলেও জন্মলীলা প্রকাশ করেছেন।

পরিশেষে উল্লেখ্য এই যে, যশোদানন্দন ও দেবকীনন্দন কৃষ্ণ তত্ত্বত একজনই। এতে পার্থক্য নিয়ে আমরা যদি 'এই কৃষ্ণ, না ওই কৃষ্ণ' বিচার করতে যাই, তবে আমাদের ভক্তিজীবনে ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের সঙ্গে কোনও জড় বুদ্ধিবিচার খাটে না।

প্রশ্ন ১০১। নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের গুরু কে? তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময়ে বৃন্দাবনে না পুরীধামে ছিলেন?

উত্তর ঃ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। মহাপ্রভু পুরীধামে কাশীমিশ্র ভবনে ছিলেন, সেইখানে ফুলতোটাতে সিদ্ধ বকুল বৃক্ষের তলে এক কুটির মধ্যে হরিদাস ঠাকুর নামভজন করে জীবন অতিবাহিত করেন।

প্রশ্ন ১০২। চিন্ময় শরীর কি কি উপাদানে তৈরি? কৃষ্ণলোকের বাসিন্দাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ? তাঁদের আহার-বিহার কেমন? তাঁদের চেহারা কেমন?

উত্তর ঃ চিন্ময় শরীর কোনও জড় উপাদান দিয়ে তৈরি নয়। তা সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। অর্থাৎ, সম্পূর্ণরূপে চেতনা দিয়ে তৈরি। প্রেম দিয়ে তৈরি। এই জগতে তা অকল্পনীয় বিষয় বলে মনে হতে পারে। কৃষ্ণলোকের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি-সৌহার্দ্যের যথার্থ সম্বন্ধ রয়েছে। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, পতি-পত্নী সবই রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকের সাথে কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিগূঢ়। অর্থাৎ, কৃষ্ণকেন্দ্রিক প্রত্যেকেই। কারও মধ্যে জরা বা ব্যাধি বা বার্ধক্যের লেশমাত্র নেই। প্রত্যেকেই আপন আপন বিচিত্র সৌন্দর্যে বিভূষিত।

রস পার্থক্য হেতু বিভিন্ন ভক্ত গোলোক ধামে সেই সেই বিভিন্ন রসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধিত। স্নেহ প্রীতিবশত শ্রীকৃষ্ণকে কোনও জিনিস নিবেদন করলে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দে তা গ্রহণ করেন। যদিও কারও কোনও কিছুর অভাব নেই। সমস্তই ভাবময়—প্রেমময়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য ইত্যাদি রসপার্থক্যের জন্য বিভিন্ন জনের কাছে ভগবানের লীলাবিলাস বিভিন্ন রকমের। ক্ষুধা নেই, তবুও প্রেমবশত খাওয়া-দাওয়া। সৌন্দর্যের কোনও বাকি নেই, তবুও প্রেমবশত নিয়ত সাজানো গোছানো। কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই, তবুও প্রেমবশত নানা আয়োজন। ভয়ের কোনও কারণ নেই, তবু রসবৈচিত্র্যে ভয়ের ভাব মাত্র রয়েছে।

সেখানে দিন, রাত বা সময় অতিবাহিত হয় না। সেখানে সূর্য, চন্দ্র, বৈদ্যুতিক আলোক নেই, তবুও তা দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। চির বসন্ত, চির নবীন। চির আনন্দময়। আবার প্রেমের প্রয়োজনে চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ-ও সেখানে প্রকাশিত হতে পারে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সেখানে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা শ্রীব্রহ্মা বর্ণনা দিয়েছেন, জল সেখানে অমৃত। ভূমি সেখানে চিন্তামণি। বৃক্ষ সেখানে কল্পতরু। কথা সেখানে গান। চলাফেরা সেখানে নৃত্য। আরও বর্ণনা রয়েছে, সেখানে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই—রয়েছে শুধু নিত্য বর্তমান। বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, ব্যাধি কেবল এই জড় জগতে। চিন্ময় জগতে বিরক্তিকর বলে কোন কিছুই নেই। অবশ্য সেখানে চিন্ময় দুঃখাদি রয়েছে যা স্বরূপতঃ আনন্দময়। যেমন কৃষ্ণবিচ্ছেদের ব্যথা। সেখানে সবই আনন্দময়। নিত্য নতুন আনন্দ কেবল বেড়েই চলেছে। কৃষ্ণসেবায় যতই নিয়োজিত হওয়া যায়, ততই *'আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং'*। প্রত্যেকেই আপন আপন মহিমায় নিত্য বিরাজমান। প্রত্যেকেই নিত্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবায় রত। সেই সচ্চিদানন্দময় অক্ষয় অব্যয় শ্রীগোলোক বৃন্দাবনেও চলেছে নিত্য সুমধুর হরিনাম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রশ্ন ১০৩। ভক্তশিরোমণি অক্রূর মহাশয় কেন স্যমন্তক মণি গোপনে গচ্ছিত রাখলেন? তিনি জানতেন যে, মণি লুকিয়ে রাখা কৃষ্ণ-বিরোধী কর্ম এবং তিনি শুনেছেন, মণিটার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বদনাম হচ্ছে। তবুও তাঁর এইরূপ আচরণের কারণ কি?

উত্তর ঃ শ্রীজীব গোস্বামী ও মহান বৈষ্ণব আচার্যগণ বলেছেন যে, অক্রূর মহাভাগবত হলেও, শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনের গোপগোপীদের কাছ থেকে নিয়ে চলে যাওয়ায় অক্রূর তাঁদের অভিশাপ লাভ করেছিলেন। ব্রজবাসীদের মনে আঘাত দেওয়ায়, পাপী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেইরকম, ভগবদ্ভক্ত কৃতবর্মাও কংসের অন্তরঙ্গ সঙ্গলাভের ফলে কলুষিত হয়ে পড়েছিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ ২ খণ্ড ২২ অধ্যায় ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

শতধন্বার মতো দুরাচারীর দুঃসঙ্গ প্রভাবে অক্রূরও স্যমন্তক মণিটিকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করার বাসনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। যদিও তিনি ভক্ত। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার (চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২/৮৪)

শ্রীল রূপ গোস্বামী *উপদেশামৃত* গ্রন্থের শ্লোকে উল্লেখ করেছেন, কৃষ্ণ বহির্মুখ লোকের সঙ্গ এবং চিত্তচাঞ্চল্য দোষে ভক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। *'জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ'*......এবং তার পরের শ্লোকে উল্লেখ করেছেন, অসৎ সঙ্গ ত্যাগ ও সদাচারের ফলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। *'সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তে.....'*।

অর্থকে কেন্দ্র করে কিরূপ অনর্থ সৃষ্টি হয়—এ বিষয়ে এই স্যমন্তক মণি উপাখ্যান একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে—

অর্থ হইতে অনর্থ—দেখায় ভগবান।
অর্থ হৈতে কারো প্রভু না হয় কল্যাণ ॥
কৃষ্ণ হৈয়া দুঃখ পাইলা অর্থের কারণে।
এ-বোল বুঝিয়া অর্থ ত্যজে বুধজনে ॥
আপনে করিয়া মর্ম লোকেরে বুঝায়।
অর্থের কারণে লোক এত দুঃখ পায় ॥
অর্থ হইতে অনর্থ—দেখায় মণি-ছলে।
লোক বুঝাইতে প্রভু হেন কর্ম করে ॥

(কৃঃ প্রেঃ তঃ ১০/৫৭/৮০-৮৪)

প্রশ্ন ১০৪। আমার বাড়িতে একটি কালো তুলসীর বৃক্ষ আছে। প্রতিবেশীগণ বলছেন, বাড়িতে কালো তুলসীর বৃক্ষ রাখা উচিত নয়। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত কি? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ কালো তুলসীকে শুদ্ধ ভাষায় কৃষ্ণতুলসী বলা হয়। তুলসী ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। কি কৃষ্ণতুলসী কি গৌরতুলসী সকল বর্ণের তুলসীই মাহাত্ম্যপূর্ণ। 'কালো তুলসী বাড়িতে রাখা উচিত নয়'—এই কথা যাঁরা বলছেন, তাঁরা নিতান্তই অজ্ঞ।

শ্রীবিষ্ণুরহস্যে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণং কৃষ্ণতুলস্যা হি যো ভক্ত্যা পূজয়েন্নরঃ ।
স যাতি ভুবনং শুভ্রং যত্র বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ ॥

অর্থাৎ, "যিনি কৃষ্ণবর্ণ তুলসী দ্বারা ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করেন, কমলা সহ বিষ্ণু যথায় বিরাজ করেন, সেই বিমল ধামে তাঁর গতি হয়।"

শ্রীপদ্মপুরাণে উল্লেখ রয়েছে—

তুলসী কৃষ্ণ-গৌরাভ্যা তয়াভ্যর্চ্য জনার্দনং ।
নরো যাতি তনুং ত্যক্ত্বা বৈষ্ণবীং শাশ্বতীং গতিং ॥

অর্থাৎ, "যিনি কৃষ্ণবর্ণ ও গৌরবর্ণ বিশিষ্ট তুলসীপত্র দ্বারা ভগবান শ্রীহরির অর্চনা করেন, সেই মানব দেহত্যাগের পর হরিধামে প্রস্থান করেন।"

অতএব সকল বর্ণের তুলসী বৃক্ষকে যত্ন করা উচিত।

প্রশ্ন ১০৫। মহামুনি ব্যাসদেব কর্তৃক সঞ্জয় যে দিব্য চক্ষু পেয়েছেন, তাতে কি সঞ্জয় অর্জুনের মতো বিশ্বরূপ দর্শন করতে পেরেছিলেন? যদি দর্শন পেয়ে থাকেন, তবে কোন্ সাধনার বলে?

উত্তর ঃ শ্রীব্যাসদেবের আশীর্বাদধনা ও দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত সঞ্জয় হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদে বসেই কুরুক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনা দেখতে পাচ্ছিলেন এবং কে কি করছেন, কে কাকে কি বলছেন, কে কোথায় কি পরিস্থিতিতে রয়েছেন সমস্ত ব্যাপারটাই প্রত্যক্ষ দর্শন করে সঞ্জয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেই সকল বর্ণনা করছিলেন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। শ্রীসঞ্জয় ছিলেন মহর্ষি ব্যাসদেবের শিষ্য।

শ্রীগুরু কৃপায় এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সঞ্জয় ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করছিলেন এবং একই সঙ্গে তা বর্ণনা করছিলেন। তাঁর পক্ষে তা অসম্ভব কিছুই নয়। শ্রীসঞ্জয়ের যে সাধনাবলই থাকুক না কেন, তিনি ব্যাসদেবের আশীর্বাদপুষ্ট এবং ঐকান্তিক শিষ্য ছিলেন সন্দেহ নেই। শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, গুরুকৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। যেমন, আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বৃদ্ধ বয়সেও মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর জঘন্যতম নাস্তিক সভ্যতার মানুষদেরকেও পবিত্র কৃষ্ণভক্তে পরিণত করেছেন। তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, সেটি ছিল তাঁর গুরুদেবের কৃপাশীর্বাদ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥ (ভাবার্থদীপিকা)

অর্থাৎ, গুরু-কৃষ্ণ কৃপায় মূক ব্যক্তিও সুবক্তা হতে পারে, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে।

প্রশ্ন ১০৬। দামোদর কথার অর্থ কি?

উত্তর ঃ 'দাম' মানে রজ্জু বা দড়ি, এবং 'উদর' মানে পেট। কোনও দড়ি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধবার ক্ষমতা কারও নেই। মা যশোদা ঘরের সমস্ত দড়ি জড়ো করে শিশুপুত্র

কৃষ্ণকে তাঁর দুষ্টুমির জন্য বাঁধতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দড়ি বারে বারেই ছোট হয়ে যাচ্ছিল। অদ্ভুত পুত্রের উদরের সীমা-পরিসীমা বুঝি মায়ের বুদ্ধিতে আসে না। বহু দড়ি গাঁট দিয়ে বেঁধেও শিশুপুত্রের উদর বেষ্টন করা গেল না। যেরকম দড়ি, সেই রকম উদর। দুটোই মায়ের কাছে বেকায়দা বলে বোধ হচ্ছিল। অবশেষে মায়ের শ্রান্তি লাঘব করতে কৃষ্ণ নিজেই বাঁধা পড়লেন। দাম বেষ্টিত উদর বলে শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম দামোদর।

প্রশ্ন ১০৭। দামোদর ব্রততে প্রদীপ দান করা হয় কেন?

উত্তর ঃ প্রদীপদান মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলেছিলেন—"হে নারদ, সমস্ত পাপে পাপী হয়েও মানুষ পবিত্র হতে পারে, যদি সে ভক্তিভরে কার্তিক মাসে ভগবান শ্রীহরির সম্মুখে প্রদীপ দান করে। দীপের আলোকে তার সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়ে যায়। সে শুদ্ধ হয়ে ভগবানের নিত্য সেবায় উন্নীত হয়।" (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৬/৪৭)

প্রশ্ন ১০৮। আদি মানব হচ্ছেন মনু। তা হলে সনকাদি ব্রহ্মার চার পুত্র এবং বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য প্রমুখ ব্রহ্মার দশজন পুত্রদের মানব না দেবতা বলা হয়?

উত্তর ঃ আক্ষরিক অর্থে মনুর পুত্রদের মানব, অদিতির পুত্রদের আদিত্য বা দেবতা এবং দিতির পুত্রদের দৈত্য বা অসুর বলা হয়। আসলে ভগবান তাঁর নিজ প্রতিমূর্তি বা প্রতিরূপে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছেন, যদিওবা ব্রহ্মার একাধিক মস্তক। ব্রহ্মা বহু মানসপুত্র সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা মানব মূর্তিরই রূপ। এদিক থেকে ব্যাপকার্থে দেবতা, মানব ও অসুর সবাইকে মানব বলা যায়। মোট চুরাশি লক্ষ প্রকারের জীবযোনির মধ্যে মানব প্রজাতি চার লক্ষ রকমের। অর্থাৎ, দেবতা অসুর ইত্যাদিও এই মানব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আবার সেই মানব প্রজাতির মধ্যে দেবগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের দেবতা এবং দেবগুণবিরুদ্ধ ব্যক্তিদের অসুর বলা হয়।

ব্রহ্মার পুত্রদের ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয়, তাঁদের জন্ম পিতৃ-ঔরসে কিংবা মাতৃজঠর থেকে হয়নি। তাঁরা ব্রহ্মার মন থেকেই জাত হয়েছেন। ব্রহ্মার সেই সাক্ষাৎপুত্র চার দশ মোট চৌদ্দজনই নয়, অসংখ্য। মাত্র কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার, শিব, নারদ, স্বায়ম্ভুব মনু, ক্রতু, ভৃগু, অত্রেয়, পুলহ, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য এবং আরও অনেকে। প্রায় সমস্ত পুত্রদের মহর্ষি বলা হয়, তাঁরা কেউ সত্য লোকে, কেউ মহর্লোক, কেউ জনলোক, তপোলোকে বাস করেন। কেউ অন্তরীক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র অনুক্ষণ পর্যটন করতে থাকেন। কেউ প্রজা সৃষ্টি করে রাজারূপে লোক পরিচালনা করেন।

শ্রীব্রহ্মা মানব প্রজাতি বৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে মিথুন সৃষ্টি করেছিলেন, অর্থাৎ মৈথুনের মাধ্যমে সন্তান সৃষ্টির জন্য একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রী সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর

তাঁদের মিলনের ফলে সন্তান সৃজন হল। সেই পুরুষ হলেন শ্রীস্বায়ম্ভুব মনু এবং স্ত্রী হলেন শতরূপা দেবী। তাঁরাই মানব প্রজাতির আদি পিতা ও মাতা।

প্রশ্ন ১০৯। শাসনকর্তৃপক্ষের যথার্থ চরিত্র কিরকম হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি বলে?

উত্তর ঃ মহাভারতে শান্তিপর্বে ভীষ্মদেবের কাছে রাজনীতি সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির মহারাজ জেনেছিলেন—শাসন কর্তৃপক্ষ বা রাজার ছত্রিশটি গুণ থাকলে জগতে তিনি গুণবান বলে বিখ্যাত হন। সেই গুণবান ব্যক্তিরা ইহলোক ও পরলোকে সুখী হন। যেমন—(১) তিনি কর্তব্য অনুষ্ঠান করবেন রাগ-দ্বেষ শূন্য হয়ে, (২) লোকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করবেন লোভ-মমতা বাদ দিয়ে, (৩) অর্থ উপার্জন করবেন জীব-হিংসাদি না করে, (৪) তিনি তার কামনা সিদ্ধিতে যত্ন করবেন ঔদ্ধত্য পরিহার করে, (৫) প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করবেন নির্ভীকভাবে, (৬) বীরত্ব প্রকাশ করবেন আত্মশ্লাঘা বিহীন হয়ে, (৭) দান করবেন সৎপাত্র দেখে, (৮) অহংকার প্রকাশ করবেন অনৃশংস হয়ে, (৯) অসৎ লোকের সঙ্গে সন্ধি করবেন না, (১০) বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সংগ্রাম করবেন না, (১১) অননুরক্ত ব্যক্তিকে চর কার্যে নিয়োগ করবেন না, (১২) লোক-পীড়ণ দ্বারা নিজকার্য সাধন করবেন না, (১৩) অসৎ ব্যক্তির কাছে সব বিষয় প্রকাশ করবেন না, (১৪) আত্মসুখে নিজগুণ কীর্তন করবেন না, (১৫) সাধুদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করবেন না, (১৬) অসৎ ব্যক্তির সাহায্য অবলম্বন করবেন না, (১৭) সবিশেষ পরীক্ষা না করে কারও দণ্ডবিধান করবেন না, (১৮) মন্ত্রণা প্রকাশ করবেন না, (১৯) অতিলোভী ব্যক্তিকে অর্থদান করবেন না, (২০) অনিষ্টকারীর প্রতি বিশ্বাস রাখবেন না, (২১) নিরন্তর স্ত্রীসম্ভোগ করবেন না, (২২) নেশা জাতীয় বা উগ্র অহিতকর সামগ্রী ভোজন করবেন না, (২৩) কারও প্রতি ঘৃণা বা ঈর্ষা না করে পবিত্র থাকবেন, (২৪) সর্বদা নিজ স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, (২৫) অকপট চিত্তে গুরুজনের সেবা করবেন, (২৬) অহংকার পরিত্যাগ করে মাননীয় ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করবেন, (২৭) ভগবানের পূজা-অর্চনা করবেন, (২৮) ন্যায় অনুসারে সম্পত্তি লাভের কামনা করবেন, (২৯) অপরিপক্ব অবস্থায় দক্ষতা প্রকাশ করবেন না, (৩০) লোককে সান্ত্বনা বা অনুগ্রহ করে পরিত্যাগ করবেন না, (৩১) অজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রহার করবেন না, (৩২) শত্রু বিনাশ করে অনুতাপ করবেন না, (৩৩) হঠাৎ ক্রোধ প্রকাশ করবেন না, (৩৪) অপকারী ব্যক্তির প্রতি মৃদুভাব অবলম্বন করবেন না, (৩৫) প্রজাপালন ও প্রজা রক্ষণে যত্নবান হবেন, (৩৬) নির্লোভ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদেরকে কার্যভার অর্পণ করবেন।

প্রশ্ন ১১০। কৃষ্ণ কথাটির অর্থ কি? কৃষ্ণের গায়ের রং কালো কেন? তিনি ত্রিভঙ্গ রূপ কেন? তাঁর মাথায় ময়ূরের পালক কেন? হাতে বাঁশি কেন? অন্য কোন রং, অন্য কোন রূপ, অন্য কোন বাদ্য হল না কেন? গোয়ালার ঘরে জন্মালেন কেন?

উত্তর ঃ 'কৃষ্ণ' কথাটির অর্থ হল সর্বাকর্ষক—যিনি সবাইকে আকর্ষণ করেন। কিন্তু তিনি কেন কালো, কেন ত্রিভঙ্গ, কেন হাতে বাঁশি ধরেছেন—অন্য কোনও রং ইত্যাদি

হল না কেন—এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এক সময়ে বলেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে আগে যেতে হবে। তারপর এই সমস্ত প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণকেই করতে হবে। তা হলেই সঠিক উত্তর তাঁর কাছেই পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন ১১১। ভগবান যদি জন্মরহিত হন তা হলে তিনি বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কেন?

উত্তর ঃ ভগবানের একটি গুণ হচ্ছে ভক্তবৎসলতা। তাঁর ভক্ত বসুদেব ও দেবকী বহু কঠোর তপস্যা করেছিলেন ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে লাভ করতে। তাই ভক্তবাঞ্ছা পূরণকারী ভগবান তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণপূর্বক লীলাবিলাস করতে রাজী হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ১১২। ভগবান যদি কালের নিয়ন্তা হন তবে শত্রুভয়ে পলায়ন করেন কি করে?

উত্তর ঃ শত্রুকে আরও নতুনভাবে ঠকানোর উদ্দেশ্যেই ভগবান ভয়ে পলায়ন করতে থাকেন। এইভাবে ভগবদ্‌লীলা আরও বেশি করে ভক্তের কাছে আনন্দ বিস্তার করে।

প্রশ্ন ১১৩। শ্রীকৃষ্ণ যদি আত্মরতি হন তবে বহু স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন কেন?

উত্তর ঃ আত্মরতি ভগবানের অপূর্বদর্শন লাভ করে মহর্ষিগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পত্নীত্ব বা দাসীত্ব গ্রহণ করে আনন্দ লাভের বাসনা করেছিলেন। বহু যুগের তপস্যার ফলে তাঁরা বৃন্দাবনে সেইভাবে কৃষ্ণসঙ্গলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন ১১৪। কৃষ্ণ ও নারায়ণের মধ্যে তফাৎ কি? কে বড়?

উত্তর ঃ কৃষ্ণ ও নারায়ণ মূলত একই তত্ত্ব হলেও, গুণবৈশিষ্ট্য অনুসারে নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের মধ্যেই অধিক উৎকর্ষ দেখা যায়। পরম বৈষ্ণব-প্রবর ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে ৬৪ প্রকারের গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। সেইগুলির মধ্যে ৫০টি গুণ সাধারণ জীবের মধ্যেও অতি বিন্দু বিন্দু পরিমাণ থাকতে পারে। ব্রহ্মা, শিব প্রমুখ শ্রেষ্ঠ দেবতাগণের মধ্যে অধিক পরিমাণে সেই ৫০টি গুণ বিদ্যমান। নারায়ণ এবং কৃষ্ণের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে সেই ৫০টি সহ আরও ১০টি গুণ রয়েছে। নারায়ণের ৬০টি গুণ পূর্ণ। কিন্তু কৃষ্ণের মধ্যে অতিরিক্ত ৪টি গুণ রয়েছে যা নারায়ণের মধ্যেও নেই। অর্থাৎ, ৬৪টি গুণ পরিপূর্ণরূপেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় আমরা দেখতে পাই যে, নারায়ণ-পত্নী মহালক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করে রাসলীলায় প্রবেশ করতে চাইলেন, কিন্তু প্রবেশের অধিকার পেলেন না বলে ব্রজের বেলবনে কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যানে নিমগ্না হলেন। অথচ বৃন্দাবনে গোপকন্যারা শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে যখন চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণকে দেখতে পেলেন তখন তাঁরা তাঁর প্রতি মোটেই আকৃষ্ট হলেন না, কেবল প্রণাম জানিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

ভৌম বৃন্দাবনলীলা সমাপ্ত হলে যখন শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হলেন তখন এক গোপকুমার পৃথিবীতে থেকে গিয়েছিলেন। গোপকুমার যখন মন্ত্রযোগে ব্রহ্মলোক অতিক্রম করে শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে উপনীত হলেন সেখানে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান নারায়ণ এবং লক্ষ্মীদেবীদের দেখলেন। তাঁরা সযত্নে গোপকুমারকে আদর আপ্যায়ণ করতে লাগলেন, কিন্তু তবুও গোপকুমারের মনে তৃপ্তির অভাব দেখা দিল। যে স্থানে কারও কোনও কুণ্ঠা থাকার কথাই নয় সেই বৈকুণ্ঠেও গোপকুমারের কুণ্ঠিত হৃদয় অপেক্ষা করতে লাগল 'কোথায় গেলে রাধাকৃষ্ণকে দর্শন পাব।' এ থেকে বোঝা যায় নারায়ণ অপেক্ষা গুণবৈশিষ্ট্যে কৃষ্ণই বড়।

প্রশ্ন ১১৫। শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টিটি গুণ কি কি এবং শ্রীনারায়ণের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের অতিরিক্ত গুণগুলিই বা কি কি?

উত্তর ঃ শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগের বিভাব লহরীতে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ৬৪টি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা—

(১) সুরম্যাঙ্গ—সুন্দর অঙ্গ, (২) সর্বলক্ষণান্বিত— মহাপুরুষের ৩২টি শারীরিক লক্ষণ, (৩) রুচির—নয়নতৃপ্তিকর সৌন্দর্য, (৪) তেজীয়ান্—প্রভাবশালী, (৫) বলীয়ান্—মহা বলবান, (৬) বয়সান্বিত—কিশোর, (৭) বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিৎ—সমস্ত রকমের ভাষায় সুপণ্ডিত, (৮) সত্যবাক্য—যাঁর বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, (৯) প্রিয়ংবদ—অপরাধীকেও প্রিয় কথা বলেন, (১০) বাবদূক—যাঁর মুখনিঃসৃত বাক্য সুস্পষ্ট সুমধুর ও বর্ণবিন্যাসযুক্ত, (১১) সুপাণ্ডিত্য—যিনি সমস্ত শাস্ত্রে বিদ্বান এবং কর্তব্য যথাযথ পালনকারী ও নীতিজ্ঞ, (১২) বুদ্ধিমান্—সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি (১৩) প্রতিভান্বিত—দ্রুত উপযুক্ত নববুদ্ধি উদ্ভাবনকারী, (১৪) বিদগ্ধ—নানা কলাবিলাসে যাঁর চিত্ত সদা লিপ্ত, (১৫) চতুর—একই সময়ে বহু কার্য সমাধান করতে পারেন, (১৬) দক্ষ—দুষ্কর কার্যও যিনি শীঘ্র সম্পাদন করতে পারেন, (১৭) কৃতজ্ঞ—উপকারীর কোন উপকার যিনি ভুলেন না, (১৮) সুদৃঢ় ব্রত—যাঁর প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম উভয়ই সত্য হয়, (১৯) দেশ-কাল-সুপাত্রজ্ঞ—দেশ-কাল-পাত্র বুঝে ক্রিয়াশীল হন, (২০) শাস্ত্রচক্ষু—শাস্ত্রানুসারে কার্য করেন, (২১) শুচি—সর্বপাপনাশী ও সর্বদোষশূন্য, (২২) বশী—জিতেন্দ্রিয়, (২৩) স্থির—ফল উদয় না হওয়া পর্যন্ত কাজ করে থাকেন, (২৪) দান্ত—মঙ্গলসাধনের জন্য দুঃসহ ক্লেশও স্বীকার করেন, (২৫) ক্ষমাশীল—অন্যের অনেক অপরাধ সহ্য করে চলেন, (২৬) গম্ভীর—যাঁর মনোভাব দুর্বোধ্য, (২৭) ধৃতিমান্—আকাঙ্ক্ষাশূণ্য এবং ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও শান্ত, (২৮) সম—রাগ ও দ্বেষ থেকে মুক্ত, (২৯) বদান্য—দানবীর, (৩০) ধার্মিক—স্বয়ং ধর্ম যাজন করেন ও অপরকে করান, (৩১) শূর—যুদ্ধ বিষয়ে উৎসাহী ও অস্ত্রপ্রয়োগে বিচক্ষণ, (৩২) করুণ—অপরের দুঃখ সহ্য করতে পারেন না, (৩৩) মান্যমানকৃৎ—গুরু ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধদের শ্রদ্ধা করেন, (৩৪) দক্ষিণ—সুন্দর স্বভাব ও সুকোমল চরিত্র, (৩৫) বিনয়ী—উদ্ধত প্রকৃতির নন, (৩৬) হ্রীমান্—দুর্বুদ্ধি স্বভাবে সঙ্কোচ বোধ করেন, (৩৭) শরণাগত পালক—শরণাগতদের পালন করেন, (৩৮) সুখী—যাঁকে দুঃখ লেশমাত্রও স্পর্শ করতে পারে না, (৩৯) ভক্তসুহৃৎ—

সুসেব্য ও দাসবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ—প্রিয়তামাত্রই বশীভূত হন, (৪১) সর্বশুভঙ্কর—সকলের হিতকারী, (৪২) প্রতাপী—স্বীয় পৌরুষ দ্বারা শত্রুদের প্রতপ্ত করেন, (৪৩) কীর্তিমান্—নির্মল যশের জন্য বিখ্যাত, (৪৪) রক্তলোক—সকলের অনুরাগ-ভাজন, (৪৫) সাধুসমাশ্রয়—সাধুদের প্রতিই পক্ষপাতী হন, (৪৬) নারীগণমনোহারী—সকল সুন্দরীর মন হরণ করেন, (৪৭) সর্বারাধ্য—সকলের আগে তিনি পূজ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্—মহা সম্পত্তিশালী, (৪৯) বরীয়ান্—সকলের মধ্যে যিনি অতিশয় শ্রেষ্ঠ, (৫০) ঈশ্বর—স্বতন্ত্র ও দুর্লঙ্ঘ্য এবং যাঁর আদেশ ব্রহ্মাণ্ড-পতিগণ পালন করেন, (৫১) সদাস্বরূপসংপ্রাপ্ত—মায়াকার্যে বশীকৃত নন, (৫২) সর্বজ্ঞ—সবার মনের কথা জানেন এবং সর্বকালের সর্বলোকের কথা জানেন, (৫৩) নিত্যনূতন—প্রতিক্ষণেই নব নবায়মানরূপে নিত্যসঙ্গীদের কাছে অনুভূত হয়ে বিস্ময় উৎপাদন করেন, (৫৪) সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ—চিন্ময় আনন্দঘন মূর্তি সর্বদেশে সর্বকালে স্বপ্রকাশ এবং নিরুপাধি প্রেমভাজন, (৫৫) সর্বসিদ্ধিনিষেবিত—যাবতীয় সিদ্ধিকে স্বীয় বশীভূত করেছেন, (৫৬) অবিচিন্ত্য মহাশক্তি—দিব্য স্বর্গাদির কর্তৃত্ব, ব্রহ্মা রুদ্রাদির মোহ এবং ভক্তগণের প্রারব্ধখণ্ডন শক্তি, (৫৭) কোটি-ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ—সর্বব্রহ্মাণ্ড ও সর্ববৈকুণ্ঠব্যাপী অবস্থান করছেন, (৫৮) অবতারাবলীবীজ—সমস্ত অবতার সমূহের বীজ বা মূল উৎস, (৫৯) হতারিগতিদায়ক—শত্রুদের নিহত করে মুক্তি প্রদান করেন, (৬০) আত্মারামগণাকর্ষী—মহান জ্ঞানী ও পূর্ণ পরমহংসদের আকর্ষণ করেন, (৬১) লীলামাধুর্য—রাসাদি বিস্ময়কর লীলা, (৬২) প্রেমমাধুর্য—সর্বদা প্রেমময় প্রিয়জনগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকেন, (৬৩) বেণুমাধুর্য—ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিনী বংশীধ্বনি বাদন করেন, (৬৪) রূপমাধুর্য—অদ্বিতীয় রূপমহিমা।

এই গুণাবলীর মধ্যে লীলামাধুরী, প্রেমমাধুরী, বেণুমাধুরী ও রূপমাধুরী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই সম্পূর্ণ বিদ্যমান।

প্রশ্ন ১১৬। মহাভারতের কর্ণ কোন্ দোষে এবং কিভাবে নিহত হলেন?

উত্তর ঃ কর্ণের ভাল গুণ ছিল। কিন্তু সেই তথাকথিত ভাল ভাল সামাজিক গুণ থাকলেও কর্ণ অনাচারী ব্যক্তিদের সঙ্গ প্রভাবে নিজেকে এমনভাবে জড়িয়েছিলেন যে, নিরপরাধ ভগবদ্ভক্তের উপর নির্বিচারে অত্যাচার করতে লেগে পড়েছিলেন। তিনি ধর্মজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে দুর্বুদ্ধিগ্রস্ত রাজা দুর্যোধনের বিশ্বস্ত সেনাপতি হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ ন্যায়নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের উপর অন্যায় সাধন করেছিলেন। যার ফলে ভগবানের কৃপা থেকে তিনি নিজেকেই বঞ্চিত করেছিলেন।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে ভগবানের চরণপদ্মে অপরাধকারী ব্যক্তিও অনুশোচনা বশত অপরাধমুক্ত হয়ে ভগবদ্ আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। কিন্তু ভগবানের শরণাগত কোন ভক্তের চরণে অপরাধ করলে ভগবান তাকে ক্ষমা করেন না। ভক্তের প্রতি কিভাবে কর্ণের মতো মহাবীর অন্যায় করেছিলেন এবং কিভাবে নিহত হয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গে মহাভারতের কর্ণ পর্বের ৯২ অধ্যায়ের 'কৃষ্ণের কর্ণ তিরস্কার' শীর্ষক প্রবন্ধটি আলোচ্য বলে মনে করি।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে কৌরব সেনাপতি কর্ণ এবং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন পরস্পর এমনভাবে বাণবর্ষণ করছিলেন যে, সূর্যালোক আবৃত হয়ে গিয়েছিল। কর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন করে দশবাণে অর্জুনকে এবং ছয় বাণে সারথি বাসুদেবকে বিদ্ধ করে ফেললেন। কর্ণের প্রতি এক ব্রাহ্মণের অভিশাপ ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের রথের চাকা ভূমিতে দেবে যাবে। তাই তাঁর রথের চাকা দেবে যায়। কর্ণের বড় অসুবিধা হল। বলপ্রয়োগ করেও কিছুতেই রথ তুলতে পারেন না। সেই সুযোগে ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুন শর নিক্ষেপের চেষ্টা করলেন।

তখন কর্ণ বলতে লাগলেন, "হে অর্জুন। মুহূর্তকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। দৈব বশত আমার রথচক্র পৃথিবীতে প্রোথিত হয়েছে। এই সময়ে কাপুরুষের মতো দুরভিসন্ধি ত্যাগ কর। তুমি রণপণ্ডিত বলে বিখ্যাত হয়েছ। তাই এখন অভদ্রের মতো যুদ্ধ করা তোমার ধর্ম নয়। হে অর্জুন! উত্তম যোদ্ধা কখনও মুক্তকেশ, বিমুখ, বদ্ধাঞ্জলী, শরণাগত, প্রার্থী, অস্ত্রত্যাগী, অস্ত্রবিহীন, কবচহীন, ভগ্নাস্ত্র ব্যক্তির প্রতি এবং ব্রাহ্মণের প্রতি শর নিক্ষেপ করেন না। ইহলোকে তুমি ধার্মিক, যুদ্ধধর্ম-অভিজ্ঞ, দিব্য অস্ত্রবেত্তা, মহাত্মা, কার্তবীর্যের ন্যায় পরাক্রান্ত বলে জগৎ বিখ্যাত হয়েছ। আর আমি এখন রথহীন বিকলাঙ্গ হয়েছি, তুমি রথের উপরে রয়েছ। অতএব যে পর্যন্ত আমি রথচক্র উদ্ধার করতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বিনাশ করা তোমার ধর্ম নয়। আমি তোমাদের ভয়ে ভীত নই। তুমি ক্ষত্রিয় বলেই এই মুহূর্তে তোমার ক্ষাত্রধর্ম রক্ষা করা উচিত। এই মুহূর্তকাল তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

মহাবীর কর্ণের কথা শুনে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "হে কর্ণ! তুমি ভাগ্যক্রমে আজ এই মুহূর্তে ধর্মস্মরণ করছ। নীচ দুরাশয় ব্যক্তিরা দুঃখে পড়ে প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করতে থাকে। কিন্তু নিজেদের দুষ্কর্মের দিকে তারা কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। হে কর্ণ। তোমার অভিমত নিয়েই দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে অন্তঃপুর থেকে রাজসভায় টানাহেঁচড়া করে নিয়ে এসেছিল। তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? দুষ্ট শকুনি যখন দুর্বুদ্ধি হয়ে তোমার অনুমোদন নিয়ে পাশা খেলায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করেছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুরাচারী দুঃশাসনের বশীভূতা রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে উপহাস করে অট্টহাসি হেসে বলেছিলে—'হে সুন্দরী দ্রৌপদী, পাণ্ডবরা বিনষ্ট হয়ে ঘোর নরকে গিয়েছে। তাই এক্ষুনি তুমি অন্য পতিকে বরণ করে নাও।' এরকম উপহাস যখন করছিলে সেই সময় অনার্য ব্যক্তিরা দ্রৌপদীকে নিরপরাধে নানা রকমের ক্লেশ দিচ্ছিল আর তুমি তাদের আচরণ উপেক্ষা করেই অট্টহাস্য করছিলে। তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয় করে তুমি পাণ্ডবদের অন্যায়ভাবে দ্যূতক্রীড়া করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলে এবং দ্রৌপদীকে বাজি রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন দুর্বুদ্ধিরাজা দুর্যোধন তোমার অভিমত অনুসারে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত ভীমকে অন্নে তীব্র বিষ মাখিয়ে খেতে দিয়েছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহ মধ্যে ঘুমন্ত পাণ্ডবদের সবংশে পুড়িয়ে মেরে ফেলবার জন্য আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহা মহা রথীদের সমবেত করে বালক অভিমন্যুকে ঘিরে ফেলে বধ করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ। তুমি যখন বহু প্রকারে অধর্ম অনুষ্ঠান করেই চলেছ, তখন এই যুদ্ধ সময়ে ধর্ম ধর্ম করে তালু শুকিয়ে ফেললে কি হবে? ধৃতরাষ্ট্রের অধর্মাচারী পুত্রদের পক্ষে যারা থাকবে তারা সকলেই এই যুদ্ধে ধর্মপ্রাণ পাণ্ডবদের হাতে নিহত হবে।"

শ্রীবাসুদেবের মুখে তিরস্কার বাণী শুনে কর্ণ লজ্জায় কোন কথা না বলেই ধনুকে শর যোজন করলেন এবং ঠোঁট চেপে তীব্রভাবে শর নিক্ষেপ করলেন। কর্ণের কুমন্ত্রণা জনিত বহুবিধ নিদারুণ ক্লেশ-পরম্পরার কথা স্মরণ করে অর্জুন ক্রোধে একান্ত অধীর হলেন। তাঁর শরীরের লোমকূপ থেকে তেজোরাশি নির্গত হতে লাগল।

কর্ণ সবচেয়ে ভীষণ মারাত্মক অস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে অর্জুনকে বিনাশ করতে উদ্যত হলেন। অগত্যা অর্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে কর্ণের বাণকে নিরস্ত করলেন। তারপর নানাবিধ ভয়ংকর ভয়ংকর অস্ত্রে দুই পক্ষে শরজাল বিস্তার হতে লাগল। বজ্রের মতো এক সিতধার অস্ত্র অর্জুনের বক্ষ ভেদ করে। তখন অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুক শিথিল হয়ে পড়ল এবং তিনি কাঁপতে কাঁপতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

তখন দেবতাগণ হাহাকার করে উঠলেন। পাণ্ডবদের হৃদয়ে শোকের ছায়া নেমে এল। এই অবসরে মহাবীর কর্ণ মাটিতে পুঁতে যাওয়া রথের চাকা উদ্ধার করার অভিলাষে বাহুবল প্রয়োগ করতে লাগলেন। কিন্তু কৃতকার্য হলেন না। এদিকে অর্জুন চেতনা ফিরে পেলেন। তখন বাসুদেব অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন কর্ণ রথে আরোহণ না করতে করতে তার মস্তক ছেদন করে ফেলতে।

বাসুদেবের নির্দেশে অর্জুন অঞ্জলিক নামে এক মহাস্ত্র ধনুকে সংযোজন করে বললেন, "যদি আমি তপস্যা, গুরুজনদের সন্তোষ সাধন ও সুহৃদ্গণের হিতকথা শুনে থাকি, তবে এই অরাতিঘাতন মহাস্ত্র অবিলম্বে প্রবল শত্রু কর্ণের প্রাণ সংহার পূর্বক আমাকে জয়শ্রী দান করুক।" এই বলে সেই অতি ভীষণ, অত্যন্ত উজ্জ্বল অঞ্জলিক বাণ নিক্ষেপ করলেন। আর মহাবীর কর্ণ সেই শরাঘাতে ধরাশায়ী হলেন এবং তার দেহ থেকে একটি তেজ নির্গত হয়ে আকাশ সমাচ্ছন্ন করে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করল।

প্রশ্ন ১১৭। কোন্ রাজার মাতৃগর্ভে জন্ম না হয়ে পিতার শরীর থেকেই জন্ম হয়েছিল?

উত্তর ঃ পৃথু মহারাজের। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রয়েছে ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা বেণ রাজার মৃত শরীরের দুই বাহু মন্থন করলে সেই বাহু থেকে রাজা পৃথু ও রাণী অর্চিদেবীর জন্ম হয়।

প্রশ্ন ১১৮। শ্রীরামচন্দ্র ভগবান। তিনি কেন মহামায়ার পূজা করেছিলেন?

উত্তর ঃ মহর্ষি বাল্মীকি রচিত মূল রামায়ণ গ্রন্থে কোথাও শ্রীরামচন্দ্রের মহামায়া পূজার কথা উল্লেখই নেই।

পরমগুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বলেছেন, তামসিক ভগবৎ-বিমুখ শ্রেণীর লোকের জন্যই তামসিক ব্যবহার স্বরূপ নীলপদ্মের পরিবর্তে রামচন্দ্রের চক্ষু উৎপাটন করে দেবীপূজার উল্লেখ কোথাও কোথাও দেখা যায়।

প্রশ্ন ১১৯। নন্দনন্দন কৃষ্ণ ও বসুদেবনন্দন কৃষ্ণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছু আছে কি?

উত্তর ঃ কৃষ্ণ একজন। কিন্তু নামের মধ্যে ভাবের তারতম্য রয়েছে। নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে কৃষ্ণ রাখালবালক রূপে গোপভাব নিয়ে লীলাবিলাস করেন। বসুদেবের পুত্ররূপে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বীর রূপে লীলাবিলাস করেন।

প্রশ্ন ১২০। হরিমন্দির ও তুলসীমঞ্চের মধ্যে পার্থক্য কি কেবল আকার ও পিতৃ-মাতৃ সম্বন্ধগত, না অন্য কিছু?

উত্তর ঃ শ্রীতুলসী হরিভক্তিপ্রদাত্রী। ভক্তগণ তুলসীদেবীর কাছে হরিভক্তি প্রার্থনা করে থাকেন। তাঁর মঞ্চ নির্মাণ করে প্রতিদিন তাঁর সেবা, জলদান, আরতি করলে জীবের কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু মানুষ হরিনাম যদি না করে, হরিভক্তি অনুশীলন না করে, হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা না করে তা হলে হরিপ্রিয়া তুলসীদেবীও প্রসন্না হন না। হরিসেবায় নিয়োজিত থাকলে তুলসীদেবী প্রসন্না হয়ে থাকেন। তুলসীমঞ্চ হলেও সেখানে শ্রীহরি যে আমাদের পরম আরাধ্য বিষয় তা বোঝা যায় না। কিন্তু হরিমন্দির হলে সেখানে আমাদের আশ্রয়তত্ত্ব তুলসীদেবীও স্থাপিতা হন।

প্রশ্ন ১২১। অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্যের নাম কি?

উত্তর ঃ দক্ষরাজার কন্যা বসুর গর্ভজাত আটপুত্রকে অষ্টবসু বলা হয়, তাঁরা হলেন—ধর, ধ্রুব, সোম, অহ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস।

একাদশ রুদ্র হলেন—অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যে বলা হয় যে, একাদশ রুদ্র এসে শ্রীগৌরহরির নাম কীর্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্য করেছিলেন। সেই ঘটনাস্থলীর নাম রুদ্রদ্বীপ, গ্রামের নাম রুদ্রপাড়া।

দ্বাদশ আদিত্য হলেন—ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশু, ভগ, বিবস্বান, ইন্দ্র, পূষা, পর্জন্য, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। বৃন্দাবনে যমুনাতে কালীয় নাগকে দমন করে নন্দপুত্র কৃষ্ণ যখন জল থেকে উঠে এলেন, তখন তাঁর শীতল শরীরকে উত্তাপ দেওয়ার জন্য দ্বাদশ আদিত্য একসঙ্গে কিরণ দান করেছিলেন। এখন সেই উঁচু স্থানটি দ্বাদশ আদিত্য টীলা নামে পরিচিত। পাশে সনাতন গোস্বামীর সমাধি, গৌরনিতাই ও রাধামদনমোহন মন্দির।

প্রশ্ন ১২২। শুকদেব গোস্বামীর ব্যাসদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত জানতে চাই।

উত্তর ঃ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে, ব্যাসদেবের পত্নী বীটিকা বহু তপস্যার পর শুকদেব গোস্বামীকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন বারো বছর ধরে। উদ্বিগ্ন ব্যাসদেব

তখন গর্ভস্থ শিশুকে বলেন, "হে পুত্র, কেন তুমি নিজ মাতাকে বহু বর্ষ ধরে পীড়া দিচ্ছ, গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসো।' পুত্র বললেন, 'গর্ভ থেকে বের হলেই মায়া আমাকে আক্রমণ করবে। তাই আমি এখানেই ভগবানের ধ্যান করছি।' ব্যাসদেব তাঁকে আশ্বাস দেন, 'পুত্র, তুমি মায়াদ্বারা প্রভাবিত হবে না।' পুত্র বলেন, 'আপনি পুত্র ও পত্নীতে আসক্ত, তাই আপনার কথার প্রমাণ কি?' ব্যাসদেব বলেন, 'তুমি কার কথা প্রামাণিক বলে বিচার কর?' পুত্র বলেন, 'যাঁর মায়া তাঁর কথা প্রামাণিক বলে স্বীকার করি।' ব্যাসদেব বলেন, 'তবে আমি তাঁকেই এখানে নিয়ে আসছি।' শ্রীল ব্যাসদেব দ্বারকাতে গিয়ে সব কথা নিবেদন করে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মাতৃজঠরস্থ শিশুকে 'আমার মায়া তোমাকে প্রভাবিত করবে না, তুমি বেরিয়ে এসো' বলে আশ্বাস দিলেন, তখন সেই দ্বাদশবর্ষের শিশু ভূমিষ্ঠ হলেন।

প্রশ্ন ১২৩। নিমাই-এর অগ্রজ বিশ্বরূপের অপ্রকটের শাস্ত্রসম্মত ইতিহাস কি?

উত্তর ঃ মহারাষ্ট্র প্রদেশে শোলাপুর জেলায় ভীমা নদীর তীরে অবস্থিত শহর পাণ্ডরপুর। নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে তীর্থভ্রমণ করতে করতে এই পাণ্ডরপুর তীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ, চিন্ময় ধামে প্রবেশ করেন। তাঁর সন্ন্যাস নাম শঙ্করারণ্য স্বামী। শ্রীনিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের পর দক্ষিণভারত পর্যটন করতে এলে এই পাণ্ডরপুরে শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রঙ্গপুরী মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য। তিনিই বিশ্বরূপের অপ্রকটের কথা জ্ঞাপন করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা নবম অধ্যায়ে সেই কথা বর্ণিত রয়েছে।

প্রশ্ন ১২৪। রাবণের পিতার নাম বিশ্রবা, মায়ের নাম নিকষা, না কেশিনী?

উত্তর ঃ রাবণের মায়ের নাম পাওয়া যায় তিনটি। নিকষা, কেশিনী ও পুষ্পোৎকটা। একজনেরই নামান্তর মাত্র।

প্রশ্ন ১২৫। রামায়ণে হরধনু ভঙ্গের সময় দশ হাজার রাজকুমার একত্রে ধনুক ভাঙ্গার চেষ্টা করেছিল। এ কথার তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ রামায়ণে বালকাণ্ড ৬৬ সর্গে বলা হয়েছে, অতি দীর্ঘাকার হরধনুটি রামচন্দ্রকে দেখানোর উদ্দেশ্যে রক্ষিত স্থান থেকে টেনে আনতে পাঁচ হাজার বলশালী মানুষ লেগেছিল। হর বা শিবের ধনুক কে ভাঙতে পারে? শিবের চেয়ে যিনি শক্তিশালী এমন বীরপুরুষই ধনুভঙ্গ করতে পারেন। অর্থাৎ, ভগবান ছাড়া কারও এত শক্তি নেই। ভগবান রামচন্দ্র অনায়াসে সেটি ভেঙে ছিলেন। বহু রাজা জনকনন্দিনী সীতাকে লাভ করতে চাইলেও প্রকৃতপক্ষে সীতাদেবী হচ্ছেন রামশক্তি।

প্রশ্ন ১২৬। ভগবান বলেছেন, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই চারি ব্যক্তি যদি সুকৃতিবান হয় তা হলে তারা আমার ভজনা করবে। এই চারি সুকৃতিবানের দৃষ্টান্ত কি?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি 'আর্ত' অর্থাৎ, আপদ্‌গ্রস্ত বা কষ্ট পাচ্ছে, তখন সে ভগবানের শরণাগত হয়, যেমন গজেন্দ্র। সরোবরের মধ্যে কুমীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গজেন্দ্র

নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করতে না পেরে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলেন। ভগবানের চক্রে কুমীরের মস্তক ছিন্ন হল। গজেন্দ্র সারূপ্য মুক্তিলাভ করলেন।

'অর্থার্থী' বা ধন-সম্পদ রাজত্ব বাসনা করে ভগবানের শরণাগত হয়েছেন এমন ভক্তের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ধ্রুব মহারাজ। তিনি ভগবদ্‌ভজন করে ধ্রুবলোক লাভ করেন।

'জিজ্ঞাসু' অর্থাৎ, আত্মস্বরূপ জ্ঞান লাভে যাঁরা ইচ্ছুক এমন ভগবদ্ শরণাগত ভক্তের উদাহরণ হচ্ছেন শ্রীশৌনক ঋষি।

'জ্ঞানী' তাঁকেই বলা হয় যাঁর ভগবৎতত্ত্ব জ্ঞান উপলব্ধ হয়েছে। যেমন শ্রীশুকদেব গোস্বামী।

প্রশ্ন ১২৭। মা যশোদা ও নন্দমহারাজ পূর্বজীবনে কাঁরা ছিলেন?

উত্তর ঃ শ্রীনারায়ণ একসময় দেবর্ষি নারদকে মা যশোদা ও নন্দমহারাজের পূর্ব পরিচিতির কথা উল্লেখ করেছিলেন, যা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লেখ রয়েছে। নন্দ মহারাজ বসুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল দ্রোণ। তিনি মহান তপস্বী ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম ধরা। সেই তপস্বিনী সাধ্বী ধরা যশোদারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন।

একদিন এই ধরা ও দ্রোণ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে গন্ধমাদন পর্বতে ব্রহ্মপুত্র গৌতম ঋষির আশ্রমের কাছে সুপ্রভা নদীর তীরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার উদ্দেশ্যে দশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তবুও এই তপস্বী ও তপস্বিনী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেননি।

তখন তাঁরা বৈরাগ্যবশত অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করলেন এবং সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করবার জন্য উপস্থিত হলেন। তাদের এভাবে প্রাণবিসর্জন দিতে ইচ্ছুক দেখে দৈববাণী হল— 'তিষ্ঠ! তোমরা পৃথিবীতে গোকুলে শ্রীহরিকে পুত্ররূপে দর্শন করবে। হে বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ! যোগীরা বহু জন্ম ধ্যান করেও যাঁর দর্শন পায় না, ব্রহ্মা, শিব প্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণ যাঁর পাদপদ্ম বন্দনা করেন, বিদ্বান ব্যক্তিরা যাঁর চরণকমল স্মরণ করেন, সেই পরমপ্রভু শ্রীহরি অচিরে পুত্ররূপে তোমাদের দর্শন দেবেন।'

সেই দৈববাণী শুনে ধরা ও দ্রোণ আনন্দিত মনে আপনভবনে গমন করলেন। তারপর তাঁরা ব্রজমণ্ডলে যশোদা ও নন্দরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১২৮। ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ ব্রহ্ম হচ্ছে ভগবানের অঙ্গজ্যোতি, ব্রহ্মা হচ্ছেন ভগবানের গুণাবতার বিশেষ এবং ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

প্রশ্ন ১২৯। শিবমন্দিরে গীতাপাঠ করা যায় কি?

উত্তর ঃ পরম বৈষ্ণব শিব ঠাকুর কৃষ্ণকথা শুনতে অবশ্যই ভালবাসেন।

প্রশ্ন ১৩০। ভারতে শঙ্করাচার্য সনাতনধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, তবে তাঁকে নিরীশ্বরবাদী বলা হল কেন?

উত্তর ঃ কলিযুগে শিব ঠাকুর ব্রাহ্মণবেশী শঙ্করাচার্যরূপে মায়াবাদী নাস্তিক-অসৎ শাস্ত্র বিধান করে ভগবানের নির্দেশেই কৃষ্ণবহির্মুখ জীবদের কৃষ্ণ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। সে কথা পদ্মপুরাণে বর্ণিত রয়েছে।

প্রশ্ন ১৩১। হস্তিনাপুর-রাজ পাণ্ডুর দেহত্যাগের পর সত্যবতী তাঁর পুত্রবধূদের সঙ্গে রাজপুরী ত্যাগ করে বনে চলে গেলেন কেন?

উত্তর ঃ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যখন দেখলেন রাজা পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের পর প্রজাদের দুঃখমনোভাব এবং তাঁর জননী সত্যবতী শোকাকুলা, তখন ব্যাসদেব বলেছিলেন, 'মা, এই সময়টি ভালো নয়। দিন দিন লোকের পাপ বৃদ্ধি হচ্ছে। পৃথিবী শস্যশূন্য ও ফলফুল বিহীন হচ্ছে। লোকেরা ক্রমশ নানারকমের মায়াজালে জড়িয়ে পড়ছে। নানা দোষে দুষ্ট হচ্ছে। কুকর্মে যুক্ত হচ্ছে। মনে হচ্ছে ধর্মকর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কুরুবংশের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করবে এবং রাজ্যশ্রী কুরুদেরকে ত্যাগ করবে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই কুরুবংশের বিনাশ হবে। সেই বিনাশ দেখবার পরিবর্তে আগের থেকে বনে গিয়ে যোগ অনুষ্ঠানে যত্ন করো। শ্রীহরির আরাধনা করো। তারপর দেহত্যাগান্তে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।'

সত্যবতী ব্যাসদেবের কথা স্বীকার করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর পুত্রবধূ অম্বিকাকে বললেন, 'শোন অম্বিকা, আমি শুনতে পেলাম এই যে, তোমার পৌত্রের অত্যাচারে অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের বংশ একেবারে উচ্ছিন্ন হবে, সেই জন্য যদি তোমার অভিমত হয়, তবে চলো, আমরা পুত্র শোকার্তা অম্বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করি।' পুত্রবধূরাও তাতে সম্মত হলেন।

এভাবে সত্যবতী দুই পুত্রবধূ সহ বনে তপস্যা করতে করতে দেহ ত্যাগ পূর্বক নিজ নিজ অভিলষিত মার্গে প্রস্থান করলেন।

কলিযুগে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা হরিনাম গ্রহণ করবেন। একথা শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে। বর্তমান মানুষদের কলুষিত চিন্তাধারা থাকার জন্য কেউ হরিনাম করে দুঃখ মোচনের চেষ্টা করে না। পরন্তু পারিবারিক কিছু একটা অসহ্যকর দুর্ব্যবহার দর্শন করে বিষভক্ষণ ফাঁসী ইত্যাদি আত্মহত্যামূলক পন্থা গ্রহণ করে। কিন্তু তাতে আরও বেশী যাতনা লাভ হয়। নিজেদের দেহ নিজেরাই নষ্ট করার ফলে বিদেহী প্রেতাত্মারূপে আরও অধিক কষ্টপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে হয়, তাদের সদ্‌গতিও হয় না। সেই জন্যেই বলা হয় আত্মহত্যা মহাপাপ।

কিন্তু পারিবারিক ছুটোপুটিতে বেশি মাথা না ঘামিয়ে যদি মানুষ জীবৎকালে কৃষ্ণনামের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে তা হলে তার অবশ্যই সদ্‌গতি লাভ হবে।

প্রশ্ন ১৩২। আপনারা তো ভগবানের সেবা করেন। তাহলে আপনারা এত লাক্সারী জীবন যাপন করেন কেন?

উত্তর ঃ যারা একটি ছোট্ট দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির সেবা করে, তারা লাক্সারী জীবন যাপন করবে এটা সহজ কথা। তা হলে যারা ব্রহ্মাণ্ডপতির সেবা করবে তাদের আরও অনেকগুণ লাক্সারী জীবন যাপন করাই দরকার।

প্রশ্ন ১৩৩। রামকৃষ্ণদেব টাকা মাটি করে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। এমনই তাঁর বৈরাগ্য। কিন্তু আপনারা এত টাকা চান কেন?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, টাকা আমি জলে ফেলে দেব না। টাকা হচ্ছে লক্ষ্মী। ভগবানের সম্পদ। ভগবানের সেবায় সব টাকা লাগিয়ে তার সদ্ব্যবহার করা চাই। এমনই তাঁর ভক্তি।

প্রশ্ন ১৩৪। মহাপুরুষদের নামের আগে অষ্টোত্তরশতশ্রী বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ বৈদিক শাস্ত্রে ১০৮ সংখ্যক সন্ন্যাস নাম রয়েছে। সেই নাম বা গুণভিত্তিক পরিচয়ে মহাপুরুষদের ভূষিত করা হয়ে থাকে। তাঁদের প্রতি বিশেষ সম্মান সূচক বলে 'অষ্টোত্তরশতশ্রী' বলা হয়ে থাকে। সেই নামগুলি হল ঃ

১) তীর্থ, ২) আশ্রম, ৩) বন, ৪) অরণ্য, ৫) গিরি, ৬) পর্বত, ৭) সাগর, ৮) সরস্বতী, ৯) ভারতী, ১০) পুরী, ১১) গভস্তিনেমি, ১২) বারাহ, ১৩) ক্ষমিতা, ১৪) পরমার্থী, ১৫) তূর্যাশ্রমী, ১৬) নিরীহ, ১৭) ত্রিদণ্ডী, ১৮) বিবুধদৈবত, ১৯) ভিক্ষু, ২০) যাযাবর, ২১) বিষ্ট, ২২) ন্যাসী, ২৩) রাভসিক, ২৪) মুনি, ২৫) বিষ্টলগ, ২৬) মহাবীর, ২৭) মহত্তর, ২৮) যথাগত, ২৯) নৈষ্কর্ম, ৩০) পরমাদ্বৈতী, ৩১) শুদ্ধাদ্বৈতী, ৩২) জিতেন্দ্রিয়, ৩৩) তপস্বী, ৩৪) যাচক, ৩৫) নগ্ন, ৩৬) রাদ্ধান্তী, ৩৭) ভজনোন্মুখ, ৩৮) সন্ন্যাসী, ৩৯) মস্করী, ৪০) ক্লান্ত, ৪১) নিরগ্নি, ৪২) নারসিংহ, ৪৩) ঔডুলোমী, ৪৪) মহাযোগী, ৪৫) শ্রবাক্, ৪৬) ভবপারগ, ৪৭) শ্রমণ, ৪৮) অবধূত, ৪৯) শান্ত, ৫০) যথার্হ, ৫১) দণ্ডী, ৫২) কেশব, ৫৩) ন্যস্তপরিগ্রহ, ৫৪) ভক্তিসার, ৫৫) অক্ষরী, ৫৬) জনার্দন, ৫৭) উর্ধ্বমন্থী, ৫৮) ত্যক্তগৃহ, ৫৯) ঊর্ধ্বরেতঃ, ৬০) যথেষ্টধৃক্, ৬১) বিরক্ত, ৬২) উদাসীন, ৬৩) ত্যাগী, ৬৪) সিদ্ধান্তী, ৬৫) শ্রীধর, ৬৬) শিখী, ৬৭) বোধায়ণ, ৬৮) ত্রিবিক্রম, ৬৯) গোবিন্দ, ৭০) মধুসূদন, ৭১) বৈখানস, ৭২) যথাঙ্গ, ৭৩) বামন, ৭৪) পরমহংস, ৭৫) নারায়ণ, ৭৬) হৃষীকেশ, ৭৭) পরিব্রাজক, ৭৮) মঙ্গল, ৭৯) মাধব, ৮০) পদ্মনাভ, ৮১) ঔডুপিক, ৮২) ভ্রামী, ৮৩) বৈষ্ণব, ৮৪) বিষ্ণু, ৮৫) দামোদর, ৮৬) স্বামী, ৮৭) গোস্বামী, ৮৮) পরমগব, ৮৯) ভাগবত, ৯০) অকিঞ্চন, ৯১) সন্ত, ৯২) নিষ্কিঞ্চন, ৯৩) যতি, ৯৪) ক্ষপণক, ৯৫) অবিবক্ত, ৯৬) উর্ধ্বপুণ্ড্র, ৯৭) মুণ্ডী, ৯৮) সজ্জন, ৯৯) নির্বিবন্নী, ১০০) হরিজন, ১০১) শ্রৌতী, ১০২) সাধু, ১০৩) বৃহদ্ব্রতী, ১০৪) স্থবির, ১০৫) তৎপর, ১০৬) পর্যটক, ১০৭) আচার্য, ১০৮) স্বতন্ত্রব্রী।

প্রশ্ন ১৩৫। ভাগবত প্রণেতা শুকদেব গোস্বামীর মায়ের নাম কি?

উত্তর ঃ বীটিকা। বীটিকাদেবী তাঁর পতি ব্যাসদেবের সঙ্গে বহুকাল তপস্যা করেন। তারপর মহান পুত্র শুকদেবকে সুদীর্ঘ এগারো বছর ধরে গর্ভে ধারণ করে রাখেন।

প্রশ্ন ১৩৬। গুঞ্জামালা কি?

উত্তর ঃ বন জঙ্গলে সরু লতানো গাছ দেখা যায়, তার পাতাগুলো অনেকটা তেঁতুলপাতার মতো হলেও পত্রফলকগুলি ঘন নয়। ফলটি অনেকটা মটরশুটির মতো। ফলের মধ্যে কয়েকটি সাদা অথবা টুকটুকে লাল বীজ থাকে। বীজগুলোকে আঞ্চলিক

ভাষায় কুঁচ বলে। অনেকে কাঁইচ বলে থাকেন। ফলটি পেকে খোসা শুকিয়ে যায়। বীজগুলি তখন শক্ত হয়ে যায়। সেই কুঁচগুলোকে শক্ত সুতো দিয়ে মালা বানিয়ে বিশেষ অলংকার হিসাবে পরা হয়। সেই কুঁচের মালাকে শুদ্ধ ভাষায় 'গুঞ্জামালা' বলে। ব্রজে শ্রীরাধারাণী ও সখীরা এই মালা বানিয়ে পরতেন।

প্রশ্ন ১৩৭। পট্টডোরী কি?

উত্তর ঃ পাটের দড়ি। নীলাচলপুরী ধামে রথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেবকে তাঁর কোমরে শক্ত মোটা পাটের কিংবা রেশমের দড়ি দিয়ে বেঁধে পূজারীরা সিংহাসন থেকে তুলে নিয়ে রথ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেই পথে বিছানো থাকে তুলোর বড় বড় বালিশ। বালিশের ওপর দিয়ে জগন্নাথ চলতে থাকেন। বালিশগুলি প্রায়ই ফট্‌ফাট্ করে ফেটেই যায়। তুলোগুলো বেরিয়ে পড়ে। তারপর পূজারীরা রথের উপর জগন্নাথকে বসানোর জন্য সেই কটিবন্ধন-দড়ি ধরে তুলবার চেষ্টা করেন। সেই দড়িকে 'পট্টডোরী' বলা হয়। পূজারীদের 'দয়িতা' বলা হয়। বালিশগুলোকে 'তুলী' বলা হয়। এইরকম অনুষ্ঠানটিকে জগন্নাথ-বলদেবের পাণ্ডুবিজয় বা উড়িয়া ভাষায় 'পহণ্ডি বিজয়' বলা হয়।

প্রশ্ন ১৩৮। শালগ্রাম শিলা কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ বিভিন্ন আকার, চিহ্ন এবং বর্ণ ভেদে শতাধিক রকমের শালগ্রাম শিলা আছে। ভগবানের বিশেষ বিশেষ অবতারদের নামেই সেই দিব্য শিলা অভিহিত হয়ে থাকে। যেমন—বাসুদেব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বামন, নরসিংহ, কূর্ম, মৎস, জনার্দন, বিষ্ণু, পদ্মনাভ ইত্যাদি।

বর্ণভেদে শালগ্রাম শিলার দোষ-গুণের কথা স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে। যেমন কৃষ্ণবর্ণ—কীর্তি দান করেন, পাণ্ডুবর্ণ—পাপ নাশ করেন, পীতবর্ণ—পুত্র দান করেন, নীলবর্ণ—সম্পদ বৃদ্ধি করেন, রক্তবর্ণ—রোগ উৎপাদন করেন।

প্রশ্ন ১৩৯। যদুবংশের ব্যক্তিরা মহান। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই বংশে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেই মহান বংশধরেরা কেন অযথা মারামারি করে বিনষ্ট হলেন?

উত্তর ঃ মহান ব্যক্তিরা যাঁরা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট লীলাতেও যোগ দিয়েছিলেন। যাঁরা নামে মহান কিন্তু যাঁরা বাস্তবে কৃষ্ণবিমুখ ছিলেন অর্থাৎ, কৃষ্ণসেবা বর্জন করে যাঁরা সাধারণের দৃষ্টিতে নিজেদেরকে শ্রীকৃষ্ণের মতোই পূজ্য বলে ভ্রম উৎপাদন করেছিলেন, ভগবান তাঁদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে তাঁদের নিধন সাধন দ্বারা পৃথিবীকে ভারমুক্ত করেছিলেন। যাঁরা কৃষ্ণসেবায় যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বাধিয়ে সংহার করেননি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বংশধরদের মধ্যে যাঁরা ভগবদ্‌বিমুখ ছিলেন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদন করিয়ে সংহার করবার জন্য তাঁদের দ্বারা নারদ প্রমুখ কৃষ্ণভক্তদের অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়ে ছিলেন। যারা ভক্ত

মহাত্মাদের অবজ্ঞা করে, অশ্রদ্ধা পোষণ করে, তাদের মতি বিকৃত হয়, তারা অযথা মারামারি করে, এভাবেই তারা বিনষ্ট হয়।

প্রশ্ন ১৪০। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদবী ছিল 'মিশ্র' কিন্তু রামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের পদবী কি ছিল?

উত্তর ঃ পূর্ব পূর্ব যুগের ইতিহাসে রাজাদের পদবী উল্লেখ তেমন নেই বললে চলে। কেবলমাত্র নামেই বিখ্যাত। যেমন রাজা মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ, উগ্রসেন, যুধিষ্ঠির তাঁদের বংশ পরম্পরার পদবী ছাড়াই নামে পরিচিতি। দশরথ-পুত্র রামচন্দ্রের কি পদবী ছিল তা পাওয়া যায় না। বিশেষ সামাজিক পরিচিতি হিসাবে গৌরহরি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে জন্মলীলা প্রকাশ করেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ শ্রীনন্দ ঘোষের গৃহে প্রকাশিত হন। এই হিসেবে অনেকে বলে থাকেন ঘোষ পরিবারেরই কৃষ্ণ। আমরা জানি ব্রজবাসী ঘোষ পদবীর লোকেরা সবাই গো পালন, কৃষিকর্মাদি করে থাকেন। তাঁরা শাকসবজি ও দুধ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতেন। কৃষ্ণের প্রতি প্রত্যেকের স্বাভাবিক সমাদর ছিল। বর্তমান আমরা ঘোষ পদবীর লোকেরা কিছু কিছু এই পেশা গ্রহণ করেও থাকি। তবে শাকসবজি দুধ জাতীয় খাদ্য ছাড়াও মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি অখাদ্য গ্রহণ করে ি, যা সম্পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি বিরুদ্ধ।

প্রশ্ন ১৪১। ভগবান গীতায় বলেছেন, জ্ঞানী ভক্তরা আমার প্রিয়। তা হলে পাষণ্ড বর্বর ব্যক্তিকেও তিনি উদ্ধার করে থাকেন, এর মানে কি?

উত্তর ঃ ভক্তরা যখন পাষণ্ড-বর্বরদের উদ্ধারের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন তখন ভক্তবৎসল ভগবান সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

প্রশ্ন ১৪২। 'রাধা-কৃষ্ণ' 'রাধা-গোবিন্দ' 'রাধা-মাধব' ইত্যাদি কথা গুলোতে 'রাধা' শব্দটি প্রথমে ব্যবহৃত হচ্ছে কেন? এতে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য খর্ব করা কী হচ্ছে না? আমরা তো শিব-দুর্গা, হর-পার্বতী বলি, তেমনই কৃষ্ণ-রাধা বললে ক্ষতি কি?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠ আরাধিকা শক্তির পাদপদ্মে আগে আশ্রয় নেওয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রীতি। এতে ভগবান কৃষ্ণ আরও বেশি প্রীত হন। শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণী কিংবা তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া কারও কাছে সরাসরি সেবা গ্রহণ করতে চান না। এই তত্ত্ব অবগত হয়ে ভক্তরা আগেই রাধারাণীর নাম উল্লেখ করেন।

পরম বৈষ্ণব শিব ঠাকুর দেবর্ষি নারদকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

আদৌ সমুচ্চরেদ্ রাধাং পশ্চাৎ কৃষ্ণং চ মাধবম্ ।
বিপরীতং যদি বদেৎ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥

"প্রথমেই 'রাধা' শব্দ উচ্চারণ করবে, তারপর 'কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করবে। যদি এর বিপরীত কেউ বলে, তবে সে ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হয়।" (শ্রীনারদপঞ্চরাত্র ৫/৬/৬)

১৯
আত্মা শাশ্বত

প্রশ্ন ১। পৃথিবীর জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে। এর কারণ কি? এই বর্ধিত আত্মাগুলি কোথা থেকে আসছে?

উত্তর ঃ অন্যান্য যুগের তুলনায় পৃথিবীতে কলিযুগে মানুষের সংখ্যা অনেক কম। কীট পতঙ্গের বৃদ্ধির হার বেশি। নিত্য আত্মা এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে অন্য ব্রহ্মাণ্ডেও যাতায়াত করে। এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাতায়াত করে। এক দেহ বিনাশ হলে আত্মা অপর যে কোনও দেহ গ্রহণ করে—মানুষ, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদি। অতএব দেহগুলি দেখে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু দেহী আত্মা কমেও না, বাড়েও না।

শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে, *অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণ* (গীতা ২/১৮)—'এই সমস্ত দেহগুলি অনিত্য। কিন্তু শরীরী আত্মা অবিনাশী।' *ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ* (গীতা ২/২০)—'আত্মার কখনো জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না। অথবা কখনো উৎপন্ন বা বৃদ্ধি হয় না।' *অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো* (গীতা ২/২০)—'অনাদিকাল ধরে আত্মা যা-ই ছিল, অনাদিকালই তাই থাকবে।'

প্রশ্ন ২। মনুষ্যাত্মা ৮৪ লক্ষ যোনিতে কি জন্ম নেয়? না কি মনুষ্যাত্মা মনুষ্যযোনিতে সর্বাধিক ৮৪ লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করে?

উত্তর ঃ আত্মা চিৎ কণা। মনুষ্য-আত্মা, পক্ষী-আত্মা, কীট-আত্মা—এইভাবে বলা হয় না। মনুষ্য, পক্ষী, কীট—এই সব হল জীব শরীর। মনুষ্য, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ সর্বমোট প্রায় ৮৪ লক্ষ প্রকারের। অর্থাৎ, ৮৪ লক্ষ প্রকার জীবযোনি রয়েছে। আর, আমরা আমাদের কর্ম ও বাসনা অনুসারে যে কোন শরীর লাভ করি। অর্থাৎ, যে কোনও যোনিতে জন্মগ্রহণ করি।

প্রশ্ন ৩। মৃত্যুর পর আত্মাকে বাঁধা যায় না কেন?

উত্তর ঃ আত্মাকে জড় দৃষ্টিতে দেখা যায় না। আত্মাকে কাটা যায় না, পোড়ানো যায় না, শুকানো বা ভেজানো যায় না—এসব কথা ভগবদ্গীতায় বর্ণনা রয়েছে। অতএব তাকে বাঁধা যায় না।

প্রশ্ন ৪। দেহের মধ্যে আত্মার স্থান কোথায় এবং আত্মার আকার কেমন?

উত্তর ঃ মুণ্ডক উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আত্মা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে। দেহের মধ্যে বায়ু ও রক্ত প্রবাহের মূল কেন্দ্র হৃৎপিণ্ডে আত্মা অবস্থান করে। পরমাণুর মতো অতি সূক্ষ্ম আত্মা প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই পঞ্চবিধ বায়ুতে ভাসমান থেকে হৃদয়ে অবস্থান করে এবং সমগ্র দেহে তার প্রভাব বিস্তার করে।

একটি বিন্দুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জ্যামিতিক সূত্রে বলা হয় যে তার কোন দৈর্ঘ্য প্রস্থ নেই। তেমনই আত্মারও আকার পরিমাপক কোনও বস্তু হয় না। শ্বেতাশ্বতর

উপনিষদে বলা হয়েছে কেশাগ্রের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে আত্মার আয়তনের পরিমাণ।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥

"একটি চুলের অগ্রভাগ বিন্দুকে শতভাগে ভাগ করে তার একভাগকে আবার শতভাগে ভাগ করলে তার একটি ভাগ যে আয়তন হয়, আত্মার আয়তনও ততখানি।" (শ্বেঃ উঃ ৫/৯)

প্রশ্ন ৫। অসংখ্য তুলসীবৃক্ষ রয়েছে। প্রতি বৃক্ষ এক-একটি আত্মা। এই আত্মাগুলো কে? এদের মধ্যে কোন্‌টি তুলসী দেবী?

উত্তর ঃ তুলসীবৃক্ষগুলি তুলসীদেবীর বিস্তার। যেমন অসংখ্য শালগ্রাম শিলা রয়েছে। প্রতি শালগ্রামই বিষ্ণু। বিষ্ণুর বিস্তার। একই গঙ্গাদেবী স্বর্গে সুরধুনী, মর্ত্যে গঙ্গা, পাতালে ভোগবতী নদীরূপে প্রবাহিতা। অনুরূপভাবে একই তুলসীদেবী শ্রীভগবানের সেবা পারিপাট্যের জন্যই অসংখ্যরূপে বিরাজিতা। তবে এই সমস্ত বৃক্ষ কখনই বদ্ধ জীবাত্মা নয়। জড় জগতের কোন বদ্ধ জীব তুলসী বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করতে পারে না। অন্যান্য বৃক্ষগুলির সঙ্গে তুলসী বৃক্ষের তুলনা হয় না।

মহর্ষি নারদ মুনি দ্বারকা পুরীতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে যান। ষোল হাজার একশ আটটি প্রাসাদে তিনি যান, কিন্তু প্রত্যেক প্রাসাদেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পান। প্রত্যেক শ্রীকৃষ্ণই পৃথক পৃথক কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন দেখা গেল। প্রত্যেক শ্রীকৃষ্ণই মুনিবরকে দেখতে পেয়ে এমনভাবে সম্বর্ধনা জানাতে লাগলেন যেন কোনও শ্রীকৃষ্ণ অন্য শ্রীকৃষ্ণ কি করেছেন না করেছেন কিছুই জানেন না। বৃন্দাবনের রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীর প্রত্যেকের সঙ্গে একই সময়ে নৃত্য করছিলেন। প্রত্যেক গোপী দেখলেন যে, তাঁর কাছেই কেবল শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন। এখন যদি প্রশ্ন করা যায়, এত অসংখ্য শ্রীকৃষ্ণ কারা? তবে উত্তর হল যে, শ্রীকৃষ্ণ মাত্র একজন। অসংখ্যরূপে তাঁর বিস্তার। ঠিক সেইরকম অসংখ্য তুলসী বৃক্ষ একই তুলসীদেবীর অসংখ্য প্রকাশ।

প্রশ্ন ৬। 'দরিদ্র নারায়ণ' কথাটির আপনারা বিরোধিতা করেন কেন?

উত্তর ঃ 'দরিদ্র নারায়ণ' কথাটির কোনও মূল্য নেই। ভগবান নারায়ণ সমস্ত ঐশ্বর্যের মালিক। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর তাঁর পাদপদ্ম সেবা করেন। নারায়ণ কখনই দরিদ্র নন। আর, দরিদ্র মানুষেরাও নারায়ণ নয়। সব দরিদ্রকেই যদি নারায়ণ বলা হবে, তবে মধ্যবিত্ত কিংবা ধনীদেরও নারায়ণ বলা হবে না কেন? তা ছাড়া বদ্ধজীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে নারায়ণ বিরাজ করলেও দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে নারায়ণও দরিদ্র—এরূপ বিচার ভ্রান্ত।

প্রশ্ন ৭। গীতায় বলা হয়েছে মানুষ পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরে, সেরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন কোন দেহ ধারণ করে। কিন্তু

বর্তমানে পিতা-মাতা সন্তান চায় না, তারা সন্তানকে গর্ভাবস্থায় নষ্ট করতে চায়। পৃথিবীতে আসার আগেই অকালে সন্তানকে বিদায় দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে গীতার ঐ উক্তিটি কিভাবে প্রযোজ্য?

উত্তর ঃ জীর্ণ অর্থাৎ, ছেঁড়া কাপড় লোকে বাদ দিয়ে নতুন বা ভাল কাপড় পরে। যে জীবাত্মাটি মাতৃজঠরে ভ্রূণ মধ্যে অবস্থান করছিল অর্থাৎ, যে নতুন শরীরটি তৈরি হচ্ছিল, সেই শরীরটিকে যদি পিশাচগ্রস্ত ছন্নমতি মাতা-পিতা ছিঁড়ে কেটে নষ্ট করে দেয়, তবে সেই ছিন্ন শরীর ত্যাগ করে জীবাত্মাকে বাধ্য হয়ে আবার নতুন কোনও মাতৃজঠরে নতুন দেহ ধারণ করতে হয়। সেই জীবাত্মার প্রতি হিংসাবশত সেই তথাকথিত পিতা-মাতাকে পরবর্তী জীবনে দণ্ডভোগ করতেই হয়।

প্রশ্ন ৮। পুরুষ আত্মা কি নারী আত্মা হতে পারে?

উত্তর ঃ পুরুষ-নারী, মানুষ-পশু, পক্ষী-কীট—এই সমস্ত আত্মার পরিচয় নয়, এগুলি বিভিন্ন শরীর মাত্র। আত্মা পুরুষ-মেয়ে এইভাবে বিচার্য নয়। জীবাত্মার পরিচয় হল সে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ভৃত্য। কৃষ্ণ-বহির্মুখ হয়ে—কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হয়ে জীব এই জড় জগতে নানা যোনি ভ্রমণ করে কখনও রাজা, কখনও ফকির, কখনও নারী, কখনও পুরুষ, কখনও মানুষ, কখনও পশু—ইত্যাদি রূপ নিয়ে এই ভবসংসারে দিনযাপন করছে। এই জড় শরীরটা পরিবর্তনশীল। এই জীবনে যে স্ত্রী, পরজীবনে পুরুষ, এই জীবনে যে পুরুষ, পরজীবনে সে স্ত্রী। এই জীবনে যে মানুষ, পরজীবনে সে পশু বা দেবতার শরীর লাভ করতে পারে। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কাব্যে ভগবান শ্রীগৌরহরি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বলছেন—

কি নারী পুরুষ দেখ, আত্মা সে সবার এক,
মিছা মায়াবন্ধে ভাবে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এ কথা না বুঝয়ে কোই ॥

প্রশ্ন ৯। কর্ম অনুযায়ী আত্মার গঠন হয় কি? আত্মা কি প্রত্যেক জীবের মধ্যে একই আছে? আত্মা যদি অবিনশ্বর হয়, তবে আত্মঘাতী যারা হচ্ছে তাদেরও কি আত্মা থাকে?

উত্তর ঃ কর্ম অনুযায়ী আত্মার গঠন হয় না। আত্মা চিরকালই একই থাকে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে একটি আত্মার পরিমাণ হচ্ছে একটি চুলের অগ্রভাগের দশহাজার ভাগ করে তার একটি ভাগ। অর্থাৎ, এমন অনুবীক্ষণ যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়নি যাতে আত্মাকে দেখা যাবে। আত্মা বড় ছোট মাঝারি লম্বা চওড়া এইভাবে কখনই আত্মার পরিমাপ হয় না। আত্মা চিৎকণা অর্থাৎ, চেতন বস্তু। কিন্তু যে দেহটিকে আত্মা ধারণ করে রয়েছে সেই দেহটির আকার রয়েছে, তাকে দেখা যায়, জীব তার কর্ম অনুসারে তার দেহের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আত্মা আছে বলে জীবদেহ সচেতন ও কর্মক্ষম। দেহের শৈশব, কৈশোর,

যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি পরিবর্তন হচ্ছে। আবার আমাদের কর্মফলে এই দেহ ত্যাগের পর অন্য কোনও পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের দেহ গ্রহণ করব। অর্থাৎ, আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ গ্রহণ করে।

আত্মা প্রত্যেক জীবের মধ্যে একই থাকে। একই চিৎকণা আত্মা একটি ক্ষুদ্র জীবাণুর মধ্যেও থাকে আবার সেই একই পরিমাণ আত্মা এক একটি বিশাল হাতি বা বৃক্ষের মধ্যেও থাকে।

আত্মা অবিনশ্বর। দেহ নষ্ট করে ফেললেও আত্মাকে বধ করা যায় না, শুকানো, পোড়ানো, ভেজানো কোন কিছুই করা যায় না। এই কথাই গীতায় বলা হয়েছে। দেহ বিশিষ্ট জীবাত্মা যখন দেহটাকে জোর করে নষ্ট করে দেয় তখন তাকে আত্মঘাতী বলা হয়। আত্মঘাতী বলতে আত্মাকে নষ্ট করা বোঝায় না, আত্মঘাতী বলতে যে জীব নিজেকে দেহ থেকে জোর করে পৃথক করে দেহটাকে নষ্ট করে ফেলে তাকেই বোঝায়। তখন সেই জীবাত্মা নতুন কোনও দেহ আশ্রয় না পাওয়া অবধি অশরীরীভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

প্রশ্ন ১০। কি করে বুঝবো যে, আমার শরীরে আত্মা ও পরমাত্মা বিরাজ করছেন?

উত্তর ঃ আপনার শরীরটিতে অনুভূতি হচ্ছে, ব্যথা লাগছে, আপনি হাঁটা চলা করছেন, কথা বলছেন, ঘুমচ্ছেন, খাচ্ছেন, বসছেন, উঠছেন, শুনছেন, বুঝছেন এসমস্ত ক্রিয়াকলাপের কারণটি কি? অনুভব, ইচ্ছা ও ক্রিয়া নিশ্চয়ই একটি মৃত শরীর করে না, একটি জীবন্ত শরীর করতে পারে। জীবনীশক্তি বা চেতনশক্তি বলে তা হলে কিছু অবশ্যই রয়েছে। না হলে ক্রিয়াকর্ম সম্ভব হত না। সেই চেতন শক্তিই হচ্ছে আত্মা। আর, সেই চেতনশক্তি বা আত্মা কোথা থেকে এল, তা অনুসন্ধান করলেই পরমাত্মার সন্ধান পাওয়া যাবে। পরমাত্মাযোগীগণ আত্মা ও পরমাত্মাকে দর্শন করতে পারেন, উপলব্ধি করতে পারেন।

প্রশ্ন ১১। কোন ব্যক্তি যদি হরিনাম জপ করেন তবে তাঁর মৃত্যুর পর সেই আত্মাকে পুনরায় নতুন দেহ ধারণ করতে হয়? না কি সেই আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায়?

উত্তর ঃ কোন আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায় না। পরমাত্মা চিরকাল পরমাত্মা। আর আত্মা চিরকাল আত্মাই। পরম আত্মা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় অঙ্গজ্যোতিতে অনেক সময় আত্মা প্রায় মিশে যায়, তাকে সাজুয্য মুক্তি বলা হয়। কিন্তু তবুও কিছু কাল পর সেই স্বতন্ত্র আত্মা আবার নতুন দেহ ধারণ করে।

ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, শ্রীহরি স্মরণ করে যদি কেউ দেহত্যাগ করে, তবে সেই আত্মা ভগবদ্ধামে ফিরে যায়, সেখানে নিত্য চিদানন্দময় দেহ লাভ করে চিরকাল বাস করতে থাকে।

শুদ্ধনাম অর্থাৎ, অপরাধশূন্য হরিনাম জপ করলে জীব ভগবানের চিন্ময় লোকে উপনীত হয়ে নিত্যলীলায় যুক্ত হয়।

অপরাধযুক্ত হয়ে নাম জপ করলে জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য ইতর জন্মাদি লাভ হয়।

নাম আভাসে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়। হাজার বছর ধরে ধ্যান তপস্যা করে যে মুক্তি সম্ভব হয় কেবলমাত্র হরিনাম উচ্চারণ করলেই সেই মুক্তি হয়। এক্ষেত্রে কখনও বা উচ্চতর গ্রহলোকে দেহধারণ করতে হয়।

শুদ্ধ হরিনামে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। যার ফলে ভগবানের নিত্যলীলায় যুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ হয়।

প্রশ্ন ১২। আত্মার তো জন্ম-মৃত্যু হয় না। তা হলে আত্মার পুনর্জন্ম কি ভাবে হবে?

উত্তর ঃ আত্মা এই জড় জগতে নানা রকমের জড় দেহ ধারণ করে। সেই দেহের জন্ম মৃত্যু হয়। দেহ ত্যাগ করার পর জীবাত্মা আবার অন্য কোন জড় দেহ গ্রহণ করে। তাকেই বলে পুনর্জন্ম। দেহটারই জন্ম মৃত্যু হচ্ছে, আত্মার নয়।

প্রশ্ন ১৩। 'জীবের মৃত্যু নেই' একথা বলা হয়েছে গীতায়, আবার 'পুনর্জন্ম হয়'—এরকম কি কথা?

উত্তর ঃ জীব হচ্ছে আত্মা, নিত্য, তার মৃত্যু নেই। কিন্তু যে দেহ ধারণ করে জীব এই সংসারে রয়েছে, সেই দেহ অনিত্য, সেই দেহ ত্যাগ করলে আত্মা কর্ম ও বাসনা অনুসারে অন্য একটি দেহ ধারণ করে। তাকেই বলা হয় পুনর্জন্ম।

প্রশ্ন ১৪। আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ ও কর্মফল ভোগ বিষয়ে বাস্তব প্রমাণ কি?

উত্তর ঃ জাতিস্মর হলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'কার্য-অকার্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ' (গীতা ১৬/২৪)। 'যার জন্ম হয়েছে তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী' (গীতা ২/২৭)। 'মৃত্যুকালীন মানুষের ভাবনানুযায়ী পরবর্তী জীবন লাভ হয়'। (গীতা ৮/৫)

প্রশ্ন ১৫। আমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে আগামী দিনগুলিতে শুভাশুভ কি ঘটনা ঘটবে তা জানার উপায় কি?

উত্তর ঃ শুদ্ধ জ্যোতিষ-গণনাতে কিছুটা গতিবিধি জানা সম্ভব হয়। কিন্তু বর্তমানে সেরকম জ্যোতিষবিদ্‌ দুর্লভ।

প্রশ্ন ১৬। আমি কে—কৃষ্ণের দাস? না, অমর আত্মা?

উত্তর ঃ আপনি পরম-আত্মা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকণিকা অমর আত্মা। আপনার কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবায় যুক্ত হওয়া।

প্রশ্ন ১৭। গোলোক বৃন্দাবনে যাওয়ার পর জীবাত্মা ও পরমাত্মা কার কি গতি হয়?

উত্তর ঃ জীবাত্মা সচ্চিদানন্দময় একটি নিত্য শরীর লাভ করে, পরমাত্মা তো জীবের হৃদয়ে চিরকাল আছেই।

প্রশ্ন ১৮। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ (গীতা ১৫/১৫) বললেন, সবার হৃদয়ে তিনি সন্নিবিষ্ট রয়েছেন। তাই যদি হয় তবে কেন আমরা কু-কর্মে রত হই?

উত্তর ঃ পিতা তাঁর চঞ্চল শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বসে থাকলেও জ্বলন্ত প্রদীপের শিখাতে শিশুপুত্রটি আপন কর্মদোষে হাতটি পুড়িয়ে ফেলে, আর চিৎকার কান্না করতে থাকে। যদিও পিতা তাকে শান্তভাবে বসে থাকতে বলেন, তবুও শিশুটি দুষ্টুমি বা দুরন্তপনা করে। পিতা তখন শিশুটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেও দগ্ধ যাতনাটির জন্য শিশুটি কান্না করে।

তেমনি, পরমপিতা পরমাত্মারূপে জীবাত্মার সঙ্গে থাকলেও জীব স্বতন্ত্র ভাবেই সুকর্ম বা কুকর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তার ভালমন্দ পরিণতি ভোগ করে।

পিতা তাঁর শিশুপুত্রকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বসিয়ে রাখতে পারেন না। সেভাবে পুত্র বেশিক্ষণ থাকতেও পারে না। কারও যদি স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা না থাকে তা হলে নিছক পুতুলের মতোই অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু জীবাত্মাকে ভগবান একেবারে পুতুলের মতো করে দেননি। জীবাত্মার নিজস্ব ইচ্ছামতো আচরণ করার স্বাধীনতাও দিয়েছেন।

সুতরাং, স্বতন্ত্র ইচ্ছা অনুসারে জীব সুকর্ম বা কুকর্ম করতে পারে এবং সেই সমস্ত কর্মের ফলও সে লাভ করে। জীব তার চেতনা কিংবা কর্মপ্রবণতা অনুসারে ভগবানের কাছ থেকে স্মৃতি ও বিস্মৃতি লাভ করে থাকে। একথাও একই (গীতা ১৫/১৫) শ্লোকে বলা হয়েছে। আবার তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ একথাও জানিয়েছেন যে, মানুষ কিভাবে আচরণ করবে, তার কর্তব্য কর্ম কি হওয়া উচিত, সেই কথা বেদশাস্ত্রের মাধ্যমে তিনি প্রদান করেছেন এবং সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। বৈদিক জীবন যাপন করে অন্তিমে ভগবদ্ ধামে ফিরে যাওয়া মানুষের কর্তব্য।

প্রশ্ন ১৯। এই আত্মা চিন্ময়। দেহ হল জড়। মৃত্যুর পর দেহটির কোনও দাম নেই। তা হলে, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দেহত্যাগের পর তাঁর সমাধি মন্দির এত সুন্দর করার দরকার কি?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, শুদ্ধ বৈষ্ণবের শরীর জড় নয়। সম্পূর্ণরূপে গুরুদেবের নির্দেশ পালনের জন্য কায়মনোবাক্যে যিনি আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁর শরীর চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

> প্রভু কহে—"বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
> 'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
> দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
> সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

> সেই দেহ করেন তার চিদানন্দময়।
> অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪/১৯১-১৯৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন—

> *মর্ত্যো যথা ত্যক্তসমস্তকর্মা*
> *নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।*
> *তদামৃতত্ব প্রতিপদ্যমানো*
> *ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥*

অর্থাৎ, "যখন মরণশীল জীব সব রকমের জড় কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে কেবল আমার নির্দেশ অনুসারে ধর্ম করার জন্য আমার কাছে আত্মনিবেদন করে, তখন সে অবশ্যই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং আমার সঙ্গে প্রেম বিনিময়ের মাধ্যমে চিন্ময় আনন্দ উপভোগের যোগ্যতা লাভ করে।" (ভাঃ ১১/২৯/৩৪)

তাই কৃষ্ণশিক্ষা অনুশীলন করে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োজিত ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়াকলাপ চিন্ময়। সাধারণ জীবের মতো তাঁর দেহ জড় নয়। শুদ্ধ ভক্তের দেহ চিন্ময়। তিনি জগদ্গুরু, ভগবানের প্রতিনিধি।

শ্রীপদ্মপুরাণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

> *অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ গুরুষু নরমতিঃ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ..*
> *যস্য বা নারকী সঃ ॥*

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলা পাথর বুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানব-বুদ্ধি করে.....সে নারকী।"

ভক্তের মাধ্যমে জগতে ভগবান ভক্তিপ্রচার করেন। সুতরাং কৃষ্ণভক্তি প্রচারে যাঁরা আত্মনিবেদন করেন, তাঁরা ভগবানের সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই কথা জোর দিয়ে বলেছেন। যেমন চুম্বক তাঁর চৌম্বক শক্তি বিস্তার করে। লোহা সেই শক্তির সংস্পর্শে থাকলে সে-ও চৌম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন তা আর লোহা নয়। ঠিক তেমনিই, ভক্ত সর্বদা ভক্তিযুক্ত হয়ে ভগবানের মতো চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। সর্বতোভাবে যিনি ভগবদ্ভক্তিযুক্ত রয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে তাই ভক্তরা জড়ত্ব আরোপ করে না। অভক্তরা জড়বুদ্ধিতে তাঁকে জড় বলেই নির্দেশ করে।

তাই দেখা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নাম প্রচারক পরম ভাগবত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দেহ কোলে নিয়ে প্রেমানন্দে হরিনাম কীর্তন করলেন। যখন সেই অপ্রাকৃত দেহ নিয়ে সমুদ্রের জলে স্নান করানো হল, তখন মহাপ্রভু ভক্তদের সামনে ঘোষণা করলেন—"আজ থেকে এই সমুদ্র মহাতীর্থে পরিণত হল।" (চৈঃ চঃ অঃ ১১/৬৪) অতএব, ভক্তের শরীরের মাহাত্ম্য কী, তা এই কথায় অনুমান করা যায়। তারপর মহাপ্রভুর নির্দেশে হরিদাসের সেই অপ্রাকৃত পাদধৌত জল ভক্তগণ পান করলেন এবং সেই দেহ সমাধিস্থ করা হল।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ হচ্ছেন কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে বলিষ্ঠ একনিষ্ঠ আদর্শ প্রচারক। তাঁর অনর্গল সাধনায় সমগ্র পৃথিবীতে হরিনামের জোয়ার বয়ে চলেছে। তিনি জগদ্গুরু। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুযোগ্য প্রতিনিধি। তিনি বৈদিক সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক। তিনি গুরুপরম্পরার ধারায় আশ্রিত পরম বৈষ্ণব। এই পৃথিবীর নানা ধরনের বিঘ্ন নানা রকমের উৎপাত থাকা সত্ত্বেও কায়মনোবাক্যে অনর্গল কৃষ্ণোন্মুখ হয়ে জগতে কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণনাম প্রচার করেছেন। কি দিন কি রাত প্রতি মুহূর্তে তিনি কৃষ্ণভাবনাময় রয়েছেন। মানুষকে হাতে কলমে শিখিয়েছেন—কিভাবে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করতে হয়। শিখিয়েছেন—কিভাবে জন্ম-জন্মান্তরেও ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত থাকতে হয়।

এই থেকে বুঝতে একেবারেই অসুবিধা হবে না যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। আমাদের কাছে তিনি অপ্রকটলীলা করলেও, ভক্তের হৃদয় থেকে কখনই তিনি বিদায় গ্রহণ করেননি, এবং চিরকাল রয়েছেন।

সেই জগদ্গুরু কারও কাছে নিজেকে প্রচার করেননি। তাই তাঁকে অনেকে জানে না। সনাতন ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েও অধিকাংশ মানুষ তাদের দুর্ভাগ্যের ফলে সেই বৈদিক জীবনধারার ধারক ও বাহককে চিনতেই পারছে না।

সেই জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ভক্তমণ্ডলী সমগ্র পৃথিবীর মানব-জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছেন বিশ্ববরেণ্য প্রভুপাদের দিব্য কার্যকলাপ জানতে এবং নিজের জীবন ও সভ্যতাকে বুঝে নিতে। সেই সনাতন বৈদিক ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের নিদর্শন স্বরূপ জগদ্গুরুর উজ্জ্বল স্মৃতিসৌধ এই পুষ্পসমাধি মন্দির বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক শুভ চেতনাকে জাগিয়ে তুলবে এবং তা কখনই জড় সভ্যতাগর্বী মানুষের অজস্র জড় বিলাস বৈভব অট্টালিকার মতো কোন কিছুই নয়—এই ধারণাটাও পরিষ্কার ফুটে উঠবে।

প্রশ্ন ২০। আগে লোকসংখ্যা যা ছিল, তুলনায় এখন প্রচুর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবিনশ্বর আত্মা তো একই থাকার কথা?

উত্তর ঃ পূর্ব পূর্ব যুগের তুলনায় কলিযুগে মানুষের সংখ্যা অনেক অনেক কম। দেখা যায়, পোকামাকড়ের সংখ্যা বেশি। অসংখ্য অগণিত জীবাত্মা রয়েছে, তারা মাত্র বিভিন্ন রকমের দেহ ধারণ করছে। যখন আত্মাগুলো বেশি সংখ্যক মশা-শরীর ধারণ করছে, তখন মশার বৃদ্ধি হল।—এইভাবে দেহ সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আত্মা সংখ্যার জন্ম-মৃত্যু নেই। তাই আত্মার সংখ্যা একই আছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক ব্রহ্মাণ্ডের জীব সংখ্যা হ্রাস হলে অন্য কোনও ব্রহ্মাণ্ডে বৃদ্ধি পেতে পারে। এক গ্রহলোক থেকে জীব অন্য লোকে চলে যায়। অন্য লোকের জীব এই পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করছে। এই পৃথিবীর বহু জীব অন্য লোকে চলে গেছে। এই সমস্ত ঘটে জীবের আন্তরিক কর্ম বাসনা অনুসারে।

প্রশ্ন ২১। আত্মাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। এই কথাটির অর্থ কি?

উত্তর ঃ দেহাত্মবুদ্ধি অর্থাৎ, দেহকে আত্মা বলে মনে করাটাই সমস্ত দুঃখকষ্টের কারণ। জীবাত্মা জড় জগতের সংস্পর্শে এসে জড় দেহ ধারণ করে কষ্ট পায়। কিন্তু স্বরূপে সে আনন্দময়। তাই ভগবদ্ বিধিনিষেধ পালনপূর্বক কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে জীবন যাপন করলে আত্মতুষ্টি লাভ হয়। পরিণামে আনন্দময় ভগবৎ-লোকে গতি লাভ হয়। অন্যথায় ভবদশা লাভ করে অনাদিকাল ধরে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে।

প্রশ্ন ২২। 'আমি' কে এবং শ্রীকৃষ্ণ কে? আমার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যদি কোনও সম্পর্ক থাকে, সেটি কিরূপ?

উত্তর ঃ 'আমি' হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আত্মা যা পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য অংশ। এই আত্মাটি জড় দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে দেহটি ক্রিয়াশীল বা সচেতন থাকে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান পরম নিয়ন্তা। জীব ভগবানের নিত্য অংশ হওয়ার ফলে উভয়ের মধ্যে নিত্য সম্পর্ক অবশ্যই বিদ্যমান। সেই সম্পর্কটি হল শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নিত্য প্রভু, আর আপনি হচ্ছেন তাঁর নিত্য দাস। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। যেহেতু জীব জড় বদ্ধ জীবনে পতিত হওয়ার ফলে অনিত্য বস্তুর সঙ্গে অনিত্য সম্পর্ক নিয়েই মত্ত থাকে, তাই সেই নিত্য সম্পর্ক সহজেই ভুলে যায়। মূর্খ মানুষ মনে করে 'আমি এই দেহ,' মা-বাবা ভাই-বোন স্ত্রী-পুত্র এরা সব 'আমার'। কিন্তু যখন দেহের মৃত্যু হয়, তার পর সেই দৈহিক সম্পর্কের ইতি ঘটে। এই জড় সম্পর্কটি হচ্ছে অনিত্য, কিন্তু আমাদের নিত্য সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে হবে।

প্রশ্ন ২৩। ভগবানের কাছে কারা সবচেয়ে বেশি প্রিয়? পুরুষ না প্রকৃতি? কার চোখের জল সবচেয়ে বেশী অভিশপ্ত করুণ ভয়াবহ ও শক্তিশালী?

উত্তর ঃ ভগবানই একমাত্র পুরুষ, আর সবই প্রকৃতি। জীব হচ্ছে ভগবানের একটি শক্তি। ভগবানের তিন শক্তি—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গা শক্তির সাহায্যে শক্তিমান ভগবান চিজ্জগৎ পরিচালনা করেন, বহিরঙ্গা শক্তির সাহায্যে জড় ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করেন। আর তটস্থা শক্তি জীব ভগবানের দেওয়া স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির বলে হয় অন্তরঙ্গার নতুবা বহিরঙ্গার দাসত্ব গ্রহণ করে চলে। সব শক্তিই ভগবানের প্রিয়।

এই জগতে পুরুষ ব্যক্তি, এবং প্রকৃতি বলতে অনেক সময় নারীকে বোঝায়। কিন্তু এই জগতের নারী পুরুষের পার্থক্য কেবল দেহগত। কে কোন্ দেহ নিয়ে আছে—সেটি ভগবানের কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। যে যত বেশি পরিমাণে ভগবদ্-আসক্ত, ভগবানের কাছে তিনি ততই প্রিয় হন। ভগবানের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে তাঁর ভক্ত। সেই ভক্ত পুরুষ কিংবা স্ত্রী—এই নিয়ে কোনও বিচার নেই। অতএব কারও চোখের জলই ভগবানের কাছে ভয়াবহ নয়।

২০

ভক্তি ও ভণ্ডামি

প্রশ্ন ১। ভক্তি কাকে বলে?

উত্তর ঃ শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

"সর্ব উপাধিমুক্ত অর্থাৎ, কৃষ্ণসুখকামনা ব্যতীত ইহজীবনের ও পরজীবনের সমস্ত প্রকার আত্মেন্দ্রিয় সুখ কামনা বর্জন করে, কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জন্যে ইন্দ্রিয়সমূহ দিয়ে ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাকেই ভক্তি বলা হয়।"

প্রশ্ন ২। রাসলীলার নামে মেয়ে-পুরুষেরা যে নৃত্যকীর্তন করে তা যথার্থ কি না?

উত্তর ঃ রাসলীলা কখনই অনুকরণীয় নয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা, মহাদেব শিব, স্বর্গরাজ ইন্দ্র, সমস্ত দেব-দেবী, গন্ধর্ব, অপ্সরা—কারও পক্ষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধারাণীর রাসলীলা অনুকরণ-যোগ্যই নয়। তবে সেই বিষয়ে মানুষের পক্ষে আর কি কথা? শ্রীব্রহ্মা ষাট হাজার বছর তপস্যা করেও ভগবদহ্লাদিনী শক্তি গোপিকাগণের চরণের ধূলিকণা মাত্র লাভ করবার আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করতে সক্ষম নি। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় প্রবেশ করার সৌভাগ্য পর্যন্ত লাভ করতে পারেননি, তাই তিনি যমুনার অপর পারে কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যানেই উপবিষ্ট হয়ে থাকলেন। মহাদেব শিব রাসলীলা দর্শনে গিয়েই বঞ্চিত হয়েছিলেন। অতএব যেখানে এই রকম অবস্থা ঘটে, সেই ক্ষেত্রে কি করে মল-মূত্র-কফ-পিত্ত বিশিষ্ট আধিব্যাধিযুক্ত, ধর্মনিষ্ঠাহীন, ব্রতহীন, কামুক লম্পট দুরাচারী, মদ্যমাংস প্রিয়, নেশাসেবী, জড়বুদ্ধিসর্বস্ব এঁচড়ে পাকাদের দল নিজেরাই রাধাকৃষ্ণ সেজে রাসলীলা করতে পারে?

উড়িষ্যাতে বিষকিষণ নামে এক বিরাট যোগী ছিল, সে কতকগুলি অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করেছিল। সে নিজেকেই ভগবান বলে জাহির করেছিল। বহু নরনারী তাকে পূজা করতে লাগল। সে একদিন জঙ্গলে রাসলীলা করতে চেয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার তাকে জেলবন্দী করে। সে বেচারা নানা ভেল্কি দেখিয়েও কার্যকরী হল না। শেষে জেলেই মারা পড়ল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই ভণ্ডকে আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বিষকিষণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে যোগশক্তিতে অনর্থক ভয় দেখিয়েছিল।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলেছেন—রাসলীলা কখনই কারও অনুকরণীয় নয়। অত্যন্ত উন্নত স্তরের ভক্তদের কাছে রাসলীলাকথা পরম আস্বাদ্য হতে পারে এবং যোগ্য ভগবদ্ভক্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের এই সকল লীলা কথা শ্রবণ করলে আমাদের হৃদয় শুদ্ধ ও পবিত্র হয়; কিন্তু অভক্তদের কাছে কখনও রাসলীলাদি

বিষয় শ্রবণ করা একেবারেই নিষিদ্ধ, যেহেতু হিতে বিপরীত হয়। যেমন মহাদেবের ক্রিয়াকলাপ কেউ যদি অনুকরণ করতে যায়, তবে সে বিপন্নই হবে। মহাদেবের এমন যোগ্যতা রয়েছে যিনি অত্যন্ত তীব্র কালকূট পান করেও স্থির থাকতে পারেন। কিন্তু তার এককণা অতি নগণ্য গরল পান করে মানুষ মৃত্যুমুখেই পতিত হয়। কালকূটের মারাত্মক প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকলে শিবের শরণাপন্ন হয়েছিল। তেমনই কৃষ্ণভক্ত সর্বদা এই দুঃখময় জড় জগতের কলুষিত প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। এইভাবে ভক্ত ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে পারেন। কিন্তু নর-নারীর কুসঙ্গ প্রভাবে হৃদয় কলুষিত হলে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের কৃপা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে হয়। ভক্তিবিরুদ্ধ রাধাকৃষ্ণ-লীলানুকরণের ফলে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীচরণে অপরাধই হয়। ফলে, ভক্তি-জগতে যাওয়ার পথ তার জন্য বন্ধই থাকে।

প্রশ্ন ৩। ভক্তিজীবন গ্রহণ করাই যদি মনুষ্য-জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে এই যুগের অধিকাংশ মানুষ কেন ভক্ত হতে চায় না?

উত্তর ঃ কলিযুগের মানুষেরা সহজে ভক্তিজীবন গ্রহণ করতে চায় না। কারণ তারা পাপাচারী, ভাগ্যহীন, দুষ্কৃতকারী, ক্ষীণবুদ্ধি, কলহপ্রিয়। কলিবদ্ধ জীবের এই সকল দোষ শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে।

যাঁরা ধার্মিক, যাঁরা পুণ্যকর্ম করে নিষ্পাপ হয়েছেন, তাঁরাই ভগবানের ভজনা করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।" (গীতা ৭/৮)

ভাগ্যবান না হলে কেউ ভক্তিজীবনে উন্নীত হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

"জীব তার কর্ম অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। কখনও সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হয় এবং কখনও সে নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হয়। এইভাবে ভ্রমণরত অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কোন একটি জীব তার অসীম সৌভাগ্যের ফলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, সদ্গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে। এইভাবে গুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের কৃপার প্রভাবে জীব ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হয়।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৫১)

দুষ্কৃতকারীরা ভক্ত হয় না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিকভাবাপন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।" (গীতা ৭/১৫)

এখানে 'মূঢ়' বলতে তাদের বলা হয়েছে যারা উদরপূর্তি ও যৌনতর্পণের জন্যই দিনরাত গাধার মতো পরিশ্রম করছে। এছাড়া তাদের আর কোনও বুদ্ধি নেই। 'নরাধম' বলতে বোঝায় নরদেহ লাভ করেও অধম বা নীচবৃত্তিতে অভ্যস্ত। তারা এমন কি সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গণ্যমান্য হলেও ধর্মীয় বিধিনিষেধ দ্বারা পরিচালিত হয় না। তারা হিংস্র প্রাণীর মতো অন্য প্রাণীদের হত্যা করে তার রক্ত মাংস হাড় ভক্ষণ করে, শেয়াল শকুনির মতো মৃত দেহ খাওয়ার জন্য তারা লালায়িত হয়। কুকুরের মতো তারা প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে রাখে। 'মায়য়াপহৃতজ্ঞান' বলতে বোঝায় মায়ার প্রভাবে যাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। তারা বড় বড় দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, নেতা হলেও মায়াশক্তি দ্বারা বিপথগামী হওয়ার ফলে তারা পরমেশ্বর ভগবানকে অবজ্ঞা করে থাকে। চতুর্থ নম্বর দুষ্কৃতকারী হচ্ছে 'অসুরভাবাপন্ন' ব্যক্তি। তারা নির্লজ্জভাবে নাস্তিক। তারা তর্কযুক্তির বড়াই করে বসে। কিন্তু তাদের সমস্ত কথা যুক্তিভিত্তিহীন হলেও তারা জোর দিয়ে ভক্ত ও ভগবানের নিন্দামন্দ করতে থাকে। এই চার ধরনের দুষ্কৃতকারীরা ভক্তিজীবন গ্রহণ করে না।

সুকৃতিবান ব্যক্তিই ভক্ত হয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—*ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনঃ* (গীতা ৭/১৬) "পুণ্যকর্মা বা সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা আমার ভজন করে।"

ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভক্তিজীবন গ্রহণ করে না। একমাত্র সুমেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হন। *যজন্তি হি সুমেধসঃ* (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৫/৩২)।

জাগতিক দ্বন্দ্ব ও মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা ভক্ত হয় না। *দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতা* (গীতা ৭/২৮)—"তাঁরাই দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভজন করেন যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন।"

প্রশ্ন ৪। স্ত্রী-সঙ্গীরা যদি ভগবানের ভজনা করে, তবে তার গতি কী?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—*অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।* 'অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন', তাহলে *সাধুরেব স মন্তব্যঃ* 'তাঁকেও সাধু বলে মনে করা উচিত'। যেহেতু *সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ* 'পূর্ণরূপে তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত হয়েছেন'। (গীতা ৯/৩০)

কিন্তু হাতীস্নানের মতো যদি ভালমতো স্নান করে শৌচ হওয়ার পর আবার শরীরে ধুলোবালি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তবে স্নানের কোনও মূল্য থাকে না। তখন যথার্থ ভক্তিমার্গে নেই বলে বুঝতে হবে।

যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের ঐকান্তিক ভজনা করেন, তাঁরা স্ত্রীজনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন না। কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করতে হলে কামবাসনা-রোগ থেকে সংযত থাকতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা ।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতম্ ॥

অর্থাৎ, "যাঁর মন স্ত্রীজন কর্তৃক অপহৃত হয়েছে, তার বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, শাস্ত্র শ্রবণ, নির্জন ভজন—সমস্তই নিষ্ফল।' (ভাঃ ১১/১৬/১২) অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য অভিলাষের আশ্রয় স্বরূপা স্ত্রীসঙ্গপিপাসা যে কোনও ব্যক্তিকে পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা থেকে বিমুখ করে ভজন-বিরোধী পথে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন ৫। আমাদের চিত্তে কবে ভগবদ্ভক্তির উদয় হবে?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

'যতদিন পর্যন্ত মায়াবদ্ধ জীব কোনও মহান্ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের চরণের ধূলিকণায় নিজেকে অভিষিক্ত না করে, ততদিন পর্যন্ত তার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে মতি হয় না।' শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র বলা হয়েছে, 'হে ভগবন্! কোনও অজানা সুকৃতির বলে জীব যখন অনন্ত জন্মমৃত্যু চক্রের শেষভাগে উপনীত হয়, তখনই দৈবাৎ সে কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ করে এবং সেইরূপ পারমার্থিক হিতকর সঙ্গের বলে জীবের পরম কল্যাণকর শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ঐকান্তিক ভক্তি উৎপন্ন হয়।' (ভাঃ ১০/৫১/৫৩)

অতএব যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সেবা করবেন। কারণ ভক্তই একমাত্র পারমার্থিক জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা জাগতিক দুঃখময় বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন। আবার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—'গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।' অর্থাৎ, গুরু এবং শ্রীকৃষ্ণ—উভয়ের সম্মিলিত কৃপাবলেই একজন ব্যক্তি ভক্তির বীজ লাভ করেন। যথাযথভাবে গুরুর আদেশ পালন করে সেবার মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলে শ্রীকৃষ্ণও সন্তুষ্ট হন। তখন ভক্তিলতা বীজ ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়ে ফুলে ফলে ভরপুর হয়ে ওঠে। তখনই ভক্ত সেই প্রেমফল আস্বাদন করতে পারেন।

প্রশ্ন ৬। মহাপ্রভু ভগবান ভক্তবৃন্দের স্বভাব তৃণসম হতে উপদেশ দিয়েছেন। অথচ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে, "কেউ যখন আমাকে ভগবান বলে জেনে নিজেকে হীন বলে মনে করে, তখন আমি তার প্রেমে বশীভূত হই না।" এরূপ বলার অর্থ কি?

উত্তর ঃ ভগবান হচ্ছেন ষড় ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাঁর কোনও কিছুর অভাব নেই। তিনি অনন্ত অগণিত বিশ্বের হর্তা কর্তা বিধাতা। তবে এই জ্ঞানে ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা হয় না। কারণ যিনি পরিপূর্ণভাবেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাঁর কাছে আমি কতই হীন ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীব মাত্র হয়ে তাঁর কীই বা সেবা করব? আর তাঁকে কীই বা ভালবাসব? তাঁর অনন্ত বৈভব—যেমন বিশ্বরূপ দর্শন কালে শ্রীঅর্জুন দেখেছিলেন তাঁর অসংখ্য মুখ

বাহু, পদ, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বিশাল মুখগহ্বরের মধ্যে অগণিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রলয় হেতু প্রবেশ করছে। পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বরের সেই মহাকাল রূপ সংবরণ করতে বললেন ভয়াবিষ্ট অর্জুন। কারণ কারও সাধ্য নেই সেই রূপ দর্শন করে পরমেশ্বরের সঙ্গে স্নেহ প্রেম প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে তুলবে।

কিন্তু সেই পরমেশ্বর যখন তাঁর ভক্তদের কাছে মনুষ্যরূপী অতি মনোহারী শ্যামসুন্দর মুরলীধর রূপে, কিংবা ননী চোরা শিশুরূপে, গোপবালকরূপে আবির্ভূত হন, তখন তাঁর সঙ্গে ভক্তের পরম আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। সখা, পুত্র, বন্ধু, পতি, গুরু নানারূপে স্নেহ প্রেম প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সেই অবস্থায় ভক্ত ভগবানকে ভগবান বলে মনে করেন না। তিনি তখন মনে করেন শ্রীকৃষ্ণের অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে, তাই তাঁর সেবা-যত্ন করতে প্রয়াস পান।

ভগবানও পরের শ্লোকে বলেছেন—

আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে।

(চৈ. চ. আ. ৪/১৯)

আপন আত্মীয়, বন্ধু, সখা, পিতা, মাতা, পুত্র, পতি—যিনি যে-ভাবে কৃষ্ণকে একনিষ্ঠ ভজনা করেন ভগবান তাঁর কাছে সেই রূপেই আবির্ভূত হন। যেমন বৃন্দাবনে দূরের কোনও জঙ্গলে শেয়াল ডাকলে স্নেহময়ী মাতা যশোমতী শিশু কৃষ্ণকে সর্বদা কাছে টেনে নেন। শিশু কৃষ্ণও শেয়ালের ভয়ে মাকে আঁকড়ে ধরতেন। মা যশোদা পুত্র কৃষ্ণকে হীন দুর্বল শিশু মনে করে তাঁর তত্ত্বাবধান করতেন।

কিন্তু প্রশ্নানুসারে নিজেকে তৃণসম হীন মনে করতে হবে, যা হল মহাপ্রভুর নির্দেশ। যাঁর ভগবানের দর্শন লাভের মতো সৌভাগ্য হল না, ভগবানের সেবা করার মতো সৌভাগ্য হল না, তিনি যদি সেই জন্য অনুশোচনাই না করে, কেবল অহংকারবশত মনে করেন—"আমি যখন ভগবানের নাম করছি, তখন আমি এক বিরাট ভক্ত, অন্যের তুলনায় আমি শুদ্ধ ভক্ত"—তা হলে বুঝতে হবে সে অভক্ত।

তাই আমাদের তৃণসম নিজেকে মনে করে ভগবদ্ভক্তদের চরণে আশ্রয় নিতে হবে। অহমিকা ও দম্ভহীন ব্যক্তি ভক্তের চরণের ধূলিতে শুদ্ধ হলে তবে ভগবানের কৃপাপাত্র হওয়ার যোগ্য বলে শাস্ত্রে নির্দেশ রয়েছে।

প্রশ্ন ৭। কৃষ্ণবহির্মুখ বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ, কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল ব্যক্তিদের কৃষ্ণবহির্মুখ বলা হয়। তারা কৃষ্ণভক্ত নয়। এই রকম বহির্মুখ জন ছয় প্রকারের বিদ্যমান। যেমন—

১) নীতিহীন ও ঈশ্বর বিশ্বাসশূন্য ব্যক্তি—যারা কোনও নীতি মানে না, ঈশ্বর মানে না, পাপকর্মপরায়ণ ও স্বেচ্ছাচারী।

২) নীতিজ্ঞান থাকলেও ঈশ্বর বিশ্বাসহীন ব্যক্তি—যারা নীতি মেনে চলে, কিন্তু সুযোগ-সুবিধা পেলেই স্বার্থ চরিতার্থ করতে নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে কর্ম করে। কারণ তারা পরমনিয়ন্তা থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র স্বাধীন বলে মনে করে।

৩) ঈশ্বর নীতির অধীন এরূপ মনোভাবী ব্যক্তি—যারা মনে করে, ঈশ্বর থাকতে পারেন, নাও থাকতে পারেন; ঈশ্বরকে প্রণাম বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেও পারি; সৎ চরিত্রটাই বড় কথা; ঈশ্বর বিশ্বাস পরিত্যাগ করলেও ক্ষতি নেই। এরূপ মনোভাব নিয়ে তারা চলে। এমন কি তারা সন্ধ্যা বন্দনাদিও করে, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ সম্পর্কে উদাসীন।

৪) মিথ্যাচারী—এদের দেখতে সাধুর মতো, বৈষ্ণবের মতো; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সব রকমের পাপকর্ম করে চলে।

৫) নির্বিশেষবাদী—যারা বলে, ঈশ্বর নিরাকার। কখনও বা তারা বলে, জীবই ঈশ্বর, সকলেই ঈশ্বর। এই ধরনের ব্যক্তি নির্বিশেষ ব্রহ্মে নিজেকে বিলীন করে দিতে চায়।

৬) বহু-ঈশ্বরবাদী—যারা সমস্ত দেব-দেবী, ভূত-প্রেত, মানুষ-গরু শূকর-ভেড়া গাছপালা সবাইকেই ঈশ্বর বলে মনে করে। কিন্তু সবার ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—তা মানে না। এরা সবাই কৃষ্ণবহির্মুখ অভক্ত হিসাবেই গণ্য।

প্রশ্ন ৮। বহির্মুখ জীব বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ যারা জড় দেহ, জড় জগৎ, জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, যারা কৃষ্ণভক্তির আনন্দ আস্বাদন করতে আগ্রহী নয়—তাদের বলা হয় বহির্মুখ জীব।

প্রশ্ন ৯। সহজিয়া কাদের বলে?

উত্তর ঃ কলিযুগে হরিনাম করাই যুগধর্ম। যারা হরিনাম করে, অথচ কলির চার রকমের পাপকর্ম—আমিষ, জুয়া, নেশাভাং, অবৈধ যৌনতা তারা ছাড়তে চায় না, তারা মনে করে, বিড়ি খাওয়া কিংবা মাছ খাওয়া বন্ধ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তাই সহজভাবে—অর্থাৎ, এগুলি থাকবে আর হরিনামও করা যাবে—এই মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সহজিয়া বলে। পারমার্থিক পথে সহজিয়া ভাব বিপজ্জনক।

প্রশ্ন ১০। গুরু চিনবার উপায় কি? কোন্ গুরুর থেকে দীক্ষা নেওয়া উচিত?

উত্তর ঃ 'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।' গুরুদেব কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথা আলোচনা করেন। তিনি সর্বদা কৃষ্ণসেবা পরায়ণ। কৃষ্ণনাম পরায়ণ। তিনি কৃষ্ণভক্তিবিরোধী আচার করেন না। যেমন, আমিষ আহার, বিড়ি-তামাক-সিগারেট-গাঁজা ব্যবহার, তাস-পাশা-জুয়া খেলা, যোষিৎ সঙ্গ বাসনা—এই সমস্ত কদাচার কখনই বৈষ্ণবের মধ্যে দেখা যায় না। সেই রকম গুরুর কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ১১। 'অষ্টসাত্ত্বিক বিকার' কথাটির অর্থ কি?

উত্তর ঃ শুদ্ধ সত্ত্বগুণ বা দিব্য আনন্দের প্রভাবে মানসিক অবস্থার রূপান্তর হয়। যখন কেউ ভগবৎ-প্রেমে অত্যন্ত আপ্লুত হন, তখন তাঁর শরীরে স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক,

স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, আনন্দজনিত ক্রন্দন এবং সমাধি—এই আটটি দিব্য আনন্দময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই অবস্থাকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বলা হয়। রজ, তম কিংবা সত্ত্বগুণে ভাবিত কলুষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এইরূপ অবস্থা কখনই দৃষ্ট হয় না। শুদ্ধ সত্ত্ব স্তরে উপনীত হয়েছেন এমন অত্যন্ত ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তির শরীরে কখনও কখনও এইরূপ অষ্টসাত্ত্বিক ভাব দেখা যায়। একমাত্র শুদ্ধ ভক্তগণ সেই ভাব উপলব্ধি করতে পারেন।

কিন্তু বর্তমান কলিযুগের কলুষিত ব্যক্তিরা ভক্তির নামে ভণ্ডামি করে জনগণের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের আশায় কৃত্রিমভাবে অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকার দেখাতে চেষ্টা করে। পরিণামে তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও হেয় হয়ে পড়ে। শাস্ত্রে সেই প্রমাণও রয়েছে। সেই ভণ্ডদের সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে।

প্রশ্ন ১২। ক্রোধভাবাপন্ন হয়ে কি যথার্থ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করা যায়?

উত্তর ঃ সাধারণ ক্ষেত্রে কৃষ্ণভক্ত অক্রোধ। তাঁর মধ্যে উত্তেজনা থাকে না। ক্রোধের বশে ভক্তিপথ থেকে বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেই ক্রোধও ভগবৎ-সেবার অনুকূল কার্য করতে পারে।

যেমন, সীতাদেবীকে রাক্ষসরাজ রাবণের কাছ থেকে মুক্ত করে আনবার জন্য হনুমান লংকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু বহু রাক্ষস হনুমানের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করতে শুরু করে। তাঁর হাত পা মন্ত্রপূত রজ্জুতে বেঁধে নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে থাকে। তারপর একটা কাপড়ে তেল লাগিয়ে কাপড়টা হনুমানের লেজে জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন হনুমান অগত্যা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ নিয়ে সমগ্র লংকাপুরী ক্রোধের সঙ্গে লেজের আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করতে শুরু করেন। হনুমানজীর এরূপ ক্রোধ ভগবদ্ভক্তির অনুকূল।

এ ছাড়া, কোন ভক্ত বা ভগবানের অবমাননা করা হলে সেই ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয়। পরম বৈষ্ণব শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর গানে উল্লেখ করেছেন—'কাম' কৃষ্ণ-কর্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্ত-দ্বেষী-জনে, 'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা। (ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন) অর্থাৎ, আমাদের উচিত কামনা-বাসনাকে কৃষ্ণকর্মে অর্পণ করা, ক্রোধকে ভক্ত-বিদ্বেষীদের ক্ষেত্রে প্রকাশ করা এবং লোভ থাকা উচিত সাধুসঙ্গে হরিকথার প্রতি।

প্রশ্ন ১৩। বৈরাগ্য সাধনে কেবল ঈশ্বর পাওয়া যায়। একথা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তবে কি ঘর-বাড়ি জাগতিক বিষয় ত্যাগ করতে হবে?

উত্তর ঃ না, কেবল বৈরাগী হয়ে গেলে কিছুই পাওয়া যাবে না। পরমেশ্বরের প্রতি যদি আকর্ষণ না থাকে, তবে সেরূপ বৈরাগীর কোন অর্থ হয় না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*আনুকূল্যস্য সংকল্প প্রতিকূল্যস্য বিবর্জনম্‌।* (চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৯৭) কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয়গুলি গ্রহণ করতে হবে এবং কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল বিষয়গুলি ত্যাগ করতে হবে।

বৈরাগ্য দুই প্রকার। ফল্গু আর যুক্ত। 'ফল্গু' বলতে লোকদেখানো বৈরাগ্য। কিন্তু অন্তরে থাকে ভোগ আকাঙ্ক্ষা। 'যুক্ত' বলতে বাহ্যত যথাযোগ্য ভোগে যুক্ত এবং বিষয়

গ্রহণ করেও বিষয়সমূহ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করেন। কিন্তু অন্তরে বিষয়ে অনাসক্ত এবং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত আসক্তিযুক্ত। সেই যুক্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। ত্যাগ ও ভোগ দুইই পরিত্যাজ্য। *'বিষয়-মুমুক্ষু' 'ভোগের বুভুক্ষু' দুয়ে ত্যজ মন, দুই—'অবৈষ্ণব' (বৈষ্ণব কে?)* বিষয়-আশয় ফেলে দেওয়া কিংবা ভোগ করা—দুই-ই অভক্তির লক্ষণ।

প্রশ্ন ১৪। কি করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উল্লেখ করেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

"তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত রাখ, আমাকে প্রণতি নিবেদন কর এবং আমার পূজা কর। সম্পূর্ণরূপে আমাকে আশ্রয় করে তুমি অবশ্যই আমাকে লাভ করবে।" (গীতা ৯/৩৪)

প্রশ্ন ১৫। ভক্তের লক্ষণ কি?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা আছে যে, পরম ভক্ত শ্রীউদ্ধব যখন ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলেছিলেন—

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্‌ ।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্‌ ।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামবিবর্জনম্‌ ॥

(ভাঃ ১১/১৯/২১-২২)

অর্থাৎ, ১। "আদরের সঙ্গে আমার পরিচর্যা করা,
২। সর্বাঙ্গের দ্বারা আমার অভিনন্দন করা,
৩। বিশেষভাবে আমার ভক্তের পূজা করা,
৪। সমস্ত জীবকে আমার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা,
৫। দেহের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে আমার সেবা করা,
৬। বাক্যের দ্বারা আমার মহিমা কীর্তন করা,
৭। মনকে আমাতে অর্পণ করা, এবং
৮। সব রকম জড় ভোগবাসনা পরিত্যাগ করা।"

এইগুলি ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ।

প্রশ্ন ১৬। যিনি কৃষ্ণভক্ত হয়ে বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত আছেন, তিনি কেমন কৃষ্ণভক্ত?

উত্তর ঃ অপকর্ম বলতে শাস্ত্রবিরোধী ভক্তিবিরোধী কর্মকে বোঝায়। যেমন, নিজের ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করার জন্য লোক-দেখানো ভক্তি করা। আমিষ আহার, নেশা

ভাং, তাস জুয়া, অবৈধ যৌন সঙ্গে লিপ্ত হওয়া—এই সমস্ত নিষিদ্ধ কর্ম। এই সমস্ত নিষিদ্ধ কর্মে যুক্ত কলি কলুষিত ব্যক্তিরা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের অযোগ্য। সকাম ভক্তরা অন্যাভিলাষিতা শূন্য না হলেও এই সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চলেন।

প্রশ্ন ১৭। সদ্‌গুরু কিভাবে চেনা যায়?

উত্তর ঃ সদ্‌গুরু হচ্ছেন ভগবদ্‌প্রতিনিধি পরম কৃষ্ণভক্ত। তিনি কৃষ্ণভক্তি বিরুদ্ধ কথা বলেন না। তিনি কৃষ্ণনাম কৃষ্ণমহিমা কীর্তন করেন তিনি জগজ্জীবকে উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণকথা বিশ্বব্যাপী প্রচার করেন। তিনি কৃষ্ণভক্তি বিরুদ্ধ আচরণ করেন না। তিনি কলির চতুর্বিধ আড্ডায় যুক্ত হন না অর্থাৎ, মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি আহার, চা পান বিড়ি সিগারেট তামাক ইত্যাদি সেবন, তাসপাশা জুয়া দাবা খেলা, অবৈধ মেলামেশা করেন না। তিনি মহাপ্রভু অনুমোদিত চার সম্প্রদায়ের কোনও একটির অন্তর্ভুক্ত। একজন সদ্‌গুরু তাঁর পূর্বতন আচার্যের অত্যন্ত প্রিয়জন এবং তাই তিনি আচার্যের নির্দেশ পালন করে চলেন।

প্রশ্ন ১৮। আমিষ খেয়ে কৃষ্ণনাম জপ কীর্তন, কৃষ্ণ পূজা, তুলসী মালা ও তিলক ধারণ, গীতা ভাগবত পাঠ করলে, তাকে কি বৈষ্ণব বলা যায় না?

উত্তর ঃ আমিষ খেলে পাপ সঞ্চিত হয়। পাপ করতে থাকব আর নাম জপ করে শুদ্ধ হতে চাইব—এই মনোভাবে শ্রীনামের প্রতি অপরাধ হয়। শ্রীপদ্মপুরাণে যে দশবিধ নাম-অপরাধের কথা উল্লেখ রয়েছে, তার মধ্যে এটি হল সপ্তম অপরাধ। কলির চতুর্বিধ আড্ডাখানার মধ্যে একটি হল আমিষ ভক্ষণ। তাই আমিষ আহারে চিত্ত কলুষিত হয়। কলুষিত চিত্তে কখনই কৃষ্ণপূজা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নীত হতে হলে আমাদের সম্যক্‌ভাবে পবিত্র হতে হয়। *সত্ত্ব-সংশুদ্ধিঃ* (গীতা ১৬/১)। তুলসীমালা এবং তিলক ধারণ করা ভাল, কিন্তু আমিষ ভক্ষণ দোষে মালা-তিলকের মর্যাদা লঙ্ঘন হয়। এরূপ মর্যাদা লঙ্ঘনকারীরা শাস্ত্রমতে অবৈষ্ণবের শ্রেণীভুক্ত। বৈষ্ণবভাবাপন্ন না হলে শাস্ত্রকথা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অবৈষ্ণবের মুখ থেকে *গীতা ভাগবতের* অপব্যাখ্যা শুরু হয়। ফলে তাদের বিষ্ণু-বৈষ্ণব চরণে মহা অপরাধী হতে হয়। আমিষ আহার, চা জর্দা বিড়ি সিগারেট তামাক সেবন, তাস জুয়া পাশা, অবৈধ সঙ্গ ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করা উন্নতিকামী সকল মানুষেরই কর্তব্য। আর, একজন বৈষ্ণব ব্যক্তির তো কথাই নেই।

প্রশ্ন ১৯। লোকে বলে, "মাছ খেলে বৈষ্ণবত্ব নষ্ট হয় না।" তা কি ঠিক?

উত্তর ঃ ভাগবত-নির্দিষ্ট কলির আড্ডাগুলির প্রথমটিই হল মাছ-মাংস আহার। এই নরকুলে মৎস্যভোজীরা কলির দাসত্ব করছে, তারা বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করছে না। অতএব কলিবদ্ধ মৎস্যভুকের বৈষ্ণবতা বিচারের আর কি কথা?

যেমন, ধনী লোকের ধন নষ্ট হওয়ার ভয় আছে, কিন্তু নির্ধনের ধন নষ্ট হওয়ার প্রশ্নটাই অবান্তর। আবার এই জগতে অনেক দরিদ্র ব্যক্তি আছে। কিন্তু তাদের সাজ-

পোশাকে হাবভাবে মনে হয় ধনাঢ্য পরিবারের লাট সাহেবের নাতি। কিন্তু সেটি তাদের আসল রূপ নয়। তেমনই, তুলসী মালা গলায়, তিলক নাকে, শিখাধারী সাজলেই তাকে বৈষ্ণব বলা হবে—এমন নয়।

আমাদের জানতে হবে যে, বৈষ্ণবকুলে মাছ-মাংস, চা-জর্দা-পান বিড়ি-সিগারেট, তাস-জুয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কেউ ভুলক্রমে এই সমস্ত আজেবাজে বস্তু গ্রহণ করে থাকেন, তবে অচিরেই তাঁর পক্ষে সেইগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে বৈষ্ণবপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় বৈদিক শাস্ত্রের বিধান অনুসারে তাঁকে অবশ্যই নরকগামী হতে হবে।

প্রশ্ন ২০। ভণ্ড কাদের বলে? কপট ব্যক্তি কিরূপ? প্রতারক কারা?

উত্তর ঃ যারা ভক্তির ভাব দেখায় কিন্তু সর্বদা কুকর্মে ওস্তাদ তাদের ভণ্ড বলে। মুখে হরিনাম করে কিন্তু কলির পাপকর্ম ছাড়ে না—মাছ-মাংস ভক্ষণ, জুয়া-তাসে মন, নেশা-ভাঙে রুচি, অবৈধ যৌনতায় আসক্তি—তারা ভণ্ড বলেই বিবেচিত। এভাবে ভক্তিজীবন থেকে পতিত হলেও নিজেকে ভক্তরূপে লোক দেখানোই ভণ্ডামি।

মন্দ অভিসন্ধি অন্তরে রেখে ভাল ভাল সহানুভূতিপূর্ণ কথা বা ভাব দেখানোই কপট ব্যক্তির স্বভাব। তারা অনেক সময় কাকুতিপূর্ণ কথা বলে। অনেক সময় তাদের মুখে শোনা যায়—"আমি ভগবানকে বিশ্বাস করি।" "সাধন-ভজন করা খুবই ভাল।" "আমার ভজনা করার প্রয়োজন আছে।" "আমিও পরে সময়মতো ভক্ত হব।" "এই ঘর দুয়ার আর কি দরকার।"—এই ধরনের কথাগুলিও কপটতার লক্ষণ।

নিজেদেরকেই ভগবান বলে জাহির করে যারা অন্যদের কাছ থেকে পূজা, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা গ্রহণ করছে তারা অবশ্যই প্রতারক। দেব-দেবীর উপাসক, সিদ্ধযোগী, ব্রহ্মবাদী, কয়েকটি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ইত্যাদি হয়ে নিজেকেই ভগবান বলে প্রচার করাটাই প্রতারণা। ভগবানের অবতরণের কথা, তাঁর রূপ গুণ কার্যকারিতার কথা লক্ষ লক্ষ বছর আগেই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। অথচ মানুষ নানা যোগী ব্যক্তিকেই ভগবান মনে করে তাদের শরণাপন্ন হচ্ছে। ফলস্বরূপ জাগতিক কিঞ্চিৎ লাভ হয়তো হতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক জীবনের আদৌ কোন লাভ হয় না। জন্মমৃত্যুময় জড় বন্ধন থেকে মুক্তি হয় না।

প্রশ্ন ২১। কোন ভক্ত যদি হরিনাম জপ করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে কনক কামিনী চিন্তা করতে থাকে, তখন তার কি গতি হয়?

উত্তর ঃ পরম সুন্দর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবায় যুক্ত হওয়ার বাসনা নিয়েই দিব্য হরিনাম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হয়। সংসার বিষয় ভোগ বাসনা নিয়ে জপ করলে পদ্মপুরাণের দশবিধ নামাপরাধের দশম অপরাধে অপরাধী হতে হয়। পরমসিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভে তা বিঘ্নস্বরূপই হয়। এই সম্পর্কে বৈষ্ণবপ্রবর সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর "জৈবধর্ম" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "নামাপরাধী যে ফল

বাঞ্ছা করে নাম উচ্চারণ করেন, শ্রীনাম সেই সকল ফল তাঁহাকে দিয়া থাকেন; কিন্তু কখনই প্রেমফল দেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামাপরাধের ফলভোগ হয়।" (জৈঃ ধঃ ২৫ অঃ)

প্রশ্ন ২২। কোনও ব্যক্তি যদি কলির চতুর্বিধ পাপ কর্ম—আমিষ আহার, নেশাসেবন, জুয়াখেলা ও অবৈধ যৌনতা এড়িয়ে চলে এবং কলিযুগের যুগধর্ম ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপকীর্তন করে চলে, অথচ সে যদি আমিষভোজী বা নেশাসেবী কোন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে থাকে তবে তার গতি কি হবে?

উত্তর ঃ আত্মকল্যাণ লাভের জন্য সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই সেরূপ কুলগুরু বা আমিষভোজী নেশাসেবী তথাকথিত গুরুকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা কৃষ্ণপ্রসাদভোজী কৃষ্ণভক্তকে গুরুরূপে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় পরমার্থ সাধনে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। যেমন, কোনও দূর গন্তব্য স্থলে যাওয়ার জন্য ভাল গাড়ি দেখে সুন্দর মজবুত আরামদায়ক সীটে বসার জন্য আগের থেকে রিজার্ভেশান টিকিট করা হল অথচ গাড়িটির পরিচালক বা ড্রাইভারটি নিয়মনীতিজ্ঞানহীন মাতাল হয়ে থাকে, তবে সেরূপ গাড়ির যাত্রী হওয়া অত্যন্ত ঝুঁকির ব্যাপার। যে কোনও সময়ে জীবন বিপন্ন হওয়ারই সম্ভাবনা। সেই ভরসাযোগ্যহীন ড্রাইভারের বদল করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তেমনই আমিষভোজী ও নেশাসেবী ব্যক্তিকে গুরুরূপে গ্রহণ করলে তাকে পরিত্যাগ করার কথাও শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। আমিষ ভোজীদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়া যায় না তেমনই আমিষভোজী নেশাসেবী গুরুর মাধ্যমে জন্মমৃত্যুর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ২৩। সহজিয়া বৈষ্ণবেরা বলে যে, 'মদের দোকান কর, কিন্তু মদ খেও না।' এটা কি যুক্তিযুক্ত কথা?

উত্তর ঃ কলির চতুর্বিধ পাপ কর্মের মধ্যে মদ্যপান বা নেশাভাঙ করা হল একটি পাপ কর্ম। মদের দোকান খোলা রয়েছে বলেই মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব মদের ব্যবসা করে লোককে মদ খাওয়ানোটাও একটি বড় পাপ। কেবল মদ পানকারীই পাপের ভাগী হবে, মদ কারবারী পাপাচারী হলো না—এরূপ নয়। মদের দোকান করার অর্থই হল অপরকে নেশাভাঙ করতে সুযোগ দেওয়া, দোকানদার চায় অপরে নেশা করে জীবন নস্যাৎ করুক। অতএব যারা মদের দোকান করছে তারা অবশ্যই অত্যন্ত গর্হিত কর্ম করছে। সহজিয়াদের মনগড়া সব কথা সর্বদাই বর্জনীয়।

প্রশ্ন ২৪। দেহতত্ত্ব বা নির্ভেদতত্ত্ব নামে কোনও বৈষ্ণবীয় দর্শন আছে কিনা? 'দেহটাই কুরুক্ষেত্র'—এই ধরনের ব্যাখ্যার যথার্থতা কি?

উত্তর ঃ দেহতত্ত্ব বা নির্ভেদতত্ত্ব নামে কোনও বৈষ্ণবী দর্শনের নাম শোনা যায় না। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বারে বারে মায়াবাদী, শ্রীকৃষ্ণের চরণে

অপরাধী ব্যক্তিদের ভাষ্য শুনতে নিষেধ করেছেন। "মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬/১৬৯) মানুষ ভক্তিবিচ্যুত হয়।

ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যে উল্লেখ রয়েছে—"কতকগুলি মানুষ বৈদিক জ্ঞানকে তাদের ইচ্ছামতো গ্রহণ করার রীতি প্রচলন করেছে। তারা তাদের মনগড়া অর্থ ব্যাখ্যা করে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার কোন কোন ভাষ্যকার বলে যে, ভগবদ্‌গীতার প্রথম শ্লোকের কুরুক্ষেত্র হচ্ছে দেহ, এবং পঞ্চপাণ্ডব হচ্ছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক, এইভাবে তারা ভগবদ্‌গীতার কদর্থ করে এবং তার ফলে মানুষ অবশ্যই বিপথগামী হয়।" (চৈঃ চঃ আদি ৭/১০৮)

এমন কি সেই তথাকথিত ভাষ্যকারেরা বলে যে, কুরুক্ষেত্র মথুরা বৃন্দাবন—এই সবই কল্পনা, এইগুলি এই দেহের মধ্যেই সব রয়েছে। রাধাকৃষ্ণ-লীলা-পরিকর সবই এই দেহের মধ্যে রয়েছে। এইভাবে তারা মল মূত্র কফ পিত্ত রক্ত মাংস হাড় সমন্বিত জড় দেহটাকেই কত কিছু কল্পনা করে চলে। এই সব তত্ত্ব শুনলে অবশ্য অবশ্যই ভক্তি বিনষ্ট হয়।

প্রশ্ন ২৫। মর্কট বৈরাগ্য আর শ্মশান বৈরাগ্য কি?

উত্তর ঃ মর্কট মানে বাঁদর। মর্কট বৈরাগ্য মানে হচ্ছে বাঁদরের মতো যার বৈরাগ্য। একটি বাঁদর—সে নিরামিষ খায়। ফল শাক-সবজি ছাড়া আমিষ কিছুই খায় না। সে কাপড়ও পরে না। তার ঘরবাড়িও নেই। যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সে ইন্দ্রিয় তর্পণ থেকে বিরত হয় না। তার অনেক স্ত্রীও থাকে। অর্থাৎ, দেখতে বৈরাগীর মতো, কিন্তু ইন্দ্রিয় মোটেই সংযত নয়। মর্কট বৈরাগ্যের অন্য নাম শ্মশান বৈরাগ্য। শ্মশান বলতে সেই স্থান বোঝায়, মানুষ মারা গেলে যেখানে মৃত দেহকে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় অনেকের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন তারা ভাবতে বা বলতে থাকে—'মাটির দেহ মাটিতেই মিশে যাবে। কে কার! কার জন্য এত কষ্ট করা হচ্ছে! কদিনের এই পৃথিবীতে আসা.........' ইত্যাদি। কিন্তু শ্মশান থেকে বাড়ি ফেরা মাত্রই আবার একই ভাবে জড় সুখভোগের জন্য বৈষয়িক কার্যকলাপে লেগে পড়ে। টাকা, জমি, আর স্ত্রী নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই হচ্ছে শ্মশান বৈরাগ্য। এরই অপর নাম ফল্গু বৈরাগ্য। ফল্গু নদী দেখে মনে হয় জল নেই। শুধু বালি আর বালি। কিন্তু একটু বালি খুঁড়লেই জল দেখা যাবে। তেমনই অনেকে তাদের বাইরের ভাব, কথা বার্তা, আচরণ দেখতে ঠিক বৈরাগীর মতো, অথচ ভেতরে ভেতরে নানাবিধ জাগতিক কামনা-বাসনায় পরিপূর্ণ। এই সমস্ত লোক দেখানো বৈরাগ্যে কখনই পরমার্থ লাভ হয় না।

যথার্থ বৈরাগ্য হচ্ছে, জীবন-সম্পদ-মূলধন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় প্রীতি সহকারে যুক্ত করে জীবন যাপন করা।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হম্ উপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যম্ উচ্যতে ॥

"ভগবানের সেবার অনুকূল যা, তাই কেবল গ্রহণ করতে হবে, নিজের ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়। ভোগ বাসনা রহিত হয়ে কৃষ্ণসেবার জন্য যা কিছু গ্রহণ করা হয়, তাকে বলা হয় যুক্তবৈরাগ্য।"

প্রশ্ন ২৬। মানুষ কত প্রকার হয়?

উত্তর ঃ মানুষ দুই প্রকার। (১) আস্তিক বা ভক্ত এবং (২) নাস্তিক বা অভক্ত।

প্রশ্ন ২৭। মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়?

উত্তর ঃ মানুষের এই বর্তমান জন্মের বাসনা ও কর্মের উপর নির্ভর করছে সে দেহত্যাগের পর কোন্ গ্রহলোকে যাবে এবং কোথায় কিরূপ দেহ লাভ করবে।

মানুষ সাধারণত মৃত্যুর পর যমলোকে অর্থাৎ, নরক গ্রহে গতি প্রাপ্ত হয়। তারপর শ্রীযমরাজের কর্মসচিব চিত্রগুপ্তের তত্ত্বাবধানে পাপপুণ্যের হিসাব বা বিচার অনুসারে সেই জীবের প্রাপ্য পুণ্যফল ও পাপফল ভোগের বিধান করে দেওয়া হয়ে থাকে। যাতে সর্বতোভাবেই জীবের ইচ্ছা বা বাসনাও পরিপূর্ণ হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, কোন ব্যক্তির যদি এই জন্মে ঐকান্তিক বাসনা থাকে যে, নির্ঝঞ্ঝাট ভাবে সারাজীবন দিল্লীর রাজ সিংহাসনে আসীন হবেন, কিন্তু তাঁর কর্মকীর্তি মানুষের মতো যদি না হয়, তবে হয়তো পরবর্তী জীবনে বাসনা ও কর্ম অনুসারে তার সুন্দর বিধান করে দেওয়া হলো, দিল্লীর রাজসিংহাসনে সারাজীবন তিনি নির্ঝঞ্ঝাট ভাবে বসে থাকতে পারবেন একটি ছারপোকা জন্মলাভ করেই। কিংবা কারও যদি বাসনা থাকে নারদমুনির মতো যেখানে ইচ্ছা সেখানে খুশিমতো অন্তরীক্ষে ঘুরে বেড়াতে পারবে। কিন্তু তার কর্ম যদি নারদমুনির মতো না হয়, কিংবা মানুষের মতো না হয়, অন্য কোন প্রাণীর মতো রজো বা তমোগুণের স্বভাব হয় তবে পরজীবনেও তার অন্তরীক্ষে যত্র তত্র ভ্রমণের বাসনা পূর্ণ হয়ে যাবে একটা মশা জন্ম পেয়ে। এই জীবনে মাছ মাংস খাওয়ার বাসনা থাকলে পরজীবনে গোসাপ, বেড়াল, বক, খেঁকশিয়াল প্রভৃতি কোনও একটা জন্ম লাভ হবে।

পুণ্য কর্মশীল মানুষ পরজীবনে মানুষ জন্ম পেয়ে সুখভোগ করতে পারে, কিংবা স্বর্গগতি লাভ করতে পারে। শ্রীবিষ্ণুভক্তিতে নিযুক্ত থাকলে বৈকুণ্ঠ গতি লাভ হয়।

সারাজীবনের কর্মকীর্তি এবং মৃত্যুকালীন মনোভাব মানুষকে পরজীবনে অনুরূপ ভাবানুসারী দেহ দান করে উপযুক্ত স্থানে আসীন হওয়ার পথে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন ২৮। ভক্তি কি? ভক্তির উদয় কিভাবে সম্ভব? কারও ভক্তির উদয় হল কিনা তা সে কিভাবে বুঝবে? দীনতা ভাব প্রকাশ করলে নকল ভক্তির উদয় হওয়া কি স্বাভাবিক নয়?

উত্তর ঃ ভগবানকে ভালবাসাই ভক্তি। *হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তির উচ্যতে।* আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাটাই ভক্তি। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যখন শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয় তখন ভক্তির উদয় সম্ভব হয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় চোখ-কান-

নাক-জিভ-ত্বক, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় বাক্-পাদ-পানি-পায়ু-উপস্থ, এবং একটি অন্তরিন্দ্রিয় মন—এ সব ইন্দ্রিয় ভগবৎসেবায় যুক্ত হলে ভক্তির উদয় হবে। চোখ দিয়ে ভগবদ্ বিগ্রহের রূপ দর্শন করা, কান দিয়ে ভগবানের মহিমা, ভক্তি ও ভক্তকথা শ্রবণ করা, নাক দিয়ে ভগবানে অর্পিত প্রসাদী তুলসী চন্দন-পুষ্পের আঘ্রাণ নেওয়া, জিহ্বা দিয়ে কৃষ্ণনাম কীর্তন করা এবং ভগবৎ চরণামৃত ও অধরামৃত আস্বাদন করা, ত্বক দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা এবং ভক্তপদরেণুতে ভূষিত হওয়া, বাক্ শক্তি দিয়ে হরিকথা কীর্তন করা, পাদ দিয়ে মন্দিরে গমন করা, হাত দিয়ে মন্দির মার্জন ও অন্যান্য ভগবদ্ সেবা করা, পায়ু ও উপস্থ দিয়ে ভগবৎ সেবার অনুকূল শরীরটার মধ্যে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করা, উপস্থ ইন্দ্রিয় দিয়ে গৃহস্থ ব্যক্তির ভগবদ্ভক্ত সন্তান উৎপাদনের জন্য মাত্র ব্যবহার করা, এবং মন দিয়ে পরমেশ্বরের প্রীতি সাধনার্থে সেবা করে চলা।

এর বিপরীত বিষয়ে যাঁর রুচি বা আগ্রহ হচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে তাঁর ভক্তির উদয় হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম কৃষ্ণকেন্দ্রিক হয়। তিনি খাচ্ছেন কৃষ্ণপ্রসাদ, অন্য কিছু নয়, তিনি বলছেন কৃষ্ণকথা, তাঁর চাষবাস, ব্যবসাবানিজ্য, অধ্যাপনা, আয় রোজগার, ঘরবানানো, সংসার পরিপালন, তাঁর সমগ্র জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে শ্রীকৃষ্ণকে স্থান দিয়েছেন। তিনি সবকিছু কৃষ্ণের বলেই মনে করেন, নিজের বলে মনে করেন না। কিন্তু কৃষ্ণের প্রীতি উদ্দেশ্যে বিষয়ের ব্যবহার করেন এবং কৃষ্ণের দাসরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাত্র। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে আত্মসমর্পণ হেতু জীবনের অন্তিমকালে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করতে করতে পরম ধাম সচ্চিদানন্দময় লোকে উন্নীত হওয়া যায়।

ভক্ত ভক্তিমাধ্যমে ভগবানের প্রিয় হন। ভক্ত মনে করেন 'আমি বদ্ধ জীব'। জড়জগতের বদ্ধজীব কত জন্ম ধরেই দুঃখযাতনা ভোগ করে চলেছে এই দুঃখময় জগতে। তাই কত সাবধানে ভক্তির আশ্রয় নিতে হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্য দীনহীন অসহায় ভাব থাকবে। কত সাবধানে যত্নপরায়ণ হতে হয়; ভক্তিবিঘ্ন হেতু অপরাধ যাতে না হয়। সেইজন্য দীনতা ভাব স্বাভাবিক। অহমিকা, গর্ব, দম্ভ, দর্প নিয়ে ভক্তি কখনও সম্ভব হয় না। অতএব দীনভাব কেন নকলভক্তি হবে? পরমেশ্বরের কাছে তুচ্ছ নগণ্য জীব দীনভাব তো প্রকাশ করবেই। যে ক্ষেত্রে ভক্তিবিরুদ্ধ কিছু ঘটে চলে সেক্ষেত্রে মানবসমাজে বা পশুসমাজে কারও কাছে দীনভাব প্রকাশ করা অনুচিত।

প্রশ্ন ২৯। মাছ খেয়ে কি হরিনাম করা যায় না?

উত্তর ঃ শ্রীহরি যেমন তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনই মাছ খেতেও নিষেধ জারি করেছেন। আমিষ আহার কলির আড্ডা বলে নির্দিষ্ট। অতএব কলির আড্ডায় যুক্ত থাকব আবার হরিনামও করব—এগুলি ভণ্ডামির লক্ষণ মাত্র। 'দুধও খাব তামাকও খাব' এইভাবে টি.বি. রোগী কখনও সুস্থ হতে পারে না। তেমনই হরিনামও করব মাছও খাব এইভাবে ভবরোগী কখনও রোগমুক্ত হতে পারে না।

প্রশ্ন ৩০। কত রকমের অপসম্প্রদায় রয়েছে এবং কে সেগুলি আবিষ্কার করেন?

উত্তর ঃ অসৎ সম্প্রদায় বা অপসম্প্রদায়ের তেরটি নাম উল্লিখিত হয়েছে। আউল, বাউল, কর্তাভজা, ন্যাড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, চূড়াধারী, অতিবড়ী, গৌরাঙ্গ নাগরী, স্মার্ত, জাতগোঁসাই। এই তের প্রকার অপসম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পথ পরিত্যাগ করে ব্যভিচারী হয়েছে। শ্রীল তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজ এই তালিকা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন পশ্চিমদেশীয়। বর্তমান শহর নবদ্বীপে তাঁর বড় আখড়া আছে। তাঁর তীব্র শাসন ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, নবদ্বীপে বসে কেউ যেন ধর্মের নামে ব্যভিচার না করে। তিনি বর্তমান শহর নবদ্বীপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

প্রশ্ন ৩১। আমরা দীক্ষিত। আমাদের গুরুদেব অবশ্য মাছমাংস ছাড়তে নির্দেশ দেননি। কলিযুগের যুগধর্ম 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপেরও নির্দেশ দেননি। কেবল ভোরে ও সন্ধ্যায় আমরা গুরুমন্ত্র জপ করে থাকি। এতে কি আমাদের জীবনের সদ্‌গতি হবে না?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

"নিজের সদ্‌গতি বা পরম মঙ্গল কি—সেই সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়ে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করতে হয়। সদ্‌গুরু হচ্ছেন তিনি—যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ, বেদশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ, যিনি ভগবদ্ অনুভূতি লাভ করেছেন। যিনি জাগতিক কোনও ক্ষোভের বশীভূত নন, তিনিই সদ্‌গুরু।" (ভাঃ ১১/৩/২১) আর বেদ শাস্ত্রের সিদ্ধান্তই হচ্ছে এই যে, মাছমাংস খাওয়া মহাপাপ এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই সদ্‌গতির একমাত্র পন্থা। *নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।*

প্রশ্ন ৩২। জাতিগত 'গোস্বামী'রা সকল গৃহস্থের কাছে খুবই সম্মানীয় হন। কিন্তু তাঁরা আমিষ আহার ধূমপান ইত্যাদি নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করেন না। তা হলে তাঁরা গোস্বামী বলে পরিচিত হন কি করে?

উত্তর ঃ 'গো' মানে ইন্দ্রিয়, 'স্বামী' মানে প্রভু। যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন বা বশীভূত করেন এমন কৃষ্ণৈকশরণ ষড়বেগবিজয়ী ব্যক্তি 'গোস্বামী' পদবাচ্য হন।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী—এই ছয়জন একত্রে ষড়গোস্বামী নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন কৃষ্ণভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত আদর্শ সদ্‌গুরু। তাই তাঁদের বলা হত গোস্বামী। বৃন্দাবনের সমস্ত মন্দির তাঁদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে সেই সব মন্দিরের পূজার দায়িত্ব তাঁদের কয়েকজন গৃহস্থ শিষ্যের উপর ন্যস্ত করা হয়। সেই থেকে তাঁরাও বংশানুক্রমিকভাবে 'গোস্বামী' উপাধি ব্যবহার করে

আসছেন। এভাবে বংশানুক্রমিক বা জাতিগতভাবে গোস্বামী উপাধি গ্রহণের প্রথা চলে আসছে। প্রকৃতপক্ষে যে সদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করছেন এবং যাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে বশীভূত তিনিই 'গোস্বামী' উপাধিতে অভিহিত হতে পারেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ৯/২৮৯ তাৎপর্য)

আমিষ আহার ধূমপানাদি বিষয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তথা ষড়গোস্বামীর ধারার বহির্ভূত।

প্রশ্ন ৩৩। কলিবদ্ধ জীব কোনও ধর্মীয় আচরণ বিধি না মেনে একান্তভাবে অন্তরে অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমে মনকে জাগিয়ে রেখে এবং শ্রীকৃষ্ণের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখলে, তাতে কি কল্যাণ হবে না?

উত্তর ঃ না, মোটেই কল্যাণ নয়, সেটি হচ্ছে সমগ্র জগতের উৎপাত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিঃ উৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"বৈদিক শাস্ত্রবিধি বাদ দিয়ে যে ঐকান্তিক হরিভক্তি সেটি সমাজের উৎপাত মাত্র।"

কলিবদ্ধ জীবের কোন কল্যাণ নেই। আগে তাকে কলির কবল থেকে মুক্ত হতে হবে। কলির আচার ছাড়তে হবে, যেমন—আমিষ আহার, নেশাভাং, জুয়া তাস, অবৈধ যৌনতা। এসব অবশ্যই ছাড়তে হবে। আর যুগধর্ম হরিনাম গ্রহণ করতে হবে। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগী যদি 'দুধও খাব, তামাকও খাব' এভাবেই রোগমুক্ত হবে বলে বিশ্বাস করে আর মনে মনে নীরোগ আনন্দময় অবস্থায় ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করে তাহলে সেই উৎপাত রোগী কোনদিন সুস্থ হবে না।

শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া বিধি-নির্দেশ পালন করে চলাই ভক্তি। অন্যথা বিধি না মেনে 'আমি ভগবান মানি', 'আমি শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করি', 'শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রিয় প্রভু'—এসব কথা কেবল উৎপাতের পরিচায়ক মাত্র।

প্রশ্ন ৩৪। ভক্তিজগতে সিদ্ধপুরুষ কি ধরনের?

উত্তর ঃ বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে সিদ্ধ জীব তিন রকমের। সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ। যিনি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁকে সাধনসিদ্ধ বলে। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে কখনই বিস্মৃত না হওয়ার মাধ্যমে সিদ্ধ অবস্থা লাভ করেছেন, তাঁকে নিত্য সিদ্ধ বলে। বৈষ্ণব বা শ্রীগুরুদেবের কৃপার প্রভাবে যিনি সিদ্ধ হয়েছেন তাঁকে কৃপা সিদ্ধ বলা হয়।

প্রশ্ন ৩৫। শাস্ত্র জ্ঞানের ঊর্ধ্বে অনুভূতির রাজ্যে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কি বলে?

উত্তর ঃ ভক্তিমার্গের সমস্ত স্তরের কথাই শাস্ত্রে রয়েছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ইত্যাদি মহান মহান শাস্ত্রে মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দ তা প্রকাশ করেছেন। সেই সব কথা বাদ দিয়ে

কোনও মনগড়া অনুভূতির কোনও মূল্য নেই। শাস্ত্রবিধি বিনা ঐকান্তিকী মনগড়া ভক্তিকে উৎপাত বলেই বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৬। তুলসী মালা ধারণ করলে কি কি নিয়ম পালন করতে হয়?

উত্তর ঃ শ্রীগরুড় পুরাণে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি তুলসী কাষ্ঠময়ী মালা শ্রীহরির চরণে নিবেদন পূর্বক ভক্তিসহকারে কণ্ঠে ধারণ করেন, তাঁর কোন পাপ বিদ্যমান থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি নিরন্তর সন্তুষ্ট থাকেন।"

তুলসী মালা শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবেদন পূর্বক মাথায় স্পর্শ করে প্রার্থনা করতে হয়,—"হে মালা, তুমি কৃষ্ণবল্লভা, কৃষ্ণভক্তেরা তোমাতে প্রীতি প্রদর্শন করেন, আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করছি, দয়া করে আমাকে শ্রীহরির এবং তাঁর ভক্তগণের প্রিয়পাত্র কর।"

শ্রীকৃষ্ণকে যাঁরা ভালবাসতে চান তাঁরা তুলসীমালা পরিধান করে থাকেন। আমাদের সমাজে দেখা যায় তুলসীমালা ধারণ করেও কৃষ্ণপ্রসাদে মন নেই। তাদের মন মাছ-মাংস, হাড়-পিত্তে। অনেকে আবার বলে থাকেন, "খবরদার তুলসীমালা পরিস না, তাহলে আর মাছ-মাংস খেতে পারবি না।" আর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অমেধ্যং তামস প্রিয়ং*—তামসিক নিম্নশ্রেণীর লোকেরা রক্তমাংসাদি অমেধ্য খেতে ভালবাসে। আর শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে *পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ।* পিশাচশ্রেণীর লোকেরা আমিষাশী হয়। অতএব মালা পরার তাৎপর্য উপলব্ধি করা কর্তব্য।

প্রশ্ন ৩৭। ভক্তজীবনে এসেও মানুষের কিভাবে ভক্তি নষ্ট হয়ে যায়? সেই সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করি।

উত্তর ঃ শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর শ্রীউপদেশামৃত গ্রন্থে দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লেখ করেছেন—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

অর্থাৎ, "(১) প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সংগ্রহ করা, (২) জড় বিষয় লাভের জন্য অত্যধিক প্রয়াস করা, (৩) জড় বিষয়ে অনর্থক প্রজল্প করা, (৪) পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য শাস্ত্রবিধি অনুশীলন না করে কেবল সেগুলির অনুসরনের জন্য অনুশীলন করা অথবা শাস্ত্রবিধি বর্জন করে স্বতন্ত্রভাবে খেয়ালখুশিমতো কার্য করা, (৫) কৃষ্ণভক্তিবিমুখ বিষয়ী ব্যক্তিদের সঙ্গ করা এবং (৬) জাগতিক লাভের জন্য লোভী হওয়া। এই ছয়টি কার্যে অত্যধিক আসক্ত হলে ভগবদ্ভক্তি বিনষ্ট হয়।" আমাদের অর্জিত বা সংগৃহীত বিষয় যখন কৃষ্ণসেবায় যুক্ত হয় তখন তা ভক্তি, কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবাই ভক্তি। কিন্তু ইন্দ্রিয় তর্পণ ভাবনা থাকলে ভক্তি নষ্ট হয়।

প্রশ্ন ৩৮। ফল্গু বৈরাগী ও যুক্ত বৈরাগী কাকে বলে?

উত্তর ঃ ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা। যার জল উপর থেকে বোঝা যায় না। দেখলেই মনে হয় শুকনো নদী। কিন্তু একটুখানি মাটি খুঁড়লেই জল দেখা যায়। সেইরকম,

এমন কিছু কিছু বৈরাগী আছে, যাদের ভোগবাসনা হৃদয়ের মধ্যে আছে কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু সামান্য অনুকূল পরিবেশ পেলেই তার ভোগীর মনোভাব প্রকাশিত হয়। এই ধরনের বৈরাগীকে ফল্গু বৈরাগী বলা হয়। দেখতে বৈরাগী কিন্তু আসলে ভোগী।

বাহ্যদৃষ্টিতে যাঁকে ভোগী বা বিষয়ী বলে মনে হয়, কিন্তু অন্তরে যিনি কৃষ্ণভাবনাময়, বিষয় সংসারে থাকলেও যার মন সর্বদা ভগবৎপাদপদ্মে আসক্ত, দেখতে বিষয়ীর মতো কিন্তু বিষয় ভোগে অনুরাগ নেই—এরকম বৈরাগীকে যুক্ত বৈরাগী বলা হয়। দেখতে ভোগী কিন্তু আসলে বৈরাগী।

প্রশ্ন ৩৯। 'হরিভজনে নিষ্ঠা থাকা দরকার।' এই কথাটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ঃ নিষ্ঠা বলতে মনোযোগ বা অনুরাগ বোঝায়। হরিভজনে নিষ্ঠা না থাকলে জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি মন আকৃষ্ট হবে এবং কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি রিপুদ্বারা চিত্ত বিক্ষুব্ধ হবে। কিন্তু নিষ্ঠা-ভক্তির প্রভাবে চিত্ত বিশুদ্ধ এবং প্রসন্ন হয়।

এই নিষ্ঠা দুই প্রকারের। সাক্ষাৎ ভক্তি বিষয়ে এবং তার অনুকূল বস্তু বিষয়ে।

১) সাক্ষাদ্ ভক্তি বিষয়ে নিষ্ঠা তিন রকমের—কায়িকী, বাচিকী ও মানসী। কায়িকী হল—ভগবৎকথা শ্রবণ, তুলসী-পুষ্প চয়ন, মালা গাঁথা, অর্চন, প্রণতি নিবেদন, পরিক্রমা, মন্দির মার্জন ইত্যাদি। বাচিকী হল—ভগবানের নাম, গুণ, লীলা কীর্তন এবং অষ্টক, স্তব, বিজ্ঞপ্তি, বন্দনাদি পাঠ। মানসী হল—ভগবানের নাম, গুণ, লীলা ইত্যাদি স্মরণ মনন। ২) তার অনুকূল বস্তু বিষয়ে নিষ্ঠা—নিজে অমানী হওয়া, অন্যকে সম্মান দেওয়া, মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা, কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য ইত্যাদি হল ভক্তির অনুকূল।

প্রশ্ন ৪০। দীক্ষা কি?

উত্তর ঃ পারমার্থিক শ্রীগুরুদেব করুণাপূর্বক মায়াকবলিত জীবকে যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান দান করেন ও বদ্ধজীব গুরুকৃষ্ণ পাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ করে তাকে দীক্ষা বলে।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্ ।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥

অর্থাৎ, "যাতে দিব্যজ্ঞান দান করে এবং পাপের সংক্ষয় করে ভগবদ্তত্ত্ববিদগণ এইজন্যই তাকে দীক্ষা বলে থাকেন। দিব্যজ্ঞান বলতে মন্ত্রে সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ জ্ঞান এবং সেই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞান।

প্রশ্ন ৪১। আমরা যে গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছি, তিনি আপনাদের মতো কড়া কথা বলেন না। তিনি বলেছেন তোমরা কেবল দীক্ষা নাও। আমিষ, চা-বিড়ি এখন খেলেও ক্ষতি নেই। যখন মন ওসব খেতে চাইবে না তখন ছেড়ে দেবে। এটা কি ঠিক নয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ এটাও ঠিক এরকম যে, যখন নারকীয় কর্ম করতে মন চায় তখন করলে ক্ষতি নেই এবং নরকপথে গিয়ে অশেষ যাতনা ভোগ করলে কোনও ক্ষতি নেই। যখনই যাতনা ভোগ করতে নরকে যেতে মন চাইবে না তখন পাপকর্ম ছেড়ে দিতে হবে। কলির চারটি পাপকর্ম হল—আমিষ আহার, নেশাভাঙ্, জুয়াতাস, ও অবৈধ যৌনসঙ্গ। আবার মন যখন এগুলি চাইছে তা করা যাক—এরকম কথা কোনও বৈষ্ণব গুরু বলেন না। মন যা চায় তাই কর—একে বলে মনগড়া হুজুগে চলা। নেশাখোরের মন নেশা করতে চাইবে। আমিষ ভোজীর মন আমিষ খেতে চাইবে, জুয়াড়ীর মন জুয়া খেলতে চাইবে, বেশ্যাগামীর মন বেশ্যালয়ে যেতে চাইবে। মন যেহেতু চাইছে অতএব এসব করলে ক্ষতি নেই—একথা কোন্ যুক্তিতে আপনি ঠিক বলে সমর্থন করলেন? ধার্মিক ব্যক্তির মনও তো ধর্মাচরণ করতেই চায়। আর তাই সে গুরু গ্রহণ করে, কিন্তু মানুষ ভালমন্দ না বুঝেই তথাকথিত গুরু গ্রহণ করে থাকে। শাস্ত্রে অবৈষ্ণব তথাকথিত গুরুকে পরিত্যাগ করতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করলে নরকে গতি হয়। সেইজন্যে যথা শাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়। (হরিভক্তিবিলাস ৪/১৪৪)

প্রশ্ন ৪২। যারা আমিষ খায় তারা কি ভগবানের অর্চাবিগ্রহ পূজা করতে পারে?

উত্তর ঃ লোকে মাছ, পশু, পাখি হত্যা করে খায়। এটি জীবহিংসা। শাস্ত্রে বলা হয়েছে মাছ-মাংসভোজীদের ভগবানের বিগ্রহ-পূজা নিষিদ্ধ।

সেই মূর্তি করি যেবা ভজে নারায়ণ ।
জীবহিংসা করে যদি, নাহি প্রয়োজন ॥

(কৃঃ প্রেঃ তঃ ৭/৫/৩২)

প্রশ্ন ৪৩। সৎসঙ্গ ও দুঃসঙ্গ কাকে বলে?

উত্তর ঃ প্রীতি ও আদরের সঙ্গে যাঁরা কৃষ্ণসেবা করেন, কৃষ্ণনাম করেন তাঁদের নির্দেশে জীবনযাপন করবার অভিলাষ, তাঁদের সঙ্গে জীবন গঠনের প্রণালী শিক্ষাই সৎসঙ্গ। আর, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্য কামনা-বাসনাই দুঃসঙ্গ।

দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥

প্রশ্ন ৪৪। সাধু ও অসাধুর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

উত্তর ঃ সাধু সর্বদা হরিনাম, হরিকথা, হরিসেবা নিয়েই দিন অতিবাহিত করেন। আর, অসাধু সর্বদা সাংসারিক কথা, নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ ও সুখ-সুবিধার কথা নিয়ে দিন অতিবাহিত করে।

প্রশ্ন ৪৫। জীব মাত্রই বিষ্ণুর অংশ। এই হিসাবে আমরা সবাই বৈষ্ণব। তা হলে অবৈষ্ণব কে?

উত্তর ঃ বৈষ্ণব মাত্রই বিষ্ণুর আরাধনা করেন, বিষ্ণুচিন্তা করেন, বিষ্ণুপ্রসাদ ভোজন করেন, বিষ্ণুসেবা করেন। কিন্তু যারা আজেবাজে চিন্তা করে, অপ্রসাদ ভোজন করে, বিষ্ণুকে বাদ দিয়ে মায়ার সেবায় আগ্রহী তারা সব অবৈষ্ণব। তাদেরও কর্তব্য বিষ্ণুসেবা করা, কিন্তু যেহেতু তারা তা করছে না তাই অবৈষ্ণব।

প্রশ্ন ৪৬। আপনারা বলেন যে, সুকৃতি না থাকলে কেউ ভক্ত হতে চায় না। তা হলে তো সুকৃতিবান লোকেরা আপনা থেকেই ভক্ত হবে। এরকম পরিস্থিতি হলে আপনারাই বা কেন তবে লোকের কাছে প্রচার করছেন—'ভক্ত হও, সাধন ভজন কর'?

উত্তর ঃ সুকৃতি বলেই লোকে ভক্তি লাভ করে। অন্যথায় লোকে ভক্ত হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রসঙ্গে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলছেন—

নিজ নিজ ভাগ্যবলে জীব পায় ভক্তি ।
ভক্তি লভিবারে সকলের নাহি শক্তি ॥
সুকৃতিজনের ভক্তি দৃঢ় করিবারে ।
আইলাম যুগধর্ম নামের প্রচারে ॥

"সমস্ত জীব সুকৃতিবলে হরিনামে শ্রদ্ধা করবে এবং তাদের ভক্তি দৃঢ় করবার জন্যই আমি হরিনামকে যুগধর্ম বলে প্রচার করেছি।

সুকৃতির ফলে ভক্তি লাভ হলেও জগতের অসৎ সঙ্গের প্রভাবের ফলে সেই ভক্তি বৃদ্ধির পরিবর্তে ক্রমশ বিনষ্ট হয়ে মানুষ দুর্ভাগা দুমর্তিগ্রস্ত হয়ে না পড়ে সেইজন্য প্রচার কার্যের অবশ্যই প্রয়োজন আছে।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন—

শুন হরিদাস, এই লীলা সংগোপনে ।
বিশ্ব অন্ধকার করিবেক দুষ্টজনে ॥
সেই কালে তোমার এ চরমোপদেশ ।
অবশিষ্ট সাধুজনে বুঝিবে বিশেষ ॥

যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর প্রিয় সঙ্গীরা জগতে প্রকটলীলা সঙ্গোপন করবেন তখন অপসম্প্রদায়ী দুষ্ট লোকেরা তাঁর পবিত্র নামধর্মাদি হিতোপদেশগুলিকে বিকৃত করে প্রচার করবে, ফলে বিশ্ব সংসারটি অভক্তির অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। তবুও যে ভক্তিশিক্ষা প্রচার করা হয়েছে, ভক্তসঙ্গে হরিনাম অনুশীলনরূপ চরম উপদেশ—ভক্তরা সেগুলি আলোচনা করবে এবং প্রচার করবে।

জগতের প্রচার-ব্যবস্থাগুলি ইতর ও নোংরা কথাগুলি প্রচার করছে। কিন্তু ভগবানের কথা বেশী করে প্রচার হলে লোকে শুদ্ধ জীবন গঠনের প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ

করবে। তারফলে লোকে সদাচারী ও সুকৃতিবান হবে এবং কৃষ্ণভাবনামৃত নিয়ে থাকতেই আগ্রহী হবে।

প্রশ্ন ৪৭। যদি কেউ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে অর্থ উপার্জন দ্বারা সংসার নির্বাহ করে। তাতে কি কোনও দোষ হয়?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উচিত নয় বলেই আচার্যগণ নির্দেশ দিয়েছেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, শরীর নির্বাহের জন্য সাধারণের কাছে ভাগবত পাঠ করে অর্থ গ্রহণ করো না। বিনা দক্ষিণায় রসিক শ্রোতার কাছে রসিক বক্তাই ভক্তিরসগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত পরমানন্দে কীর্তন করার অধিকারী হন।

প্রশ্ন ৪৮। সদ্গুরু আর অসদ্গুরুর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ সমাজে অনেকে গুরু সেজে পূজালাভের পাত্র হয়েছেন, সেইজন্য গুরুতত্ত্বকে বুঝে নেবার জন্যে 'সৎ' ও 'অসৎ' কথাটি ব্যবহার হয়েছে। সদ্গুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি যিনি কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিয়ে জড়দুঃখময় সংসারবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করে ভগবদ্ধামে নিয়ে যান। তিনি অধর্মের চারটি পাপাচার যথা—নেশাভাং, মাছ মাংস আহার, জুয়াতাস এবং অবৈধ সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি কলিযুগের যুগধর্ম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন। কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন করেন। গীতা-ভাগবত পাঠ ও অনুশীলন করেন এবং শিক্ষা দেন। তিনি হঠাৎ গুরু হয়ে যান না কিংবা কোন তান্ত্রিক যোগসিদ্ধি দেখিয়ে গুরু হন না। তিনি আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণ থেকে পরম্পরা সূত্রে আগত ভগবৎ প্রতিনিধি। আর অসদ্গুরু হচ্ছে সদ্গুরুর বিপরীত।

প্রশ্ন ৪৯। ভক্তি এবং শুদ্ধ ভক্তির মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ ভক্তি সাধারণত দুই রকমের। মিশ্র ভক্তি এবং শুদ্ধ ভক্তি। যখন জড় জাগতিক কোন রকম কামনা বাসনা পূরণের জন্য ভক্তি অনুশীলন করা হয়, তা মিশ্রভক্তি। ক্রোধী, হিংসুক, দাম্ভিক, মাৎসর্য পরায়ণ ব্যক্তিরা যখন ভগবানে ভক্তি করে, তাদের সেই ভক্তি তামসিক। বিষয় যশ ঐশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের প্রতি যে ভক্তি করা হয়, তা রাজসিক ভক্তি। সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে কর্মের ফল ভগবানকে নিবেদন পূর্বক যে ভক্তি করা হয়, তা সাত্ত্বিক ভক্তি। কিন্তু এসবই মিশ্র ভক্তি।

শুদ্ধভক্তি হচ্ছে—*অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।*

শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া অন্য কোনও অভিলাষ থাকবে না। মায়াবাদীদের শুষ্কজ্ঞান এবং সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত থেকে নিজের ইচ্ছামতো না করে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার অনুকূলে প্রীতিপূর্বক নিরন্তর সেবা অনুষ্ঠান করাই উত্তম ভক্তি বা শুদ্ধ ভক্তি।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে, প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রকে অবহেলা করে যে হরিভক্তি তা সমাজের উৎপাত মাত্র।

শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিঃ উৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, নারদ পঞ্চরাত্র ইত্যাদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করে যে ঐকান্তিক ভাব দেখিয়ে হরিভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, তা শুধু উৎপাতই সৃষ্টি করে।"

প্রশ্ন ৫০। ধামবাসী কাদের বলা হয়?

উত্তর ঃ ভগবানের আবির্ভাব লীলাভূমিকেই ধাম বলা হয়। সেই স্থানে যাঁরা বাস করেন তাঁদের ধামবাসী বলা হয়। এটি আপাত কথা। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা ভগবৎভক্তি অনুশীলন করেই জীবন যাপন করছেন তাঁরাই ধামবাসী। কৃষ্ণভক্তি আচার ও প্রচার করাই তাঁদের কাজ। ভগবানের আবির্ভাবভূমিতে বাস করেও যারা খল হিংস্র মদ্যপায়ী মাংসভোজী যোষিৎ সঙ্গী ক্রূরবুদ্ধি তারা ধামবাসী নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, "মোর মন বৃন্দাবন"। অর্থাৎ, তাঁর মন কৃষ্ণ চেতনা সর্বস্ব।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেছিলেন, "তুমি যাহাঁ যাহাঁ রহ, তাহাঁ 'বৃন্দাবন'।" কৃষ্ণভক্তি চেতনা নিয়ে বিশ্বের যে স্থানেই থাকা হোক না কেন সেটিই বৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত প্রকাশ, তিনি যেখানেই অবস্থান করেন তাঁর ঐকান্তিক সেবায় যেখানে লোকে নিয়োজিত হয় সেটিই বৃন্দাবন হয়ে যায়। মহাপ্রভুর অনুগত ব্যক্তিরাই প্রকৃত পক্ষে ধামবাসী।

প্রশ্ন ৫১। ষড় গোস্বামীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর শিক্ষাদর্শ তাঁদের মধ্যে একই থাকা যুক্তিযুক্ত। তবে কেন লোকে বলে যে 'ছয় গোঁসাইর ছয় মত'?

উত্তর ঃ এটি সম্পূর্ণ বাজে কথা। ষড় গোস্বামীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত। তাঁদের সবার মত অভিন্ন। কিন্তু বর্তমান সমাজে ষড় গোস্বামীর শিক্ষা পরম্পরায় আশ্রিত নয়, অথচ 'গোস্বামী' বা 'গোঁসাই' নামে জনসমাজে পরিচিত হচ্ছেন, সেই সমস্ত শ্রীচৈতন্যভক্তি-বিরোধী তথাকথিত 'গোঁসাই'দের নানা রকমের হাবিজাবি মত থাকতে পারে। তাছাড়া সাধারণ অভক্ত 'লোকের কথা'র কিবা মূল্য?

প্রশ্ন ৫২। অনেক লোককে দেখা যায়, তারা 'হা গোবিন্দ হা গোবিন্দ' উচ্চারণ করতে করতে মাটিতে গড়াগড়ি যান, তাদের চোখের জলধারা নামতে থাকে। আবার কিছুক্ষণ পরেই তারা বিড়ি খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এটা কি ধরনের ভক্তি?

উত্তর ঃ অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হয় শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে। কিন্তু সেই বিকার তাঁরা লোকসমক্ষে প্রকাশ করতে আদৌ ইচ্ছা করেন না। লোকসমক্ষে সেই বিকার প্রকাশিত হলেও ভক্তের বাহ্যজ্ঞান থাকে না, যেমন নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর হরিনাম এমনভাবে স্মরণ করছিলেন যে বাইশ বাজারে অজস্র প্রহার খেয়েও তাঁর কিছুই হল না। কিন্তু পূজা ও সম্মান লাভের আশায় হরিদাস ঠাকুরকে অনুকরণ করতে এসে এক ব্রাহ্মণ বেতের একটি ঘা খেয়ে হরিনাম ছেড়ে 'বাপ্‌রে বাপ্' বলে উঠে দৌড়ে পালালো।

শুদ্ধভক্তের মধ্যে যে বিকার দেখা যায়, ভণ্ডের মধ্যেও সেই বিকারের সহজ অনুকরণ দেখা যায়। সেই ভণ্ডদের লক্ষ্য করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গান করেছেন—

অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত লম্ফ-ঝম্প-অকস্মাৎ
মূর্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া ।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ
কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া ॥

(কল্যাণ কল্পতরু)

বিড়ির ধোঁয়া খাওয়ার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তি ভক্ত নয়, ভণ্ড। আমিষভোজী, নেশাখোর, জুয়াড়ী ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গীরা ভক্তির দাসত্ব করতে পারে না, তারা কলির দাসত্ব করে।

প্রশ্ন ৫৩। ভণ্ড কাকে বলে?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *গীতায়* অর্জুনকে বলেছেন—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

"যে ব্যক্তি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সংযত করেও মনে মনে ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়গুলি স্মরণ করে, সেই মূঢ় অবশ্যই নিজেকে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে মিথ্যাচারী বা ভণ্ড বলা হয়ে থাকে।" (গীতা ৩/৬)

প্রশ্ন ৫৪। কে গুরু হতে পারেন?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যে-ই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সে-ই গুরু হয় ॥

অর্থাৎ, "যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই 'গুরু', তা তিনি ব্রাহ্মণ হোন, কিংবা সন্ন্যাসীই হোন অথবা শূদ্রই হোন, তাতে কিছু যায় আসে না।" (চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮/১২৮)

শ্রীপ্রেমবিবর্ত গ্রন্থেও বলা হয়েছে—

কিবা বর্ণী, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন ।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে-ই, সে-ই আচার্যপ্রবীণ ॥

অর্থাৎ, যে কোনও বর্ণে, যে কোনও আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হোন না কেন এমনকি বর্ণ আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত না হলেও যদি কেউ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হোন, তবে তিনিই গুরু হতে পারেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীউপদেশামৃত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

(উপদেশামৃত ১শ্লোক)

অর্থাৎ, "বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়বেগ যে ব্যক্তির বিশেষরূপে সহ্য করতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করতে পারেন (অর্থাৎ শিষ্য করতে পারেন) তিনিই ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী জগদ্‌গুরু।"

এখানে বাচোবেগ—কৃষ্ণসম্বন্ধছাড়া যত রকমের ইতরকথা, মনোবেগ—মনের দাস হওয়া, মন যা চায় তাই করা, ক্রোধবেগ—কাম চরিতার্থ করতে বাধার ফলে অতৃপ্তিজনিত ক্রোধ, জিহ্বাবেগ—সুস্বাদু দ্রব্য ভোজনে আগ্রহশীল, উদরবেগ—অতিরিক্ত ভোজনপরায়ণ, উপস্থবেগ—যৌন সঙ্গ লালসা, এই ছয়বেগ যাঁর বশে সর্বদা থাকতে পারে, তিনিই গোস্বামী এবং জগৎ গুরু হতে পারেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়ে নির্দেশ দিলেন—

যারে দেখ তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

অর্থাৎ, "যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে তাকেই তুমি ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান কর। আমার আজ্ঞায় এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে তুমি এই দেশকে উদ্ধার কর।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলছেন—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার ।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥
'আচার', 'প্রচার',—নামের করহ 'দুই' কার্য ।
তুমি—সর্বগুরু, তুমি জগতের আর্য ॥

"কিছু লোক আচরণ করছেন, কিন্তু প্রচার করছেন না, আবার কিছু লোক প্রচার করছেন কিন্তু আচরণ করছেন না। কিন্তু তুমি ভগবানের দিব্য নামের আচার ও প্রচার—দুই কার্যই করছ। তাই তুমি সকলের গুরু এবং এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।"

যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরু, তিনি অবশ্যই কৃষ্ণভক্ত এবং তিনি পরম্পরা আশ্রিত হবেন। ভগবান বলছেন—

এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্ রাজর্ষয়ো বিদুঃ । (গীতা)

অর্থাৎ, পরম্পরা মাধ্যমেই ভগবদ্‌তত্ত্বজ্ঞান প্রবাহিত হয়। ভগবৎ প্রতিনিধি গুরুদেব শ্রীমদ্ভাগবত নির্দিষ্ট কলির চতুর্বিধ কলুষিত কর্ম থেকে বিরত থাকবেন যেমন—মাদকদ্রব্যের নেশা, আমিষ আহার, অবৈধ যৌনতা এবং জুয়া তাস ইত্যাদি তিনি বর্জন করে চলবেন। কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তনে তিনি ব্রতী হবেন। তিনি শাস্ত্র নির্দিষ্ট ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ও জপ করবেন। তিনিই তাঁর পূর্বতন আচার্যের প্রিয়জন হবেন। তিনি কৃষ্ণসেবা বিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়তর্পণ মূলক কোন কর্মের জড়িত থাকেন না।

প্রশ্ন ৫৫। কে গুরু হতে পারে না?

উত্তর ঃ শ্রীপদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

ষট্ কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরু ॥

"যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয় কর্মে নিপুণ এবং মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ কোনও ব্রাহ্মণও গুরু হতে পারেন না, যদি না তিনি বৈষ্ণব হন। বরং চণ্ডালকুলে আবির্ভূত হয়েও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি গুরু হওয়ার যোগ্য।"

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে—

পরিচর্যা-যশোলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্ন হি ॥

"শিষ্যের কাছে কেবল সেবা পরিচর্যা আর যশ লাভের বাসনা যিনি করেন তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নন।" (বিষ্ণুস্মৃতি)

শ্রীশিব পার্বতীদেবীকে বলছেন—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ ।
দুর্লভঃ সদ্‌গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥

"হে দেবি, শিষ্যের বিত্ত ধন অপহারক বহু গুরু এই জগতে আছে, কিন্তু শিষ্যের দুঃখ নাশক একজন সদ্‌গুরু দুর্লভ।"

আদি গুরু শ্রীকৃষ্ণ থেকে যাদের পরম্পরার ধারা নেই, যারা কলির চতুর্বিধ আড্ডায় জড়িত অর্থাৎ, যারা মাছ মাংস খায়, দোক্তা খৈনি চা জর্দা তামাক বিড়ি সিগারেট গাঁজা খায়, যারা জুয়া ভাগ্যলটারী খেলে, অবৈধ যৌনতায় জড়িত তারা গুরু পদবাচ্য হয় না। যাঁরা কলিযুগের যুগধর্ম ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে উপদেশ দেন না, শাস্ত্র বহির্ভূত নিজেদের মনগড়া নাম কীর্তন করেন তাঁরা নিশ্চয় গুরু পদবাচ্য নন।

প্রশ্ন ৫৬। কোন্ অবস্থায় গুরু পরিত্যাজ্য হয়?

উত্তর ঃ সাধারণত ভগবৎ প্রতিনিধি গুরুদেব পরিত্যাজ্য হন না। তবে ভুলক্রমে কাউকে গুরুরূপে গ্রহণ করা হলে তিনি যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধাচারী হন তবে নির্দ্বিধায় শাস্ত্রীয় নির্দিষ্ট পন্থায় সেই গুরুব্রুবকে ত্যাগ করে সদ্‌গুরু গ্রহণ করতে হয়।

শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে অযোগ্য কুলগুরুকে পরিত্যাগ করতেই নির্দেশ দিয়েছেন।

পরমার্থগুর্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক গুর্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্তব্য ॥ (ভঃ সঃ ২১০)

"ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক, অযোগ্য গুরুব্রুব পরিত্যাগ করে পারমার্থিক শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করবে।"

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥

"স্ত্রীসঙ্গী কৃষ্ণভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করলে নরক গমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর নিকটেই মন্ত্র গ্রহণ করবে।" (হঃ ভঃ বিঃ ৪/১৪৪)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বলা হয়েছে—

স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্নীয়াদ্ দীক্ষয়া ।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তদ্দেবতাশাপ আপতেৎ ॥

"স্নেহবশত বা লোভবশত যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোন রূপ জাগতিক লাভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।" (হঃ ভঃ বিঃ ১/৫)

মহাভারতে বলা হয়েছে—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥

"জড় জাগতিক ভোগ্য বিষয়ে লিপ্ত, কর্তব্য-অকর্তব্য বিবেকরহিত, মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতর পন্থানুগামী ব্যক্তি নামে মাত্র গুরু, তাঁকে অবশ্যই পরিত্যাগ করাই বিধি।" (মহাভারত উদ্যোগ পর্ব ১৭৯/২৫)

প্রশ্ন ৫৭। ভক্ত ও কর্মীর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ যাদের জীবনের কেন্দ্র হল ভগবান শ্রীহরি, যাদের লক্ষ্য হল কৃষ্ণকৃপা লাভ করা—তারাই ভক্ত। আর যাদের জীবনের কেন্দ্র হল জাগতিক সম্পদ, যাদের লক্ষ্য হল ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করা—তারাই কর্মী বা অভক্ত।

সজ্জন তোষণীতে (১১/১১) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এক রচনা থেকে জানা যায় যে ১) কর্মবাদী ব্যক্তিরা ভক্ত নয়। তারা অভক্ত। কৃষ্ণকৃপা লাভের জন্য যদি কেউ কর্ম করে, তবে সেই কর্মের নামই ভক্তি। কর্মীরা কৃষ্ণকৃপা অনুসন্ধান করে না। কখনও বা যদি তারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান করে, তবুও তাদের মূল তাৎপর্যই হল কি করে জড় সুখ লাভ হয়।

২) যোগীরা কোথাও জ্ঞানের ফল মোক্ষ এবং কোথাও কর্মের ফল ঐশ্বর্য এরূপ অনুসন্ধান করে বেড়ায়। তাতে তাদেরকে অভক্তই বলা যায়।

৩) বহু দেবদেবীর পূজকদের পরমেশ্বরের অনন্য শরণাপত্তি না থাকায় তাদেরকেও অভক্ত বলা যায়।

৪) শুষ্ক ন্যায়-শাস্ত্রবিদ্ নানা তর্কেই কেবল আসক্ত থাকে। তারা ভগবদ্ বহির্মুখ। অর্থাৎ, অভক্ত।

৫) যারা সিদ্ধান্ত করে যে, ভগবান একটি কাল্পনিক তত্ত্ব মাত্র। তাদের তো কথাই নেই।

৬) যারা বিষয়ে আসক্ত হয়ে ভগবানকে মনে করতে অবসর পায় না, তারাও অভক্ত মধ্যে গণ্য।

এইসব অভক্তদের সংসর্গ করলে ভক্তদের অতি অল্পকালের মধ্যেই সৎ বুদ্ধি বিনষ্ট হয়। কর্মীদের ভক্তিবিমুখ প্রবৃত্তি এসে ভক্তের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে।

যদি কারও শুদ্ধ ভক্তি পেতে বাসনা থাকে তবে সে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অভক্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করবে।

প্রশ্ন ৫৮। বৈষ্ণব কি কখনও ঘৃণ্য কর্ম করতে পারে?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, বৈষ্ণব-অপরাধীরা ঘৃণ্য কর্ম করে বসে। বৈষ্ণব চরণে অপরাধ হেতু মানুষের হিতাহিত জ্ঞান কাজ করে না। কাম, ক্রোধ ও রজোগুণের প্রবলতায় মানুষ উন্মাদগ্রস্ত হলেই তার ঘৃণ্য নিন্দিত অনুচিত কর্মেও প্রবৃত্ত হতে সংকোচ হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন, কেউ যেন কখনও বৈষ্ণব অপরাধ না করেন। এটি মত্ত হস্তীর মতো, কৃষ্ণভক্তিলতা ছিঁড়ে ফেলতে পারে, উপড়িয়ে ফেলতে পারে। কৃষ্ণ ভক্তিসম্পর্কিত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে গেলেই কৃষ্ণভক্তিবিঘ্নকর ক্রিয়াকলাপের জন্ম হতে থাকে।

প্রশ্ন ৫৯। 'সপ্ত শল্য' কি জিনিস?

উত্তর ঃ সপ্ত মানে সাত, শল্য মানে কাঁটা বা যন্ত্রণা। সাত রকমের কাঁটা ভক্তিরাজ্যে যাতনা বা পীড়াদায়ক।

দেবর্ষি নারদ পরম ভক্ত। সর্বদা সর্বত্র কৃষ্ণনাম গান করে চলেন। সপ্ত শল্য প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি এরকম—

নৃপো ন হরিসেবিতা ব্যয়কৃতী ন হর্যর্পকঃ
কবির্ন হরিবর্ণক শ্রিতগুরুর্ন হর্যাশ্রিতঃ ।
গুণী ন হরিতৎপরঃ সরলধীর্ন কৃষ্ণাশ্রয়ঃ
স ন ব্রজরমানুগঃ স্বহৃদি সপ্ত শল্যানি মে ॥

"দেখ, (১) যে *রাজা* হয়েও সর্বব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীহরির সেবা করে না,

(২) যে *ধনী* হয়ে বহু খাতে ব্যয় ও দান করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্যে কিছুই করতে চায় না,

(৩) যে *কবি* বহু সুখ-দুঃখ নিয়ে জাগতিক বিচিত্র কাব্য রচনা করে, অথচ শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-রূপ-মহিমা-লীলা-পরিকর-ধাম-উপদেশ বর্ণনা করে না,

(৪) যে ব্যক্তি গুরু অবলম্বন করেছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভজনসাধন করে না,

(৫) যে *গুণী* ব্যক্তি এই জগতে সবার শ্রদ্ধেয় মান্য পূজ্য হয়েছেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত নন,

(৬) যে ব্যক্তি অত্যন্ত *সরল* বুদ্ধি বলে গণ্য হয়েছেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম অবলম্বন করে না,

(৭) যিনি নিজেকে *কৃষ্ণভক্ত* বলেও মানেন, কিন্তু ব্রজগোপীগণের অনুগামী নন,

এই সাতটি বিষয় আমার হৃদয়ে অসহ্য শল্য সদৃশ বা বিদ্ধ কাঁটার মতো।" (গোপালচম্পূ পূর্ব ২/৩৩/১৭৮)

প্রশ্ন ৬০। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের গুণ কি?

উত্তর ঃ শুদ্ধ ভক্তের সবচাইতে মহত্ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি লম্পট বা অসংযমী নন, এবং তাঁর আর একটি গুণ হচ্ছে যে, তিনি সর্বদা অপরের দুঃখ দূর করার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন। জীবের সবচেয়ে জঘন্য দুর্দশা হল তার কৃষ্ণবিস্মৃতি অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে থাকা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা সকলের হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করার চেষ্টা করেন। আর সেইটি হচ্ছে সমগ্র ক্লেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। (ভাঃ ৩/১৪/৪৯ প্রভুপাদ তাৎপর্য)

প্রশ্ন ৬১। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪/৮/৫৪ শ্লোকের তাৎপর্যে লেখা আছে—যাঁরা ব্রাহ্মণ নন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) প্রণব বা ওঁকার মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন না। তা হলে, অব্রাহ্মণেরা কেন এই প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে না? তবে কি তারা ঐ মন্ত্র বাদ দেবে?

উত্তর ঃ ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরাই প্রণব মন্ত্র উচ্চারণের যোগ্য। তাঁদেরই ব্রাহ্মণ বলা হয় যাঁদের মধ্যে শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই গুণগুলি রয়েছে। (গীতা ১৮/৪৩)

অব্রাহ্মণ বলতে যাদের মধ্যে এই গুণগুলি নেই তাদেরই বোঝায়। তারা প্রণব মন্ত্র উচ্চারণে উপযুক্ত নয়। কারণ মন্ত্র হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম। সেই মন্ত্র উচ্চারণ করব এবং একই সঙ্গে তামসিক আচরণ বজায় রাখব—পাপকর্ম করে চলব; তা হলে সেক্ষেত্রে নাম-অপরাধরূপ মহা অপরাধ হয়।

যেমন দেখা যায়, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও মানুষ পাপ আচরণ করছে। শ্রীবিষ্ণুর পূজা আরাধনা করছে এবং একই সঙ্গে তামসিক ব্যক্তিদের মতো মাছ-মাংস খাওয়া, ধূমপান, খৈনি সেবন, নোংরা ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি বদ্ আচরণ করে চলেছে। সেই সব ব্যক্তি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের অযোগ্য বলেই বিবেচিত।

কিন্তু কেউ যদি বৈষ্ণব মন্ত্র বা বৈষ্ণব-পন্থায় শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তখন তিনি অবশ্যই প্রণব মন্ত্র জপ করতে পারেন।

অতএব সদ্গুণগুলি ত্যাগ করে মন্ত্র উচ্চারণ করা বাদ দিতে হবে—এমন কোনও ইঙ্গিত উক্ত শ্লোকের তাৎপর্যে নেই। বরং সদ্গুণগুলি আয়ত্ত করে দিব্য মন্ত্র গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে।

যখন কেউ পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের একান্ত শরণাগত হন, তখন তাঁর শম বা মনোসংযম, দম বা বহিরিন্দ্রিয় সংযম, তপ বা তপস্যা, শৌচ বা শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা ইত্যাদি গুণগুলি আপনা-আপনি অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ৬২। কৃষ্ণভক্ত কি সত্য সত্যই ভক্তিপথ থেকে ভ্রষ্ট হতে পারে?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় ভক্তের পথভ্রষ্ট হওয়া প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥*—"হে

অর্জুন! আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, এই কথাটি দৃপ্তকণ্ঠে জগতে ঘোষণা কর।" (গীতা ৯/৩১)

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—ভক্ত সাধারণত যথাসম্ভব সচেতন থাকেন, যাতে তিনি এমন কোন কার্য না করেন যার ফলে তাঁর ভগবৎ-সেবা বাধা প্রাপ্ত হতে পারে। ভক্ত জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণভাবনায় উত্তরোত্তর অগ্রগতির উপর তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সফলতা নির্ভর করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো কখনো দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণভাবনা-পরায়ণ মানুষ এমন কাজ করে বসে, যা সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে হয়। কিন্তু এই প্রকার ক্ষণিক পতন হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভক্তিযোগের অযোগ্য হন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, অনন্যভাবে ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ মানুষ যদি পতিতও হয়, তা হলে অন্তর্যামী ভগবান শ্রীহরি তাকে নির্মল করে পাপমুক্ত করে দেন। মায়ার প্রবল মোহময়ী প্রভাবে পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিও কখনো কখনো তার দ্বারা আক্রান্ত হন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভাবনা এত অধিক শক্তিসম্পন্ন যে, তাঁর প্রাসঙ্গিক পতন দশা পরিশোধিত হয়ে যায়। সুতরাং, ভক্তিমার্গের সফলতা নিত্যসিদ্ধ। ভগবদ্ভক্তের কেবল একটি যোগ্যতা দরকার। তা হল, ভক্তিসহকারে নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবানের সেবা করার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

শ্রীনৃসিংহপুরাণে উল্লেখ রয়েছে—

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা
ভৃষমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ ।
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ
তিমিরপরাভবতাম্ উপৈতি চন্দ্রঃ ॥

অর্থাৎ, কাউকে সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে রত থেকে কখনও কখনও হীনকর্মে নিয়োজিত হতে দেখা যায়। এই ক্রিয়াকলাপ চাঁদের কলঙ্কের মতো, তাতে চন্দ্রকিরণ প্রতিহত হয় না। তেমনি, সৎপথ থেকে ভক্তের প্রাসঙ্গিক পতন তাঁকে পাপাত্মায় পরিণত করে না।

তবে, কখনোই মনে করা উচিত নয় যে, ভক্ত সবরকম নিন্দনীয় কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে। ভগবদ্ভক্তি বস্তুতপক্ষে জাগতিক মিথ্যা মোহের বিরুদ্ধে অর্থাৎ, মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সামিল। এই যুদ্ধ করতে ভক্ত যতক্ষণ না সমর্থ হচ্ছে, ততক্ষণ জড়জাগতিক বিষয় সংসর্গঘটিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

কিন্তু, উক্ত শ্লোকের দোহাই দিয়ে, পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়ে নিজেকে ভক্ত বলে মনে করা কখনই উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তি সাধন করার পরেও যদি চরিত্র শুদ্ধ না হয়, তা হলে বুঝতে হবে সে শ্রেষ্ঠ ভক্ত নয়।

প্রশ্ন ৬৩। রজকিনী ও চণ্ডীদাসের প্রেম কি বৈষ্ণব-সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে? এই বিষয়ে বিস্তারিত জানালে খুশি হব?

উত্তর ঃ বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী তাঁর পত্রাবলীতে লিখেছেন—"চণ্ডীদাস একজন নহেন। অসংখ্য সহজিয়া তাঁহার নাম লইয়া তাহাদের অসৎবৃত্তি চালাইবার জন্য নানা পদ ও গল্প রচনা করিয়াছে। কিন্তু মহাপ্রভুর কাছে যে চণ্ডীদাসের গীত হইত, সেই চণ্ডীদাসের চিত্তবৃত্তি Servitor এর চিত্তবৃত্তি মাত্র। Servitor (পরিচারক) নিজেকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠানুগ জানেন। জড় চণ্ডীদাসগণ বামাচারী বাগানের চণ্ডীদাস। কেবল বামাচারী বাগানে নহে, কালে কালে অসংখ্য জড় চণ্ডীদাস নানা স্থানে জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ-ব্যাপার লইয়া বসিয়া থাকে। বর্তমানেও চণ্ডীদাস ও রামী অবস্থায় বহু জড় কামুক চণ্ডীদাস আছে। এখনকার চণ্ডীদাসেরা আউল-বাউল প্রভৃতির দল। মোটের উপর, শ্রীরূপানুগগণের চিত্তবৃত্তি জড় ভোগবাদীরা আদৌ বুঝিতে পারিবে না।

অপ্রাকৃত দেহে মধুর রসের সেবক জড়ভোগী পুরুষাকৃতি নহে। প্রাকৃত (জড়) স্ত্রীদেহ ও অপ্রাকৃত (চিন্ময়) ভক্তিরাজ্যের চিদানন্দ দেহের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে, উহাই শুদ্ধ ভক্ত চণ্ডীদাসের মত। আধ্যক্ষিক বা Sensuous (জড় ইন্দ্রিয়গত) বিচারে যে চণ্ডীদাস, তাহা শুদ্ধ ভক্ত চণ্ডীদাস নহে। আধ্যক্ষিকগণ অপ্রাকৃত চণ্ডীদাসকে চিনিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।" (২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আরও মন্তব্য করেছিলেন যে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং জয়দেবের গ্রন্থাবলী থেকে কেবলমাত্র শ্রীরামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদরের মতো পরমহংসদেরই অধিকার রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অনুকরণ করে সাধারণ মানুষদের এই বিষয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তিবিহীন ইন্দ্রিয়-তর্পণ পরায়ণ তথাকথিত শিক্ষিত মানুষেরা এবং জড়জাগতিক কবিতার সমালোচক ছাত্ররা এই অতি উচ্চ স্তরের সাহিত্য পাঠ করার অযোগ্য।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে, জড় বিষয়াসক্ত সমালোচকেরা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং জয়দেবের অপ্রাকৃত ভগবৎ-লীলা গীতির যে আলোচনা করেন তার ফলে জনসাধারণ লম্পটে পরিণত হয় এবং জগতে ব্যভিচার ও নাস্তিকতা বৃদ্ধি পায়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসকে প্রাকৃত জড়জাগতিক নায়ক-নায়িকার কামক্রীড়া বলে মনে করে ভুল করা উচিত নয়। তাই যারা দেহাত্ম-বুদ্ধি যুক্ত এবং ইন্দ্রিয় তর্পণ পরায়ণ, তাদের ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের লীলার যে-কোন রকমের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। (চৈঃ চঃ আদি ১৩/৪২ তাৎপর্য)

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছেন—

রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি ।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি ॥

অর্থাৎ, "শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার আকুলতা আমার কবে হবে এবং তার ফলে কবে আমি রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রেম হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব?" কিন্তু সমাজে নানাবিধ অপসম্প্রদায়ের দল সহজেই চণ্ডীদাসের শুদ্ধ প্রেম অনুকরণ করে তার বিকৃত প্রকাশ ঘটাচ্ছে, যা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রশ্ন ৬৪। গুরুর আগে সৎ অর্থাৎ সদ্‌গুরু, ভক্তের আগে শুদ্ধ অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্ত, শুদ্ধ নাম ইত্যাদি শব্দগুলি ভাগবতের শ্লোকগুলির তাৎপর্যের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তা হলে অসদ্‌গুরু, অশুদ্ধ ভক্ত, অশুদ্ধ নাম আছে, না কি?

উত্তর ঃ জগতে অনেক তথাকথিত গুরু আছেন, যাঁরা বহু জনের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে বসে আছেন, দিন দিন লোকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করছে। সেই তথাকথিত গুরুরা অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাতে পারেন, অথচ তাঁরা আমাদের পারমার্থিক জগতের পথপ্রদর্শক নন, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ নন, কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে তৎপর নন। বহু তথাকথিত গুরু আছেন, যাঁরা নিজেদের ভগবান বলে মনে করেন। যদিও তাঁরা গুরু হওয়ার উপযুক্ত নন, তবু গুরুরূপেই বহু জনগণের পূজা গ্রহণ করছেন।

কিন্তু পারমার্থিক গুরুদেব এই জগতে আবির্ভূত হন, বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। গুরুদেব ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভাবনাময়। তিনি বেদবিরুদ্ধ আচরণকারী নন। কলির চতুর্বিধ আড্ডার মধ্যে তিনি জড়িত নন, মাছ মাংস ডিম খাওয়া, চা বিড়ি সিগারেট তামাক জর্দা খৈনি সেবন, তাস পাশা দাবা জুয়া লটারী খেলা, অবৈধ পুরুষ বা স্ত্রী সঙ্গ—এই সমস্ত ব্যাপারে পারমার্থিক গুরু জড়িত নন।

কিন্তু কৃষ্ণভক্তি-প্রতিকূল, পারমার্থিক পথের জঞ্জাল নিয়ে যাঁরা গুরু সেজে বসে আছেন, তাঁরা অসদ্ আচারী। সেই সমস্ত তথাকথিত গুরু থেকে পার্থক্য বোঝাতে সদ্‌গুরু কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে আমরা যাকে তাকেই মনের মতো গুরু বলে না ভেবে বসি।

জাগতিক একটি উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন—বিজ্ঞাপনে 'খাঁটি ঘি', 'খাঁটি সরিষা তেল' দেখা যায়। এই কথার মানে হচ্ছে বাজারে এমন সব ঘি আর সরিষা তেল পাওয়া যায়, যা আসলে খাঁটি নয়। সেগুলি নামে ঘি বা সরিষা তেল বটে, কাজের ক্ষেত্রে সেগুলি বিদ্‌ঘুটে কোনও কিছু। তাই বস্তুর শুদ্ধতাকে ইঙ্গিত করার জন্য বিশেষত 'খাঁটি' কথাটি ব্যবহার করা হয়।

শুদ্ধ ভক্তি বলতে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যেই সব কিছু করেন, নিজের জন্য কোনও বাসনা করেন না। সকাম ভক্তরা কৃষ্ণভক্তি করে নিজেদের জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ঐশ্বর্য ইত্যাদির জড় কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত সম্পূর্ণ নিষ্কাম কৃষ্ণপরায়ণ।

শুদ্ধ নাম বলতে বোঝায় অপরাধশূন্য হরিনাম। বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নির্দেশ করেছেন—

অপরাধশূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণনাম ।

কিন্তু, শ্রীনামের ক্ষেত্রে দশ রকমের অপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন, (১) যাঁরা বিশ্ব জুড়ে ভগবানের নাম মহিমা প্রচারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে নিন্দাবাদ করা, (২) দেব-দেবীর নাম ভগবানের নামের সমান বলে মনে করা

(৩) পারমার্থিক গুরুদেবকে অবজ্ঞা করা, (৪) বৈদিক শাস্ত্রের নিন্দা করা, (৫) নাম মাহাত্ম্যকে কাল্পনিক মনে করা, (৬) ভগবদ্ নামে অর্থবাদ আরোপ করা, (৭) নামবলে পাপ করা, (৮) হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করাকে বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় কোনও পুণ্য কর্ম বলে মনে করা, (৯) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামমহিমা উপদেশ করা, (১০) নাম মাহাত্ম্য শুনেও নামের প্রতি বিশ্বাস না থাকা এবং জড় আসক্তি বজায় রাখা, এই সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে যিনি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তাঁর সেই নামই শুদ্ধ নাম।

প্রশ্ন ৬৫। 'কলিযুগে ব্রাহ্মণকুলে রাক্ষসরা জন্ম গ্রহণ করবে,' এই রকম কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। রাক্ষস কেন?

উত্তর ঃ রাক্ষসরা আমিষভোজী প্রাণী। অন্য প্রাণীর রক্ত-মাংসে খেতে তারা অভ্যস্ত। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলতে বোঝায় যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ, ভগবানের কথা জানেন, ভগবদ্ বিধিনিষেধ পালন করেন এবং জনসমাজকে বিধিনিষেধ শিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁরা নিজেরাই মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি ভক্ষণ করতে অভ্যস্ত। তাই তাদের রাক্ষস বলা হয়েছে। তবে, গুরু বৈষ্ণব কৃপায় অনেকেই শুদ্ধ ভক্তিময় জীবন যাপন করছেন, সন্দেহ নেই। তাই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেই যে রাক্ষস হবে—এরূপ বলা হয়নি। কলিযুগে অনেক পরম পূজনীয় জনও ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণগণ কখনই আমিষজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন ৬৬। আত্মা ও মন কি এক? 'মন যা চায় তাই খাও' কথাটি কি ধরনের?

উত্তর ঃ বৈদিক শাস্ত্রে একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আত্মা, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, দেহ এগুলির পার্থক্য বোঝানো হয়েছে। একটি রথ। সেই রথের উপর আরোহী বসে আছে। সেই রথটিকে চালনা করছে সারথী। পাঁচটি ঘোড়া রথটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াদের লাগাম গুলি হাতে ধরে সারথী ঘোড়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

আমাদের দেহটি হচ্ছে রথ। এই দেহের মধ্যে রয়েছে 'আমি' বা আত্মা। দেহরূপ রথের আরোহী আত্মা। দেহরূপ রথটি চালনা করছে সারথী বুদ্ধি। এই দেহরূপ রথটি পাঁচটি ঘোড়ারূপ ইন্দ্রিয় সমন্বিত। অর্থাৎ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। বুদ্ধি ঘোড়ারূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে লাগাম রূপ মন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করছে। মনকে লাগামের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

বুদ্ধি রূপ সারথী যদি বিকৃত হয়, অর্থাৎ, ঠিক না থাকে তবে সে লাগাম ধরে থাকলেও ঘোড়া গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। বিবেক বুদ্ধি অনুসারে তেমনই মনটা যদি চলে তবে দুর্বার ইন্দ্রিয় গুলিকে সংযত করা সম্ভব হয়। স্বভাব চঞ্চল ঘোড়া গুলি জাগতিক উদ্দীপনায় যথেচ্ছাচার করতে পারে, নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিপজ্জনক ভাবে চলতে পারে। তখন অকালে রথ ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সারথী বিকারগ্রস্ত হয় এবং আরোহী আতঙ্কিত ভাবে অসহায় বোধ করতে থাকে। আমাদের চক্ষু কর্ণ

নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক যথাক্রমে জড় জাগতিক রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ সুখভোগের দিকে দুর্বারিত ভাবে ধাবিত হলে ভজন সাধনের উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ দুর্লভ নরদেহটি অকালে নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। মোহগ্রস্ত বুদ্ধি ভ্রষ্ট জীবন খুবই বিপজ্জনক। শেষে হতাশাচ্ছন্ন জীব জন্ম মৃত্যুর ভব সংসারে ত্রিতাপ দুঃখে জর্জরিত হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—মনই আত্মার বন্ধু। মনই আত্মার শত্রু। নিয়ন্ত্রিত মন বন্ধু। অনিয়ন্ত্রিত মন শত্রু। ভগবান আরও বলেছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মানো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥

'মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার মনের দ্বারা নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করা। মনের দ্বারা আত্মাকে (নিজেকে) অধঃপতিত করা কখনই উচিত নয়। মন জীবের অবস্থা ভেদে বন্ধু ও শত্রু হয়ে থাকে।' (গীতা ৬/৫)

অমৃতবিন্দু উপনিষদে বলা হয়েছে—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গো মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং মনঃ ॥

"মনই মানুষের বন্ধন অথবা মুক্তির কারণ। বিষয়ের প্রতি মনের অনাসক্তি হচ্ছে মুক্তির কারণ।" (অঃ বিঃ উঃ ২)

আমাদের আধুনিক সমাজে একটি গ্রাম্য বুলি শোনা যায়—'মন যা চায় তাই খাও। আত্মা নারায়ণ সুখী হলে সবই সুখময় হয়।' এই ধরনের কথা ভগবদ্ বিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ নাস্তিক বিষয় ভোগ-লোলুপদের মনগড়া বুলি মাত্র। কলির মানুষের মন সর্বদা কলুষিত হতে চায়। যেমন জল সর্বদা নিম্ন দিকে যেতে চায়। শিশু সর্বদা ধুলো কালি খেলতে চায়। তেমনই মন সর্বদা পাপাচার করতে চায়। নেশা করা, অবৈধ সঙ্গ করা, আমিষ আহার, জুয়াখেলা—এই সমস্ত শাস্ত্র নিষিদ্ধ পাপাচারে মত্ত হতে চায়। মন যা চায় তাই করো কথাটিতে—পাপাচারে মত্ত থাকলেও ক্ষতি নেই এই রকম বদ্‌বুদ্ধি পোষণ করে। ফলস্বরূপ অবশ্যম্ভাবী নরকগামী হতেই হবে।

আত্মা নারায়ণ সুখী হলে সবই সুখময় হয়। এই রকম কথাটিতে আত্মাকে নারায়ণ জ্ঞানে অর্থাৎ, নিজেকে ভগবান মনে করে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে জীবাত্মা স্বরূপত ভগবানের দাস মাত্র। কিন্তু দাসই নিজে প্রভু হতে চায়। প্রভুর সুখ বিধান না করে নিজেই সুখী হতে চায়। ভগবানের নির্দেশ না মেনে নিজের সুখভোগ চরিতার্থ করতে চায়। একটি আসুরিক মতবাদ আছে—*যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।* যতদিন বাঁচো সুখে বেঁচে যাও। ঋণ করেও ঘি খেয়ে যাও। সারাটা জীবন ঋণ করো, আর যাই করো ভোগ করে যাও। ঋণ শোধ করার কথা নেই। এই ধরনের অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিরা সমাজে ছেয়ে গেছে।

আর এক ধরনের বুলি শোনা যায়। 'যা খুশি তাই কর, মুখে হরিনাম কর।' অর্থাৎ, পাপপুণ্য ধর্ম-অধর্ম যা ইচ্ছা—যা তোমাকে করতে সুখ হয় তাই-ই করো। আর যদি

নরকের ভয় থাকে তবে উদ্ধার পাওয়ার জন্য হরিনামটা মুখে করতে পারো। অথচ এই বুলিকারদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বহু পূর্বে পাপ করা আর নাম করা বিষয়ে মহর্ষি ব্যাসদেব হরিনামের দশবিধ অপরাধের ধারায় ৭ নম্বরে অপরাধী হয়ে দুর্ভোগ ভুগতে হবে বলে নির্দেশ করে গেছেন।

প্রশ্ন ৬৭। বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের ভগবদ্ভক্তি কি একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়?

উত্তর ঃ না, প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের ব্যক্তিদের মধ্যে ভক্তিরও প্রকার ভেদ রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৯/৮-১২) ভগবান মাতা দেবহূতিকে বলছেন, "ক্রোধী, ভেদদর্শী, হিংসাপরায়ণ, দাম্ভিক ও মাৎসর্যপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রতি যে ভক্তি করে, তা তামসিক।" এই ধরনের মানুষ নিজেকে বড় ভক্ত মনে করে এবং অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ থাকে। অপরের ভাল দেখে তার সহ্য হয় না।

"যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়, খ্যাতি ও ঐশ্বর্যের উদ্দেশ্যে ভেদদর্শী হয়ে আমার পূজা করে, তার সেই ভক্তি রাজসিক।" এই ধরনের মানুষ আপন জড়সুখ ভোগের বাসনা করে, নিজে ঐশ্বর্যশালী ও যশস্বী হওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবানের কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

"যে ব্যক্তি তার সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবানের পূজা করে, নিজের কর্মের ফল ভগবানকে নিবেদন করে, তার সেই ভক্তি সাত্ত্বিক।" এই ধরনের মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে, এমন সব কর্ম করা হয়েছে যা জীবনের গতিপথে দুঃখদায়ক হবে, অতএব আপন মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্মফল সে ভগবানকে নিবেদন করে।

কিন্তু এই তিন শ্রেণীর মানুষের ভক্তির মধ্যে 'পৃথক ভাব' বা 'ভেদদর্শী' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে 'ভেদদর্শী' হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তার নিজের স্বার্থ ভগবানের স্বার্থ থেকে ভিন্ন বা পৃথক বলে দর্শন করে। একজন মিশ্রভক্ত বা একজন রাজসিক কিংবা তামসিক ভক্ত মনে করে যে, ভগবানের কাজ হচ্ছে তাঁর ভক্তদের চাহিদা মেটানো। এই প্রকার ভক্তদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য ভগবানের কাছ থেকে যতখানি সম্ভব আদায় করে নেওয়া। এই হচ্ছে ভিন্নদর্শী বা ভেদদর্শীর মনোভাব।

প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধভক্তির বর্ণনা হচ্ছে, ভগবানের মন ও ভক্তের মন এক হবে। সেটিই একাত্মতা। অর্থাৎ, ভক্তের স্বার্থ বা ইচ্ছা এবং ভগবানের স্বার্থের চিন্তা ভিন্ন নয়। শুদ্ধভক্ত নিজের স্বার্থকথা চিন্তা করে না, ভগবানের ইচ্ছার কথাই চিন্তা করে।

এই 'ভেদদর্শীর' ব্যাখ্যা এই নয় যে, ভগবান ও ভক্ত এক। তা নয়। একমাত্র ভগবানের স্বার্থে কর্ম করা ছাড়া শুদ্ধভক্তের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

জড়-জাগতিক লাভ পূজা যশ মান প্রতিষ্ঠার আশা নিয়ে যে ভক্তি, তা জড়গুণমিশ্রিত ভক্তি। তা বিশুদ্ধ ভক্তি নয়। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছিলেন, প্রকৃতির

তিনটি গুণ—স্বত্ত্ব, রজঃ ও তম। নববিধা ভক্তি হল—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই প্রতিটি ভক্তি-অঙ্গকে তিন-তিনটি গুণাত্মক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন শ্রবণ তমোগুণে, রজোগুণে ও সত্ত্বগুণে; কীর্তন রজোগুণে, তমোগুণে ও স্বত্ত্বগুণে ইত্যাদি। এই তিন গুণকে এভাবে নয় ভক্তিঅঙ্গ দিয়ে গুণ করে সাতাশ রকমের ভক্তি হয়, সেই সাতাশকে আবার তিন দিয়ে গুণ করলে একাশি হয়।

শুদ্ধভক্তি স্তরে উপনীত হতে হলে এই অসংখ্য মিশ্রগুণের ভক্তি অতিক্রম করতে হয়। শুদ্ধভক্তি—*অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*—মায়িক জগতে কোন কিছু চায় না। *ভক্তিরহৈতুকী*—কোন বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য এই ভক্তি নয়। নিছক ভগবৎ প্রীতি উদ্দেশেই ভক্তি।

প্রশ্ন ৬৮। ভক্তি কাকে বলে?

উত্তর ঃ কায়-মনো-বাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই ভক্তি। *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে* (নারদপঞ্চরাত্র) আমাদের সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মন দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাকে ভক্তি বলা হয়। যেমন চক্ষু দিয়ে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের রূপ দর্শন করা, কর্ণ দিয়ে ভগবানের কথা শ্রবণ করা, নাসিকা দিয়ে ভগবানের অর্চাবিগ্রহে নিবেদিত গন্ধপুষ্প আঘ্রাণ করা, জিহ্বা দিয়ে ভগবানের চরণামৃত সেবন, মহাপ্রসাদ আস্বাদন করা, ভগবানের নাম কীর্তন করা, হাত দিয়ে ভগবানের মন্দির মার্জনাদি করা, ভগবানের সেবার্থে পদচালনা পায়ের সার্থকতা, ভগবানের মহাপ্রসাদে উদরভরণ উদরের সার্থকতা। ভগবানের সেবা বিস্তার করার চিন্তাই বুদ্ধির সার্থকতা। এইভাবে কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণপ্রীতিসেবাই ভক্তি নামে আখ্যাত।

প্রশ্ন ৬৯। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আমাদের কি করা উচিত?

উত্তর ঃ পঞ্চ ইন্দ্রিয় কৃষ্ণসেবায় যুক্ত করা উচিত। যেমন, চক্ষু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট বা শ্রীমূর্তির রূপ দর্শন করা, কর্ণ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কথা, ভক্তকথা বা ভক্তিগীতি শ্রবণ করা, নাসিকা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত তুলসী ও পুষ্পের সৌরভ আঘ্রাণ করা, জিহ্বা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত সেবন, মহাপ্রসাদ সেবন ও শ্রীকৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণনাম কীর্তন করা, ভক্তপদধূলি গায়ে লাগানো এবং কৃষ্ণের প্রসাদী চন্দন কপালে লেপন করা হচ্ছে ত্বক দিয়ে ভগবৎসেবার নামান্তর।

প্রশ্ন ৭০। 'গুরুকৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।' তা হলে আদিগুরু শ্রীবলরামের প্রতি ভক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও দুর্যোধন কেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর রূপে বুঝতে পারলেন না?

উত্তর ঃ ভীম ও দুর্যোধনের গদা-অস্ত্র চালনার শিক্ষক বা গুরু ছিলেন শ্রীবলরাম। দুর্যোধনের মতো অহংকারী, মাৎসর্যপরায়ণ, হিংসুক, বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি মহৎজনের সংস্পর্শে এলেও তাঁর কৃপা লাভের অযোগ্যই হয়ে থাকে। শ্রীবলরামের প্রতি দুর্যোধন

যে ভক্তিমান ছিল তা বলা যায় না। দেখা যায় সাম্ব ও লক্ষ্মণার বিবাহ সম্বন্ধ ব্যাপারে দুর্যোধন তার দলবলের সঙ্গে বলরামের নিন্দাই করেছিল। পরে বলরামের বিক্রম দেখে আতঙ্কিত হয়ে বলরামের কথা সমর্থন করেছিল মাত্র।

যারা মূর্খ, যারা মাতাল, তারাও কখনও কখনও গুরুকৃপায় বা ভক্তকৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু যারা ধূর্ত, রাজনৈতিক চক্রান্তকারী, পরিকল্পনা করে সাধু সজ্জনকে উদ্বেগ ও আঘাত প্রদান করে, তারা কারও কৃপার অধিকারীই হয় না।

গুরুদেবের সঙ্গে শিষ্যের পারমার্থিক সম্বন্ধ থাকা দরকার। যার ফলে শিষ্য বুঝতে পারে যে, গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত। গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে চলেন। তিনি কৃষ্ণগত প্রাণ। গুরুদেবকে এভাবে দর্শন করে শিষ্য গুরুদেবের শরণাপন্ন হয়। তখন গুরুকৃপায় শিষ্য কৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করবার সুযোগ সৌভাগ্য লাভ করেন। শিষ্যের উদ্দেশ্য যদি গুরুকৃষ্ণ-কৃপালাভের দিকে না থাকে, তবে তার শিষ্যত্বের কোনও মূল্য নেই।

দুর্যোধনের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রাণ পাণ্ডবদের বিনাশ করে, কৃষ্ণ ও বলরামকে তার নিজের আনুগত্যে নিয়ে নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্যের রাজা হয়ে সুখ ভোগ করা। আমাদের কি করা উচিত, কিভাবে চলা উচিত, আমাদের কর্মগুলি গুরু বা কৃষ্ণের নির্দেশের অনুপন্থী না পরিপন্থী, দেখে নেওয়া কর্তব্য। কিন্তু আমার জড় স্বার্থ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে গুরু বা কৃষ্ণকে আমার অনুকূলে আনতে চেষ্টা করাটা বদ্‌মাশ লোকের কর্ম। অপরাধীরা গুরুকৃপা বা কৃষ্ণকৃপার পরোয়া করে না। দুর্যোধন জানত না যে, কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হন। রাজনৈতিক চক্রান্ত করে কৃষ্ণকে বন্দী করা যায় না। কূটনীতিবিদ দুর্যোধন লোকজন লাগিয়ে জবরদস্তি কৃষ্ণকে গৃহবন্দী করতে চেষ্টা করেছিল। এভাবে কখনও জড় বুদ্ধিতে গুরু-কৃষ্ণকে উপলব্ধি করা যায় না।

প্রশ্ন ৭১। চৈতন্যচরিতামৃত কিংবা অন্য কোনও শাস্ত্রে কি এরকম বলা হয়েছে যে—'খইয়া মাছের ঝোল, শুইয়া রমনীর কোল, মুখে বল হরিবোল।' যদি না বলা হয়ে থাকে, তবে লোকেরা এই কথাগুলি বলে কেন?

উত্তর ঃ প্রবাদে বলা হয়েছে, 'পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়?' ভক্তদের জন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদিন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি আমাদের জড় চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণীয় বিষয় হয় না। যখন কেউ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উন্মুখ হয়, তখন তার জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নামাদি স্বয়ং স্ফূর্তি লাভ করে।" (ভঃ রঃ সি পূর্ব ২ লহরী)

কিন্তু আত্ম-ইন্দ্রিয় তর্পণ কর্মে যে থাকে, তার মুখে হরিনাম হয় না। জড় ভোগীদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-কেন্দ্রিক বুদ্ধিতে হরিনাম কখনও অধিষ্ঠিত হন না।

জিহ্বার লালসায় অপ্রসাদ আমিষ অমেধ্য ভক্ষণ করতে যার খুব আগ্রহ, যৌনসঙ্গ সুখের প্রতি যে আসক্ত, এবং ভূরিভোজনে যে খুবই অভ্যস্ত—এই ধরনের অনর্থযুক্ত জীব শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে উপনীত হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য বলেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা ৬/২২৭) মহাপ্রভুর উক্তি—

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায় ।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে 'মন যা চায়, তাই করো' এরকম বদ্‌বুদ্ধিতে সহজিয়া অপসম্প্রদায়ের লোকেরা যারা ইন্দ্রিয় তর্পণের চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা করতেই পারে না, তারাই বসে বসে সাধারণ লোককে প্রতারণা করবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ভক্তিবিরুদ্ধ গ্রাম্য নানা রকমের প্রলাপ-ছড়া তৈরি করে থাকে।

২১
কাম ও প্রেম

প্রশ্ন ১। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি উৎপাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (১/৯/২৭) শ্লোক তাৎপর্যে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—"কাম বা অবৈধ বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হয়। ক্রোধ জয় করার জন্য ক্ষমা করতে শিখতে হয়। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা নিদ্রা জয় করা যায়। সহিষ্ণুতা গুণের দ্বারা লোভ জয় করা যায়। বিভিন্ন রোগের উৎপাত প্রতিহত করা যায় নিয়ন্ত্রিত আহারের দ্বারা। আত্ম-সংযমের দ্বারা মিথ্যা আশা থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং সঙ্গ ত্যাগ করার ফলে অর্থের অপব্যয় বন্ধ করা যায়। যোগ অনুশীলনের ফলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের ফলে জড়জাগতিক বিষয় ভোগাকাঙ্ক্ষা নিবারণ করা যায়। বিহ্বলতা জয় করা যায় খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করার দ্বারা এবং তথ্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে মিথ্যা তর্ক জয় করা যায়। মৌন ও গাম্ভীর্যের দ্বারা বাচালতা বর্জন করা যায় এবং বীর্যের দ্বারা ভয় জয় করা যায়। আত্ম-অনুশীলনের দ্বারা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, জড়জাগতিক সমস্ত রকমের পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভের জন্য কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বপ্ন ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।"

প্রশ্ন ২। আর্তের সেবা, অসহায় ব্যক্তিদের উদ্ধার, পীড়িতের শুশ্রূষা সর্বোপরি জীব নির্বিশেষে প্রীতি ও ভালবাসা প্রদর্শনই ঈশ্বর লাভের প্রথম ও শেষ সোপান; না কি নিরিবিলি জায়গায় শান্ত মনে ঈশ্বরের নাম জপ ও কীর্তন করা ঈশ্বর লাভের প্রথম ও শেষ সোপান?

উত্তর ঃ আমাদের সর্বপ্রথমে জ্ঞান থাকা উচিত যে, আমরা এই ক্ষণস্থায়ী দেহ নই, স্বরূপে আমরা চিরন্তন আত্মা। আত্মার বৃত্তি হচ্ছে ভগবানকে ভালবাসা। আমাদের স্বরূপ চিন্তা বাদ দিয়ে, পরম নিয়ন্তার সঙ্গে আমাদের প্রীতির সম্পর্ক বাদ দিয়ে, আমাদের আশেপাশে আর্ত পীড়িত—যাদের আয়ুষ্কাল খুব বড় জোর ৭০ কি ৮০ বছর তাদেরকে কিছু খাবার, কিছু টাকা, কিছু ঔষধ, কিছু সান্ত্বনা আর কিছু বিপদে-আপদে সাহায্য করে দিলেই পরোপকার হয়ে গেল—এটা এ যুগের একটি ভ্রান্ত ধারণা।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরোপকার করার শিক্ষাটাই পরম ও চূড়ান্ত শিক্ষা। তা হল নিছক কিঞ্চিৎ ক্ষণিক লোকসেবা না করে, নিরিবিলিতে ভগবানের ধ্যান না করে, বিশ্ববাসী প্রত্যেকের ঘরে ঘরে কৃষ্ণনামামৃত, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণমহিমা প্রচার করা। এতে যদি কেউ একটুও পরম নিয়ন্তার কথা চিন্তা করে, অমনি সে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন চর্চা শুরু করবে, এবং তার ফলস্বরূপ, জাগতিক কোন দুঃখ যন্ত্রণাই তাকে মোটেই হতাশ

করবে না, উপরন্তু ভগবদ্ভক্তিময় জীবন-যাপন প্রণালীতে সে দুঃখময় জগৎ থেকে উদ্ধার পেয়ে ভগবানের নিত্য আনন্দময় ধামের অধিবাসী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। কৃষ্ণভাবনাময় জীবন মানেই হল প্রকৃত আনন্দময় জীবন।

কিন্তু নেহাৎ ক্ষণস্থায়ী কিছু পরোপকারের নামে কারো কিছু সেবা করার পর তার অবস্থার কি হয়?—তা জানা আবশ্যক। তার জড় দেহ যতক্ষণ আছে, বড় জোর ততক্ষণ তাকে বহু কষ্টে কিঞ্চিৎ সুখ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু জন্মান্তর চক্র বা কর্মকীর্তি অনুসারে সে হয়তো এক কোটি বছর নরক ভোগ করল। তখন তার এই মানব দেহ ধারণ কালে কয়টি বছরে আমি যে উপকার করলাম—সে সেবার কী-ই বা মূল্য থাকল? তা কীসেরই বা ভালবাসা হল?

আর প্রকৃত বা আসল ভালবাসা জীবেদের মধ্যে কোন দিনও সম্ভবপর হয় না। ভালবাসার পরম আধার হচ্ছেন পরমাকর্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। জীবে জীবে কেবল কামই হয়। কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য, পাঁচদশ জনের বাহবা পাওয়ার জন্য, প্রতিষ্ঠা অর্জন করার জন্য লোকে অনেক কিছু করে বসে। এর মূলে কামনা-বাসনাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে। কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে বাধা-বিপত্তি ঘটলে ভালবাসার ইতি ঘটে। ভোগবাদী সমাজে কামনা-বাসনার ব্যাঘাতের ফলেই সমস্ত ভালবাসা নিমেষের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়, তার প্রমাণ সচরাচরই দেখতে পাওয়া যায়—ভ্রাতৃবিরোধ, একঘরে করা, ত্যাজ্যপুত্র, বয়কট, বিবাহবিচ্ছেদ, বধূ নির্যাতন, অপহরণ, মাতৃপিতৃ অবজ্ঞা, রক্তপাত, খুনখারাপি, আত্মহত্যা, যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, দলবাজী, দাঙ্গা সবই চলছে। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা কাউকে হতাশ করে না, কাউকে উত্তেজিত করে না, কাউকে বিরক্ত করে না এবং তা নিছক কয়েক ঘণ্টার সান্ত্বনাও নয়।

বরং আসল ভালবাসা এই জীবনে কেন, জন্মজন্মান্তরেও নষ্ট হয় না। কারণ প্রকৃত ভালবাসা ভগবানের সঙ্গেই সংযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি যাদের আছে, তারা নেশাভাঙ, অবৈধ যৌনতা, জুয়ার আড্ডা, পশুমাংস খাওয়ার প্রতি কখনোই আগ্রহী নয়। তারা যখন ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রদান করে কলিযুগের যুগধর্ম সর্বদুঃখ হরণকারী দিব্য হরিনাম কীর্তন, পরম নিয়ন্তার নির্দেশাবলী, তাঁর লীলাবিলাসের কাহিনী, তার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ ইত্যাদি কথা জানায় তখন তা মানুষ বুঝতে চেষ্টা করে এবং কৃষ্ণভাবনাময় জীবন গঠনে আগ্রহী হয়। ভগবদ্মুখী জীবনধারা গ্রহণ করার ফলে, ক্রমে ক্রমে সে জন্মমৃত্যুর চক্রকে অতিক্রম করে ভগবদ্ধামে পৌঁছাবে এবং সেখানে গেলে কোনদিনই তাকে আর এই দুঃখময় অনিত্য জগতে ফিরে আসতে হবে না। সেই ভগবদ্ধামে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির লেশমাত্রও নেই, রয়েছে শুধু চিন্ময় আনন্দ। তাই, দরিদ্রকে অন্ন-বস্ত্র দান করার মতো আপেক্ষিক সাহায্যের প্রশ্নও সেখানে ওঠে না।

প্রশ্ন ৩। ভোগ আর ত্যাগ—কোন্‌টা আমাদের দরকার?

উত্তর ঃ আমাদের বিষয়ভোগের বাসনা বা ভুক্তিস্পৃহা হল ক্লেশপূর্ণ সংসার বন্ধনের কারণ এবং ত্যাগের বাসনা বা মুক্তিস্পৃহা হল সংসার বন্ধন ছিন্ন করার কারণ। কিন্তু

শাস্ত্রে এই ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা—এই দুটিকে পিশাচীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারণ যারা ভুক্তি চায় কিংবা মুক্তি চায়, তারা তাদের প্রকৃত কৃষ্ণভক্তিময় সত্তাকে নষ্ট করতে চায়।

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে ।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

অর্থাৎ, 'ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা এই দুই পিশাচী যতক্ষণ কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্তমান থাকে, ততক্ষণ তার হৃদয়ে কোনভাবে ভগবদ্ভক্তি-সুখের উদয় হতে পারে না।' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২)

অভক্তরাই ভুক্তি কিংবা মুক্তি চায়। কিন্তু ভগবানের ভক্তরা ভগবানের শুদ্ধসেবা চায়, মুক্তি চায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৯/১৩) উল্লেখ আছে—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

ভগবান বলেছেন, 'আমার সেবাপরায়ণ ভক্তদের সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও একত্ব বা সাযুজ্য (অর্থাৎ, যথাক্রমে ভগবানের লোকে বাস করা, ভগবানের মতো ঐশ্বর্য লাভ, ভগবানের সাথে থাকা, ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্তি এবং ভগবানের সাথে মিশে যাওয়া)—এইরকম পাঁচ প্রকারের মুক্তি দান করলেও আমার সেবাপরায়ণ ভক্তরা তা গ্রহণ করতে চায় না।'

ভক্ত জানে, শ্রীকৃষ্ণ হলেন সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষ ভগবান। তাঁর সঙ্গে আমাদের নিত্য দাসত্বের সম্বন্ধ রয়েছে। 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস' এবং প্রীতি সহকারে তাঁর সেবা করাই আমাদের একমাত্র বৃত্তি। অংশের সার্থকতা পূর্ণের সেবার মাধ্যমে। আমরা পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষের অংশ। তাই তাঁর প্রীতিবিধানের মাধ্যমে আমাদের প্রকৃত আনন্দময় সত্তার প্রকাশ ঘটে।

আমাদের কৃষ্ণসেবার অনুকূল সমস্ত বিষয় ব্যবহার করা এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বা প্রসাদরূপে ভগবৎবস্তু গ্রহণ করা উচিত। আর কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল বিষয় পরিত্যাগ করাই উচিত। ভগবান বলেছেন, "যাঁরা আমার চরণসেবায় রত ও আমার জন্য সব রকম চেষ্টা করে চলেছে, সেই ভাগবতগণের কেউই মুক্তি চায় না।" (ভাঃ ৩/৩৫/৩৪) বরং "স্বয়ং মুক্তি এসে হাত জোড় করে ভক্তের সেবা করতে চায়।" *'মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্'* (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭পৃঃ)। অভক্তরাই ভুক্তি মুক্তি চায়। ভক্ত কৃষ্ণসেবা ছাড়া স্বর্গ সুখভোগ বা সংসার মুক্তি সবই নরক বলে মনে করে। "স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।" (চৈঃ চঃ ম ১৯/২১৬) *'স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ'*—স্বর্গ, মোক্ষ, নরক ভক্তের কাছে সমান। (ভাঃ ৬/১৭/২৮)

ভুক্তিকামী, মুক্তিকামী, সিদ্ধিকামী ব্যক্তিরা ভগবৎপরায়ণ নয়, তাদের মনে অন্য অভিলাষ থাকায় তারা জড় কামের বশবর্তী হয়ে অশান্তিই পায়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *'জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি'*—'আমাকে যথাযথভাবে জানতে পারলে শান্তি লাভ হয়।' (গীতা ৫/২৯)

কিন্তু যাদের কৃষ্ণসম্বন্ধ নেই, কৃষ্ণপ্রীতি নেই, তাদের জড় বিষয় ভোগ করবার ইচ্ছা, কিংবা সমস্ত ভোগ্য বিষয় ত্যাগ করবার ইচ্ছা—সব দিক থেকেই তারা অশান্তিই লাভ করে। এ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ১৯/১৪৯) উল্লেখ আছে—

কৃষ্ণভক্ত-নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি 'অশান্ত' ॥

প্রশ্ন ৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥
—এর কারণ কি?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্)

যিনি যোগ্যতা থাকলেও নিজেকে অন্যদের অপেক্ষা অতি নীচ ও অভক্ত বলে মনে করেন, যিনি কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের জন্য প্রতিকূলতার মধ্যেও তরুর মতো সহিষ্ণু হন, যিনি মানহীনদের মধ্যেও সদ্‌গুণ জাগতে পারে এই মনে করে তাদের সম্মান দিয়ে থাকেন, তিনিই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তনের অধিকারী। অর্থাৎ, জড়জাগতিক রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য, বৈভবাদির কোনও অভিমানে যিনি ব্যস্ত নন, তিনি অপরাধমুক্ত হয়ে অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করতে সমর্থ হন এবং প্রেম লাভ করেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হয়ে আপন জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন কিংবা জাগতিক সুখ-সুবিধা ও স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে ভগবানের নাম কীর্তন করছে এবং জড়বুদ্ধি নিয়ে ভগবানের কথা শ্রবণ করছে, সেই ব্যক্তি ভগবানের প্রতি আসক্ত হয় না, সে জন্ম জন্ম ধরে শ্রবণ কীর্তন করে গেলেও কোন দিন কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে না।

প্রশ্ন ৫। 'কৃষ্ণপ্রেম যার আছে সেই সবচেয়ে বড় ধনী'। প্রেমভক্তি কিভাবে লাভ করা যায়? কিভাবে তা বর্ধিত করা যায়?

উত্তর ঃ প্রেমভক্তি সকলের হৃদয়ে রয়েছে। কেবল তাকে জাগ্রত করানোই কাজ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্য ২২/১২৮-১২৯) বলা হয়েছে—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ ॥

"শুদ্ধচিত্তে নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তদের সঙ্গ করা, ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা, মথুরাতে বাস করা এবং শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের শ্রীমূর্তির সেবা করা, এই পাঁচটি অঙ্গ সমস্ত সাধনাঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই পাঁচের অল্প প্রভাবেই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়।"

জাগতিক ধনসম্পদকে বলা হয় অর্থ, পারমার্থিক সম্পদ কৃষ্ণভক্তিকে বলা হয় পরমার্থধন। বৈষ্ণবকবি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর গেয়েছেন, 'গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন'। এই প্রেমধন লাভ হয় কৃষ্ণভক্তি বিধি অনুশীলন করতে করতে ক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের প্রতি হৃদয়ের টান ও প্রীতিমূলক সেবায় আত্মনিয়োগের মাধ্যমে। স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ স্তরে না আসা অবধি অবশ্যই সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে বৈধীভক্তির অনুশীলন করে চলতে হয়। কৃষ্ণপ্রেমের ক্রমবিকাশের বর্ণনা করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—"কোন ভক্তি উন্মুখী সুকৃতির বলে কোন জীবের যদি অনন্য ভক্তির প্রতি 'শ্রদ্ধা' জন্মায়, তা হলে সেই জীব শুদ্ধভক্তের সঙ্গ করে। সেই 'সাধুসঙ্গ' থেকে ভাগবত কথা শ্রবণ ও কীর্তন হয়। শ্রবণ ও কীর্তন মনোযোগ সহকারে যে পরিমাণে হতে থাকে, সাধনভক্তিতে সেই পরিমাণে হৃদয়ে অনর্থসমূহ নিবৃত্ত হতে থাকে। শ্রদ্ধার উদয় কাল থেকে শ্রবণ কীর্তন দ্বারা স্থূল 'অনর্থ নিবৃত্তি' হলে সেই শ্রদ্ধাই অনন্য ভক্তির প্রতি 'নিষ্ঠা' উদয় করায়। সেই নিষ্ঠাই ক্রমে 'রুচি' হয়ে পড়ে। সেই রুচি থেকে পরে 'আসক্তি' জন্মায়। আসক্তি নির্মল হলে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুর স্বরূপ 'ভাব' হয়। সেই ভাব বা রতি গাঢ় হলে 'প্রেম' নাম প্রাপ্ত হয়।"

প্রশ্ন ৬। রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও জড় জগতে প্রেমের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ প্রেম কথাটি ভগবৎ-সম্বন্ধীয়। ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বলে প্রেম কোন জাগতিক বস্তু নয়। তা অপ্রাকৃত পারমার্থিক বস্তু। কোনও বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে জড়-জাগতিক বদ্ধ জীবের মধ্যে প্রেম সম্বন্ধীয় কোন কথা কোথাও বলা হয়নি, যা কেবল তথাকথিত পণ্ডিতদের নভেল-উপন্যাস, পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়। জড়-জাগতিক সম্বন্ধই নয়। জড়-জাগতিক সম্বন্ধগুলি সমস্তই স্বার্থপরতা, মায়া-মোহ-মমতা ও কাম-পরায়ণতারই ব্যাপার। তা প্রেম নয়, কাম। কাম জড়-জাগতিক। প্রেম পারমার্থিক। 'কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্মল ভাস্কর।' কাম কলুষ, প্রেম পবিত্র। কাম পচনশীল দেহের ভিত্তিতে গঠিত, প্রেম অবিনশ্বর আত্মা ও পরমাত্মা পরমেশ্বরের দিব্য সম্বন্ধের ভিত্তিতে গঠিত। শুদ্ধ ভক্তের মুখে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কথা শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে শ্রবণ করলে জীবের হৃদয়ে কাম-কলুষতা দূরীভূত হয়। জড়-জাগতিক কামনা-বাসনাই ভগবদ্ভক্তি থেকে মানুষকে বিমুখ করে।

প্রশ্ন ৭। মেয়েরা শিবপূজা করে কেন?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে দেখা যায়, শ্রীবৃন্দাবনের গোপবালিকাগণ মহাদেব শিবের পূজা করেছিলেন এবং শিব এখনও সেখানে গোপীশ্বররূপে রয়েছেন। সরল গোপবালিকারা কিন্তু শিবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁদের আশীর্বাদ করেন, যাতে তাঁরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে লাভ করতে পারেন। মহাদেব শিব শান্ত এবং সহজে উপাসকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের অভিলষিত বর প্রদান করেন বা আশীর্বাদ করেন। (ভাঃ ৪/৩০/৩৮ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

হয়তো কলিযুগের মেয়েরা সেই সূত্রের অনুকরণে কোনও মরণশীল মানুষকে একান্ত পতিরূপে পাওয়ার জন্য শিবপূজা করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

অর্থাৎ, "যাদের মন জড় কামনা-বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারা দেবতাদের শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।" (গীতা ৭/২০) জড়জাগতিক অনিত্য বস্তু লাভের আশায় মোহিত ব্যক্তিকে বলা হয় *হৃতজ্ঞান* অর্থাৎ, 'যার বুদ্ধি হারিয়ে গেছে।'

কিন্তু গোপীরা যে শিবপূজা করেছিলেন, তাতে তাঁদের কোনও দোষ ছিল না। কারণ তাঁরা নিত্য পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করবার বাসনায় পরম বৈষ্ণব শিবের আরাধনা করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৪/৬৮) ভগবান বলছেন—"আমার ভক্ত আমাকে ছাড়া কিছুই চায় না, আমিও তাই তাদের কখনই ভুলতে পারি না। আমার শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তা প্রগাঢ় প্রেমময় এবং আন্তরিক। পূর্ণজ্ঞানী শুদ্ধ ভক্তরা কখনই আমার পারমার্থিক সান্নিধ্য বর্জন করে না, তাই তারা আমার অত্যন্ত প্রিয়।"

কিন্তু কৃষ্ণবহির্মুখ ভোগাসক্ত বদ্ধ জীব পরম বৈষ্ণব শিবের আরাধনা করছে জড়জাগতিক তুচ্ছ লাভের আশায়। তারা জানে না যে, মহাদেব শিব হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম ভক্ত। *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।* বৈষ্ণবদের মধ্যে শিবের স্থান সর্বোচ্চ। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে শিবের ভক্ত, তাঁরা শিবের উপদেশ অনুসারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেন। মহারাজ প্রাচীন বর্হিষতের পুত্রগণ যাঁরা প্রচেতা নামে খ্যাত, তাঁরা মহাদেব শিবের কৃপায় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেন।

মেয়েরাই যে কেবল শিবের পূজা করে, তাই নয়। বর্তমানে, শিবের তথাকথিত ভক্তরা, যারা কেবল জড়জাগতিক উন্নতি সাধন করতে চায়; তারা পরোক্ষভাবে শিবের দ্বারা প্রতারিত হয়।

শিব প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতারণা করেন না, কারণ প্রতারণা করা তাঁর কাজ নয়। কিন্তু তথাকথিত শিবভক্তরা যেহেতু প্রতারিত হতে চায়, তাই শিব সহজেই প্রসন্নচিত্তে তাদের সবরকম জড়জাগতিক বর প্রদান করেন। সেই সমস্ত বরগুলি তথাকথিত সেই সব ভক্তদের বিনাশের কারণ হতে পারে।

দেখা যায় রাবণ, ভস্মাসুর, বাণাসুর শিবের কাছ থেকে জড়জাগতিক বর লাভ করেছিল, কিন্তু পরিণামে শিবের আশীর্বাদের অপব্যবহার করার ফলে সেই আশীর্বাদ তাদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে, 'বৈষ্ণব হয়ে শিবরাত্রি ব্রত করলে হরিভক্তিরসের সারগ্রাহী পরম বৈষ্ণব শিবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি বর্ধিত হয়ে থাকে।'

প্রশ্ন ৮। এই জগতে যা যা সুখ বলে মানুষ গ্রহণ করেছে সেগুলি প্রাপ্তিই যথার্থ নয় কি?

উত্তর ঃ না, জড়-জাগতিক সুখ যথার্থ নয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"জড়-জগতের সুখের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিংবা দুঃখের প্রতি অসহিষ্ণু হওয়ার মনোভাব পরিত্যাগ করলে মানুষ চির আনন্দময় শাশ্বত জীবন লাভ করবার যোগ্যতা অর্জন করবে।" (গীতা ২/১৫)

দেবর্ষি শ্রীনারদমুনি উল্লেখ করেছেন—"যে সমস্ত মানুষ যথার্থ বুদ্ধিমান এবং পারমার্থিক বিষয়ে উৎসাহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ধামে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়াস করা। জড় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই জগতে লব্ধ যে অনিত্য মায়া-সুখ তা কালের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়, ঠিক যেমন আশা-আকাঙ্ক্ষা না করলেও কালক্রমে আমরা দুঃখভোগ করে থাকি।" (ভাগবত ১/৫/১৮)

হিরণ্যকশিপুকে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন—"যাদের শ্রীকৃষ্ণের চরণে মতি নেই, জড়সুখ ভোগের চেষ্টায় গভীরভাবে যুক্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা তাদের অভিজ্ঞতার অতীত আর কিছুই জানে না, তারা জড়া প্রকৃতির তরঙ্গের মধ্যে সুখভোগের চেষ্টা করে—যেন চর্বিত বস্তুকে আবার চর্বণ করে চলে। তারা তাদের অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। এইভাবে তারা নারকীয় জীবনের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে অধঃপতিত হয়।" (ভাগবত ৭/৫/৩০)

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন—"জড়-জগতে স্ত্রীসঙ্গ করাটাই হচ্ছে পরম সুখ। সমগ্র বিশ্ব এরই মোহে চালিত হচ্ছে। দেহসর্বস্ব বিষয়ী লোকেরা তো স্ত্রীসঙ্গের অনুপ্রেরণা ছাড়া কোনও কাজই করতে পারে না। (গীতা ৫/২১ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

তিনি আরও পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন—"মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। প্রথমে নিজেকে, তারপর পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হয়। কিন্তু কেউ যখন জড় বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, তখন সে স্ত্রীসঙ্গকেই জীবনের পরমার্থ বলে মনে করে। স্ত্রীসঙ্গই হচ্ছে জড় আসক্তির মূল। সেই অবস্থায় মানুষ নিজেকে কিংবা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারে না।" (ভাগবত ৪/২৭/৪ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন—ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ম করাটাই যথার্থ কর্ম, নতুবা নিজের সুখভোগ লিপ্সার জন্য সমস্ত কর্মই দুঃখময় জড় জগতে আমাদের বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ, সুখভোগের চেষ্টায় আমাদের জড় বদ্ধ-জীবনধারা চলতেই থাকবে।

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমাদের একান্তভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

প্রশ্ন ৯। কিভাবে ভগবানকে ডাকলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়? কি করলে সুখশান্তিতে থাকা যায়? তাঁকে ডাকলে আরও বেশি কষ্ট ও দুঃখ হয়।

উত্তর ঃ কলিবদ্ধ জীব নিশ্চয়ই ধ্রুব বা প্রহ্লাদের মতো নয় যে, ভগবান স্বয়ং তার কাছে এসে দর্শন দেবেন। আবার দুর্যোধন, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, রুক্মী ইত্যাদি ব্যক্তিরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেও কোনও শান্তি পেত না। বরং তারা সবসময় শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করত। অতএব ভগবানের দর্শন পেলেই যে শান্তি লাভ হবে, এরূপ নয়।

আবার শ্রীমতী কুন্তীদেবী প্রার্থনা করছেন, "হে কৃষ্ণ। আমি সুখ শান্তি চাই না, রাজ্যভোগ চাই না। তার চেয়ে সবরকমের দুঃখ অশান্তি থাকুক, যার ফলে তোমাকে ডাকতে পারব এবং তুমি এসে আমাদের সঙ্গে থাকবে।" ধর্মপ্রাণ রাজা কুলশেখর প্রার্থনা করছেন, "হে কৃষ্ণ। আমি এখন সব দিক থেকে সুস্থ আছি, আমার মন তোমার পাদপদ্ম ছাড়া আর অন্য কিছুই চিন্তা করছে না, তাই তুমি এই মুহূর্তেই আমাকে গ্রহণ কর। অন্যথায়, শেষের দিকে নানা রোগভোগ ইত্যাদিতে যুক্ত থেকে তোমার সাধন ভজন হয়ত আর করতে পারব না। তাই এখনই তুমি এস।"

প্রশ্নানুসারে, ভগবানকে ডাকলে যদি বেশি দুঃখকষ্ট লাগে, তবে এত ডাকাডাকি না করাই ভাল। বোকার মতো কষ্ট লাভের জন্য ডাকার প্রয়োজন কি? লোকে ভগবানকে পাওয়ার জন্য সমস্ত দুঃখকষ্ট স্বীকার করে। কিন্তু জাগতিক সুখশান্তির আশায় হরিভজনকে উপায় হিসাবে যারা গ্রহণ করে, তারা দুঃখই লাভ করে।

প্রশ্ন ১০। সংসার ভোগবাসনা আর শ্রীকৃষ্ণভাবনা সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে একনিষ্ঠ ভক্তি সাধকের মনেও সংসার বাসনা জন্মায় কি করে?

উত্তর ঃ বহু জন্ম জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত কামনাবাসনা মনের অচেতন স্তরে ঘোরা ফেরা করে। গুরু-কৃষ্ণের কৃপা আশীর্বাদে সেই সকল বাসনা সংযত থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মতি হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের (১০/২/৩২ শ্লোকের) লঘুতোষণী টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ উল্লেখ করেছেন—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্মভিঃ ।
যদ্যচিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥

"জড়জাগতিক সংসার ভোগবাসনা থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেন, তা হলে তিনি পুনরায় জড় সংসার-বাসনায় বন্ধনে আবদ্ধ হন।"

ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থেও সেই কথা বলা হয়েছে—

শ্রীহরির চরণে অপরাধ করার ফলে, *জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্।*

তবে কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবায় যাঁরা যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা এই ধরনের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হন না বলে শাস্ত্রে উল্লেখ হয়েছে।

প্রশ্ন ১১। ষড়রিপুর সংজ্ঞা কি?

উত্তর ঃ ছয়টি শত্রু বা রিপু মানুষের চিত্তে অবস্থান করে মানুষকে পাপী করে। সেই ছয় রিপু হল—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য।

মানুষ স্বচ্ছন্দে, নিষ্পাপে দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য অর্থ ও দ্রব্য বাসনা করে থাকে। সেই বাসনার অতিরিক্ত বাসনাকে 'কাম' বলা হয়। সেই কামই আমাদের উপদ্রব সৃষ্টি করে। কামনা পূর্ণ না হলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে কলহ, কটুবাক্য প্রয়োগ, অন্যের প্রতি আঘাত এমনকি আত্মঘাতমূলক পাপকর্ম করে বসে। সেই উত্তেজনাকে ক্রোধ বলে। বহু বিঘ্ন আশঙ্কা সত্ত্বেও কোন বস্তু ভোগের মানসিকতাকে লোভ বলা হয়। মাত্রাতিরিক্ত অনিত্যবস্তুতে মমতাকে মোহ বলা হয়। নিজেকে বড় শ্রেয় উন্নত বলে মনে করাকে মদ বলা হয়। পরের উন্নতি সহ্য করতে না পারাকে মাৎসর্য বলা হয়।

এই ছয় রিপুর মধ্যে যে কোনও রিপুই চিত্তবিভ্রম ঘটায়। যার ফলে লোকে পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়, নাস্তিক হয়ে যায়।

প্রশ্ন ১২। কর্ম করতে হয় কিন্তু কর্মফল আশা করতে হয় না। একজন শ্রমিক পরিশ্রম করে যদি পারিশ্রমিকের কথা চিন্তা না করে, তা হলে তার পরিবার কিভাবে চলবে? এই কর্মফল চিন্তা না করা কথাটি ভালভাবে বুঝতে চাই।

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গ ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়ঃ*—'হে অর্জুন, ফল ভোগের কামনা ত্যাগ করে ভক্তিযোগে স্বধর্মবিহিত কর্ম কর।' (গীঃ ২/৪৮)

কর্তব্যকর্ম করে যেতেই হবে। নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা চলবে না।

প্রশ্নানুসারে শ্রমিক পারিশ্রমিক ফল পাবে বলেই শ্রম করছে, নইলে শ্রম করত না। শ্রমফল বা কর্মফল পেলেই তার পরিবার পালিত হবে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, '*কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*' তোমার স্বধর্মবিহিত কর্ম করার অধিকার মাত্র আছে, কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নেই। পারিবারিক দায়িত্ব কর্তব্য থাকবে, শ্রমিকের শ্রম করার দায়িত্বও থাকবে কিন্তু সেই পারিশ্রমিক পেলেই যে পরিবার পালিত হবে, সবাই সুখী হবে—এরকমটি আশা করা বৃথা, কারণ সবই কর্তব্য বোধে করা হচ্ছে মাত্র। পারিশ্রমিক পেয়েও সেই শ্রমফলে আদৌ পরিবার পালন না হতেও পারে, এমন কি শ্রমফল চোরেও নিতে পারে, অসুখেও ব্যয় হতে পারে। শ্রমফলটা সুখভোগে লাগবে, কি দুর্ভোগে লাগবে সেটি ভগবানের হাতে। কি ফল পাবো—সেটি চিন্তা করে লাভ নেই।

আমি একজন শ্রমিক। শ্রম করাই কর্তব্য। মালিকের নির্দেশে আমাকে শ্রম করে যেতেই হবে। সেটিই আমার সধর্মবিহিত কর্ম। শ্রম অনুষ্ঠানকালীনও আমার আয়ুষ্কাল

শেষ হয়ে যেতে পারে। শ্রমকালীন আমার হাত পা ভেঙে যেতে পারে। আমার জীবন সাঙ্গ হতে পারে। কিন্তু আমি যদি টাকা পাবো, তবে পরিবার পালন করব, তবে সুখী হব এই চেতনায় কর্ম করেই চলি তা হলে দুঃখময় জগতে পতিতই থাকতে হবে। কারণ পরিবারের সুখদুঃখ চিন্তা করেই মৃত্যুবরণ করলে এই জড় সংসার চক্র থেকে সদ্গতি লাভ হয় না। টাকা রোজগার এবং পরিবার পালন হচ্ছে আমার অবস্থা মাত্র। কিন্তু আমি জাগতিক পরিস্থিতির আশা ত্যাগ করে যদি কেবল মাত্র ভগবানের নির্দেশেই শ্রম করি, ভগবানকে কেন্দ্র করেই আমার সমগ্র জীবনচক্র অতিবাহিত হয়, তবে যেভাবেই যা ঘটুক না কেন অন্তিমে জড় সংসারে কর্মবন্ধন মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ জগতে উন্নীত হওয়া যায়। সেটি সম্ভব হয় যখন সমস্ত কর্ম চিন্তা-ভাবনা কামনা ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যেই করা হয়।

প্রশ্ন ১৩। 'পদ্মানীতি' কথার অর্থ কি?

উত্তর ঃ 'পদ্মানীতি' হল 'জড়-সাংসারিক বুদ্ধি'। শোনা যায় পদ্মা ছিলেন কৃষ্ণবিদ্বেষী কংসের মাতা। তিনি জড় বুদ্ধিতেই কৃষ্ণলীলা বিচার করতেন। ব্রজবাসীদের সকলের একমাত্র জীবনসর্বস্ব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই নন্দ মহারাজ, যশোদাদেবী এবং অন্য সমস্ত গোপ-গোপীরা সর্বদা কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর হতেন। কৃষ্ণছাড়া তাঁরা থাকতে পারেন না। কিন্তু কংসমাতা পদ্মা মন্তব্য করতে লাগলেন, "দেবকীপুত্র কৃষ্ণ গোপ-গোপীদের গরু চরিয়ে বেশ কতটা তো খেটে দিয়েছে, আর বাদবাকী কৃষ্ণকে ছোটবেলা থেকে লালন-পালন, খাওয়া-পরার বাবদ কত টাকা খরচ করেছে। যদি সেই ব্রজবাসীদের পাওনা কিছু হয়তো বেশী থাকতে পারে, তাই সেই পাওনার কয়েকটা টাকা তাদের দিয়ে দিলে আর তারা কৃষ্ণচিন্তা করবে না, কৃষ্ণকে নেওয়ায় চেষ্টা করবে না। এভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপ-গোপীদের সম্বন্ধটুকু চিরতরে চুকিয়ে দেওয়া যাক।" এইভাবে জড় বুদ্ধিতে কংসমাতা পদ্মা বিচার করেছিলেন।

প্রশ্ন ১৪। অষ্টাঙ্গিক যোগ মার্গে কি মন সংযত হয় না?

উত্তর ঃ মনটি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত না থাকলে সংযত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥

"যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি-এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা সুষ্ঠুভাবে যোগ সাধিত হলেও সাধকের চিত্ত কাম-লোভ দ্বারা সর্বদা হত হওয়াতে শমতা-গুণ লাভ করতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবা-পদ্ধতি আদরের সঙ্গে পালন করে চললে আত্মা অনতিবিলম্বে শম-ধর্মকে অবলম্বন করে।" (ভাঃ ১/৬/৩৬)

প্রশ্ন ১৫। হরিনাম সংকীর্তন যদি মানব-সমাজের সর্বমঙ্গলের কারণ হয়ে থাকে তবে বহু মানুষ একথা শুনেও হরিনাম বিরোধী হয় কেন? সংকীর্তনের প্রতি লোকের আকর্ষণ থাকছে না কেন?

উত্তর ঃ মানুষ অনেক কিছু বুঝতে পারে, তবুও ব্যক্তিগত মনোভাব অনুসারেই আচরণ করে থাকে। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন—

লুব্ধানাং যাচকাঃ শত্রুঃ মূর্খানাং বোধকো রিপুঃ।
জারস্ত্রীণাং পতিঃ শত্রুঃ চোরাণাং চন্দ্রমা রিপুঃ ॥

লোভীদের কাছে যাচক ব্যক্তিরা শত্রু। যাঁরা সদুপদেশ দিয়ে থাকেন মূর্খরা সেই উপদেশ অনুসারে না গিয়ে উপদেষ্টাদেরকে শত্রু বলে মনে করে। পরপুরুষে আসক্ত স্ত্রী নিজ স্বামীকে শত্রু বলে মনে করে। সবার কাছে চাঁদের আলো আকর্ষণীয় হলেও, যারা চোর লম্পট বাটপার তারা চাঁদের আলোকে শত্রু বলে মনে করে। চোরের কাছে চাঁদের আলো আকর্ষণীয় নয়। ঘোর অন্ধকারটাই তার আনন্দের বিষয়। যেহেতু চুরিকর্মটা অন্ধকারেই ভাল হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে হরিনাম সংকীর্তন যদিও মানবসমাজের সর্বমঙ্গলের কারণ তবুও নাস্তিক গোষ্ঠের লোকদের কাছে তা আদরের সঙ্গে গ্রহণ করার বস্তু হয়ে ওঠে না।

কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ যাচক, উপদেষ্টা, নিজস্বামী, চাঁদের আলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। তেমনই অস্বাভাবিক বদ্ প্রবৃত্তি না থাকলে মানুষ সহজেই হরিনাম সংকীর্তনে সংযুক্ত হবে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রশ্ন ১৬। মোহ ও লোভের মধ্যে ভেদ কি?

উত্তর ঃ মোহ—মাত্রাতিরিক্ত মমতা; লোভ—লাভ করবার জন্য প্রবল বাসনা।

প্রশ্ন ১৭। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন আহারের জন্য অন্ন প্রার্থনা করতে সখাদের পাঠালেন ব্রজবাসীদের গৃহে, তখন পণ্ডিত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা কেন ভিক্ষা দিলেন না?

উত্তর ঃ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণকে সাধারণ ব্যক্তিরূপে মনে করেছিলেন। জড় জাগতিক সুখের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তাই তাঁদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্য ছিল স্বর্গলোকে গিয়ে সুখভোগ করা। তাঁরা নিষ্ঠাবান যাজ্ঞিক এবং পণ্ডিত হলেও ভগবানকে চিনবার মতো প্রীতি বা ভক্তি চেতনা তাঁদের ছিল না। তাই ভগবান যখন তাঁর ভক্ত বা সখাদের তাঁদের কাছ থেকে অন্ন চেয়ে আনতে পাঠালেন তখন তাঁরা কর্ণপাতই করলেন না।

প্রশ্ন ১৮। কৃষ্ণ ব্রজবাসীদের গৃহে মাখন চুরি করতেন কেন?

উত্তর ঃ ভগবানের চুরি করবার মতো বস্তু সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নেই। সব কিছুই ভগবানের সম্পদ। ভক্তদের প্রীতি বর্ধন উদ্দেশ্যে ভগবান কৃষ্ণ ব্রজবাসীদের গৃহে মাখন চুরি লীলা করতেন। এতে সেই সব সৌভাগ্যসম্পন্ন ব্রজবাসীরা মাখনচোর কৃষ্ণকে দেখে বহুগুণ অধিক আনন্দ উপভোগ করতেন। যাঁরা ভাগ্যবান তাঁরা ভগবানকে

প্রীতিভরে কিছু দান করেন, যাঁরা আরও বেশি ভাগ্যশালী তাঁরা ভগবানকে দেওয়ার আগে ভগবান নিজেই তাঁদের জিনিষ চুরি করতে থাকেন। যারা দুর্ভাগা তারা ভগবানকে কিছু দেয় না। কিন্তু তাদের সমস্ত জিনিষ ভগবান অচিরেই মৃত্যুরূপে এসে ছিনিয়ে নেন। *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্।* কিন্তু ভক্তদের বিষয়ে সবকিছুর সুরক্ষা ভগবান নিজ হাতেই গ্রহণ করেন। *নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।*

প্রশ্ন ১৯। আমাদের সাধারণ জ্ঞানে বলে যে, জগতের সব কিছুর আয়োজন মানুষের জন্যই। সমস্ত বস্তু মানুষের ভোগের জন্য। এটি ঠিক কি না?

উত্তর ঃ জগতের সব কিছুর আয়োজন কৃষ্ণসেবার জন্য। সেই কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "আমি সমস্ত আয়োজনের ভোক্তা, আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরম ঈশ্বর, আমি সমস্ত জীবের উপকারী সুহৃদ—এইভাবে আমাকে জানতে পারলে শান্তি লাভ করবে।" (গীতা ৫/২৯)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।

জীবের স্বাভাবিক আনন্দময় অবস্থাটি হচ্ছে সে কৃষ্ণসেবায় যুক্ত। কিন্তু সে যদি মনে করে কৃষ্ণসেবা না করে, নিজে কিছু ভোগ করবে, কৃষ্ণ কেন ভোক্তা হবে আমিই ভোক্তা। সেই মনোভাবই এই দুঃখময় জড় জগতে তার পতনের কারণ।

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব ভোগবাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

অর্থাৎ, মানুষ যদি মনে করে এই জগৎটি ভোগের জন্যই, তাহলে ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তাকে এই দুঃখময় জগতে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ করে রাখবে।

কোনও কালে ভোগবাসনা করার জন্যই এই দুঃখময় জগতে আমরা পতিত হয়েছি। আবার এখানেই ভোগ বাসনার জন্য আরও গভীর দুঃখের মধ্যে পতিত হব। তখন নারকীয় যাতনা ভোগ হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*দুঃখালয়মশাশ্বতম্*—এই জড় জগৎটি হচ্ছে দুঃখময় স্থান। এখানে কোনও বস্তুই নিত্য নয়।

যিনি এই বিশ্ব চরাচরে হর্তা কর্তা বিধাতা তিনিই বলছেন এই জগৎটি দুঃখ দিয়েই তৈরি। কোনও শাস্ত্রেই বলা হয় না যে, এই জগৎটি সুখের জায়গা। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রেই বলা হয়েছে, এই জগৎটি দুঃখময়। অতএব কোনও বুদ্ধিমান মানুষ মনে করে না যে, এই জগৎটি তার ভোগের জন্য।

প্রশ্ন ২০। যদি কোনও বিষয়-ভোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সুখের আশায় ভালো কর্ম করে তবে তাকেও কি এই জগতে যাতনা ভোগ করতে হবে?

উত্তর ঃ বিষয়ভোগসুখ লাভের আশায় যারা ভালমতো পুণ্য কর্ম করছে, তারা স্বর্গলোকেও গতি পায়, কিন্তু *ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*—পুণ্যভোগ শেষ হয়ে গেলে পুনরায় এই মর্ত্যে তাকে এসে জন্ম নিতে হয়। *নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি।* মর্ত্যলোকে মানুষ অথবা শূকর-কুকুর, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি যোনিতেও জন্মগ্রহণ করতে হয়। এমনকি ঘোর নরকেও প্রবেশ করতে হতে পারে। এই কথা মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে। যাঁরা এই দুর্লভ মানব-জীবন থেকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করতে চান তাঁদের অবশ্যই সাধুসঙ্গে হরিনাম, ভজন-সাধন করে চলতে হবে। কিন্তু বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা আর হরিভজন বিপরীত ধর্মী।

প্রশ্ন ২১। আমাদের জীবন কখন পবিত্র বলে নির্দিষ্ট হয়?

উত্তর ঃ জড় জাগতিক সুখ ভোগের বাসনা থাকলেই জীবনটি অপবিত্র হয়। কিন্তু কেউ যখন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করেন, শ্রীকৃষ্ণের কথা মন দিয়ে শুনতে থাকেন এবং কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে থাকেন তখন তিনি পবিত্র হতে থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে সবার হৃদয়ে বিরাজ করছেন। তিনি সৎ ব্যক্তির সুহৃদ, তিনি ভক্তহৃদয়ের জড় সুখ ভোগের সমস্ত বাসনা বিধৌত করেন। যখন তাঁর নাম এবং বাণী শ্রবণ কীর্তন করা হয়, তখন জীবন পবিত্র হয়ে ওঠে।" (ভাগবত ১/২/১৭)

জাগতিক কামবাসনা ত্যাগ না করা পর্যন্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। কৃষ্ণসেবায় কায়মনোবাক্য সমর্পণ ব্যতীত কেউ পবিত্র জীবন লাভ করতে পারে না।

প্রশ্ন ২২। সবাই তো আমরা সৎ চরিত্র হতে চাই, কিন্তু কেন আমরা জেনে শুনেই অসৎ আচরণ করে বসি কিংবা অসৎ চরিত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করি?

উত্তর ঃ মানুষের যদিও নীতি বুদ্ধি রয়েছে, সৎ-অসৎ বিচার বুদ্ধি রয়েছে, তবুও সেই বিচার বুদ্ধি অকেজো হয়ে যায় যখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়াকর্ষণ প্রবল হয়, বিশেষত যখন রজোগুণে প্রভাবিত হয়ে মানুষ কাম ও ক্রোধের দ্বারা চালিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥

"রজোগুণ থেকে সমুদ্ভূত কামই মানুষকে পাপাচারে প্রবৃত্ত করে। এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী ও পাপাত্মক। কামই জীবনের প্রধান শত্রু বলে জানবে।" (গীতা ৩/৩৭)

প্রশ্ন ২৩। 'ভাবের ঘরে চুরি' কথাটির অর্থ কি?

উত্তর ঃ যিনি কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করেন, তিনি জানেন, তিনি কৃষ্ণের সেবক এবং জগতের সব কিছু ভাল দ্রব্য কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করে তিনি প্রীত হন। তাঁর মন সর্বদা

কৃষ্ণভাবনায় থাকে। কিন্তু যখন দেখা যায় কেউ কেবল মুখে বলেন 'সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের' অথচ কাজের বেলায় নিজেরই সুখ ভোগের বা আত্মসুখের জন্যই সব কিছুই গ্রহণ করতে প্রয়াসী হন তখন তিনি চোর বলে সাব্যস্ত হন। কৃষ্ণভক্তিকক্ষে এসে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাসনা চরিতার্থ করবার চেষ্টাকে বলে ভাবের ঘরে চুরি। এই অসৎ চেষ্টাই পরমানন্দপ্রদ কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা থেকে মানুষের ভাবনাকে বিপথগামী করায়।

প্রশ্ন ২৪। তত্ত্বজ্ঞানী ভক্ত কাকে বলে? তিনি কেন কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়?

উত্তর ঃ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্ন বিধান করা ছাড়া যে ব্যক্তি কোন বস্তু বা কাম্য ফলকে ভোগ করতে ইচ্ছা করেন না, কৃষ্ণপ্রীতি ছাড়া বিন্দুমাত্র সময়ও অতিবাহিত করেন না। এইরকম ব্যক্তিকে তত্ত্বজ্ঞানী ভক্ত বলা হয়।

যেহেতু সেইরকম ভক্ত কৃষ্ণকে ভাল না বেসে এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না, সেজন্য তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

প্রশ্ন ২৫। পথেঘাটে প্রায় 'প্রেম-প্রীতি'র কথা শোনা যায়। এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ প্রকৃত প্রেম-প্রীতি একমাত্র ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত। তা পথেঘাটের বা এই জাগতিক কোন বস্তু নয়। বর্তমান সমাজে 'প্রেম' কথাটি সম্পূর্ণ বিকৃতরূপেই ব্যবহৃত হচ্ছে। যুবক-যুবতীর যৌন কামনা-বাসনাকেই উদ্ভট সিনেমা ও পত্র-পত্রিকায় বহুলভাবে 'প্রেম' নামেই চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ আছে—কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্মল ভাস্কর। (আদি ৪/১৭১) আপন ইন্দ্রিয়-প্রীতিকে 'প্রেম' নামে অভিহিত করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

প্রশ্ন ২৬। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'যে যেভাবে আমার ভজনা করে আমি তাকে সেইরূপেই পুরস্কৃত করি।' আবার, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তিনি গৌরহরিরূপে বললেন যে, 'মূর্খ যদি বিষয় কামনা করে, তবে তিনি বিজ্ঞ হয়ে বিষয় না দিয়ে তাঁর চরণামৃত দিয়ে সেই মূর্খের বিষয় ভুলিয়ে দেবেন।' এইভাবে দু'রকম কথা কেন?

উত্তর ঃ যে যেভাবে ভজনা করবে, সে সেইভাবেই পুরস্কৃত হবে, এটি ভগবানের সাধারণ নিরপেক্ষ বিচার। বিভিন্ন ধরনের মানুষ রয়েছে—কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত ইত্যাদি। কর্মীরা জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে, নির্বিশেষ জ্ঞানীরা ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যেতে চায়, যোগীরা পরমাত্মার দর্শন চায়, ভক্তরা ভগবানের নিত্য সেবানন্দে উন্নীত হতে চায়। প্রত্যেকের ঐকান্তিক বাসনা ও কর্মপ্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ভগবান তা পূরণ করবেন। এটি ভগবানের সাধারণ বিচার।

কিন্তু দেখা যায়, কেউ বিষয় কামনা করেও বিষয়সুখ লাভ করতে পারে না। ভগবান তাকে বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে আনেন। কারণ বিষয়সুখে প্রমত্ত হয়ে সে দুঃখময় জগতের ভবচক্রে ঘূরপাক খাবে জন্ম-জন্মান্তর ধরে। সেই রকম বিষয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির উপর সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা বর্ষিত হলে ভগবানও তাঁকে বিশেষ রকমের

কৃপা করেন, যাতে সে মূর্খের মতো বিষয় চাইলেও ভগবান তাঁর চরণামৃত দিয়ে বিষয় বাসনা ভুলিয়ে দেন। এ ক্ষেত্রে বুঝতে হবে সেটি তার প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা, যা সচরাচর কেউ লাভ করতে পারে না।

পিতামহ ব্রহ্মার অপেক্ষাও বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উত্তানপাদের শিশুপুত্র ধ্রুব শ্রীনারদ মুনির নির্দেশে বনমধ্যে কঠোরভাবে শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন। কিন্তু, যেদিন পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির দর্শন পেলেন, তখন শ্রীহরি ধ্রুবকে তাঁর অভীষ্ট বর দিতে চাইলে ধ্রুব বলতে লাগলেন—"হে প্রভু! আমি রাজ্য লাভের আশায় আপনার তপস্যা করেছি, কিন্তু আমি তো সামান্য তুচ্ছ কাঁচ অন্বেষণ করতে করতে চিন্তামণি পেয়েছি। সমস্ত দেব, মুনি, ঋষিদের পক্ষে যা অত্যন্ত দুর্লভ, সেই আপনার দর্শন আজ পেয়েছি। অতএব আর আমি অন্য বর প্রার্থনা করি না।"

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে ধ্রুব মহারাজ সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়াটা একটি অতি তুচ্ছ জ্ঞান করলেন। তবুও ভক্তবৎসল ভগবান তাঁকে ধ্রুবলোক নামক বিশাল গ্রহটির অধিপতি করলেন।

সুদামা বিপ্র ছিলেন অত্যন্ত নিষ্কিঞ্চন দরিদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। অভাব অনটন মোচনের জন্য তাঁর পত্নী তাঁকে দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে অনুপ্রেরণা দেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য সখা হওয়ার দরুণ সকলেই মনে করতে পারেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যা চাইবেন তাই পাবেন। শীর্ণকায় মলিন বসন অভাবগ্রস্ত সুদামা বহুকষ্টে দ্বারকাতে পৌঁছলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেই তিনি সমস্ত দুঃখ ভুলে গেলেন। অঢেল ধনরত্ন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, বিষয় সম্পদ—কোনও কিছুই তিনি চাইলেন না। নিজের দুঃখের কথা বলবার মানসিকতাই তাঁর ছিল না। কেবল শ্রীকৃষ্ণকে দেখেই তাঁর অন্তরে আনন্দের ঢেউ উঠল। তিনি বাল্যবন্ধুর কাছে প্রীতিমূলক আদর আপ্যায়ন লাভ করে পুনরায় আপন কুটিরে ফিরে এলেন।

কুটিরে ফিরে এসে সুদামা দেখলেন সেই কুঁড়ে ঘর আর নেই। সে যে বিরাট অট্টালিকা, তাঁর দুঃখিনী পত্নী এখন রাজরাণীর মতো, আর নিজের রূপের পরিবর্তনও লক্ষ্য করলেন। সেই প্রাসাদে কোনও কিছু আমোদ-প্রমোদ, আহার-বিহারের অভাব নেই। অত্যন্ত বিস্মিতচিত্ত শ্রীসুদামা বিপ্র সেই ঐশ্বর্য দর্শন করে উৎফুল্ল হওয়া তো দূরের কথা, তিনি অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন, "হে কৃষ্ণ, এই সব অঢেল ঐশ্বর্য আমাকে দিলে কেন? আমি তো চাইনি। আমি ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বান্বিত হয়ে তোমাকে ভুলে যাব। তখন তোমাকে আর পাব না। না, না আমি এ সব চাই না। হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

সুদামা বিপ্র দরিদ্র হলেও বিষয়সুখ-ঐশ্বর্যে থেকে ভগবানকে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। তাই তিনি বিষয় কামনা করেননি। বিষয়হীনতাটাকেই ভগবানের বিশেষ কৃপা রূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁর নবোদ্ভূত প্রাসাদটিকে শ্রীকৃষ্ণের মন্দিররূপে, আত্মীয়বর্গকে শ্রীকৃষ্ণের দাস-দাসীরূপে গ্রহণ করে সেই দিব্য ঐশ্বর্যের যথার্থ ব্যবহার করেছিলেন।

এইভাবে দেখা যায়, ভগবৎ-দর্শনে সমস্ত কিছুই লাভ হয়। যাঁর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্তি ঘটেছে তাঁর আর কোনও কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না। যারা বিষয় থেকেও বঞ্চিত, ভগবানের শ্রীচরণামৃত থেকেও বঞ্চিত, তারা সুকৃতিবান নয়।

যারা মনে করে যে, আমি ভক্তিও করব ভোগবাসনাও করব। অতএব ভক্তি করার দরুণ, ভগবান আমাকে কৃপা করবেন এবং ভোগবাসনাও চরিতার্থ হবে, সেটি ভণ্ডের লক্ষণ। গীতায় ভগবান তাকে 'ভণ্ড' বলেছেন। ভণ্ডামিতে সর্বনাশ হয়। সে-ক্ষেত্রে তার বিষয়সুখ ভুলিয়ে ভগবান বিশেষ রূপে কৃপা করবেন না।

সুতরাং, আমাদের সাধন ভজন, আমাদের সুকৃতি সৌভাগ্য, আমাদের আন্তরিক অনুরাগ ইত্যাদির উপরই নির্ভর করছে আমরা ভগবানের কাছে কিরূপ কৃপা লাভ করব। অন্তর্যামী ভগবানের কোন কথার মধ্যে বৈষম্য বা অসামঞ্জস্য নেই।

প্রশ্ন ২৭। আমাদের হৃদয়ে কিভাবে কামনা-বাসনা দূর হবে? কিভাবে আমরা ভক্তির আশ্রয়ে থাকতে পারব?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, "এই জগতে আমার নামের প্রতি, আমার রূপের প্রতি, আমার গুণ ও আমার লীলা কথার প্রতি যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, তাঁর পাপ কিংবা পুণ্য কর্মের প্রতি কোনও আসক্তি থাকে না। যে মানুষ এই জগতের ভোগ্যবস্তুগুলি দুঃখের কারণ বলে জেনেছে, অথচ সেইসব পরিত্যাগ করতে সমর্থ নয়, সে যদি আমার প্রতি শ্রদ্ধালু হয়, তবে সেই শ্রদ্ধাভক্তি দিয়েই তার সমস্ত অভাব দূর হবে। আর এইটি জেনে যে ব্যক্তি দুঃখপরিণাম বিষয় ভোগের প্রতি বিরক্ত হয়, সে প্রীতিভরে আমারই ভজনা করতে থাকে। এইভাবে ভক্তিযোগে যে ব্যক্তি সর্বদা আমার ভজনে রত থাকে, তার হৃদয় মধ্যে থেকে আমি স্বয়ং তার সমস্ত রকমের কাম-মল ধ্বংস করি।" (ভাগবত ১১/২০/২৭-২৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৮) বলা হয়েছে—

নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া।
ভগবতি উত্তমশ্লোকে ভক্তিঃ ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

নিয়মিতভাবে অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, এবং উত্তমশ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ কীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রানি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন, তিনি সাধুবর্গের সুহৃদ্। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে রতিযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণ সেই ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত জড় ভোগবাসনা বিনাশ করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, হরিনাম কীর্তন নিষ্ঠার সঙ্গে করতে থাকলে হৃদয়ের কামনাবাসনা উড়ে পালায়। 'শুনিয়া গোবিন্দ রব আপনি পালাবে সব।'

প্রশ্ন ২৮। মানুষ কি উদ্দেশ্যে ভক্তি করে? কত রকমের ভক্তি হতে পারে?

উত্তর ঃ জাগতিক সমস্ত রকমের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ ভক্তি-আচরণ করে। কৃষ্ণভক্তি আমাদের জীবনচক্রের সর্বপাপ প্রণাশিনী।

জড় সংসারের মানুষ জড়জাগতিক বাসনা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভজনা করে। কৃষ্ণকে ভালবাসাই উদ্দেশ্য নয়, নিজের স্বার্থ নিজের কোন বাসনা চরিতার্থ করাটাই উদ্দেশ্য। এই জন্যই কৃষ্ণভক্তি।

জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের বশীভূত হয়ে বিভিন্ন রকমের মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভক্তি করে থাকে। তামসিক ভক্তি, রাজসিক ভক্তি ও সাত্ত্বিক ভক্তি। প্রত্যেক ভক্তিকে আবার তিন রকমের ভক্তিরূপে প্রকাশ করা যায়। অধম, মধ্যম ও উত্তম ভক্তি। বৃহন্নারদীয় পুরাণে বর্ণনা রয়েছে, অন্যের ক্ষতি করবার উদ্দেশ্যে, অন্যের বিনাশের জন্য যখন কেউ হরিভজন করে, সেই ভক্তিই অধম-তামস।

যশ্চান্যস্য বিনাশার্থং ভজতে শ্রদ্ধয়া হরিম্।
শৃণুষ্ব পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসাধমা ॥

ব্যভিচারিণী রমণী নিজ পতিকে সর্বদা কপটভাবে সন্তুষ্ট রাখতে চায়, যাতে তার ব্যভিচার পাপ নিজপতির কাছে ধরা না পড়ে।

যোঽর্চয়েৎ কৈতবধিয়া স্বৈরিণীং স্বপতিং যথা।
নারায়ণং জগন্নাথং সা বৈ তামস মধ্যমা ॥

নিজের পাপ প্রবৃত্তিটাকে গোপন করবার উদ্দেশ্যে ভগবদ্ ভক্তি অনুষ্ঠান করা হলে, সেই ভক্তি মধ্যম-তামস।

দেবপূজাপরান্ দৃষ্ট্বা মৎসরী যোঽর্চয়েদ্ হরিম্।
শৃণুষ্ব পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসোত্তমা ॥

অন্যদেরকে ভক্ত হতে দেখে ঈর্ষাবশত নিজেও হরিভক্তি অনুষ্ঠান করে চলেন। এরকম যে হরিভক্তি তা উত্তম-তামস।

ধনধান্যাদিকং যস্তু প্রার্থয়ন্নর্চয়েদ্ হরিম্।
শ্রদ্ধয়া পরয়াবিষ্টঃ সা ভক্তী রাজসাধমা ॥

ধন-ধান্য ইত্যাদি ভোগ্যবস্তু প্রার্থনা করে পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে হরিভক্তি, তা অধম-রাজস।

যঃ সর্বলোকবিখ্যাতাং কীর্তিমুদ্দিশ্য মাধবম্।
অর্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সা বৈ রাজসমধ্যমা ॥

যে ব্যক্তি সর্বলোকবিখ্যাত কোনও কীর্তি লাভের উদ্দেশ্যে পরম ভক্তিসহকারে মাধবকে পূজা করে, তার ভক্তিই মধ্যম-রাজস।

সালোক্যাদিপদং যস্তু প্রার্থয়ন্নর্চয়েদ্ হরিম্।
বিজ্ঞেয়া পৃথিবীপাল সা ভক্তী রাজসোত্তমা ॥

সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি ইত্যাদি মুক্তি প্রার্থনা করে যে ব্যক্তি হরিপূজা করে, তার ভক্তি উত্তম-রাজস।

যস্তু স্বকৃত পাপানাং ক্ষয়ার্থং পূজয়েদ্ হরিম্ ।
শ্রদ্ধয়া পরয়া রাজন্ সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকাধমা ॥

যে ব্যক্তি নিজকৃত পাপক্ষয়ের জন্য পরম শ্রদ্ধা সহকারে হরিপূজা করে, তার ভক্তি অধম-সাত্ত্বিক।

হরেরিদং প্রিয়মিতি কৃত্বা মনসি যো নরঃ ।
কর্মানি কুরুতে ভূপ ভক্তিঃ সাত্ত্বিকমধ্যমা ॥

'এই কর্মটি শ্রীহরির প্রিয়' এরকম মনে করে যে সেই কর্ম অনুষ্ঠান করে, তার ভক্তি মধ্যম-সাত্ত্বিক।

বিধিবুদ্ধ্যার্চয়েদ্যস্তু দাসবচ্চক্রপাণিনম্ ।
ভক্তীনাং প্রবরা জ্ঞেয়া সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকোত্তমা ॥

যে ব্যক্তি কর্তব্যবোধে দাস স্বরূপ শ্রীহরির পূজা করে, তার ভক্তি উত্তম-সাত্ত্বিক।

উত্তম-সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা সর্বদা বিধি-নিয়ম মেনে চলেন। ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেই জীবন যাপন করেন।

যে ভক্তিতে জগতের সর্বত্রই সর্বক্ষণই শ্রীকৃষ্ণকে দেখার অভিলাষ হয়, সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ আছেন এই উপলব্ধি করে ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, সেই ভক্তিই উত্তমোত্তম।

জাগতিক কোনও আশা আকাঙ্ক্ষা নয়, কেবলমাত্র অহৈতুকী অপ্রতিহতা নিত্য ভালবাসার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণসেবায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করাকে বলে শুদ্ধভক্তি।

এই জগতে বিভিন্ন গুণের প্রভাবে মানুষ ভক্তি আচরণ করে থাকে। আচরণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির মনোভাব বিভিন্ন রকমের থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, একাশি রকমের ভক্তি রয়েছে। শুদ্ধভক্তি ওরটি সেই সমস্ত ভক্তির উর্ধ্বে। যাকে বলা হয় চিন্ময় স্তর বা শুদ্ধসত্ত্ব স্তর।

২২
পাপ পুণ্য বিচার

প্রশ্ন ১। পাপ-পুণ্য কি বস্তু—তা আমরা দেখতেও পাই না, শুনতেও পাই না, তবে আমরা পাপ-পুণ্য মানবো কেন?

উত্তর ঃ দেখেও মানুষ মানে না। যেমন, একজন চোর—চুরি করার অপরাধে তার হাত-পায়ের আঙুলগুলি কেটে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য পাকা চোর সেই সব দেখেও চৌর্যবৃত্তি ছাড়তে পারে না। অর্থাৎ, চুরিকর্মের পরিণামে তারও হাত-পা কেটে যেতে পারে—সে অনুরূপ ঘটনা দেখেও মনের দিক থেকে তা মানতে চায় না। সে ভাবতে পারে, 'আমি এমন পাকা, কেউই টের পাবে না।'

আবার, শুনেও মানুষ শেখে না। যেমন, ধূমপান করার বদ্‌ভ্যাসের দরুণ টি.বি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ডাক্তার ধূমপান করতে নিষেধ করেন। কিন্তু রোগী কিছুদিন পরে পুনরায় ধূমপান করতে শুরু করেছে। যদিও ডাক্তারের কথা সে শুনেছিল, তবুও সে আর সেই নির্দেশ মানছে না।

সুতরাং, দেখতে পেলে কিংবা শুনতে পেলেই বস্তুর অস্তিত্ব মানবো নতুবা মানবো না—এটি উন্মাদের কথা। যেমন, একটি তারের মধ্যে বিদ্যুৎ আছে কি নেই তা দেখা বা শোনা না গেলেও হাতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হলে তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে আমরা বাধ্য হই। কিন্তু যখন কেউ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে তারের মধ্যে ঝুলে থাকে, তখন সে কখনই বলতে পারে না যে, 'আমি বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়েছি, তোমরা আমার কথা শোন এবং এখুনি এসে আমাকে দেখ।' ঠিক তেমনিই, পাপের ফলে যখন নরকভোগ হয় কিংবা পুণ্যের ফলে যখন স্বর্গভোগ হয়, তখন সেই ব্যক্তি নরক বা স্বর্গ থেকে বলে না যে, 'দেখ, আমি কেমন নরক ভোগ করছি' কিংবা 'স্বর্গ ভোগ করছি'। আমরা দেখি, জগতে একই পরিবেশে বিভিন্ন জনের মধ্যে বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। কেউ দুঃখী, কেউ সুখী, কেউ সুস্থ, কেউ রোগী, কেউ খোঁড়া, কানা বা বোবা। আবার কেউ দেখতে সুন্দর, কেউ বিকৃতমস্তিষ্ক, কেউ সুস্থির মস্তিষ্ক। এই রূপ বৈচিত্র্যের কারণ ব্যাখ্যা কেউ করতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্রে নির্দেশ আছে—আমরা আমাদের পূর্ব জীবনের কর্মফল অনুসারে এই জীবন লাভ করেছি।

আরও দেখা যায়, পাপপরায়ণ কিংবা পুণ্যবান ব্যক্তির দেহত্যাগের সময় কতকগুলি বিপরীত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যেমন, পাপী ব্যক্তি দেহত্যাগের সময় বিকট চিৎকার করে, বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ করে, যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে—যমদূতের ভয়। পুণ্যবান ব্যক্তি শান্তভাবেই দেহত্যাগ করে। ভক্তরা সাধারণত দেখা যায় হরিনাম উচ্চারণ করতে করতে, কৃষ্ণচিন্তা করতে করতে গভীর প্রশান্তিতে দেহ ত্যাগ করেন।

পরিশেষে উল্লেখ্য এই যে, পাপ-পুণ্য মানা হোক আর নাই হোক, আমরা কি বস্তু পাবো, আমাদের গতি কি হবে, তা নির্ভর করছে আমরা কি করছি তার উপর।

প্রশ্ন ২। জীবহত্যা মাত্রই যদি পাপ হয়, তবে ভক্তরা গাছকে হত্যা করে পাপ করেন কেন? গাছেরও তো প্রাণ আছে?

উত্তর ঃ কতকগুলি বিষয়ে বেদশাস্ত্রে নির্দেশ আছে যেখানে হত্যা করলেও কোনও পাপ হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ বিপক্ষ শত্রুসৈন্যকে হত্যা করলে কোনও পাপ হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নির্দেশ দিচ্ছেন, বিপক্ষ যোদ্ধাদের হত্যা করতে। সেখানে হত্যা করাটা পাপ নয়। পক্ষান্তরে, ভগবানের নির্দেশ অমান্য করাটাই মহাপাপ। গাছকেও অনর্থক হত্যা করা উচিত নয়। তবে ভক্তরা যে ভগবানের মন্দির, আসন, ভোজ্যদ্রব্য ইত্যাদির আয়োজন করতে গাছকে ছেদন করছে—এতে পাপ হচ্ছে বলে কখনও কোথাও নির্দেশ করা হয়নি। অধিকন্তু, ফল ফুল লতা পাতা শাখা প্রশাখা দিয়ে ভগবানের ভোজ্যদ্রব্য তৈরি করা, মন্দির সাজানো, ভগবানকে নিবেদন করা, ভগবদ্‌প্রসাদ রূপে তা গ্রহণ করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। যেমন, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করে, আমি তার সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি। (গীতা ৯/২৬) স্রষ্টার নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হওয়াটা যথার্থ কর্ম। মাছ মাংস ডিম খেতে ভগবান মানুষদের নির্দেশ দেননি, শস্য ফল মূল শাকসব্জী তাঁর প্রসাদরূপে ভোজন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাক্ষস, পিশাচ, ডাইনরা যদি মাছ মাংস ডিম খায়, তবে তাদের পাপ হয় না, কারণ তাদের জন্য শাস্ত্রে সেগুলি খাওয়ার বিধান রয়েছে। *যক্ষ-রক্ষাংসি ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ* (শ্রীমদ্ভাগবত ৪/১৮/২১) যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচরাই মাছ-মাংস খায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই যে, জীব মাত্রেই হত্যা করা মহাপাপ নয়। বেদশাস্ত্রে ছয় প্রকার মানুষকে হত্যা করলেও কোন পাপ হয় না বলে নির্দেশ করা হয়েছে—১) যে বিষ প্রয়োগ করে, ২) যে ঘরে আগুন লাগায়, ৩) যে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে, ৪) যে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে, ৫) যে অন্যায়ভাবে জমি দখল করে এবং ৬) যে বিবাহিত স্ত্রীকে হরণ করে। এই ধরনের শত্রুদের অবিলম্বে হত্যা করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে এবং এদের হত্যা করলে কোনও পাপ হয় না। (গীঃ ১/৩৬ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

আবার, রক্তমাংসের লালসায় প্রাণীহত্যা যে করছে কেবল তারই পাপ হচ্ছে, এরূপ নয়; অধিকন্তু সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মানুষই সেই পাপে জড়িত হয়ে সমানভাবে দণ্ডনীয় হয় বলে শাস্ত্রে বলা হয়েছে; যথা—১) যে বিক্রি করে, ২) যে কেনে, ৩) যে কাটে, ৪) যে হত্যা করতে নির্দেশ দেয়, ৫) যে রান্না করে, ৬) যে পরিবেশন করে, এবং ৭) যে ভক্ষণ করে। (মনুসংহিতা ৫/৫১)

প্রশ্ন ৩। কৃষ্ণই যদি মানুষের সর্বকর্মের মধ্যে রয়েছেন তবে কেন মানুষ এত পাপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে?

উত্তর ঃ না, কৃষ্ণ আমাদের সর্বকর্মেই রয়েছেন মনে করা ঠিক নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—এই জগৎটাকে ভোগ করার স্বতন্ত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়েই জীব প্রকৃত অহংকার বশে জড়া প্রকৃতির তিন গুণ দ্বারা কর্ম করে চলেছে (গীতা ৩/২৯), শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—তোমার সমস্ত কর্ম আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ কর (গীতা ৩/৩০) কিন্তু জীব নিজেই পাপ বা পুণ্য কর্ম করে তার ফল নিজেই ভোগ করে, শ্রীকৃষ্ণ তার কিছুই গ্রহণ করেন না (গীতা ৫/৫৫), অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা জাগতিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কষ্ট স্বীকার করে, যার ফলে জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই জড় সংসারে বিভিন্ন দেহ লাভ করে দুঃখকষ্টই ভোগ করে। (গীতা ২/৪২)

তাই শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।

"ভগবদ্ প্রীতি উদ্দেশ্যেই কর্ম করা উচিত, অন্যথায় সমস্ত কর্মই জন্ম-মৃত্যুর দুঃখময় ভবচক্রে বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।" (গীতা ৩/৯) কিন্তু মূর্খেরা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কৃষ্ণচেতনা হারিয়ে পাপ কর্মেই লিপ্ত হচ্ছে। (ভাগবত ৫/৫/৫)

প্রশ্ন ৪। 'মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক'—এই কথাটি সত্য কি?

উত্তর ঃ স্বর্গ এবং নরক সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থান। যেমন আমাদের এই পৃথিবী হল একটি গ্রহ। সেই রকম স্বর্গলোক বা নরকলোক হল এক-একটি পৃথক গ্রহপুঞ্জ। স্বর্গের পরিবেশ আমাদের এই পৃথিবীর তুলনায় বহু বহু গুণে সুখকর ও সুন্দর। অতীব মনোরম স্থান। সেখানে দেবদেবীগণ থাকেন। আনন্দ উপভোগের স্থান। স্বর্গলোকের রাজা হলেন শ্রীইন্দ্রদেব।

কিন্তু নরকলোক হল এক বীভৎস স্থান। পাপী মানুষদের দণ্ডদাতা শ্রীযমরাজ হলেন নরকের অধিপতি। সমস্ত পাপীদের সেখানে বাস করতে হয় অত্যধিক যন্ত্রণাময় শাস্তি ভোগ করবার জন্য। উপযুক্ত শাস্তির জন্য যাতনা শরীর নামে একপ্রকার শরীর ধারণ করে জীব নরককুণ্ড ভোগ করে। শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে নরকের বর্ণনা রয়েছে।

অবশ্য এই জগতেও আমরা কিছুটা স্বর্গ-নরক ভোগ করছি। যেমন মাতৃজঠরে ভ্রূণ অবস্থায় অসহায় জীব মারাত্মক কষ্টে অবস্থান করে। আবার রুক্ষ আবহাওয়া, বিষাক্ত পরিবেশ, শারীরিক দুরারোগ্য ব্যাধি, উগ্র মানুষদের পাশবিক অত্যাচার, জীব জন্তুর পীড়াদায়ক দংশন, অঙ্গহানি ইত্যাদি এই সবই নরকতুল্য। আবার এই দুঃখময় জগতে ইন্দ্রিয়ভোগ লালসায় নানাপ্রকার আয়োজন হল মায়া-মোহে আচ্ছন্ন মূর্খ জীবেদের কাছে স্বর্গসুখতুল্য।

আবার যেহেতু পাপপুণ্যের বিচার একমাত্র মানব জীবনের উপরই প্রযোজ্য, তাই মানুষই পুণ্যের বা পাপের ফল স্বরূপ স্বর্গ কিংবা নরক ভোগ করে।

প্রশ্ন ৫। পরলোক বলে কিছু আছে কি? মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, পরলোক অবশ্যই রয়েছে। অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই একটি ব্রহ্মাণ্ড চৌদ্দ ভুবন বিশিষ্ট। তার মধ্যে ভূলোকের অন্তর্গত পৃথিবী হল আমাদের বর্তমান ইহলোক। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, যে ব্যাঙ কুয়োতে জীবন কাটাচ্ছে, তার পক্ষে মহাসাগরগুলির ধারণা করাই অসম্ভব ব্যাপার। সেইভাবে ইহলোক ছাড়া আর কোনও লোক নেই—এরূপ মন্তব্য কূপমণ্ডুকতারই পরিচায়ক।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা রয়েছে, *একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং*....."সেই ভগবান গোবিন্দ স্বরূপত একতত্ত্ব হয়েও অচিন্ত্য শক্তিবলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উল্লেখ রয়েছে—শ্রীভগবান বলছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন। (৮/১৬)

"হে অর্জুন, এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত।"

মৃত্যুর পর মানুষ যে কোনও লোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। অবশ্য তা নির্ধারিত হয় তার বিগত জীবনের কর্মকীর্তি, বাসনা, পাপ-পুণ্য ইত্যাদির বিচার অনুসারে।

প্রশ্ন ৬। পাপ কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ মহাভারতে দানধর্মে পাপ দশবিধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি কায়িক পাপ—প্রাণীহত্যা, চুরি করা, পরস্ত্রীহরণ; চারটি বাচিক পাপ—অসৎ প্রলাপ, কর্কশতা, ক্রূরতা, মিথ্যা কথন; এবং তিনটি মানসিক পাপ—পরধনে চিন্তা, সর্বজীবে দয়াশূন্যতা, বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা।

প্রশ্ন ৭। আমরা জানি আমিষ আহার, নেশাভাঙ, জুয়া, অবৈধ সঙ্গ—ভাগবত নির্দেশিত পাপকর্ম। কিন্তু ধাম বা তীর্থে বাস করেও যারা এই সমস্ত পাপ করছে, তারা কি ধামবাসী হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়? কারণ, পুণ্যবান না হলে ধামে বাস করা যায় না, অথচ পাপকর্ম করেও ধামবাস সম্ভব হচ্ছে কি করে?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর ধাম চিন্ময় ও অভিন্ন। তাই ধামে অন্যায় করা এবং ভগবদ্ চরণে অন্যায় করা একই কথা। কিন্তু ভগবান বলছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥

"আমি সর্বত্র সবার কাছে প্রকাশিত হই না। আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত থাকি। মূর্খেরা আমাকে জন্ম-মৃত্যু-রহিত অব্যয় রূপে বুঝতে পারে না।" (গীতা ৭/২৫)

সেই জন্য মায়াচ্ছন্ন ভক্তিহীন ব্যক্তিরা ভগবদ্‌শাস্ত্রের বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে পাপকর্মে নিয়োজিত হয়। এ যেন বীরের মতোই নরকযাত্রা। তাদের পরিণতি সম্পর্কেও ভগবান বলেছেন—"আমি তাদের জন্মে জন্মে অসুর যোনিতে নিক্ষেপ করব।" (গীতা ১৬/১৯)

ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি শ্রীব্যাসদেব উল্লেখ করেছেন—

অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্ন সংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ॥

অর্থাৎ, "(১) তীর্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত আচরণে শ্রদ্ধাহীন, (২) পাপাচারী (জীবহত্যা, অবৈধসঙ্গকারী), (৩) নাস্তিক (ভগবান ও বৈদিক নিয়মকানুন যারা মানে না), (৪) অচ্ছিন্ন সংশয় (তীর্থমহিমা শুনেও যারা তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয় না), (৫) হেতুনিষ্ঠ (কুতর্ক করতে আগ্রহী)—এই পাঁচ প্রকারের মানুষেরা তীর্থে বসবাস করলেও তীর্থফলভোগী হতে পারে না।"

মহাভারতে বলা হয়েছে—

যো লুব্ধঃ পিশুন ক্রূরো নাস্তিকো বিষয়াত্মকঃ।
সর্বতীর্থেষ্বপি স্নাতঃ পাপো মলিন এব সঃ॥

অর্থাৎ, "(১) লুব্ধ বা লম্পট, চোর বাটপাড়, (২) পিশুন বা খলচরিত্র, (৩) ক্রূর বা অন্যের ক্ষতি করা যাদের স্বভাব, (৪) নাস্তিক বা ভগবানে ভক্তে ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন, (৫) বিষয়াত্মক বা সাংসারিক বিষয় ভোগ চিন্তাকারী—এই ধরনের মানুষেরা এক তীর্থ কেন, বিশ্বের সমস্ত তীর্থে স্নান করলেও পাপমুক্ত হতে পারে না। তারা যেরূপ পাপী ও কলুষিত, সেইরূপেই থাকে।"

আসলে, ধামবাসের সুফল লাভ করা একটি কথা, আর ধামে থেকে ধামের চরণে অপরাধ করা অন্য কথা। ধামের কৃপায় সংসারবদ্ধ জীব বৈকুণ্ঠগতি লাভ করে, আবার ধামাপরাধযুক্ত ব্যক্তি নরকগতি লাভ করে।

নোংরা আচরণ পরিত্যাগ করলে তবে শুদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় এবং ধামের আশীর্বাদ, ভগবদ্ আশীর্বাদ লাভ হয়। যেমন, ডাক্তারী নির্দেশ হল—ক্ষয়রোগ নিবারণে ধূমপান করা ছাড়তে হবে, তার বদলে ওষুধ ও দুধ খেতে হবে। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি ওষুধ ও দুধ খায় এবং সমানে ধোঁয়াও খেয়ে চলে, তবে তার ক্ষয়রোগ কখনও ভাল হবে না। তেমনই, ধামবাসের ক্ষেত্রেও কলিবদ্ধ মানুষকে ভবযাতনা নিবারণে ধামাপরাধ ছাড়তে হবে, তার বদলে ধামের প্রতি শ্রদ্ধা-যত্নশীল হয়ে ভক্তিময় জীবন যাপন করতে হবে। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি ভগবৎ-প্রসাদ ভোজন, হরিকথা শ্রবণ কীর্তন করে এবং সমানে আমিষ অমেধ্য খেতেই থাকে, নাস্তিকদের সঙ্গ করে তবে, তার ভবরোগ দূর হবে না।

প্রশ্ন ৮। ঈশ্বরের সব কাজ কি মঙ্গলময়? বন্যা-ভূমিকম্প ইত্যাদিতে হাজার হাজার লোক নিহত ও আহত হচ্ছে। অসংখ্য নবাগত নির্দোষ শিশুরাও নিহত হচ্ছে। এই সব ঘটনা কি মঙ্গলময়?

উত্তর ঃ পরমেশ্বরের কার্যকলাপ দিব্য অপ্রাকৃত। তাঁর কার্যকলাপের দোষগুণ বিচার হয় না। স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম যিনি যথাযথভাবে জানতে পারেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। কারণ, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" (গীতা ৪/৯)

বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়-দুর্যোগ ইত্যাদি ঘটনা এই জড় জগতে থাকবে। নানাবিধ ক্লেশ বা দুঃখে পরিপূর্ণ এই জগৎকে তাই বলা হয়েছে *দুঃখালয়ম্* বা 'দুঃখের আলয়' (গীতা ৮/১৫)।

জীব এই সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছে। কারণ, সে জড় জগতের বদ্ধ জীব। প্রত্যেকেই জড় গুণে আবদ্ধ হয়ে কর্ম করে চলেছে। *প্রকৃতে ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ* (গীতা ৩/২৭)।

প্রত্যেক বদ্ধ জীব তার কর্মের ফল ভোগ করতে বাধ্য। প্রকৃতির বিধান অনুসারে সে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। কেবল এই জন্মেই নয়, জন্ম-জন্মান্তরের পূর্ব সঞ্চিত পাপ কিংবা পুণ্য কর্মের ফল সে এই জন্মে অথবা পরবর্তী জন্মে ভোগ করে।

আপাতদৃষ্টিতে শিশুদের নির্দোষ, নিরীহ ও শুদ্ধ বলে মনে করা হলেও, তারা তাদের পূর্ব জীবনের কৃত কর্মের অধীন। আমাদের স্থূল জড় শরীর ত্যাগের পর মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই সূক্ষ্ম শরীরে কর্মের প্রভাব তিনটি স্তরে থাকে। সেগুলি হচ্ছে বীজ, কূটস্থ (বাসনা) এবং ফলোন্মুখ। সেইগুলি সহ জীবাত্মা অপর একটি জড় শরীর ধারণ করে। যে কর্মফল আমরা বর্তমানে ভোগ করছে, তাকে বলা প্রারব্ধ। "শিশু অবোধ হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে মুক্ত পুরুষ। তার পূর্বকৃত সমস্ত কর্ম সঞ্চিত অবস্থায় রয়েছে এবং যথা সময়ে সেগুলি প্রকাশিত হবে। মুক্ত পুরুষ বলতে বোঝায় যিনি সমস্ত জাগতিক কর্ম ও কর্মফল থেকে মুক্ত। তিনি কখনও কোন সুখ-দুঃখের অধীন হন না। কিন্তু শিশুকে আপাতদৃষ্টিতে অবোধ ও শুদ্ধ বলে মনে হলেও, তাকে একজন মুক্ত পুরুষের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা ভুল। সে অবশ্যই এই জড়া প্রকৃতির অধীন।" (ভাগবত ৪/২৯/৭৩ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)।

জড়া প্রকৃতির অধীন হয়ে দুঃখ কিংবা সুখ ভোগ করাটা মোটেই মঙ্গলময় নয়। জীব তার পূর্ব সঞ্চিত পুণ্যের জন্য সুখ ভোগ করে এবং পূর্ব সঞ্চিত পাপের ফলে দুঃখ ভোগ করে। এখন দুঃখ ভোগ করতে থাকলে পাপ বিনষ্ট হতে থাকবে, আবার সুখ ভোগ করতে থাকলে সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হতে থাকবে। কিন্তু একমাত্র ভগবৎ-কর্ম বা ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করাটা নিত্য মঙ্গলময়। যে কর্ম করলে পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখের উত্থান-পতন থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য অপ্রাকৃত আনন্দময় ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়া যায়। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সতর্ক করে দিয়েছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ সমাচর ॥

অর্থাৎ, "ভগবানের প্রীতি সাধনার্থে কর্ম করা ছাড়া অন্য সমস্ত কর্মই জীবকে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই হে কৌন্তেয়, ভগবদ্ সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল কর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত, যার ফলে এই জগতের বন্ধন থেকে সদা সর্বদা মুক্ত থাকতে পারবে।" (গীতা ৩/৯)

ভগবৎ কর্ম সাধনার জন্য জীব মানবদেহ ধারণ করে। বহু ভাগ্যে সে দুর্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করে। বৈদিক শাস্ত্রের বিচারে মাতা-পিতার শুভ চেতনার ফলে ভাগ্যবান শিশুর জন্ম হয়। কিন্তু কলিযুগের অধিকাংশ মাতা পিতারাই নিছক দৈহিক কামনার বশবর্তী হয়ে সন্তান উৎপন্ন করেন। ভগবদ্ভক্ত-সন্তান উৎপাদন করার বাসনা তাঁদের নেই। সেই সন্তানেরাও দুর্ভাগা। তাই তাদেরও অন্যান্য পোকামাকড় ও জীবজন্তুর মতোই মৃত্যুবরণ করতে হয়। এই সমস্তই কর্মফল।

প্রশ্ন ৯। 'জীবহত্যা মহাপাপ'। তবে পিঁপড়ে, উকুন, মশা, মাছি, আরশোলা এগুলির উপদ্রবের প্রতিবিধান কি?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে পিঁপড়ে, উকুন, মশা, মাছি ইত্যাদি প্রাণী বধ হেতু পাপের ফল ভোগ করার কথা রয়েছে। মানুষকে সাবধান থাকতে হবে যাতে এই সমস্ত পোকামাকড় উপদ্রব করতে না আসে। তাই বৈদিক পন্থা হল সর্বদা পরিবেশকে নির্মল রাখা। খাবার দাবার, আসবাবপত্র, দেহ, জামাকাপড়, ঘরদুয়ার, রাস্তাঘাট সর্বদা পরিষ্কার রাখলে পোকামাকড়ের আমদানী হয় না। এছাড়া যুগধর্ম সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে অনিচ্ছাকৃত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, ইচ্ছাকৃত পাপ থেকে নয়।

প্রশ্ন ১০। স্বর্গ কোথায়?

উত্তর ঃ চৌদ্দভুবন বিশিষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমরা মাঝখানে ভূলোকে বাস করছি। ভূলোকের ঊর্ধ্বে ভুবর্লোক রয়েছে। সেখানে উপদেবতা, যক্ষ, পিশাচ আদি প্রাণীরা বাস করে। তার ঊর্ধ্বে স্বর্গলোক। সেখানে ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা বাস করেন।

প্রশ্ন ১১। মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়?

উত্তর ঃ মানুষ মৃত্যুর পর তার পঞ্চভূতের তৈরি দেহটি ক্রমশ পঞ্চভূতে অর্থাৎ, মাটি, জল, বায়ু, আগুন ও আকাশের সঙ্গে মিশে যায়। জীবৎকালে মানুষ পাপ ও পুণ্য কর্মাদি আচরণ করে। পাপ কর্মের ফলে যমদূতেরা তার সূক্ষ্ম শরীরকে আবৃত করে যমপুরীতে নিয়ে যায়। সূক্ষ্ম শরীর হচ্ছে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের আবরণ। যমালয়ে তার বিচার ও উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা হয়। তারপর তার কর্ম অনুসারে একটি স্থূল জড় দেহ গ্রহণ করবার জন্য এই দুঃখময় জগতে তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। পুণ্যকর্ম করলে স্বর্গে সুখ ভোগ করার সুযোগ পায়। সুখভোগের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসে যে কোন শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্ন ১২। মানুষের পাপ ক্ষয় হয় প্রায়শ্চিত্তে, না কি পুণ্য কর্মে? পাপ খণ্ডনের উপায় কি? জীবনে দুঃখলাভ কি পাপকর্মের ফলে? সুখ লাভ কি পুণ্য কর্মের ফল?

উত্তর ঃ মানুষ তার জীবনে যদি পুণ্যকর্ম করে চলে, তবে সে পুণ্যফলে স্বর্গ-সুখ লাভ করবে। পাপকর্ম করলে পাপের ফলে সে দুঃখযন্ত্রণা পাবে। কেউ যদি পাপের ফলে এই জীবনে শাস্তি ভোগ করে থাকে, তা হলে শাস্তিটাই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, তাই সেই পাপ খণ্ডিত হল। আবার যদি কেউ পাপকর্ম না করার সংকল্প করে এবং পুণ্যকর্ম করেই চলে, তবে সে-ও শুদ্ধতা লাভ করছে। *অন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্য কর্মণাম্।* (গীতা ৭/২৮) প্রায়শ্চিত্ত কথাটির তাৎপর্য হল পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা। কেউ প্রায়শ্চিত্তের পরেও যদি পাপ করতে থাকে তবে সেই রকম প্রায়শ্চিত্তের কোনও মূল্য নেই। *প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ।* চোর চুরি করল। ধরা পড়ল। শাস্তি পেল। আবার চুরি করল। আবার ধরা পড়বে। আবার শাস্তি পাবে। আবার....—এইভাবে পাপপ্রবণ মানসিকতার ফলে মানুষ কোন দিনও শুদ্ধ হতে পারবে না। চির যাতনা ভোগই তার ভাগ্যে ঘটে। আবার কেউ বেদবিহিত পুণ্যকর্ম করার ফলে স্বর্গসুখ ভোগ করল। স্বর্গের সুখ ভোগের ফলে তার সঞ্চিত পুণ্য শেষ হয়ে যায়। তখন আবার তাকে দুঃখময় সংসারে জন্ম নিতে হয়। *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্য লোকং বিশন্তি।* তখন হয়তো আবার পাপকর্মে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতেই পারে। কভু স্বর্গে কভু বা নরকে। তবে পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার সবচেয়ে চূড়ান্ত পন্থা হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগত হওয়া। কেউ যদি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হয়, *মাম্ একং শরণং ব্রজ,* তবে হর্তা কর্তা বিধাতা শ্রীকৃষ্ণ তার সমস্ত পাপ থেকে তাকে মুক্ত করবেন। *সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি।* আমরা যদি এই দুঃখযন্ত্রণাময় জড় জগৎ থেকে উত্তীর্ণ হতে চাই, আর এই জগতে জন্ম-মৃত্যু আদির যন্ত্রণা ভোগ করতে না চাই, তবে আমাদের অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত ব্যক্তির অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তের সেবা করতে হবে। *মহৎ সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে।* অন্যথায় জগতে দুরাচারী বিষয়ী কৃষ্ণভক্তিবিমুখ ব্যক্তির সঙ্গক্রমে আমাদের পাপময় যন্ত্রণাময় জীবনে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। *তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।* ভগবদ্ভক্তিতে আমাদের যুক্ত হতে হবে। অবশ্য ভক্তিযোগে থাকলে পাপ ও পুণ্য দুই-ই নষ্ট হয় এবং জীব দুঃখময় সংসার উত্তীর্ণ হয়ে ভগবদ্ধামে গতিলাভ করে, যা দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের লক্ষ্য বস্তু। তবে এই জগতে থাকাকালীন ভক্তেরও অনেক সময় দুঃখকষ্ট ভোগ হতে দেখা যায়। যেমন, চলন্ত বৈদ্যুতিক পাখা বন্ধ করলেও হালকাভাবে কিছুক্ষণ ঘুরতেই থাকে, সেইভাবে ভক্তিযোগে পাপ নষ্ট হলেও কিছু দিন লঘুভাবে কষ্ট লাভ হতেই পারে। *নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু।* কিন্তু পাখার ঘূর্ণায়মান অবস্থাটি কালে নিশ্চিত রূপে বন্ধ হয়ে যায়, তেমনি ভক্তেরও ভবসংসার চক্র থেকে নিশ্চিতভাবে উত্তরণ ঘটে। আর, বর্তমান জীবনে আমরা যেসব সুখ দুঃখ ভোগ করছি—সেই সবই আমাদের পুণ্য বা পাপকর্মের ফলস্বরূপ। কিন্তু যখন কেউ কৃষ্ণের আনন্দবিধানের জন্য ভক্তিযুক্ত কর্ম করে তখন সেই কর্ম এই জড় জাগতিক সুখ-দুঃখ ভোগের কারণ হয় না, কৃষ্ণভক্তিসেবা করার ফলে বদ্ধ জীব পাপ-পুণ্য—সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে নিত্য অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করবার সুযোগ পায়।

প্রশ্ন ১৩। সাধারণত বলা হয় ছোট শিশু নিষ্পাপ। কিন্তু আমার মনে হয় নিষ্পাপ হলে ধরা ধামে না এসে গোলোক বৃন্দাবনে সে চলে যেত। পাপীরাই এই জগতে আসে। কোন্‌টি ঠিক?

উত্তর ঃ মহাভারতের শান্তিপর্বে ৩২৩ অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শ্রীভীষ্মদেব বলছেন, "মানুষ গর্ভবাস কালেও প্রাক্তন সুখ-দুঃখ পেয়ে থাকে। কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্ধক্য, লোকে যে অবস্থায় যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাকে পরজন্মে সেই অবস্থায় তার অনুরূপ ফল ভোগ করতেই হয়।"

অর্থাৎ, ছোট শিশু মাত্রই নিষ্পাপ—এটি ঠিক কথা নয়। কারণ পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফল অনুসারে তাকে এই জন্ম-মৃত্যুর ভবসংসারে জন্ম লাভ করতে হয়েছে। আবার অনাধিক একশ বছরের মধ্যে যেকোনও মুহূর্তেই তাকে দেহত্যাগ করতেই হবে। পুনরায় নতুন কোনও দেহ ধারণ করতেই হবে। তবে, যদি কেউ ছোটবেলা থেকেই হরিভজন শুরু করে দেয় তবে তার প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট হয়। অর্থাৎ, প্রারব্ধ পাপের ফলভোগ থেকে সে রক্ষা পায়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তাঁর শরণাগত ব্যক্তিকে তিনি সর্ব পাপ থেকে রক্ষা করেন। *সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি* (গীতা ১৮/৬৫)।

পাপী মানুষেরাই এই ধরাধামে আসে—এই কথাটিও ঠিক নয়। কারণ, যারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তনে ব্রতী হয়ে নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত জীবনযাপন করছেন তাঁরা অবশ্যই সর্বদেবতারও বন্দনীয়। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, স্বর্গের দেবতাগণ সংকীর্তন আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে মানবকুলে জন্মগ্রহণের বাসনা করে থাকেন। অতএব পাপীরাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে—এরূপ মনে করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ১৪। যদি কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে পাপকর্ম করার ফলে নরকে গমন করে, তারপর নরক যাতনা ভোগ করার পর সে কিরূপ জন্ম পাবে?

উত্তর ঃ বিভিন্ন পুরাণাদি বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা এ বিষয়ে কিছুটা জানতে পারি। যেমন, শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে থাকাকালীন কোনও মানুষ যখন আচার্যের প্রতি কপট ব্যবহার করে, তবে তাকে কুকুরের দেহ পেতে হবে। কারও দ্রব্য হরণ করলে, কিংবা যজ্ঞে দানে বিবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে, কিংবা দত্তা কন্যার পুনর্দান করলে, কিংবা পতিত জনের পূজা করলে কৃমিকীট হয়ে জন্মাতে হয়। ধান, গম ইত্যাদি শস্য হরণ করলে ইঁদুর হয়ে জন্মাতে হয়। অবৈধ যৌনতায় শূকর, শিয়াল, কুকুর, শকুন যোনি লাভ হয়। ভ্রাতার পত্নীকে পীড়ন করলে কচ্ছপ জন্ম নিতে হয়। পিতামাতার অবমাননা করলে গর্দভ জন্ম নিতে হয়। পিতামাতার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করলে শালিক পাখি হয়ে জন্মাতে হয়। ভূমি অন্যায় ভাবে দখল করলে নরক যাতনা ভোগের পর ঘাস, চামড়াসার গাছ, উঁইপোকা, পিঁপড়ে, ইঁদুর হয়ে জন্মাতে হয়। মাছ মাংস ভক্ষণ করলে নেকড়ে, শেয়াল, বক জন্ম লাভ হয়। ভণ্ড বৈরাগী হলে বিড়াল, বক, বাঁদর জন্ম লাভ হয়। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণকে নিবেদন না করে ভোজন

করলে কাক জন্ম পেতে হয়। স্ত্রীলোক, শিশু বা অস্ত্রবিহীন পুরুষকে হত্যা করলে কৃমি জন্ম পেতে হয়। স্ত্রী বা শিশুর খাদ্য হরণ করলে মাছি হয়ে জন্মাতে হয়। কারও অন্ন হরণ করলে বিড়াল জন্ম পেতে হয়। দুধ হরণ করলে বক জন্ম পেতে হয়। মধু হরণে ডাঁস ও ঘি হরণে বেঁজি, সুগন্ধি তেল হরণে ছুঁচো জন্ম পেতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, যারা আপন গোপন অঙ্গ অন্যকে দেখায় তাকে গাছ হয়ে জন্মাতে হয়। কাউকে দান করা বস্তু পুনরায় গ্রহণ করলে গিরগিটি জন্ম পেতে হয়।

অবশ্য অতি হিংস্র নিষ্ঠুর প্রকৃতির পাপীদের পুনর্জন্মের ফলে পূর্ব পাপের ফল স্বরূপ কেউ খোঁড়া, কানা, রোগগ্রস্ত, যক্ষ্মা, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠরোগ, বায়ুরোগ ইত্যাদি বিভিন্ন রোগপ্রাপ্তি ঘটে এবং নীচ-হীন কুলে জন্ম পেতে হয়।

প্রশ্ন ১৫। আমি জীবনে কোন অন্যায় করিনি, তবে আমাকে কেন এত কষ্ট পেতে হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর কি?

উত্তর ঃ 'আমি জীবনে কোন প্রকারের অন্যায় করিনি, আমি কারও কোন ক্ষতি করিনি, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ'—আমাদের এই ধরনের কথা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার দোষ আছে বলেই তো এই জড় জগতে আমি পতিত হয়েছি। নইলে তো আনন্দময় ধামে অবস্থান করতাম। শাস্ত্রে বলে—

যেই মাত্র জীব কৃষ্ণ ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তারে গলায় বাঁধিল ॥

আমার দোষ আছে বলেই তো এই জগতে পড়েছি। এই জগতে প্রতিপদেই পাপাচার হচ্ছে। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে অসংখ্য অন্যায় হচ্ছে। কত শত পিপীলিকা পায়ের তলায় পিষ্ট করছি। কত শত ক্ষুদ্রপ্রাণী আমার শ্বাসকার্যের সময়ে হত্যা করছি। আগুন জ্বালিয়ে বহু প্রাণী দাহ করছি। কত লোক আমার দ্বারা উদ্বিগ্ন হচ্ছে। কত কথা ভুল বোঝাবুঝি করে অন্যের অশান্তির কারণ হচ্ছি। নিজের অস্তিত্বের জন্য আমি অন্যের সম্পদ ভোগ করছি। আমার আরামের জন্য অন্যের সেবা নিচ্ছি, অন্যের কষ্টের কারণ হচ্ছি। আকাশ বাতাস জল মাটি ফুল ফল শস্য—এ সমস্ত গ্রহণ করছি। কিন্তু যাঁর সম্পদ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ নই। অথচ আমি পাগলের মতো প্রলাপ বকছি যে, 'আমি কোন অন্যায় করিনি।'

যদি কেউ মনে করে যে, 'আমি কারও ক্ষতি করবো না, কেউও আমার কোনও ক্ষতি করবে না। কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না। আমি একেবারে শান্ত সুন্দরভাবে থাকতে পারবো।' এই রকম যদি কেউ মনে করে তবে সে নিশ্চয়ই মূর্খ। এই জগৎ সংসার সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন, *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্।* উদ্বেগ আঘাত ব্যাঘাত পূর্ণ জগতে—দুঃখময় কুণ্ঠাময় জগতে বাস করে কেউ যদি শান্তি সুখ বিকুণ্ঠা পাওয়ার আশা করে তবে সে অবশ্যই গণ্ডমূর্খ। এই দুঃখময় উদ্বেগময় কুণ্ঠময় জগতে থেকেই আমাদের বৈকুণ্ঠধামের সন্ধানে যাওয়ার জন্য ঐকান্তিক ভাবে হরিভজনের নির্দেশ গীতা-ভাগবতে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ১৬। উদ্ভিদেরও প্রাণ রয়েছে। তাই শস্যাদি ভক্ষণে কি পাপ হবে না?

উত্তর ঃ গাছপালা, পশু-পাখি, মাছ-ব্যাঙ, সবারই প্রাণ রয়েছে। শাস্ত্রে পশু-পাখি মাছ-ব্যাঙ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। গাছপালা শাক-সবজি শস্যদানা ফুল-ফল খেলেও পাপ হবে। তবে শাক-সবজি ফল-ফুল ভগবানকে ভোগ নিবেদন করে তাঁর প্রসাদরূপে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শকুন, শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, সাপ ইত্যাদি প্রাণীরা আমিষাশী; আর ছাগল, গরু, বাঁদর, হাতি ইত্যাদি প্রাণীরা নিরামিষাশী। বৈষ্ণবধর্মে মানুষকে আমিষভোজী বা নিরামিষভোজী হতে বলা হয়নি। মানুষকে মহাপ্রসাদভোজী ভক্ত হতে বলা হয়েছে। অবশ্য মাছ মাংস ডিম রক্ত ভগবানকে নিবেদন করা নিষিদ্ধ। শাক-সবজি শস্য ফুল ফল চিনি দুধ ভগবানকে নিবেদন করে ভগবানের উচ্ছিষ্ট রূপে সেই মহাপ্রসাদ গ্রহণীয়।

প্রশ্ন ১৭। মানুষকে পাপকর্ম করতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ পাপকর্মফলে তাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে যাতনা ভোগ করবার জন্য জড় সংসারে পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু পাপকর্ম কি?

উত্তর ঃ পাপকর্ম হচ্ছে শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ম নয়, বরং শাস্ত্র বিরুদ্ধকর্ম-যা শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে। মানুষ এই জগতে যে সব পাপকর্ম করে সেগুলি তিন প্রকারের। তিন প্রকারের পাপকর্ম হচ্ছে—শরীর মাধ্যমে পাপকর্ম বা শারীরিক পাপ, বাক্য দিয়ে পাপকর্ম বা বাচিক পাপ, এবং মনে মনে পাপকর্ম বা মানসিক পাপ।

শারীরিক পাপ হচ্ছে তিন প্রকারের। যেমন—পরহিংসা, চুরি ও পরস্ত্রীসঙ্গ। পরহিংসা বলতে অপরকে অনর্থক প্রহার করা, আঘাত করা, কষ্ট দেওয়া কিংবা কাউকে হত্যা করা ইত্যাদি বোঝায়।

বাচিক পাপ হচ্ছে চার প্রকারের। যেমন—অসৎ প্রলাপ, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, পরদোষ কীর্তন, মিথ্যা কথন।

মানসিক পাপ হচ্ছে তিন প্রকারের। যেমন—পরদ্রব্যে লোভ, পরের অনিষ্ট করবার চিন্তা, বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা।

কায়মনোবাক্যে যে ব্যক্তি এই ত্রিবিধ পাপকর্ম সযত্নে এড়িয়ে থাকবেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বদা কল্যাণ লাভ করবেন, এবং পরমসুখী হবেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশে জগাই-মাধাই সমস্ত পাপকর্ম ত্যাগ করে দিয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে ব্রতী হয়ে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছিলেন।

কলিযুগে চারটি পাপের ভিত গঠিত হয়েছে। সেগুলি হল মাংস-আহার, জুয়াখেলা, নেশাভাঙ ও অবৈধ যৌনতা। কল্যাণকামী মানুষ এ সমস্ত ভাগবত নির্দিষ্ট পাপাচার সযত্নে এড়িয়ে চলবেন। এই চারটি হচ্ছে কলির আড্ডাখানা। এই চার পাপ-কর্মে মনুষ্যধর্ম বিনষ্ট হয়। যেমন—মাছ-মাংস আহারে দয়া গুণ নষ্ট হয়, জুয়াখেলার ফলে সত্য গুণ নষ্ট হয়, নেশাভাঙের ফলে শৌচগুণ নষ্ট হয়, অবৈধ যৌনতার ফলে তপোগুণ নষ্ট হয়। তখন নামে কিংবা আকারে আমরা মানুষ থাকলেও ইতর জন্তুর পর্যায়ে

বাস্তবিক পর্যবসিত হই এবং কোন জীবনেও কোন লোকেই আমরা প্রকৃত সুখ-শান্তি পেতে পারব না।

এই জগতে আমাদের জীবনের অস্তিত্ব যদি অন্য কারও জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে আমরাও কখনও বিধির বিধান অনুসারে সুখ-শান্তি পেতে পারব না। তাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম থেকে সাবধান।

প্রশ্ন ১৮। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে।" আবার বললেন "কোটি জন্ম করে যদি নাম সংকীর্তন। তথাপি নাহি পায় সে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥" দুইরকম কথা কেন?

উত্তর ঃ পাপাচার ও অপরাধযুক্ত নাম কোটিজন্ম ধরে করলেও শুদ্ধ হওয়া যায় না। আবার অপরাধশূন্য হয়ে শুদ্ধ হৃদয়ে একবার কৃষ্ণনামেই পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকলুষ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ১৯। এই জীবনে আমরা যে সব কর্ম করছি সেই কর্মের ফল এজীবনে ভোগ না হলে পরবর্তী জীবনে ভোগ করতে হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

কর্মাণি আরভতে যেন পুমান্ ইহ বিহায় তম্ ।
অমুত্র অন্যেন দেহেন জুষ্টান্ স যদ্ অশ্নুতে ॥

অর্থাৎ, "মানুষ ইহজীবনে যে সমস্ত সকাম কর্ম করে, তার ফল সে পরবর্তী জীবনে ভোগ করে।" (ভাঃ ৪/২৯/৫৯)

মন্দ কর্মের মন্দ ফল, ভাল কর্মের ভাল ফল ভোগ করবার জন্য এই জড় জগতে কোনও জন্ম পেতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় জীবনযাপন করে দেহত্যাগের পর ভগবদ্ধামে চলে যাওয়া যাবে।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার কর্মের ফল ভোগ করতে চায়, সে তার কর্মের বন্ধনে জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু যিনি তাঁর কর্মের ফল বা লাভ ভগবানকে অর্পণ করেন, তিনি কখনও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। তিনি মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন। (গীতা ৩/৯)

প্রশ্ন ২০। এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে ॥
এই কথাটি কোন্ শাস্ত্রে বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ মূলশাস্ত্র শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ ।
তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী নরঃ ॥

অর্থাৎ, "পবিত্র শুদ্ধ হরিনাম উচ্চারণের ফলে যে পরিমাণ পাপ থেকে মানুষ উদ্ধার লাভ করে, তত পরিমাণ পাপ করার ক্ষমতা কারও নেই।"

কৃষ্ণনামে বহুল পুঞ্জীভূত পাপরাশি ভস্মীভূত হয়। নাম-অপরাধ সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে হবে। উপরিউক্ত বাংলা শ্লোকটি মূল সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ মাত্র।

প্রশ্ন ২১। আমরা শাস্ত্র কথা শুনে থাকি যে, গঙ্গাজলে স্নান করলে মানুষ শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়। তা হলে আমরা সারা জীবন পাপ করে চলব, তারপর গঙ্গায় স্নান করে নিলেই হল, তাই নয় কি?

উত্তর ঃ গঙ্গা-মাহাত্ম্যের ভরসায় যারা পাপ করে, তারা গঙ্গাদেবীর প্রতি বিষম অপরাধী। অন্য সমস্ত পাপ গঙ্গাস্নানে দূর হয়, কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ গঙ্গাস্নানে দূর হয় না। (ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, সঃ তোঃ ১০/৪)

প্রশ্ন ২২। কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে। গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে। এই উক্তির দৃষ্টান্ত দিলে খুশী হব।

উত্তর ঃ কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং গুরু হচ্ছেন ভগবানের পরম ভক্ত। তাঁরা রুষ্ট তখনই হন যখন তাঁদের চরণে গর্হিত অপরাধ করে বসি।

মহা প্রতাপশালী তেজস্বী ঋষি দুর্বাসা যখন ভগবানের প্রিয়ভক্ত অম্বরীশ মহারাজের চরণে অপরাধ করলেন তখন অগত্যা অম্বরীশ শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হলেন। ভগবান তখন সুদর্শন চক্র দিয়ে দুর্বাসাকে আক্রমণ করলেন। সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনও পন্থা পেলেন না। ভগবান তাঁকে নির্দেশ দিলেন অম্বরীশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে। দুর্বাসা মুনি অম্বরীশের চরণে পতিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে অম্বরীশ সুদর্শন চক্রকে যথাস্থানে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। এভাবে দুর্বাসা মুনি রক্ষা পেলেন।

আমাদের দৈনন্দিন ভক্তি-জীবনে আমরা অনেক অপরাধ করে বসি। এতে ভক্তিবিঘ্নফলে আমাদের পতন ঘটার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু গুরুদেবের কৃপাদৃষ্টিবলে আমরা সংশোধন হই।

প্রশ্ন ২৩। অনেক লোককে দেখা যায় অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে ফুল ও জল দান করে প্রণতি নিবেদন করে। কেন?

উত্তর ঃ স্কন্দপুরাণে উল্লেখ রয়েছে—

অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী গো-ভূমিসুর-বৈষ্ণবাঃ ।
পূজিতাঃ প্রণতাঃ ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘম্ ॥

অর্থাৎ, "অশ্বত্থ, তুলসী, আমলকী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে পূজা করলে, প্রণাম করলে, ধ্যান করলে মানুষের সর্বপাপ নাশ হয়।"

প্রশ্ন ২৪। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে আমাদের রুচি থাকে না, ভজনে আস্থা হারিয়ে যায় কেন?

উত্তর ঃ শ্রীভগবান, ভক্ত, শ্রীনাম, শ্রীধাম—এই সমস্ত চিন্ময় বস্তুতে যখনই জড়বুদ্ধিবশে আমরা অবজ্ঞা অনাদর ইত্যাদি মনোভাব পোষণ করি তখনই অপরাধ হয়।

সেই অপরাধই আমাদের ভজন সাধনে নিদারুণ বিঘ্ন ঘটায়। তখন আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি অন্তর্হিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন ২৫। ভক্তরা কি কখনও কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা করে?

উত্তর ঃ শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, আত্মহত্যায় কৃষ্ণ মেলে না। পাপ কর্ম ফলে তামসিক চেতনায় লোকেরা আত্মহত্যা করে।

দেহ ত্যাগাদি তমোধর্ম—পাতক কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪/৬০)

প্রশ্ন ২৬। পৃথিবী থেকে নরকের দূরত্ব কত?

উত্তর ঃ ৭ লক্ষ ৯২ হাজার মাইল।

প্রশ্ন ২৭। আমরা যে সব কর্ম করে চলেছি, কি পাপ কি পুণ্য, সে সব কে দেখছে?

উত্তর ঃ মানুষের সমস্ত কর্মের সাক্ষী চৌদ্দ জনের নাম মহাভারতে (আদি পর্ব) উল্লেখ রয়েছে। যথা (১) সূর্য, (২) চন্দ্র, (৩) বায়ু, (৪) অগ্নি, (৫) আকাশ, (৬) পৃথিবী, (৭) জল, (৮) দিবা, (৯) নিশা, (১০) উষা, (১১) সন্ধ্যা, (১২) ধর্ম, (১৩) কাল, (১৪) পরমাত্মা। সারা বিশ্বে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে আমরা অনেক কিছু পাপকর্ম করতে পারি, কিন্তু এ সকল দেবতাদের কাউকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আবার আমাদের বহু সৎকর্মের হিসাব এই বিশ্বে কেউ না রাখলেও উনারা সাক্ষী থাকেন। এমন কি সমস্ত দেবতাকেও যদি কখনও সম্ভব হয়ে থাকে কোনও কিছু তাঁদের আড়ালে থাকার বা করার মতো, তবুও কাল কিংবা সর্বোপরি পরমাত্মাকে আড়াল করে কোনও কিছু করাই সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ২৮। কৃষ্ণভক্ত হওয়ার ফলে কিভাবে মৃত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার সম্ভব হয়?

উত্তর ঃ ভগবান যখন বলে রেখেছেন, তাঁর ভক্ত হলে, ভক্তের পিতৃপুরুষেরাও উদ্ধার পেয়ে যাবেন, তখন ভগবানই জানেন কিভাবে তিনি পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করবেন। হয় তো তাঁরা শীঘ্রই ভক্তগৃহে জন্মলাভ করবার, ভক্ত হবার সুযোগ পাবেন।

প্রশ্ন ২৯। একজনের কর্মের ফল কিরূপে অন্যজন ভোগ করবে? একের পাপ-পুণ্য কিভাবে অপরে সংক্রামিত হতে পারে?

উত্তর ঃ সঙ্গক্রমে পাপ-পুণ্য একে-অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে থাকে। এজন্য শাস্ত্রে 'সাধুসঙ্গের জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে। পাপাচারী মানুষের সঙ্গক্রমে পাপাচারী হতে হবে।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে প্রজার পাপপুণ্য রাজাতে বর্তায়, অর্ধাঙ্গিনী পত্নী পতির পুণ্যের ভাগী হয়, আর পতিকে পত্নীর পাপের ভাগী হতে হয়।

প্রশ্ন ৩০। প্রত্যেক মানুষ কি তার আগের জন্মের পাপের ফল পরজন্মে পায়?

উত্তর ঃ *স্বকর্মফলভুক্ পুমান্*—মানুষ তার কর্মের ফল ভোগ করে। পূর্ব জন্মের বা এই জন্মের কর্মফল এই জন্মে বা পরজন্মে ভোগ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা পূর্ব জন্মের কর্মফল ভোগ করছি, এবং এই জন্মের কর্মফল পরজন্মে বর্তাবে।

প্রশ্ন ৩১। শাস্ত্রে বলা হয়েছে শত্রুকে মারলে পাপ হয় না। মশা তো মানুষের শত্রু, মশা মারলে পাপ হয় কেন?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে শত্রু ছয় প্রকার—১) যে বিষ প্রয়োগ করে, ২) যে ঘরে আগুন লাগায়, ৩) যে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে, ৪) যে অন্যায়ভাবে জমি দখল করে ৫) যে বিবাহিত স্ত্রীকে হরণ করে, ও ৬) যে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। এদের হত্যা করলে কোনরকম পাপ হয় না।

কিন্তু কোনও মশা তো এই ধরনের কর্ম করছে না। মশা কারও ঘরে আগুন লাগাচ্ছে না, কিংবা জমি দখল করছে না, মশা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে রক্ত খেতে আসে। মানুষ সেটা পছন্দ করে না, তাই স্বাভাবিক নিয়মে মশারি ব্যবহার করতে পারে। তাতে তো পাপ নেই।

প্রশ্ন ৩২। পুণ্য কর্ম করার মাধ্যমে পাপ কর্মফল থেকে মানুষ মুক্তি পায় কি না? না কি পাপের ফল এবং পুণ্যের ফল দুটোই ভোগ করতে হয়?

উত্তর ঃ পাপের ফল এবং পুণ্যের ফল দুটোই আলাদা হিসাব। দুই ফলই ভোগ করবার জন্য মানুষ এই জড় সংসারে আবদ্ধ। কর্মফলচক্র থেকে মুক্তি পেতে হলে কৃষ্ণনাম করতে হয়, কৃষ্ণভক্তি করতে হয়। কৃষ্ণনামে পাপ হরণ হয়। ভববন্ধন মুক্তি হয়। ভগবদ্ধামে গতি হয়। পাপবাসনা ত্যাগ করতে হয়।

প্রশ্ন ৩৩। যজ্ঞ করলে নাকি বৃষ্টি হয়, চেরাপুঞ্জিতে প্রচুর বৃষ্টি, সাহারাতে খরা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণনাম হচ্ছে, সেখানেও বৃষ্টি নেই। কেন?

উত্তর ঃ কৃষ্ণ বলছেন যজ্ঞ করলে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির ফলে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। তা খেয়ে জীব বেঁচে থাকে। খাদ্য বস্তুটি কৃষ্ণের দান। যজ্ঞ কথাটির অর্থ হল ভগবানের সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে বেদবিহিত কর্তব্যকর্ম। ভগবানের সন্তোষ বিধান হলে তাঁর ভৃত্য স্বরূপ ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ—যাঁরা জল, তাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করেন—তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে উপযুক্ত রোদ, উপযুক্ত বৃষ্টি দান করবেন, ফলে শস্যাদির ফলন বৃদ্ধি হবে, লোকে সুখী হবে। অন্যথায় অতিবৃষ্টি, অতিখরায় শস্যহানি হবে, লোকে কষ্ট পাবে। সুতরাং, কে কোথায় যজ্ঞ করল কি করল না, বৃষ্টি হল কি হল না, খেতে পেল কি পেল না, ভালো থাকল কি থাকল না—সে বিচার করতে হলে পূর্ণ দৃষ্টি থাকা চাই।

প্রশ্ন ৩৪। কৃষ্ণভক্তি আচরণ করলে সমস্ত ক্লেশ দূর হয়ে যায়। এ কথার অর্থ কি?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, আমরা ক্লেশ বা যাতনা পাচ্ছি আমাদের পাপ কর্মের ফলে। আমরা জ্ঞানে অজ্ঞানে নানাবিধ পাপ করে থাকি। সেগুলি 'পাপ', আবার পাপকর্ম করার বাসনা মনের মধ্যে রয়েছে সেগুলি 'পাপবীজ'। আমরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—সেই স্বরূপ জ্ঞানই নেই, তা 'অবিদ্যা'। এগুলিই সমস্ত দুঃখ-ক্লেশের কারণ। কিন্তু শুদ্ধভক্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হলে সমস্ত পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা দূর হয়ে যায়।

প্রশ্ন ৩৫। নির্মল হওয়ার জন্য চারটি বিধিনিষেধ পালন করতে হয়। সেই বিধিনিষেধ গুলি কি কি?

উত্তর ঃ কলিযুগের মানুষের হৃদয় স্বভাবতই কলির প্রভাবে কলুষিত থাকে। তার পারমার্থিক উন্নতি বিধানের জন্য যুগধর্ম 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ কীর্তন করতে হবে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্‌ (কলিসন্তরণ উপনিষদ) এই ষোলনাম যুক্ত মহামন্ত্রটি কলির কলুষ নাশ করে।

হরিনাম গ্রহণ করার সঙ্গে চারটি কলির ক্রিয়াকাণ্ড যেমন আমিষ আহার, জুয়া-লটারী, নেশাভাঙ, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ সযত্নে বর্জন করে চলতে হবে।

প্রশ্ন ৩৬। যদি কেউ অপরকে নোংরাভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে, তার ফল কি?

উত্তর ঃ বাক্‌শক্তির পবিত্রতা থাকাই কাম্য। লোকের গালাগালকে ভয় করে চলা ভালো। সংযত জীবনযাপনই কর্তব্য। অন্যায়ভাবে কাউকে উদ্দেশ করে যদি গালি দেওয়া হয় তবে তাতে নিশ্চয় দোষ সঞ্চিত হয়। রামায়ণে দেখা যায় শূর্পনখা সীতাদেবীর নামে 'কুদর্শনা বিকট-চেহারা' ইত্যাদি বলে গালি দিচ্ছিল। সেই অপরাধে সে পরজন্মে বিকট চেহারা নিয়ে কুব্জী হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। চোরকে 'চোর' বলাটা তেমন দোষের না হতে পারে, কিন্তু ভুল বুঝে সাধুকেও চোর বলে ফেললে তার জন্য মন্দ পরিণতি অপেক্ষা করে থাকে। সাধুলোকেরা বাকসংযমী ও মিষ্টভাষী হন। হরিভক্তিবিলাসে নির্দেশ রয়েছে—*ন ম্লেচ্ছভাষণং শিক্ষেৎ* (হঃ ভঃ বিঃ ১১/৭৭০) ম্লেচ্ছজনের ভাষা শেখা উচিত নয়। ভাষা মন্দ হওয়ার ফলে লোকে অন্যদের কাছে হেয় ও হিংসার পাত্র হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৩৭। দীক্ষা গ্রহণ করলে কি আমাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়?

উত্তর ঃ পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শ্রীগুরুদেবের কাছে হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলে অতীত জীবনের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

পূর্বে যত পাপাদি বহু জন্মে করে।
হরিদীক্ষা মাত্রে সেই সব পাপে তরে ॥

দীক্ষাকালে যখন কেউ গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করে অর্থাৎ, কায়মনোবাক্যে ভক্তি অবলম্বন করে জীবন যাপন করবার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তার পূর্বপাপ খণ্ডন করে দেন।

অকৈতবে করে যবে আত্মনিবেদন।
কৃষ্ণ তার পূর্বপাপ করেন খণ্ডন ॥

কিন্তু বাহ্যত ভক্তিভাব, নিষ্ঠা আর অন্তরে জড়ভোগ লালসাদি থাকলে নানাবিধ অপরাধ প্রবণতা মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তখন সে জাগতিক পুণ্য কিংবা পাপের দাস হয়ে পড়ে। কপটতায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ হয় না। নিষ্পাপ নিরপরাধ হতে হলে নিষ্কপট হ'তে হবে।

নিষ্কপটে হরি-আশ্রয় করে যেই জন।
সর্ব অপরাধ তার বিনষ্ট তখন ॥

প্রশ্ন ৩৮। দীক্ষায় যদি পাপমুক্ত হওয়া যায়, তবে দীক্ষার পরেও কেন নানাবিধ অঘটন ঘটে থাকে?

উত্তর ঃ দীক্ষার পরেও নানাবিধ জানা-অজানা পাপ বা বিষ্ণু-বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে যায়। সেগুলি জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপায় অনবরত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মতি থাকলে পাপাদি কলুষ স্পর্শ করার সুযোগ পায় না। কিন্তু জড় জাগতিক মোহ বা তীব্র আসক্তিকে মনের মধ্যে পোষণ করতে থাকলে কৃষ্ণনিষ্ঠা কার্যকরী হয় না। সেই সুযোগে অঘটন অমঙ্গল প্রবেশ করার সুবিধা পেয়ে যায়।

যদিও বা এই জগৎটি দুঃখদুর্দশায় পূর্ণ, কিন্তু কারও যদি শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা অর্থাৎ, নামসেবা, ধামসেবা, ভক্তসেবা, ভক্তিসেবাদিতে আগ্রহ থাকে তখন সমস্ত অঘটন এলেও, হৃদয়টি সেই সব প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। আচার্যগণ এই ধরনের কথা বলে থাকেন।

প্রশ্ন ৩৯। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে জগাই-মাধাইকে সর্বপাপ মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাতে জগাই-মাধাইয়ের কি কোনও বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল?

উত্তর ঃ যখন জগাই-মাধাই পাপযুক্ত ছিল তখন তারা মদ খেত, মাংস খেত, অবৈধ সঙ্গ করত, চুরি-ছিনতাই করত। তাদের মুখে সর্বদা নোংরা ভাষা উচ্চারিত হত। যেদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের পাপমুক্ত করলেন সেদিন থেকে তাদের চেতনা, তাদের ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তিত হল। তারা সব সময় কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে লাগল। মদ-মাংস গাঁজা বিড়ি খাওয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জন করল। আগে তাদের ছোঁয়া লাগলে সাধুসন্তরা গঙ্গায় স্নান করত। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল সমস্ত সাধুরা তাদের আলিঙ্গন করছে, প্রণতি নিবেদন করছে। যাদের মুখে সর্বদা নোংরাভাষা উচ্চারিত হত, তাদের মুখে এখন সর্বদা কৃষ্ণনাম। সমগ্র নবদ্বীপবাসীর কাছে যারা ছিল এক রকমের আতঙ্কের পাত্র, তারাই এখন সবার আকর্ষণীয় শ্রদ্ধার পাত্র। যারা পথিকদের দেখলেই তাদের ছিনতাই করবার চেষ্টা করত, তারা এখন যাকেই দেখছে তাকেই প্রণতি জ্ঞাপন করছে। জগাই মাধাইয়ের কায়মনোবাক্যই এভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল।

মহাপ্রভুর প্রিয়জন শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যখন জগতের অসংখ্য জগাই-মাধাইয়ের মতো ব্যক্তিকে কৃষ্ণভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করলেন, তখন তাদের জীবনের রীতির বিরাট পরিবর্তন হল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছেন সারা পৃথিবীতে হরিনামের প্রচার হোক। প্রভুপাদ তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে হরিনাম প্রচার করলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন, যারাই কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করবে তারাই আনন্দ লাভ করবে। তাদের জীবন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সারা বিশ্ববাসী যদি এটি গ্রহণ করে তবে এই বিশ্ব বৈকুণ্ঠ সদৃশ হবে।

প্রশ্ন ৪০। কোনও কোনও মানুষকে দেখা যায়, যাদের সারাদিন কাজ হচ্ছে পরের নিন্দা করা, পরকে আঘাত দেওয়া। এরকম কেন?

উত্তর ঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ রয়েছে, যে ব্যক্তি পরনিন্দা করে, কৃতঘ্ন হয়, পরমর্ম ছেদন করে, নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়, নির্লজ্জ, পরস্ত্রী সঙ্গ করে, পরধন চুরি করে, অপবিত্র থাকে, সাধুনিন্দা, দেবনিন্দা করে, লোককে ঠকায়, প্রাণীহত্যা করে, কৃপণ হয়, নিষিদ্ধ কর্মেই প্রবৃত্ত হয়,—এ রকম যদি কাউকে দেখা যায়, তা হলে জানতে হবে যে, সেই পাপাত্মা পূর্ব জীবনে নানা রকমের নরক যাতনা ভোগ করে এসে কোনক্রমে পৃথিবীতে মানুষ জন্ম পেয়েছে।

আবার জীবের মঙ্গল উদ্দেশ্যে বাক্য কথন, সাধুসঙ্গ, প্রীতিমৈত্রীভাব যুক্ত, সর্বজীবের প্রতি দয়া, করুণা, দেব-ঋষি-গুরু পূজা, ধর্ম-আচরণে সর্বদা যুক্ত—এরকম যদি কাউকে দেখা যায়, তাহলে জানতে হবে যে, সেই নিষ্পাপ ব্যক্তি পূর্বজীবনে স্বর্গে ছিল। স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে এসে পৃথিবীতে মানুষ জন্ম পেয়েছে। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৫/৩৭-৪৬)

প্রশ্ন ৪১। ভক্তরা যারা কৃষ্ণভজনা করেন, তাঁরাও নীতিভ্রষ্ট বা অসদাচার করেন কিনা?

উত্তর ঃ কৃষ্ণৈকপ্রাণ ভক্ত কখনও অসদাচার করেন না। অন্যাভিলাষ যুক্ত, সকাম ভক্তরা যারা কৃষ্ণসেবা প্রীতি অপেক্ষা নিজেদের অন্য কোনও কামনা বাসনার বিষয়টিকে বড় বলে মনে করে, তাদের ক্ষেত্রে নীতিভ্রষ্ট বা অসদাচার ঘটে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তিনি সর্বসাক্ষী। সব জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে অবস্থিত। অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সম্পর্কে সবার সব ব্যাপারই তিনি জানেন। এই কথাগুলি যে মানুষ বিচার করতে পারবে, সে কোনও দিন গোপনেও কোনও নীতিবিরুদ্ধ কর্ম করতে সমর্থ হবে না।

প্রশ্ন ৪২। কেউ যদি ধনী লোকের সম্পদ চুরি করে গরীবদের দান করে, তার গতি কি হবে?

উত্তর ঃ চুরি করার অপরাধে অবশ্যই চোর দৃষ্ট-অদৃষ্ট শাস্তি ভোগ করবে। 'গরীবদের জন্য চুরি করেছি' এই কথা বললে আদালত তাকে ছেড়ে দেবে না। নিজের সম্পদ গরীবদের দান করলে দরিদ্র সহানুভূতির ফলে কিছুটা পুণ্য সঞ্চিত হয়। কিন্তু অন্যের কাছে চুরি করে এনে দরিদ্র সহানুভূতি দেখালে দরিদ্ররা হয়তো দু-চার দিন তার নাম যশ করতে থাকবে—এই মাত্র।

প্রশ্ন ৪৩। কারা জাতিস্মর হতে পারে?

উত্তর ঃ যে মানুষ সর্বদা বৈদিক শাস্ত্র অনুশীলন করেন, কায়-মনো-বাক্যে শুদ্ধ থাকেন, সবার প্রতি মৈত্রীভাব রাখেন, জীবহিংসা করেন না, শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে জীবন যাপন করেন, সেই ব্যক্তি পূর্ব জন্মের জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

শ্রীমনুসংহিতা শাস্ত্রে এই কথা বলা হয়েছে—

বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেন চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্বিকীম্‌ ॥

"সর্বদা বেদ অভ্যাস, বাহ্যান্তর শৌচ, তপস্যা এবং সর্বজীবে মৈত্রীভাব—এই সমস্ত অনুষ্ঠানে দ্বিজ জাতিস্মর হন।" (মঃ সঃ ৪/১৪৮)

প্রশ্ন ৪৪। বর্তমান যুগের মানুষ জন্মান্তর বিশ্বাস করে না কেন?

উত্তর ঃ কলি প্রভাবিত মানুষ বেদ নির্দিষ্ট চারটি পাপ কর্ম সম্পাদনে আগ্রহী। চারটি পাপ কর্ম হল—আমিষ আহার, নেশাভাঙ, জুয়া ও অবৈধ যৌনতা। চারটি ধর্মস্তম্ভ হল—দয়াশীলতা, শুচিতা, সত্যপরায়ণতা ও তপস্যা। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশ বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে মানুষ আমিষাহার করে দয়াহীন, নেশাভাঙ করে শুচিহীন, জুয়া খেলে সত্যহীন ও অবৈধ মেলামেশা করে তপস্যাহীন জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেই জন্যেই বর্তমান মানুষ পূর্বজন্ম, পরজন্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান শূন্য হয়ে, এমন কি বর্তমান জন্মের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েই দিনযাপন করছে।

প্রশ্ন ৪৫। শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করলে কি লাভ? আর নিবেদন না করে গ্রহণ করলে কি ক্ষতি হয়?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন—

যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব কিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

"ভক্তরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা ভগবানকে নিবেদন করে অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য পাক করে, তারা কেবল পাপই ভোজন করে।" (গীতা ৩/১৩)

শ্রীল প্রভুপাদ এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "ভক্তরা ভগবানকে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করে তারপর তা গ্রহণ করেন। এইভাবে খাদ্য গ্রহণ চর্চার ফলে শুধু যে দেহের মধ্যে সঞ্চিত বিগত পাপকর্মের ফল সব নষ্ট হয়ে যায়, তাই নয়—জড়া প্রকৃতির সমস্ত কলুষতা থেকেও দেহ প্রতিষেধ লাভ করে। যখন রোগ-সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে, তখন রোগ-প্রতিষেধক টীকা নিয়ে মানুষ তা থেকে রক্ষা পায়। সেই রকম ভগবদ্ উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করলে জড়-জাগতিক রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যে কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে, তার পূর্বকৃত সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায় এবং এইভাবে পাপমুক্ত হয়ে পবিত্র হলে অচিরেই মানুষ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ভগবানকে নিবেদন না করে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে, তার পাপের বোঝা বাড়তে থাকে, এবং তার মনোবৃত্তি অনুসারে তাকে পরবর্তী জীবনে নিকৃষ্ট পশুদেহ ধারণ করতে হয়।

কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করলে জীবের চেতনা কলুষমুক্ত হয়, যে তা করে না, সে ভবরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করে।"

প্রশ্ন ৪৬। সব মানুষই তো মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করছে। সবাই তো ভগবানের সন্তান। ভগবান কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। তবে কিছু মানুষ ধার্মিক, আবার কিছু মানুষ অসুরভাবাপন্ন হয় কেন?

উত্তর ঃ পিতার কাছে সব সন্তান সমান হলেও, সন্তানদের স্বতন্ত্রভাব থাকবে। ভাল-মন্দ দুই গুণই নিয়ে মানুষ এই জগতে জন্মগ্রহণ করছে। ভালগুণটি ধরে রাখার এবং মন্দগুণটি পরিহার করে চলার যখন কারও সঙ্কল্প আছে, সে ধার্মিক হয়। আর, বিপরীত মানসিকতা থাকলে অধার্মিক হয়।

প্রশ্ন ৪৭। মানব সমাজের জন্য বৈদিক নিয়মকানুন প্রবর্তিত যাতে মানুষের কল্যাণ ও শান্তি সুরক্ষিত হয়, অথচ মানুষ সেই সব জেনেও কেন পাপকর্মে নিয়োজিত হয়?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥

"অতএব কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে বৈদিক শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। তাই শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের স্বরূপ জেনে কর্ম করা উচিত যাতে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা যায়।" (ভগবদ্গীতা ১৬/২৪)

কিন্তু মানুষ ঐশ্বর্য কিংবা কোনও ভোগ্যবস্তুর মোহে মোহাচ্ছন্ন কিংবা গর্বিত হলে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করে না। যার ফলে সে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হতে শুরু করে।

জড় ঐশ্বর্য লাভ করে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে অসুরেরা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে।

এবমৈশ্বর্যমত্তস্য দৃপ্তস্যোচ্ছাস্ত্রবর্তিনঃ।
কালো মহান্ ব্যতীয়ায় ব্রহ্মশাপমুপেয়ুষঃ ॥

"এইভাবে অসুর হিরণ্যকশিপু ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত হয়ে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে বহুদিন অতিবাহিত করেছিল। তার ফলে সে সনকাদি মহান ব্রাহ্মণদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিল।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৪/২০)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

"যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে কামাচারে রত হয়, সে কখনও সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি লাভ করতে পারে না।" (গীতা ১৬/২৩)

শ্রীঅর্জুন যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, মানুষ তো জানে পাপকর্ম করা উচিত নয়, মঙ্গলকর নয়, তবুও সে পাপকর্ম করে বসে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥

"রজোগুণ থেকে উদ্ভূত কামই মানুষকে পাপকর্মে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী এবং পাপাত্মক, কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে।" (গীতা ৩/৩৭)

অর্থাৎ, মানুষের জড় ভোগবাসনাই মানুষকে এই ভবসংসারচক্রে পতিত করে এবং পাপকর্মে লিপ্ত করায়।

প্রশ্ন ৪৮। জীবহত্যা যে মহাপাপ—এটি কি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

উত্তর ঃ না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জীবকে কিংবা মানুষকে হত্যা করলে কোনও পাপ হয় না। যেমন—১। বিষ-প্রয়োগকারী, ২। গৃহদাহকারী, ৩। অস্ত্র দিয়ে যে আক্রমণ করে, ৪। ধনসম্পদ যে লুণ্ঠন করে, ৫। অন্যায়ভাবে জমি যে দখল করে, ৬। বিবাহিত পত্নীকে যে হরণ করে—এই ধরনের ব্যক্তিকে হত্যা করলে কোনও পাপ হয় না। (গীতা ২/৩৬ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

প্রশ্ন ৪৯। মানুষ মারা গেলে তার কর্মের বিচার হয়, না জীবিত থাকাকালীন তার পাপপুণ্য কর্মের বিচার হয়?

উত্তর ঃ মানুষ ইহজীবনে কি কর্ম করে চলেছে—পাপকর্ম কিংবা পুণ্যকর্ম, তা সঙ্গে সঙ্গেই হিসাবরক্ষক শ্রীচিত্রগুপ্ত লিখে রাখেন। কিছু কর্মের ফল মানুষ ইহজন্মেই লাভ করতে পারে। আবার কোনও কর্মের ফল পরজন্মে লাভ হতে পারে। যার যে কর্মের ফল এই জন্মেই ভোগ হয়ে যাচ্ছে তার আর সেই কর্মের আর নতুন বিচার প্রয়োজন নেই। যে কর্মের ফল এই জীবনে বর্তায়নি, তা দেহান্তে বিচারের পর সেই কর্মফল ভোগের জন্য তাকে অনুরূপ পরিস্থিতি লাভ করতে হবে।

যেমন, কোনও চুরি করতে গিয়ে অন্য কাউকে কেটে ফেলল। যখন সে ধরা পড়ল তাকে জেলে ঢুকিয়ে সশ্রম কারাদণ্ড এবং অবশেষে ফাঁসির হুকুম হল। ফাঁসির পর আর পরজন্মে তার সেই সব পাপকর্মের বিচার অনর্থক। কিন্তু যদি সে ধরা না পড়ে, কিংবা ঘুষ দিয়ে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে তবে পরজন্মে তার পাপের ফল ভোগ করতে হবে।

প্রশ্ন ৫০। কারা ঠিক ঠিক সাধনভজন করতে পারে?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা জাগতিক বিষয়ে দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।" (গীতা ৭/২৮)

প্রশ্ন ৫১। এক 'কৃষ্ণ' নামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে ॥
—এই কথার সত্যতা যাচাই করুন।

উত্তর ঃ সমস্ত রকমের পাপকর্মে পটু জগাই ও মাধাই নাম-প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কপালে কলসী দিয়ে ভয়ংকর আঘাত করে বসল। জানা যায় তাদের পাপের হিসাব চিত্রগুপ্তের খাতায় লিপিবদ্ধ করে করে শেষ করা যায়নি। তবুও পরম করুণাময় নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, তোমরা কেবল একটিবার হরিনাম কর। দস্যু জগাই মাধাই সমস্ত পাপকর্ম সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে পরম প্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ পূর্বক হরিনাম উচ্চারণ করতেই তাদের সমস্ত পাপ দূরীভূত হল। তারা পরম ভক্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে, যত ইচ্ছা পাপকর্ম করে যাই, তারপর হরিনাম করেই পাপমুক্ত হয়ে যাব—এইরূপ ব্যক্তি নামাপরাধী। দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে ৭ নম্বরটি হল নাম-বলে পাপ আচরণ করা। এটি একটি মহা অপরাধ। এতে শ্রীনামের চরণে কেবল অপরাধই হয়, নাম হয় না। নাম-অপরাধ থেকে সাবধান থাকতে হবে। তাই নামহট্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নির্দেশ দিয়েছেন—"অপরাধ-শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণনাম।"

প্রশ্ন ৫২। "যত মত তত পথ"—যে কোনও পথে গেলে একই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারা যায়। এই সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ এই প্রবাদটি জনমানসে একটি বিপজ্জনক ধারণা সৃষ্টি করে। গাঁজাখোরের মত এবং সাধুজনের মত কিংবা তাদের পথ কখনও এক হতে পারে না। নরকে যাওয়ার পথ এবং মত কখনও পরম লক্ষ্য পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দময় পরম ধামে যাওয়ার পথে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে না। এ ছাড়া অল্পজ্ঞ মানুষের মতামতের কী মূল্য আছে? সর্বজ্ঞ ভগবানই পারেন পরম পথটি প্রদর্শন করতে। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং*—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। তাঁর মত এবং পথই পরম। কলিযুগে মানুষ যাতে নানা রকমের মনগড়া পন্থা অবলম্বন না করে সেই জন্য ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি তথা ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সুনির্ধারিত করে দিলেন—

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। (মহাভারত বনপর্ব ৩/১৩/১১৭)

'মহাজনদের দ্বারা নির্দেশিত পন্থাই একমাত্র পথ।' সেই মহাজনদের নামও শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/৩/২০) পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা), শ্রীনারদ মুনি, শম্ভু (শিব), সনৎকুমার, দেবহূতিপুত্র কপিল, মানবজাতির পিতা মহর্ষি মনু, জনক রাজা, ভীষ্মদেব, দৈত্যরাজ বলি, ব্যাসপুত্র শুকদেব, প্রহ্লাদ, যমরাজ—এই দ্বাদশ মহাজন। এই সকল মহাজনেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রণীত ধর্মকেই একমাত্র পথ বলে গ্রহণ করেছেন—*ধর্মং তু সাক্ষাৎ ভগবদ্প্রণীতম্।* সাক্ষাৎ ভগবানই ধর্মের প্রবর্তক ও প্রণেতা।

এই মহাজনেরা প্রত্যেকেই নির্দেশ দিয়েছেন কিভাবে একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে ভক্তিযোগের মাধ্যমে এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিময় ভবচক্র থেকে চিরতরে উদ্ধার পেয়ে পরমানন্দময় ভগবৎসেবায় আপন স্বরূপে উন্নীত হতে হয়।

তাঁরা কেউ কখনই বলেননি, যে কোনও পথে গেলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বরং আমরা যাতে প্রবঞ্চনা থেকে সতর্ক থাকতে পারি, সেই জন্যে তাঁরা নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। সেই সকল মহাজনদের নির্দেশ লঙ্ঘন করলে অপরাধী হিসেবে দণ্ডভোগ করতে হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মাছ মাংস ভক্ষণ ভক্তিপথে বিঘ্নস্বরূপ। মহাজন মহর্ষি মনু নির্দেশ দিয়েছেন, *মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ* (মনুসংহিতা ৫/১৫)—মাছ ভক্ষণ করবে না। কিন্তু মহাজনবাক্য অগ্রাহ্য করে মানুষ রোজই মাছ খেয়ে চলেছে। প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা বলছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণকারণম্ ॥ (ব্রহ্মসংহিতা ১)

'পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়, তিনি সমস্ত কিছুর আদি, সমস্ত কারণের পরম কারণ।' ব্রহ্মা তাই বলছেন *গোবিন্দম্ আদিপুরুষম্ তমহং ভজামি*—'সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।' কিন্তু মহাজনদের সেই সব কথা সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গিয়ে মনগড়া মত নিয়ে উদ্ধত মানুষ নির্দেশ দিচ্ছে—'জীবই ঈশ্বর, জীবের ভজনা কর। এ ছাড়া অন্য কোথাও ভগবান বলে কিছুই নেই।' সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি মনগড়া মত জুড়ে দেওয়া হচ্ছে—'যত পারো মাংস খাও, জীবহত্যায় পাপ বলে কিছু নেই। মানুষকে ভালবাসাই ধর্ম আর অন্য জীবদের কেটে খেলে ক্ষতি নেই।' এইভাবে "যত মত তত পথ" ধরা হয়েছে।

শেষে সমস্ত মহাজনকে বাদ দিয়ে মৃত্যুর সময় একজন মহাজনের কাছে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। তিনি হচ্ছেন শ্রীযমরাজ। তিনি মনগড়া মতাবলম্বীকে একটি পথ দেখিয়ে দেবেন। নরককুণ্ডের পথ। সেই নরকের বর্ণনা দিয়েছেন মহাজন শ্রীশুকদেব গোস্বামী। স্বতন্ত্র স্বাধীনতা থাকার দরুণ মানুষ নরকের পথ অবলম্বন করতেও পারে, তবে সেই পথে ভগবানের আশীর্বাদ পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে যমদূতদের বীভৎস উৎপীড়ন। নরকের মত নরকের পথ। তেমনি বৈকুণ্ঠের মত (যা কেবল বৈকুণ্ঠপতিই

দিতে পারেন) অনুসরণ করলে বৈকুণ্ঠের পথে যাওয়া সম্ভব। আমেরিকার বিমানে চড়ে জার্মান যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং, যে কোনও পথে গেলে পরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে, এই ধারণা বিশিষ্ট "যত মত তত পথ" প্রবাদটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

প্রশ্ন ৫৩। শাস্ত্রে আছে বহু জন্মের তপস্যা ও পুণ্যের ফলে মানবজন্ম লাভ হয়। তা হলে কলিযুগে প্রতি দেশে দিন দিন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারা পুণ্যবান কি না—এই বিষয়ে যদি কিছু বলেন কৃতার্থ হব।

উত্তর ঃ বহু জন্মের তপস্যা ও পুণ্যের ফলে মানব-জন্ম লাভ হয়—এই রকম কথা কোনও শাস্ত্রে আছে কি না সন্দেহ। চুরাশি লক্ষ রকমের প্রজাতি বা জীবযোনির কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে মানব-জন্ম লাভ করাটাই শ্রেয়। তবে জীব জৈব বিবর্তন অনুসারে ক্রমশ অনুন্নত থেকে উন্নত জীবন লাভ করে। অর্থাৎ, বিবর্তন সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই একটি জীব চুরাশি লক্ষ প্রকারের জন্ম লাভ করার শেষ পর্যায়ে মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। তার জন্য তাকে তপস্যা বা পুণ্য করতে হয় না। কারণ, তপস্যা বা পুণ্যকর্ম কিংবা পাপকর্মের বিচার একমাত্র মানব-জীবনেই হয়, অন্যান্য গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশু-পাখির জীবনে পাপ-পুণ্যের বিচার হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভম্ ।

এই আদ্য মনুষ্য-দেহ সুলভ অর্থাৎ, স্বাভাবিকভাবেই লাভ হয়েছে এবং সুদুর্লভ অর্থাৎ, বহু বহু লক্ষ জীবযোনিতে ভ্রমণ করার পর এই মনুষ্য-জীবন লাভ হয়েছে।

কলিযুগে প্রত্যেক দেশে দিন দিন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে—এই কথাটিও যথার্থ নয়। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগের লোক সংখ্যার তুলনায় কলিযুগের লোকসংখ্যা অতি অল্প। অন্যান্য যুগের মানুষ লক্ষ বছর হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু কলিযুগে আশি-নব্বই বছর পর্যন্তই মানুষ বাঁচে, অধিকাংশই অকাল মৃত্যু বরণ করে।

কলিযুগের মানুষেরা পুণ্যবানও নয়। তারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপ ক্লেশে জর্জরিত। অন্যান্য যুগের মানুষের তুলনায় কলিযুগের মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা বেশি। অধিকাংশ মানুষই পাপাচারী। কলির কলুষিত আড্ডা প্রধানত যে চারটি পাপকর্ম শ্রীমদ্ভাগবতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে—সেই পাপকর্মেই কলিগ্রস্ত মানুষ অভ্যস্ত। যেমন—অবৈধ যৌনসঙ্গ, নেশাদ্রব্য সেবন, জুয়া খেলা, আমিষ ভক্ষণ এইগুলিতে মনুষ্য-ধর্ম নষ্ট হয়। ফলস্বরূপ, এই মানব-জন্মের কর্মফল অনুসারে যে কোনও নিম্নতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করতেই হয়।

এমন কি এই জন্মের পরেই পাপপ্রবণ জীব কোন কারণে পরজন্মে মনুষ্য-দেহ লাভ করেও, তবে তাঁকে খোঁড়া, বোবা, অন্ধ, কুঁজো কিংবা নানাবিধ জটিল দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে জীবন যাপন করে চলতে হয়। অনেকে মাতৃজঠরে থাকতে থাকতেই মৃত্যুবরণ করে।

এই গ্রহের বিভিন্ন দেশের কথাটাই সব কিছু নয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। কোনও গ্রহের পুণ্যবান জীব এই গ্রহে এসে সুখ-ঐশ্বর্যময় জীবন লাভ করছে। এই গ্রহের পুণ্যবান

মানুষ অন্য গ্রহে গিয়ে সুখময় জীবন লাভ করছে। এই গ্রহের পাপাচারীরা অন্য গ্রহেও দুঃখ ভোগ করার জন্য চলে যাচ্ছে, আবার অন্য গ্রহের মানুষ পৃথিবীতে জন্ম লাভ করছে। অতএব কে পুণ্যবান, কে পাপাচারী, সেই সব তার আচরণ চরিত্রে প্রকাশ পায়। আগের যুগগুলিতে জনগণের মধ্যে সদ্ভাব প্রীতি সৌহার্দ্য ও কর্তব্যবোধ, নীতিবোধ ধৈর্য বজায় থাকার জন্য বহু জনসংখ্যা হওয়ার ফলেও কারও মধ্যে বিরক্তি হট্টগোল ও কলহ উপস্থিত হত না। কিন্তু কলিযুগে সারা জগতের তো পরের কথা, মাত্র কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও সদ্ভাব বজায় থাকে না। স্বার্থপরতা, ক্রূরতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও ঈর্ষাভাব থাকার জন্য অল্প কয়েকটি মানুষের মধ্যে, এমন কি একটি ঘরের দুই-তিনজন সহোদর ভাইয়ের মধ্যে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে একটি বিশাল হৈ হট্টগোল বাধে, তার ফলে মনে হয় একজনই মা-বাবার সন্তান থাকাই ভাল। এইভাবে ধর্মজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খল মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে—যারা সমগ্র জগতে কেবল উৎপাত আর কলহ সৃষ্টি করছে। ফলে, মনে হয়, জগতে অনেক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে এবং অল্প লোকসংখ্যাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি জানেন যে, এই মনুষ্য-জীবন লাভ করা যে কোনও জীবের পক্ষে একটি সুদুর্লভ সুযোগ—এই জীবনে কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তনে ব্রতী হয়ে এই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ভবচক্র অতিক্রম করে পরমানন্দময় নিত্য ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার পন্থা রয়েছে। তাই তাঁরা পরস্পরকে হরিনাম কীর্তনে উদ্বুদ্ধ করে পাপকর্ম বর্জনপূর্বক কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণে প্রেরণা ও সহযোগিতা করেন।

কিন্তু মূর্খেরা ভগবদ্ভক্তিযুক্ত সংসার-জীবনের গুরুত্ব কোনও দিনই বোঝে না—তারা কেবল মনে করে তাদের জড় বিষয় সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তাই পরিবার পরিকল্পনার নামে যথেচ্ছ ভ্রূণ হত্যা, গর্ভপাত, বন্ধ্যাত্বকরণ—এই সবই করে চলে। অর্থাৎ, তারা ধর্মজ্ঞানহীন হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত, তাদের যদি সন্তানও জন্ম হয় তবে সেই সন্তান উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের চাপে আরও বেশি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে, ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ে প্রায় মানুষ বিব্রত হচ্ছে। অথচ কেউই এই শিক্ষা গ্রহণ করছে না যে, এই মনুষ্য-জন্ম কত ভাগ্যের ব্যাপার। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

"এই মনুষ্য দেহটি সকল ফলের মূল; অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্লভ। বহু জন্মের পরে এই মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়। এই জীবনে পারমার্থিক শ্রীগুরুদেবই কর্ণধার। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা পরিচালিত এই মনুষ্যদেহরূপ নৌকাখানি লাভ করেও যে ব্যক্তি এই ভবসংসার-সমুদ্র পার হতে চেষ্টা না করে, সে আত্মঘাতী।"

প্রশ্ন ৫৪। "কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর। মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।" কিভাবে বুঝব কোন্‌টা স্বর্গ আর কোন্‌টা নরক?

উত্তর ঃ স্বর্গ একটি আলাদা গ্রহলোক এবং নরক আর একটি আলাদা গ্রহলোক। আমাদের এই পৃথিবীর ঊর্ধ্বে ভুবর্লোক এবং তার ঊর্ধ্বে স্বর্গলোক অবস্থিত। সেখানে দেবতারা থাকেন। সেখানকার রাজা ইন্দ্র পৃথিবীর নিচের দিকে পর পর গ্রহলোকগুলি যথাক্রমে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাললোক বিদ্যমান। পাতাললোকের কাছাকাছি নরক নামক গ্রহ রয়েছে। সেখানকার রাজা হচ্ছেন যম। পুণ্যবান ব্যক্তিগণ সুখপ্রাপ্তির জন্য স্বর্গগতি লাভ করেন এবং পাপাচারী ব্যক্তিগণ শাস্তিভোগের জন্য নরকগতি লাভ করেন।

স্বর্গসুখ উপভোগের জন্য সেখানে রয়েছে অত্যন্ত সুন্দর মনোরম পরিবেশ, মধুর আবহাওয়া, ফুলের ফলের বিশাল মনোরম উদ্যান, নানা রঙের পাখির সুমিষ্ট কলরব, স্বচ্ছ সুনীল সরোবর, রত্নবেদী, অতি সুমিষ্ট বৃহৎ আকার নানাবিধ ফল, অতি সুগন্ধি নানাবিধ বড় বড় ফুলের অপরূপ শোভা। রোগব্যাধিহীন, দুর্ভিক্ষ ভূকম্প ঝড় বাদলাহীন, অত্যন্ত সুন্দর সাম্রাজ্য।

আর নরকলোকে আছে অসংখ্য কুণ্ড, সেখানে যমদূতেরা পাপীকে একটি যাতনা শরীর দিয়ে সেই কুণ্ডে নিয়ে যায় এবং অতি ভয়ংকর ও প্রচণ্ড রকমে শাস্তি প্রদান করতে থাকে। যমদূতদের চেহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। সর্বত্র পাপীদের যন্ত্রণার আর্ত চিৎকার আর যন্ত্রণাদায়ী হিংস্র প্রকৃতির জীবজন্তু সহ ভীষণাকৃতির যমদূতদের অসহ্য উল্লাস। কোথাও গাত্রদাহী প্রচণ্ড উত্তাপ, কোথাও দম আটকানো বিষাক্ত ধোঁয়া, কোথাও অন্ধকূপ, সর্বদা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হতাশা, মূর্চ্ছা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, রোগ, ব্যাধি, জীবজন্তুর মারাত্মক উৎপাত, জিঘাংসাবৃত্তি ইত্যাদি মিলে প্রতি মুহূর্তেই অত্যন্ত ক্লেশদায়ক।

সেই সব গ্রহলোকের কথা বাদ দিয়েও, এমন কি এই পৃথিবীতেই মানুষ স্বর্গ ও নরকের দৃশ্য দেখতে পারে। কোনও কোনও মানুষ অতি সরলভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। সবার সঙ্গে তার প্রীতি, ভালবাসা রয়েছে। বৈদিক নিয়মকানুনগুলিও সে চর্চা করছে। সেই মানুষ স্বর্গেরই প্রতিভূ। আবার বেশির ভাগ মানুষই নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করছে, প্রতিদিন রক্ত-মাংস-হাড় ভক্ষণের জন্য গরু, ছাগল, ভেড়া, মোরগ, হাঁস, শূকর, মাছ, ব্যাঙ ধরছে আর কাটছে। পিতা-মাতা নিজের সন্তানকে মাতৃ জঠর মধ্যে থাকা অবস্থায় মেরে ফেলছে। প্রতিদিন মানুষ বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি মাদকের নোংরা ধোঁয়া খেয়ে নিজের এবং সারা পরিবেশকে কলুষিত করছে। দুষ্কৃতকারীরা নিজেদের তুচ্ছ স্বার্থরক্ষার জন্য কিংবা নিছক তামাশা করার জন্য নিরীহ নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ যাকেই পাচ্ছে রাস্তা ঘাটে কেটে ফেলছে। কত দুর্বৃত্তদের ভয়, উদ্বেগ, ব্যাধি, যন্ত্রণা, পঙ্গু, অন্ধ, বধির, অঙ্গহানি, বন্যা, খরা, ভূকম্প, ঝড়ঝাপটা, অগ্নিকাণ্ড, যুদ্ধ, হিংসা, ঈর্ষা, কলহ, বিবাদ ইত্যাদি মিলে প্রায়মুহূর্তই অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হয়ে উঠেছে।

এই পৃথিবীতে সুরগুণসম্পন্ন ব্যক্তি স্বর্গগতি লাভ করবে এবং অসুরগুণসম্পন্ন ব্যক্তি নরকগতি লাভ করবে। তাই মানুষ তার নিজ ইচ্ছা অনুসারে সুর হতে পারে নতুবা অসুর হতে পারে এবং ফলস্বরূপ মানব-সমাজকে স্বর্গে নতুবা নরকে পরিণত করতে পারে এবং পরিণামে অর্থাৎ, মৃত্যুর পর স্বর্গগতি নতুবা নরকগতি লাভ করবে।

প্রশ্ন ৫৫। পাপ আচরণকারী মানুষ মৃত্যুর পর যমলোকে শাস্তি পাবে। কিন্তু শাস্তি ভোগ হয়ে গেলে সে কি মুক্ত হয়ে যায়?

উত্তর ঃ পৃথিবীতে যে মানুষ পাপ আচরণ করছে, তার যেরূপ বাসনা—অর্থাৎ, পাপাচারীর ভোগবাসনা হেতু তাকে মৃত্যুর পর নরক ভোগের পরেই তার বাসনা চরিতার্থ করবার অনুরূপ শরীর গ্রহণের জন্য জড়জগতে বদ্ধ হতে হয়। মুক্তির প্রশ্নই নেই। উদাহরণ স্বরূপ, কোনও ব্যক্তি এমন পাপকর্ম করল যে, সে নরকে গিয়ে মলমূত্রের গর্তে পড়ে বহুবর্ষ কৃমির মতো মলমূত্র খেয়ে থাকল। তারপর নরক মেয়াদের পর তাকে একটি মলমূত্র ভোগের উপযোগী হয়তো শূকরের দেহ ধারণ করবার জন্য পৃথিবীতে শূকর কুলে জন্মগ্রহণ করতে হল।

প্রশ্ন ৫৬। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পরম পিতা, তবে শত শত লোক খরায় মারা গেল। পিতা কেন রক্ষা করল না?

উত্তর ঃ বহু জন্মজন্মান্তরের কর্মদোষে নানাবিধ দুর্ঘটনা ঘটে। এসব শাস্ত্র পড়ে জানতে হয়। এই জন্মের সব ঘটনাই আমাদের পূর্ব কর্মের ফল। বহু বহু জন্ম শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষেই আপন বুদ্ধি বড়াই করে আমরা চলেছি। কিন্তু চরম বিপদের মুহূর্তে যখন আর বুদ্ধির বড়াই খাটে না, তখন শ্রীকৃষ্ণকে তার জন্য দায়ী বলে ঘোষণা করতেও মনে বাধে না। আবার শ্রীকৃষ্ণ কেন রক্ষা করছে না বলে তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ আদায় করতে চাই। এই হচ্ছে আমাদের দশা। আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পারি, যেমন একটি মৎসভোজী পরিবারে প্রতিদিন গড়ে পাঁচটি করে মাছ রান্না হচ্ছে, এইভাবে পঞ্চাশ বছরে তাদের পরিবারে কত জীবহত্যা হচ্ছে, কত তারা তপ্ত তেলকড়াইতে চাপাচ্ছে। সেই কর্মফলে সেই পরিবারের কি ধরনের শাস্তি হবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। যে পরিবারে মাছমাংস পাক হয়, সেখানে কৃষ্ণ থাকেন না। তবুও যে তারা বহু বিপদ থেকে রক্ষা পাচ্ছে, সেটাই ভগবানের আশ্চর্য কৃপা। আমাদের জীবনে কত রকমের ভয়ংকর বিপদ ঘটেছে, আমরা সেই সব বিপদের মধ্যেও আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষা পেয়ে গেছি। সেই হিসাবটি তো দেখতে হবে।

প্রশ্ন ৫৭। মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্মপ্রাণ হয়েও নরক দর্শন করলেন, অথচ দুরাচারী দুর্যোধন স্বর্গগমন করলেন। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির নরকেও যাননি, স্বর্গেও যাননি। মহাপ্রস্থান বলতে ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে গমনের কথাই বোঝায়। রাজা কুরু স্বর্গরাজ ইন্দ্রের কাছে একটি বর পেয়েছিলেন, কুরুক্ষেত্রে যে নিহত হবে সে স্বর্গে গমন করবে। তাই দুর্যোধনের

স্বর্গে গতি হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে যে মৃত্যু বরণ করে সে কখনও নরক ভোগ করে না। কিন্তু পাণ্ডবরা ছিলেন ভক্ত। তাঁরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতেন, কৃষ্ণের সান্নিধ্য কামনা করতেন, তাঁরা কৃষ্ণধাম বৈকুণ্ঠ দ্বারকায় গতিলাভ করেছেন। অনেকে বলেন স্বর্গে গিয়েও যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হত' এরূপ একটি মিথ্যা কথা দ্রোণাচার্যের সম্মুখে বলার ফলে নরক দর্শন করলেন। কিন্তু আমাদের জানতে হবে, স্বর্গে কখনও নরক দর্শন হয় না। নরক হচ্ছে একটি পৃথক গ্রহলোক। স্বর্গলোক হচ্ছে সম্পূর্ণ সুখময় একটি গ্রহলোক। অধিকন্তু যুধিষ্ঠির যদি 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' এই কথাটি না বলতেন তবে তাঁর জীবনে নতুন কোনও বিঘ্নই সৃষ্টি হত। কারণ ভগবানেরই নির্দেশে তিনি সেই কথাটি উচ্চারণ করেছেন বলে তা যথার্থই হয়েছে। তা ছাড়া সত্যই অশ্বত্থামা নামে একটি হাতী তো নিহত হয়েছিল। বরঞ্চ ভগবানের কথা অবজ্ঞা করলে তাঁকে নরক দর্শন করতে হত।

প্রশ্ন ৫৮। আমরা জানি দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করাই ধর্ম। ভক্তদের অনেক কিছু আছে। যাদের কিছু আছে তাদেরকে দান করা তো তেলা মাথায় তেল দেওয়ার মতো। তাই নয় কি?

উত্তর ঃ কাকে দান করা উচিত এবং কিভাবে দান করা উচিত তা যদি আপনি জানতে না পারেন, তবে আপনার দান করা কর্মটি যে-কোন সময় বিপদজ্জনক হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। সেই দান কার্যটি তখন ধর্ম বলে পরিগণিত হওয়া তো দূরের কথা, এমন কি মহাপাপ বলেও গণ্য হতে পারে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি পাপ করে এবং যে তাকে পাপকর্ম করতে সাহায্য করে তারা উভয়েই দণ্ডনীয়। যেমন নেশাভাং করা পাপ কর্ম। একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে আপনি দয়াশীল হয়ে একশত টাকা দান করলেন। আর সেই দরিদ্র ব্যক্তিটি একশত টাকা পেয়ে তিনদিন ধরে মদ খেলো, গাঁজার কৌটো কিনল, আর মদের বাজারে যাতায়াতের জন্য ভাড়া মিটালো। এখন, সেই দরিদ্র ব্যক্তিটিকে আপনি যেহেতু নেশাভাং করবার জন্য অর্থ সাহায্য করেছেন, সেইজন্য তার পাপের ভাগীদারও আপনি। এটি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। আপনি দাবী করতে পারেন না যে, তাঁকে চাল খরিদ করে পেট চালাবার জন্য টাকা দান করেছিলেন। যাকে দান করছেন সেই ব্যক্তির জীবন-যাত্রা হাব-ভাব কিরূপ, সে সৎ কিনা—এসব বিচার্য আছে। এখনও আমাদের দেশে অনেক দরিদ্র আছে—পেশাদারী দরিদ্র। ভিক্ষা করাটাই তাদের স্বভাব।

আগেকার দিনে লোকে ব্রাহ্মণকে ধনসম্পদ স্বর্ণ গাভী বস্ত্র ইত্যাদি দান করত ব্রাহ্মণরা সরলভাবে জীবন যাপন করত এবং জন-সমাজকে ধর্মনীতি শিক্ষা দিত। কিন্তু এখনকার যুগে ব্রাহ্মণরাও ধর্মজ্ঞানহীন হওয়ার ফলে তারাও দান পাওয়ার অধিকারী নয়। কোন জুয়াড়ী বা নেশাখোর ব্যক্তিকেও দান করা উচিত নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনগুণের দানের কথা বলেছেন। সাত্ত্বিক গুণের দাতা মনে করেন, দান করাই কর্তব্য। উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত স্থানে

উপযুক্ত সময়ে তার কাছে রক্ষিত সম্পদ দান করা হলে ভগবান ও ভক্তগণ প্রীত হবেন। এই মনে করে তিনি উপযুক্ত স্থান অর্থাৎ, ভগবদ্ আবির্ভাব লীলাক্ষেত্র কিংবা ভগবানের অর্চনা মন্দিরে, উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ, সংক্রান্তি কিংবা শুভ তিথিতে, উপযুক্ত পাত্রে অর্থাৎ, পারমার্থিক কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বা পরম বৈষ্ণবকে দান করেন। এই দানের ফলে দাতার ভক্তি উন্মুখী সুকৃতি লাভ হয়। রাজসিক দানে দাতা মনে করেন, আমি যদি আমার সম্পদ দান করি তাহলে আমি স্বর্গসুখ ভোগের সুযোগ পেতে পারব। সেখানে দাতার মনে একটি প্রত্যুপকার লাভের আশাও থাকে। দান করার ইচ্ছা না থাকলেও গুরুজনদের নির্দেশে দান করে। আর, তামসিক দানের ক্ষেত্রে দাতা কেবল মজা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অশুচি স্থানে অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় সুখভোগে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানে, অযোগ্য পাত্রে অর্থাৎ, নেশাখোর জুয়াড়ী মাংসাশী বদ্চরিত্র ব্যক্তিকে অনাদরে হুজুগে দান করতে থাকে।

এই কলিযুগে মহাবদান্য অবতার শ্রীগৌরহরির হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনে যে ব্যক্তি তার সময় শ্রম বুদ্ধি কিংবা অর্থ জমি জিনিস-পত্রাদি এমন কি জীবন দান করছেন তাঁদের দানের তুলনা এই জড় বদ্ধ ভাবধারার মানুষ কখনও কল্পনা করতেও পারবে না। সেই দাতাদের বৈকুণ্ঠ জগতে গতি নির্ধারিত। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন "যা কিছু দান করতে চাও সেই সব আমাকেই দান কর।" *দদাসি যৎ, কুরুস্ব মৎ অর্পণম্।* এই 'কলিযুগে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার'। শ্রীকৃষ্ণ গৌরহরি রূপে বললেন—পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম ॥

গীতায় ভগবান বলেছেন, 'হে অর্জুন! যে ব্যক্তি আমার মহিমা নাম প্রচার করবে তার মতো আমার প্রিয় আর কেউ হতে পারে না।' অতএব বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন শ্রীগৌরহরির কৃষ্ণনাম সংকীর্তন প্রচার করে চলেছেন। তাদেরকেই অর্থাদি দান করা একমাত্র কর্তব্য।

প্রশ্নানুসারে, ভক্তরা তেলা মাথা, অতএব আপনি অনর্থক তেল চাপাচ্ছেন—এই রকম কথাটি ঠিক নয়। আপনার দেওয়া তেল নিয়ে ভক্তরা মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তন প্রচারে কিভাবে নিয়োগ করে আপনাকেই ধন্য করবে সেই চিন্তা করেন। আপনার দেখে নেওয়াও কর্তব্য যে আপনার দেওয়া তেল নিয়ে ভক্তরা কি কাজ শুরু করেছে। সেটি না জেনে অনর্থক আপনি তেল চাপাবেন কেন?

মানুষ পারমার্থিক ভক্ত ব্যক্তিদের কোন কিছু দান করে ভক্তি শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং ভক্তি উন্মুখী সুকৃতি লাভ করতে পারে। যাতে তার জীবন পরিণামে পরম মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নিছক মজা বা স্ফূর্তি করবার উদ্দেশ্যে বহু অহিতকর প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করছে বলেই সমাজে নানাবিধ প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে এবং তাদের দানের ফলে নিজের ও অন্যের অমঙ্গল সাধিত হচ্ছে। যেমন অশ্লীল ছায়াছবি প্রদর্শক, মদ্য ব্যবসায়ী, জুয়া ব্যবসায়ী, ইত্যাদি ধনী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা লোকে দান করছে। এই দানের ফলে মানুষ নরকগামী হয়।

প্রশ্ন ৫৯। পূর্ব জন্মের কর্মফল জীবকে ভোগ করতে হয়। ভালো কিংবা মন্দ কর্মের ফল। কিন্তু সেই পূর্বকর্মের প্রভাব কি রোধ করা যায়? পুরুষকার দ্বারা তা কি খণ্ডিত হয়? যদি হয়, তা হলে কি গোবিন্দ-নির্দিষ্ট কর্মফলের মান হ্রাস হচ্ছে না?

উত্তর ঃ ভালো কর্মের ফল সুখ, মন্দ কর্মের ফল দুঃখ। যার যা প্রাপ্য তা না চাইলেও পেতেই হবে। এটিই অমোঘ বিধি। তবে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের ফলে কৃষ্ণকৃপায় কর্মফল লঘু করা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ এক সময়ে বলেছিলেন, "যার কর্মদোষে গলা কেটে যাওয়ার কথা তার হয় তো একটু আঙুল কাটল।" যার পা একেবারে ভেঙে যাওয়ার কথা তার হয় তো পায়ে একটুখানি আঘাত লাগল। এভাবে কর্মফলের ভীষণ প্রভাব অত্যন্ত লঘু বা হাল্কা হয়ে যায়।

যদি জীব গোবিন্দ-আশ্রয় নেয় তবে তার কর্মফল তাকে বিচলিত করে না। গোবিন্দ-ভক্তিফলে সর্বপাপ ক্ষয় হয়। সেইকথা গোবিন্দ নিজেই বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সব রকমের জাগতিক ধর্মকর্ম পরিত্যাগ করেও যদি কেউ আমার শরণাগত হয়, তবে তার কর্তব্য-অকর্তব্যজনিত সর্বপাপ থেকে নিঃসন্দেহে আমি তাকে রক্ষা করব।" (গীতা ১৮/৬৫)

নিছক পুরুষকার বা আপন চেষ্টা দিয়ে কোনও কর্মফল খণ্ডন করা যায় না। পুরুষকার দিয়ে কেবল কর্ম করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।* (গীতা ২/৪৭) "ধর্মবিহিত কর্মে তোমার কেবলমাত্র অধিকার আছে, কিন্তু কোনও কর্মফলে তোমার অধিকার নেই।" এই জগতে ফলের প্রত্যাশা করে যে কর্ম করা হয় তা সুখ কিংবা দুঃখ যাই হোক না কেন তা অশুভ। কারণ ফলের প্রত্যাশাই এই জড় জগতের কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণ। ফলাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে কর্ম করলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাই-ই শুভ। কারণ ভক্তিসেবা কর্মে দুঃখময় জড় জগৎ থেকে জীব উদ্ধার পেয়ে ভগবদ্ধামে উন্নীত হয়। অন্যথায় কৃষ্ণভক্তি বিনা এই জাগতিক পাপপুণ্য কর্মের ফল ভোগ করে চলতেই হবে। টাকাপয়সা চড়িয়ে, পরিশ্রম দিয়ে, নানা বুদ্ধি খাটিয়ে কর্মফল হ্রাস বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ৬০। কোনও মানুষ মারা গেলে তার নামের আগে 'স্বর্গীয়' কথাটি লেখা হয় কেন?

উত্তর ঃ সাধারণত লোকেরা পরলোকগত ব্যক্তির নামের আগে 'স্বর্গীয়' লিখে থাকে। এটি একটি মামুলি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুণ্যবান না হলে কেউ স্বর্গে যায় না। 'স্বর্গীয়' কথাটিতে বোঝায় 'স্বর্গে গতি লাভ হয়েছে'। পাপাচারীরা 'নারকীয়' অর্থাৎ, 'নরক গতি' লাভ করে। আবার অনেকে না বুঝে 'ঈশ্বর' কথাটি ব্যবহার করেন। ভগবানের সঙ্গে ঘোর বিরোধিতা করেও অসুরেরা 'ঈশ্বর সাযুজ্য গতি' লাভ করতে পারে।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ২৩ অধ্যায়ের শেষ দিকে শ্রীভীষ্মদেব ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে 'স্বর্গীয় লক্ষণ' সম্বন্ধে বলছেন, "...যাঁরা মাংস খায় না, নেশাভাঙ করে না, পরস্ত্রীসঙ্গ করে না, যাঁরা পিতা-মাতার শুশ্রূষা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি স্নেহপ্রদর্শন করে থাকেন, যাঁরা বলশালী-ধনশালী হয়েও ধীর ও জিতেন্দ্রিয়, যাঁরা বহু লোকের ভোজন দাতা, ধন দাতা ও রক্ষক, যাঁরা আশ্রম ও গ্রাম-নগর স্থাপনে প্রবৃত্ত হন, ...সেই সব ব্যক্তিগণ স্বর্গগতি লাভ করে থাকেন।" তাই তাদের মৃত্যুর পর 'স্বর্গীয়' কথাটি শোভনীয়।

প্রশ্ন ৬১। ছারপোকা ও উকুন মানুষের রক্ত চোষে, তাদের মারলে অপরাধ হয় কি?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে 'নরকের বর্ণনা' নামক ষষ্ঠবিংশতি অধ্যায়ের সতেরো নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, "ভগবানের আয়োজনে ছারপোকা, উকুন মশা ইত্যাদি নিম্ন স্তরের প্রাণীরা মানুষের কিংবা অন্য প্রাণীর রক্ত পান করে জীবন ধারণ করে। তাদের ধারণা নেই যে, তাদের দংশনের ফলে মানুষের কষ্ট হয়। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের চেতনা উন্নত। তারা জানে মৃত্যু কত বেদনাদায়ক। বিবেক সমন্বিত মানুষ যদি বিবেকহীন তুচ্ছ প্রাণীদের হত্যা করে অথবা যন্ত্রণা দেয়, তবে নিশ্চয়ই পাপ হয়। সেই পাপের ফলে মানুষকে ভগবান যে নরকে দণ্ডভোগ করবার ব্যবস্থা দিয়েছেন তার নাম অন্ধকূপ নরক। একটি অন্ধকার বিশালাকার কূপের মধ্যে পতিত হয়ে পাপী নানা রকমের কীটপতঙ্গ মশা মাছি থেকে শুরু করে অসংখ্য বিভিন্ন রকমের প্রাণীদের দ্বারা সব দিক থেকে একই সঙ্গে আক্রান্ত হয়ে অনবরত ভয়ংকর যন্ত্রণায় ছুটাছুটি করতে থাকে।"

অর্থাৎ, অন্যান্য প্রাণীরা মানুষকে কষ্ট দিলেও তাদেরকে কষ্ট দেওয়া উচিত হচ্ছে না। মানুষ এই সব রক্ত চোষা প্রাণীগুলির কবল থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য নানা বৈদিক কলাকৌশল মাত্র প্রয়োগ করতে পারে।

প্রশ্ন ৬২। যে করে পাপ, সে সাত ছেলের বাপ।
যে করে পুণ্য, তার ঘর শূন্য ॥

উত্তর ঃ আপনার হেঁয়ালী ছড়াটি বেশ সুন্দর। যে পাপাচার করে, তাকে জড় সংসারে সাতজনের ধিকৃত হতে ও প্রহার খেতে হবে। আর যে পুণ্যশীল, তার ঊর্ধ্বগতি হবে। তার প্রহার খাওয়া কিংবা ধিক্কার শোনার প্রশ্নই নেই। তার দণ্ডভোগের ঘর শূন্য।

প্রশ্ন ৬৩। যে নিজে পাপ করেনি কিন্তু পাপাচারীর সংস্পর্শে এলে তার কি কোনও পাপ হয়?

উত্তর ঃ পাপাচার নিবৃত্ত করবার জন্য যদি কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি পাপাচারীর সংস্পর্শে আসে তাতে তার পাপ হয় না। কিন্তু পাপাচার নিবৃত্তির ব্যাপার নেই, সেই ক্ষেত্রে নিষ্পাপ ব্যক্তিও পাপাচারীর সংস্পর্শে এসে পাপাক্রান্ত হয়ে থাকে।

মনুসংহিতা (৮/৩১৭) শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে—

অন্নাদেভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্যাপচারিণী।
গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষম্‌॥

"যে ব্যক্তি জীবহত্যা বা ভ্রূণহত্যা করে তার অন্ন ভক্ষণ করলে ভক্ষণকারীতে হত্যা-পাপ সংক্রামিত হয়। ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পাপ স্বামীতে সংক্রমণ করে। গুরুতে শিষ্য ও যাজ্যের পাপ সংক্রামিত হয়। চৌর্যের পাপ রাজাতে পতিত হয়।"

প্রশ্ন ৬৪। যদি ভগবান থাকে, যদি স্বর্গ নরক থাকে, তবে তার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

উত্তর ঃ আপনার সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় নেই, তবুও আপনার প্রশ্ন পড়ে আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু আপনি প্রশ্ন না করলেও কি আপনার অস্তিত্ব থাকবে না? আমি কখনও আপনাকে না জানলেও আপনার অস্তিত্ব থাকবে। আমার জ্ঞানশক্তি দিয়ে প্রমাণ করেই তবে আপনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করব নতুবা আপনার অস্তিত্ব থাকতে পারে না—এরকমটি মনে করার কোনও অর্থ হয় না।

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা 'ভগবান' 'স্বর্গ', 'নরকের' বর্ণনা দিয়ে গেছেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে ভগবান হচ্ছেন শ্রীহরি। জীব হচ্ছে শ্রীহরির দাস। যে শ্রীহরির দাসত্ব বরণ করতে চাইবে না, তাকে নরকে যেতে হবে।

আপনার নাম শ্রীহরিচরণ দাস। অতএব শ্রীহরি বলে যদি কেউ না থাকে তা হলে 'তাঁর চরণের দাস' কথাটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রভু 'শ্রীহরি' থাকলে তবে তাঁর 'চরণদাস' কথাটি যথার্থ হয়। শ্রীহরি যদি অস্তিত্বহীন হন তা হলে শ্রীহরিচরণ দাস অবশ্যই অস্তিত্বহীন।

কিন্তু 'শ্রীহরিচরণ দাস' নামটি মিথ্যা নয়। কারণ এরূপ নামকরণেরও এক কর্তা বা কারণ রয়েছে। সেইরকমভাবে সমগ্র জগতের পরম কারণ হচ্ছেন শ্রীহরি। কেবলমাত্র সমস্যাটি হচ্ছে শ্রীহরির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে অনেকে অন্য কারও দাসত্ব করছে। শুধু তাই নয়, শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যারা মানব জীবনে ভগবান, স্বর্গ, নরক মানে না তারা নাস্তিক। নাস্তিক পাপাচারীরা নরক নামক গ্রহলোকে যাতনা ভোগ করতে গিয়ে নরকের অস্তিত্ব রয়েছে বলে চাক্ষুষ প্রমাণ অবশ্যই পেতে পারবে।

প্রশ্ন ৬৫। অবৈধ সঙ্গীদের 'তপ্তশূর্মি' নরকে, মাছ রান্নাকারীদের 'কুম্ভীপাক' নরকে গতি হয় বলে শুনলাম। তবে যারা মাছ খায় তাদের কোন্‌ নরকে স্থান হয়? নরক কয়টি ও কি কি? নরকের বর্ণনা কোন্‌ শাস্ত্রে রয়েছে?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *মহারৌরবো যত্র নিপতিতং পুরুষং ক্রব্যাদা নাম রুরবস্তং ক্রব্যেন যাতয়ন্তি যঃ কেবলং দেহম্ভরঃ*—অর্থাৎ, 'মহারৌরব' নামে নরকের একটি শাস্তিবিভাগ আছে। সেখানে সেই সমস্ত পাপীরা নিক্ষিপ্ত হয়—যারা নিজেদের দেহ ধারণের জন্য অন্য প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে। সেখানে ক্রব্যাদ নামক এক প্রকার হিংস্র পশুরা থাকে, তারা পাপীকে যাতনা দিয়ে তার মাংস ভক্ষণ করতে থাকে।

অসংখ্য রকমের নরক কুণ্ড রয়েছে। সেগুলির মধ্যে মাত্র ২৮টি নরকের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে ছাব্বিশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। যেমন—(১) তামিস্র, (২) অন্ধতামিস্র, (৩) রৌরব, (৪) মহারৌরব, (৫) কুম্ভীপাক, (৬) কালসূত্র, (৭) অসিপত্রবন, (৮) সূকরমুখ, (৯) অন্ধকূপ, (১০) কৃমিভোজন, (১১) সন্দংশ, (১২) তপ্তশূর্মি, (১৩) বজ্রকন্টক শাল্মলী, (১৪) বৈতরণী, (১৫) পূয়োদ, (১৬) প্রাণরোধ, (১৭) বিশসন, (১৮) লালাভক্ষ, (১৯) সারমেয়াদন, (২০) অবীচি, (২১) অয়ঃপান, (২২) ক্ষারকর্দম, (২৩) রক্ষোভোজন, (২৪) শূলপ্রোত, (২৫) দন্দশূক, (২৬) অবট নিরোধন, (২৭) পর্যাবর্তন ও (২৮) সূচীমুখ।

প্রশ্ন ৬৬। স্বর্গ নরকের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারব কিভাবে?

উত্তর ঃ নরকের অস্তিত্ব অনুভব করতে হলে কতকগুলি সরল পন্থা আছে তা হল তত্ত্বদর্শী মহর্ষি ব্যাসদেবের 'শ্রীমদ্ভাগবত' থেকে বর্ণনা পাঠ বা শ্রবণ করতে হবে। অনুভব নেই বলেই তো মানুষের ছোট অবস্থায় পাঠশালায় যেতে হয়। অবশ্য পাঠ্যসূচির প্রবর্তকেরা যে বিষয় সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করছেন না, সেই বিষয় আলোচিত হয় না বলেই অনুভবে আসে না। পৃথিবী গ্রহ থেকে নরক গ্রহের দূরত্ব ৭ লক্ষ ৯২ হাজার মাইল। শ্রীমদ্ভাগবতে একথার উল্লেখ রয়েছে। নরকের বিবরণী দেওয়া আছে, তা পাঠ করে চুপচাপ অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। যেমনটি আমাদের অসংখ্য কোটি অজানা জিনিস চাক্ষুষ প্রমাণ ব্যতিরেকে আমরা চুপচাপ স্বীকার করে থাকি। তাছাড়া যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই উপলব্ধি করেন যে, আমার অনুভব হওয়া বা না হওয়ার উপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। অত্যন্ত মূর্খ ব্যক্তি না হলে কেউই একথা বলবে না যে, "আমার যেহেতু অনুভব নেই, অতএব কোনও বস্তুর বা কোনও গ্রহের অস্তিত্ব থাকবে না।"

প্রশ্ন ৬৭। কেউ যদি বৈষ্ণবজনের নিন্দা অপবাদ করতে থাকে তার পরিণাম কি?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে (মধ্য-২২) বলা হয়েছে—

বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যা'র গণ।
তার রক্ষা-সামর্থ্য নাহিক কোন জন॥
শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ যায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে॥

"যে ব্যক্তি বৈষ্ণবজনের নিন্দা করে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। শিবের মতো শক্তিশালী ব্যক্তিও পর্যন্ত যদি বৈষ্ণবের নিন্দা করেন, তা হলে তিনিও অবশ্যই বিনষ্ট হবেন। সেটিই সমস্ত শাস্ত্রের বাণী। কেউ যদি শাস্ত্রের উপদেশ না মেনে বৈষ্ণবের নিন্দা করে, তাহলে সেইজন্যে তাকে জন্মে জন্মে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে।"

প্রশ্ন ৬৮। পশু বধ করা মহাপাপ এবং পশুর চর্মনির্মিত জুতা বেল্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা অনুচিত। কিন্তু চর্মনির্মিত মৃদঙ্গ ভগবানের সেবায় ব্যবহার করলে অপরাধ কেন হবে না? কেউ পশু বধ করে চর্ম বিক্রি না করলে মৃদঙ্গ বানাতে চর্ম কোথায় পাওয়া যাবে?

উত্তর ঃ ভগবানের সেবার জন্য উপকরণগুলি শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। সেই বিহিত বস্তুগুলি আমাদের মনগড়া তথাকথিত যুক্তিতর্কের উপর ভিত্তি করে নিষিদ্ধ বা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচ্য হয় না। পশু বধ করা মহাপাপ তা স্বীকার করতেই হবে। সম্মুখস্ত জিঘাংসাপর পশুকে বধ করা নিষিদ্ধ নয়। পশুর মল অপবিত্র। কিন্তু গোবর পশুর মল হলেও তা পবিত্র। উচ্ছিষ্ট দুধ ভগবৎ সেবায় লাগে না। কিন্তু বাছুরের মুখ লাগলেও সেই দুধ ভগবৎ সেবায় লাগে। পোকা মাকড়ের মুখনিঃসৃত লালা শুদ্ধ নয়, কিন্তু মৌমাছির মুখ থেকে উদ্গীর্ণ মধু বিশুদ্ধ। লোম, কংকাল, খোলস, দাঁত, পাখির পালক অপবিত্র। কিন্তু চামর, শঙ্খ, হাতির দাঁত, ময়ূরের পালক পবিত্র। অতএব জুতো আর মৃদঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা কখনও উচিত নয়।

তাছাড়া মৃদঙ্গের জন্য পশু বধ করতে হয়—এরকম কথা শোনা যায় না। লোকে ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য পশুবধ করে মহাপাপ অর্জন করে। পশুচর্মের মৃদঙ্গ অশুদ্ধ বলেও শাস্ত্রে নির্ধারিত হয় নি।

প্রশ্ন ৬৯। খুব পাপী মানুষও কি কৃষ্ণভক্ত হতে পারে?

উত্তর ঃ পাপাচার সম্পূর্ণ ত্যাগ করে কৃষ্ণনাম করলে কৃষ্ণভক্ত হওয়া যায়।

পাপীতাপী যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল।
তার সাক্ষী জগাই-মাধাই ॥

প্রশ্ন ৭০। কিভাবে সাধন করতে হয়?

উত্তর ঃ কলির চারটি পাপকর্ম—নেশাভাঙ, আমিষ আহার, জুয়া তাস ও অবৈধ সঙ্গ এড়িয়ে কৃষ্ণনাম করতে হবে, কৃষ্ণভক্তের আশ্রিত হয়ে ভগবৎসেবা ও ভক্তসেবা করতে হবে।

প্রশ্ন ৭১। আমরা শুনে থাকি 'ধর্মের জয়' হয়। কিন্তু দেখতে পাই 'অধর্মের জয়'। এর শাস্ত্রীয় যুক্তি কি?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে এরকম কথা বলা হয়েছে যে,—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

"অধর্মের মাধ্যমে কাউকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে দেখা যায়, নানারূপে অভীষ্ট লাভ করতে দেখা যায়, তার শত্রুদেরও জয় করতে দেখা যায়। কিন্তু পরিশেষে অধর্মকর্তা সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।" (মনুসংহিতা ৪/১৭৪)

প্রশ্ন ৭২। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে ক্রেতাদের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে এবং ক্রেতাদের কখনও চা, কফি, পান ও সিগারেট ইত্যাদি খাওয়াতে হচ্ছে। কি করা যায়?

উত্তর ঃ অধিক মুনাফার উদ্দেশ্য যদি কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করা হয় তবে ক্রেতাদেরও অজ্ঞাত সুকৃতি লাভ হয়। আর যদি জীবনের কেন্দ্রে কৃষ্ণ স্থাপিত না হয়ে পারিবারিক কুটুম্ব ভরণাদির ব্যাপার মাত্রই থাকে, তা হলে নীতিগত মর্যাদা রক্ষার্থে ক্রেতাদের কাছে বেশী মুনাফা লাভের আশা করা উচিত হয় না। ক্রেতাদের প্রতি প্রীতিবশত অবশ্যই অপ্রসাদ না দিয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ দেওয়া কর্তব্য। সেক্ষেত্রে প্রসাদী আয়ুর্বেদিক চা, প্রসাদী মৌরী, কিংবা যে কোনও কৃষ্ণপ্রসাদ দান করলে, কেবল অর্থ কেন, পরমার্থও উপার্জিত হয়। অন্যথায় চা কফি সিগারেটাদি নেশাজাতীয় পদার্থ খাওয়ালে অর্থ উপার্জিত হতে পারে, কিন্তু অন্তিমে তা অনর্থেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন ৭৩। শ্রীকৃষ্ণের জন্য পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের কথা অমান্য করে চললে কী কোন পাপ বা অপরাধ হয়?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণের জন্য পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের কথা অমান্য করেই বহু ভক্ত কৃষ্ণকৃপা লাভ করেছেন। প্রহ্লাদ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পিতামাতা আত্মীয় স্বজনেরা যদি ভক্ত হন তবে, তাঁরা এমন কথা বলেন না যাতে কৃষ্ণভক্তির বিরুদ্ধতা হয়। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের জন্য না করে এই বিশ্বে যা কিছু করা হয়, সেই সমস্ত কর্মই এই দুঃখময় সংসারে পতিত হয়ে থাকার কারণ স্বরূপ হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্যে যা কিছু নিয়ম নীতি অনুশীলন করা হয় তাতে এক অণুও ক্ষতি নেই, পাপ বা অপরাধ তো দূরের কথা।

প্রশ্ন ৭৪। মানুষ তো মরে গেলে দেহটি পঞ্চভূতে লীন হয়ে যায় এবং আত্মা পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। তা হলে মৃত্যুর পরে সেই মানুষটি কিভাবে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে?

উত্তর ঃ মানুষ মরে গেলে স্থূলদেহটি পঞ্চভূতে মিশে গেলেও সূক্ষ্মদেহধারী আত্মাকে যমদূতেরা যমপুরীতে নিয়ে যায়। যমপুরীতে যাতনাশরীর নামক একরকম শরীর দেওয়া হয়। সেই যাতনাশরীর ধারণ করে জীব নারকীয় যাতনা ভোগ করতে থাকে। এই পৃথিবীতে যদি কেউ আমাদের শরীরে প্রচণ্ড আঘাত দেয় তবে আমরা দেহ ত্যাগ করতে বাধ্য হই। কিন্তু যাতনা-শরীরে থাকাকালীন অতি প্রচণ্ড আঘাত দিলেও আত্মা যাতনাদেহ ত্যাগ করতে পারে না। কেবল অসহ্য যাতনাই পেতে থাকে। এমনকি যাতনা-শরীরে আগুন ধরানো হলে কিংবা যাঁতাকলে পিষিয়ে সারা শরীরটি চেপ্টা করে রক্ত নিংড়ে ফেললেও পাপী দেহত্যাগ না করে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। এই রকমই হল যমলোকে যাতনা শরীরের বৈশিষ্ট্য। তারপর প্রায় সব রকমের পাপের ফল ভোগ হয়ে গেলে পৃথিবীতে একটি স্থূল শরীর নিয়ে তাকে জন্মাতে হয়। তবে সম্পূর্ণরূপেই পাপফল

নরকে ভোগ হয় না। কিছুটা পাপের ফল থাকেই, যার জন্য পরজন্মে পৃথিবীতে এসে ভোগ করতে হয়।

প্রশ্ন ৭৫। কোনও কর্মফলে একজন একটা গাছ হয়ে জন্ম গ্রহণ করল। বহু বছর সেভাবে তার থাকার কথা। কিংবা কেউ মানুষ হয়ে জন্মালো, বহুদিন যাবৎ তার কষ্ট পাওয়ার কথা। গাছটি হরিনাম শুনে কিংবা মানুষটি হরিনাম কীর্তন করে মুক্তি পাবে। কিন্তু যে কর্মফলে তার ভাগ্যে দুঃখ কিংবা সুখ ছিল সেই কর্মফল থেকেও কি তার মুক্তি হবে? নাকি কর্মফল ভোগ করতেই হবে?

উত্তর ঃ *কর্মাণি নির্দহতি চ ভক্তিভাজাং*—সমস্ত রকমের জাগতিক কর্মফল ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত এই দুঃখময় জগতে এসে সবাই দুঃখই দর্শন করবে। কিন্তু ভক্তির প্রভাবে সেই দুঃখময় দুস্তর পরিস্থিতি অতি সহজে অতিক্রম করতে পারবে। কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। তবে ভক্তির প্রভাবে সেই কর্মফল যা দীর্ঘকাল ধরে কষ্ট পাওয়ার কথা সেটা সংকুচিত হয়ে ক্ষণিকের মধ্যে কষ্ট সমাহিত হল। কিংবা যে কষ্ট অত্যন্ত গুরুতর হবার কথা ছিল সেটি লঘুতর হয়ে গেল। এই হচ্ছে সাধারণ ব্যাপার।

প্রশ্ন ৭৬। তুলসীমালা ধারণ করে মিথ্যা বলা অনুচিত, কিন্তু সংসারে থাকতে গেলে বিশেষ প্রয়োজনে মিথ্যা বলতে হয়। সেই ক্ষেত্রে কী পাপ হয়?

উত্তর ঃ সমস্ত কথা কৃষ্ণভক্তির অনুকূলে ব্যবহৃত হলে তা-ই সত্য হয়। কেননা শ্রীকৃষ্ণই পরম সত্য। সমস্ত সত্যের উৎস ও আশ্রয়।

আন কথা না বলিব আন কথা না শুনিব
সকলি কহিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব সদা লালসা অভীষ্ট কথা
ইহা বিনা সকলি অনর্থ ॥

যাঁরা পারমার্থিক কৃষ্ণভক্তিপূর্ণ জীবন গঠন করতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রে সাংসারিক সত্য মিথ্যা নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। তাঁরা কৃষ্ণভক্তি বিহীন সমস্ত কথাকেই অনর্থ জ্ঞানে কৃষ্ণভক্তির অনুকূল আলোচনাতে আগ্রহান্বিত হন।

জড় জাগতিক ক্ষেত্রে সৎব্যক্তির প্রাণরক্ষার নিমিত্ত, অধিক কলহ বন্ধ করবার নিমিত্ত, অপপ্রচারে আসক্ত ব্যক্তিদের কাছে কারও দুর্নাম গোপন করবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বললে কোনও দোষ নেই।

প্রশ্ন ৭৭। দেখা যায়, যারা ভক্ত তারাই কষ্ট পাচ্ছে। যারা নাস্তিক, বহু কুকর্ম করেও তারা দিব্যি সুখেই রয়েছে। এরকম হওয়ার কারণ কি?

উত্তর ঃ শাস্ত্রকথা হল, প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল ভোগ করে। কিন্তু কে কখন কিভাবে কর্মফল ভোগ করে তা কর্মফল ভোগকারীই বুঝতে পারে। আবার, প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্মফল বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে ভোগ হয়।

একথাও শোনা যায়, যাদের অধিকাংশ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করা হয়েছে এবং অল্প কিছু পুণ্য সঞ্চিত রয়েছে, তারা অধিক পাপকর্মের ফলটুকু মৃত্যুর পরে যমলোকে প্রাপ্ত হবে। এবং স্বল্প পুণ্যকর্মের ফলটুকু এই জীবনে লাভ করে। তাই তারা ভোগ সুখে রয়েছে।

পক্ষান্তরে, যারা অল্প পাপ এবং অধিক পুণ্য কর্ম করেছে, তারা অধিক পুণ্য ফলে সুখ লাভের উদ্দেশ্যে স্বর্গলোকে যাবে। তাই অল্প সঞ্চিত পাপরাশি স্খালনের জন্য এই জীবনেই দুঃখ যাতনা ভোগ করে। তাই তারা দুঃখে রয়েছে।

প্রশ্ন ৭৮। পাপাচারীরা মারা গেলে সেই জীবাত্মাকে যমদূতেরা নরকে নিয়ে যায়। তাহলে পুণ্যশীলদের যমদূতেরা কোথায় নিয়ে যায়?

উত্তর ঃ একমাত্র ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনকারী শুদ্ধাত্মাদের বিষ্ণুদূতেরা বৈকুণ্ঠ জগতে নিয়ে যায়। পাপাচারীদেরকে ভয়ংকররূপ যমদূতেরা নরকে নিয়ে যায়। পুণ্যাচারীদেরকেও যমদূতেরা নরকে নিয়ে যায়। কিন্তু পাপীরা যেমন যমলোকের যাত্রাপথে কষ্টযাতনা ভোগ করে থাকে এবং নরকেও শাস্তি ভোগ করে থাকে, তেমনটি পুণ্যাচারীদের কখনও ভোগ করতে হয় না। পুণ্যাচারীরা সুখেই যমলোকে গমন করেন। সেখানে সুন্দর সৌম্য-দর্শন শ্রীযমরাজ তাদেরকে আগে সম্মান প্রদান করে সুখভোগ সম্পন্ন পুণ্যস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং পুণ্যাচারীদের যদি কিছু দুষ্কর্ম থাকে, সেই কর্মফল পরে অন্যত্র কোন সময়ে প্রাপ্ত হবেন বলে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এই সমস্ত কথা শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণে ২৯ অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে।

২৩
কলিযুগের অবতার

প্রশ্ন ১। কলিযুগে ভগবানের কতজন অবতার এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন?

উত্তর ঃ কলিযুগপাবনাবতারী কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী কৃষ্ণনাম সংকীর্তন প্রবর্তনকারী সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলির প্রথম সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কলিযুগের শেষে কলিবিনাশকারী ভগবানের কল্কি অবতার অবতীর্ণ হবেন। এই দুইয়ের মাঝে অন্য কেউ ভগবানের অবতারের অবতীর্ণ হওয়ার কথা শাস্ত্রে নেই। অতএব এই সুদুর্লভ মানবজন্মে আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় নিয়ে চৈতন্য অনুগামীদের সঙ্গে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত বেদনির্দিষ্ট হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা।

প্রশ্ন ২। কেউ বলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীর সমুদ্রে প্রাণ হারান; আবার কেউ বলেন, মহাপ্রভু পুরীধামের জগন্নাথদেবের শরীরে লীন হয়ে যান। এই দুটি সম্ভাবনার মধ্যে কোন্‌টি যথার্থ এবং সেই রূপ করার তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কখনই 'প্রাণ হারান' না। যেমন, আমরা বলি সূর্য অস্ত গেল—পশ্চিম দিগন্তে ডুবে গেল। কেউ বলতে পারে, সমুদ্রের মাঝে সূর্য ডুবে গেল, কেউ বলতে পারে, দূরে ওই গ্রামের পারে সূর্য অস্ত গেল, আবার কেউ বলতে পারে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পাশেই সূর্য অস্ত গেল। কিন্তু এই সমস্ত কথাগুলি কেবল বাহ্যিক। এটা কোনও প্রকৃত দর্শন নয়। আসল দর্শন হল, সূর্য ডুবে যায় না বা অস্ত যায় না। সূর্য সূর্যই থাকে। কেবল ভিন্ন জনের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সূর্যকে কোথাও উঠতে, কোথাও ডুবে যেতে দেখা যায়। কেবল মাত্র দৃষ্টির গোচরীভূত হওয়া আর দৃষ্টির অতীত হওয়া—এই হল লীলা।

কলিযুগের প্রচ্ছন্ন অবতার ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপ্রকটলীলার সময়, হয়তো যে ভক্ত সমুদ্রের কাছে ছিলেন তিনি বলতে পারেন মহাপ্রভু জলের মধ্যে গিয়ে অন্তর্হিত হলেন, যিনি জগন্নাথ মন্দিরে ছিলেন তিনি হয়তো বলতে পারেন মহাপ্রভু জগন্নাথের অঙ্গে মিশে গেলেন। এসব অসম্ভব হওয়ার কারণ নেই। কারণ, ভগবান বলেছেন, *জন্মকর্ম চ মে দিব্যম্* (গীতা ৪/৯) ভগবানের লীলাবিলাস দিব্য অপ্রাকৃত। তা এই প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর উর্ধ্বে।

অবশ্য নানা মতের মধ্যে না গিয়ে, শাস্ত্র-প্রমাণই একমাত্র গ্রহণীয়। পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের অনতিদূরেই শ্রীটোটাগোপীনাথ মন্দির বিদ্যমান। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীগদাধর পণ্ডিত সেবিত সেই শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তর্হিত হন। মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ অন্যতম পার্ষদ শ্রীনরহরি সরকার রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে (৮/৩৫৬-৩৫৭) উল্লেখ রয়েছে—

ন্যাসিশিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার?
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার ॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন,—পুনঃ না আইলা বাহিরে ॥

প্রশ্ন ৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিযুগের পূর্বে কি কখনও জগতে আবির্ভূত হয়ে হরিনাম প্রচার করেছিলেন? হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কি অন্য কোনও যুগে ছিল?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈবস্বত মন্বন্তরে আটাশ সংখ্যক চতুর্যুগের অন্তর্ভুক্ত কলিযুগের প্রথমভাগে পরম উদার-স্বভাব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হন। একটি মন্বন্তর বলতে ৭১ চতুর্যুগ বোঝায়। অর্থাৎ, অনন্ত কালচক্রে ৭১ বার সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলির আবর্তনকাল হল একটি মন্বন্তর। প্রতি মন্বন্তরের জন্য ভগবানের এক-একজন অবতার অবতীর্ণ হন। যেমন, বর্তমান মন্বন্তরাবতার শ্রীবামনদেব। কোনও মন্বন্তরের সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হন। যুগ বিশেষে এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে, যেমন যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে বা মহাপ্রভুরূপে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করতে একমাত্র এই বিশেষ কলিযুগেই অবতীর্ণ হন।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নিত্য। তবে এই দিব্য নাম কলিযুগের বদ্ধ জীবদের জন্য নির্ধারিত, যাতে তারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে জড় কলুষ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

অনন্ত সংহিতা শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারিণে ॥

"এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কলিযুগের মহামন্ত্র। এই মহামন্ত্র কলিবদ্ধ জীবকে রক্ষা করবে।"

কলিসন্তরণ উপনিষদে উল্লেখ রয়েছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

"এই ষোল নাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কলিকলুষ নাশকারী। এর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় সমগ্র বেদের মধ্যেও দেখা যায় না।"

অতএব, কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র। অন্যান্য যুগের তারকব্রহ্ম নাম ভিন্ন রকমের। যেমন—

সত্যযুগের মন্ত্র হল—

নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণ পরামুক্তির্নারায়ণ পরা গতি ॥

ত্রেতাযুগের মন্ত্র হল—

রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠবামন ॥

দ্বাপর যুগের মন্ত্র হল—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

এবং কলিযুগের মন্ত্র হল—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রশ্ন ৪। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছেন?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একমাত্র কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে দুঃখময় সংসার-বদ্ধ জীব জন্মমৃত্যুর আবর্ত অতিক্রম করে গোলোক বৃন্দাবন নামক সর্বোচ্চ ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

তিনি ভক্তদের বলছেন—

"যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥
সবে গৃহে যাহ গিয়া লহ কৃষ্ণনাম।
সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন-প্রাণ ॥
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউক তোমা সবার শরীরে ॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

ব্রহ্মা শিব শুকদেব গোস্বামী প্রমুখ মহান মহাজনেরা যে ভক্তিরস লাভের জন্য বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করেন, এই ধন্য কলিযুগে পাপাচ্ছন্ন পৃথিবীর মানুষ অতি সহজেই তার জীবনের মাত্র কয়েকটি বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কৃষ্ণনাম কীর্তন, কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ, কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন, কৃষ্ণবিগ্রহ অর্চনাদির মাধ্যমেই সেই পরম ফল লাভ করতে পারবে।

প্রশ্ন ৫। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি কি কারণে গৌররূপে ধরাতে আবির্ভূত হলেন?

উত্তর ঃ জগতে সংসার মুক্তির একমাত্র পন্থা স্বরূপ কৃষ্ণভক্তিযোগ শিক্ষা দানের জন্য ভক্তরূপে, বিশেষত পরম ভক্তির পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধারাণীর গৌরঅঙ্গকান্তি ও ভক্তিভাব অঙ্গীকার করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাতে আবির্ভূত হলেন।

প্রশ্ন ৬। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যদি ভগবান হন, তবে কৃষ্ণ, রামচন্দ্র বা নারায়ণের অঙ্গবর্ণ থেকে পৃথক বর্ণ কেন?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গবর্ণ জলভরা মেঘের মতো নীল। *অসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।* রামচন্দ্রের অঙ্গবর্ণ দুর্বাদলের মতো শ্যাম। আর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অঙ্গ বর্ণ তপ্তস্বর্ণের মতো গৌর। কালবিশেষে অবতীর্ণ ভগবানের অঙ্গবর্ণের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে।

প্রশ্ন ৭। কার অঙ্গে মহাভাব প্রকাশিত হয়?

উত্তর ঃ মহাভাব হচ্ছে প্রেমের চরম লক্ষণ। এই মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধারাণীর অঙ্গে প্রকাশিত হয়। আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধাভাবে অবতীর্ণ হন অর্থাৎ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গে মাত্র প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন ৮। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, গীতা-ভাগবতের প্রভাব দশ হাজার বছর পর্যন্ত থাকবে। তবে তারপর ইসকনের কি অবস্থা হবে?

উত্তর ঃ তারপর ঘোর কলির রাজত্বে গীতা-ভাগবত্ত কেউ পড়বে না, কৃষ্ণভাবনামৃত অন্তর্হিত হয়ে যাবে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ আন্দোলন মাত্র পাঁচশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আরও নয় হাজার পাঁচশ বছর এখনও বাকি। সেইজন্য কলির প্রথম দিকেই যাঁরা মানুষ রূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরা সৌভাগ্যবান, তাঁদের কর্তব্য এই জীবনেই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে প্রয়াণকালে নিত্যধামে চলে যাওয়া।

প্রশ্ন ৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কতটুকু বিদ্যাশিক্ষা বা লেখা-পড়া করেছিলেন?

উত্তর ঃ আগেকার দিনে এখনকার মতো স্কুল-কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না, তখন গুরুগৃহে বা টোলে গিয়ে লোকে শিক্ষালাভ করত। তখনকার দিনের সংস্কৃত শিক্ষা, ন্যায়-শাস্ত্র ধর্ম-শাস্ত্র গীতা-ভাগবত শিক্ষার ধারা বর্তমান স্কুল-কলেজে নেই বললেই চলে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পতি। তাঁর লেখা-পড়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তবুও তিনি শ্রীল গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

তৎকালীন বিশ্ববিখ্যাত কেশব কাশ্মীরী পণ্ডিত যিনি সরস্বতীর বরপুত্র বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি নিমাইপণ্ডিতের কাছে পরাজিত হয়ে সরস্বতীর পাদপদ্মে ক্রন্দন করলে দেবী জানালেন—

যাঁর ঠাঁই তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সেই সুনিশ্চয় ॥

আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি ॥

(চৈতন্য ভাগবত আদি ১৩/১২৯-১৩০)

প্রশ্ন ১০। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন জেনেও কেন পুনরায় বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করলেন?

উত্তর ঃ বিষ্ণুপ্রিয়া হচ্ছেন গৌরহরির নিত্য শক্তি। তাই মহাপ্রভুকে বিবাহ করতেই হয়। গৃহস্থজীবনে কি করে সর্বপ্রযত্নে কৃষ্ণভাবনাময় থাকা যায় জগতে শিক্ষা দেবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে গৃহে রাখলেন, এবং কি করে আদর্শ সন্ন্যাসী হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে দিন যাপন করতে হয়, হাজার হাজার মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু সন্ন্যাস লীলা করলেন।

তাছাড়া মহাপ্রভুর সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ অপ্রাকৃত। এই জড় সংসারে আমাদের মতো অর্থাৎ, সাধারণ জড়বুদ্ধি মানুষের মতো তাঁর ক্রিয়াকলাপ নয়। আমাদের মতো জড়বুদ্ধি মানুষকে যদি সংসারী হতে হয়, খুবই চিন্তায় পড়ব—কি করে সংসারী হবো, কি করে সংসার চালাবো—আমার স্ত্রী, আমার পরিবার কি করে সুখী হবে? আবার যদি সন্ন্যাস নিতে হয়, তা হলে খুবই চিন্তায় পড়ব—হায় হায় সন্ন্যাসী হতে পারবো তো। কি রে কাটাবো। স্ত্রীপুত্রকে কে দেখবে? তাছাড়া আমাকে তো সবাই ভালোবাসে, আর সন্ন্যাসী হব কেন? কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে বা শুদ্ধভক্তের ক্ষেত্রে এরকম আদৌ বিচার্য নয়। সেই জন্য আমাদের প্রতি মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন—

গৃহে থাকো বনে থাকো
সদা হরি বলে ডাকো।

যেখানে থাকো না কেন—হরিনামটা অবশ্যই জপ-কীর্তন করতে থাকো। বিবাহ করে সংসারী হওয়া কিংবা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হচ্ছে অনবরত কৃষ্ণভক্তি-চেতনায় আত্মনিয়োগ করা। কৃষ্ণভক্তিহীন গৃহস্থের একফোঁটাও মূল্য নেই, আবার কৃষ্ণভক্তিহীন সন্ন্যাসীও অনর্থক।

প্রশ্ন ১১। কলিযুগের শেষে ভগবান কল্কি আবির্ভূত হয়ে সবাইকে নিহত করবেন, তখন পৃথিবীতে আর কোনও মানুষ থাকবে না?

উত্তর ঃ সবাই নিহত হবে না। বলা হয়েছে, *দস্যূন্ কোটিশো নিহনিষ্যতিঃ* অসংখ্য কোটি দস্যু নিহত হবে। তারা নিহত হলে অবশিষ্ট নাগরিকেরা ভগবান কল্কির দিব্য অঙ্গ থেকে বাতাসে প্রবাহিত সুগন্ধ অনুভব করবে। তৎক্ষণাৎ তারা দিব্য পবিত্র হয়ে উঠবে। তারাই পৃথিবীতে বিপুলভাবে প্রজা সৃষ্টি করবে। তখন মানব সমাজে সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট সন্তানদের জন্ম হবে। সত্যযুগ শুরু হবে।

প্রশ্ন ১২। মহাপ্রভু গৌরহরি না কি বলেছেন, কলিযুগে তিনি আরও দুইরূপে অবতীর্ণ হবেন? সেই দুই অবতার কে কে?

উত্তর ঃ শচীমাতা যখন নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণ বার্তা শুনলেন তখন একদিন স্থিরভাবে অবস্থিত নিমাইয়ের কাছে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে বিলাপ করতে লাগলেন। মাতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে নিমাইসুন্দর তাঁর এবং মাতার স্বরূপ উল্লেখ করেন। নিমাই বললেন, মা, তুমি মন স্থির করো। প্রতি জন্মেই আমি তোমার পুত্ররূপে এসেছি। পূর্বে তোমার নাম ছিল পৃশ্নি, আমার নাম পৃশ্নিগর্ভ, তোমার নাম ছিল অদিতি, আমি হলাম বামন অবতার। যখন তুমি দেবহূতি হলে, আমি হলাম কপিল। রাম অবতারে তুমি কৌশল্যা, মথুরা কারাগারে তুমি দেবকী, সেখানে আমি তোমার পুত্ররূপে জন্ম নিলাম। এখনও আমি তোমার পুত্র। অচিরে আরও দুই রূপ ধারণ করছি। তুমিই ধরণী রূপা। আর আমি তোমার কোলে অর্চা বিগ্রহ, এবং তুমি জিহ্বারূপা, আর আমি তোমার কোলে নাম রূপ।

অর্থাৎ, কলিযুগে শচীনন্দন গৌরহরির আরও দুই অবতার হল—

(১) অর্চা অবতার বা গৌরবিগ্রহ। এবং (২) নাম অবতার বা তাঁর নাম।

মোর অর্চামূর্তি মাতা তুমি সে ধরণী।
জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী ॥
এইমত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্মে ॥

(চৈতন্য ভাগবত মধ্য ২৭/৪৮-৪৯)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, পাষণ্ডী লোকেদের কিন্তু গৌরহরির "অর্চা' ও 'নাম'—এই দুইরূপ" কথাটি আদরণীয় হয় না। তারা 'নবগৌরাঙ্গবাদ' সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, কোনও কোনও মানুষকে ভগবান গৌরসুন্দরের অবতার রূপে স্থাপন করে।

প্রশ্ন ১৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর। কিন্তু মায়াপুর গঙ্গার পূর্বদিকে, না পশ্চিমদিকে?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মলীলাক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর গঙ্গার পূর্বদিকেই। পশ্চিমদিকে কখনও নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দপণ্ডিত তাঁর রচিত শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত গ্রন্থে নয়দ্বীপ সমন্বিত নবদ্বীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

মধ্যে স্রোতস্বতী ধন্যা ভাগীরথী বেগবতী।
তাহাতে মিলিছে আসি' শ্রীযমুনা সরস্বতী ॥
তা'র পূর্বতীরে সাক্ষাৎ গোলোক মায়াপুর।
তথায় শ্রীশচীগৃহে শোভে গৌরাঙ্গ ঠাকুর ॥

(প্রেঃ বিঃ ১১/২-৩)

প্রশ্ন ১৪। কলিযুগের স্থায়িত্ব কত বছর? কত বছর কলিযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে?

উত্তর ঃ কলিযুগের স্থায়িত্ব ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছর। মাত্র ৫ হাজার ৫ শত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখনও বাকি ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৫ শত বছর।

প্রশ্ন ১৫। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কেন রাধাভাব গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে ভক্তরা কি সুখ পায়, সেই কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে, সেই সুখ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর আনন্দদায়িনী পরমভক্তির পরাকাষ্ঠা শ্রেষ্ঠ আরাধিকা শক্তি শ্রীরাধারাণীর গৌর অঙ্গকান্তি ও ভক্তিভাব গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ১৬। চৈতন্য মহাপ্রভু পরমেশ্বর ভগবান এই কথা বেদে উল্লেখ রয়েছে শুনেছি। কোন্ বেদে উল্লেখ করলে খুশি হব।

উত্তর ঃ অথর্ব বেদে শ্রীব্রহ্মা ও মহর্ষি পিপ্পলাদের কথোপকথন জ্ঞাতব্য। ব্রহ্মা বলছেন—

জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি।

অর্থাৎ, "জাহ্নবীতীরে গোলোকাখ্য নবদ্বীপধামে দ্বিভুজ গোবিন্দ সকলের আত্মস্বরূপ, মহাপুরুষ পরমাত্মস্বরূপ, মহাযোগী ত্রিগুণাতীত, বিশুদ্ধসত্ত্বময় তিনি গৌররূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে ভক্তি প্রকাশ করবেন।"

চৈতন্যাখ্যং পরং তত্ত্বং সর্বকারণকারণম্ ।

"সর্বকারণের কারণ সেই পরমতত্ত্বের নাম শ্রীচৈতন্যদেব।"

প্রশ্ন ১৭। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মাকে ত্যাগ করলেন কেন? মা হচ্ছেন গুরুজন। মাকে ত্যাগ করাতে সূক্ষ্মধর্ম হয় বলে মনে হয় না। মা ও স্ত্রীকে সঙ্গে রাখলে কি ধর্ম হয় না?

উত্তর ঃ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হচ্ছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের গুরু। বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থায় সন্ন্যাসী হচ্ছেন সবার গুরু। প্রতিযুগে মানুষ সন্ন্যাসীকে সম্মান করে এসেছে। কলিযুগে তাঁর সমকালীন হাজার হাজার সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে ছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদেরকে শেখাতে হলে নিজেকে সন্ন্যাসী হতে হবে। মা আর স্ত্রীর সঙ্গে থেকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তাই মহাপ্রভু হাজার হাজার মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে যথার্থ শিক্ষা দানের জন্য, উদ্ধার করবার মানসে নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

কৃষ্ণই সমগ্র জীবের আশ্রয়, কৃষ্ণই সবার পরম পিতামাতা, কৃষ্ণই পরমবন্ধু, কৃষ্ণই পরম গতি। তাঁর ভজন উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে তাঁর প্রীতিসেবা উদ্দেশ্যে যে-কোন সামাজিক ধর্ম বর্জন করলে কোনও দোষ হয় না। সেই শিক্ষা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একম্ শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

জাগতিক সমস্ত রকমের ধর্ম—মাতৃধর্ম, পিতৃধর্ম, সমাজ ধর্ম, রাষ্ট্রধর্ম—সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হলে, আমাদের এই জাগতিক সমস্ত কর্তব্য-অকর্তব্যজনিত যা কিছু পাপ হয়ে গেল বলে মনে করছি—সেই সমস্ত পাপ থেকে পরমেশ্বর ভগবান আমাদের রক্ষা করবেন। এ সম্পর্কে আমাদের কোনরকম দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন। (গীতা ১৮/৬৬)

মা আর স্ত্রীকে নিয়ে গৃহস্থ ধর্ম পালন করা যায়। কিন্তু একজন গৃহস্থের কথা লোকে মানবে কেন? তাই মহাপ্রভুর ছাত্ররা মহাপ্রভুর চরণে অপরাধ করে বসলেও, সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও প্রণতি নিবেদনের মাধ্যমে তাদের অপরাধ বিনষ্ট হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁদের মন প্রাণ ধাবিত—তাঁরা কখনও মা বাবা স্ত্রী আদি কারও মধ্যে জড়িয়ে থাকেন না। তাদের গৃহ সংসার ত্যাগ করতেই হয়। আমরা ভাবি যে, একদিন সংসারের সব ঝামেলা মিটিয়ে দিয়ে আমি কৃষ্ণভাবনায় ভালভাবে আত্মসমর্পণ করব। কিন্তু সেই 'একদিন' কোনওঁ দিন আসবে না। কারণ কোনও দিনই সংসারের ঝামেলা মিটে না।

কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মা, তিনি সর্বজীবের হৃদয়ে রয়েছেন। কিন্তু এক জীব অন্য জীবের হৃদয়ে থাকতে পারে না। কেবল মাত্র দৈহিক আকর্ষণে, ক্ষণিক মায়া-মমতায় আবদ্ধ থাকে। তারপর অন্য কোন জীবনে অন্য কোন সম্বন্ধে বারে বারে জড় ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করতে হয়। সর্বান্তর্যামী কৃষ্ণের কাছে যাওয়ার জন্য যে এগিয়ে চলেছে—সে তো সবারই প্রিয়। কৃষ্ণ সবাইকেই দেখেন। আমরা কাউকে পালন করতে পারি না, কারণ আমাদের সমস্ত জীবনীশক্তিটাই কৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর মা শচীদেবী, পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কোনও অসুবিধায় পড়েননি। তাঁরাও মনে করেননি যে, মহাপ্রভু তাঁদের ছেড়ে চলে গেছেন।

কেউ সন্ন্যাসী হয়ে গেল মানেই তাদের আত্মীয়-স্বজন খুবই বিপদাপন্ন হল—এরকম নজির মহাবিশ্বে কোথাও দেখা যায় না। বরং আত্মীয়-স্বজনেরা সেই সন্ন্যাসীকে স্মরণ করে পরিশেষে বন্দনা করেছেন।

সহজিয়া তথাকথিত সন্ন্যাসীরা স্ত্রী-সঙ্গ ব্যতীত সন্ন্যাসের ভাবকলা দেখাতে পারে না। আদর্শ সন্ন্যাসী সেরকম নন।

যদিও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কাউকে ত্যাগ করার প্রয়োজন ছিল না, তবুও বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে মা এবং স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে হয়। তাৎপর্য এই যে, মানুষ স্বভাবতই গৃহসংসারের বৈষয়িক চিন্তায় অভ্যস্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণের চিন্তা করা কর্তব্য।

তাছাড়া আর একটি ব্যাপার হল, যিনি পরমাত্মা অন্তর্যামী তিনি আবার কাকে ছেড়ে কোথায় থাকবেন, সবই তাঁর। সমগ্র সংসারের কি করণীয়, কি করণীয় নয়—এ সমস্ত বিধিধর্মের ঊর্ধ্বে কৃষ্ণপ্রেম লাভের বাসনা। যখন মানুষ মায়ামমতা ছাড়তে পারে না তাদের এভাবে না বুঝে-সুজে সন্ন্যাস নেওয়া ঠিক নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোনও ভক্তের হৃদয়ে দুঃখ-উদ্বেগ দেন না। তিনি বলছেন—

"কাহারও হৃদয়ে না রাখিব দুঃখশোক।
সংকীর্তন সমুদ্রে ডুবাব সর্বলোক ॥
কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা মোর মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ—তার কোলে আমি আছি ॥"

(চৈতন্যমঙ্গল মধ্য ১৫/৫১-৫২)

একথা শুনে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম করতে লাগলেন। তাঁরা বুঝলেন, মহাপ্রভু তাঁদের সঙ্গে চিরকালই রয়েছেন যদি না তারা কৃষ্ণভজন ভুলে যায়।

মহাপ্রভু মাকে ও স্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁদের একমাত্র কর্তব্য কৃষ্ণসেবায় যুক্ত থাকা, তাতে তাঁদের সমস্ত দুঃখ ঘুচবে। তাঁরাও বুঝতে পেরেছিলেন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই কৃষ্ণ। তাঁর ইচ্ছার বিরোধিতা করা মোটেই ধর্ম নয়, তাঁর নির্দেশমতো জীবন যাপন করাই একমাত্র যথার্থ ধর্ম।

প্রশ্ন ১৮। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোথায় কিভাবে অপ্রকট লীলা করেন?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীনরহরি চক্রবর্তী রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, শ্রীক্ষেত্রপুরী ধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণপশ্চিম দিকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দুরত্বে শ্রীল গদাধর গোস্বামী পণ্ডিত সেবিত শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মিশে যান। মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র যিনি মহাপ্রভুর মামা বলেই মামু ঠাকুর নামে পরিচিত, তিনি শ্রীনিবাস আচার্যকে মহাপ্রভুর অপ্রকট ঘটনার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—

ন্যাসী শিরোমণিচেষ্টা বুঝে সাধ্য কার?
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার ॥
প্রবেশ করিলা গোপীনাথের মন্দিরে।
প্রবেশিয়া পুনঃ প্রভু না আইলা বাহিরে ॥

প্রশ্ন ১৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের কাছে কি আশা করেন?

উত্তর ঃ পরম করুণাময় কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—

যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥

"তোমরা যদি আমাকে ভালবাসো, তবে তোমরা সর্বদা কৃষ্ণনাম কর। শয়নকালে, ভোজনকালে, জাগ্রত অবস্থায় দিবারাত্র তোমরা কৃষ্ণকথা চিন্তা কর, আর কৃষ্ণকথা বল।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তরূপে ভগবান। তিনি সর্বদা একাকী কৃষ্ণনাম জপ করতেন। লোকদের সঙ্গে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করতেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করতেন। সর্বদা কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন ছিলেন।

নীলাচল পুরীধামে মহাপ্রভুর দর্শনে যে সমস্ত গৃহস্থ ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা মহাপ্রভুকে ছেড়ে গৃহে ফিরতেও ইচ্ছা করছিলেন না। মহাপ্রভু তাঁদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—

সবে গৃহে যাহ গিয়া লহ কৃষ্ণনাম।
সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন-প্রাণ ॥
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউক তোমা সবার শরীরে ॥

ব্রহ্মা শিব শুকদেব গোস্বামী প্রমুখ মহান মহান দেবতা ঋষিগণও যে কৃষ্ণপ্রেমরস লাভের জন্য আকুল আগ্রহ করে থাকেন, সেই গোলোকের প্রেমরত্ন ছড়াতে মহাপ্রভু ধন্য কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। কৃষ্ণনাম করতে করতে সেই প্রেমামৃত লাভ হয়।

প্রশ্ন ২০। মায়াপুর ইসকন মন্দিরের নাম চন্দ্রোদয় মন্দির রাখা হল কেন?

উত্তর ঃ 'শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয় মন্দির'। 'মায়াপুরচন্দ্র' বলতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বোঝায়। অন্ধকার রাত্রে চন্দ্র উদয় হলে অন্ধকার দূরীভূত হয়। তেমনই কলির অন্ধকারে বদ্ধজীবকে কৃষ্ণভক্তির আলো দান করবার উদ্দেশ্যে মায়াপুরে গৌরচন্দ্রের উদয় হলো। তাই মায়াপুর ধামে ইসকন মন্দিরটির নাম শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয় মন্দির। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম বৃন্দাবনচন্দ্র। তেমনই শ্রীগৌরহরির অপর নাম মায়াপুরচন্দ্র।

প্রশ্ন ২১। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন? গৃহস্থ জীবনে কি ভগবানের নাম মহিমা প্রচার করা যায় না?

উত্তর ঃ প্রতি যুগেই মানুষ সন্ন্যাসীকে সম্মান দিয়েছে। সন্ন্যাসীর কথা শিরোধার্য করেছে। কিন্তু কলিযুগে বহু সন্ন্যাসী দেখা যায়, যারা মায়াবাদী, বা নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী। সেই সমস্ত সন্ন্যাসীরা জানে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তারা নিরাকার ব্রহ্মকে, কিংবা সবাইকে, কিংবা নিজেকে, অন্য দেব-দেবীকে পরমেশ্বর ভগবান বলে দাবি করে।

সমাজে সন্ন্যাসীর কাজই হচ্ছে বদ্ধ জনগণকে ভগবদ্ভক্তি শেখানো। সন্ন্যাসত্ব থাকলে তবে কোন ব্যক্তি গুরু হন, সবার পূজনীয় হন। অথচ অধিকাংশ সন্ন্যাসী ভগবানকেই জানে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জানালেন—'যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।' তাই আদর্শ সন্ন্যাসী কিরূপ হওয়া উচিত, তা তিনি সন্ন্যাসলীলা গ্রহণ করে তথাকথিত সমস্ত সন্ন্যাসীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাদের সমস্ত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেছিলেন। তথাকথিত মায়াবাদী ব্রহ্মবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সন্ন্যাসীরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন, তাঁদেরই উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু দেখিয়ে গিয়েছিলেন—কেমন করে আদর্শ সন্ন্যাসী হয়ে বিশ্বের সর্বত্র কলিযুগের যুগধর্ম

হরিনাম প্রচার করা যায়। এটাই মহাপ্রভুর সন্ন্যাস লীলার তাৎপর্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, গৃহস্থ হলে ভগবানের নাম-মহিমা প্রচার করা যায় না।

মহাপ্রভু যতদিন গৃহে ছিলেন, আদর্শ গৃহস্থ হিসাবেই ছিলেন। সংসারের সমস্ত কাজকর্মে লিপ্ত থেকে কিভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত থাকা যায়, তা-ই তিনি তাঁর আচরণের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত আচার্য প্রভু, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস ঠাকুর—মহাপ্রভুর এই সকল অন্তরঙ্গ পার্ষদের সকলেই ছিলেন আদর্শ গৃহস্থ। সেই ধরনের গৃহস্থ যখন ভগবানের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন ভগবানই তাঁর আশ্রিতদের রক্ষা করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করেছিলেন, নববধূ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও বৃদ্ধা মাতা শচী দেবীকে ছেড়ে কৃষ্ণ-মহিমা প্রচার করেছিলেন। আমরা জানি, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও শচীমাতার তাতে কোনই অসুবিধা হয়নি। তাঁরা সর্বদা মহাপ্রভুর কথাই চিন্তা করছিলেন এবং কৃষ্ণ নাম জপ করেই দিনাতিপাত করেছিলেন।

যাঁরা কৃষ্ণগত প্রাণ, তাঁরা গৃহে থাকুন কিংবা বনে থাকুন, যে ভাবেই থাকুন না কেন, অন্তর্যামীর সঙ্গে তাঁদের যে চিরন্তন সম্পর্ক, তা কোনদিনই বিচ্ছিন্ন হয় না, তা কৃষ্ণভক্ত-মাত্রই জানেন। আর যারা জানে না, তারাই ভক্তদের ছন্নছাড়া হিসাবে দেখে। শয়নে, স্বপনে, স্মরণে, আরাধনায়, নামকীর্তনে, নাম শ্রবণে ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। বৈষ্ণব মাত্রেই জানেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্* অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবানের জন্ম ও কার্যকলাপ সমস্তই দিব্য। তাঁর সমস্ত লীলাবিলাস জড়-জগতের ঊর্ধ্বে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা যদি কোন কিছু চুরি করি, তবে আমাদের দুর্নাম হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদি কোন কিছু চুরি করেন, তবে লোকে তাঁর গুণকীর্তন করবে। এটাই হল জড় কর্ম ও চিন্ময় কর্মের মধ্যে পার্থক্য। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস লীলা আর শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষী নিয়ে যে গৃহস্থ লীলা—উভয়ই সমভাবে সচ্চিদানন্দময়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়েছেন বলে আমাদের সন্ন্যাস নিতে হবে, এমন কথা কোথাও বলা হয়নি। মহাপ্রভুর ভক্তদের বেশির ভাগই ছিলেন গৃহস্থ। বৈষ্ণব আচার্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নির্দেশ দিয়েছেন—

"গৃহে থাকো, বনে থাকো।
সদা 'হরি' বলে ডাকো ॥"

আমরা যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন, আমাদের জীবন-যাপন করতে হবে কৃষ্ণনাম কীর্তন, কৃষ্ণকথা আলোচনা, কৃষ্ণ আরাধনা ও কৃষ্ণসেবার ভাব নিয়েই এবং অন্য সকলে যাতে কৃষ্ণভক্তিপথে থাকে, তার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়াও আমাদের কর্তব্য।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করলেও তিনি নিজেকে সন্ন্যাসী মনে করতেন না। তিনি জীবকে শিক্ষা দিয়ে ছিলেন—আমরা প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস। শ্রীকৃষ্ণের দাসত্বই আমাদের প্রকৃত পরিচয়। শাস্ত্রে এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদ-কমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ ॥

অর্থাৎ, 'আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। আমি সেই নিখিল-পরমানন্দ পূর্ণ-অমৃত-সমুদ্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের দাস-দাসানুদাস মাত্র।' (পদ্যাবলী ৭/৪ শ্লোক)

আমরা ভগবানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ স্বরূপ দাসানুদাসানুদাস মাত্র। এই শিক্ষা নিয়েই যে কোনও জায়গায় থাকি না কেন, কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন ও কৃষ্ণমহিমা প্রচার করাই মানুষের এই ধরাধামে জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ২২। মহাপ্রভু শচীমাতাকে বলেছিলেন, 'অতি শীঘ্র আমি তোমার কাছে আরও দুইরূপে অবতীর্ণ হব'—কোন্ দুই রূপ?

উত্তর ঃ বিগ্রহরূপে এবং নামরূপে। শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী—

'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।'

(চৈঃ চঃ আদি ৭/২২)

এবং অন্যত্র বলেছেন—

'নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি—তিন চিদানন্দরূপ ॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ৭/১০)

শচীমাতাকে গৌরসুন্দর বলছেন, 'অর্চাবিগ্রহরূপে আমার যে প্রকাশ সেক্ষেত্রে ধরণীরূপে তুমিই আমার মাতা। আর নামরূপে আমার যে অবতার, জিহ্বারূপে তুমিই তার মাতা।'

'মোর অর্চামূর্তি মাতা তুমি সে ধরণী।
জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী ॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৭/৪৮)

প্রশ্ন ২৩। বুদ্ধদেব কেন আবির্ভূত হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ভগবানের বুদ্ধ অবতার সম্পর্কে শ্রীল জয়দেব গোস্বামী তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে লিখেছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

মানুষেরা যজ্ঞের দোহাই দিয়ে ব্যাপক হারে নিরীহ পশুদের হত্যা করতে থাকে। এইভাবে যজ্ঞের নামে পশু-হত্যা দেখে ভগবানের সদয়-হৃদয় ব্যথিত হয়েছিল, এবং সেই পশু-হত্যা বন্ধ করার জন্য তিনি কৃপা করে বুদ্ধদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ২৪। স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে এই কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই সম্পর্কে শাস্ত্রীয় যুক্তি কি?

উত্তর ঃ প্রায় সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার অসংখ্য প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঘোষণা করা হয়েছে—

ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম, পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ-অবতার প্রকট প্রমাণ ॥
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্যের কিরণ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৩/৮৩-৮৫)

শ্রীঅথর্ববেদে শ্রীব্রহ্মা মহর্ষি পিপ্পলাদকে বলছেন—"*রহস্যং তে বদিষ্যামি,— জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি।*"
অর্থাৎ, "এক পরম নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাকে বলব। সকলের আত্মস্বরূপ, মহাপুরুষ, পরমাত্মাস্বরূপ মহাযোগী, ত্রিগুণাতীত, বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর স্বয়ং জাহ্নবীতীরে গোলোকাখ্য নবদ্বীপ ধামে শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে ভক্তি প্রকাশ করবেন।"

শ্রীমৎস্য পুরাণে ভগবান বলছেন—

মুণ্ডো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রি স্রোতস্তীর সম্ভবঃ।
দয়ালু কীর্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে ॥

"আমি কলিযুগে গঙ্গাতটে সুদীর্ঘ গৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হয়ে জগতের প্রতি করুণাবশত মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীবেশে সকলকে যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন করাব।"

শ্রীকূর্ম পুরাণে ভগবান বলছেন—

কলিনা দহ্যমানানামুদ্ধারায় মহীতলে।
জন্ম প্রথম সন্ধ্যায়াং প্রহীষ্যামি দ্বিজাতিষু ॥

"কলিকবলিত জনগণকে উদ্ধার করবার জন্য আমি কলিকালের প্রারম্ভে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হব।"

শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণে শ্রীভগবানের উক্তি—

অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেন লোকান্ রক্ষামি সর্বদা ॥
দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং ভক্তরূপিনঃ।
কলৌ সংকীর্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

"হে বিপ্র, আমি কলিকালে ভগবদ্ভক্তরূপে প্রচ্ছন্ন মূর্তিতে সকল লোককে নামপ্রেম প্রদান করত রক্ষা করব। হে দেবতাগণ, তোমরা সকলে শীঘ্র পৃথিবীতে ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ কর। আমি কলিকালে শচীপুত্ররূপে প্রকটিত হয়ে জগতে হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন করব।"

শ্রীপদ্ম পুরাণে শ্রীভগবান উল্লেখ করেছেন—

কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগীরথীতটে ভূম্নি ভবিষ্যামি সনাতনঃ ॥

"আমি কলিযুগ প্রারম্ভে গঙ্গাতটে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হব।"

শ্রীগরুড় পুরাণে ভগবানের উক্তি—

অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগো সন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

"আমি যুগসন্ধিতে অর্থাৎ, কলির প্রারম্ভে শ্রীনবদ্বীপে মায়াপুরে শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং পূর্ণস্বরূপে প্রকটিত হব।"

শ্রীভবিষ্য পুরাণে শ্রীভগবান বলছেন—

আনন্দাশ্রুকলারোমহর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিনম্ ॥

"হে তপোধন! কলিকালে আমাকে সকলে প্রেমানন্দে বিহ্বল সন্ন্যাসীরূপে দেখতে পাবে।"

শ্রীবামন পুরাণে শ্রীভগবান বলছেন—

কলিঘোর তমশ্ছন্নান্ সর্বানাচারবর্জিতান্।
শচীগর্ভে সম্ভবায় তারয়িষ্যামি নারদ ॥

"হে নারদ! আমি শচীগর্ভে প্রকটিত হয়ে আচারবিহীন কলিহত জনগণকে উদ্ধার করব।"

শ্রীদেবী পুরাণে উল্লেখ রয়েছে—

নাম-সিদ্ধান্ত সম্পত্তি প্রকাশন পরায়ণঃ।
ক্বচিৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামা লোকে ভবিষ্যতি ॥

"কোন সময় ভগবান শ্রীহরি নামসংকীর্তনরূপ পরম-সম্পত্তি বিতরণের জন্য জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকাশিত হবেন।"

শ্রীভবিষ্য পুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বং ন সংশয়ঃ।
কলৌ সঙ্কীর্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

"কলিযুগে সংকীর্তনারম্ভে আমি শচীদেবীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব, জন্মগ্রহণ করব, জন্মগ্রহণ করব। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে নির্দেশ রয়েছে—

গোলোকং চ পরিত্যজ্য লোকানাং ত্রাণকারণাৎ।
কলৌ গৌরাঙ্গরূপেন লীলালাবণ্যবিগ্রহঃ ॥

"লীলাময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কলিযুগে জীবদের উদ্ধারের জন্য গোলোক থেকে ভূলোকে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হন।"

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

"যাঁর মুখে সর্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুটি বর্ণ, যাঁর অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ, গৌর, সেই অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করেন।"

মহাভারতে কলিযুগে ভগবান সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥

"সুবর্ণ বর্ণ, সুগলিত হেমবৎ অঙ্গ, সর্বাঙ্গ সুন্দর গঠন, চন্দন ও মালা শোভিত—এই চারটি গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাস আশ্রয়, হরিরহস্য আলোচনারূপ শমগুণ বিশিষ্ট, হরিকীর্তনরূপ মহাযজ্ঞে সুদৃঢ়নিষ্ঠ, কেবলাদ্বৈতবাদীর, অভক্তিনিবৃত্তিকারি শান্তিলব্ধ মহাভাব পরায়ণ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮/১৩) উল্লেখ রয়েছে—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

শ্রীগর্গ মুনি শ্রীনন্দ মহারাজকে বলছেন—"হে নন্দ! তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীত (গৌর) বর্ণ অন্য তিন যুগে ধারণ করেন। অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছেন।"

আদি পুরাণে ভগবান বলছেন—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্বদা ॥

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। আমার এই প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ নিত্য। আমিই নিজরূপ গোপনপূর্বক ভগবদ্ভক্তরূপে লোকসমূহে ধর্ম স্থাপন করে সর্বদা তাদের রক্ষা করি।"

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৯/৩৮) উল্লেখ রয়েছে—

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীভগবানকে বলছেন, "হে কৃষ্ণ। তুমি এই প্রকারে নর, তির্যক, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদি অবতাররূপে লোকদের পালন কর এবং জগৎশত্রুদের বিনাশ কর। হে মহাপুরুষ! কলিকালে যুগানুবৃত্ত নামকীর্তন ধর্ম ছন্নভাবে প্রচার করবে। এই জন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেননা প্রচ্ছন্ন-অবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার ।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ২/১০৯-১১০)

উপপুরাণে উল্লেখ রয়েছে—

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষি ব্যাসদেবকে বলছেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমি বিশেষ কলিযুগে অধঃপতিত পাপী মানুষদের হরিভক্তি প্রদান করবার জন্য সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করি।"

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে—

যেই দ্বাপরে হয় কৃষ্ণ-অবতার ।
সেই কলিযুগে গৌরচান্দের প্রচার ॥

(চৈঃ মঃ আদি ৫৮৬)

দ্বাপর যুগে অভক্ত অসুরেরা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করত না। তারা তাঁকে সাধারণ মানুষরূপে চিন্তা করেছিল। কলিযুগের মহাবদান্য অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে অভক্ত ও আসুরিক ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

কৃষ্ণ নাহি মানে তা'তে দৈত্য করি' মানি ।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তা'রে জানি ॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন ।
সর্বোত্তম হইলেও তা'রে অসুরে গণন ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৮/৯, ১২)

শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্তুতি করছেন এইভাবে—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

"মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা, গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভুকে নমস্কার।" অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ হচ্ছে মহাবদান্যতা, তাঁর লীলা—কৃষ্ণপ্রেম প্রদান, তিনি তত্ত্বত কৃষ্ণ, তাঁর নাম—কৃষ্ণচৈতন্য, তাঁর রূপ—গৌরবর্ণ।

প্রশ্ন ২৫। কল্কি অবতার কথার অর্থ কি?

উত্তর ঃ কলিযুগের শেষ সময়ে ভারতে সম্ভলগ্রাম নামক স্থানে শ্রীবিষ্ণুযশা নামে এক সৎ ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণু কল্কি নামে আবির্ভূত হয়ে কলি-কলুষিত অনাচারী জঘন্য প্রকৃতির সভ্যতাকে বিনাশ করবেন। তখন সমগ্র জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এই কলিযুগের স্থায়িত্ব হচ্ছে ৪,৩২,০০০ বছর। প্রায় ৫০০০ বছর গত হয়েছে। আরও ৪,২৭,০০০ বছর বাকি। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু ।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ ॥

"দ্বাবিংশ অবতারে যুগসন্ধিকালে শাসক সম্প্রদায় যখন দস্যুতে পরিণত হবে, তখন ভগবান কল্কি অবতার নামে বিষ্ণুযশ নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতরণ করবেন।" (ভাঃ ১/৩/২৫)

শ্বেতঅশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে অস্ত্র দ্বারা কলিকে সম্পূর্ণরূপে কর্তন করবেন সেই কল্কি অবতার। তার পর নতুন যুগের সূচনা হবে।

প্রশ্ন ২৬। বুদ্ধ অবতার কোন্ যুগে?

উত্তর ঃ ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার বুদ্ধদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় ২৬০০ বছর আগে। অর্থাৎ এই কলিযুগে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বহু পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল—

ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্ ।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥

"একবিংশতি অবতরণে কলিযুগের প্রারম্ভে ভগবান ভগবদ্‌বিদ্বেষী নাস্তিকদের সম্মোহিত করার জন্য বুদ্ধদেব নামে গয়া প্রদেশে অঞ্জনার পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন।" (ভাঃ ১/৩/২৪)

কলিযুগে নাস্তিক অসুর-প্রকৃতির মানুষেরা ব্যাপকহারে নিরীহ পশুদের হত্যা করতে লাগল, মাংস-আহার-প্রিয় এবং বৈদিক যজ্ঞের নামে সবই জায়গাই কসাইখানাতে পরিণত হয়েছিল। বেদের নামে অবৈধভাবে অসংখ্য পশুবলি চলতে লাগল। সেই সময় ভগবান অহিংসার বাণী নিয়ে বুদ্ধদেবরূপে আবির্ভূত হলেন।

প্রশ্ন ২৭। বহিরঙ্গ লয়ে করে নাম সংকীর্তন ।
অন্তরঙ্গ লয়ে করে রস আস্বাদন ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এখানে অন্তরঙ্গ কারা এবং বহিরঙ্গই বা কারা?

উত্তর ঃ এখানে শ্লোকটিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই ধরাধামে অবতরণের বহিরঙ্গ বা গৌণ কারণ হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন এবং অন্তরঙ্গ বা মুখ্য কারণ ভক্তরূপে কৃষ্ণপ্রেম রস আস্বাদনের কথাই বলা হয়েছে। তাই প্রশ্ন হবে, মহাপ্রভুর অবতরণের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ কারণ কি?

কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন করার কার্যটি হচ্ছে যুগাবতারের কার্য। ভগবান চার যুগে যথাক্রমে শ্বেত রক্ত পীত ও কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্য আবির্ভূত হন। কিন্তু যেহেতু এই যুগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যিনি সমস্ত অবতারের অবতারী—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন—তাই তিনি যুগাবতারের কার্যটিও সম্পাদন করেছেন। তাঁর মধ্যে সমস্ত অবতার সন্নিবিষ্ট। তাই নাম সংকীর্তন লীলাটি হল তাঁর বাহ্যিক বহিরঙ্গ কার্যকলাপ।

কিন্তু শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণরূপে যখন তিনি লীলাবিলাস করেছিলেন, তখন তিনি চিন্তা করেছিলেন—তাঁর প্রিয়ভক্তের মহিমা কি রকম, ভক্ত ভগবানের মাধুর্য কিভাবে আস্বাদন করে, ভক্তের সুখটি বা কি রকম—এই সমস্ত বিষয়ে বিজাতীয় সুখ আস্বাদন করবার জন্য স্বয়ং ভগবান ভক্তরূপে অবতীর্ণ হলেন।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

(চৈঃ চঃ আ ৪/৩২০)

অর্থাৎ "শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কি রকম, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করে, সেই মাধুর্যই বা কি রকম এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করে, সেই সুখই বা কি রকম—এই সকল বিষয়ে জানবার জন্য লোভ জন্মানোর ফলে শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভ-সিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন।"

এটিই ভগবানের আভ্যন্তরীণ বা অন্তরঙ্গ কার্যকলাপ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের প্রেমরস আস্বাদন করবার জন্য রাধাভাবযুক্ত হয়ে মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেটিই তাঁর অবতরণের মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ।

প্রশ্ন ২৮। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর বয়সে অতি বৃদ্ধা মাতা ও যুবতী পত্নীকে অতি দুঃখময় জীবনে ফেলে রেখে গৃহত্যাগ করলেন কেন? এতে সাধারণ মানুষের শিক্ষণীয় বিষয় কি?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে হৃদয় আকৃষ্ট হলে মানুষ এই জড় বদ্ধ জীবনধারার গণ্ডী অতিক্রম করে যায়। আমাদের মনুষ্য জীবন ও পরিবার পরিজনাদির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ অনিত্য, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিত্য। নিত্য বস্তুর প্রতি যাদের আকর্ষণ নেই, তারা অনিত্য বস্তু নিয়েই সমস্ত রকমের পরিকল্পনা করে। যারা কৃষ্ণকে চায় না, যাদের হৃদয় জড় জাগতিক বস্তুর ভোগাকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত, তারা মনে করে, "গৃহসংসার নিয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্ফূর্তি করে দিন কাটানো যাক, পরে যখন বৃদ্ধ অথবা অকেজো হয়ে যাব, তখন হরিভজনের জন্য একদিন সন্ন্যাস ব্রত নেওয়া যাবে।" কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাদের সেই চিন্তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পরমনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের অভয়চরণে শরণাগত ভক্ত জানেন যে, সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের সমস্ত প্রকারের অভাব অভিযোগ পূরণ করেন এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করেন। এই সম্বন্ধে পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

"অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাঁরা আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁদের সমস্ত অভাব পূরণ করি এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।" (গীতা ৯/২২) কিন্তু জড় বুদ্ধি সম্পন্ন বিষয়ী মানুষেরা চিন্তা করে, "আমি চলে গেলে আমার বৃদ্ধ মাকে কে দেখবে, যুবতী স্ত্রীর দশা কি হবে? তার চেয়ে কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে মা ও স্ত্রীর দেখাশোনা করি, তা হলেই আমার জীবন সার্থক হবে।"

শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৌরহরির বিরহে কাতর হয়েছিলেন। তাঁরা সর্বদা গৌরহরির চিন্তা করতেন, তাঁর স্মরণ, তাঁর ধ্যান, তাঁর নাম কীর্তন ও আরাধনা করেই জীবন যাপন করেছিলেন। এই জীবনধারার অপর নাম কৃষ্ণভাবনাময় জীবন। এটাই প্রত্যেক মনুষ্যের গ্রহণীয়। তাঁরা যে মহাপ্রভুকে স্মরণ করে তাঁর দর্শন পেতেন, সে কথাও শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের গৃহপরিবার কখনও অভাব অনটনে বিপন্ন হয় নি।

গৌরহরি কেবল শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর হৃদয়নিধি ছিলেন, তাই নয়; তিনি সমস্ত ভক্তের হৃদয়ে বাঁধা ছিলেন। কোনও গৃহস্থ ব্যক্তি সাধারণত তার মাতা পিতা ও পত্নীর আপনজন হন, কিন্তু কোনও সন্ন্যাসী সারা বিশ্ববাসীর প্রিয় হন। কেউ যদি বিশ্ববাসীকে মনুষ্য-জীবনের আদর্শ শিক্ষা দান করতে চান, তবে তাঁকে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে বিশ্বের সবার দরবারে যাত্রা করতে হয়।

ভগবানের লীলা অপ্রাকৃত। ষোল হাজার রাণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্যলীলা এবং মহাপ্রভুরূপে তাঁর সন্ন্যাস লীলার মধ্যে মূলত কোনও পার্থক্য নেই। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার জন্ম ও সমস্ত কার্যকলাপ দিব্য অপ্রাকৃত বলে তত্ত্বত জানেন, তাঁকে আর দেহ ত্যাগ করার পর পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" (গীতা ৪/৯) কিন্তু প্রাকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা ভাবে, "ভগবানের এরূপ লীলা ঠিক নয়, এরূপ কাজ ঠিক নয়, আমার মতোই ভগবানের চলা উচিত। ভগবান ভাল কাজ করেন নি।"

মহাপ্রভু যদি গৃহে থাকতেন তবে তাঁকে সাধারণ মানুষ ভুল বুঝত। মহাপ্রভুর ছাত্ররাই তাঁকে ভুল বুঝেছিল এবং তারা মহাপ্রভুর চরণে মহা অপরাধ করেছিল। কিন্তু মহাপ্রভু চিন্তা করলেন, সন্ন্যাসীকে প্রতি যুগে লোকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আসছে। সন্ন্যাসী সবার প্রণম্য। সন্ন্যাসীর কথা সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলে মানুষের বহু পাপ নষ্ট হয়ে যায়। সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দর্শন করলেই কল্যাণ হয়। সন্ন্যাসীরাই পরিব্রাজক রূপে দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করতে পারে এবং কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের শিক্ষা দিতে পারে। তা ছাড়া আদর্শ সন্ন্যাসী কে হতে পারেন? তাই তৎকালীন অসংখ্য নামকরা মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু স্বয়ং সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করলেন এবং সর্বনাশা মায়াবাদ থেকে তাদের উদ্ধার করেন।

কৃষ্ণপ্রেমে আকুলচিত্ত ব্যক্তি ধন-জন-সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হন না। আদর্শ কৃষ্ণভক্ত তাঁর ধন-জন স্ত্রী-পুত্র এবং নিজের জীবন সর্বস্বই শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেন। কিন্তু যে ব্যক্তির চিত্ত ধন-জন সুন্দরী স্ত্রীর প্রতিই আকৃষ্ট, তার পক্ষে লোক দেখানো সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করা উচিত নয়। এ কথাও মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন। মহাপ্রভু বলেছেন—

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা ॥

"লোকের কাছে বাহবা পাবার জন্য কপট বৈরাগ্যের অভিনয় কোর না; অনাসক্ত হয়ে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ কর।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৬/২৩৮)

অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥

"অন্তরে, নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা কর, কিন্তু বাইরে, একজন সাধারণ বিষয়ীর মতো আচরণ কর। তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি অচিরেই সন্তুষ্ট হবেন এবং ভবমায়ার বন্ধন থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৬/২৩৯)

কলিযুগের মানুষেরা ঘর সংসারের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট থাকে এবং তারা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। বাইরে তারা নিজেদের গণ্যমান্য সম্মানীয় ব্যক্তিরূপে নিজেদের পরিচয় দেয়।

পরমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া এই অনিত্য জড় সংসারে অন্য কোন কিছুই যে আকর্ষণীয় নয় এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্যই জীবন উৎসর্গ করা উচিত, তা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই মহাপ্রভু এইভাবে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন গ্রহণ করলেন।

প্রশ্ন ২৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন, তবে লক্ষ্মীপ্রিয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করলেন কেন?

উত্তর ঃ লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া ভগবানের নিত্যশক্তি। সূর্য ও সূর্যপ্রভার মধ্যে যেমন নিত্য সম্বন্ধ তেমনই শক্তি ও শক্তিমানের নিত্য সম্বন্ধ। এমন নয় যে, লক্ষ্মীপ্রিয়া কিংবা বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, যেমনটি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কিংবা অন্য কোনও জীবের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে, ভগবৎশক্তি কখনই ভগবান ছাড়া থাকতে পারেন না। তিনি নিত্যই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েই রয়েছেন।

আমরা ভক্তিমুখে শুনি কৃষ্ণপ্রিয়া রাধারাণী কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর হয়েছিলেন। অথচ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—"আমি কখনও বৃন্দাবন ছেড়ে এক পাও কোথাও যাই না।" তিনি সর্বদাই বৃন্দাবনে বৃন্দাবনেশ্বরীর স্থানেই রয়েছেন।

আসলে, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ও কালের অধীন বদ্ধ জীব আমরা ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাকে জড়জাগতিক কার্যকলাপ মনে করেই উদ্‌ভ্রান্ত হই। কিন্তু চিদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন মুক্ত পুরুষেরা সেই দিব্য ক্রিয়াকলাপ শ্রবণ ও কীর্তন করে অভিভূত হন। মুক্ত পুরুষেরা

জানেন ভগবান কালের অতীত তত্ত্ব, অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যেটা মনে হচ্ছে শত বছরের বিচ্ছেদ বিরহ যন্ত্রণা, কিন্তু সেটি ভগবানের কাছে একটি নিমেষমাত্রও নয়।

ভগবান গৌরসুন্দর এসেছিলেন ধরাধামে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করতে। ভগবৎ লক্ষ্মী লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াও ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন কৃষ্ণভক্তি প্রচার করতে। অতএব তাঁদের বিবাহলীলা অনুষ্ঠিত হতে হলে শ্রীগৌরহরির সঙ্গেই বিবাহ হবে। তৎকালীন মানব সমাজে মেয়েদের অতি অল্পবয়সেই বিবাহ হত। তাই লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অল্পবয়সেই বিবাহ অনুষ্ঠান হয়েছিল।

সাধারণত মানুষ সংসার-বাসনায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের বিবাহ সেরূপ নয়। নারায়ণ বিবাহ করে লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হন নি। লক্ষ্মী ও নারায়ণ নিত্যকালই পতি-পত্নীরূপে রয়েছেন। যেমনটি শ্রীব্রহ্মাকে পুত্ররূপে লাভ করতে ভগবানের লক্ষ্মীর সাহচর্য নিতে হয় না, আত্মারাম ভগবান নিজের নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করেছিলেন।

কিন্তু জড়জাগতিক বিবাহ ঘটে সাধারণত নারী-পুরুষের প্রবল আসক্তি ও সংসার সুখভোগের বাসনা হেতু, এবং সেই বৈবাহিক সূত্রে অপত্য সৃজন ও সমস্ত পরিবার নিয়ে মানুষ মায়ামোহিত হয়ে মনে করে যে, সংসার সুখ ভোগ করাটাই জীবনের পরম উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটি যে জীবনের কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নয় তা মহাপ্রভু জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

লোক বিবাহ করুক আর নাই করুক তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু মনুষ্য জন্মকে সার্থক ও ধন্য করতে হলে হরিভজন একান্তই প্রয়োজন এবং সেটি মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভগবদ্‌সেবা বিমুখতার ফলে আমরা ভগবানের তটস্থা জীবশক্তি এই দুঃখময় জড় জগতে অধঃপতিত হয়েছি, আমরা মায়ার সংসারে পড়ে ভগবানের পাদপদ্ম সেবা রূপ আমাদের চিন্ময় স্থিতির কথা ভুলে গেছি। সেই দুরবস্থায় আমাদের কি করণীয় তা শেখানোর উদ্দেশ্যেই ভগবানের প্রিয় পার্ষদগণ এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে আপন লীলা বিস্তার করেছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া ভগবানের নিত্যপার্ষদ। যদি কেউ মনে করে 'ভগবান এখানে নেই, ভগবান আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমি কর্মদোষে এই দুঃখময় জগতে পতিত হয়েছি,' তবে তিনি সত্বর ভগবানের পাদপদ্ম সন্নিকটস্থ হওয়ায় উদ্দেশ্যে আকুল ক্রন্দন করবেন, সমগ্র জগৎ তাঁর কাছে স্বাভাবিকভাবেই শূন্য বলে বোধ হয়। তাই তিনি আর এই জগতে বেঁচে থাকতে স্পৃহাবোধ করবেন না। নিরবধি ভগবদ্‌স্মরণ হতে থাকে। তাঁর দেহস্মৃতি পর্যন্ত থাকে না। তিনি দেহ ত্যাগ করে ভগবদ্‌পাদপদ্মে উন্নীত হন। এইরূপ দৃষ্টান্ত হলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী।

আবার যদি কেউ চিন্তা করেন, ভগবান সর্বত্র রয়েছেন, তবে তিনি ভগবানের স্বরূপ, তাঁর দিব্য নাম, তাঁর শ্রীবিগ্রহ অভিন্ন এই জ্ঞানে ভগবদ্ বিগ্রহের পূজা অর্চনা, ভগবানের নাম কীর্তনাদি করে সুখে দুঃখে বিচলিত না হয়ে ভগবদ্ প্রীতির উদ্দেশ্যে অহৈতুকী ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন করেন, তিনিও ভগবদ্ ধামে উন্নীত হন। এইরূপ দৃষ্টান্ত হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী বৈকুণ্ঠলক্ষ্মী ভৌমলীলা সংবরণ করে গৌরহরি বৈকুণ্ঠপতির পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে উন্নীত হলেন, আর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী দ্বারকালক্ষ্মী সত্যভামা কলিযুগে ধরাবাসীর কাছে আন্তরিকভাবে গৌরকৃষ্ণের নাম স্মরণ, কীর্তন, অর্চনা প্রণতি ইত্যাদি শুদ্ধভক্তির শিক্ষাদর্শ স্থাপন করেছেন।

তাই, ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অপ্রাকৃত বিরহলীলা এবং মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধিতে বিচার্য নয়। শ্রীভগবান বলছেন যে, তাঁর এই জগতে জন্ম এবং সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যদি দিব্য জ্ঞানে কেউ বুঝতে পারে তো সে দিব্যধাম প্রাপ্ত হবে, সে আর এই দুঃখময় জগতে জন্মগ্রহণ করতে আসবে না।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য অপ্রাকৃত বলে তত্ত্বত জানেন, তাঁকে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন। (ভগবদ্‌গীতা ৪/৯)

ভগবান সর্বব্যাপী, সর্বাশ্রয়, তাঁকে আশ্রয় করে অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান, অতএব এরূপ যিনি তিনি কাকে ছেড়ে কোথায় যাবেন? ভগবান সর্বান্তর্যামী, তিনি সবার হৃদয়েই বিরাজমান। তিনি বলেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।

"আমি সবার হৃদয়ে রয়েছি, আমিই জীবের বাসনা অনুসারে স্মৃতি জ্ঞান দান করি আবার স্মৃতি জ্ঞান হরণ করি।" (গীতা ১৫/১৫)

সর্বাশ্রয় ভগবান গৌরহরি সবার গৃহ স্বরূপ, লক্ষ্মীদেবী তাঁকে আশ্রয় করেই নিত্য বিরাজমান। অতএব তিনি কখনও লক্ষ্মীপ্রিয়া বা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ এবং তার পরে পরে সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যাপারটি অসঙ্গতি মূলক হয় না।

প্রশ্ন ৩০। জগাই ও মাধাই সব রকমের পাপ আচরণ করা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের ক্ষমা করে কৃপা করলেন। কিন্তু সামান্য অপরাধে পরমভক্ত ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করলেন না কেন? অধিকন্তু ত্রিবেণীতে ছোট হরিদাস আত্মহত্যা করলেন। আত্মহত্যা কি মহাপাপ নয়?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যদি জগাই-মাধাইকে কৃপা না করতেন তবে সাধারণ পাপাচারী মানুষেরাও হরিনামের প্রতি আকৃষ্ট হত না, কারণ সাধারণ মানুষ মনে করত 'আমরা তো পাপ করেছি অতএব আমাদের আর সুন্দর হওয়ার আশা নেই, সদ্‌গতি নেই, তার চেয়ে এই জগতে থাকাকালীন পাপাচারের মাধ্যমেও সুখভোগ করে যাওয়া ভাল, পরজন্মের অবস্থা যখন ভয়ংকর তখন এই জীবনটাই উপভোগ করে যাই।'

কিন্তু মহাপ্রভু মহাবদান্য অবতার শিক্ষা দিলেন অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও যদি হরিনাম কীর্তন করে এবং পাপাচার বন্ধ করে দেয় তা হলেও সে সুন্দর জীবন পেয়ে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পাবে।

কিন্তু ছোট হরিদাসকে সেইভাবে ক্ষমা না করার কারণ হল, হরিভজন করতে এসে, বৈরাগ্যভাব দেখিয়ে মনে মনে ভোগ লালসা থাকলে অন্তর্যামী ভগবান কখনও প্রসন্ন হন না, সেই শিক্ষা দেওয়াই ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য। তিনি যদি ছোট হরিদাসকে ত্যাগ না করতেন, তবে কপট ভক্তরা নানা ঘটনার অজুহাত দেখিয়ে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে লিপ্ত হত। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পবিত্র ভক্তিপন্থাকে কলুষিত করত। আমরা জানি না ছোট হরিদাসের কি অপরাধ ছিল, কিন্তু অন্তর্যামী মহাপ্রভু জানেন। তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়তে হবে। তাই মহাপ্রভুকে যেদিন শ্রীবাস ঠাকুর ছোট হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করেন তখন উত্তরে মহাপ্রভু বলেন 'স্বকর্মফলভুক্ পুমান্' অর্থাৎ, "মানুষ তার আপন কর্মের ফল ভোগ করে।" পরমপূজনীয়া মাধবী দেবী ছিলেন মহা তপস্বিনী কিন্তু ছোট হরিদাসের দৃষ্টিভাব হয়তো ভাল ছিল না।

যখন মহাপ্রভু জানলেন ছোট হরিদাস একবছর মহাপ্রভুর কৃপা অপেক্ষা করে করে নিরাশ হয়েই ত্রিবেণীতে প্রাণবিসর্জন করেছে, তখন মহাপ্রভু বলেন, "এটিই হচ্ছে অবৈধ সঙ্গবাসনার প্রায়শ্চিত্ত।" অর্থাৎ, মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন যদি কারও মনে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বাসনা জন্মে তবে তার উচিত ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত করা। ছোট হরিদাস দেহ ত্যাগ করেই মহাপ্রভুর পদাশ্রয় লাভ করেছে—সেই কথা ভক্তরা বুঝেছিলেন।

বর্তমানে আমাদের এই দেশে 'বৈষ্ণব-ধর্মের' নামে বহু ভেকধারী তিলকধারী বৈষ্ণব গোপনে প্রচার করে বেড়াচ্ছে আপন আপন ইন্দ্রিয় তর্পণ মানসে—"খেয়ে মাছের ঝোল, শুয়ে নারীর কোল, মুখে হরি বোল"। এভাবে তারা অবশ্যই নরকের রাস্তা তৈরি করছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় লাভ করতে হলে আমাদের কত সাবধান হয়ে চলতে হবে সেই কথা মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত তাঁর 'প্রেমবিবর্ত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "যদি প্রণয় রাখিতে চাও গৌরাঙ্গের সনে। ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥" ইন্দ্রিয় লালসা ত্যাগ না করলে মহাপ্রভু তাকে গ্রহণ করেন না। আবার এটাও ঠিক যে, প্রভুর অনুগত ভক্তের অধঃপতন হলেও তিনি ভগবানের কৃপার প্রভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার সুযোগ পান।

পবিত্র ত্রিবেণীতে দেহ বিসর্জন দিয়ে ছোট হরিদাস মহাপাপ করেননি। তিনি মহাপ্রভুর পদসেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে হতাশাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তাই আপন কর্মদোষের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ত্রিবেণীতে দেহ বিসর্জন দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু তার সেই কর্মকে 'প্রায়শ্চিত্ত' বলেই উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন ৩১। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দশাবতারের তালিকাভুক্ত নন। তাহলে শ্রীচৈতন্যদেব যে ভগবান তা কি করে বুঝবো?

উত্তর ঃ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ছয় প্রকার অবতার রয়েছে—

(১) পুরুষাবতার—তাঁরা হচ্ছেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্যের অধিকর্তা। কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই তিন জন।

(২) লীলাবতার—পঁচিশ অবতারের উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে শ্রীপাদ জয়দেব গোস্বামী তাঁর শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ গ্রন্থে মাত্র দশ অবতারের কথা উল্লেখ করেছেন। আর আমরা যদি সেই দশজনকেই মনে করি যে, ভগবানের এই মাত্র দশ অবতার ছাড়া আর কোন অবতার নেই তা হলে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা হবে।

(৩) গুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

(৪) মন্বন্তরাবতার—প্রতি মন্বন্তরে এক এক জন করে অবতীর্ণ হন—ব্রহ্মার ১২ ঘণ্টায় এই রকম চৌদ্দ অবতার রয়েছেন। ব্রহ্মার ১২ ঘণ্টা বলতে পৃথিবীর হিসাবে ৪৩২ কোটি বছর।

(৫) যুগাবতার—চারি যুগে ভগবান চার বর্ণ রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। যেমন—সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরে শ্যামবর্ণ এবং সাধারণ কলিতে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন। কিন্তু বিশেষ কলিযুগে অর্থাৎ, সপ্তম বা বৈবস্বত মন্বন্তরের আটাশ চতুর্যুগে শেষ কলিতে পীতবর্ণ ধারণ করে ভগবান এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন। যেমন এই বর্তমান কলিযুগটি হল সেই আটাশটি দিব্যযুগের শেষ যুগ, তাই অবতীর্ণ হয়েছেন পীতবর্ণধারী শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

কিন্তু তিনি এই যুগের একজন অবতার—এই বললে ভুল হবে। তিনি স্বয়ং অবতারী, অর্থাৎ, সমস্ত অবতারের উৎস। অনন্ত কোটি অবতার তাঁর থেকেই এসেছেন। তবুও তিনি গৌণত এই যুগাবতারের কাজটি করেছেন।

(৬) শক্ত্যাবেশাবতার—সাত অবতারের উল্লেখ রয়েছে। সনাতন শিক্ষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কয়েকটি বিশেষ অবতারের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অবতার অগণিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/২৬) বলা হয়েছে—

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাহবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥"

"শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন—'হে ব্রাহ্মণগণ, যেরূপ অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র প্রবাহ নির্গত হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়, চিদানন্দসমুদ্র ভগবান্ শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকটিত হন।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে পুরুষাবতারের প্রকাশ এবং তাঁর থেকে ক্রমান্বয়ে অসংখ্য অবতারের প্রকাশ। আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হলেন শ্রীগোলোক-বৃন্দাবননাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন বিগ্রহ। তিনি সমস্ত দেবদেবী ও মনুষ্য কুলের দুষ্প্রাপ্য সেই কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানকারী মহাবদান্য বিগ্রহ। ভগবানের নানারূপে অবতরণ, অবতরণ সময় ও লীলাবিলাস ইত্যাদি তথ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে শাস্ত্রে। যেমন—কল্কি

অবতার এই কলিযুগের শেষ পর্যায়ে কোথায় কি রূপে অবতরণ করবেন সেই ভবিষ্যদ্বাণী বহু আগের থেকেই করা হয়ে আছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সমস্ত অবতারের অবতারী স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান তার বহু বহু প্রমাণ শাস্ত্রে রয়েছে যেমন—শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৯/৩৮) প্রহ্লাদ বলেছেন—

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেব ঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্ ।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম্
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥

"হে কৃষ্ণ, তুমি এই প্রকারে নর, তির্যক, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদি অবতার রূপে লোকদেরকে পালন কর এবং জগৎ শত্রুদের বিনাশ কর, হে মহাপুরুষ। তুমি কলিকালে যুগধর্ম নামসংকীর্তন প্রচ্ছন্নভাবে প্রচার করবে। এই জন্য তোমার নাম ত্রিযুগ, কারণ প্রচ্ছন্ন অবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না।"

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২) মহাপ্রভু সম্বন্ধে এও বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

"যাঁর মুখে সর্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুটি বর্ণ, যাঁর কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ, গৌর সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সংকীর্তন-যজ্ঞদ্বারা যজন করে থাকেন।"

আবার দেখা যায় অর্থব বেদে—মহর্ষি পিপ্পলাদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কলিযুগের উপাস্য দেবতা কে?" উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—"জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি।...."

অর্থাৎ, "...সকলের আত্মস্বরূপ, মহাপুরুষ, পরমাত্মাস্বরূপ মহাযোগী ত্রিগুণাতীত বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর স্বয়ং জাহ্নবীতীরে গোলোক স্বরূপ নবদ্বীপ ধামে গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে ভক্তি প্রকাশ করবেন।"

অতএব, ভগবানের সমস্ত রকম বিষয় জানতে হলে সনাতন রত্নস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠচর্চা করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বাপরে অবতীর্ণ হন তখনও অনেকে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে বিশ্বাস করতেন না। তিনি কলিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হন—তিনিই যে ভগবান তাও সবাই মানতে চাইবে না। এর কারণ আমাদের প্রাকৃত জড় চোখে ভগবানকে দেখতে পেলেও—চিন্ময় ভগবান লৌকিক দর্শনের গোচরীভূত হলেও আমাদের মায়াবদ্ধ বুদ্ধিতে তিনি ধরা পড়েন না। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ (গীতা ৯/১১) উল্লেখ করেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবম্ অজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"আমি যখন মনুষ্য রূপে অবতরণ করি, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে জানে না এবং আমি যে সমগ্র বিশ্ব চরাচরের ঈশ্বর তা তারা বিশ্বাস করবে না।"

শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্য রূপের প্রকাশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'ভক্তরূপ' বলা হয়। অর্থাৎ, তিনি স্বয়ং ভক্তরূপেই লীলাবিলাস করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন—আমাদের মতো জড়বুদ্ধিযুক্ত পিশাচীগ্রস্ত হওয়া ভবঘুরেদের কিভাবে ভগবদ্-ভক্তি সাধন করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পেয়ে ভগবানের অংশস্বরূপ আমাদের প্রকৃত মর্যাদা লাভ করতে পারি।

প্রশ্ন ৩২। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী দশাবতার স্তোত্রে কলিযুগে কল্কি অবতারের কথা উল্লেখ করেছেন। কখন সেই অবতার অবতীর্ণ হবেন?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/২৫) বলা হয়েছে—

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু ।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ ॥

"কলিযুগের শেষকালে যখন বিশ্বের রাজন্যবর্গ দস্যু প্রায় হয়ে উঠবে, তখনই শ্রীহরি বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে কল্কি অবতার আবির্ভূত হবেন।"

সেই কল্কি অবতার অবতীর্ণ হতে এখনও প্রায় চার লক্ষ সাতাশ হাজার বছর বাকি। কলিযুগে এখনও সদ্গুণ সম্পন্ন মানুষ অনেক আছেন। ঘোর কলিতে দস্যুরাই সমগ্র জগৎ ছেয়ে ফেলবে।

প্রশ্ন ৩৩। কে আরাধ্য মহাপুরুষ?

উত্তর ঃ জ্যোতিষ বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা সামুদ্রিক শাস্ত্রের তৃতীয় শ্লোকে মহাপুরুষের ৩২টি লক্ষণের কথা বর্ণিত হয়েছে, যেমন—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥

পাঁচটি অঙ্গ (নাক, বাহু, চিবুক, চক্ষু, জানু) দীর্ঘ, পাঁচটি অঙ্গ (ত্বক, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব, দাঁত, রোম) সূক্ষ্ম, সাতটি অঙ্গ (চক্ষু, পদতল, করতল, মুখের তালু, অধর, ওষ্ঠ ও নখ) রক্তিম, ছয়টি অঙ্গ (বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কোমর, মুখ) উন্নত, তিনটি অঙ্গ (গ্রীবা, জঙ্ঘা, মেহন) হ্রস্ব বা খর্বাকৃতি, তিনটি অঙ্গ (কটিদেশ, ললাট ও বক্ষ) বিস্তীর্ণ বা চওড়া, তিনটি অঙ্গ (নাভি, স্বর, সত্ত্ব) গম্ভীর।

যিনি এই বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত, তিনিই মহাপুরুষ। যে কোনও ব্যক্তিই মহাপুরুষরূপে বিবেচ্য হন না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সমস্ত লক্ষণ ছিলই এবং শচীমাতার পিতা মহান জ্যোতিষী ও শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী ভগবানের করচিহ্ন ও পদচিহ্নসমূহ শিশু নিমাইয়ের হাতে পায়ে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। বজ্র, ধ্বজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, রথ, মীন, অঙ্কুশ, অম্বর, কুঞ্জর, অশ্ব, বৃষ, ধনু, শক্তি ইত্যাদি বিবিধ রকমের মঙ্গলময়

চিহ্ন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কর ও চরণ তলে প্রকাশিত ছিল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সে কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। ভগবান শ্রীহরির চিহ্নযুক্ত করতল পদতল দেখে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীকে গৃহে ডেকে আনেন। নীলাম্বর চক্রবর্তী দিনক্ষণ দেখে শিশু নিমাইয়ের নামকরণ করতে থাকেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই শিশু সমগ্র জগৎ উদ্ধার করবে। সর্বলোক ধারণ ও পোষণ করবে। তাই এর নাম 'বিশ্বম্ভর'—যিনি বিশ্বকে ভরণপোষণ করেন।

সুতরাং, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরাধ্য মহাপুরুষ কিনা তা তাঁর আবির্ভাবের বহু পূর্বে শাস্ত্রে উল্লেখ থাকবে। মনগড়াভাবে যাকে তাকে আরাধ্য ভগবান বা আরাধ্য মহাপুরুষ জ্ঞান করাটা অজ্ঞতার বা মূর্খতার পরিচায়ক। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২) বর্ণিত হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

মহারাজ নিমির প্রতি শ্রীকরভাজন ঋষি কলিযুগ প্রসঙ্গে নির্ধারণ করেছেন যে, কলিযুগে যারা সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি হবে তারা অবশ্যই সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করবে। সেই আরাধ্য ভগবান 'কৃষ্ণ' বর্ণ উচ্চারণ করেন, কিন্তু তাঁর গায়ের রঙ অকৃষ্ণ অর্থাৎ, গৌরবর্ণ। তিনি তাঁর সঙ্গী সেবক ও অন্তরঙ্গ পার্ষদদের দ্বারা পরিবৃত।

অথর্ব বেদে বলা হয়েছে, কলিযুগে নবদ্বীপে ভাগীরথীতীরে স্বয়ংকৃষ্ণ গৌররূপে আবির্ভূত হয়ে জগজ্জীবকে ভক্তিশিক্ষা দান করবেন। মহর্ষি পিপ্পলাদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি—*জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্বাত্মা মহাপুরুষো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি।* দ্বিভূজ শ্যামসুন্দর স্বয়ং জাহ্নবীতীরস্থ গোলোকাখ্য নবদ্বীপ ধামে গৌরসুন্দর রূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে ভক্তিপ্রকাশ করবেন। তিনি সকলের অন্তর্যামী মহাপুরুষ।"

অতএব এখন, কে আরাধ্য মহাপুরুষ তা বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারবেন।

প্রশ্ন ৩৪। কলিযুগে মহাপ্রভু শ্রীগৌরহরি যদি—আরাধ্য ভগবান হন, তা হলে মানুষ কেন বিভিন্ন দেবদেবী, বিভিন্ন যোগী বা সিদ্ধবাবাদের পূজা করছে?

উত্তর ঃ অধিকাংশ মানুষের ধারণাই নেই, কে ভগবান। কেউ বলে জীবই ভগবান, কেউ বলে দরিদ্র, পঙ্গু, অন্ধরাই ভগবান, কেউ বলে মানুষই ভগবান কিছু একটা সিদ্ধি জানে এমন ব্যক্তিকে কেউ কেউ ভগবান বলে মনে করে। অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা একটা বাজে ধারণা আছে যে, বৈদিক শাস্ত্রগুলি তারই মতো কোনও কোনও মানুষের রচনা, অধিকাংশ মানুষই মনে করে ভগবান হচ্ছে কল্পনা। অনেকেই মনে করছে এই জীবনটাই সবকিছু, অতীত জন্ম বা পরজন্ম বলে কিছু নেই। এই জগতের বাইরে কোনও জগৎ নেই। এই দৃশ্যমান জগৎ ছাড়া সবই রূপ কথা। মরে গেলে সব শেষ। অতএব ভোগ করতে পারলেই জীবন সার্থক হবে। তখন যারা কিছু কিছু সিদ্ধি জানে সেই

সিদ্ধদের শরণাগত হয়। দেব-দেবীর শরণাগত হয়ে কিছু জাগতিক সুখ ভোগ প্রার্থনা করে। কিন্তু এই ধরনের মানুষেরা সমাজে যতই বিশাল গণ্যমান্য ব্যক্তি হন না কেন শ্রীমদ্ভাগবতে তাদের গণ্ডমূর্খ পশু বলে নির্ধারিত করা হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"যাদের মন জড়জাগতিক সুখভোগের কামনা বাসনা দ্বারা বিকৃত, তারাই অন্য দেবদেবীদের শরণাগত হয় এবং তাদের নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে নিয়ম পালন করেই দেবতাদের উপাসনা করে।" (গীতা বিজ্ঞানযোগ ৭/২০)

প্রশ্ন ৩৫। শ্রীমদ্ভাগবতে দশজন অবতার ছাড়া অসংখ্য অবতার রয়েছেন বলা হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য মহাপ্রভুকে 'যুগাবতার' প্রমাণের যে যুক্তি দিয়েছেন তা অন্যের বেলায় প্রযোজ্য হবে না কেন?

উত্তর ঃ আপনি শ্রীমদ্ভাগবত কিংবা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত নিশ্চয়ই পড়েন নি। শ্রীমদ্ভাগবতে মাত্র ২২জন অবতারের নাম উল্লেখ রয়েছে এবং অনন্ত কোটি অবতারের অবতরণের কথা বলা হয়েছে। কোথাও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'যুগাবতার' বলা হয়নি। এখন কলিযুগে কতরকমের উদ্ভট ভুঁইফোড় 'যুগাবতার' গুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ধরনের 'যুগাবতার' নামে খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কেউ কেউ তান্ত্রিক মন্ত্র সিদ্ধি প্রাপ্ত কিংবা অষ্টাঙ্গিক যোগসিদ্ধি কিছুটা আয়ত্ত করেছেন মাত্র। কিন্তু তারা কোনও দিন কেউ ভগবানও নয়, এমনকি ভক্তও নয়। শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার তিন, কল্পাবতার পঁচিশ, মন্বন্তরাবতার বারো, যুগাবতার চার, গুণাবতার তিন ইত্যাদি যে সব অবতারের নাম পরিচয়াদি বর্ণিত আছে তা কোনও অষ্টাঙ্গিক যোগীবাবাকে বা তান্ত্রিক সাধককে বোঝায় না। সমস্ত অবতারের মূল উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। কলিযুগের লীলাবতার হচ্ছেন কল্কি। তিনি আবির্ভূত হবেন চারলক্ষ বছর পরে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ, সমস্ত অবতারের অবতারী। যে ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে যুগধর্ম সংকীর্তন মাধ্যমে আরাধনা করবেন তিনিই হচ্ছেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এ কথা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ রয়েছে। কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতারের কার্যটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এই বিশেষ কলিযুগে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবার ধরাতলে প্রকটলীলা করবেন পুনরায় বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলিতে।

প্রশ্ন ৩৬। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে কলিযুগে আবির্ভূত হন, সেই কলিযুগ ধন্য। সেই কলিযুগে মনুষ্য জীবন লাভ করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এ ব্যাপারে আমরা শাস্ত্রকথা শুনেছি। তা হলে এরকম ধন্য কলিযুগে দুর্ভাগা কি থাকছে না?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে—

অবতীর্ণ গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণ প্রেমসাগরে।
সুপ্রকাশিত-রত্নৌঘে যো দীনো দীন এব সঃ ॥

বিস্তৃত প্রেম সাগরে শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হয়ে শ্রবণ-কীর্তন ইত্যাদি নববিধ ভক্তিরত্ন রাশি সুপ্রকাশিত করেছেন। এরকম সুযোগেও যে ব্যক্তি দরিদ্রই থেকে গেল, অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণ, হরিনাম কীর্তনাদি সাধনভজন বর্জিত থেকে গেল, সেই মানুষ নিতান্তই দুর্ভাগা সন্দেহ নেই। (চৈঃ চঃ ৫/৩৪) ভগবানের ভক্ত হলে ভাগ্যবান এবং অভক্ত হলে অভাগা হয়ে থাকতে হয়।

প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযুষ-রস সাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উদিত হয়ে মহাপ্রেম অমৃত সাগর বিস্তার করলেও যে ব্যক্তি দীন থাকল অর্থাৎ, সেই প্রেমামৃত পানে বঞ্চিত থাকল, সে নিতান্তই বড় ভাগা। (চৈঃ চঃ ৫/৩৬) এই কথাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন ৩৭। শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে রাধারাণীর ভাব ও কান্তি নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তিনি হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। রাধারাণীর ভাব নিয়েছেন ভাল কথা, কান্তি নিয়েও কেন আবির্ভূত হলেন?

উত্তর ঃ রাধাকান্তি নিয়ে আবির্ভূত হলেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে, তাতে মন্দ কথাটাই বা হল কোথায়? গোলোক মায়াপুরে গৌরহরির নিত্যরূপই হল তপ্তকাঞ্চন বর্ণ। কলিযুগের মানুষের জন্য সেই রূপটিই ব্যাসদেব মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখ করেছিলেন। "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গ"—স্বর্ণ বর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২) কলিযুগের ভগবানের অঙ্গকান্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে "ত্বিষাঽকৃষ্ণ" কান্তিতে গৌরবর্ণ।

অতএব পণ্ডিতগণ জানেন এই কলিযুগে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ধারণকারী দ্বিতীয় কেউই নেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ছাড়া।

কলিযুগে অনেক ভুঁইফোঁড় তথাকথিত ভগবানের কথা শোনা যায়। কত মানুষ এভাবে ভগবান সাজে। কিন্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি ভক্তরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন। পরমভক্তির পরাকাষ্ঠা রাধারাণীর অঙ্গকান্তি তিনি অঙ্গীকার করেছেন। এটাই হচ্ছে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় মহাবদান্য মহাপ্রভুর বিশেষ রূপ।

প্রশ্ন ৩৮। গৌরাঙ্গের পঞ্চ নাম কি কি?

উত্তর ঃ শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্রীগৌরাঙ্গের সহস্র নাম বলেছিলেন। জীবকে কৃষ্ণভক্তি চেতনা প্রদান করেন বলে তাঁর নাম 'কৃষ্ণচৈতন্য'। বিশ্বের ভরণপোষণ করেন তাই তাঁর নাম 'বিশ্বম্ভর'। সেই যশোদানন্দন কৃষ্ণ কলিকালে শচীদেবীর পুত্ররূপে প্রকাশিত তাই তাঁর নাম 'শচীনন্দন'। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়া রাধারাণীর

ভাব নিয়ে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হলেন। তাই তাঁর নাম 'রাধাভাব'। তিনি যদিও ভক্ত নন, স্বয়ং ভগবান, তবুও ভক্তরূপে স্বয়ং আচরণ করে সংসারে বদ্ধ জীবদের কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিয়েছেন তাই তাঁর নাম 'সর্বভক্তশিরোমণি'।

প্রশ্ন ৩৯। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥
(চৈতন্যচরিতামৃত আদি ৩/৫১)

এখানে অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা কি?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে কলিকালের লোকেদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নামসংকীর্তন বহুল যজ্ঞ দ্বারা অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদদের সঙ্গে বিদ্যমান কৃষ্ণনাম-উচ্চারণরত অকৃষ্ণবর্ণ শ্রীগৌরহরির উপাসনা করবেন।

এখানে ভগবান গৌরহরির স্বাংশ প্রকাশ অর্থাৎ, দুই ঈশ্বর প্রকাশকে 'অঙ্গ' বলা হয়েছে তাঁরা হলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু। গৌরহরির 'উপাঙ্গ' হচ্ছেন শ্রীবাস প্রমুখ শুদ্ধভক্তবৃন্দ। 'অস্ত্র' হল অবিদ্যা ছেদক ভগবৎ নাম, আর 'পার্ষদ' হলেন শ্রীগদাধর প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ।

প্রশ্ন ৪০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কখন কত বছর পর্যন্ত ধরাধামে প্রকটলীলা করেছেন?

উত্তর ঃ ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৪৮ বছর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ধরাধামে প্রকটলীলা প্রদর্শন করেছেন।

প্রশ্ন ৪১। এই কলিযুগে ভগবানের অবতারগণের নাম পরিচয়াদি সংক্ষিপ্ত ভাবে জানতে চাই।

উত্তর ঃ বর্তমান কলিযুগ দুই হাজার বছর গত হলে ভগবান গয়াপ্রদেশে ধর্মারণ্য গ্রামে অজিনের পুত্র রূপে **শ্রীবুদ্ধ** অবতার আবির্ভূত হন। তাঁর অঙ্গকান্তি পাটলবর্ণ (রক্ত ও শ্বেত মিশ্রিত), মুণ্ডিত মস্তক দ্বিভুজ অবতার।

কলিযুগ পাঁচহাজার বছর গত হলে শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীমতী শচীদেবীর পুত্ররূপে **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু** পাপীতাপী নির্বিশেষে বদ্ধজীবগণে ভক্তিশিক্ষা দানার্থে আবির্ভূত হন। তিনি তপ্তকাঞ্চন বর্ণ অবতার।

এই কলিযুগের অবসান সময়ে সম্ভলপুর গ্রামে বিষ্ণুযশার পুত্ররূপে **কল্কী** অবতার অবতীর্ণ হয়ে সমগ্র দস্যুকে বিনাশ করে কলির রাজত্বের অবসান করবেন। তারপর সত্যযুগের সূচনা হবে।

প্রশ্ন ৪২। ভগবানের সবচেয়ে করুণাময় রূপ কোনটি?

উত্তর ঃ করুণাময় ভগবানের সবচেয়ে করুণাময় যে রূপে কলিযুগের পাপীতাপীকেও সুদুর্লভ ভগবৎ প্রেম প্রদান করে তাঁর সচ্চিদানন্দময় ধামে আকর্ষণ করেছেন, সেই করুণাময় উদার রূপ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। সেইজন্য মহাপণ্ডিত শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমো ॥

'পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সমস্ত অবতার থেকেও উদার (মহাবদান্য), যিনি অত্যন্ত দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেছেন, তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।'

প্রশ্ন ৪৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই। একথা আমরা বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি নদীয়ার লোকেরা কেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা না গ্রহণ করে তারা কেউ লোকনাথ বাবার ভক্ত, কেউ অনুকূল চন্দ্রের ভক্ত, কেউ নিগমানন্দের ভক্ত, কেউ সম্পূর্ণ নাস্তিক? তার মানে কি এই যে, নদীয়াতে বাস করেও তারা দুর্ভাগা?

উত্তর ঃ যদি বৈদিক শাস্ত্র থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলে জানতে পেরেছেন, তাহলে আপনি মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে ব্রতী হোন এবং কৃষ্ণভক্তি-বিরুদ্ধ বিষয় এড়িয়ে চলতে যত্ন নিন।

কে কার ভক্ত, কে কোথায় বাস করে কি করছে, সে বিষয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। যদি কেউ আন্তরিক ভাবে জানতে চায়, কলিযুগের আরাধ্যদেব কে? তখন আপনি অবশ্যই শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দিয়ে বলবেন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই পরম আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবান। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই। রাধাভাব অঙ্গীকার করে ভক্তরূপে ভক্তিশিক্ষা দেবার জন্য তিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন।

নদীয়ার লোক হোক কিংবা অন্য কোন স্থানের লোক, যেই হোক না কেন, যারা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানে না এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভক্তরূপে সাধারণ পাপীতাপীদের মধ্যেও কৃষ্ণভক্তি বিলিয়ে কৃষ্ণধামে নিয়ে যাবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, এরকম ঘটনা ব্রহ্মার দিবসে একবার মাত্র ঘটে, এসব কথা যারা হৃদয়ঙ্গম করে না, তারা যত বড় সামাজিক গণ্যমান্য ব্যক্তি হন না কেন, তারা অত্যন্ত হতভাগা।

প্রশ্ন ৪৪। 'শ্রীচৈতন্য' কথাটির মানে কি?

উত্তর ঃ 'সুন্দর চেতনাময়'। পরম চেতন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যার সম্বন্ধ জ্ঞান নেই, তাকে অজ্ঞান বা অচৈতন্য বলা হয়। অচৈতন্য জীবকে কৃষ্ণভাবনামৃত দিয়ে সচেতন করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরূপ ধারণ করে শ্রীচৈতন্য রূপে ধরাধামে আবির্ভূত হলেন।

প্রশ্ন ৪৫। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ না হলে জগতের কি অবস্থা হত?

উত্তর ঃ কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ না হলে জগতে ঘোর কলি শুরু হয়ে যেত। অর্থাৎ, সবাই আমিষ আহার, জুয়া-লটারী, অবৈধ যৌনতা ও নেশাভাঙে মেতেই থাকত এবং সব রকমের অনাচার শুরু হয়ে যেত। মানুষের নিজেকে পবিত্র রাখার মানসিকতাও হারিয়ে যেত। গীতা-ভাগবতের নির্ধারিত চিন্ময় নিত্য আনন্দের সন্ধানে কেউ অগ্রসর হত না। সবাই জড় বিষয়সুখ ভোগের জন্যে সবরকমের পাপ

কার্যেরই অনুষ্ঠান করত। সেই সম্ভাব্য ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে মনস্বী ব্যক্তিত্ব শ্রীঅদ্বৈত আচার্য তুলসীমঞ্জরী ও গঙ্গাজল শালগ্রামকে অর্পণপূর্বক হুঙ্কার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করেছিলেন ধরাতলে নেমে আসার জন্য। তাঁর আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ নিমাই বা শ্রীচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হলেন।

প্রশ্ন ৪৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/৭-৮) বলা হয়েছে, ধর্মের গ্লানি হলে, অধর্মের উত্থান হলে সাধুদের পরিত্রাণ করতে, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করতে এবং ধর্ম সংস্থাপন করতে ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র, দ্বাপরে কৃষ্ণ ও কলি যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বর্তমানে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হচ্ছে। কিন্তু ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে ভগবান কেন অবতীর্ণ হচ্ছেন না?

উত্তর ঃ কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যুগধর্ম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন সংস্থাপন করেছেন। এখন সারা পৃথিবীতে হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন চলছে। ধর্মের গ্লানি নয়, ধর্মের প্রতি বহু মানুষের মতি রয়েছে। যখন কলির প্রবল প্রভাবে কেউ আর হরেকৃষ্ণ উচ্চারণ করবে না, কৃষ্ণ আরাধনা করবে না, লোকে সম্পূর্ণরূপে অধর্মাচারী পাপাচারী হবে, সেই পরিস্থিতি নস্যাৎ করতে কল্কি অবতার অবতীর্ণ হবেন। এখন তো ধর্ম সংস্থাপিত রয়েছে। পৃথিবীতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব কাল থেকে আগামী দশ সহস্র বৎসর অবধি হরেকৃষ্ণ কীর্তন তথা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন চলবে। এই কথা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের কৃষ্ণনাম আশ্রয় করেই ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে চলতে হবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'নামরূপে কলিযুগে কৃষ্ণ অবতার'।

প্রশ্ন ৪৭। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহকে কিভাবে সাজসজ্জায় ভূষিত করা কর্তব্য?

উত্তর ঃ এই প্রশ্ন প্রসঙ্গে একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, ভক্তরা তাঁদের ভাব অনুসারে অর্চা মূর্তিকে সাজাবে। কালনাতে শ্রীনিত্যানন্দের শ্বশুরবাড়ি থাকায় সেখানে শ্রীশ্রীগৌরনিতাইকে সাদা বা ঘি রঙের ধুতি-পাঞ্জাবী পরানো হয়। শ্রীমায়াপুরে শচীমাতার নিমাই নানা রঙ-বেরঙের বসন পরে থাকেন। পুরীতে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য গেরুয়া বসন পরিহিতরূপে আরাধিত হন। মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ এই জ্ঞানে ভক্তরা তাঁর মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজে দেন। আবার কোথাও রাধাভাবান্বিত মহাপ্রভুর ময়ূরের পালক থাকে না। এভাবে ভক্তদের ভাব অনুসারে মহাপ্রভুর বিগ্রহকে সাজানো হয়।

প্রশ্ন ৪৮। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে শিখিয়েছেন। তিনি কি উচ্চস্বরে জপ করতেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী (শ্রীচৈতন্যাষ্টক ৫) উল্লেখ করেছেন, হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনাকৃতগ্রন্থিশ্রেণী। লোকশিক্ষক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সূত্রের গ্রন্থিতে গণনা করে স্ফুরিত জিহ্বায় উচ্চস্বরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
শ্রীমদ্ভাগবত (১ম-১২শ স্কন্ধ, ১৮ খণ্ড)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (৪ খণ্ড)
গীতার গান
গীতার রহস্য
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
দেবহূতি নন্দন কপিল শিক্ষামৃত
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম উপহার
ঈশোপনিষদ
যোগসিদ্ধি
কৃষ্ণভাবনার অমৃত
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
জীবন আসে জীবন থেকে
বৈদিক সাম্যবাদ
অমৃতের সন্ধানে
ভগবানের কথা
ঈশ্বরের সন্ধানে
জ্ঞানকথা
কৃষ্ণ বড় দয়াময়
পরম পিতা
শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে
কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান
কৃষ্ণভক্তি প্রচারই প্রকৃত পরোপকার
হরেকৃষ্ণ চ্যালেঞ্জ
পরলোকে সুগম যাত্রা
প্রকৃতির নিয়ম ঃ যেমন কর্ম তেমন ফল
জীবন জিজ্ঞাসা
বৈষ্ণব কে?
বৈষ্ণব শ্লোকাবলী
ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন
প্রভুপাদ
ভক্তিবেদান্ত স্তোত্রাবলী
পাশ্চাত্যে কৃষ্ণভক্তির প্রচার
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে পরম শান্তি (রঙীন)
পরম সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্য
শ্রীএকাদশী মাহাত্ম্য
পঞ্চরাত্র প্রদীপ (শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি)
শ্রীমায়াপুর দর্শন
গৃহে বসে কৃষ্ণভজন
যুগধর্ম
ভক্তবৎসল ভগবান
মায়াপুরে শ্রীশ্রীরাধামাধব
ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব
মহাজন উপদেশ
ধ্রুব চরিত
শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব মহিমা
জগতে আমরা কোথায়?
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (পাক্ষিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
ডি. বি-৪৫
সল্টলেক
কলকাতা—৭০০০৬৪